বিষয় সূচী

লেখক সূচী

চিঠিপত্র ... ... *
পুস্তক সমালোচনা ... ... †

চিত্র-সূচী

ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্র ... *

ত্রিবর্ণ চিত্র ... †

অ

আ

ই

উ

এ

ও

ক

স

৫ম বর্ষ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ১ম সংখ্যা

প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান*

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বেলজিয়াম্-নিবাসী প্রসিদ্ধ গব্লেট্ ডি আল্ভিলা ভারতবর্ষ দেশ সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ দেশটীকে ভাল করিয়া বুঝা বড়ই শক্ত। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, অপূর্ব্ব নাট্যকলা, উপনিষদের অতুলনীয় দর্শনবাদ এবং গীতা পাশ্চাত্য দেশকে বহুপূর্ব্বেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষেই এক সময়ে পাটিগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্কুরপাত হয়। সাধারণতঃ যে সংখ্যালিখনপ্রণালী আরববাসীদিগের দ্বারা উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়—সে'টী বস্তুতঃ হিন্দুমস্তিষ্কেরই আবিষ্কার।

ম্যাক্সমুলার কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষ ইউরোপকে সংখ্যাপ্রণালী ছাড়া অন্য কিছু উপকার নাও দিত, তাহা হইলেও ভারতের কাছে ইউরোপের ঋণ অপরিশোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আসিরিয়া, বাবিলন্ এবং মিশরদেশে কেবল স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান; প্রস্তরাদির গাত্রে অথবা ইষ্টকাদির উপর শরফলাকাকার উৎকীর্ণ রেখা ও চিত্রাক্ষর—কেবল ইহা লইয়াই ঐ সকল দেশ গৌরবান্বিত। তুতানখামেনে যে সমাধিমন্দির আছে, সেখানে সম্প্রতি মিশরদেশীয় সকল প্রকার কলাকার্য্যের অনেক নূতন নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের শেষস্মৃতি আজ কেবল সাহিত্য ও দর্শনবাদেই পর্য্যবসিত। কিন্তু হিন্দুজাতি ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে—যখন পুণ্যনগরী কাশীতে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—

* ভারতীয় রসায়ন-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্-এস্-সি কর্ত্তৃক অনূদিত।

তখনও যেরূপ ছিল, আজও ঠিক সেইরূপই আছে। শাক্যমুনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যদি হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম্মের মূলে আঘাত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমগ্র ভারত তাঁহার নূতন ধর্ম্মবাদ অবিলম্বে গ্রহণ করিবে।

কাশীনগরী হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সারনাথের প্রাচীন চিত্রকলার আবিষ্কার হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আধিপত্যের মূলে আঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়তা ও জীবনীশক্তি অতি আশ্চর্য্য; এবং ইহা পিয়ের লোতির মত জ্ঞানী পরিব্রাজক ও সমালোচককেও বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। এমন কি, আজকালকার দিনেও ইউরোপীয় আগন্তুকেরা ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুকে দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য এবং গঙ্গাতীরে স্নান করিতে দেখিয়া সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, পাশ্চাত্যের সহিত সংঘর্ষণে হিন্দুধর্ম্মের কোনই অনিষ্ট হয় নাই। পঞ্চবিংশতি শতাব্দির পূর্ব্বে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপভাবে থাকিতেন,—আজও হিন্দু ঠিক সেইরূপই সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

> "The East bowed low before the blast
> In patient, deep disdain,
> She let the legions thunder past
> And pluuged in thought again".

অর্থাৎ, "প্রাচ্যের উপর দিয়া অনেক ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে গভীর সহিষ্ণুতা ও ঘৃণার সহিত অসংখ্য ঝটিকা অতিক্রম করিয়া আবার নিজের সাধনায় বিভোর হইয়া আছে।"

এ'কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, হিন্দুরা চিরকালই খুব চিন্তাশীল এবং কূট আধ্যাত্মিক তত্ত্বজালে আপনহারা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসেবকের কখনও অভাব হয় নাই। কণাদের বৈশেষিক বাদে নিয়ন্ত্রিত পরমাণুবাদ সম্বন্ধে বেশী বলা এই অল্পসময়ের মধ্যে আমার পক্ষে অসম্ভব। কণাদের এই কল্পনার মধ্যে আনাক্সাগোরাস্ ও এম্পিডোক্লসের ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। এখন আমি প্রাচীন হিন্দুদিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সম্বন্ধে এবং পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁহারা যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই বিষয়ে কিছু বলিব। "রসেন্দ্রচিন্তামণি" নামক উৎকৃষ্ট ঔষধসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণেতা ঢুণ্ডুকনাথ সত্যই বলিয়াছেন—তাঁহারাই আদর্শ শিক্ষক, যাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রের সমক্ষে দেখাইতে পারেন; এবং তাঁহারাই উপযুক্ত ছাত্র, যাঁহারা অধীত পরীক্ষাগুলি পুনঃ সম্পন্ন করিতে পারেন। যে সকল শিক্ষক ও ছাত্র তাহা পারেন না, তাঁহারা কেবল রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা।

ঢুণ্ডুকনাথ "রসার্ণব" নামক একটি উৎকৃষ্ট ভেষজগ্রন্থের নিকট তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পুস্তকে পরিস্রবণ (distillation) ও পরিষ্করণ (sublimation) প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণী আছে। ভারতবর্ষের রসতান্ত্রিকগণ (Alchemists) বিচক্ষণ রাসায়নিক পণ্ডিত নাগার্জ্জুনের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই নাগার্জ্জুনই উপরোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়াসকলের উদ্ভাবক বলিয়া বিবেচিত।
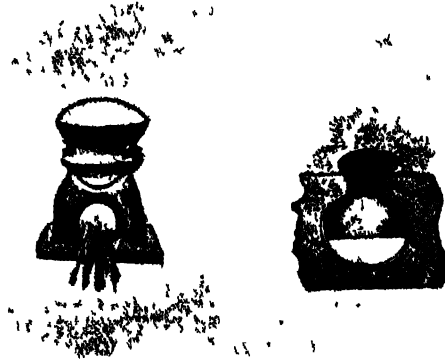
পরিস্রবণ ও পরিষ্করণের যন্ত্রপাতি

যে সকল উপায়ে পারদ পরিষ্কৃত হয়—একটী উদাহরণ দিলেই তাহার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।—

"মিশ্রিতো চেদ্রসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষতন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ।"

পরিস্রবণের যন্ত্র

সিনাবার হইতে পারদ-প্রস্তুতকরণের যন্ত্র

অর্থাৎ—"প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী পারদের সঙ্গে সীসা মিশাইয়া "ভেজাল" করে। তিন বার পরিস্রবণ করিয়া এই সকল সংমিশ্রিত দূষিত পদার্থ দূরীভূত করা হয়।"

অগ্নিশিখার বর্ণ হইতে যে ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারে, "রসার্ণব" নামক পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে—"তাম্র অগ্নিশিখাকে নীল, রঙ্গ ধূসরবর্ণে এবং সীসা আকাশের বর্ণে রঞ্জিত করে"। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রাচীন কালে ধাতুনির্ণয়ের জন্য এইরূপ পরীক্ষা আর কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। ধাতুর কার্য্যে হিন্দুরা কিরূপ নিপুণ ছিল, সে সম্বন্ধে দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে মাত্র ছয়টী ধাতুর কথা উল্লেখ করা আছে—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীসা, টিন ও তাম্র। দস্তা (জসদ) নামক সপ্তম ধাতুর নাম ইউরোপের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম প্যারাসেল্‌সাসের পুস্তকে দেখা যায়। তিনি দস্তাকে "অর্দ্ধ ধাতু" বা "বিজাতক ধাতু" আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু উহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

ধূম প্রস্তুত করিবার যন্ত্র

ক্যালামিন্ হইতে দস্তা প্রস্তুতকরণ

লিবেভিয়াস্‌ই সর্ব্বপ্রথম দস্তার বিশেষ গুণগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, ঐ ধাতু "ক্যালামিন" (Calamine) নামক খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ক্যালাইম্" (calaëm) নামক এক বিশেষ প্রকার টিন্ পূর্ব্ব ভারতে পাওয়া যায়। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে হল্যাণ্ডে এই খনিজ পদার্থ কিছু আনেন এবং এইরূপে এই খনিজ পদার্থ লিবেভিয়াসের হাতে আসে।

ক্যালামিন্ হইতে কি প্রকারে দস্তা পাওয়া যায়, তাহার সমস্ত বিবরণী বিস্তৃতভাবে আমরা "রসার্ণব" ও "রসরত্নসমুচ্চয়"—এই দুইখানি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। শেষোক্ত পুস্তকে দস্তা প্রস্তুত করিবার যে উপায়ের কথা বলা আছে, তাহার বিস্তৃত ভাবার্থ ই—

ক্যালামিনের সহিত হরিদ্রা, রজন, লবণ, অঙ্গার ও সোহাগা মিশান হয়। একটী ক্রুসিবুল্ অর্থাৎ ধাতু গলাইবার পাত্রের মধ্যে উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ রাখা হয় এবং তাহার পর উহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। অতঃপর ক্রুসিবুলের মুখ ফুটো রেকাবী দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। একটী জলপূর্ণ পাত্র মাটীর ভিতর পুঁতিয়া রাখা হয় এবং সেই মাটির উপর উপরোক্ত মিশ্রিত জিনিষ ভরা পাত্রটি উল্টাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে তখন উনানে কাঠকয়লার উপর রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। এ সমস্তই ছবিতে দেখান হইল। যখন পাত্রের ভিতর হইতে নির্গত অগ্নিশিখার রঙ্ নীল হইতে সাদা হয়, তখন এই সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। সেই খনিজ পদার্থের সারাংশ—যাহা জলে ডুবিয়া যায় এবং যাহাতে টিনের মত ঔজ্জ্বল্য আছে—তাহা গ্রহণ করা হয়;—ইহাই দস্তা।

বস্তুতঃ, দস্তা প্রস্তুত করিবার এই উপায় এরূপ সুবিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, আধুনিক রসায়নের যে-কোন গ্রন্থে এই প্রণালীটি অবিকল নকল করিয়া দিলেও কোনরূপ অসামঞ্জস্য হইবে না।
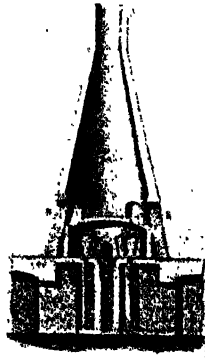
দস্তা প্রস্তুতকরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি

দস্তা প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী হইতেছে—অল্প বায়ুর উপস্থিতিতে পরিস্রবণ করা (distillation in insufficient supply of air)। ক্রুসিবুলের মুখ হইতে কার্ব্বণ-মনক্সাইড্ পুড়িয়া নীল রঙের অগ্নিশিখা বাহির হয়,—ইহা আজকাল ধাতুকার্য্যে প্রায়ই পর্য্য-বেক্ষণ করা হয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পুরাতন প্রণালী ও নূতন প্রণালী—এই দুইই বলিতে গেলে একই।

এ'কথা অবশ্য জোর করিয়া বলা চলে না যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে কার্ব্বণ মনক্সাইড্ পুড়িবার জন্যই যে অগ্নিশিখা নীল বর্ণ হয়, তাহা প্রাচীনকালে হিন্দুরা জানিত; কিন্তু উপরোক্ত প্রাচীন প্রণালীটিতে কি অদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি নিহিত আছে, তাহা লক্ষ্য করা খুব দরকার।

প্রাচীনকালে হিন্দুরা পোট্যাসিয়ম্ কার্ব্বনেট ও সোডিয়ম কার্ব্বনেট এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিত। তাহারা পোটাসিয়ম্ কার্ব্বণেটকে যবক্ষার ও সোডিয়ম কার্ব্বনেটকে সরজিকাক্ষার বলিত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বিবরণী "সুশ্রুতের প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে আছে। "চরক" ও "সুশ্রুত" এই দুইখানিই আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় গ্রন্থ। "চরকে" ঔষধ-সম্পর্কীয় ব্যাপারই বেশী লিপিবদ্ধ করা আছে; এবং "সুশ্রুতে" অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধেই বেশী সংবাদ পাওয়া যায়। "সুশ্রুত সংহিতায়" উপরোক্ত কথা লেখা হইবার ২০০০ বৎসর পরে যোসেফ্ ব্ল্যাক্ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার করেন। "সুশ্রুতে" ঐ দুই প্রকার ক্ষারকে তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষার বলিয়া উল্লেখ করা আছে। এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝা খুব শক্ত নয়। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কলাগাছ পোড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যাইত তাহার দ্বারা রজকেরা কাপড় পরিষ্কার করিত। ইহার কারণ এই যে, এই ভস্মে পোটাসিয়ম্ কার্ব্বণেট প্রচুর পরিমাণে আছে। "সুশ্রুতে" অনেক স্থানীয় গাছ-পালার উল্লেখ আছে। এই সকল গাছপালা উদয়চাঁদ দত্ত প্রণীত "Materia Medica of the Hindus" (অর্থাৎ হিন্দুদিগের ঔষধদ্রব্য) নামক পুস্তকে উদ্ভিজ্জশাস্ত্রানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে "সুশ্রুতে" যাহা লেখা আছে, তাহার মোটামুটি ভাবার্থ এই—"শুভদিনে গাছ কাটিয়া তাহাকে পোড়াইবে। উহার ভস্ম একটী লৌহপাত্রে জলের মধ্যে রাখিয়া ফুটান'র পর অনেক পদ্দা ভাঁজ করা কাপড়ের ভিতর দিয়া উহাকে ছাঁকিয়া ফেলিবে।" "সুশ্রুতে" বলা আছে যে—উহাই মৃদুক্ষার। এই প্রণালীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া যে কি হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যে পরিষ্কার দ্রাবক সর্ব্বশেষে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রচুর পোটাসিয়ম্ কার্ব্বণেট থাকে এবং উহাই মৃদুক্ষার।

প্রাচীন ভারতে যে প্রণালীতে ক্ষারপ্রস্তুত হইত, তাহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ের খুব সামান্যই প্রভেদ আছে। কতকগুলি বিশেষ প্রকারের চূর্ণ-প্রস্তর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া উগ্রভাবে পোড়াইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জলের সহিত মিশাইবে। তাহার পর এই গুঁড়া চূণ (Slaked lime) মৃদুক্ষারের সহিত মিশাইয়া জলে ফুটাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লোহার হাতল দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। এই প্রণালীতে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তাহা অধুনা সকল রাসায়নিক ছাত্রই সম্যক অবগত আছেন।

চূর্ণ-প্রস্তর ———> চূণ + কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্
($CaCO_3$) (CaO) CO_2

চূণ + জল ———> গুঁড়া চূণ
(CaO) (H_2O) $Ca(OH)_2$

মৃদুক্ষার + গুঁড়া চূণ ———> ক্ষার + চূর্ণ প্রস্তর
(K_2CO_3) $Ca(OH)_2$ ($2KOH$) ($CaCO_3$)
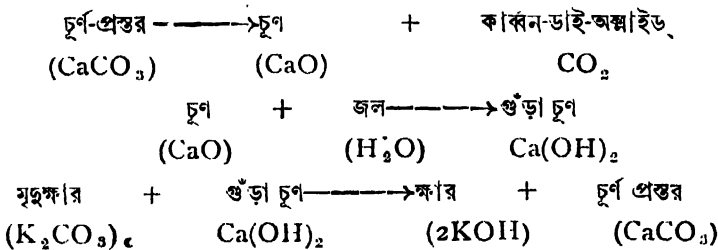
ক্ষারপ্রস্তুত করার এই প্রণালীটি কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে খৃঃ পূঃ ১৬ বা ১৭ শতাব্দীর

আগে বাহির হয় নাই। "সুশ্রুতে" এই যে প্রণালী দেওয়া আছে, ইহা এরূপ সুন্দর বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রানুযায়ী যে, ইহা যে-কোন রাসায়নিক পাঠ্য পুস্তকে অবিকল নকল করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "সুশ্রুতে" লেখা আছে ক্ষারপ্রস্তুত করিতে গেলে মিশ্রিত পদার্থকে লোহার পাত্রে ফুটান দরকার। "সুশ্রুতে" আরও বলা আছে যে, প্রস্তুত হইবার পর ক্ষারকে লোহার পাত্রে রাখা উচিত; এবং সেই লৌহপাত্রের মুখ বন্ধ থাকিবে।

"আয়াসে কুম্ভে সংবৃতমুখে নিদধ্যাৎ"

"সুশ্রুত" নিশ্চয়ই জানিতেন না যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভব বলিয়াই কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইডকে ক্ষারের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তৎকালীন চিকিৎসকগণ নিশ্চয়ই নিজেদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই সকল সতর্কতা অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ক্ষারের তীক্ষ্ণতা অনেক কমিয়া যাইবে। আজকালকার দিনেও আমরা ক্ষারকে লোহার অথবা রূপার পাত্রে রাখিয়া থাকি।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, "সুশ্রুতে" দুই রকম ক্ষার তৈয়ারী করিবার ও রাখিবার সুন্দর প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে; এবং শুধু তাই নয়, তাহাতে তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষার,—এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে। ডেভি যখন পোটেসিয়াম্ (Potassium) বিশ্লিষ্ট করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রাচীনকালে লোকেরা পোটেসিয়ম্ কার্ব্বনেড্ ও সোডিয়ম্ কার্ব্বনেড্—এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ জানিত না"। কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এই প্রভেদ খুব স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

"সুশ্রুতের" কাল হইতে যোসেফ্ ব্ল্যাকের সময়—এই দুইয়ের মধ্যে প্রায় বিংশ শতাব্দীর ব্যবধান। ব্ল্যাক্ এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "এম্-ডি" পাশ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম (১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে) মৃদুক্ষার ও তীক্ষ্ণক্ষার—এই দুইয়ের পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ কার্ব্বনেড্‌কে আগুনে খুব উত্তপ্ত করিলেন এবং পরীক্ষার প্রত্যেক অবস্থায় তুলাদণ্ড ব্যবহার করিয়া দেখাইলেন যে, উহার ওজন কিছু কমিয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখাইলেন যে, উত্তপ্ত অবস্থায় উহা হইতে একপ্রকার বায়ু নির্গত হয়—উহাকে তিনি "fixed air" অর্থাৎ "আবদ্ধ বায়ু" নাম দিলেন। র‍্যাম্‌সে ব্ল্যাকের জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "আগুনে চূর্ণ-প্রস্তর উত্তপ্ত করিলে চূণ তৈয়ারী হয়। চূণ এইরূপে তীক্ষ্ণক্ষারের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে।" বাস্তবিকই এই হিসাবে ব্ল্যাক্ বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন।

বার্থেলোই আমাকে হিন্দু রাসায়নিক তত্ত্বের ইতিহাস ("History of Hindu Chemistry") লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তিনি আমার পুস্তকখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এই অংশ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা সম্ভবতঃ পোর্টুগিজদের নিকট হইতে এই প্রণালী শিখিয়াছিল। কিন্তু আমি ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে, গৌড়াধিপতি ন্যায়পালের সভাচিকিৎসক চক্রপাণি তাঁহারই নিজ নামে লিখিত পুস্তকে ক্ষারপ্রস্তুত

করিবার এই প্রণালী অবিকল "সুশ্রুত" হইতে নকল করিয়া দিয়াছেন। আরও প্রাচীন কালের "ভাগবৎ" নামক পুস্তকে ঠিক এই প্রণালীটি অবিকল উদ্ধৃত আছে। আমি বৌদ্ধযুগের (১৪০ খৃঃ পূঃ) মিলিন্দ পঞ্হো নামক এক পুস্তকের একস্থানে পড়িয়াছিলাম এবং অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্‌স্ ইংরাজিতে তাহার অনুবাদও করিয়াছেন; উহার মর্ম্মার্থ এই,—"এবং যখন বেদনা কমিয়া যায় এবং ক্ষতস্থান নীরোগ হইয়া আসে, মনে কর যদি তখন চিকিৎসক ক্ষতস্থান অস্ত্র দিয়া কাটে এবং কস্‌টিক্ দিয়া পোড়াইয়া দেয়; এবং তাহার পর চিকিৎসক যদি ক্ষারের জল দিয়া উহা ধোয়াইবার ব্যবস্থা করে।······হে রাজন্, এখন বলুন যে চিকিৎসক কি নির্দ্দয়ভাবাপন্ন হইয়াই ক্ষতস্থানে অস্ত্র করিল এবং পরে কস্‌টিক্ দিয়া উহা পোড়াইয়া দিল?"

এ'কথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্ল্যাক্ একেবারে স্বাধীনভাবেই তাঁহার নিজের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং তিনিই দেখান যে, মৃদুক্ষার ও কস্‌টিক্ ক্ষারের মধ্যে তফাৎ এই যে—মৃদুক্ষারে কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইড্ আছে। "সুশ্রুতে" অবশ্য এ'সকল কথা কিছুই নাই।

ধাতব ঔষধের প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার বহু পুরাকাল হইতেই হিন্দুদিগের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে পার্‌সেল্‌সাস্‌ই সর্ব্বপ্রথম ধাতব ঔষধ প্রচলন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন কি চক্রপাণিরও এক শতাব্দী পূর্ব্বে মনীষীবৃন্দ কজ্জলীকে ঔষধরূপে ব্যবহার করিবার অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণিও কজ্জলী-প্রস্তুত করিবার প্রণালীর এক বিস্তৃত বিবরণী দিয়াছেন। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহই উহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন না।

আরবেরা ইউরোপে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল, তাহা তাহারা হিন্দুদিগের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। স্বনামধন্য ফরাসী রাসায়নিক পণ্ডিত ডুমার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—"এখন ইউরোপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ আসিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রগাঢ় বুদ্ধিবলে ও গ্রীসের তীক্ষ্ণ প্রতিভাগুণে ইউরোপ যেখানে উঠিয়াছিল, আজ আবার ইউরোপ সেই শীর্ষস্থানেই উঠিতেছে।"

কচুড়িপানা

শ্রীবিপিনবিহারী সেন

কচুড়িপানা কচুজাতীয় একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্। কচু দুই প্রকার—এক প্রকার স্থলে জন্মে, যেমন—মানকচু, ডাঙ্গাভুরা, মুখীকচু, গুড়িকচু প্রভৃতি; আর এক প্রকার স্থলে জন্মে, যেমন—পানিকচু, সোলাকচু, কালকচু প্রভৃতি। এই জলজ কচুও আবার দুই প্রকার—একপ্রকারের

মূল মাটির ভিতর প্রোথিত থাকে, যেমন—পানিকচু, কালকচু প্রভৃতি; আর একপ্রকার কচু জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, যেমন—সোলাকচু। কচুড়িও কচুর ন্যায় দ্বিবিধ—একপ্রকার স্থলে জন্মে, যাহাকে স্থল-কচুড়ি বলে (চিত্র—১); আর এক প্রকার জলে জন্মে, যাহাকে জল-কচুড়ি বলে। জলজ কচুর ন্যায় জলজ কচুড়িও দ্বিবিধ—একপ্রকারের মূল মাটিতে প্রোথিত থাকে (চিত্র—২ ও চিত্র—৩)। এই প্রকারের জলকচুড়ি বঙ্গদেশে বরাবর ছিল; ইহার বংশবৃদ্ধি তত অধিক নহে বলিয়া ইহা তেমন অনিষ্টকর নহে। আর একপ্রকার পূর্ব্বোক্ত সোলাকচুর ন্যায় জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় (চিত্র—৪); কচুড়িপানা এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা ভারতীয়

চিত্র—১

স্থল-কচুড়ি

ক—পাতা; খ—গোড়

উদ্ভিদ্ নহে; আমেরিকা হইতে অল্পদিন হইল এ'দেশে আনীত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহাকে 'লিল্যাক্ ডেভিল' (Lilac Devil) বলে। শ্বেতাভ নীলবর্ণ বিশিষ্ট ইহার সুগন্ধী ফুলগুলি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নারায়ণগঞ্জের মিসেস্ মর্গ্যান্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা উহা আমেরিকা হইতে এ'দেশে আনয়ন করেন বলিয়া এ'দেশে ইহার আর একটি নাম "মর্গ্যান ফ্লাওয়ার" বা মর্গ্যান পুষ্প।

কচুড়িপানার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত ভেনিজুয়েলা ও ব্রেজিল প্রদেশ। তথা হইতে ইহা আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে নীত হয়। যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত ফ্লোরিডা হইতে ইহা অষ্ট্রেলিয়ায় এবং তথা হইতে ক্রমশঃ সুমাত্রা, যাভা, শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয় সিংহল প্রভৃতি প্রদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহা আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে প্রথম প্রবেশলাভ করে। ঐ বৎসর লুসিয়ানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত মিশিশিপি

নদীর মোহনায় অবস্থিত নিউ-অর্লিয়ান্‌স নগরে যে কার্পাস-প্রদর্শনী (Cotton Centennial Exposition) হইয়াছিল, তাহাতে ইহা প্রথম প্রদর্শিত হয়। সমাগত দর্শকগণের মধ্যে অনেকে ইহার মনোমুগ্ধকর ফুলের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ইহার গাছ তাঁহাদের বাগান ও পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জন্য যত্নপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যান। যুক্ত-প্রদেশের আবহাওয়ায় ইহার বংশবৃদ্ধি এত দ্রুত হইতে লাগিল যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সৌখিন ধনিগণের উদ্যানমধ্যস্থ জলাশয়, পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা
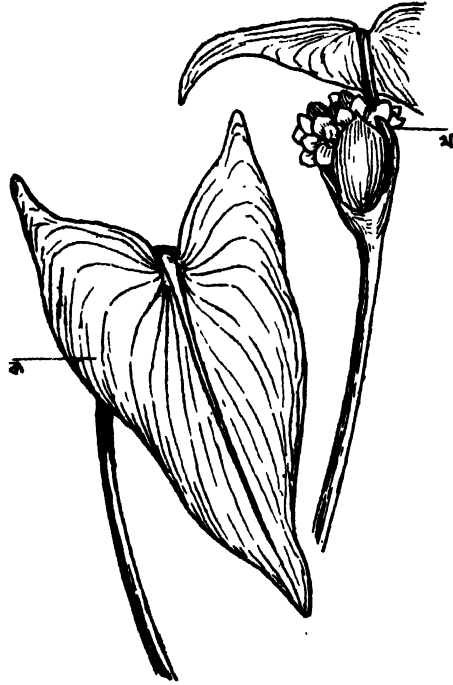
চিত্র—২

জল—কচুড়ি—যাহার মূল ভূমিতে প্রোথিত থাকে

ক—পাতা; খ—ফুল

অতিরিক্ত গাছগুলি তুলিয়া নিকটবর্ত্তী নদী-খাল প্রভৃতি জলপথগুলির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, এই সকল নদী-খাল প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হইয়া কচুড়িপানা সমগ্র যুক্ত-প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল; এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথাকার জলপথগুলি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইল যে, তাহার মধ্য দিয়া নৌকা চলাচল একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই জলপথ-বহুল লুসিয়ানিয়া প্রদেশটি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই প্রদেশের বণিক সম্প্রদায়—তাঁহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে দেখিয়া—

সকলে একযোগে একদল লোক নিযুক্ত করিয়া জলপথের কচুড়ি-পানাগুলি লৌহনির্ম্মিত আকর্ষী দ্বারা টানিয়া তুলিয়া উহা পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করতে লাগিলেন। আমেরিকায় যখন "লিল্যাক্ ডেভিলের" ধ্বংসের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়েই সে মনোমুগ্ধকর মর্গ্যান ফ্লাওয়ারের রূপধারণপূর্ব্বক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা সিংহলে প্রবেশ-লাভ করে।

কচুর ন্যায় কচুড়িরও শিকড় হইতে চারা জন্মে (চিত্র—৪)। কচুজাতীয় উদ্ভিদের
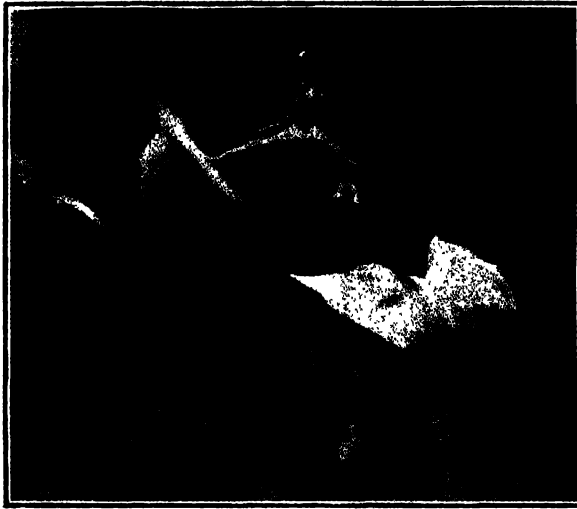
চিত্র—৩

জল—কচুড়ির গাছ

মোথা বা 'গেড়' হইতে যে অপেক্ষাকৃত মোটা একপ্রকার শিকড় বাহির হয়, তাহাকে "বই" বলে (চিত্র—৪, চ ও ছ)। এই বই-এর অগ্রভাগ হইতে পাতা বাহির হইয়া উহা পৃথক একটি নূতন গাছে পরিণত হয়। এক একটি কচুড়িগাছের মোথা হইতে বহু সংখ্যক "বই" এবং অসংখ্য চারা জন্মে। এইজন্য ইহার বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক এবং কোন জলাশয়ে একটি মাত্র গাছ বা একখানি বই বা শিকড় কোনওরূপে আসিয়া পড়িলে অল্প দিনের মধ্যেই উহা কচুড়িপানায় পূর্ণ হইয়া যায়। কচুড়িপানার বই-এর অগ্রভাগ হইতে পাতা বাহির হইয়া কিরূপে উহা নূতন গাছে পরিণত হয়, তাহা ৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল;—উহার চ চিহ্নিত লম্বা অংশ বই।

কচুড়িপানার ব্যবহার

কচুড়িপানার শ্বেতাভ নীলবর্ণ-বিশিষ্ট কোমল ফুলগুলি সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাওয়া যাইতে পারে। ফুলগুলি একবার মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া "তেলশাক" করিয়া অথবা উহা

চিত্র—৪

কচুড়িপানা

ক—ফুল ; খ—পাতা ; গ—গেড় বা মোগা ; ঘ—শিকড়

চ—পরিণত বই—যাহার মাথা হইতে পত্রোদ্গত হইয়া

নূতন গাছে পরিণত হইয়াছে ; ছ—অপরিণত

বই—যাহা হইতে পরে গাছ

হইতে পারিবে।

বেসমের গোলায় ডুবাইয়া লইয়া ভাজিয়া খাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে রন্ধন করিলে ইহাকে একটি সুখাদ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। উহার কচিপাতা ও ডাঁটাগুলি কচুশাক

কুটিবার ন্যায় উপরের ছাল ফেলিয়া কুটিয়া লইয়া একবার সিদ্ধ করিয়া সেই জলটা ফেলিয়া দিয়া ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়া যাইতে পারে। নারিকেল-কোরা, নারিকেলের দুধ, চিংড়ি বা ইলিশ মাছের মাথা বা কাঁটা প্রভৃতি ইহার যে কোন একটি দিয়া রাঁধিলে অতিশয় সুস্বাদু হয়। কচুড়ি ফুলের তেলশাক বা কচুড়ি শাকের ঘণ্ট খাইতে বেশ সুস্বাদু; একটু টান ঝাল হইলেই ভাল হয়। কচুড়ির ডাঁটা ও পাতা গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কচুড়ির ডাঁটা ও পাতাগুলি খড় কুটিবার ন্যায় কাটিয়া লইয়া তাহার সহিত সরিষার খইল জলে গুলিয়া উহা মাখিয়া খাইতে দিলে গাভীগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। পাঁচ ভাগ কচুড়িপানার সহিত এক ভাগ সরিষার খইল-গোলা মিশাইয়া লইলে উত্তম গাভী-খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে; ইহা খাইতে দিলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরা কচুড়িপানা দ্বারা গবাদি পশু প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কচুড়ির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সোডিয়াম্, পোটাসিয়াম্ ও নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকায় উহা হইতে জমির উত্তম সার প্রস্তুত হইতে পারে। কচুড়ি-গাছগুলি তুলিয়া উত্তমরূপে শুকাইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া পোড়াইয়া লইলে যে ছাই পাওয়া যাইবে, তাহা ধানের জমির—বিশেষতঃ বোরো ধানের জমির—পক্ষে অতি উত্তম সার। ধান্য-রোপনের জন্য জমি কাদা করিবার সময় উহা মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। আর এক রকমে কচুড়ির সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কচুড়িগুলি জল হইতে তুলিয়া দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া একটি স্থানে গাদা করিয়া রাখিলে কিছুদিন পরে পচা গোবরের ন্যায় এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়। দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিলে পচা কচুড়ির যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা আরও ভাল। নারিকেল, সুপারী, পেঁপে, পাট, শণ, লাউ-কুমড়া, শশা, পুঁই প্রভৃতির পক্ষে পচা কচুড়ির সার গোবরের সার অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। লালমাটি-বিশিষ্ট স্থানে পাট কিম্বা কার্পাসের চাষ করিতে হইলে পচা কচুড়ির সারে ফলন আশাতিরিক্ত পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। ঢাকা কৃষি-বিভাগের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, গোবরের সার ব্যাবহার করিয়া পাটের ফলন প্রতি একর চর জমিতে ২৭।৫ হইয়াছিল; কিন্তু ঐ জমিতে পচা কচুড়ির সার ব্যবহারে প্রতি একরে ফলন ৩৩।৫ হইয়াছিল-প্রবন্ধ লেখকের নিজের পরীক্ষাতে পচা কচুড়ির সারে নারিকেল ও সুপারীর ফলন দেড় গুণের কম হয় নাই। লাউ-কুমড়ার ফলন আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাবনায় ভূতপূর্ব্ব জেলা জজ পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের বরিশালস্থ বাসভবনের একটি নারিকেল গাছ মরণাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইলে লেখক উহা তাঁহার নিকট হইতে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে দুই তিন বৎসর উহাতে আদৌ কোন ফল হয় নাই। পত্রগুলির আকৃতি যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র এবং হ্রস্ব, গাছের মাথাটি সরু হইয়া গিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক গাড়ী কচুড়িপানা দুই তিন দিন

রৌদ্রে রাখিয়া অর্দ্ধ শুষ্ক হইলে উহা দ্বারা গাছের গোড়াটি আংশিক ভাবে ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপর অল্প মাটি চাপা দিয়া রাখা হয়। ভাদ্র মাস হইতে বড় বড় নূতন পাতা বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং গাছের মাথাটি ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে। পরবর্ত্তী ফাল্গুন মাসে ৫।৬টি কাঁদিতে প্রায় ৩০।৪০টি সুপুষ্ট নারিকেল পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম অপেক্ষা শেষের দিকে যে কাঁদিগুলি বাহির হইয়াছিল, সেগুলির নারিকেল অধিকতর সুপুষ্ট ছিল। সুপারীর চারার গোড়ায় কচুড়িপানার পচা সার এইরূপে প্রয়োগ করিলে গাছের কান্তি ও পুষ্টি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; এবং ফলন্ত গাছে দিলে আশাতীত পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেড় হাত ব্যাস ও দেড় হাত গভীরতা বিশিষ্ট গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহা অর্দ্ধ শুষ্ক কচুড়িপানা দ্বারা পূর্ণ করতঃ তাহার উপর কিছু মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া উহার প্রত্যেক গর্ত্তের উপর ভাদ্র মাসে লাউ-কুমড়া বা পেঁপের দুইটি করিয়া বীজ পুতিয়া দিলে তাহা হইতে যে গাছ জন্মিবে, তাহার সৌন্দর্য্য ও ফলনে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে। দুইটি গাছই যদি সতেজ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহার একটি গাছ তুলিয়া লইলে ভাল হয়।

কচুড়িপানার ধ্বংসের উপায়

কচুড়িপানার অপকারিতার পরিমাণ বড় কম নহে। যে নদী, খাল, বিল বা জলাশয়ে কচুড়িপানা একবার প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। অল্প দিনের মধ্যেই জলপথগুলি নৌকাচলাচলেরও মৎস্য-বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর জলাশয়গুলির জল ঘোর ধূসরবর্ণ বিশিষ্ট মশককুলের প্রশস্ত প্রজননক্ষেত্র স্বরূপ একপ্রকার তরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহার ফলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি অস্বাস্থ্যকর এবং ধান-পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রসকল আবাদের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সেচের প্রণালীগুলি বদ্ধ হইয়া যাওয়ায় জলনিকাসে বাধা পড়ে ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সময় সময় এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, বায়ু-তাড়িত কচুড়ির ধাপের চাপে টেলিগ্রাফের লোহার খুঁটিগুলি উপড়াইয়া পড়িয়া যাওয়ায় লাইন-বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং সহজে উহার উদ্ধারসাধন না হওয়ায় সাময়িকভাবে অস্থায়ী খুঁটা পুতিয়া কার্য্য চালাইয়া লইতে হইয়াছে। এই সকল বায়ু-তাড়িত কচুড়ির ধাপের দ্বারা সময় সময় বিল-অঞ্চলের বহু বিস্তীর্ণ ধান্য-ক্ষেত্রের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়। পয়োপ্রণালীগুলি রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় দেশের জলনির্গমেরও (drainage) যৎপরোনাস্তি ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণে কচুড়িপানার ধ্বংসসাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকায় যেরূপ লুসিয়ানিয়া প্রদেশের অন্তর্গত নিউ-অর্লিয়ান্স্ নগরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, বঙ্গদেশেও সেইরূপ ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

প্রথমে কচুড়িপানার আবাদ যে লুসিয়ানিয়া প্রদেশে আরম্ভ হইয়াছিল, উহার ধ্বংসের চেষ্টাও সেই লুসিয়ানিয়া প্রদেশে প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে। জলপথগুলি লুসিয়ানিয়া প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যপথ; এই পথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে তথাকার বাণিজ্যের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। Bayon Plaquamine নামক প্রণালীর পার্শ্ববর্ত্তী করাত কলের স্বত্বাধিকারিগণ প্রথমে একদল লোক নিযুক্ত করিয়া কচুড়িপানার ধাপগুলি লৌহনির্ম্মিত আকর্ষী দ্বারা টানিয়া তুলিয়া জলপথগুলি পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় কচুড়িপানাগুলি এইরূপে তুলিয়া ফেলার পর দেখা গেল, অন্য স্থান হইতে কচুড়ির ধাপ ভাসিয়া আসিয়া পূর্ব্ব পরিষ্কৃত স্থান অধিকার করিতেছে। এইরূপে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেখা গেল, এতদপেক্ষা বিস্তৃতভাবে কার্য্য করা আবশ্যক। এইজন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফিডারেল গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। উক্ত গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এইজন্য ২৫০০০ ডলার ব্যয় মঞ্জুর করেন। একখানি ষ্টীম-বোট ক্রয় করিয়া তাহার সম্মুখ ভাগে চারি ফিট প্রশস্ত একখণ্ড ভেসালজালের ন্যায় যন্ত্র (Conveyor) সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ষ্টীমবোট অগ্রসর হইবার সময় কচুড়ির ধাপগুলি যন্ত্রসংযোগে কাটিয়া তুলিয়া কতকগুলি বাষ্প চালিত রোলারের মধ্যে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করতঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই কার্য্য বহুব্যয়সাপেক্ষ এবং উহা এত ধীরভাবে চলিতে লাগিল যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ কচুড়িপানা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিতে লাগিল। এইজন্য অল্পদিনের মধ্যেই এই উপায় পরিত্যক্ত হইল।

এইস্থানে কচুড়িপানা-ধ্বংশের প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কচুড়িপানা-ধ্বংসের প্রণালীগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। হাতে হাতিয়ারে বা যন্ত্র সাহায্যে তুলিয়া ফেলা (Mechanical);

২। রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে গাছগুলি মারিয়া ফেলা (Chemical) ;

৩। তাপপ্রয়োগে গাছগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া (Thermal);

৪। ইহার মধ্যে ছত্রক জাতীয় পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিজ্জাণু বা উদ্ভিদ্‌-রোগবীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া (ইহাকে ইংরাজীতে Physiological method বলা যাইতে পারে)।

১। মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক উপায়—ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীয় উপায়গুলিই সহজসাধ্য ও লাভজনক। আমেরিকার লুসিয়ানিয়া প্রদেশে প্রথমে এই উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও আবার আকর্ষী দ্বারা কচুড়িগুলি উপরে টানিয়া তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পরে পচাইয়া অথবা পোড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করা সহজ, সর্ব্বজনসাধ্য ও লাভজনক। অল্পপরিসরবিশিষ্ট জলাশয়ের পক্ষে এই উপায়টি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। একবার তুলিয়া ফেলিলে চলিবে না; কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া পানা তুলিতে হইবে। তিন চারি মাস এরূপ করিলে

জলাশয়গুলি পরিষ্কৃত হইবে। পরে একটু নজর রাখিয়া দুই একটি গাছ [illegible] মাত্র তুলিয়া ফেলিয়া দিলে আর কোন উপদ্রব থাকিবে না। স্কুলের ছাত্রগণ যদি দল বাঁধিয়া গ্রামস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির কচুড়িপানা-ধ্বংসের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামকে এই রক্তবীজের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। নদী-খাল-বিল প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলাশয়গুলির জন্য দেশবাসীগণের সমবেত ভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক। বঙ্গদেশের সমস্ত জেলাবোর্ডগুলি যদি একই সময়ে একযোগে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এখনও পর্য্যন্ত এই রক্তবীজের কবল হইতে দেশকে উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। এ'জন্য তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বড় বড় নৌচলাচলের উপযোগী (navigable) নদীগুলি যখন গভর্ণমেণ্টের খাসের সম্পত্তি, তখন সেগুলির ভার গভর্ণমেণ্টের পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের হাতে যাওয়া সঙ্গত। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস। এই সময় এই সকল উদ্ভিদের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। বর্ষা এবং শরৎকালে ইহাদের জীবনীশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়; এইজন্য বর্ষাকালে কার্য্য আরম্ভ করা সুবিধাজনক নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মুর নদী-খাল প্রভৃতির কচুড়িপানা তুলিবার জন্য 'Water hyacinth lifter' নামক এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার দ্বারা স্রোতোজলের কচুড়িপানা তুলিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই যন্ত্র ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহা দ্বারা কচুড়িগাছগুলি জল হইতে উত্তোলিত হইয়া তীরে নিক্ষিপ্ত হয়; এবং পরে রৌদ্রে শুকাইয়া মরিয়া যায়। ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের বিল-অঞ্চলে বর্ত্তমানে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে।

২। কেমিক্যাল বা রাসায়নিক উপায়—আমেরিকার অন্তর্গত লুসিয়ানিয়া প্রদেশে নাইট্রিক্, সালফিউরিক্, হাইড্রোক্লোরিক্ প্রভৃতি এ্যাসিড্ স্প্রে বা নিক্ষেপ করিয়া কচুড়িপানা ধ্বংসের চেষ্টা কিছুকাল চলিয়াছিল। ইহাতে এই এসিডগুলি গাঢ় বা অবিমিশ্র অবস্থায় ব্যবহার করার আবশ্যক বলিয়া ইহার ব্যয় অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এই উপায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক প্রকার বিষাক্ত পেটেণ্ট স্প্রে ব্যবহার করিয়া বেশ ফল পাওয়া গিয়াছিল। ইহার এক গ্যালনে, দ্বাদশ বর্গগজ পরিমিত স্থানের কচুড়ির ধাপ নষ্ট করা যাইতে পারিত; উহার দাম পড়িত তিন সেণ্ট বা পাঁচ পয়সারও কিছু কম। তৎপরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগ, কচুড়িপানা-ধ্বংসের জন্য সোডা ও আর্সেনিক্ মিশাইয়া একপ্রকার তরল পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন; ইহা প্রস্তুত করিবার খরচ প্রতি গ্যালনে অর্দ্ধ সেণ্ট মাত্র। এই তরল বিষাক্ত পদার্থপূর্ণ 'স্প্রেয়িং ট্যাঙ্ক, পাম্প' বা দমকল, এবং বোমা (hose) প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত ষ্টীমবোট-সমূহ কচুড়িপূর্ণ স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল; ইহার প্রয়োগে গাছগুলি তিন চারি দিনের মধ্যে আমুরিয়া মরিয়া যায়। এই ব্যবস্থায় কিছু ফল হওয়ায় কোন কোন স্থানে উহা এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। ফ্লোরিডা

ও [illegible] প্রদেশে—বিশেষতঃ পানামা খালে—এই আর্সেনিক স্প্রে দ্বারা কচুড়িপানা-ধ্বংসের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু এখন পর্য্যন্তও আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় নাই। এই ব্যবস্থার মধ্যেও যথেষ্ট ক্রটি আছে। এই শতমুখী কচুড়ি-রাক্ষসীর প্রাণ তাহার ডাঁটা-পাতায় নহে—শতমুখ শিকড়ের মধ্যে লুকান আছে। এইজন্য গাছের গায়ে বিষ-প্রয়োগ করিয়া গাছগুলিকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার বংশ ধ্বংস করা অসম্ভব। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, এই বিষ-প্রয়োগের পর অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টি হইয়া গাছগুলি ধুইয়া গেলে আদৌ কোন ফল হয় না। তৃতীয় অসুবিধা এই যে, গাছগুলিতে বিষ-প্রয়োগের পর, কোন গবাদি পশু উহা ভক্ষণ করিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই সকল কারণে এ'দেশে উহার ব্যবহারের চেষ্টা না করাই ভাল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি এ'দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার আর্সেনিক স্প্রে দ্বারা কচুড়িপানা-ধ্বংসের প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞকে পানামায় প্রেরণ করেন। ইহার পর মিঃ গ্রিফিথ্‌স (T. S. Grifiths) নামক একজন দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী বিশেষজ্ঞের আবিষ্কৃত এক প্রকার বিষাক্ত স্প্রে তাঁহাদিগের নজরে পড়ে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট আবিষ্কর্ত্তাকে ২২৫০০৲ সাড়ে বাইশ হাজার টাকা রয়্যাল্‌টি দিয়া উক্ত স্প্রে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, কচুড়ি-বনে ইহা প্রয়োগ করিলে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০টি গাছ মারা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা কচুড়িপানার সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না; কারণ যে-গাছগুলি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বংশবৃদ্ধির ফলে সেই স্থান অল্পদিনের মধ্যেই আবার কচুড়িপানায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এ'রূপ অবস্থায়ও গভর্ণমেণ্ট ৯০,০০০ নব্বুই হাজার টাকা দিয়া গ্রিফিথ্‌স সাহেবের সর্ব্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় প্রচলিত আর্সেনিক স্প্রে ব্যবহারের কল্পনাও সরকারি কৃষিবিভাগের ছিল। আমেরিকার সরকার যে ভুল করিয়াছিলেন, এ'দেশেও গভর্ণমেণ্ট সেই ভুল করিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, কচুড়িপানার গাছ ও পাতা মাড়িয়া তাহার বংশ ধ্বংস করা যাইতে পারে না; কারণ উহার বংশবৃদ্ধির মূল তাহার শিকড়—গাছ বা পাতা নহে। ইহার এক টুক্‌রা বই বা শিকড়-বিশেষ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ১০,০০০ দশ হাজার বর্গ গজ ব্যাপী এক কচুড়ি-বন হইতে পারে।

উহাকে শিকড়সহ সমূলে ধ্বংস করিতে না পারিলে উহার বংশনাশ করিবার আর কোন উপায় নাই। যাহা হউক, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কচুড়িপানার ডাঁটা-পাতা নষ্ট করিয়া তাহার বংশ ধ্বংশ করা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করায় সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট এ'পথে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

৩। তাপ-প্রয়োগ (Thermal)—১৯২১ খৃষ্টাব্দে লুসিয়ানিয়া প্রদেশের Bayou Lafourche নামক একটি প্রধান জলপথের মধ্যে টেক্‌সাস্ অয়েল কোম্পানীর (Texas Oil Company) কয়েকখানি তেল ধোঝাই বোট কচুড়ির ধাপে

আটকাইয়া পড়ে। তখন উক্ত কোম্পানী বিষাক্ত স্প্রে-যন্ত্র (poison spray apparatus)-যুক্ত বোটসহ 'হায়সিন্থ' (S. S. Hyacinth) নামক তাঁহাদের একখানি বৃহৎ জাহাজ উহাদের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করেন। উক্ত তৈলবাহী বোটগুলির উদ্ধারের চেষ্টায় 'হায়সিন্থ' জাহাজের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার শিকলগুলি একটির পর একটি করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। এই সময়ের একদিন টেক্সাস্ অয়েল কোম্পানীর বেণ্টলি সাহেব (G. D. Bentley) মিশিশিপিতীরস্থ বেটন রুজ (Baton Rouge) নগরে আসিয়া লুসিয়ানিয়া প্রদেশের গভর্ণর পার্কার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া কচুড়িপানা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে মিঃ পার্কার বলিলেন, "আপনারা জাহাজ হইতে কচুড়িপানার উপর অত্যুষ্ণ (Superheated) বাষ্পের মোটা ধারা জোরে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছেন না কেন?" এই আলোচনার পর উক্ত কোম্পানী কচুড়ির ধাপের উপর ঐ প্রকারে অত্যুষ্ণ বাষ্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহাতে আশাতীত ফল হইল; কার্য্য দেখিয়া ঐ স্প্রে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। বাষ্পনিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই কচুড়ির গাছগুলি সিদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইতে লাগিল। জাহাজখানি উভয় পার্শ্ব হইতে অত্যুষ্ণ বাষ্পনিক্ষেপ করিতে করিতে তেলের বোটগুলি লইয়া ঘণ্টায় দেড় মাইল বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এ'রূপে অগ্রসর হইতে হইতে নয় মাইল দীর্ঘ অত্যধিক পুরু নিরেট একটি কচুড়ির ধাপ সম্মুখে পড়িল। পূর্ব্ব সাফল্যের উৎসাহে উসাহিত হইয়া এ'টিকেও তাঁহারা বড় একটি বাষ্পনিক্ষেপক (Steam thrower) সাহায্যে অত্যুষ্ণ বাষ্প নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিতে সমর্থ হইলেন। এই উপায়ে কৃতকার্য্য হইবার পর হইতে লুসিয়ানিয়া প্রদেশে অত্যুষ্ণ (superheated) বাষ্প সাহায্যে কচুড়িপানা ধ্বংস করিবার উপযোগী যন্ত্রাদি আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল। সম্প্রতি কচুড়িপানার গেড়-শিকড়ের সহিত ডাঁটা-পাতা-গাছ প্রভৃতি উহার ধাপসমেত সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নলের মুখ (nozzle) হইতে উষ্ণ জলের সহিত অত্যুষ্ণ বাষ্প প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া কচুড়িগাছের সহিত তাহার গেড় বা মোথা (bulbs) শিকড় প্রভৃতি যা'কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, সে সমুদয়ই সিদ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিয়া দেয়। নদী-খাল-বিল প্রভৃতি বিস্তৃত জলাশয়ের কচুড়ি ধ্বংস করিবার পক্ষে এই উপায়টিকে বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলা যাইতে পারে। বিষাক্ত ঔষধ ছিটান বা spray method অপেক্ষা ইহাতে ব্যয়ও অনেক কম, ধ্বংশকার্য্যও দ্রুত অগ্রসর হয়; জলবৃষ্টিতে ধুইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিম্বা ইহা হইতে গো-মহিষাদি জীবেরও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এই পদ্ধতিটি এ'দেশের পক্ষে গ্রিফিথ্স্ সাহেবের স্প্রে বা আমেরিকার আর্সেনিক স্প্রে অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

৪। উদ্ভিজ্জাণু উদ্ভিদ-রোগবীজজাণু প্রয়োগ (Physiological method)

নিউ অর্লিয়ান্স্ নগরের সিটি-ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জন্ ক্লোরার (John Klorer)—যাঁহার উপর পাঁচ বৎসর কাল লুসিয়ানিয়া প্রদেশের কচুড়িপানা ধ্বংসকার্য্যের ভার ছিল—তিনি তাঁহার প্রদত্ত লুসিয়ানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটির একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"On account of the immense area infected it is impossible to exterminate each and every plant by mechanical means or the poisoning method now in vogue. We must look to plantpathology for a complete riddance. The investigating Botanist may possibly find some natural enemy to the plant, some parasitic fungus, that could be cultivated and spread among the hyacinths and which would not be a menace to our agricultural interest."

সমস্ত দেশগুলি কচুড়িপানা দ্বারা এরূপ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে, হস্ত দ্বারা, যন্ত্র সাহায্যে অথবা বিষ-প্রয়োগে প্রত্যেক গাছটি মারিয়া ফেলিয়া উহা নির্ম্মূল করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইহার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্ভিদ্-নিদানের বা উদ্ভিজ্জব্যাধি-বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। অনুসন্ধানকারী উদ্ভিদ্-বৈজ্ঞানিক যদি এমন কোন পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদাণু (fungus) বা উদ্ভিদের ব্যাধিবীজাণু অথবা কচুড়িপানার স্বভাবশত্রু আবিষ্কার করিতে পারেন,—যাহা কেবল কচুড়িপানারই ধ্বংসসাধন করিবে কিন্তু অন্য কোন কৃষিজাত পদার্থের পক্ষে কোন প্রকার হানির কারণ হইবে না, তাহা হইলে উহা কচুড়িবনে ছাড়িয়া দিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। বস্তুতঃ, কচুড়িপানার আদি জন্মভূমি ভেনিজুয়েলা প্রদেশেই ইহার এইরূপ এক প্রকার স্বভাবশত্রু বিদ্যমান থাকায়, তথায় উহা উপদ্রবে (pest) পরিণত হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং পারিতেছেও না। কিন্তু ক্লোরার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কচুড়িপানার এই স্বভাবশত্রু বঙ্গদেশের ধান্য-পাট প্রভৃতি ফসলের স্বভাবশত্রু হইয়া দাঁড়াইবে কি না ?

কচুড়িপানা-ধ্বংসের চতুর্ব্বিধ প্রণালীর আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে এ'দেশের পক্ষে স্থলভেদে প্রথম ও তৃতীয় প্রণালীই সমধিক বাঞ্ছনীয়।

কালিদাসের বৃক্ষলতা

দ্বিতীয় পর্য্যায়

শ্রীগণপতি সরকার

ইতিপূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের নাটক বর্ণিত বৃক্ষলতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই সময় স্বীকার করিয়াছিলাম যে, কাব্যধৃত বৃক্ষাদির আলোচনা করিব। আমার সেই কথা রাখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র আয়োজন। এই সঙ্গে বলিয়া রাখি যে, পূর্ব্বের বৃক্ষলতার আলোচনা হইতে যে ভুলভ্রান্তি আমার হিতৈষী বন্ধুগণ ধরাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এই সময় তাহার সংশোধন করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবির কাব্য হইতেছে—ঋতুসংহার, কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত। মহাকবির নাটকে পঁয়ত্রিশটি বৃক্ষাদির উল্লেখ পাইয়াছি। এখন কাব্যে বহু বৃক্ষাদির নাম পাইতেছি। এই নামের মধ্যে ভেদ বাদ দেওয়া হইয়াছে; যেমন—আম্র, সহকার; পুণ্ডরীক, ইন্দীবর, কোকনদ, কুবলয়। নাটকে উল্লিখিত পঁয়ত্রিশটির মধ্যে অর্ক, তিন্তিড়ী, নিচুল, পিণ্ডখর্জ্জুর, রাজজম্বু এবং বীজপূরক—এই ছয়টি ব্যতীত বাকি সকলগুলিই কাব্যের মধ্যে পাইতেছি। ঐ বাকি উনত্রিশটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে ঐগুলি লইয়া আর বিশেষ আলোচনা করিব না। আবশ্যকমত উহাদের আলোচনা করিব এবং যে কয়েকটি সম্বন্ধে ভুল ও ভ্রান্তি দেখা গিয়াছে, সেগুলিরও উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বোক্ত পঁয়ত্রিশটির মধ্যে "মাধবী লতার" আলোচনায় "অতিমুক্তলতার" উল্লেখ করিয়াছি। ঐ দুইটি এক বলিয়াছি। অতিমুক্তলতার উল্লেখ "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকে আছে। অমরসিংহ অতিমুক্তলতা ও মাধবীলতাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করায়, আমি ঐ দু'টিকে এক লতা ধরিয়াছিলাম। মল্লিনাথও "মাধবী" ও "অতিমুক্তলতা"কে একই লতা বলিয়াছেন—"মধৌ বসন্তে ভবা মাধব্যঃ তাসাং মণ্ডপঃ তস্য অতিমুক্তলতাগৃহস্য"—উত্তর মেঘদূত শ্লোক ১৫। কিন্তু পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ দুইটি পৃথক পৃথক লতা। অতিমুক্ত-লতার বিশেষত্ব হইতেছে যে, ঐ লতা মাধবীর মত খুব বড় হয়; ফুলও প্রচুর হয় বটে, কিন্তু ভোর হইতে না হইতেই সব ফুলগুলি ঝরিয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে ইহা জানিয়াছেন ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মাধবী ও অতিমুক্ত পৃথক পৃথক লতা হওয়ায় নাটকের বৃক্ষাদির সংখ্যা পঁয়ত্রিশ স্থানে ছত্রিশ হইবে। এখন কাব্যের বৃক্ষলতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। অরবিন্দ :—

পদ্মের সাধারণ নাম। পূর্ব্ব প্রবন্ধে "পদ্ম" দ্রষ্টব্য।

পুণ্ডরীক = শ্বেতপদ্ম

কোকনদ = রক্তপদ্ম

ইন্দীবর = নীলপদ্ম। সময় সময় নীল সালুককেও ইন্দীবর বলে।

কুবলয় = উৎপল = ছোট পদ্ম। 'কুবলয়' শব্দে কোথাও নীল পদ্মকেও বলা হইয়াছে; যেমন—"কুবলয়দলনীলৈ রুন্নতৈ স্তোয়নম্রৈঃ"—(ঋতু ২।২২)।

কালিদাস বলিতেছেন যে, শরৎকালে শ্বেতপদ্ম প্রচুর ফোটে; যথা—

"পার্থিব শ্রীর্দ্বিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণা" (রঘু ৪।১৪)

"সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা" (রঘু ১০।৬৯)

"চারু কমলাবৃতভূমিভাগাঃ" "উৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধুন্বন্"

"অম্ভোরুহৈর্বিকসিতৈ র্মুখচন্দ্রকান্তিঃ"

"স্বচ্ছপ্রফুল্ল কমলোৎপলভূষিতানি" (ঋতু)।

নীলপদ্মও ফোটে :—

"নীলোৎপলৈ র্মদকলানি বিলোকিতানি"

"বিকচ কমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী" (ঋতু)

উৎপলও ফোটে :—

"স্বচ্ছপ্রফুল্ল কমলোৎপলভূষিতানি" (ঋতু)

ইহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, পদ্ম ও উৎপল পৃথক; তা' না হইলে এক সঙ্গে "কমল" ও "উৎপল"—এই দুই মহাকবি উল্লেখ করিতেন না।

হেমন্ত ও শীতকালে পদ্মের অবস্থা :—

শ্বেতপদ্ম শীতে আর ফোটে না, ঝরে যায়। মহাকবি তাই বলিয়াছেন :—

"জাতং মন্যে শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপম্" (২।২০ রঘু)

"সতদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্ট-কিঞ্জল্কমিব পঙ্কজম্" (১৫।৫২ রঘু)

"মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্" (১৬।৭ রঘু)

"বিনীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্" (ঋতু)

ইহা হইতে বোধ হয় যে, হেমন্তকাল আসিলেই পদ্ম ঝরিতে থাকে; আর পুরা শীতে একেবারেই থাকে না।

হেমন্তে "নীলপদ্মের" অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ, বেশ ফোটে—

প্রফুল্লনীলোৎপল শোভিতানি সোন্মাদকাদম্ব বিভূষিতানি।

প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরান্তি পুংসাম্॥ ৯ ঋতু॥

প্রস্ফুটিত নীলোৎপলে শোভিত সুন্দর,
মত্ত কলহংসগণে শোভে মনোহর ;
সুশীতল সুনির্ম্মল সরোবর জল,
হরিছে মানবমন মরি এ সকল।

বসন্তকালে পদ্ম ফোটে—

"দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণু:" (৩।৩৭ কুমার)
"অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাং কমলিনী মলিনীরপতত্রিণঃ" (৯।২৭ রঘু)
"বিকচ তামরসা গৃহদীর্ঘিকাঃ" (৯।৩৭ রঘু)
"দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মম্" (ঋতু)

ইহা হইতে বোধ হয় 'পদ্ম' বসন্তে ফুটিতে আরম্ভ করে।

গ্রীষ্মকালে পদ্ম বোধ হয় বেশী ফোটে না, অথবা ফোটা কম হইয়া যায়। পদ্ম সম্বন্ধে ঋতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় "কমলবন চিতাম্বুঃ"—এইটুকু পাওয়া যায়। অন্য কাব্যে আর কিছু পাওয়া যায় না।

বর্ষাকালে পদ্মের বর্ণনায় ঋতুসংহারে মহাকবি বলিয়াছেন—

"বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা, বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারি নিস্বনাঃ।
পতন্তি মূঢ়াঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং, কলাপচক্রেষু নবোৎপলাশয়া॥ ২।১৪।
শ্রবণমোহন আহা মধুর গুঞ্জনে
হীনপত্র কমলিনী ত্যজি অলিগণে
ঔৎসুক্যেতে, মূঢ়, নবনলিনী ভাবিয়া
নৃত্যশীল শিখিপুচ্ছে পড়িছে আসিয়া।

সুতরাং ইহা হইতে পাওয়া গেল যে, বর্ষায় পদ্মের পাতা খসিয়া যায়। কিন্তু মেঘদূত তো বর্ষা লইয়াই আরম্ভ ; সেখানে তো ফোটা পদ্মের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন—

"দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যুষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানি মঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥ ৩১॥
"তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোঃ ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্তয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ॥ ৩৯।

উৎপলও ফোটে, যেমন—

"গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ॥ ২৬ ॥ (মেঘ)

"ধূতোদ্যানং কুবলয়রজো গন্ধিভির্গন্ধবত্যা-

স্তোয়ক্রীড়ানিরত যুবতিস্নান-তিক্তৈ র্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৩। (মেঘ)

মহাকবি ঋতুসংহারে "বিপত্রপুষ্পাং নলিনীং"—পাতাশূন্য পদ্ম—বলিয়া পুনর্ব্বার মেঘদূতে কি করিয়া ফুটন্ত পদ্মের কথা বলিলেন। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার প্রথমমুখে পদ্ম বিপত্র হয়; বৃষ্টি পড়ার পর ক্রমশঃ পত্র জন্মিতে থাকে, পদ্মও ফুটিতে থাকে। তারপর শরতেই পূর্ণ বিকাশ। অবশেষে শীতে আবার ঝরিতে থাকে। পুনর্ব্বার বসন্তে আবার ফুটিতে আরম্ভ করে।

মৃণাল এবং বিষ—ইহারা একার্থবাচক। ইহা পদ্মের গাছের মাটির মধ্যের অংশ। পদ্মের তো আর গাছের মত কিছু হয় না,—হয় নাল। নলিন অর্থে পদ্ম। নলিনী অর্থে পদ্মিনী, পদ্মময় স্থান এবং পদ্মের ঝাড়—বুঝায়।

২। অর্জ্জুন :—

আপিঞ্জরা বদ্ধরজঃকণত্বাৎ, মঞ্জর্য্যুদারা শুশুভেহর্জ্জুনস্য।

দগ্ধাপিদেহং গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্য ॥১৬।৫১ ॥ রঘু ॥

অংশলম্বি কুটজার্জ্জুনস্রজঃ, তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।

প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষভূৎ, কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ১৯।৩৭ ॥ রঘু ॥

কদম্ব সর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনম্ ॥ ২।১৭-ঋতু ॥

কর্ণান্তরেষু ককুভ-দ্রুম-মঞ্জরীভিঃ ॥ ২।২০ ঋতু ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ

কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।

শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ

প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ মেঘ ১।২২ ॥

ভাষানাম :—সং—নদীসর্জ্জো বীরতরুরিন্দ্রদ্রুঃ ককুভোর্জ্জুনঃ—অমর। বাঃ=অর্জ্জুন, অর্জ্জুনগাব। হিঃ—কোহ, কৌহ। মঃ=সারঢোল। গুঃ—কড়ায়ো। তৈঃ—মট্টিচেট্টু। কঃ=তোরেমত্তি। আঃ—ওর্জ্জুন। উঃ=হঞ্জল। সিংহলী=কুম্বুক্। বোটানিক্= Terminalia Arjuna, Pentaptera Arjuna.

অর্জ্জুনের ছাল হৃদরোগ (Heart disease)-এর ভাল ঔষধ। ঔষধার্থে ছাল ও পত্র ব্যবহার হয়। ইহা নানাবিধ ব্যাধিতে লাগে।

"অর্জ্জুন গাছ ৩০।৩২ হাত উচ্চ হয়; কাণ্ড অতি স্থূল। বাংলার বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর জন্মে—ইহা আরণ্যবৃক্ষ। পাতার আকার মানুষের জিহ্বার মত। পাতার পিঠে বোঁটার

নিকটে দু'টি অর্বুদাকৃতি গ্রন্থি এমন ভাবে থাক যে, পাতার উপর দিকে দেখিয়া উহারা যে আছে, এরূপ বোধ হয় না। পাতার প্রান্ত অতি সামান্য খাঁজ-কাটা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ফুল হয়। ফুল খুব ছোট—হরিদাভ শ্বেতবর্ণ; পুষ্পদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত। কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম কেশরগুলি উচ্চ হইয়া থাকে। ফল অগ্রহায়ণ-পৌষে পাকে। ফল দেখিতে কামরাঙ্গার মত শির-উঠা, কিন্তু তাহা অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি এবং তাদৃশ মাংসল নয়।" (বনৌষধিদর্পণ)।

কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন—বর্ষাকালে ইহার ফুল ফোটে; ফুলে সুগন্ধ আছে। ইহার মঞ্জরীগুলি দীর্ঘ হয় এবং পরাগে পূর্ণ থাকে; তখন পিঞ্জরাবর্ণ—পিঙ্গল বা পীতবর্ণ হয়।

৩। অশোক :—পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ঋতুসংহারে ইহার বর্ণনা এইরূপ :—

আমূলতো বিদ্রুমরাগাতাম্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥

মূল হ'তে সুশোভন রক্তবর্ণ পুষ্পগণ
পল্লব সহিত ওই অশোক কি শোভিছে,
হেরি তারে মনোহারী যতেক যুবতী নারী
সশোক আকুল হৃদি মন ক্ষোভে মরিছে।

কুমারে অকাল বসন্তের আবির্ভাব উপলক্ষে ইহার বর্ণনা একইরূপ,—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাসিঞ্জিত নূপুরেণ॥ ৩।২৬॥
অশোক নির্ভৎসিতপদ্মরাগং...বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ ৩।৫৩॥

ইহা হইতে জানা গেল যে, বসন্তকালে অশোকের ফুল হয়; আর ঐ ফুল মূল হইতে ফোটে। কবি-প্রসিদ্ধি আছে যে, সুন্দরী সালঙ্কারা রমণী বাম পদাঘাত না করিলে অশোকের ফুল ফোটে না—প্রাচীন ভারতে এই একপ্রকার আমোদজনক প্রথা ছিল। নতুবা পদাঘাতের সঙ্গে ফুল-ফোটার কোন প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অশোকের ফুল থোলো থোলো হয়; তাহারও বর্ণনা মহাকবি করিয়াছেন—

"ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্"। রঘু ১৩।৩২॥

ফুল থোলো থোলো হয় বলিয়াই যুবতীর স্তনের সহিত তাহার সাদৃশ্য বলিয়াছেন। অশোক ফুল দেখিলেই ইহার সার্থকতা তৎক্ষণাৎ বোধ হইবে।

আর অশোক বৃক্ষ যে স্মরদীপক, তাহাও বলিয়াছেন—

কুসুমমেব ন কেবল মার্ত্তবং, নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্।
কিসলয়প্রসবোঽপি বিলাসিনাং, মদয়িতা দয়িতা শ্রবণার্পিতঃ॥ রঘু ৯।২৮॥
"রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ......দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ"। উ, মেঘ ১৪

তরুণ অশোকবৃক্ষই দেখিতে সুন্দর এবং তাহার পাতাগুলি ঐ সময় যত ভাল থাকে, বড় অশোকবৃক্ষের তেমন থাকে না। ঐ সময় যখন লাল লাল ফুল ফোটে আর বাতাসে ঝাকড়া পাতাগুলি একবার সরিয়া যায় আবার ঢাকা পড়ে—এইরূপ "চলকিশলয়" হয়, তখন ঐ "রক্তাশোক" স্মরবর্দ্ধকই হয়। মল্লিনাথও বলিয়াছেন যে—"রক্তোঽত্র স্মরবর্দ্ধনঃ" (উ, মেঘ টীকা ১৫ শ্লোক)—এই স্মরদীপক বলিয়াই ঋতুসংহারে কালিদাস অশোকের বিশেষণ "সশোক" দিয়াছেন।

৪। আম্র :—পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। ইক্ষু :—

"ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যঃ তস্যগোপ্তু,র্গোদয়ম্"। ৪।২০ রঘু।

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ···শিশিরসময় এষ···। ঋতু ৫।১৬।

ভাষানাম :—বাঃ = আক্, কুশের। হিঃ = ইখ্, গন্না, গাঁড়া। মঃ = উঁস। গুঃ = শেরড়ী, শেরডেন্থুমূল। কঃ = কবু ,কব্বিন্মেরু। তৈঃ = চিরকৃ। ফাঃ = নেশ্কর। অঃ = কম্বুসশকর। সিংহলী = উখ্। বোটানিক্ = Saccharum officinarum।

ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ আঁক। এ'দেশে ইহার রসে গুড় ও পাটালি তৈয়ারী হয়। আঁকের গুড় প্রসিদ্ধ। শীতকালেই ইক্ষু পরিপুষ্ট হয়। তখনই গুড় প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। আঁকগাছ সকলেই দেখিয়াছে।

৬। ইঙ্গুদী :—

"তা ইঙ্গুদীস্নেহ কৃত প্রদীপম্"—(১৪।৮১ রঘু)

পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রী মহাশয়কে ডেরাডুনাদি অঞ্চলে "ইঙ্গুদী" বলিতে "মৌগাছ" দেখাইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই "মৌ"-কেই ইঙ্গুদী বলেন। ইঙ্গুদীকে অমরসিংহ কেবল তাপস তরু বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়—ইঙ্গুদীর তৈল ঋষিরা মাখিতেন, খাইতেন, প্রদীপে জ্বালাইতেন এবং কোন স্থান কাটিয়া গেলে এই তৈল দিয়া বাঁধিতেন, তাহাতেই ঐ ক্ষত আরাম হইত। মৌ-তৈলেরও নাকি ঐরূপ ব্যবহার আছে ও ঐরূপ গুণ আছে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্ববৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইঙ্গুদী লইয়া আলোচনা হইলে তিনি বলেন যে, তাঁহার মতে ইহা বাদাম গাছ। বাদাম তৈলের ঐরূপ ব্যবহারাদি চলিতে পারে। পড়িবার সময় ৺রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই বৃক্ষের আর নির্ণয় হয় না।

যখন কোন দেশে ইঙ্গুদী বলিতে মৌয়াগাছ দেখাইয়াছে, তখন ঐ মৌয়াগাছকেই ইঙ্গুদী ধরাই ভাল।

৭। উদুম্বর :—

"শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্"—(পূর্ব্বমেঘ ৪২)

অমর :—"উদুম্বরে জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ"।

ভাষানাম—বাঃ = যজ্ঞডুমুর (সাধারণ যে ডুমুরের তরকারী খাওয়া হয়, সে ডুমুর নয়)। হিঃ = গুলর। সিংহলী = আট্রিক্কা। মঃ = উম্বর। কঃ = অত্তি। তৈঃ = বাড়ুচেট্টু। কোঃ = ডুম্‌রী। ফাঃ = অঞ্জীরে আদম্। অঃ = জমীঝ্। বোটানিক্ = Ficus Glomerata ; Syn. Covellia glomerata. Miq.

এই যজ্ঞডুমুরের গাছ সুপরিচিত। ইহার ফল ডুমুরের ফল অপেক্ষা বড়, পাতা কর্কশ নয় ; ডুমুরের পাতার ন্যায় পাতা চওড়া নয়। ফল পাকিলে মধ্যে পোকা থাকে বলিয়া ইহাকে সম্ভবতঃ "জন্তু ফল" বলে। কাঁচা ফল কাটিলে আঠা বাহির হয়।

বর্ষায় উদুম্বরের ফল পাকিবার কথা কালিদাস বলিয়াছেন।

৮। এলালতা :—

তাম্বুল বল্লী পরিণদ্ধপূগা-স্বেলালতা লিঙ্গিতচন্দনাসু।

তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং, প্রসীদ শশ্বন্ মলয়স্থলীষু॥ ৬।৬৪ রঘু॥

অমর—"পৃথ্বীকা চন্দ্রবালৈলা নিষ্কুটির্বহুলা।"—

পৃথ্বীকা, চন্দ্রবালা, এলা, নিষ্কুটি এবং বহুলা।

অন্য নাম—চর্ম্মসম্ভবা, দিবোদ্ভবা, স্থূলা, মালেয়া, তাড়কাফল।

"এলয়তি নাশয়তি মুখদৌগন্ধ্যম্"—এলাইচ্ লতা।

এলাইচ দুই প্রকার—বড় এলাচ ও ছোট এলাচ।

বড় এলাচের ভাষানাম—হিঃ = বড়ি ইলায়চি, লাল ইলায়চি। মাঃ = থোরবেলা, বেলদোড়ে। গুঃ = মোটী এলাচী, এলচা। কঃ = পরডুলক্কী। তৈঃ = পেদ্দ এলাকুলু। তাঃ = এলম্। ফাঃ = হৈলকলাং। অঃ = কাকুলে কিবার্।

ছোট এলাচের ভাষানাম—হিঃ = ছোটী ইলায়চি, গুজরাতি ইলায়চি। মঃ = বেলচি। গুঃ = এলচি কাগদী। তৈঃ = এলাকু। দ্রাঃ = এলোকুল্লকাপু। ফাঃ = হৈল্। অঃ = কাকিলেসিগার। বোটানিক্—Elettaria Cardamomum, Amomum Subelatum.

"এলাচ" প্রসিদ্ধ। কেহ ইহাকে "এলাসূক্ষ্ম" বলে।

(ক্রমশঃ)

মলাশ্ম

অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

পুরাকালে বড় আকারের কতকগুলি সরীসৃপ পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। তাহারা এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত সরীসৃপ Dinosaurus (ভীষণ সরীসৃপ) নামে খ্যাত; কিন্তু ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে, সরীসৃপের এই পর্য্যায়বিশেষ-ভুক্ত সমস্ত জীবই বৃহদায়তনের ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ *Compsognathus* নামক জীবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই জন্তুটী দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক ২ ফিট মাত্র ছিল। আসানসোলের নিকটবর্ত্তী দেওলি নামক স্থানে এই বর্গভুক্ত জীবের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি

আলোক চিত্র] মলাশ্ম [শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র

পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই জীবের আয়তনও বড় ছিল না। শরীরাস্থি ব্যতীত আরও যে সমস্ত ভাবে এই পর্য্যায়ভুক্ত জীবের নিদর্শন প্রস্তরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মলাশ্মের বা প্রস্তরীভূত মলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও একাধিক স্থানে এই বর্গভুক্ত বৃহদায়তন জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়; এবং মধ্য-প্রদেশান্তর্গত চন্দা জেলাস্থিত পিসডুরা নামক স্থান তন্মধ্যে অন্যতম। এইস্থানে যে Dinosaurus পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে *Titanosaurus*। এইস্থানে প্রস্তরীভূত অস্থি ব্যতীত এই জীবের মলাশ্মও পাওয়া গিয়াছে। এই মলাশ্মগুলির আকার প্রভৃতি আবার নানা রকমের। প্রেসিডে

কলেজের ভূতত্ত্ব-বিভাগে এই জীবের কতকগুলি মলাশ্ম রক্ষিত আছে। এইগুলি কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সংগৃহীত মলাশ্মগুলির মধ্যে একটির গাত্রে চক্রাকার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য যখন অন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন অন্ত্র-সংযুক্ত ঝিল্লি হেতু এই প্রকারের দাগ মলের উপরে পড়িয়া থাকে[১]। মলাশ্ম দুষ্প্রাপ্য না হইলেও এইরূপ কুণ্ডলিত চিহ্নবিশিষ্ট মলাশ্ম অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য ; এবং সেই হেতু পূর্ব্ববর্ণিত মলাশ্মের একটী চিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল।

প্রজাপতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে বহুসংখ্যক পতঙ্গকে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাতায়াত করিতে দেখা যায় ; উহাদিগের অনেকগুলিই যে প্রজাপতি নামে পরিচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। জীবজগতের মধ্যে উহাদের ন্যায় সুন্দর জীব বোধ হয় আর নাই। দার্জ্জিলিঙ সহরে প্রজাপতি বিক্রীত হইয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী বাবু ঘর সাজাইবার জন্য ঐ সকল পার্ব্বত্য মৃত প্রজাপতি ক্রয় করিয়া থাকেন। সিমলা সহরে ইংরাজ-বালকদিগকে শিক্ষকের সহিত পর্ব্বতভ্রমণকালে ছোট জালের সাহায্যে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতিসমূহ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি। ফলতঃ, অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য উহারা আবালবৃদ্ধবনিতার মন হরণ করিয়া থাকে। বিশ্বশিল্পী কি উদ্দেশ্যে এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেহ অনুমান করিয়াছেন কি? অভিভাবক ও শিক্ষকগণ বালকবালিকাদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচিত করিবার অবসর ও উৎসাহ প্রদান করিলে আমাদিগের মধ্যেও দুই একজন বিংহাম্ (Bingham) বা কম্‌ষ্টক্ (Comstock)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব অবশ্যই হইত বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ, সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই আমাদের অনেকেই সহজপ্রাপ্য নানাবিধ কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করিতে পারেন ও অবসরকাল উহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ-জনিত বিমলানন্দে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রজাপতিদিগকে শল্কপক্ষ পতঙ্গের (Lepidoptera) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কম্‌ষ্টক্ নামধারী জনৈক বৈজ্ঞানিক "Manual for the Study of Insects" নামক গ্রন্থে শল্কপক্ষ পতঙ্গদিগকে দুইটি অধঃবর্গে (Sub-order) বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) 'Some of the coprolites have a spiral line impressed on them which was made by the membrane of the intestine on the food as it passed along'—Pelly: Glossary and notes on Vertebrate Palæontology.

(ক) আঁকুশীযুক্ত শল্কপক্ষশ্রেণী (Jugatae Lepidoptera)

প্রত্যেক পতঙ্গের যে এক এক পার্শ্বে দুইখানি করিয়া মোট চারিখানি পাখা থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক পার্শ্বের সম্মুখের পাখাখানিকে পুরতঃ-পক্ষ (fore-wing) এবং পশ্চাতের খানিকে পশ্চাৎপক্ষ (hind-wing) বলা হয়। পুরতঃপক্ষের পশ্চাৎ কিনারার মূলদেশে একটি করিয়া বর্দ্ধিতাঙ্গ (projection) থাকে—উহাকে আঁকুশী (jugum) বলে। এই আঁকুশীর সাহায্যে প্রত্যেক পার্শ্বের পক্ষদুইখানি একত্র আবদ্ধ থাকিতে পারে। অনেক শলভ (moth)-এর পক্ষকে এইরূপভাবে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়।

(খ) সকণ্টক শল্কপক্ষশ্রেণী (Frenate Lepidoptera)

শলভ, Skipper নামক এক জাতীয় সাধারণ প্রজাপতি—যাহাদের প্রতিপার্শ্বের পক্ষদ্বয় একটি কাঁটা (frenulum) দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে।

পণ্ডিত মেরিক্ (Meyrick) তাঁহার 'Handbook of British Lepidoptera' গ্রন্থে শল্কপক্ষ পতঙ্গদিগকে নয়টি গণে (genera) বিভক্ত করিয়াছেন। Papilionidae প্রজাপতি উহাদের অন্যতম। আর Skipper-গণ Hesperiidaeর অন্তর্গত। মেরিকের মতে প্রজাপতির পাখাগুলিতে আঁকুশী (jugum) বা কাঁটা (frenulum) থাকে না; কিন্তু পশ্চাৎপক্ষের দীর্ঘীভূত বড়শী (humeral angle) সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। আর প্রজাপতি-দিগের শুঁয়ার (antennae) অগ্রভাগ মোটা (knobbed) বা প্রশস্ত অথবা বড়শীযুক্ত হয়।

শল্কপক্ষ-পতঙ্গের কোন কোন দলে (group) jugum বা frenulum থাকে না বটে; কিন্তু তাহাদের শুঁয়ার অগ্রভাগ মোটা (knobbed) হয় না। সুতরাং প্রজাপতি হইতে এই দলকে পৃথক করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না। অপর পক্ষে, Skipper-জাতীয় পতঙ্গের শুঁয়ার অগ্রভাগ মোটা হইলেও উহাদের সর্ব্বদাই কাঁটা (frenulum) থাকে। অতএব ঐ সকল পতঙ্গদিগকে প্রজাপতি হইতে পৃথক করিতে কোনরূপ কষ্ট হয় না *। সমুদায় শল্কপক্ষ পতঙ্গগণের জীবনে চারিটি অবস্থা দেখা যায়:—

(১) ডিম্বাবস্থা—ডিমগুলির আকার গোল বা বাদামী। কখন কখন লম্বা ও প্রায়ই চ্যাপ্টা দেখায়। এই সকল ডিমের বহিরাবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত।

* শলভ (moth) ও প্রজাপতির পার্থক্য:—দিবাভাগে যে সকল শল্কপক্ষ পতঙ্গকে উড়িতে দেখা যায়, তাহাদেরই সাধারণ নাম প্রজাপতি। শলভগণ নিশাচর; উহাদের পাখার উপরের পিঠই দেখিতে সুন্দর হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজাপতিদিগের পাখার উভয় পিঠই দেখিতে মনোহর। শলভদিগের শুঁয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে; এবং পরিশেষে সূচ্যগ্রভাব ধারণ করে। ইহারা অনেক সময় গরম পোষাক নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু প্রজাপতির শুঁয়া ঐরূপ সূচ্যগ্র হয় না বা উহারা কখন পোষাকাদি নষ্ট করে না। প্রজাপতিদিগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ প্রজাপতিই যখন কোন কিছুর উপর বসিয়া থাকে, তখন উহারা পাখাগুলিকে প্রায়ই উচ্চ করিয়া রাখে। সুতরাং সেই সময় আমরা উহার পাখার প্রধানতঃ নীচের পিঠই দেখিতে পাইয়া থাকি।

(২) **কড়াবস্থা** (larva বা caterpillar) (চিত্র—১)—কেহ কেহ এই অবস্থাকে "শুঁয়োপোকা" বলেন। সাধারণতঃ এই অবস্থায় প্রজাপতিকে বাঁশের মত গিঁটযুক্ত দেখায়। উহার গায়ে কখন কখন লোম থাকে। অনেক সময়েই আত্মরক্ষার উপযোগী কাঁটা বা মোটা মোটা মাংসপিণ্ডযুক্ত দেখা যায়। প্রত্যেক কড়ার দেহ ১৪ অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি মস্তক; ২য়—৪র্থ খণ্ড বক্ষপঞ্জর-সূচক। ইহাদের সহিত গ্রন্থিময় জোড়া জোড়া পদ দেখা যায়—ইহারাই প্রকৃত পদ (চিত্র—১ ক)। পরবর্ত্তী একটি, কি দুইটি খণ্ডে পায়ের কোন চিহ্ন থাকে না। পরের এক বা ততোধিক খণ্ডে কিন্তু জোড়া জোড়া মাংসময় পদ বা উপপদ (prolegs) থাকে (চিত্র—১ খ)। পশ্চাতের খণ্ড দুইটি অন্যান্য খণ্ড হইতে পৃথকাকার হইয়া থাকে; উহাদিগকে ইংরাজীতে claspers বলে (চিত্র—১ খ)।

(৩) **মূককীটাবস্থা** (pupa or chrysalis)—এই অবস্থায় ইহার আকার অল্পাধিক রিঠামাছের ন্যায় কোণবিশিষ্ট (fusiform) দেখায়। ইহার দেহের বহিরাবরণের সহিত কতকগুলি দ্রব্য সংযুক্ত থাকে। অনেক সময় আবার ইহার গায়ে কাঁটা কাঁটা দেখা যায়। আবার কখন কখন পাখার ন্যায় অঙ্গও বিদ্যমান থাকে (চিত্র—২)। এই অবস্থায় ইহা কচিৎ সূত্র দ্বারা আবৃত থাকে। কখন কখন মূককীটগুলি রেশমের সূতার ন্যায় সূতা দ্বারা লেজের দিকে কোন একটি পাতা বা প্রশাখার সহিত আবদ্ধ থাকে; আবার কখন কখন মধ্যভাগের সহিতও সূতা যে আবদ্ধ না থাকে—এমনও নহে।

(৪) **পূর্ণাঙ্গ বা প্রজাপতি-অবস্থা** (imago)—এই অবস্থায় প্রজাপতির চারিখানি পাখা ও বক্ষের সহিত ছয় খানি পা সহজেই দেখা যায় (চিত্র—৪)।

ভারতীয় প্রজাপতিদিগকে ছয়টি পরিবারে (families) বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সকল পতঙ্গের মস্তক, বক্ষ, পক্ষ ও পদের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে।

ক। মস্তক (চিত্র—৩)

(১) **অধরস্থ-স্পর্শিনী** (labial palpi—ধ, খ)।—সমুদায় প্রজাপতিরই এই সকল অধরস্থ-স্পর্শিনী তিনটি গ্রন্থিযুক্ত হয়; ইহাদের আকারও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে

শলভেরা কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় পাখাগুলিকে উচ্চে না রাখিয়া বরং শায়িত (horizontal) বা টারা (inclined) ভাবে রাখে এবং অনেকে আবার আপনাপন দেহকে পাখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। প্রজাপতিদিগেরই কেবল পাখার কিনারায় কাঁটা (spines), কুচি (bristles) বা আঁকড়া (hooks) থাকে না। অতএব কি উড়িবার, কি বসিয়া থাকিবার সময় প্রতিপার্শ্বের অগ্র ও পশ্চাতের পাখাগুলি পৃথক থাকে। প্রজাপতির পাখার শল্কগুলি (scales) এরূপভাবে সজ্জিত থাকে যে, শলভ ও hawk-moth-এর পাখা অপেক্ষা উহাদিগকে অধিকতর মসৃণ (smoother) দেখায়। প্রজাপতির শুঁয়াগুলি সাধারণতঃ সরল (simple), সরু (slender) এবং দীর্ঘ (elongated)। উহাদের অগ্রভাগ কখন গোল, কখন গদাকৃতি, কখন বা অন্যরূপ থাকে।

বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। শঙ্ক বা লোমও এক এক গণে (genus) এক এক রূপ হয়। এই সকল স্পর্শিনী স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের কার্য্য বা আবশ্যকতা যে কি, তাহা পণ্ডিতেরা আজিও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।
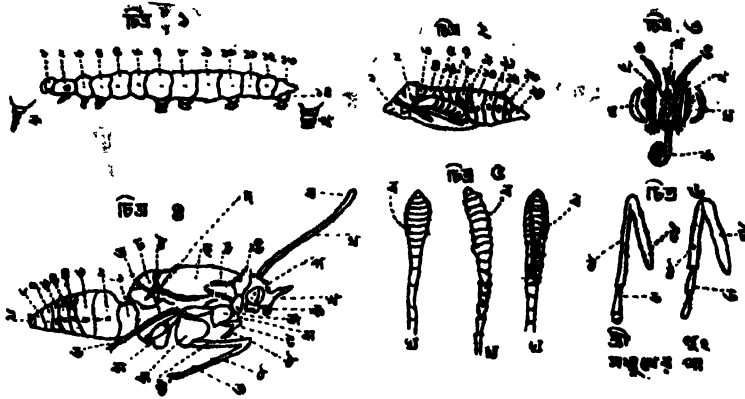
চিত্র ১—প্রজাপতির কড়া অবস্থা; চিত্র ২—প্রজাপতির মুককীটাবস্থা
চিত্র ৩—প্রজাপতির মস্তক: ক—শুঁড়, খ-খ—অধরস্থ-স্পর্শিনী, গ-ঢাল, ঘ-মিশ্র চক্ষু, ঙ-ঙ শুয়া—শুঁয়ার গোড়ার অংশ ছড়ি (shaft) (চিত্র-৪ ঘ; চিত্র—৫ঘ)এবং অপর অংশ গদা (club) (চিত্র—৪ব; চিত্র—৫ব)
চিত্র ৪—দেহ: ক-শুঁড়, খ-অধরস্থ-স্পর্শিনী, গ-মিশ্রচক্ষু, ঘ-শুঁয়া, ঙ-পুরতঃ বক্ষ (pronotum), চ—patella, ছ—মধ্যবক্ষ (mesonotum), জ-সীণাস্থ (episternum), ঝ-ঝ-ঝ—নিতম্বগ্রন্থি (coxa), ট-ট-ট—উরু (femora, চিত্র—৬ ট), ঠ-ঠ-ঠ—নলা (tibia, চিত্র—৬ঠ), ড-ড-ড পায়ের পাতা (tarsi, চিত্র—৬ ড) ঢ—পশ্চাৎবক্ষের ঢাল (scutellum of meta-thorax), ত—ঢালের ঊর্দ্ধভাগ (post-scutellum), দ—পশ্চাৎবক্ষ (metathorax), ১-৯—উদরের পাব বা গ্রন্থিসমূহ।
চিত্র—৫: ব—শুঁয়ার অপর অংশ—গদা (club), ঘ—শুঁয়ার গোড়ার অংশ—ছড়ি (shaft)
চিত্র—৬: ট-উরু, ঠ-নলা, ড—পায়ের পাতা

(২) শুঁয়া (antennae) (চিত্র—৪ ঘ এবং চিত্র—৫ ঘ)—পিপীলিকারা যেমন শুঁয়ার সাহায্যে পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করে, প্রজাপতিরাও সেইরূপ শুঁয়ার বলে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। এই শুঁয়া অনেকগুলি 'পাব' বা গ্রন্থির (joints) সমষ্টি মাত্র; ইহাদের দৈর্ঘ্য একরূপ নহে। আবার কোনটি বা সরু, কোনটি বা মোটা হইয়া থাকে; কোন কোনটির আকার গদার (club) ন্যায়। সকল প্রজাপতির শুঁয়ার আকারও অবশ্য একইরূপ নহে (চিত্র—৫ ঘ)। ইহাদের উপরিস্থ লোম এবং শল্ক-সংখ্যাও সমান হয় না। কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়ার নীচের পিঠে খাঁজ (grooved)-কাটা থাকে।

খ। বক্ষ

পক্ষ ও পদগুলি বক্ষের সহিত সংযুক্ত থাকে। উহাদিগের গঠনের উপর শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে।

(১) পক্ষ (wings)—প্রজাপতির পক্ষগুলি চীনে কাগজের মত পাৎলা (membraneous)। প্রত্যেক পক্ষের মূলদেশ হইতে অগ্রভাগের শেষ পর্য্যন্ত অনেকগুলি সূত্রাকার স্নায়ুগুচ্ছ (nervures) বিস্তৃত থাকে। ঐ সকল স্নায়ুগুচ্ছ পাখাগুলির ভারবহন ও উহাদিগের সঞ্চালন-শক্তির প্রধান কারণ। অধিকাংশ প্রজাপতিরই পাখার উভয় পৃষ্ঠ সচরাচর উজ্জ্বলবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ শল্ক দ্বারা আবৃত থাকে। সাধারণতঃ সম্মুখের পক্ষে বারটি স্নায়ু, আর পশ্চাতের পক্ষে নয়টি স্নায়ু থাকে। এতদ্ভিন্ন পক্ষগুলিতে অনেক শিরা (vein) থাকে। অবশ্য কখন কখন দুই একটি শিরা কম থাকিতেও পারে। আবার কখন কখন দুই একটি অতিরিক্ত শিরাও যে থাকিতে না পারে—এমনও নহে। ৭—ক,খ চিত্রে পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম দেখা যাইবে।

(২) পদ—প্রজাপতির ছয় খানি পা থাকে। ইহাদের মধ্যে সম্মুখের পা-জোড়ার আকার সকলের সমান থাকে না; আর ইহারা প্রায়ই ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে (চিত্র—৬)। Nymphalidæ বংশের (family) প্রজাপতির সম্মুখের পা দুইখানি শরীরের সহিত সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকে; দেখিলে ভ্রম হয় যে, উহারা বুঝি লোম হইবে। কিন্তু ঐ বংশের প্রায় সমুদায় গণেই—কি পুং, কি স্ত্রী—উভয় প্রজাপতির পা-গুলি চলিবার উপযোগী নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুঁয়া ও পক্ষের স্নায়ুগুচ্ছের উপর নির্ভর করিয়াও ভারতীয় প্রজাপতি-দিগকে ছয়টি বংশে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা :—

(১) Nymphalidæ—ইহাদের সম্মুখের পা জোড়া, অসম্পূর্ণ।

(২) Erylinidae—পুংদিগের সম্মুখের পা জোড়া অপূর্ণ হইলেও স্ত্রীদিগের পা সম্পূর্ণ (perfect)।

(৩) Papilionidæ—স্ত্রী ও পুং উভয়েরই সম্মুখের পা জোড়া, সম্পূর্ণ (perfect)। কিন্তু পশ্চাৎ পক্ষের শিরা থাকে না; তবে থাবা (claws)-গুলি সরল থাকে

(৪) Pieridæ—Papilionidæ-র ন্যায় ইহাদের পশ্চাৎ-পক্ষের শিরার অভাব হয় না; ইহাদের থাবা দ্বিখণ্ডিত দেখা যায়।

(৫) Lycænidæ—পশ্চাৎ-পক্ষের সম্মুখ দিকে চালক-স্নায়ু (precostal nervures) থাকে না।

(৬) Hesperiidæ—শুঁয়া দুইটির মূলদেশের নিকটে অনেকটা ফাঁক থাকে। পশ্চাৎ tibia-য় (পাদপর্ব্বে) মধ্য ও অন্ত্য জোড়া জোড়া কাঁটা (spurs) থাকে; সম্মুখের পাখায় মূলদেশ কিম্বা শেষ কোষ হইতে যে সমুদায় শিরা বাহির হয়, তাহাদের কোনটিই বিভক্ত (forked) অথবা অদূরে মিলিত থাকে না।
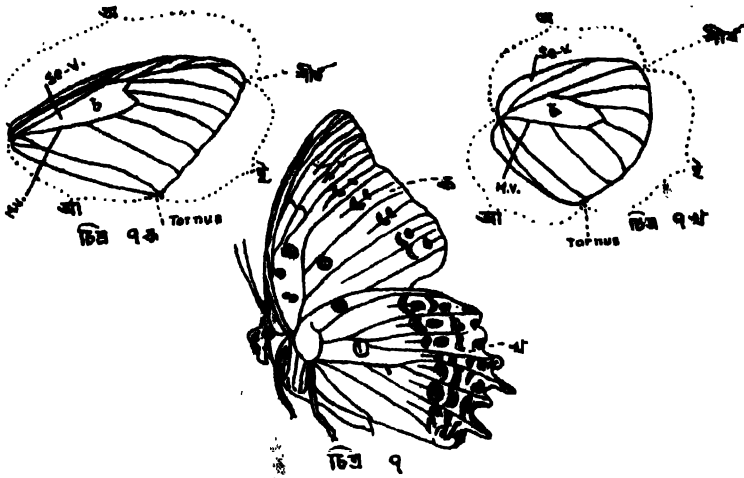
চিত্র ৭—প্রজাপতি (Eulepis delphis)

চিত্র ৭-ক—সম্মুখের পক্ষ : অ—সম্মুখের কিনারা, আ—পশ্চাতের কিনারা, ই-প্রান্তবর্ত্তী কিনারা, চ—চক্রবৎ কোষ (discoidal cell)

চিত্র ৭খ—পশ্চাতের পক্ষ : অ—সম্মুখের কিনারা, আ—পশ্চাতের কিনারা, ই—প্রান্তবর্ত্তী কিনারা, চ—চক্রবৎ কোষ (discoidal cell)।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-মহাসাগরে তুষারাচ্ছন্ন গ্রীণল্যাণ্ড ও স্পিটস্‌বর্জেন দ্বীপে উহাদিগকে অত্যল্পকালের জন্ত গ্রীষ্মের রৌদ্রমধ্যে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু উহারা গ্রীষ্মমণ্ডলেই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উহারা গরম দেশের প্রখর রৌদ্র অপেক্ষা বন-জঙ্গল বা পত্রের ছায়ায় থাকিতে ভালবাসে। ডাক্তার হুকার (Dr. Hooker) হিমালয় প্রদেশে—বিশেষতঃ সিকিম অঞ্চলে—বিচিত্র

বর্ণের বিবিধাকার প্রজাপতি-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ফলতঃ, আকাশ-পথে উহাদের উড্ডয়ন, কখন বা আর্দ্র নদী-সৈকতে বসিয়া বিশ্রাম, কাহার পক্ষগুলি ঊর্দ্ধমুখী (erect), কেহ বা পাখার ভরে দোদুল্যমান—এইরূপ সহস্র সহস্র প্রজাপতির রূপ-দর্শন করিয়া কাহার মন না মুগ্ধ হইয়া থাকে ?

প্রজাপতিদিগকে দেখিলে অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রাণী বলিয়া মনে হইলেও উহাদের পাখার বল অসাধারণ। উহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া আকাশ-পথে উড়িয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির প্রথম জোড়া পা এত ক্ষুদ্র থাকে যে, উহাদিগকে ষট্‌পদ না বলিয়া চতুষ্পদ বলিলে বিশেষ দোষ হয় না।

যে গাছের পাতা খাইয়া কড়া বা শুঁয়াপোকা (caterpillar)-গুলি অনায়াসে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে, প্রজাপতিগণ সেইরূপ গাছের পাতার উপরেই ডিম্বপ্রসব করিয়া থাকে। শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে শরৎকালে যে সকল ডিম্ব প্রসূত হয়, পরবর্ত্তী বসন্তকালের পূর্ব্বে উহারা ফোটে না। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন কোন জাতীয় প্রজাপতি এক বৎসরের মধ্যে একাধিক বার ডিম্বপ্রসব করিয়া থাকে; কারণ গ্রীষ্মের সময় কয়েক দিনের মধ্যেই ডিমগুলি ফুটিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জাতীয় প্রজাপতির কড়াকে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষে থাকিতে দেখা যায়। সকলের খাদ্য একইরূপ নহে বলিয়াই এইরূপ ঘটে। জননীগণ সন্তানের উপযোগী বৃক্ষ বাছিয়া লয় বলিয়াই এক এক জাতীয় বৃক্ষে এক এক জাতীয় কড়ার অবস্থান দেখা যায়।

কোন কোন জাতীয় পতঙ্গ (হা-ঘরে বা Ichneumones) প্রজাপতির কড়ার দেহ ভেদ করিয়া আপনাপন ডিম্বপ্রসব করে। ডিমগুলি ফুটিয়া ঐ সকল কড়াকে ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এইজন্য অনেক প্রজাপতি অকালে মারা পড়ে। নতুবা বোধ হয় প্রজাপতিতে পৃথিবীর জলস্থল ও অন্তরীক্ষ পূর্ণ হইয়া যাইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রজাপতির আকার বহুবিধ। দুই পার্শ্বের পক্ষগুলিকে বিস্তৃত অবস্থায় মাপিলে কাহার দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চ হয় না; আবার কাহার এক ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় প্রজাপতিকে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। Cynthia Cardui নামক প্রজাপতিকে ইউরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্র, মিসর, উত্তর-আফ্রিকা, সেনিগাল, কেপ্ কলনি মাডাগাস্কার দ্বীপ, চীন, যাভা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল এবং উত্তর-আমেরিকা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আর অন্য অনেক জাতিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

প্রজাপতিরা কেবলমাত্র আমাদিগের যে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে। উহাদের কড়াগুলি বাগানের অনেক ফুল-ফলের বৃক্ষকে পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীগণ—ইংরাজ ও ফরাসীদিগের পঙ্গপালভক্ষণের ন্যায়—অত্যধিক মাত্রায় প্রজাপতি-প্রিয়। এই সকল প্রজাপতি (Euplœa humata) পর্ব্বত-গাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া থাকে। অসভ্যগণ ধোঁয়ার সাহায্যে উহাদিগকে মারিয়া ফেলে। পরে পাখা ও লোমাদি

বিচ্ছিন্ন করিয়া দেহগুলিকে উত্তপ্ত ভূমির উপরে মাড়াইয়া পিণ্ডাকার করতঃ শুকাইয়া লয়। নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে—অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে—অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য আদিম অধিবাসিবৃন্দ আনন্দের সহিত ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

এক জাতীয় প্রজাপতি (Pontia Brassicæ) বাঁধা-কপির পাতা খাইয়া কড়া অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে; উহাদিগকে 'কপি-প্রজাপতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। উহারা বেশ বড় হয় এবং দেখিতে শ্বেতবর্ণ; পাখার ধারে ধারে কাল কাল দাগ থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতিগণ ২০ হইতে ৩০টি ডিম্বপিণ্ড প্রসব করিয়া কপি-পাতায় রক্ষা করে। ডিমগুলি ফুটিয়া কড়া জন্মে। ঐ সকল কড়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাপন দেহের ওজনের দ্বিগুণ পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। পক্ষী ও অন্যান্য পতঙ্গ না থাকিলে উহাদের অত্যাচারে কপি হয়'ত নির্মূল হইয়া যাইত। ফলে, আমাদের অনেকে হয়'ত বড়দিনের একটি প্রধান খাদ্য হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতেন।

প্রজাপতি দ্বারা জগতের যে বিশেষ কোন উপকারই হয় না, তাহা নহে। উহারা এক পুষ্পের মধুপান করিয়া যখন অন্য পুষ্পের মধু সংগ্রহ করিতে যায়, তখন পূর্ব্ব পুষ্পের রেণুকণা উহার গাত্র ও পদের সহিত সংযুক্ত হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় পুষ্পের গর্ভকেশরকে নিষিক্ত করে। অনেক পুষ্প প্রজাপতির নিকট এইজন্য বিশেষ ভাবে ঋণী। নতুবা উজ্জ্বল বর্ণ দ্বারা দূর হইতে প্রজাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ ও গর্ভকোষের অভ্যন্তরে বা পাপড়ীর গোড়ায় মধু-সঞ্চয়ের হয়'ত কোন কারণই থাকিত না। প্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় এক্ষেত্রে মধুর প্রলোভন প্রদর্শনের আবশ্যক। নতুবা পূর্ব্বোক্ত নিষেকক্রিয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমরাও নানাবিধ ফলাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতাম।

জীবগণ অনেক সময় পরিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অনুরূপ বর্ণ পাইয়া থাকে। নতুবা শত্রুর হস্ত হইতে সকল সময় সতর্ক থাকিয়া আত্মরক্ষা করা কখনই সম্ভবপর হইত না। কালকসুন্দা (এড়াঞ্চি) গাছে যে সকল কীট ও পতঙ্গ সচরাচর বাস করিয়া থাকে, তাহারা এইজন্য পত্রের অনুরূপ সবুজ বর্ণ লাভ করে। কখন কখন এমনও দেখিয়াছি যে, এক জাতীয় ফড়িঙের পাখা অবিকল কালকসুন্দার পাতার আকার ও বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষ-কোটরবাসী টিকটিকির বর্ণ পচা কাঠের মত যে অনেকটা কাল হয়, তাহা হয়'ত অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু কলিকাতায় চুণ-কামকরা দেওয়ালে যে সকল টিকটিকি প্রায়ই দেখা যায়, তাহাদের বর্ণ অনেকটা সাদা। শুধু আততায়ী জীবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই যে কীটপতঙ্গের এই রূপান্তর সাধিত হয়—তাহা নহে; আহার্য্য দ্রব্যের সংগ্রহের জন্য অনেক উচ্চশ্রেণীরও জীবের পক্ষে উহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ বর্ণের বিশেষ আবশ্যক। সিংহের বর্ণ রৌদ্রদগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় পিঙ্গল না হইয়া শ্বেত বা কৃষ্ণ হইলে গো-মহিষাদি শিকার ধরা সম্ভব হইত কি? গভীর বনমধ্যে পত্রান্তরাল দিয়া যে-স্থানে প্রখর সূর্য্যরশ্মি শুষ্ক পত্রের

উপর পতিত হয়, ব্যাঘ্রকে মধ্যাহ্ন কালে সেই স্থান হইতে সহসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ-সাধ্য কি ? শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশে শ্বেত ভাল্লুকের পক্ষেই বীবর, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতির দৃষ্টি এড়ান সম্ভব—কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুকের পক্ষে নহে। বিশেষ বিশেষ প্রজাপতিকে বিশেষ বিশেষ পুষ্পের মধু আহরণ করিতে দেখা যায়। কথামালার শৃগালের পক্ষে থালার ঝোল পান করা সহজসাধ্য হইলেও যেমন নিমন্ত্রিত সারসের পক্ষে উহা সম্ভব হয় নাই, পুষ্পের বিভিন্ন স্থান হইতে মধুসংগ্রহ করাও সেইরূপ সকল জাতীয় প্রজাপতির পক্ষে সম্ভবপর নয়। পুষ্পের বর্ণ যেমন বিচিত্র, প্রজাপতিদিগের বর্ণও সেইরূপ বিচিত্র হওয়া আবশ্যক ; নতুবা আততায়ী পক্ষিসমূহের কবল হইতে রক্ষা পাইবার তো কোন উপায়ই নাই। সুতরাং পরম কারুণিক বিশ্বপিতা অসহায় প্রজাপতিদিগকে পুষ্পের ন্যায় বিচিত্র বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

জীবমাত্রেরই গাত্রে একরূপ গন্ধ থাকে। গন্ধ-গোকুল, নেকড়া-বাঘ, বোকা-পাঁঠা প্রভৃতি জীবের গাত্রগন্ধ সুপরিচিত—তবে অনেক সময়ে উহা মলমূত্র-সঞ্জাত। কিন্তু মৃগনাভি নামক সুগন্ধি দ্রব্য পুং-মৃগেরই নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সময়বিশেষে হস্তীরও মদক্ষরণ হয়—উহাও গন্ধযুক্ত। অনেক প্রজাপতির গাত্রেও এইরূপ একপ্রকার গন্ধ জন্মে। লঙ্গষ্টাফ্ (Colonel Longstaffe) ১২০ প্রকারেরও অধিক প্রজাপতির গন্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রজাপতিকে "সুগন্ধ কিন্তু উড্ডয়নক্ষম পুষ্প" আখ্যা প্রদান করিলে বিশেষ দোষ হইতে পারে না।

মৃগনাভি ত' মৃগের নাভিদেশে উৎপন্ন হয়। প্রজাপতির গাত্রগন্ধ কোন্ স্থানে জন্মিয়া থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ঐ গন্ধস্থলী-সকল (scent-bottles) কোন কোন প্রজাপতির পক্ষের উপর, আবার অনেকের পায়ের উপরেও থাকে ; আবার কাহার বা উদরের উপরেও দৃষ্ট হয়। সচরাচর পক্ষের উপরে যে সকল কোষ থাকে, তাহাদের মধ্যেই গন্ধোৎপাদক-কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ কোষের ভিতর হইতে গন্ধ ফুটিয়া বাহির হয় ; এবং হয় উহার পিঠের উপর নতুবা কিনারার উপর হইতে বাষ্পীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ঐ গন্ধ বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া পড়ে।

ফুল-বাগানে অনেক সময় শ্বেতবর্ণের একপ্রকার পুং-প্রজাপতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পাখার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইলে আঙ্গুলের উপরে যে সাদা গুঁড়া গুঁড়া শল্ক (scales) জমে, উহার গন্ধ অনেকটা লেবু ফুলের ন্যায়। এইরূপ গন্ধযুক্ত শল্ক Lycaenidæ নামক জাতির অন্তর্ভুক্ত নীলবর্ণ প্রজাপতির পাখার উপরের পিঠের উপরেও দেখা যায়।

শ্বেত ও নীলবর্ণ প্রজাপতিদিগের মধ্যে সগন্ধ শল্ক (scented scales) পাখার উপরের পিঠে অন্যান্য শল্কের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত থাকে। কিন্তু অন্যান্য জাতির

মধ্যে সগন্ধ শল্কগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থান করে। ঐ সকল প্রজাপতির পাখার উপরে যে সকল ডোরা (stripes) বা কোন-রূপ ছাপ (patches) দেখা যায়, উহারাই সাধারণতঃ গন্ধদায়ক। পুং-জাতীয় Fritilary নামক প্রজাপতির পাখার উপরে কাল কাল ডোরা থাকে; এবং তৃণ-বিহারী কোন কোন পুং-প্রজাপতির সম্মুখের পাখায় কাল কাল ছাপ থাকে। ঐগুলি শত শত সগন্ধ-শল্কের সমষ্টি মাত্র।

আবার অন্যান্য প্রজাপতির পাখায় ছোট ছোট থলি (pouch) বা 'জেব' (pocket) থাকে। ঐ সকল থলি ও 'জেব' সগন্ধ-শল্কের দ্বারা আবৃত। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন প্রজাপতির পাখার কিনারার একটি খাঁজের (flap) মধ্যে গন্ধ-শল্ক থাকে। ঐ সকল প্রজাপতি ইচ্ছানুসারে ঐ খাঁজ খুলিয়া দিয়া গন্ধ বিস্তার করিতে পারে।

যে সকল প্রজাপতির পায়ের গোছে বা পেটের উপরে গন্ধোৎপাদক যন্ত্র অবস্থিত থাকে, সচরাচর উহাদের সঙ্গে এক গোছা লোম (hairs) দেখা যায়। ঐ সকল লোম দ্বারা গন্ধ বাহিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পুং-প্রজাপতিদিগেরই গন্ধ-শল্ক জন্মে। কিন্তু সচরাচর মোহনমূর্ত্তি প্রজাপতিদিগের গন্ধ থাকে না। Vanessas এবং Apaturas নামক প্রজাপতিদিগের মনোহর রূপ আছে বটে; কিন্তু উহাদের কোন গন্ধ নাই। অথচ উজ্জ্বলবর্ণবিহীন নিশাচর অনেক শলভের (moths) গায়ে রজনীগন্ধা প্রভৃতি উজ্জ্বলবর্ণহীন পুষ্পেরই ন্যায় সুগন্ধ দেখা যায়। Hawkmoth নামক শলভগণের গাত্রে কস্তুরীর ন্যায় যে গন্ধ থাকে, তাহা হয়'ত অনেকেই জানেন। ফলতঃ, ইহাদের সৌন্দর্য্যের অভাব গন্ধের দ্বারা পরিপূরিত করাই যেন স্রষ্টার ইচ্ছা।

সকল প্রকার শলভের এবং প্রজাপতির গায়ের গন্ধ একইপ্রকার নহে। ঐ গন্ধ কাহারও বা অধিক, আবার কাহারও বা অল্প। ফলতঃ, উহার যথাযথ বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। লঙ্গষ্টাফ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কাহার গন্ধ চকোলেটের ন্যায়, কাহার বা গোলাপের মত; কোন কোনটির গন্ধ সূর্য্যমুখীর ন্যায়, কাহার বা আম, যুঁই, দারুচিনি, কমলা বা কস্তুরীর ন্যায় ইত্যাদি। সকল প্রজাপতির গন্ধই যে ভাল হয়—তাহা নহে। কাহার গন্ধ তামাকের ন্যায়; কাহার গন্ধ য্যামোনিয়া (ammonia), ক্লোরফর্ম, তেলাপোকা ইত্যাদির মত (১)।

প্রজাপতি, শলভ ও অন্যান্য অনেক পতঙ্গকে নিকটে আনিতে না পারিলে অনেক পুষ্পেরই নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। সুতরাং পুষ্পের পক্ষে উজ্জ্বল বর্ণ, গন্ধ এবং মধু-সঞ্চয়ের যে আবশ্যক, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উড্ডয়নক্ষম প্রজাপতিদিগের গন্ধের আবশ্যকতা কি? সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার জন্যই অনেক প্রজাপতির গন্ধের আবশ্যক। দিবাভাগে নিয়ত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণকালে

---

(১) Colonel Longstaffe describes the scent of more than 120 species &c—The Statesman, October 1926.

আততায়ী পক্ষী দ্বারা বিনষ্ট হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু গাত্রে একটা দুর্গন্ধ থাকিলে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবারই কথা। অনেক কীটও গন্ধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। "পোদো" পোকাকে কেহ সহজে স্পর্শ করে কি? Bombardier-beetles নামক কীট আততায়ীর প্রতি দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার রস সশব্দে নিক্ষেপ করে। আক্রমণকারী ঐ শব্দে ও গন্ধে ভীত হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে পোকা পলায়ন করিতেও পারে (২)। আত্মরক্ষা ভিন্ন গন্ধের আর একটি কারণ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, প্রজাপতির গাত্রগন্ধ আমাদিগের নিকট ভালই হউক বা মন্দই হউক, উহা দ্বারা স্ত্রী-প্রজাপতিগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক পুং-প্রজাপতি স্ত্রী-প্রজাপতির মনোহরণের জন্য উহার গাত্রোপরি যে গন্ধ ছড়াইয়া থাকে, তাহা দেখা গিয়াছে। মানবের মধ্যে স্ত্রী-জাতি গন্ধ-ব্যবহারের অধিক পক্ষপাতী হইলেও প্রজাপতির মধ্যে পুং-প্রজাপতিগণই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। বংশরক্ষার জন্য স্ত্রীর মনোহরণ করা জীবমাত্রেরই কার্য্য। সেইজন্য জীবজগতে পুং-জাতির অধিকতর সৌন্দর্য্য ও গুণের আবশ্যক। আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। মুরগী অপেক্ষা মোরগ, ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর, গাভী অপেক্ষা ষণ্ড, সিংহী অপেক্ষা সিংহকে অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হয়। প্রজাপতিদিগের মধ্যে সেইরূপ পুং-প্রজাপতিকেই অধিকতর সুন্দর ও গন্ধ-বিশিষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে প্রজাপতিদিগের আদিতে গন্ধোৎপাদক অঙ্গ ছিল না; উহা পরে উদ্ভূত হইয়াছে। এ'কথা সত্য হইলে কালক্রমে উহার আরো উন্নতি হওয়াই সম্ভব। তাহার ফলে, আমাদের বায়ুমণ্ডল প্রজাপতি ও শলভের গন্ধে আমোদিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

মানুষের চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রেশম-শলভের (Silk-moth) মিলন-ফলে ঐ সকল শলভ-বংশ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং মানুষেরা সুগন্ধ প্রজাপতির মিলন দ্বারা উহাদের গন্ধ-যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি না করিবে—তাহাও বলা যায় না। অন্ততঃ আমাদের বাগান-বাড়ীর নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল গোলাপ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি পুষ্পের ন্যায় প্রজাপতি দ্বারা সুগন্ধীকৃত হইলে যে অত্যন্ত সুখকর হইবে—এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(২) "In some cases an offensive odour is emitted at pleasure from particular organs. The peculiar faculty of the so-called Bombardier-beetles, consisting in the discharge of a volatile liquid like a puff of smoke, accompanied by a distinct crepitating explosion and attended by a disagreeable scent, is well-known. An enemy in pursuit is dismayed, and arrested on its progress, enabling the beetles to gain time, and probably to effect its escape".—Romance of the Insect World by L. N. BADENOCH, page 271.

পদার্থের গঠন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের চারিধারে ইলেকট্রন ছড়াইয়া আছে—শুধু এইটুকু মোটামুটি খবরে বৈজ্ঞানিক তৃপ্ত রহিল না ; সে দৃষ্টির অগোচর এই এটমের আরো অনেক নাড়ীর খবর টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। কতক পরীক্ষা চলিল রেডিয়ম্ হইতে নির্গত ঐ আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে। এই আল্‌ফা কণিকার প্রকৃতি এই যে, রেডিয়ম ও তজ্জাতীয় পদার্থ হইতে ভীমবেগে নির্গত হইয়া যখন চলিতে থাকে, তখন চলার সঙ্গে সঙ্গে উহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে এবং এই বেগ একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম হইয়া পড়িলে ঐ আল্‌ফা কণিকা আর ফটোগ্রাফি কাঁচ কালো করিবে না, জিঙ্ক সলফাইড পর্দ্দায় আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিবে না ;—এই অল্পগতি আল্‌ফা কণিকাকে তখন আর চিনিবার উপায় থাকিবে না। রেডিয়ম্ হইতে নির্গত এই আল্‌ফা কণিকা বাতাসে ৭ সেন্টিমিটার পথ গিয়া হঠাৎ এইরূপে কাবু হইয়া পড়ে। এখন এইরূপ একটা বন্দোবস্ত যদি করা যায় যে, এই আল্‌ফা কণিকা চলিতে চলিতে পথে একটা হাইড্রোজেন এটম্‌কে সজোরে ধাক্কা দিবে, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে দেখা যাক। এই আল্‌ফা কণিকা একটি হিলিয়ম এটম্ ব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং ইহার অভ্যন্তরে ৪টী প্রোটন আছে ; আর যে হাইড্রোজেনকে ইহা ধাক্কা দিল, সেই হাইড্রোজেনের এটমে আছে মাত্র একটী প্রোটন। অতএব দাঁড়াইল যেন একটা ফুটবল আসিয়া একটা ক্রিকেট বলে ধাক্কা দিল ;—এইরূপ সংঘর্ষণে যেমন ক্রিকেট বলটী ফুটবলের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকে, এখানেও ঠিক সেইরূপ হইবে। ঐ হাইড্রোজেন ধাক্কা খাইয়া আল্‌ফা কণিকা যে-বেগে উহাকে ধাক্কা দিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত-বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিবে। ফলে দাঁড়াইবে এই যে, ঐ আল্‌ফা কণিকা যতদূর যাইয়া কাবু হইয়া পড়িত, ধাক্কা খাইবার পর ঐ হাইড্রোজেন এটমের অভ্যন্তর তাহার চতুর্গুণ দূর অবধি নিজেকে জানান দিবে। পরীক্ষায়ও এইরূপ পাওয়া গেল—আল্‌ফা কণিকা যতদূর অবধি গিয়া আর নিজেদের ধরা দেয় না, পরীক্ষায় দেখা গেল তাহার চতুর্গুণ দূর অবধি এই হাইড্রোজেন-অভ্যন্তর জিঙ্ক সলফাইড্ পর্দ্দায় মাথা ঠুকিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিতেছে। হাইড্রোজেন ছাড়িয়া অন্যান্য গ্যাসের উপর পরীক্ষা হইল। হিসাবে দেখা যায় যে, নাইট্রোজেন-অভ্যন্তর ধাক্কা খাইয়া আল্‌ফা কণিকার সীমানা ছাড়াইয়া আর সামান্য একটু দূর অবধি নিজকে ধরা দিবে। নাইট্রোজেনের উপর এইরূপ পরীক্ষা চলিল। নাইট্রো-জেন-অভ্যন্তরকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমানায় ধরা গেল ; কিন্তু একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা গেল

—নাইট্রোজেনের এই সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূরে জিঙ্ক সল্‌ফাইড পর্দা হইতে অল্প কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। সংখ্যায় অবশ্য ইহারা কম; কিন্তু কাহারা এরা, কোথা হইতেই বা আসিল? চুম্বক ও তড়িৎ-শক্তি প্রয়োগে ইহদের পথ বাঁকিয়া গেল—হাইড্রোজেন-অভ্যন্তর এইরূপ ক্ষেত্রে যতটা বাঁকে, ঠিক ততটা। তবে তো ইহারা হাইড্রোজেন, কিন্তু আসিল কোথা হইতে? ঐ নাইট্রোজেনের সঙ্গে কি হাইড্রোজেন একটু-আধটু মিশান ছিল? আচ্ছা, একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি নাইট্রোজেন লওয়া যাক। তা'ই লওয়া হইল; কিন্তু ঐ দ্রুতগামী হাইড্রোজেন তো বন্ধ হইল না। তবে কি আল্‌ফা-কণিকা দ্বারা ধাক্কা খাইয়া নাইট্রোজেন এটম চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তাহা হইতে বাহির হইল এই হাইড্রোজেন? তাহাই হইতেছে; নচেৎ এই হাইড্রোজেনের আর কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই। বহুযুগ হইতে বৈজ্ঞানিক যাহা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার সে চেষ্টা আজ সফল হইল। পরীক্ষাগারে একটি মৌলিক পদার্থ বাহির হইতে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া আর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইল। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় দেখা গেল যে, শুধু নাইট্রোজেন নয়—বোরণ, ফ্লুয়রিণ, সোডিয়ম্, এলুমিনিয়ম্ এবং ফস্‌ফরস্ আল্‌ফা কণিকার আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহা হইতে বাহির হয় হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেন তাহা হইলে কি প্রতি মৌলিক পদার্থের উপাদান? কথাটা আর একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। আল্‌ফা কণিকা কার্ব্বণ বা অক্সিজেনের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে কার্ব্বণ বা অক্সিজেন এটম্ কিছুতেই ভাঙ্গে না। কার্ব্বণের আণবিক ওজন হইল ১২, অক্সিজেনের ১৬। আল্‌ফ কণিকা ইহাদের কিছু করিতে পারে না; অথচ নাইট্রোজেন—যাহার আণবিক ওজন ইহাদের মাঝামাঝি, ১৪—তাহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। এটাই কেমন করিয়া হয়? তবে কি হাইড্রোজেন উপাদান দিয়া কার্ব্বণ ও অক্সিজেন গঠিত নয়; শুধু নাইট্রোজেন প্রভৃতি ৬টী মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের সমষ্টি লইয়া গঠিত। এ'সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করা হইল। হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা এটম; তাহার পর হইল হিলিয়ম। এই হিলিয়ম এটম হাইড্রোজেন এটমের ৪ গুণ ভারী। সূক্ষ্ম হিসাবে কিন্তু দেখা যায় যে, এ'টা ঠিক ৪ গুণ নয়—সামান্য একটু কম। হিলিয়ম ৪, অক্সিজেন ১৬—এই হিসাবে কিন্তু হাইড্রোজেনের ওজন দাঁড়ায় ১ নয়—১·০০৭৭; সুতরাং হিলিয়ম যদি ৪টা হাইড্রোজেনের সমষ্টি হয়, তো উহার ওজন হওয়া উচিত ৪ নয়—৪-এর একটু বেশী। তবে ৪ আসিল কিরূপে? খানিকটা পদার্থ খসিয়া গেল কিরূপে? এখানে আইন্‌ষ্টাইন্-আবিষ্কৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের (Theory of relativity) একটা তথ্যের আলোচনা প্রয়োজন। এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দুইটা মূল সূত্র ছিল—একটা এই যে ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থ অবিনশ্বর; ইহা আকৃতি ও কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু ইহার ওজনের নড়চড় হয় না। যে মোমবাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইল বলিয়া মনে করিতেছি, হিসাবে দেখা যাইবে—ততটা পরিমাণ পদার্থ অদৃশ্য গ্যাসে পরিণত হইল—এতটুকু কমবেশী নাই। পদার্থ যেরূপ অবিনশ্বর, সেরূপ শক্তিও অবিনশ্বর; শক্তিরও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই—ইহা শুধু রূপান্তরিত হয় মাত্র। এই সূত্র দুইটী

এখনও অটুট আছে ; কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্বের হিসাব অনুসারে দাঁড়ায় যে, পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কতটা পদার্থের বিলোপে কতটা শক্তি উদ্ভূত হইবে, তাহারও হিসাব হইয়াছে। হিলিয়মের গঠন সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে যে, ৪টা হাইড্রোজেনের মিলনে যখন হিলিয়মের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন কিয়ৎ পরিমাণ পদার্থ বিলুপ্ত হইয়াছিল ; এবং তাহার বিনিময়ে খানিকটা শক্তি দেখা দিয়াছিল। এই শক্তির পরিমাণ দু'একটা হিসাব হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে। এক ফোঁটা জলে যতটুকু হাইড্রোজেন আছে, সেই হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হইয়া হিলিয়মে পরিবর্ত্তিত হইলে ইহাতে যে তাপ নির্গত হয়, কয়েক মণ কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায়, উহা তাহার অধিক।

যাক্, এখন নিজেদের কিয়দংশ হারাইয়া এবং তাহার ফলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন করিয়া ৪টা প্রোটন জোট বাঁধিয়া যে হিলিয়ম এটমে পরিণত হইয়াছে, আল্ফা কণিকার সাধ্য নয় যে, সে জোট ভাঙ্গে। আল্ফা কণিকার অন্ততঃ তিন গুণ শক্তিশালী কোন পদার্থের আঘাতে এই হিলিয়ম এটম ভাঙ্গা সম্ভব ; এইরূপ শক্তিধর কোন পদার্থের কথা আজও জানা নাই। এই বার হিলিয়ম ছাড়িয়া অন্যান্য এটমের কথা ধরা যাক। কার্ব্বণ এটমের ওজন ১২ ; এখানে কল্পনা করা হয়, তিনটী হিলিয়ম এটম জোট বাঁধিয়াছে খুব জোরে—এত জোরে যে, আল্ফা কণিকার আঘাতেও এ'জোট ভাঙ্গে না। অক্সিজেনে ৪টী হিলিয়মের সমাবেশ ; এখানেও কার্ব্বণের মত অবস্থা ; কিন্তু নাইট্রোজেনের গঠন হইল এই যে, এখানে তিনটি হিলিয়ম একত্র হইয়াছে এবং তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে দুইটি হাইড্রোজেন। হিলিয়মদিগের মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি যেরূপ প্রবল, এই হাইড্রোজেন দুইটি সেরূপ জোরে হিলিয়মের সহিত আটকাইয়া নাই ; তাই আল্ফা কণিকার আঘাতে এই হাইড্রোজেন দু'টা বিচ্যুত হইয়া পড়ে। নাইট্রোজেন ছাড়িয়া বোরণ প্রভৃতিতে যখন উঠি, তখনও সেইরূপ ব্যাপার ; কিন্তু আরও উপরে যত উঠিতে থাকি, অভ্যন্তরস্থ এই হিলিয়ম-সমষ্টির সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তাহার ফলে, এই হাইড্রোজেনগুলির বন্ধন ক্রমশঃ খুব দৃঢ় হইয়া আসে ; আল্ফা কণিকা আসিয়া আর উহাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না। তাই যে-সব মৌলিক পদার্থের আণবিক সংখ্যা খুব বেশী—অর্থাৎ যাহাদের অভ্যন্তরে অনেকগুলি প্রোটন আছে—সেই সব এটম হইতে আল্ফা-কণিকার আঘাতে হাইড্রোজেন বাহির হয় নাই।

এই বার কথা উঠিল যে, আলফা-কণিকার সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে একটী এটমকে চুরমার করা যায় কি না। ধরা যাক—সোনা আর পারদ। সোনার আণবিক সংখ্যা হইল ৭৯, আর পারদের ৮০ ; কোন উপায়ে পারদ হইতে একটী প্রোটন যদি খসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তো উহা সোনায় পরিণত হইবে। জাপানে ও জার্ম্মাণিতে দুই জন বৈজ্ঞানিক চেষ্টা আরম্ভ করিলেন—আল্ফা-কণিকার সাহায্যে নয়, খুব প্রচণ্ড কয়েক হাজার ভোল্ট তড়িৎ শক্তির সাহায্যে। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা প্রমাণ পাইয়াছেন যে এইরূপ পরীক্ষায় পারদ সোনাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—অবশ্য খুবই অত্যল্প পরিমাণে।

এ'পরীক্ষার ফলাফলের উপর এখনও খুব জোর দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদার্থের গঠনের সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বাহিরের শক্তির আঘাতে পারদের সোনায় পরিবর্ত্তন একেবারে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়।

ক্রমশঃ

ফলের চাষ

৺ রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

যথারীতি ফলকর বৃক্ষের আবাদ-প্রথা এ'দেশে নিতান্তই বিরল। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ব্যবসায় হিসাবে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, সুপারী ইত্যাদি দেশীয় ফলসমূহের অল্পবিস্তর আবাদ আছে সত্য; কিন্তু উহা যথারীতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত না হওয়ার দরুণ অনেক সময় নিকৃষ্ট এবং অল্পসংখ্যক ফলপ্রদান করিয়া থাকে। বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ দেশী ও বিদেশী ফলকর বৃক্ষসমূহ দ্বারা উদ্যান-রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উদ্যানজাত বৃক্ষসমূহের শৃঙ্খলানুযায়ী সংস্থানের ত্রুটি, উদ্যানস্বামীর তত্ত্বাবধানের শৈথিল্য এবং অশিক্ষিত মালীগণের পরিচর্য্যার অভাব প্রভৃতি বিবিধ কারণে অধিকাংশ উদ্যানই আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না।

এদেশের গৃহস্থগণের বাস্তু-সংলগ্ন ফলকর বৃক্ষগুলিও অধিকাংশস্থলেই গৃহস্থগণের যত্ন ও পরিচর্য্যার অভাবে একপ্রকার বন্য অবস্থায় থাকিয়া নিকৃষ্টতর ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ফলকর বৃক্ষসমূহের জন্য যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়, এ'দেশের অধিকাংশ গৃহস্থই তাহা অবগত নহেন। তাহাদের ধারণা—গাছগুলি যখন বিনা যত্নে বাঁচিয়া থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর কিছু না কিছু ফল প্রদান করিতেছে, তখন আর উহাদের জন্য মিছামিছি যত্ন ও পরিচর্য্যার আবশ্যকতা কি? কিন্তু এ'ধারণা নিতান্তই ভ্রম-সঙ্কুল। ক্ষেত্রজাত শস্যের জন্য যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়, ফলকর বৃক্ষগুলির জন্যও সেইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিচর্য্যার দরকার। ফলকর বৃক্ষের পরিচর্য্যার বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

কোন কোন সৌখীন উদ্যানস্বামী আপনাপন উদ্যানে বিভিন্ন আবহাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার বিদেশীয় ফলকর বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ সময়ে ঐ বৃক্ষগুলিকে ফলপ্রসূ হইতে দেখা যায় না। ইহাতে একদিকে যেমন অর্থব্যয় ও মনস্তাপের কারণ হয়, তেমন অপরদিকে মিছামিছি উদ্যানের কতকগুলি স্থান আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ফলকর বৃক্ষের চাষ করিতে হইলে যে সকল ফলকর বৃক্ষ এ'দেশের আবহাওয়াতে স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উত্তম ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়, কেবল ঐগুলিই উদ্যানে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ব্যবসায়ের জন্য ফলের চাষ করিতে হইলে পৃথক পৃথক ফলের জন্য পৃথক পৃথক উদ্যান-রচনা করা কর্ত্তব্য ; কারণ বিভিন্ন প্রকার ফলের বৃক্ষের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়। সুতরাং একই উদ্যানে শ্রেণীবদ্ধভাবে একজাতীয় বৃক্ষ সুবিন্যস্ত থাকিলে পরিচর্য্যা বিষয়ে বিশেষ সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, একজাতীয় বৃক্ষের পরস্পর সান্নিধ্য হেতু এবং উহারা একই সময়ে কুসুমিত হওয়ার ফলে, উহাদের পরাগপাতন (pollination) বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য হইতে পারে। একই উদ্যানে বিভিন্ন জাতীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করিতে হইলেও, উদ্যানের বিভিন্ন অংশে বিভন্ন জাতীয় বৃক্ষসমূহ ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

বৃক্ষ-সকলের স্বাভাবিক বর্দ্ধনশীলতা এবং উৎকৃষ্ট ফলধারণক্ষমতা উহাদের অবাধ বায়ু এবং সূর্য্যকিরণপ্রাপ্তির উপরে যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভর করিয়া থাকে। মুক্ত প্রান্তর অথবা কোন প্রকার উন্মুক্ত স্থানে একক ভাবে যে সকল বৃক্ষ জন্মে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ'বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হইবে। ঐসকল স্থানে উৎপন্ন বৃক্ষ-সকল স্বভাবতঃই চতুর্দ্দিকে শাখা-বিস্তার পূর্ব্বক সম পরিসরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ নয়নাভিরাম হয়। ফলবান বৃক্ষের শাখার সংখ্যা যত অধিক হইবে, ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও তদনুপাতে বাড়িবে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুলি রৌদ্র এবং বায়ুর অল্পতানিবন্ধন বিশেষতঃ স্থানাভাব প্রযুক্ত চারিপার্শ্বে শাখাবিস্তার করিতে সমর্থ না হইয়া ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; সুতরাং ঐগুলি দুর্ব্বল ও স্বল্প শাখাবিশিষ্ট হওয়ার দরুণ নিকৃষ্ট এবং অল্পসংখ্যক ফলপ্রদান করে। কাজেই বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের পূর্ণাবস্থার আয়তন অনুযায়ী ব্যবধান নির্ণয় করিয়া তদনুরূপ ব্যবধানে ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি প্রচলিত ফলবান্ বৃক্ষ-রোপণের দূরত্ব এবং একবিঘা জমিতে কতগুলি বৃক্ষ-রোপণ করিলে উত্তমরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৃক্ষের নাম	পরস্পর কত হাত দূরে	১ বিঘাতে কতগুলি গাছ
আম্র (বীজ হইতে উৎপন্ন চারা), তেঁতুল	৩০	৭
আম্র (কলম দ্বারা উৎপন্ন চারা), কাঁঠাল	২৫	১০
কমলা, কালোজাম, গোলাপজাম	১৬	২১
দাড়িম্ব, পিচ, আতা, নোনা	১৪	৩৩
লিচু, কুল, আমড়া, কামরাঙ্গা, জলপাই, জামরুল	২২	১৪
পেয়ারা	১০	৬৪
পেঁপে, লেবু	৮	১০০
লকেট	১২	৪৫

নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে বীজ অথবা কলমের চারা রোপণ করিয়া দুই শ্রেণীর ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচ হাত পরিসর চলাচলের জন্য রাস্তা রাখিতে হইবে। অবশ্য যে-স্থলে বৃহদায়তন বৃক্ষের দুই শ্রেণীর মধ্যে অধিক ব্যবধান রাখা প্রয়োজন হয়, সেই স্থলেই রাস্তার পরিমাণ পাঁচ হাত রাখিতে হইবে; অন্যথা ব্যবধানের অল্পতার অনুপাতে রাস্তাও সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে। এই প্রকার রাস্তা দীর্ঘ ও প্রস্থের দিকে তুল্যরূপেই রাখা আবশ্যক।

ফলের বাগানের জন্য বর্ষার সময় জল দাঁড়াইয়া না থাকে এইরূপ চূণযুক্ত এঁটেল, দোঁয়াশ মাটি সবিশেষ উপযোগী। নির্ব্বাচিত জমি অসমতল থাকিলে উদ্যান-রচনার পূর্ব্বে কাটিয়া ভরিয়া উহা এমনভাবে সমতল করিয়া লইতে হইবে যেন কোন স্থানে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে; এবং জল-নিকাশের জন্যও মাঝে মাঝে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী রাখিতে হইবে।

ফলের বাগানের জমি শস্যক্ষেত্রের ন্যায় লাঙ্গল ইত্যাদি সহযোগে কর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে যে সকল স্থানে চারা বসাইতে হইবে, ঐ সকল স্থানের দু'হাত ব্যাসবিশিষ্ট মাটি দু'হাত গভীর ভাবে খনন করিয়া লইয়া ঐ মাটি উত্তমরূপে সারযুক্ত করিয়া লইতে হইবে; এবং অন্ততঃ একমাস পরে ঐ সকল স্থানে চারা রোপণ করিবে।

বীজ-জাত চারা 'হাপর' হইতে একবার স্থানান্তরিত করিয়া উহা বেশ সতেজ হইলে, পুনরায় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। 'হাপর' হইতে তুলিয়াই স্থায়ীভাবে রোপণ করা উচিত নহে। চারাগুলি ঐরূপে একবার স্থানান্তরিত করিবার পর পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে। কাহার কাহারও মতে পূর্ণ দুই বৎসর বয়সে চারা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করিবার উপযোগী হয়। স্থায়ীভাবে রোপণের সময় উহাদের প্রধান মূলের অগ্রভাগ হইতে কতক অংশ ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; উহাতে গাছগুলি ভবিষ্যতে উচ্চতার দিকে বৃদ্ধি না পাইয়া চারিপাশে শাখাবিস্তার পূর্ব্বক প্রস্থের দিকে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্থানান্তর হইতে চারা ক্রয় করিয়া আনিলে উহা স্থায়ী-ভাবে রোপণ করিবার পূর্ব্বে কিছুকালের জন্য অন্য স্থানে রোপণ করিয়া জলসিঞ্চন ইত্যাদি পরিচর্য্যার দ্বারা উহাকে একটু সবল করিয়া লইয়া, পরে স্থায়ীভাবে রোপণ করা উচিত। চারাগুলি 'হাপর' কিম্বা অন্য স্থান হইতে তুলিবার সময় যাহাতে উহাদের চারিপাশের শিকড়গুলি অধিক পরিমাণে ছিঁড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 'হাপর' হইতে তুলিবার পূর্ব্বে 'হাপরে'র মাটি জলসিঞ্চন দ্বারা নরম করিয়া লইয়া তৎপর অধিক মাটিসহ চারা উত্তোলন করিতে হইবে।

কলমের চারাও মাতৃবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার পরই স্থায়ীভাবে রোপণ না করিয়া কিছুকাল ভিন্ন স্থানে রোপণ করিয়া একটু সবল হইলে পরে স্থায়ীভাবে রোপণ করা কর্ত্তব্য। জোড়-কলমে জোড়া স্থান মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া দিতে হইবে। জোড়ার স্থান গোড়া হইতে ৪।৫ ইঞ্চির অধিক উচ্চ হইলে বেশী দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে প্রোথিত না করিলেও হয়। কিন্তু

জোড়া স্থানের নীচের কাণ্ডে উদ্গত কুঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার; এবং চারা বসাইবার পরেও যখনই ঐস্থানে নূতন কুঁড়ি উদ্গত হইবে, তখনই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা উপরের মাতৃবৃক্ষস্থ শাখা সবল হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে। সকল অবস্থাতেই কলম স্থানান্তরিত করিবার সময় অধিক মৃত্তিকাসহ উহা উত্তোলন করা কর্ত্তব্য। বীজ-জাত অথবা কলমের চারা স্থায়ীভাবে রোপণ করিবার পরে ঐগুলি রীতিমত বসিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবশ্যক অনুযায়ী জলসিঞ্চন করিতে হইবে।

চারা-রোপণের পর ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ঐগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত—'খুস্‌কি'র দিনে মাঝে মাঝে জলসিঞ্চন করা আবশ্যক হয়। জলসিঞ্চনের জন্য গাছের চারিপাশে ঘুরাইয়া নালা কাটিয়া লইতে হইবে—ঐরূপ নালা 'আলবাল' নামে খ্যাত। আলবালের খনিত মৃত্তিকা উহার চারিপাশে আইলের আকারে মুড়াইয়া রাখিতে হয়; ইহাতে আলবালের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঐ সকল আলবাল জল দ্বারা একেবারে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। অনাবৃষ্টির সময় সপ্তাহে দুইবার এইরূপ জলসিঞ্চন করা প্রয়োজন। জলাশয় হইতে 'দোন' অথবা অন্য কোন প্রকার যন্ত্রাদি দ্বারা জলসিঞ্চনের সুবিধা থাকিলে, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহের আলবালগুলি নালা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া জলসিঞ্চনের সুব্যবস্থা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

ফলের বাগান সর্ব্বদা আগাছা-শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ, সর্ব্বত্রই ফলের বাগানে উলুখড় জন্মিয়া থাকে। উলুখড় মৃত্তিকার রস অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া উহাকে নীরস করিয়া ফেলে এবং সেইজন্যই ঐস্থানের অন্যান্য বৃক্ষসমূহ বিশেষ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাগানের উলুখড়ের প্রথম আবির্ভাবমাত্রই মূলসহ উৎপাটন করিয়া ঐগুলিকে বিনাশ না করিতে পারিলে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত বাগান ছাইয়া ফেলে, তখন ঐগুলিকে ধ্বংস করা আয়াস ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। অনেকের ধারণা—কেবল প্রত্যেক গাছের গোড়ার চারিদিকে কতক অংশ আগাছা-শূন্য করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু এ'ধারণা নিতান্তই ভ্রম-মূলক; কারণ প্রত্যেক বৃক্ষের শিকড়ই মৃত্তিকার নিম্নে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্যানজাত বৃক্ষসমূহের শিকড়গুলি উদ্যানের সমস্ত অংশই একেবারে ছাইয়া ফেলে।

আগাছা এবং পরগাছা উভয়ই ফলবান বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। পরগাছাগুলি বৃক্ষের শাখাতে জন্মিয়া ছালের মধ্যে শিকড় বিদ্ধ করিয়া ঐ বৃক্ষেরই সংগৃহীত খাদ্য-রস দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ফলে, মূল বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়; এবং ঐ পরগাছই ক্রমে সবল হইয়া কাণ্ডের সর্ব্বত্র আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং কোন বৃক্ষের পরগাছার আবির্ভাব হওয়া মাত্র উহা বৃক্ষশাখা হইতে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

ফলবান বৃক্ষগুলির পুষ্পোদ্গমের কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতি বৎসর উহাদের গোড়ার মাটি কোদালী দ্বারা খুঁড়িয়া শিকড়ের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিতে হয়; এবং সম্ভব হইলে নিম্নগামী মূল-শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া দেওয়া উচিত এবং পার্শ্বগামী শিকড়গুলির মধ্যে হইতেও

কতক কতক ছাটিয়া ফেলিতে হয়। মূল-শিকড় কাটিয়া দিলে বৃক্ষগুলি উপরের দিকে অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না ; এবং পার্শ্ববর্ত্তী শিকড় কাটিয়া দেওয়ার দরুণ বৃক্ষতেজ কিয়ৎপরিমাণ হ্রাস হইয়া ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে বৃক্ষমূলে যথেষ্ট পরিমাণ জল-সিঞ্চনের আবশ্যক হয়।

ফলবান বৃক্ষের ফল নিঃশেষ হইয়া গেলেই প্রতি বৎসর উহার পুরাতন শাখাগুলির উপরের অংশ কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহাতে একদিকে যেমন বৃক্ষের আকৃতি সুন্দর হয়, অপরদিকে তেমন উহার ফলেরও উৎকর্ষলাভ হইয়া থাকে।

ফলের উদ্যানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রাচীর অথবা মজবুত বেড়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রাচীর অথবা বেড়া দ্বারা উদ্যান সুরক্ষিত না করিলে ছোট অবস্থায় গাছগুলি গবাদি পশু দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে এবং উদ্যানের ফল চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া উদ্যান-স্বামীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। লৌহ-তার কিম্বা কোন প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া তদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে বেড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। যাহারা একই উদ্যানে বিবিধ জাতীয় ফলকর বৃক্ষ উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণে উদ্যান রচনা করা যুক্তিসঙ্গত।

প্রথমতঃ, উদ্যানের দেওয়াল বা বেড়ার নিকট কাঁঠাল, কালোজাম, গোলাপ জাম প্রভৃতি বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। তৎপর ৬ হাত পরিমাণ রাস্তা রাখিয়া রাস্তার অপর পারে—প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে অন্ততঃ ১২ হাত অন্তরে—দ্বিতীয় সারিতে পেয়ারা, আতা, নোনা লিচু, লকেট প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে হইবে। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া এই দুই শ্রেণী বৃক্ষ-রোপণের পর উদ্যানের মধ্যস্থানে যে ভূমি অবশিষ্ট থাকিবে, উহাকে অবস্থানুযায়ী লম্বালম্বি অথবা পাশাপাশি ভাবে কয়েকটী খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইবে ; এবং উহার প্রত্যেক দুই খণ্ডের মধ্যে ৬ হাত পরিমাণ এক একটি রাস্তা রাখিয়া দিবে। এখন এ'সকল বিভিন্ন খণ্ডে ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ফলকর বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। ইহার মধ্যে আমের জন্য অধিক স্থান নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। দুই একটি খণ্ডে এ'দেশের আবহাওয়ার উপযোগী বিদেশী ফলের চারাও রোপণ করা যুক্তিযুক্ত।

প্রত্যেক উদ্যানের মধ্যেই জল-সিঞ্চনের সুবিধার জন্য এক একটি জলাশয় খনন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ জলাশয়-খনিত মৃত্তিকা জলাশয়ের চারিপাশের ভূমিতে ফেলিয়া ঐ স্থানে উত্তম কলার চাস হইতে পারে। কলার চাষ অতিশয় লাভজনক। এমন কি, দুই বৎসরের কৃষিলব্ধ কলা এবং তেউরের মূল্য দ্বারা পুষ্করিণী খননের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যায়। ঐ পুষ্করিণীর পাড়ের উপরে লেবু, পাতিলেবু, কাগজী প্রভৃতির চাষ দ্বারাও বিস্তর আয় করা যায়।

কৈশিক ব্যাপার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৪। লাপ্লাসের সূত্র-প্রয়োগে কৈশিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা

কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে তরল দ্রব্যের আকৃতি—মিলনকোণ

তরল দ্রব্যমাত্রেরই একটা কঠিন আধারের প্রয়োজন। দেখা যায়, কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলেই তরল দ্রব্যের আকৃতিটা বদলাইয়া যায়—যে স্থানে উহাদের মিলন ঘটে, ঐ স্থানে তরলের পিঠটা কঠিনের পিঠের উপরে হেলিয়া পড়ে; এবং ইহার ফলে ঐ সংযোগস্থলে তরলের পিঠটা বক্রাকার ধারণ করে। কঠিনের পিঠের সহিত
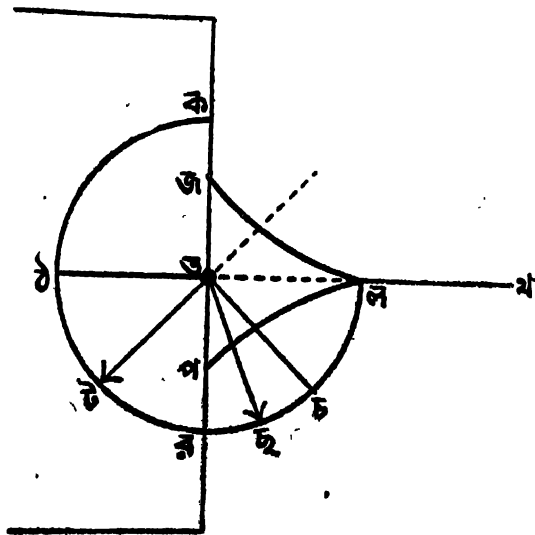
১৪ নং চিত্র

তরলের পিঠটা যে কোণ করিয়া অবস্থিত হয়, উহাকে উহাদের 'মিলন-কোণ' (Angle of Contact) বলা যায়। এই কোণটা কোনও ক্ষেত্রে সূক্ষ্মকোণ, কোনও ক্ষেত্রে স্থূলকোণ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই উহা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হইয়া থাকে। কেন এইরূপ হয়, তাহা সহজেই দেখা যাইতে পারে। 'ত থ' একটা তরল দ্রব্যের সমতল পিঠ (১৪ নং চিত্র)। উহার অভ্যন্তরে একটা কঠিন পদার্থের পিঠকে খাড়াভাবে ('ক র' রেখাক্রমে) ডুবাইয়া ধরা গিয়াছে। তরল দ্রব্যের 'ত' কণাটা কঠিন ও তরল

দ্রব্যের পিঠের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ঐ কণাটার উপরে এতক্ষণ কেবল তরল দ্রব্যের আকর্ষণই বিদ্যমান ছিল এবং এই আকর্ষণটা ছিল নীচের দিকে ('ত থ' পিঠের লম্বরেখাক্রমে)। এখন, বাঁ দিককার তরল কণাগুলি দূরীভূত হওয়ার ফলে, ঐ আকর্ষণটার দিক ও পরিমাণ উভয়ই বদলাইয়া যাইবে; এবং কঠিন পদার্থের আবির্ভাব হেতু একটা নূতন আকর্ষণের সৃষ্টি হইবে। ফলে, 'ত' কণার পক্ষে এখন দু'টা আকর্ষণের এলাকা স্বীকার করিতে হইবে—তরল পদার্থের জন্য 'তরল' গোলকাংশটা এবং কঠিন পদার্থের জন্য 'ক ঠ র' গোলার্দ্ধটা।* প্রথম অংশের জন্য আকর্ষণটা হইবে 'ত চ' রেখাক্রমে এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য 'ত ঠ' রেখাক্রমে। মোট আকর্ষণটা দাঁড়াইবে ঐ দুই রেখার মাঝামাঝি একটা দিকে। যদি তরল দ্রব্যের আকর্ষণটাই প্রবল হয়, তবে মোট আকর্ষণটা 'ত ছ' দিক বরাবর, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ডাহিন দিকে হেলিয়া; এবং যদি কঠিন দ্রব্যের আকর্ষণটা প্রবল হয়, তবে উহা 'ত ট' দিক বরাবর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বাম দিকে হেলিয়া অবস্থান করিবে।

এখন তরল দ্রব্যের একটা ধর্ম্ম হইতেছে এই যে, উহার পিঠের কোনও একটা কণার উপরে মোট আকর্ষণটা যে-দিকে হইবে, ঐ স্থানে তরল দ্রব্যের পিঠটা তাহার আড়ভাবে অবস্থিত হইবে। সুতরাং, যদি তরল দ্রব্যের আকর্ষণটা অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, তবে 'ত'-স্থানে উহার পিঠটা 'ত ছ' রেখার আড়ভাবে অথবা 'প ল' রেখা বরাবর অবস্থান করিবে;—অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় মিলন-কোণটা ('র প ল' কোণটা) স্থূলকোণ হইবে এবং কঠিন পদার্থের কাছাকাছি তরল দ্রব্যের পিঠটা কুব্জাকার ধারণ করিবে। আর যদি কঠিন পদার্থের আকর্ষণটা অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, তবে উক্ত স্থলে তরল দ্রব্যের পিঠটা 'ত ট' রেখার আড়ভাবে অথবা 'জ ল' রেখা বরাবর অবস্থান করিবে; অর্থাৎ এ'রূপ ক্ষেত্রে মিলন-কোণটা ('ল জ ত' কোণটা) সূক্ষ্মকোণ হইবে এবং সংযোগস্থলে তরল দ্রব্যের পিঠটা ন্যুব্জাকার ধারণ করিবে। উভয় ক্ষেত্রেই মিলন-কোণটা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হইবে।

দেখা যায়, কাঁচ ও পারদের পক্ষে মিলন-কোণটা স্থূলকোণ হইয়া থাকে এবং কাঁচের পিঠের কাছাকাছি পারদের পিঠটা কুব্জাকার ধারণ করে। কাঁচ ও জলের পক্ষে ঐ কোণটাকে সূক্ষ্মকোণ হইতে দেখা যায় এবং জলের পিঠটা কাঁচের কাছাকাছি ন্যুব্জাকার ধারণ করিয়া থাকে। যে সকল তরল দ্রব্যের কণা কঠিন পদার্থের আকর্ষণ-এলাকারূপ ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে থাকে, তাহাদের উপরে কঠিন পদার্থের আকর্ষণ থাকে না; সুতরাং তরল দ্রব্যের পিঠের বক্রতাও একটু দূরে সরিলেই আর লক্ষ্য করা যায় না।

উক্ত আলোচনায় আমরা মাধ্যাকর্ষণটাকে হিসাবের মধ্যে আনি নাই। 'ত' কণার উপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবটা হইবে নীচের দিকে বা 'ত র' রেখাক্রমে; সুতরাং উহার উপরে

* এই গোলক দু'টার ব্যাস সমান—চিত্রে এইরূপ দেখান হইয়াছে; কিন্তু ঐরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

মোট আকর্ষণটাও 'ত ছ' বা 'ত ট' বা উহাদের কাছাকাছি একটা দিক বরাবর হইবে; —অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের ফলে মিলন-কোণটা কিছু ভিন্ন পরিমাণের হইলেও, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণেরই হইবে।

কাঁচের নলে জলের উর্দ্ধগতি

আমরা পূর্ব্বে ('প্রকৃতি'—৪১৫ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছি যে, মাধ্যাকর্ষণ বা অপর কোনও বলের অভাবে সাম্যাবস্থায় তরল দ্রব্যের পিঠটা সর্ব্বত্র সমান বাঁকা হইয়া থাকে; এবং কোনও কারণে যদি ঐ বক্রতার ইতরবিশেষ ঘটে, তবে পিঠের সমতল অংশের ঠিক নীচেই চাপের মাত্রা যাহা হয়, উহার কুব্জ বা ন্যুব্জ অংশের নীচে চাপটা তাহা অপেক্ষা (ব × ছ) পরিমাণে বেশী বা কম হইয়া থাকে (৫ নং সমীকরণ)। সুতরাং পিঠটা কোথাও কম বাঁকা, কোথাও বেশী বাঁকা —এইরূপ আকার লইয়া তরল দ্রব্যের সাম্যাবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না; অথবা ইহা সম্ভব হয়, যদি বাহির হইতে উহার কণাগুলির উপরে মাধ্যাকর্ষণ অথবা ঐরূপ কোনও একটা বলের ক্রিয়া হইতে থাকে।

এখন জড়কণামাত্রই মাধ্যাকর্ষণ বলের অধীন এবং এই বলের প্রভাবেও তরল দ্রব্যের অভ্যন্তরে একটা চাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই চাপের মাত্রাটা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। দেখা যায়, তরল দ্রব্যের যতই নীচে নামা যায়, মাধ্যাকর্ষণজনিত উহার চাপটাও ততই বাড়িতে থাকে; অর্থাৎ উহার যে তলটা ধরাপৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে অবস্থিত, তাহার সর্ব্বত্রই ঐ চাপটা সমান হইয়া থাকে; এবং এইরূপ দুইটা তলের একটা যদি অপরটার 'ন' পরিমিত নীচে অবস্থিত হয়, তবে সাম্যাবস্থার জন্য, নীচের তলে চাপের মাত্রাটা—আয়তন 'এক' পরিমিত তরল দ্রব্যের এইরূপ একটা অংশের ওজনকে যদি 'জ' বলা যায়—(জ × ন) পরিমাণে অধিক হইবার আবশ্যক হয়।

মোটের উপরে দেখা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণ বল প্রযুক্ত হইবার ফলে, পিঠের বক্রতাভেদ সত্ত্বেও, তরল দ্রব্য স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু এ'জন্য পিঠের কুব্জাকার অংশটা (অর্থাৎ যেখানে চাপ বেশী) উহার সমতল প্রদেশের নীচে এবং ন্যুব্জাকার অংশটা (যেখানে চাপ কম) ঐরূপ প্রদেশের উপরে অবস্থিত হইবার দরকার। আরও দেখা যায় যে, ঐরূপ একটা অংশের বক্রতা যদি 'ব' পরিমিত হয় এবং উহা সমতল পিঠের 'ন' পরিমিত নীচে বা উপরে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তবে ঐ দু'টা রাশির মধ্যে নিম্নোক্ত সম্বন্ধটা খাটিবে—

$$ব \times ছ = জ \times ন \cdots\cdots(২৩)$$

একটা সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাঁচের নল জলে ডুবাইয়া ধরিলে নলের ছিদ্রপথের ভিতর দিয়া জল অনেকটা উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে—ইহা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ:—

মনে করা যা'ক, সমতল-পৃষ্ঠ জলের মধ্যে 'ক খ গ ঘ' কাঁচের নলটাকে খাড়াভাবে ডুবাইয়া

ধরা গিয়াছে (১৫নং চিত্র)। ডুবান মাত্র নলের ভিতরে জল ঢুকিবে এবং ভিতরের জলের পিঠটা বাহিরের জলের পিঠ বরাবর ('স স' রেখাক্রমে) 'চ'-স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে। তরল পদার্থমাত্রেরই এইরূপ চেষ্টা বিদ্যমান। কিন্তু কৈশিক আকর্ষণ জন্য ভিতরের পিঠটা ন্যুব্জাকার ('খ চ গ' আকার) ধারণ করিবে। ফলে, ন্যুব্জপিঠের ঠিক নীচেই চাপের মাত্রাটা কমিয়া যাইবে ; অর্থাৎ সমতল পৃষ্ঠের ঠিক নীচেই (বা 'স' স্থানে) চাপের মাত্রা যাহা, 'চ' স্থানের চাপটা তাহা অপেক্ষা (ব × ছ) পরিমিত কম হইবে। সুতরাং ভিতরকার জলের পিঠটা উহার ন্যুব্জাকার বজায় রাখিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে এবং খানিকটা উঠিয়া—'ক ছ ঘ'
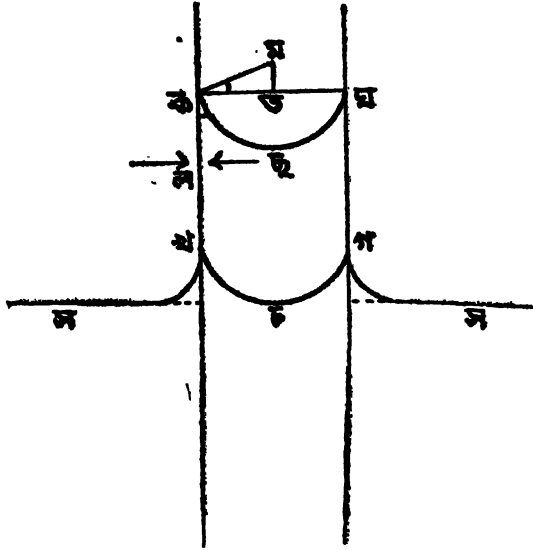
১৫ নং চিত্র

স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ পিঠের বক্রতা যদি 'ব' পরিমিত হয় এবং সাম্যাবস্থায় উহার উচ্চতা ('চ ছ' রেখার দৈর্ঘ্য) যদি 'ন' পরিমিত হয়, তবে 'ব' ও 'ন'-এর মধ্যে ২৩নং সম্বন্ধটা খাটিবে ; অর্থাৎ—

$$ন = \frac{ছ}{জ} \times ব \quad \text{পরিমিত হইবে.........(২৪)}$$

একটা বিশিষ্ট তরলদ্রব্যের পক্ষে 'ছ' ও 'জ' নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হইয়া থাকে ; সুতরাং 'ন' ও 'ব' পরস্পরের সমানুপাতিক হইবে। অর্থাৎ তরলদ্রব্য কতটা উর্দ্ধে উঠিবে, তাহা ভিতরকার ন্যুব্জপিঠের বক্রতার উপরে নির্ভর করিবে ; এবং ঐ বক্রতাটা যত অধিক হইবে, তরল পদার্থও ততই উর্দ্ধে উঠিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই সম্বন্ধটা সকল তরল দ্রব্যের পক্ষেই খাটিবে।

নলের ছিদ্রটা মোটা হইলে 'চ' স্থানটা নল হইতে দূরে অবস্থিত হইবে; সুতরাং ঐ স্থানে ভিতরকার জলের পিঠটাও সমতল হইবে। ফলে, মোটা ছিদ্রবিশিষ্ট নলে ভিতরকার জলের পিঠ বাহিরের পিঠ ছাড়িয়া উপরে উঠিবে না—কেবল নলের সহিত সংযোগস্থলে উহা একটু-খানি উচু হইয়া নলের গায়ে হেলিয়া অবস্থান করিবে। বাহিরের জলটাও, নলের সহিত সংযোগস্থলে, ঐভাবে অবস্থান করিয়া থাকে (১৫নং চিত্র)।

ছিদ্রটা খুব সরু হইলেই ভিতরকার জলের পিঠটা আগাগোড়া ন্যুজাকার ধারণ করে এবং—সমতার অনুরোধে—'চ' স্থানে উহার বক্রতার পরিমাণ সকল দিকে সমান হইয়া ঐ পিঠটা গোলকের আকার প্রাপ্ত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে বক্রতাটাকে আমরা 'ব' পরিমিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সরু নলের পক্ষে, উহা একটা গোলকের বক্রতা নির্দ্দেশ করে।

নলের ব্যাসের সহিত এই গোল পিঠের বক্রতার একটা সম্বন্ধ সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে; এবং এইরূপে ২৪নং সমীকরণে 'ন'-এর সহিত নলের ব্যাসের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা দেখা যাইতে পারে।

নলের ব্যাসার্দ্ধকে (অর্থাৎ ছিদ্রপথের ব্যাসার্দ্ধকে) আমরা 'র' দ্বারা নির্দ্দেশ করিব; এবং 'ক ছ ঘ' গোলকের মধ্যবিন্দুকে 'ম' ও 'ক ঘ' রেখার বা নলের ব্যাসের মধ্যবিন্দুকে 'ত' বলিব। সুতরাং

'ক ছ ঘ' গোলকের বক্রতা বা 'ব' $= \frac{২}{কম}$ ['প্রকৃতি'—৪২২ পৃ]

$$= \frac{২}{কত} \times \frac{কত}{কম} = \frac{২}{র} \times \frac{কত}{কম}$$

সহজেই দেখা যায়, 'ম ত' রেখাটা 'ক ঘ' রেখার উপরে লম্বভাবে অবস্থিত হইবে এবং উক্ত $\frac{কত}{কম}$ ভগ্নাংশটা মাত্র 'ত ক ম' কোণের উপরে নির্ভর করে—এইরূপ একটা বিশিষ্ট রাশি হইবে। এই সম্বন্ধনির্দ্দেশ-জ্ঞাপক উক্ত ভগ্নাংশটাকে কস্ 'ত ক ম'—এইরূপ বলা যায়।

আরও দেখা যাইবে যে, 'ত ক ম' কোণটা 'খ ক ছ' কোণটার অর্থাৎ তরল ও কঠিনের মিলন-কোণটার সমান। এই মিলন-কোণটাকে আমরা 'মি' চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিব; সুতরাং

$\frac{কত}{কম}$ = কস্ 'ত ক ম' = কস্ 'মি'। ফলে,

$$ব = \frac{২}{র} \times \text{কস্ 'মি'} \cdots\cdots (২৫)$$

এখানে 'মি' বা মিলন-কোণটা একটা নির্দ্দিষ্ট কোণ। সুতরাং এই সম্বন্ধ হইতে দেখা যায় যে, নলের ব্যাসার্দ্ধ যত ছোট হইবে—অর্থাৎ নলটা যত সরু হইবে—নলের ভিতরকার জলের

পিঠের বক্রতাও ততই বেশী হইবে। 'ব'-এর উক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া ২৪ নং সমীকরণটাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

$$ন = \left(২\ \frac{ছ}{জ} \times কস্\ 'মি'\right) \times \frac{১}{র} \text{......(২৬)}$$

এই সম্বন্ধ হইতে দেখা যায় যে, নলের ব্যাসার্দ্ধ ('র') যে অনুপাতে ছোট হইবে, ভিতরকার জলটাও সেই অনুপাতে উচু হইয়া দাঁড়াইবে। এই সম্বন্ধটাও যেমন জলের পক্ষে, সেইরূপ সকল তরল দ্রব্যের পক্ষেই খাটিবে।

জল ও কাঁচের পক্ষে মিলন-কোণটাকে প্রায় শূন্য পরিমিত হইতে দেখা যায়। এ'রূপ স্থলে 'ত ক ম' কোণটাও শূন্য পরিমিত হয়; 'ম' বিন্দুটা 'ত' বিন্দুর সহিত মিলিয়া যায় এবং কস্ 'মি' বা $\frac{কত}{কম} = ১$ পরিমিত হয়। সুতরাং কাঁচের নল ও জলের পক্ষে—

$$ন = \frac{২ছ}{জ} \times \frac{১}{র} \text{.........(২৭)}$$

এই সম্বন্ধটা খাটিবে।

কাঁচ ও পারদের বেলায় মিলন-কোণটা স্থূলকোণ হয়; নলের মধ্যে পারদের পিঠটা কুব্জাকার ধারণ করে এবং উহা নল বাহিয়া 'ন' পরিমিত নীচে নামিয়া যায়। এইরূপ স্থলেও ২৬ নং সূত্রটা প্রয়োগ করা যাইবে।

উপরের হিসাবে নলের ছিদ্রটাকে আমরা আগাগোড়া সমান সরু বলিয়া অনুমান করিয়াছি। এ'রূপ না হইলেও উক্ত সম্বন্ধ খাটিবে—কেবল নলের ব্যাসার্দ্ধ (বা 'র') অর্থে তরল পদার্থটা যে স্থান পর্য্যন্ত ওঠে বা নামে, নলের ঐ স্থানটার ব্যাসার্দ্ধ বুঝিতে হইবে; কেন না, যে বক্রতার উপরে 'ন'-এর মূল্য নির্ভর করে, তাহা ঐ স্থানের ব্যাসার্দ্ধ দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে।

সমান্তরাল কাঁচের প্লেটের মধ্যে জলের ঊর্দ্ধগতি

সমতল-পৃষ্ঠ জলের মধ্যে 'ক খ' ও 'গ ঘ' চিহ্নিত দু'খানা কাঁচের প্লেটকে (১৫ নং চিত্র) সমান্তরালভাবে এবং খাড়াভাবে ডুবাইয়া ধরা গিয়াছে। প্লেট দু'খানার অন্তর্গত জলের পিঠটা এ'ক্ষেত্রেও কাঁচের প্লেটের সহিত একটা সূক্ষ্মকোণ করিয়া অবস্থান করিবে; এবং উহারা খুব কাছাকাছি অবস্থিত হইলে এ'ক্ষেত্রেও ঐ পিঠটা আগাগোড়া ন্যুব্জাকার ধারণ করিবে। কিন্তু নলের পক্ষে এই পিঠটা ছিল গোলাকার; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা স্তম্ভাকার হইবে। এ'স্থলেও ২৪ নং সমীকরণটা খাটিবে,—কেবল 'ব' অর্থে এখানে গোল পিঠের বক্রতা না বুঝিয়া স্তম্ভপিঠের বক্রতা বুঝিতে হইবে। এই স্তম্ভপিঠের ব্যাসার্দ্ধও হইবে 'ক ম' পরিমিত; সুতরাং এ'স্থলে

$$ব = \frac{১}{কম}$$ ['প্রকৃতি'—৪২২ পৃ]

$$= \frac{কস্'মি'}{কত} \quad \left[কেন\ না,\ কস্'মি' = \frac{কত}{কম} \right]$$

$$= ২\frac{কস্'মি'}{ক\ ঘ} \quad [কারণ,\ 'কঘ' = ২ \times কত]$$

'ক ঘ' রেখাটা প্লেট দু'খানার মধ্যে দূরত্ব নির্দ্দেশ করে। এই দূরত্ব বুঝাইতে যদি 'দ' চিহ্ন ব্যবহার করা যায়, তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—

$$ব = ২\ \frac{কস্'মি'}{দ} \ldots\ldots\ldots\ldots(২৮)$$

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ২৪ নং সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে :—

$$ন = \left(২\ \frac{ছ}{জ} \times কস্'মি'\right) \times \frac{১}{দ} \ldots\ldots\ldots(২৯)$$
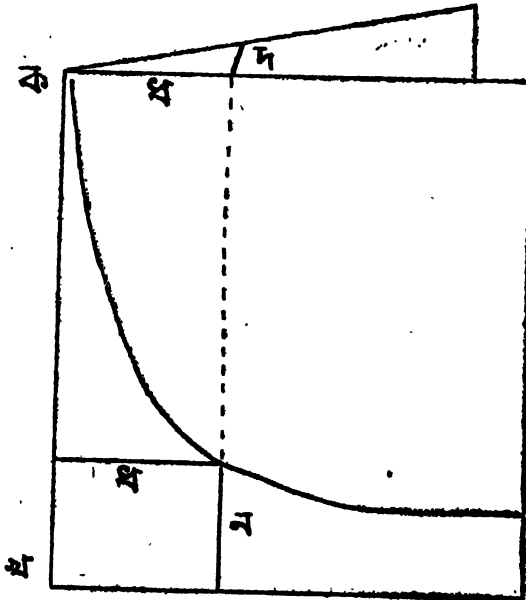
১৬ নং চিত্র

ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্লেট দু'খানা যত কাছাকাছি হইবে, বা 'দ' যে অনুপাতে কম হইবে, উহাদের অন্তর্গত জলের পিঠের উচ্চতাও সেই অনুপাতে বেশী হইবে। এই সম্বন্ধটার সহিত ২৬ নং সমীকরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্লেট দু'খানার ব্যবধান ('দ') যদি পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের কাঁচের নলের ব্যাসার্দ্ধের ('র'-এর) সমান হয়, তবে 'ন'-এর মূল্যও উভয়

স্থানে সমান হইয়া থাকে ; আর ঐ ব্যবধানটা যদি নলের ব্যাসের সমান হয়, তবে 'ন'টা নলের পক্ষে যাহা হইবে, প্লেটের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র হইবে।

প্লেট দু'খানা যদি জলের মধ্যে ঠিক সমান্তরালভাবে অবস্থিত না হইয়া ১৬ নং চিত্রের মত পরস্পরের দিকে ঈষৎ পরিমাণে হেলিয়া অবস্থান করে, তবে উহাদের সংযোগস্থল বা 'ক খ' রেখা হইতে যত দূরে সরা যাইবে, প্লেট দু'খানার অন্তর্গত দূরত্ব বা 'দ'-ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে এবং ২৯ নং সমীকরণের 'ন'-এর মূল্যটাও ততই কমিতে থাকিবে ; ফলে, (ন × দ) অথবা (ন × ধ) একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি—এই সম্বন্ধটা বজায় রাখিয়া উভয় প্লেটের অন্তর্গত ন্যুব্জপিঠটা চিত্রে প্রদর্শিত রেখার মত একটা বক্ররেখাক্রমে অবস্থান করিবে। এইরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বক্ররেখাকে ইংরাজীতে Rectangular Hyperbola বলে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহাকে "কৈশিক রেখা" বলা যাইতে পারে।

ভাসমান দ্রব্যের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ

তরল দ্রব্যে ভাসমান পদার্থসমূহ যথা—খড়-কুটা, দু'খানা দেশলাইএর কাঠি, দুইটুক্‌রা সোলা বা কর্ক প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দেখা যায়, উভয় পদার্থই যদি ঐ তরল দ্রব্যে ভিজিয়া যায় অথবা কোনটাই যদি না ভিজে, তবেই উহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ; যদি একটা মাত্র ভিজে, তবে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুইটুক্‌রা সোলার কথা ধরা যা'ক। জলে ভাসাইয়া দিলে সোলা দু'খানা ভিজিয়া উঠিবে এবং উহারা খুব কাছাকাছি থাকিলে উভয়ের অন্তর্গত জলের পিঠটা (১৫ নং চিত্র) ন্যুব্জাকার—'খ চ গ' আকার—ধারণ করিবে ; এবং ঐ পিঠটা খানিকটা উচুতে উঠিয়া 'ক ছ ঘ'-এর মত স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ অবস্থায় বাম পার্শ্বের সোলাটার 'ক খ' পিঠের উপরে দু'দিক হইতে চাপ পড়িবে—বাঁ দিক হইতে বায়ুর চাপ ঐ পিঠটাকে ডাহিন দিকে ঠেলিবে এবং ডাহিন দিক হইতে জলের চাপ উহাকে বাঁ দিকে ঠেলিয়া ধরিবে। বায়ুর চাপটা ঐ পিঠের সর্ব্বত্রই সমান হইবে ; কিন্তু জলের চাপ উহার এক এক স্থলের পক্ষে এক এক পরিমাণের হইবে। 'ল' স্থানটার কথা বিবেচনা করিলে (১৫ নং চিত্র) দেখা যাইবে যে, এই স্থানটা সমতল পৃষ্ঠ হইতে 'ল চ' পরিমিত উর্দ্ধে অবস্থিত। সুতরাং সমতল পিঠের উপরে চাপের মাত্রা যাহা, 'ল' স্থানে চাপটা তাহা অপেক্ষা (জ × ল চ) পরিমাণে কম হইবে ; অর্থাৎ 'ল' স্থানের একটা টুক্‌রা অংশের উপরে, মোটের উপর ডাহিন দিকে, ঐ পরিমাণের একটা চাপ পড়িবে। এইরূপ ঐ পিঠের প্রত্যেক অংশের পক্ষে—ঠিক একই কারণ বশতঃ—ডাহিনের সোলাটার 'গ ঘ' পিঠের উপরে মোটের উপর বাঁ দিকে একটা চাপ পড়িবে। ফলে, ভাসমান সোলা দু'খানা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া পরস্পরে মিলিত হইবে।

সোলা দু'খানা দূরে দূরে থাকিলে মাঝখানকার জলের পিঠটা সমতল হইবে এবং যথাস্থানেই রহিয়া যাইবে; উহারা যতই কাছাকাছি হইবে, ভিতরকার জলটাও ততই বাঁকা হইয়া ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে এবং সোলা দু'খানাও ক্রমবর্দ্ধিত বেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হইবে।

সোলা দু'টাকে তৈলাক্ত করিয়া ভাসাইয়া দিলে জলের সহিত উহাদের মিলন-কোণটা স্থূলকোণ হইবে; মাঝখানকার জলের পিঠটা কুব্জাকার হইবে এবং উহা উর্দ্ধে না উঠিয়া নীচে নামিয়া যাইবে। এ'রূপ ক্ষেত্রেও ঠিক উক্তরূপ কারণ বশতঃ উহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

কিন্তু যদি কেবল একটা সোলাকে তৈলাক্ত করা যায়, তবে মিলন-কোণটা একটা সোলার পক্ষে সূক্ষ্মকোণ এবং অপরটার পক্ষে স্থূলকোণ হয়; মাঝখানকার জলের পিঠটা একটার কাছাকাছি ন্যুব্জাকার হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং অপরটার কাছাকাছি কুব্জাকার হইয়া নীচে নামিয়া যায়। ফলে, জলের চাপটা একটা সোলার পক্ষে বায়ু-চাপের তুলনায় ছোট এবং অপরটার পক্ষে বায়ুচাপের তুলনায় বড় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ স্থলে আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ দেখা যায়।

বিবাহাদি ব্যাপারে কোন কোনও স্থলে একটা প্রথা আছে এই যে, একটা হাঁড়ির ভিতরে জল রাখিয়া উহার মধ্যে দু'টুক্‌রা সোলা ভাসাইয়া দিতে হয়; এবং জলটাকে নাড়িয়া দিয়া দেখিতে হয়, শেষটা সোলা দু'খানা পরস্পরে সংযুক্ত হয় কি না। পরস্পরে মিলিত হইলে উহা শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পরীক্ষায় এ'টা জানা থাকা উচিত যে, সোলাই হউক, অথবা অপর যে কোন পদার্থই ব্যবহার করা যাক'—উভয় টুক্‌রাই জলে ভিজে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই সকল উদাহরণ সম্পর্কে একটা দেখিবার বিষয় রহিয়াছে এই যে, জড় হউক, বা অজড় হউক, দুইটা পদার্থকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখিলে আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, এই ব্যাপারে ঐ দু'টা পদার্থের অস্তিত্বই বুঝি যথেষ্ট—উহাদের সংযোগসাধন করিয়া উভয়ের ভিতরে ও বাহিরে একটা 'মিডিয়ম' রহিয়াছে বা নাই অথবা ঐ 'মিডিয়মে'র অভ্যন্তরে কোন রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কি না এবং উক্তরূপ পরিবর্ত্তনটাই উহাদের আকর্ষণ রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে কি না—তাহার খোঁজ লইবার প্রয়োজন বোধ করি না। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিতে পাই যে, ভাসমান খড়-কুটার পক্ষে অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে যাহা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা জল, তৈল বা বায়ু রূপ 'মিডিয়মে'র বিকারবিশেষ মাত্র। সুতরাং কবির ভাষাতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলে বোধ হয় অশোভন হইবে না—

দুকূল ভাঙ্গে প্রেম-নদীর ঐ ঢেউ;
আপন মনে যায়রে ছুটে
পারের পানে চায় না কেউ।

কোন্ সুদূরে মধুর সুরে
ডাকছে কে কারে!
কাঁপছে আকাশ কাঁপছে বাতাস
সুরের ঝঙ্কারে;
তাই'ত প্রেম-নদীতে ঢেউ ব'য়ে যায়
গভীর হুঙ্কারে।
মিছাই এপার ভাবছে ওপার
ভাঙ্গছে আমারে;
মিশছে গ'লে তবু বলে
নাই'ত আমার কেউ!

(প্রথম অংশ সমাপ্ত)

মানব-অভ্যুদয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

জগতে যত প্রকার জীব আছে, তাহাদের মধ্যে মানবই সর্ব্বপ্রধান। মানব যেন জগৎ উপভোগ করিতেই জন্মিয়াছে; আর সকল জীব তাহাকে সেবা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এই মানব ধরার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাহার শারীরিক বল অতি অল্প; তাহার দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অনেক পশুপক্ষী, এমন কি কীটপতঙ্গের অপেক্ষাও হীন। পৃথিবী তাহার প্রতি কিন্তু বড় স্নেহবতী;—আকাশে-পাতালে, বনে, গিরিগুহায়, সাগর-ও ভূ-গর্ভে কত সুন্দর, কত মনোরম, কত মূল্যবান দ্রব্যাদি মানবের জন্যই যেন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

কোনও অজ্ঞাত যুগে, অজ্ঞাত কারণে, অজ্ঞাত জীব হইতে মানব এই ধরাবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অভিব্যক্তির ধারায় আদি জীব হইতে কত বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়া 'মানুষ' হইয়াছে। আদিতে এক-কৌষিক জীব বহু-কৌষিক হইল; ক্রমে তাহা 'বর্ত্তুল', এবং পরে 'কৃমি' আকারে উপনীত হইল; অনেক পরে আবার শঙ্খ-শম্বুকে ও তৎপরে মৎস্যে উন্নত হইয়াছিল। অভিব্যক্তির ইতিহাসে মৎস্য একটি বিশেষ অধ্যায়।

সকল দেশের রূপ-কথাতে দেখা যায় যে, রাজার দু'য়রাণীর, অর্থাৎ দুর্ভাগা রাণীর সন্তান সন্ততি অনেক অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করিয়াও পরে কত রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু

'সু'য় অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী রাণীর সন্তানগণ প্রথমে অনেক সুবিধা-সুযোগ পাইয়াও, শেষে ঐ দু'য় রাণীর সন্ততির নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বিধিব্যবস্থা অনুধাবন করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রকৃতির আদরের পুত্র তাহার অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগ্য ভ্রাতার সহিত জীবনযুদ্ধে হারিয়া যায় এবং দুর্ভাগাই শেষে টিকিয়া যায়। ক্রমোন্নতি প্রায় এই দুর্ভাগা বংশ হইতেই হইয়াছে।

আদিতে শঙ্খ-শম্বুক প্রকৃতির প্রিয় সন্ততি ছিল—অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযুক্ত ছিল। মৎস্য আসিয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই; তাহাকে জীবনধারণ উপযোগী আহারাদি অন্যত্র খুঁজিয়া লইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ শঙ্খ-শম্বুককে নিশ্চিন্তে বিনা সঙ্ঘর্ষে রাজ্য উপভোগ করিতে দিয়া, নিজে তাহাদের অধিকারের বাহিরে অন্য রাজ্যে গিয়াছিল। সাগর-তলে শঙ্খের রাজ্য সীমাবদ্ধ রহিল; আর মৎস্য আততায়ীর হাত এড়াইবার নিমিত্ত ক্ষিপ্র গতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাগর-তল ত্যাগ করিয়া সাগর-জলে বিচরণ করিতে করিতে নূতন বিশাল রাজ্য অধিকার করিল। শঙ্খ তাহার আদিম অবস্থা অপেক্ষা অধিক উন্নত হইল না; কিন্তু বিতাড়িত মৎস্য কত উন্নত হইল এবং অন্য জীবের উদ্ভবের সোপান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ'খানেও দু'য় রাণীর সন্ততির জয় হইয়াছে।

জীবের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যে-জাতি প্রকৃতির স্নেহে বঞ্চিত, সে প্রায়ই উন্নতির ধারা বহন করে।

মৎস্য নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া প্রকৃতির স্নেহ যেন জোর করিয়া আদায় করিল। এখন সে জলে যেন সর্ব্ববিজয়ী। শঙ্খ-শম্বুক এখন সাগর-তলে ও মৎস্য সাগর-জলে রাজত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু যাহারা এই দুই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইল, সে দুর্ভাগারা স্থলের দিকে ধাবিত হইল। ইহারা নিতান্ত প্রাণের দায়েই জল ছাড়িয়াছিল; আবার তাহারাই শেষে শঙ্খ-মৎস্য অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল—ইহারা সরীসৃপ শ্রেণী। ইহারাও আদিতে প্রকৃতির দুর্ভাগা সন্তান; জলে টিকিতে পারে নাই বলিয়াই স্থলে আসিয়াছিল।

এই উভচর সরীসৃপ স্থলে আসিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিশাল নূতন রাজ্য উপভোগ করিতে লাগিল। এই সরীসৃপ অঙ্গারীয় যুগে তাহাদের বহু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহাদের আকার-প্রকার এত বড় হইয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত সুখভোগের সুবিধা পাইল না; বরং ক্ষুদ্র আকারের জীব তাহাদের আপন বহু সুবিধা করিয়া লইল। এই ভীমকায় প্রাণীদের আহার সংগ্রহ করাই এক বিষম দায় হইয়া উঠিল। ক্রমে আহার্য্যের অকুলান হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় জীবদিগের সন্ততি বা উত্তরাধিকারীদিগকে প্রাণের দায়ে স্থল ছাড়িয়া আকাশে উড়িতে হইয়াছিল; এবং এইরূপে যে খাদ্য স্থলচর জীবের আয়ত্তের বাহিরে ছিল, তাহার সন্ধান করিতে হইয়াছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সকল জীবের সহিত উড্ডয়নশীল বিহঙ্গজাতির সম্বন্ধনির্দ্দেশ জীবতাত্ত্বিক করিয়াছেন।

যেমনই ইহাদের উড্ডীন গতির অভিব্যক্তি হইল, তেমনই কতক ক্ষুদ্র জীব ভূমির

অভ্যন্তরে লুক্কাইত পরিত্যক্ত আহারাদির—যাহা হেলায় নষ্ট হইতেছিল—সন্ধানে ভূমির ভিতর প্রবিষ্ট হইল। এই ক্ষুদ্রকায় উচ্ছিষ্টজীবীর বংশধরই স্তন্যপায়ী চতুষ্পদের আদিপুরুষ।

এই ক্ষুদ্র চতুষ্পদ হইতে কি প্রকারে এত বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর উদ্ভব হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যেদিন হইতে জীব সন্তানের জন্য স্বীয় বক্ষে পীযূষ-ধারার সঞ্চয় করিল, সেদিন হইতে ক্রমোন্নতির ধারা অনেক অগ্রসর হইয়াছিল; কারণ অণ্ডজ জীব অণ্ড হইতে শাবক উৎপন্ন করে এবং অণ্ড হইতে শাবক জন্মিবামাত্র তাহাকে আহারের সন্ধান করিতে হয়। সুতরাং তাহার শারীরিক বা মানসিক পুরিপুষ্টি সম্যক্ না হইয়া কেবল আহার আহরণের উপযুক্ত হইয়াই জন্মায়। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব জন্ম লভিয়াই জননীর স্নেহ-সঞ্চিত বক্ষে পীযূষ-লাভ করিয়া থাকে বলিয়া সে শৈশবাবস্থায় নিশ্চিন্তে কাটায় এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টিও সম্পূর্ণ হইতে পায়। এই স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব অভিব্যক্তির একটি প্রকৃষ্ট সোপান। এই স্তন্যপায়ী জীব হইতেই মানবের উদ্ভব হইয়াছে। জীব প্রধানতঃ তৃণশষ্প-ভুক। মাংসাশী জীবও বহুকাল হইতে জন্মিয়াছে এবং ইহারা উদ্ভিদ্-ভোজী অপেক্ষা শারীরিক বলে উন্নত হইয়াছিল। মাংস অল্পমাত্রায় অধিক পুষ্টিকর। অনেক শাক-পাতায় যতটুকু পুষ্টি পাওয়া যায়, অতি অল্প মাংসখণ্ডেও তাহা পাওয়া সম্ভব। হস্তী, গবাদির উদরের সহিত সিংহ-শৃগালাদির কটিদেশের তুলনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। সেকালের জীবগণকে কেবল পত্র-শাখা আহার করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত বলিয়া তাহাদের উদর বিশাল হইত; এবং সেই উদর বহিতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিশাল হইত। সেকালের জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত আকার দেখিলে তাহা বুঝা যায়।

কিন্তু জীবাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগতেও প্রভূত ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হইয়াছিল। আদিতে বৃক্ষ-লতায় ফল বা বীজ হইত না; ক্রমে রসাল ফলের ও পুষ্টিকর বীজের আবির্ভাব হওয়াতে জীবদেহের উপরও ইহার প্রভাব দেখা গেল। জীবগণ পল্লবগ্রাহী না হইয়া ফলপ্রত্যাশী হইয়া উঠিল। ফল ও বীজ-শস্য মাংসের মত অল্প পরিসর মধ্যে অধিক পুষ্টি প্রদান করিতে লাগিল এবং জীবগণ মাংসাশী হিংস্র না হইয়াও অল্প আহারে তাহাদের তুল্য বলশালী হইল। জীবা-ভিব্যক্তির ইতিহাসে উদ্ভিদের ফলের আবির্ভাব একটি বিশেষ ব্যাপার।

ক্রমে এই ফল আহরণ করিতে জীবের অঙ্গুলীর ব্যবহার আবশ্যক হইল; এবং যে জীবের অঙ্গুলীর সম্যক্ পরিপুষ্টি হইল, তাহারা পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘর্ষে বিজয়ী হইতে পারিল এবং ফলে তাহাদের ক্রমোন্নতির গতি ক্ষিপ্র হইল। অবশ্য সম্মুখ সমরে পশু হনন করা অপেক্ষা ফলাহার অল্প কষ্টসাধ্য ছিল; এবং যাহারা ভূচর সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখ বিরোধে অসমর্থ হইল তাহারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিল ও পরে উহাদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ "চতুর্ভুজ" বা বানর-শ্রেণীতে পরিণত হইল।

কিন্তু মানব কেবল ফলাহারী থাকিতে সম্মত হইল না। তাহাকে পরে সর্ব্ব জীবের উপর

প্রভুত্ব করিতে হইবে—সে শাখা আশ্রয় করিল না—সে "চতুর্ভুজ" অপেক্ষা দ্বিভুজ হইয়া পদভরে দাঁড়াইল। বোধ হয় কেবল শাখা আশ্রয় না করিয়া সে প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া অধিকতর নিরাপদ হইল। এখানে তাহাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইল; এবং ক্রমে আধুনিক মানবের পঙ্‌ক্তিতে উন্নীত হইল। শুভক্ষণেই সে দুই পায়ে দাঁড়াইয়াছিল; কারণ ইহাতেই তাহার মস্তিষ্কের ভিতর রক্তচলাচল ইত্যাদি হইয়া মস্তিষ্কের জটিলতা ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে—চারি পায় বা চারি হস্তে চলিলে তাহা হয়'ত সম্ভব হইত না *।

এখনকার মানবের শরীর-গঠনে কতকগুলি পেশী প্রভৃতির বিন্যাস দেখিয়া অনেক জীবতত্ত্ব-বিদ্‌ পণ্ডিত নরকে বানর-বংশসম্ভূত স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ শ্রেণীর বানর যে নরের পূর্ব্ব-পিতামহ ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

এই নরের আদিপুরুষ যে দুর্ভাগা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সে তৎকালের অনেক পশু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হীন ছিল। তাহার আত্মরক্ষার উপযোগী তীক্ষ্ন নখরদন্ত আয়ুধ ছিল না; বৃক্ষশাখা, প্রস্তরাদি ও অন্যান্য পশু হইতে লব্ধ শৃঙ্গাদির দ্বারা তাহা পূরণ করিল। শীতাতপ হইতে ত্রাণ পাইবার উপযোগী কেশলোমাদি তাহার দেহে বিরল ছিল বলিয়া পশু হনন করিয়া তাহাদের চর্ম্মলোমাদি গাত্রাচ্ছাদনের জন্য গ্রহণ করিল। তাহার গতি মৃগাদির মত বেগশালী ছিল না; কিন্তু অশ্বকে বশে আনিয়া তাহার পূরণ করিল। কিন্তু যেদিন সে অগ্নির সন্ধান ও তাহার উৎপাদন করিতে পারিল, সেইদিন সে সকল পশুকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। অগ্নির সাহায্যে সে অনেক অখাদ্যকে সুপক্ক করিয়া আহার্য্যে পরিণত করিল। অগ্নি তাহাকে অনেক শত্রু হইতে ত্রাণ করিয়াছে; অনেক অন্ধকার তাঁহার উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই অগ্নিদেবই তাহাকে সভ্যতার শীর্ষে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানব প্রকৃতির সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। ইহার আবির্ভাবের পর আর কোনও নূতন প্রাণী পৃথিবীতে জন্মে নাই। এত দিনের অভিব্যক্তির ধারা কি এইখানেই শেষ হইবে? মানবই কি সৃষ্টির চরম?

মানব ঠিক কবে জন্মিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। পৃথিবীর শেষ হিমানী যুগ (Pleistocene age)-এর পর হইতে আধুনিক মানবের চিহ্ন পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে মানব-আকারের জীব থাকিলেও তাহারা বানর ও বনমানুষ অপেক্ষা উন্নত ছিল না। ইহাদের অস্থি-করোটি হইতে ইহাই প্রমাণ হয়।

আবার মানবের বোধ হয় একটি মাত্র দম্পতি হইতে উদ্ভব হয় নাই। সম্ভবতঃ আদি-মানব হিমানী যুগের পূর্ব্বের নরবানরের শোণিতসংশ্লিষ্ট। হিম-প্রলয়ের পর পৃথিবীর হিম-ঋতু কমিলে উদ্ভিদ্‌-শ্রেণীর নূতন তরুলতা, শাক-সব্জীর আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল; জীবজগতে আধুনিক গো-মহিষাদির, জলে আধুনিক মৎস্যাদির, আকাশে আধুনিক পক্ষীদের ও কীটপতঙ্গের সাক্ষাৎ

* Descent of Man—Darwin.

পাওয়া গেল। এইরূপে মানবও আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শেষ প্রলয়কালে, পুরাতন অনেক বস্তু লোপ পাইয়াছে; জগৎসৃষ্টি যেন নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই আধুনিক মানব প্রাক্-হিমানী যুগের নর-পশু অপেক্ষা অনেক উন্নত; কিন্তু সেই অর্দ্ধ পশু কিরূপে 'মানুষ' হইল—তাহা এখনও অজ্ঞাত।

মানবের আদি জন্মভূমি কোথায়? এসিয়া ভূখণ্ডের উষ্ণ প্রদেশেই বোধ হয় মানব প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল †। দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে এবং হয়'ত বিভিন্ন নর-বানরের সংমিশ্রণে আধুনিক মানবের বিভিন্ন উপজাতির উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

মানব আদিতে অনেকটা পশুর মত ছিল। তাহার শারীরিক বল অন্য পশু অপেক্ষা অল্প হইলেও, তাহার মস্তিষ্ক সকল জীব হইতে জটিল; তাহার বুদ্ধি-বল অনেক অধিক। এই বুদ্ধিবলে সে পৃথিবী শাসন করিতেছে। প্রকৃতির অনেক শক্তিই এখন তাহার ক্রীতদাস।

মানবের আবির্ভাব কি দৈবাৎ হইয়াছে, না ইহা প্রকৃতির অভিপ্রেত? অনেক নৈসর্গিক কারণের উপর ইহা নির্ভর করিয়াছে। আদিতে পৃথিবী যখন শীতল হইয়া জীববাসের উপযোগী হইল, তখন অগ্ন্যুৎপাত হেতু বায়ুতে এত বেশী অঙ্গারীয় বাষ্প (CO_2) দেখা দিল যে, তাহাতে জীব বাঁচিতে পারে না। উদ্ভিদ্ আসিয়া এই বাষ্প বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল করিল ও ঐ বাষ্প হইতে জীবের একটি প্রধান আহার শ্বেতসার (Carbohydrates) সৃষ্ট হইল। আবার তরুলতা আকরিক লৌহ হইতে Chlorophyl নামক হরিৎবর্ণের উপাদান সৃজন করিল,—যাহা হইতে জীবের রক্ত-কণিকার প্রধান উপকরণ * উৎপন্ন হয়। এই দুইটি প্রধান আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য জীবজগৎ উদ্ভিদের নিকট চিরঋণী। অবশ্য সেও পুষ্পের পরাগ-বহন কার্য্য ও বীজকে নানা স্থানে নানারূপে সঞ্চারিত করিয়া এবং উদ্ভিদের প্রধান আহার—Nitrogenous দ্রব্যাদি—প্রদান করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিতেছে। সুতরাং উদ্ভিদের নিকট জীব অনেক কাল হইতে ঋণী। ইহা অপেক্ষা আরও প্রত্যক্ষ ঋণ আছে; ইহার উপর মানবীয় সভ্যতা নির্ভর করে।

পৃথিবীর শেষ হিমানীপ্লাবনের পর হইতে মানব জীবজগতের শিরোমণি হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রলয়ে সমগ্র পৃথিবী হিমানী-স্তূপে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই বরফ গলিয়া মাটি, পাথর, ভস্ম মিশাইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিয়াছিল; এবং এই উর্ব্বরতাই ধান্য, গোধুম, কলাই, মটর প্রভৃতি ওষধি তরুর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে। এই বিষয়ে মার্কিন পণ্ডিত বেরী (Berry) তাঁহার Paleo-botany নামক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রলয়ের পর উদ্ভিদ্-জগতে অনেক নূতন তরু-গুল্মের উদ্ভব উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—The variety of fruits is almost as great as flowers, and must be considered an

† It is the warmer region of the Old World that the best scientific evidence leads us to look for man's origin, and the rest of the earth could have been peopled only through the gradual dispersion of mankind.—Origin of American Indian Hrdlicka.

* Hæmoglobin.

important factor in the success of Angiosperms as well as one of the prime benefits to humanity. It seems more than a coincidence that the evolution of a group of plants...in which, as in some of cereals, 30 per cent of the total weight of the plant is stored as elaborated food in seed, should have been contemporaneous with the evolution of the warm-blooded animals. At any rate it seems certain that human civilization could not have evolved but for the evolution of this plant phylum.*

এই ওষধিগণ ক্ষীণকায় হইয়াও বহু পুষ্টিকর খাদ্য অতি অল্প সময়ে সৃজন করিয়া মানবের অন্নচিন্তার সমাধান করিয়াছে। যদি ইহারা না জন্মিত, মানব-সভ্যতার বিকাশই সম্ভব হইত না! এ'ত গেল উদ্ভিদ্-রাজ্যের কথা। জীবরাজ্যও মানবের আবির্ভাবের জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছিল।

মানবের সভতার আদি সম্বল অশ্ব, গো, মহিষ, কুকুর এই যুগে আধুনিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, জলে রোহিতাদি পুষ্টিকর মৎস্যও এই সময়ে প্রথম দেখা দেয়। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ওয়েন্ (Owen) তাঁহার পুস্তকে মৎস্য-অধ্যায়ের উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

"One other conclusion may be drawn from a general retrospect of the mutation of forms of fishes at different epochs of the earth's history—viz., that those species, such as the nutritious cod, the savoury herring, the richflavoured salmon, and the succulent turbot, have greatly predominated at the period immediately preceding and accompanying the advent of man, and they have superseded species which, to judge by the bony Garpikes, were much less fitted to afford mankind a sapid and wholesome food †

সুতরাং মানবকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আকাশ, বাতাস, স্থাবর, জঙ্গমের যেন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মধু-কৈটভ্ কে ছিল, জানি না। তবে আজকাল পৃথিবী যে কত যুগের জীব-জন্তুর মেদ-মাংস দ্বারা সৃষ্ট তাহার সন্দেহমাত্র নাই। এই মেদিনী এখন মানবের লীলাভূমি।

শত লক্ষ যুগ ধরিয়া ধরা-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে সকল আগ্নেয় উৎপাত হইয়াছে, তাহাও মানবের হিতার্থে; কারণ এই সব অগ্ন্যুৎপাতে পর্ব্বতের জন্ম হইয়াছে এবং পর্ব্বত না থাকিলে

* Paleo-botany—Berry

† Palæontology.—Owen p 151.

সাগরোত্থিত জলবাষ্প বৃষ্টি রূপে আবার ধরায় ফিরিয়া না আসিয়া মেরুপ্রদেশে বরফ হইয়া জমিত, এবং উষ্ণ দেশ-সমূহের নদী-প্রস্রবণ বহিত না। ধরার কতক অংশ শুষ্ক মরুতে ও কতক অংশ চিরতুষারে আবৃত থাকিত। আবার নদী অভাবে ক্রমে সাগরও শুকাইয়া যাইত। সুতরাং এই কুসুম-আভরণা ফল-শস্যময়ী শ্যামলা ধরণীর যে কি অবস্থা হইত, তাহা বুঝা যায়। তাহা হইলে কেবল মানব কেন, অনেক পশুপক্ষীও বাঁচিতে পারিত না। কিন্তু পর্ব্বত-সংস্থানে তাহা হয় নাই। ইহাও মানবের সৌভাগ্য। মানবের বহু পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ-তরু জন্মিয়াছিল, তাহাদের অঙ্গারীভূত অংশ পাথুরে-কয়লা রূপে মানবের ইন্ধন যোগাইতেছে। ইহারা কতকালের সঞ্চিত ধন,—পৃথিবী যেন ইহাদিগকে মানবের জন্য বুকে করিয়া রাখিয়াছিল। 'খনিজ তৈল' আর একটি সেকালের সঞ্চিত শক্তি; ইহাও আদিতে উদ্ভিদ্ হইত উদ্ভূত হইয়া ভূগর্ভে সঞ্চিত ছিল; মানব আসিয়া এই দুইটি সঞ্চিত শক্তি গ্রহণ করিয়াছে ও এখনকার মানবীয় সভ্যতা পাথুরে কয়লা ও Petrolium-এর উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতেছে। লৌহ-তাম্রাদি ধাতুও ভূগর্ভে কত কাল হইতে সঞ্চিত আছে—ধাতুর সঞ্চার জীব-সঞ্চারের অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ধরায় কত জীব জন্মিল, মরিল; কেহও ধাতুর ব্যবহার করিল না। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, মানব আসিয়া ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করিল। আজ যদি ধাতুর আবিষ্কার না হইত, তবে মানব-সভ্যতা কোথায় থাকিত?

এইরূপ অনেক দ্রব্যই যেন মানবের জন্য সৃষ্ট ও সঞ্চিত ছিল এবং তাহার ব্যবহারে আসিয়াই যেন সার্থক হইয়াছে। আজ কত ফল-শস্যাদি, কত পশুপক্ষী মৎস্যাদি মানবের আহার যোগাইতেছে; কত কার্পাস, বল্কল, পশুচর্ম্ম ও লোম তাহার বসন, তাহার সাজসজ্জা হইয়াছে। ধরিত্রীর হৃদয়ে লুকান কত ধন-রত্ন তাহাকে অলঙ্কার দিতেছে। অগ্নি, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ তাহাকে সেবকের মত সেবা করিতেছে। বিদ্যুৎ তাহার আজ্ঞাবাহী। সেও আজ বোধ হয় স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি
ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(মোর) ভয়ে জ্বলে অগ্নি, ভয়ে ভানু ভায়
চলে মেঘ, চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

কিন্তু সকল উদয়েরই অস্ত আছে, সকল উত্থানের পতন দেখা যায়। মানব সভ্যতা কতকগুলি ভিত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। নরের প্রভাবের মূলে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তি আছে—যেমন ইন্ধন। সঞ্চিত ইন্ধনের, যেমন পাথুরে-কয়লা বা খনিজ তৈলের, সীমা আছে—ইহাদের ক্ষয় হইলে মানবকে নূতন শক্তির সন্ধান করিতে হইবে। দুই একটির সন্ধানও সে পাইয়াছে—যেমন বিদ্যুৎ ও রেডিয়ম।

সূর্য্য-তাপ, জলোচ্ছ্বাস ও ভূগর্ভস্থ উত্তাপের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আরো নূতন শক্তির সন্ধান মিলিবে। মানবীয় সভ্যতা প্রোজ্জ্বলভাবে আরো কয়েক শত শতাব্দী চলিতে পারিবে। কিন্তু যখন সূর্য্য নিভিয়া যাইবে, জল জমিয়া যাইবে; বায়ুও হয়'ত লোপ পাইবে; সূর্য্য ভাতিবে না, চন্দ্র-তারকা উদিবে না;—'নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি'—বিদ্যুৎও থাকিবে না, অগ্নির ত' কথাই নাই।—তখন সে তমিস্রা রজনীতে, সে সুষুপ্ত জগতে এই মানবের দশা যে কি হইবে তাহা কে জানে?

মানব এখনও অভ্যুদয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায় নাই; বোধ হয় সভ্যতার আরো অনেক ক্রম-বিকাশ সম্ভবপর হইবে—সে বিষয় কল্পনায়ও আমরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু সর্ব্বশেষে তাহার পরিণাম কি হইবে কে বলিতে পারে? বিজ্ঞান এখানে মূক!

ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের স্কন্ধে দিয়া—

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্'

আমি প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৪। বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের স্বীকার্য্য

পূর্ব্বের দুই অধ্যায়ে আমরা সাধারণভাবে দেশ ও কাল সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন মতের আলোচনা করিয়াছি। এ'স্থলে আমরা নূতন মতটাকে আরও তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব এবং আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণে অগ্রসর হইব।

আমরা দেখিয়াছি আইন্‌ষ্টাইনের মতে, মাইকেল্‌সনের পরীক্ষা হইতে নিম্নোক্ত দুইটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়:—

(১) জড় দ্রব্যের কেবল আপেক্ষিক বেগেরই অর্থ আছে—উহার নিরপেক্ষ বেগ

এ'কথার তাৎপর্য্য এই যে, পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন দুই জগতের দুই জন দ্রষ্টার মধ্যে প্রত্যেকেরই নিজের জগৎকে স্থির (বাহ্য ঘটনার অবস্থান নির্ণয়োদ্দেশ্যে System of reference বা ভিত্তিভূমি স্বরূপ) এবং অপরের জগৎকে বেগ-সম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রকৃতিদত্ত সমান অধিকার রহিয়াছে। এই সিদ্ধান্তটাকে আমরা 'আপেক্ষিকতা সূত্র' বলিয়াছি।

(২) বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের প্রত্যেকের পরিমাপে—ঐ সকল জগৎ পরস্পর সম্পর্কে স্থির হউক বা সমবেগ-সম্পন্ন হউক—আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইবে এবং উহার পরিমাণ সম্বন্ধেও সকল দ্রষ্টা একই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে; অর্থাৎ যাহার যাহার জগৎ হইতে মাপিয়া দেখিয়া প্রত্যেক দ্রষ্টাই বলিবে আলোকরশ্মির বেগ সকল দিকেই 'ভ' পরিমিত। ইহাও প্রকৃতিরই বিধান। এই সিদ্ধান্তটাকে আমরা "আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা" (Principle of Constancy of the Velocity of Light) নামে অভিহিত করিব।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে, উক্ত সিদ্ধান্ত দু'টাকে স্বীকার্য্য স্বরূপ গ্রহণ করিলে দেশ এবং কালের আপেক্ষিকতার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া দাঁড়ায়; এবং নিম্নোক্ত কথাগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—

(ক) সমসাময়িকতার ধারণা আপেক্ষিক। শ্যামের বাস্তব জগতে যে সকল ঘটনা সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন রামের বাস্তব জগতে উহারা বিভিন্ন সময়ের ঘটনা বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

(খ) কালের পরিমাণের ধারণা আপেক্ষিক। আপেক্ষিক বেগের ফলে রামের জগতের ঘড়ি শ্যামের কাছে এবং শ্যামের জগতের ঘড়ি রামের কাছে 'শ্লো' বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

(গ) দৈর্ঘ্যের ধারণা আপেক্ষিক। রামের জগতের ফুট-রুল শ্যামের মাপে এবং শ্যামের জগতের ফুট-রুল রামের মাপে অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া ধরা পড়ে।

(ঘ) দুইটা দূরের ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান এবং কালের ব্যবধান সম্বন্ধে রাম-শ্যামের পরিমাপের ফল তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকের দেশ অথবা কালের মাপের সহিত অপরের দেশ এবং কাল উভয়ের পরিমাপের ফলই একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত এবং এই সম্বন্ধের আকারটা কেবল রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগের ('ব'-এর) উপরে এবং দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ আলোকের বেগের ('ভ'-এর) উপরে নির্ভর করে।

কিন্তু উক্ত কথাগুলির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেশ এবং কালের পরিমাপ-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

দেশ ও কালের পরিমাপ-প্রণালী

উক্ত ১নং স্বীকার্য্য হইতে দেখা যায় যে—এই ঘটনাময় জগতে প্রত্যেক দ্রষ্টারই নিজেকে স্থির বলিয়া বিবেচনা করিবার পক্ষে প্রকৃতিদত্ত সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে

হইবে প্রকৃতিদেবীর অভিপ্রায় এইরূপ যে, প্রত্যেক দ্রষ্টাই নিজের দেহটাকে এবং ঐ দেহসম্পর্কে যে সকল জড়দ্রব্য বরাবর স্থির হইয়া রহিয়াছে, উহাদিগকে একত্র করিয়া যে জগৎটা দাঁড়ায়, উহাকেই নিজের জগৎরূপে এবং এই জগৎটাকে বাহ্য জগৎরূপে কল্পনা করিবার জন্য যে দেশের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন, তাহাকেই নিজের দেশরূপে গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক দ্রষ্টা কল্পনাবলে তাহার দেহ হইতে চতুর্দ্দিকে এবং যথেচ্ছ পরিমাণে দীর্ঘ অশরীরি হস্ত বিস্তার করিয়া দিবেন; এবং এই সকল হস্ত লৌহ অপেক্ষা rigid (অর্থাৎ উহাদের অংশ-সমূহের পরস্পরের সম্পর্কে অবস্থানের কথনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না)—এইরূপ কল্পনা করিবেন। এইরূপে যে দেশের সৃষ্টি হইবে, উহাকেই ঐ দ্রষ্টা তাহার দেশরূপে গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে যাবতীয় বাহ্য ঘটনাকে স্থানদান করিবেন। বাহ্য ঘটনামাত্রই ঐ দেশের কোনও না কোনও স্থলে স্থানলাভ করিবে।

এই দেশ-সৃষ্টি কেবল ঘটনা-সমূহকে বাহ্য ঘটনারূপে উপলব্ধি করিবার জন্য—ঘটনা-নিরপেক্ষরূপে বা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষরূপে উহার একেবারেই অস্তিত্ব নাই। এইরূপ দেশের যে কোনও একটা স্থায়ী চিহ্নকে এবং ইচ্ছা হইলে নিজের দেহটাকেই ঐ দ্রষ্টা ঘটনা-সমূহের অবস্থান বা দূরত্ব নির্ণয়োদ্দেশ্যে ভিত্তিভূমি (origin) স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা তাহার বিভিন্ন দিকে প্রসারিত সহস্র বাহুর মধ্য হইতে পরস্পরের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থিত এইরূপ তিনখানা বাহু চিহ্নিত করিয়া লইবেন; এবং উহারা যে তিনটা দিকে প্রসারিত, উহাদিগকে যথাক্রমে সম্মুখের দিক, ডাহিন দিক ও ঊর্দ্ধদিক (অথবা 'ক' 'খ' 'গ' দিক) রূপে গ্রহণ করিয়া নিজের দেহরূপ ভিত্তিভূমি হইতে ঘটনাস্থলে পৌঁছিতে হইলে ঐ তিন দিক বরাবর যতটা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে,—এই পাদত্রয়ের পরিমাণ ('ত' 'থ' ও 'দ') নিরূপণ করিবেন। এই তিনটা রাশি দ্বারাই ঐ দ্রষ্টার দেশ-সম্পর্কে ঘটনাটার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। ঘটনার বর্ণনায় পূর্ণতা দান করিবার জন্য দ্রষ্টা উহার বাস্তব কালও ('স') নিরূপণ করিবেন। ফলে তিনটা দেশের পাদ ও একটা কালের পাদ অর্থাৎ 'ত' 'থ' 'দ' ও 'ঘ'—এই চারিটা পাদের পরিমাণ দ্বারাই ঘটনার বর্ণনা সম্পূর্ণতালাভ করিবে।

এইরূপে আপেক্ষিক বেগ-সম্বন্ধে রাম-শ্যাম প্রত্যেকেই এক একটা লৌহ-কঠিন দেশের সৃষ্টি করিয়া লইয়া এবং নিজেকে নিজের দেশে স্থির রূপে কল্পনা করিয়া, নিজের দেহটাকে দূরত্ব পরিমাপের পক্ষে ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রত্যেক দ্রষ্টাই নিজের দেশকে স্থির এবং অপর সকলের দেশকে অল্পবিস্তর বেগ-সম্পন্ন দেখিতে পাইবে। দ্রষ্টা বহু; সুতরাং দেশও বহু হইবে। আপেক্ষিক বেগের ফলে রামের দেশের সহিত শ্যামের দেশের অথবা রামের দেহরূপ ভিত্তিভূমি হইতে প্রসারিত সহস্র বাহুর সহিত শ্যামের দেহ হইতে প্রসারিত সহস্র বাহুর ক্রমাগত কাটাকাটি হইতে থাকিবে; কিন্তু এই সকল কাল্পনিক বাহুর কাল্পনিক ঠোকাঠুকির ফলে ঘটনা-সমূহের অবস্থান বা উহাদের দূরত্ব-নিরূপণে রাম-শ্যামের কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটিবে না।

ঘটনার অবস্থান-নিরূপণে সকল দ্রষ্টাই একই প্রণালী অবলম্বন করিবে। রাম তাহার দেশের মধ্যে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' প্রভৃতি এবং শ্যাম তাহার দেশে 'কা' 'খা' 'গা' 'ঘা' প্রভৃতি স্থায়ী চিহ্নের অস্তিত্ব কল্পনা করিবে এবং প্রত্যেকেই প্রতি চিহ্নের কাছে একটা করিয়া ঘড়ি রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করিবে। এই ঘড়িগুলি একই মেকারের তৈয়ারী অর্থাৎ সর্ব্বাংশে একরূপ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ফলে যে ঘটনাটাকে রাম তাহার দেশের 'ক'-স্থানে স্থানদান করিবে, শ্যাম তাহাকে তাহার দেশের 'কা'-চিহ্নিত স্থলের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু ঘটনামাত্রই সকল দ্রষ্টার দেশ ও কালের পক্ষে সাধারণ ঘটনারূপে এবং 'একটা' ঘটনারূপেই উপস্থিত হইবে; সুতরাং উহাকে অবলম্বন করিয়া উভয় দ্রষ্টাই 'ক' ও 'খ' চিহ্ন দু'টার মধ্যে ক্ষণেকের জন্য একটা মিলের অস্তিত্ব অনুভব করিবে। এই মিলন-মুহূর্ত্তটাকে যদি রামের 'ক' ঘড়ির কাঁটাটা 'গ' ঘরে অবস্থান দ্বারা এবং শ্যামের 'কা' ঘড়ির কাঁটাটা 'খা' ঘরে অবস্থান দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লয়, তবে ঐ দুইটা চিহ্নকেই ঐ দুই জগতের পক্ষে ঐ ঘটনার বাস্তব কালরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তারপর ঐ দেশ-সম্পর্কের চিহ্ন দু'টা ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়িবে; কিন্তু রাম তাহার স্থির জগতের 'ক' চিহ্নটাকে এবং শ্যাম তাহার স্থির জগতের 'কা' চিহ্নটাকেই ঘটনাস্থল রূপে গ্রহণ করিয়া ধীরে সুস্থে উহার অবস্থান নিরূপণ করিতে পারিবে। এইরূপে রামের মাপে 'ক' চিহ্নের পাদত্রয় যদি 'ত' 'থ' ও 'দ' পরিমিত এবং শ্যামের মাপে 'কা' চিহ্নের পাদত্রয় 'তা' 'থা' ও 'দা' পরিমিত হয়, তবে ঐ ঘটনাটা রামের দেশে ও কালে 'ত' 'থ' 'দ' ও 'স' এবং শ্যামের দেশে ও কালে 'তা' 'থা' 'দা' ও 'সা' পাদচতুষ্টয় দ্বারা একটা বিশিষ্ট ঘটনার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। দূরত্বের পরিমাপে রাম-শ্যাম অবিকল এক মাপের মাপকাঠি ব্যবহার করিবে; অর্থাৎ একই স্থলে বসিয়া মাপ সমান করিয়া লইয়া দু'খানা ফুট-রুল তৈয়ার করা হইয়াছে। তারপর উহাদের একখানাকে রামের জগতে, একখানাকে শ্যামের জগতে স্থাপন করা হইয়াছে;—এইরূপ দু'খানা ফুট-রুলের সাহায্যেই রাম-শ্যাম উক্ত পাদত্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ করিবে। এই সকল মাপকাঠিকে পূর্ণ মাত্রায় rigid বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক দ্রষ্টা তাহার দেশ-সম্পর্কে এবং তাহার কাল-সম্পর্কে প্রত্যেক ঘটনার স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারিবে; কিন্তু বিভিন্ন জগতে নিরূপিত ঐ পাদচতুষ্টয়ের পরিমাণ যে পরস্পরের সমান হইতে হইবে —তাহার কোন অর্থ নাই। দেশের পাদের পরিমাণ সম্বন্ধে যে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ থাকিতে পারে—ইহা এক হিসাবে নূতন হইলেও সম্পূর্ণ নূতন কথা নহে; কিন্তু কালের পাদের পরিমাপের ফলও যে দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, ইহা বলিবার জন্য আইন্‌ষ্টাইনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

দুইটা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান কত—ইহা নির্ণয়োদ্দেশ্যে রাম উহাদিগকে তাহার দেশের 'ক' ও 'খ' স্থানে চিহ্নিত করিয়া লইয়া 'কখ' দূরত্বটার পরিমাপ করিবে; সেইরূপ শ্যাম উহাদিগকে তাহার দেশের 'কা' ও 'খা' স্থানে স্থাপন করিয়া 'কাখা' দূরত্বটা

মাপিবে। এই দূরত্ব-নিরূপণ ধীরে সুস্থে করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই ; কেন না, প্রত্যেক ঘটনাই প্রত্যেকের দেশের কোনও না কোনও একটা স্থায়ী চিহ্নের সহিত মিলিয়া যাইবে ; এবং যে-প্রণালীতে কাপড়খানা কত হাত অথবা ঘরটার দৈর্ঘ্য কত ফুট নিরূপিত হইয়া থাকে, দূরত্ব-নিরূপণে প্রত্যেক দ্রষ্টা সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। উক্তরূপে নিরূপিত 'কথ' দূরত্বটা রামের জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমান হইবে ; সেইরূপ 'কা খা' দূরত্বটাও শ্যামের জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমান হইবে। কিন্তু রামের পরিমাপের ফলটা যে শ্যামের পরিমাপের ফলের সমান হইতে হইবে (অর্থাৎ ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধান সম্বন্ধে রাম-শ্যাম যে একমতই হইবে)—এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রামের দেশে যদি দু'টা ঘটনা একই স্থলে—'ক' চিহ্নিত স্থলে—ঘটে ; কিন্তু পরপর ঘটে, তবে আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন শ্যাম দেখিবে যে, যতক্ষণ (অর্থাৎ তাহার কালপ্রবাহের যতক্ষণে) ঘটনা দু'টা ঘটিল, ততক্ষণ রামের দেশের 'ক' চিহ্নটা তাহার দেশের 'কা' স্থান হইতে 'খা' স্থানে চলিয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে রাম যদিও বলিবে যে, উভয় ঘটনাই ঘটিয়াছে 'ক' স্থানে, সুতরাং উহাদের দেশের ব্যবধান শূন্য পরিমিত ; শ্যাম বলিবে, ঘটনা দু'টা ঘটিয়াছে 'কা' ও 'খা' স্থানে, সুতরাং উহাদের দেশের ব্যবধান 'কা খা' পরিমিত। প্রত্যেক দ্রষ্টারই নিজেকে স্থির বলিয়া বিবেচনা করিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে ; প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য এবং প্রত্যেকের পরিমাপের ফলই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে দেখিবার বিষয় এই যে, যে-পদার্থের দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে, উহার উভয় প্রান্তের সহিত যে মাপকাঠি ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহার উভয় প্রান্তের মিলন একই সময়ে ঘটিতেছে কি না। ঐ পদার্থটা এবং ঐ মাপকাঠি যদি একই জগতে অবস্থিত হয়, তবেই এই সমসাময়িকতার ধারণা লইয়া বেগ পাইতে হয় না ; কিন্তু উহারা আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন জগতে অবস্থিত হইলে ঐ মিল দু'টাকে সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করা যাইবে কি না—তাহা বলা তত সহজ হয় না।

শ্যামের জগতে অবস্থিত 'কা খা' পদার্থের দৈর্ঘ্য (অথবা শ্যামের দেশের 'কা' ও 'খা' চিহ্ন দু'টার মধ্যে দূরত্ব) মাপিতে হইবে। শ্যামের পক্ষে ইহা সহজ ব্যাপার। শ্যামের মাপকাঠি সম্পর্কে ঐ পদার্থটা বেগহীন ; সুতরাং শ্যাম তাহার মাপকাঠির একপ্রান্ত উহার 'কা' স্থানে স্থাপন করিয়া এবং ঐ মিলটাকে বরাবর বজায় রাখিয়া, উহার অপর প্রান্তটাকে (অথবা উহার কোনও একটা বিশিষ্ট চিহ্নকে) ধীরে ধীরে 'খা' স্থানটার সহিত মিলাইয়া লইতে পারিবে ; এবং শেষোক্ত মিলটা যখন ঘটিল, প্রথমোক্ত মিলটার তখন কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া শ্যামের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। ফলে, শ্যাম ঐ মিল দু'টাকে সমসাময়িকরূপে গ্রহণ করিয়া 'কা খা' দূরত্বটাকে এককাঠি (অথবা উহার একটা নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে ; এবং শ্যামের এই পরিমাপটাকে নির্ভুল বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু রামের পক্ষে শ্যামের জগতের ঐ পদার্থটা বেগবিশিষ্ট ; সুতরাং রামকে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, উহার 'কা' ও 'খা' প্রান্তের সহিত তাহার জগতের কোন্ কোন্ স্থলের মিলন একই সময়ে ঘটিল। রামের পর্য্যবেক্ষণে যদি দাঁড়ায় যে, তাহার দেশের 'ক' ও 'খ' চিহ্ন দু'টাই ঐ দুইটা স্থল—অর্থাৎ রাম যদি 'ক কা' ও 'খ খা' মিল দু'টাকেই সমসাময়িক সাব্যস্ত করিয়া উহাদিগকে তাহার জগতের 'ক' ও 'খ' স্থানে স্থাপন করিতে পারে, তবেই রাম বলিতে পারিবে যে, শ্যামের জগতের 'কা খা' পদার্থটার দৈর্ঘ্য তাহার জগতের 'ক খ' দূরত্বের সমান ; সুতরাং ধীরে সুস্থে এই শেষোক্ত দূরত্বটা মাপিয়া লইয়া 'কা খা' দূরত্বটাও নিরূপণ করিতে পারিবে।

সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইল এই যে, ঐ 'ক কা' ও 'খ খা' মিল দু'টা সমসাময়িক কি না—রাম তাহা বুঝিবে কিরূপে? ঐ মিল দু'টাকে রাম তাহার দেশের 'ক' ও 'খ' স্থানে স্থাপন করিয়া নিজের জগতের ঘটনারূপে গ্রহণ করিতেছে ; রামের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক এবং এই প্রণালী অবলম্বনেই তাহার পক্ষে উহাদের অন্তর্গত দূরত্ব-নিরূপণ সম্ভবপর হয় ; কিন্তু এই দু'টা স্থলেও রাম একই সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারে না এবং 'ক' স্থানের মিলটা বরাবর বজায় থাকিয়াই 'খ' স্থানের মিলটা ঘটিতেছে—এ'রূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারে না। মিল দু'টা যদি রামের জগতের একই স্থলে ঘটিত (অর্থাৎ 'ক খ' দূরত্বটা শূন্য পরিমিত হইত), তবে রাম ঐ ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়া—হাত-ঘড়ির সাহায্যে—উহারা সমসাময়িক কি না, অক্লেশেই নিরূপণ করিতে পারিত। দূরের ঘটনা হওয়াতেই উহাদের সমসাময়িকতার প্রশ্ন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং একই জগতের দুইটা দূরের ঘটনা সম্পর্কে সমসাময়িকতার একটা সংজ্ঞা নিরূপণ আবশ্যক। আইন্‌ষ্টাইন্ বলেন—পূর্ব্বোক্ত ২নং স্বীকার্য্যটাকে ভিত্তি করিয়াই প্রত্যেক জগতের পক্ষে সমসাময়িকতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রষ্টা তাহার দেশের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইয়া ঘটনা দু'টা প্রত্যক্ষ করিবে। তারপর উক্তরূপে চিহ্নিত ঘটনাস্থল দু'টার অন্তর্গত দূরত্ব মাপিয়া এবং সকল দিকে ও সকলের পক্ষে সমান আলোকের বেগটাকে সাধারণ মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিয়া উহারা সমসাময়িক কি না অথবা উহাদের বাস্তব কালের ব্যবধান কত—তাহা নিম্নোক্ত উপায়ে নিরূপণ করিবে :—

মনে করা যা'ক, উক্ত মিল দু'টাকে (রামের মতে—'ক' ও 'খ' স্থানের ঘটনা দু'টাকে) রাম 'ক' স্থানে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে। এ'রূপ অবস্থায় 'ক' স্থানের মিলটাকে রাম ঘটামাত্রই প্রত্যক্ষ করিবে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়ি দেখিয়া উহার প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব উভয় কালই নির্রূপণ করিতে পারিবে। এখন বাস্তবিক পক্ষে এই মিলটা যদি 'খ' স্থানের মিলটার ('খ খা' মিলটার) সমসাময়িক হয়, তবে দ্বিতীয় মিলটাকে রাম প্রত্যক্ষ করিবে তাহার প্রথম প্রত্যক্ষের $\frac{\text{কখ}}{\text{ভ}}$ সেকেণ্ড পরে। নিজের জগৎটাকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে এই সিদ্ধান্তটাকেই, রামের পক্ষে, তাহার জগতের বাস্তব কালের সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করা স্বাভাবিক হইবে। অর্থাৎ ঘটনা দু'টার প্রত্যক্ষ কালের ব্যবধানটা যদি $\frac{\text{কখ}}{\text{ভ}}$ পরিমিত হয়, তবেই রাম তাহার বাস্তব জগতে উহাদিগকে সমসাময়িক (উহাদের বাস্তব কালের ব্যবধান শূন্য পরিমিত) বলিয়া এবং ঐ

ব্যবধানটা যদি ভিন্ন পরিমিত দাঁড়ায়, তবে উহা হইতে $\frac{\text{কখ}}{\text{ভ}}$ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ঐ দুই ঘটনার বাস্তব কালের ব্যবধানরূপে গ্রহণ করিবে। ফলে, সমসাময়িকতার সংজ্ঞাটাকে নিয়োক্তরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—

কোনও জগতের কোনও দুইটা ঘটনাস্থলের মধ্যে দূরত্বটা যদি ঐ জগতের ফুটরুলের মাপে 'দ' পরিমিত হয় এবং একটা ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়া দ্রষ্টা যদি দেখিতে পান যে, ঘটনা দু'টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মধ্যে তাহার হাত-ঘড়ি 'শ' পরিমিত সময় নির্দ্দেশ করিতেছে, তবে ঐ দ্রষ্টা বলিবেন যে, উহাদের বাস্তব কালের ব্যবধান বা 'স' $=$ শ $- \frac{\text{দ}}{\text{ভ}}$ পরিমিত ; এবং যে ক্ষেত্রে ঐ প্রত্যক্ষ কালের ব্যবধান (বা 'শ') $\frac{\text{দ}}{\text{ভ}}$ এর সমান হইবে, সে ক্ষেত্রে ঘটনা দু'টাকে ঐ দ্রষ্টা সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

সমসাময়িকতার উক্ত সংজ্ঞাটাকে আরও সহজভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। মনে করা যা'ক, 'ক' ও 'খ' চিহ্নের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াইয়া রাম ঐ মিল দু'টাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই মধ্যস্থল নিরূপণেও ফুটরুলের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যক হইবে। এ'রূপ ক্ষেত্রে রামের প্রত্যক্ষে যদি ঐ ঘটনা দু'টা সমসাময়িকভাবে উপস্থিত হয় এবং 'ক খ' দূরত্বটা রামের মাপে 'দ' পরিমিত হয়, তবে রাম বলিবে তাহার বাস্তব জগতে উভয় ঘটনাই ঘটিয়াছে তাহার ঐ সাধারণ প্রত্যক্ষের $\frac{\text{½দ}}{\text{ভ}}$ সেকেণ্ড পূর্ব্বে ; অর্থাৎ রামের বাস্তব জগতেও ঘটনা দু'টা সমসাময়িকই হইবে। সুতরাং

দুই ঘটনার ঠিক মধ্যস্থলে (অথবা সমান সমান দূরে) দাঁড়াইয়া কোনও দ্রষ্টা তাহার মন-ঘড়ি বা হাত-ঘড়ি সাহায্যে যদি দেখিতে পান যে, উহারা তাহার প্রত্যক্ষে সমসাময়িকরূপে (বা 'শ' সেকেণ্ড আগে-পরে) উপস্থিত হইতেছে, তবে ঐ দ্রষ্টার বাস্তব জগতেও উহারা সমসাময়িক (অথবা 'শ' সেকেণ্ড আগে-পরের) ঘটনা হইবে।

আইনষ্টাইনের মতে ইহাই প্রত্যেক জগতের পক্ষে, দুইটা দূরের ঘটনা সম্পর্কে, বাস্তব কালের এবং বাস্তব সমসাময়িকতার সংজ্ঞা। এই বাস্তব কাল নিরূপণে যেরূপ হাত ঘড়ির, সেইরূপ ফুটরুলেরও সাহায্যগ্রহণের আবশ্যক হইয়া থাকে। উভয় সংজ্ঞারই ভিত্তি হইতেছে পূর্ব্বোক্ত ঐ স্বীকার্য্য দু'টা। আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন জগতের প্রত্যেক দ্রষ্টাই নিজের জগৎটাকে স্থির এবং আলোকের বেগকে সকল দিকেই 'ভ' পরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটাকে অবলম্বন করিয়াই আইনষ্টাইন্ সকল জগতে প্রযোজ্য এই বাস্তব কালের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিজের জগৎকে বেগ-সম্পন্ন রূপে কল্পনা করিলেই বিভিন্ন দিক্‌গামী আলোকরশ্মির বেগে একটা আপেক্ষিকতা আসিয়া পড়িবে ; এবং উক্ত সমসাময়িকতার সংজ্ঞাটাও মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

বাস্তবিক পক্ষে উক্ত কালের সংজ্ঞাটাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই জ্যোতিষিগণ এ'যাবৎ সুদূর নক্ষত্ররাজ্যের ঘটনার কাল-নিরূপণ করিয়া আসিয়াছেন। রোমার' যখন বৃহস্পতির

চন্দ্রবিশেষের রাহু-গ্রাসকাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আলোকের বেগের সসীমতা প্রতিপন্ন করেন, তখনও বাস্তব কালের উক্ত সংজ্ঞাটাই স্বীকৃত হইয়াছিল। মহাশূন্যে সৌরজগৎটা কোনও দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে কি না,—এ'রূপ প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বিবেচিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি বৈজ্ঞানিকগণ ঐরূপ প্রশ্নের অসারতা অস্বীকার করিয়া এ'যাবৎ বাস্তব কালের ধারণাটাকেই কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মাইকেল্‌সনের নিষ্ফল পরীক্ষাটা ঐরূপ কল্পনার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আইন্‌ষ্টাইনের কালের সংজ্ঞাটাকে সত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে এবং উহার সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে রামের জগতে ঐ 'ক কা' ও 'খ খা' মিল দু'টা যদি সমসাময়িক হইয়া দাঁড়ায়, তবেই রাম নিজের জগতের 'ক খ' দূরত্বের পরিমাপ করিয়া শ্যামের জগতের 'কা খা' দূরত্বটাও মাপা হইল—ইহা বলিতে পারিবে।

আমরা দেখিলাম, দূরত্ব-পরিমাপের সহিত কালের ধারণাটা জড়াইয়া রহিয়াছে। নিজের জগতের কোনও দূরত্বের পরিমাপে বেগের কথা উঠে না; সুতরাং সমসাময়িকতার প্রশ্নটাও চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন ভিন্ন জগতের দূরত্ব মাপিতে হইলেই সম-সাময়িকতার ধারণাটা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ফলে, নিজের জগৎ-সম্পর্কে বাস্তব কালের এবং বাস্তব সমসাময়িকতায় একটা সংজ্ঞানির্দ্দেশের আবশ্যক হয়; এবং প্রত্যেক দ্রষ্টাকে নিজের জগতের সমসাময়িকতার ধারণাটাকে ভিত্তি করিয়াই অপরাপর জগতের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করিতে হয়। আবার নিজের জগতের সমসাময়িকতার সহিত নিজের জগতের দূরত্বের ধারণাটাও ('দ') জড়াইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই দূরত্বের পরিমাপে নূতন করিয়া আর কালের ধারণটাকে টানিয়া আনিবার আবশ্যক হয় না। দ্রষ্টাবিশেষের জগতের একই স্থলে (অথবা তাহার দেহসম্পর্কে) যে সকল ঘটনা ঘটে, ঐ দ্রষ্টার মতে তাহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধান নাই—আছে কেবল কালের ব্যবধান। এইরূপ দু'টা পরপর ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধানটা ঐ দ্রষ্টা কেবল তাহার হাত-ঘড়ির সাহায্যেই নিরূপণ করিতে পারে। কিন্তু আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা উহাদিগকে তাহার দেশের বিভিন্ন স্থলে স্থাপন করে; এবং ফুটরুলের সাহায্যে উহাদের দূরত্ব মাপিয়া ও হাত-ঘড়ির সাহায্যে উহাদের প্রত্যক্ষ কালের ব্যবধান মাপিয়া তবেই উহাদের বাস্তব কালের ব্যবধান নিরূপণ করিতে পারে। আইন্‌ষ্টাইনের মতে, পুরাতন যুগের সমসাময়িকতার ধারণাটা ভিত্তিহীন; কালের পরিমাণ-বুদ্ধি দেশের অপেক্ষা রাখে না—এই অনুমানের মূলে কোন যুক্তি নাই। কিন্তু উক্ত সমসাময়িকতার সংজ্ঞাটা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ আলোকের বেগটাকে (অথবা বিভিন্ন দ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের একটা বিশিষ্ট ঐক্যের দাবীটাকে) কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া সকল দ্রষ্টার জগতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহে, এবং প্রত্যেক জগতে দেশের সহিত কালের এবং এক জগতের দেশ বা কালের সহিত ভিন্ন জগতের দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে চাহে। জগৎভেদে কালের ধারণা ভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু একই জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষেই বাস্তব কালের ধারণা সমান হইয়া থাকে। কিরূপে সমান

হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে ('প্রকৃতি'—৩৬৫ পৃ) আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং দূরত্বের ধারণাও এক জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমান হইয়া থাকে।

ঘড়ি মিলাইবার উপায় কি? একই জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কতগুলি ঘড়ি রহিয়াছে; উহাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে কি না, ঐ জগতের দ্রষ্টা নিরূপণ করিবে কিরূপে? সবগুলি ঘড়িকে একস্থানে আনিয়া মিলাইয়া লইয়া পুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ফিরিবার পথে প্রত্যেক ঘড়িই ঐ জগৎ-সম্পর্কে—এবং হয়ত পরস্পর সম্পর্কে—বেগসম্পন্ন হইবে। ইহার ফলে ঘড়িগুলি 'শ্লো' বা 'ফাষ্ট' হইবে না—কে বলিতে পারে? অবশ্য ঘড়িগুলিকে খুবই ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিলে ঐরূপ গরমিল হইবার আশঙ্কা নাই; কিন্তু ঐ ব্যাপারে, বলিতে গেলে, অনন্ত কালের আবশ্যক হইবে।

উক্ত কালের সংজ্ঞা হইতে ঘড়ি মিলাইবার একটা সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রামের জগতে বহুদূরে ('দ' পরিমিত দূরে) একটা ষ্টাণ্ডার্ড ঘড়ি রহিয়াছে; রাম উহার সহিত তাহার হাত-ঘড়িটাকে মিলাইয়া লইতে চাহে। দূরের ঘড়িটা যদি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে (১) সমসাময়িকতার প্রথম সংজ্ঞাটার অনুসরণ করিয়া রাম প্রচলিত প্রথাই অবলম্বন করিতে পারিবে; অর্থাৎ রাম একসঙ্গে উভয় ঘড়ির কাঁটার অবস্থান দু'টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। রামের এই দুই প্রত্যক্ষের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নাই—অর্থাৎ এ'স্থলে 'শ' = ০ পরিমিত; সুতরাং রাম যে দুই ঘটনা (প্রত্যেক ঘড়ির কাঁটার সহিত উহার একটা বিশিষ্ট ঘরের মিলন) প্রত্যক্ষ করিল, উহাদের মধ্যে বাস্তব কালের ব্যবধানটা $\frac{দ}{ভ}$ পরিমিত হওয়া উচিত। ফলে, রাম যদি দেখিতে পায় যে ঐ দুই কাঁটার অবস্থানের পার্থক্য $\frac{দ}{ভ}$ পরিমিত সময় নির্দ্দেশ করিতেছে, তবে রাম সিদ্ধান্ত করিবে যে, দূরের ঘড়ির সহিত তাহার হাত-ঘড়ির বাস্তবিক মিল রহিয়াছে; কিন্তু ঐ অবস্থানের পার্থক্যটা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক বা অল্প সময় নির্দ্দেশ করে, তবে হাত-ঘড়িটাকে রাম ঐ পরিমাণে 'শ্লো' বা 'ফাষ্ট' করিয়া লইবে। অথবা (২) সমসাময়িকতার দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে, হাত-ঘড়িটাকে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া রাম দুই ঘড়ির ঠিক মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইবে; এবং ঐ স্থান হইতে একই সময়ে উভয় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম যদি দেখিতে পায় যে, উহাদের কাঁটার অবস্থানে 'ষ' পরিমিত সময়ের পার্থক্য বিদ্যমান, তবে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া হাত-ঘড়িটাকে ঐ পরিমাণে 'শ্লো' বা 'ফাষ্ট' করিয়া লইবে।

দূরত্বের জন্য দূরের ঘড়ি যদি স্পষ্টরূপে দেখা না যায়, তবে উহার কাঁটার অবস্থান জ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকরশ্মির সাহায্যে, অথবা আলোক রশ্মির সমবেগসম্পন্ন তাড়িতরশ্মির সাহায্যে, সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে রামের জগতের প্রত্যেক দ্রষ্টাই—কাহারও ঘড়িতে একটুও বেগ উৎপন্ন না করিয়াই—ষ্টাণ্ডার্ড ঘড়ির সহিত নিজের ঘড়ি মিলাইয়া লইতে পারিবে; এবং এইরূপে মিলাইয়া লইবার পর ঐ জগতের যে-স্থানেই যে-ঘটনা ঘটুক না কেন, ঘটনাস্থলের ঘড়িটা উহার সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিবে, উহাকেই উহার বাস্তব কালরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঠিক একই প্রণালী অবলম্বনে শ্যামের জগতের প্রত্যেক দ্রষ্টা ঐ জগতের ষ্টাণ্ডার্ড ঘড়ির সহিত নিজের ঘড়ি মিলাইয়া লইবে। একবার মিলাইয়া লইবার পর এক জগতের ঘড়িগুলির মধ্যে বরাবর মিলই দেখা যাইবে ; কিন্তু দুই জগতের দু'টা ঘড়ির মধ্যে মিল দেখা যাইবে কি না, সহসা বলা যায় না। রামের 'ক' চিহ্নিত ও শ্যামের 'কা' চিহ্নিত ঘড়ির মিলন-ক্ষেত্রে রামের ঘড়ির কাঁটাটা যে ঘরে অবস্থান করিবে, শ্যামের ঘড়ির কাঁটাটাই যে সেই ঘরেও অবস্থিত হইবে—তাহার কোন অর্থ নাই। সুতরাং শ্যামের জগতে 'ক কা' মিলটা 'খ খা' মিলটার সমসাময়িক হইলেও রামের জগতে উহারা সমসাময়িক হইবে কি না, অর্থাৎ শ্যামের মতে 'ক খ' দূরত্বটা 'কা খা' দূরত্বের সমান হইলেও রামের মতে উহারা সমান সমান হইবে কি না—তাহা বিনা বিচারে বলা চলিবে না।

তথাপি একটা বিষয়ে সকল দ্রষ্টাকেই একমত হইতে হইবে—ঘটনার সংখ্যা-সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ ঘটিতে পারিবে না। ঘটনা একটা না দু'টা—এ'সম্বন্ধে রাম-শ্যামে মতভেদ থাকিলে উহাঁদের পরস্পরের সহিত কোন কারবারই চলিতে পারিত না। সুতরাং শ্যাম যে দুই ঘটনাকে তাহার জগতের একই স্থলের এবং একই সময়ের ঘটনারূপে সিদ্ধান্ত করিয়া উহা-দিগকে 'একটা' ঘটনারূপে অনুভব করিতে চাহিবে, রামও ঐ দুই ঘটনাকে তাহার দেশের একই-স্থলে এবং তাহার কালপ্রবাহের একই মুহূর্তে স্থানদান করিয়া 'এক' ঘটনারূপেই অনুভব করিতে চাহিবে। বলিতে গেলে 'এক না দুই' ?—এই প্রশ্নের মীমাংসায় একমত হইবার প্রবৃত্তিটাকে অনুসরণ করিয়াই, বাহ্য ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে, বিভিন্ন দ্রষ্টা দেশ ও কালের সৃষ্টি করিয়া লয় ; এবং উহাদের পরিমাণ-সম্বন্ধে মতভেদ সত্ত্বেও খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের বর্ণনায় একই ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টাবিশেষের দুইটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একই সময়ে শ্যাম একটা লাল আলো ও একটা নীল আলো প্রত্যক্ষ করিল। এই প্রত্যক্ষ দু'টাকে রাম-শ্যাম উভয়েই দু'টা বাহ্য ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে পারে। শ্যামের বাস্তবে উহারা সম-সাময়িক এবং একই স্থলের (চক্ষুরূপ ভিত্তিভূমির) ঘটনারূপে উপস্থিত হইতেছে ; সুতরাং রাম ও শ্যামের প্রত্যক্ষ দু'টাকে একই স্থলের এবং একই সময়ের ঘটনারূপে অনুভব করিবে। ফলে দূরের ঘটনার কাল সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ থাকিলেও দ্রষ্টাবিশেষের সমসাময়িক প্রত্যক্ষগুলিকে সকল দ্রষ্টাই সমসাময়িক ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে ; এবং এই সত্যটাকে ভিত্তি করিয়াই প্রত্যেক দ্রষ্টা নিজের জগতের দেশ ও কালের সহিত অপরাপর জগতের দেশ ও কালের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে।

দেখা গেল, বাহ্য ঘটনা সম্পর্কে নিজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক দ্রষ্টা তাহার দেশ ও কালের সৃষ্টি করিয়া লয়। এই কালপ্রবাহ এমন পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়, যাহার ফলে কোন দ্রষ্টার পক্ষেই নিজের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগুলিকে—উহারা সমসাময়িকই হউক বা পর পর ঘটনাই হউক—একই স্থলের ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয়।

যে সকল প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাবিশেষের পক্ষে সমসাময়িক, তাহারা সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমসাময়িক হইয়া থাকে ; কিন্তু দ্রষ্টাবিশেষের পর পর প্রত্যক্ষগুলিকে আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা তাহার দেশের মধ্যে ছড়াইয়া লইতে—সুতরাং উহাদের অন্তর্গত কালের ব্যবধানগুলিকেও ভিন্ন পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে (বড় করিয়া তুলিতে)—বাধ্য হয়। প্রত্যেক দ্রষ্টাই তাহার নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে দেশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়া উহাদিগকে কেবল কালের পথে অগ্রসর করিয়া দেয় ; এবং অপরের জীবনের ঘটনাগুলিকে নিজের দেশে এবং কালে উভয়েই ছড়াইয়া লইয়া দেখিতে চাহে। এই সকল ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়াই প্রত্যেক দ্রষ্টা দেশের সহিত কালের এবং নিজের দেশ বা কালের সহিত অপরের দেশ ও কালের সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রসর হইয়া থাকে।

আরও দেখা গেল যে, আপেক্ষিকতাবাদের বিচার-প্রণালীতে পরিমাপের প্রাধান্যটা বিশেষভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যামাত্রই পরিমাপের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং ঘড়ি ও ফুটরুলই উহার প্রধান অস্ত্র ; কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানমাত্রই কোনও না কোনরূপ পরিমাপের উপরে নির্ভর করে। আপেক্ষিকতাবাদে প্রত্যেক ধারণা (concept) একটা পরিমাপের ফল নির্দ্দেশ করে ; যাহার সম্বন্ধে পরিমাণজ্ঞান নাই, তাহা আছে কি নাই—বলাই চলে না। সত্য কি ?—যাহা বাস্তব জগতে আছে, তাহাই বাস্তব সত্য। আছে কি ?—যাহাকে মাপজোখের গণ্ডির ভিতরে আনা যায়। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ পরিমাপযোগ্য নহে ; সুতরাং উহা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। ঘটনার চিহ্ন অনুসরণ করিয়া দেশ ও কালের পরিমাপ করা চলে ; সুতরাং ঘটনাময় জগতে দেশ ও কাল প্রত্যেক দ্রষ্টার পক্ষে খাঁটি পদার্থ। ঘটনাকে বাদ দিয়া উহাদের পরিমাপ করা চলে না ; সুতরাং ঘটনা-নিরপেক্ষ দেশ বা কাল মরীচিকামাত্র। পরিমাপের মূল কথা কি ? পরিমাপের মূলে রহিয়াছে তুলনা-বুদ্ধি—পদার্থের সহিত মাপকাঠির তুলনা, সমজাতির সহিত সমজাতির তুলনা। জগতে বৈচিত্র্য কেন ? উহারও মূলে রহিয়াছে তুলনা-বুদ্ধি—একটা পরিমাপের ফলের সহিত অপর একটা পরিমাপের ফলের সম্বন্ধ-নির্দ্দেশের চেষ্টা ; এবং ইহারই ফলে ভেদ-জ্ঞান ও বাস্তব জগতে নিয়মের প্রাধান্য। যে দ্রষ্টার তুলনা-বুদ্ধি বা পরিমাণ-জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে ছোট-বড় নাই ; তাহার দৃষ্টি বৈচিত্র্যবিহীন। বাস্তব জগৎ তাহার কাছে নিয়মের রাজত্ব নহে—উহা মরীচিকামাত্র ; অথবা এ'সম্বন্ধে হয়'ত তাহার একটা মতও নাই।

পরিমাপ সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলি সকলই কিছু নূতন কথা নহে ; কিন্তু বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণটা একটা নূতন প্রয়োজনরূপে উপস্থিত হইয়াছে এবং এ'জন্য গোড়ার কথাগুলিও খুঁটিনাটি করিয়া বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। মোটামুটি-ভাবে উপরের কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পরবর্ত্তী অংশের অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে —সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাসঘোষ

(১২) মেরুদণ্ডী (Chordata)

(ক) আত্মদণ্ডী (Protochorda)

Balanoglossus—শুণ্ডশিরঃ
Branchial groove—রন্ধ্রখাত
Collar—গলবলয়; গলদেশ
Collar nerve tube—নাড়ীনলিকা
Gillslit—কণ্ঠকূপ
Gillpouch, atrial chamber—শ্বাসকোষ
Gillpore—শ্বাসরন্ধ্রাণু
Glomerulus—প্রস্রবগুলিকা
Neuropore—নাড়ীরন্ধ্র
Nuchal skeleton—গলকঙ্কাল, গলত্রিশূল
Lateral septum—শিরাপট্ট
Pericardium—সঙ্কোচনকোষ্ঠ
Pleural fold—পৃষ্ঠ-পার্শ্ববলি
Proboscis gut, stomochord—শুণ্ডান্ত্র শুণ্ডদণ্ড
Septal bars—ব্যবধায়ক দণ্ড
Tornaria—অঞ্চলাঙ্গী
Tongue bar—আলম্ব দণ্ড
Trunk—দেহকাণ্ড

(খ) পুচ্ছদণ্ডী (Urochorda, Tunicata)

Appendicularia—সোপাঙ্গী
Ascidiacea—নির্যাসাঙ্গীবর্গ
Ascidian tadpole—বালভেকাঙ্গী
Atrial aperture, cloacal aperture—পায়ুদ্বার
Atrial siphon—পায়ুনলক
Atrial cavity, peribranchial cavity—পরিশ্বাসকোষ্ঠ
Branchial aperture—শ্বাসমুখ
Branchial siphon—শ্বাসনলক
Branchial sac—শ্বাসকোষ্ঠ
Cyclomyaria—পূর্ণবলয়াঙ্গী
Dorsal tubercle—পৃষ্ঠোৎসেধ
Dorsal lamina—পৃষ্ঠবলী
Dorsal languet—পৃষ্ঠপট্ট
Endostyle—বক্ষখাত
Hemimyaria—অর্দ্ধবলয়াঙ্গী
Larvacea—চিরবালভেকাঙ্গীবর্গ
Œsophagus—অন্ননালী
Peripharyngeal band—কণ্ঠপার্শ্বিক আলি
Prebranchial zone—পুরঃশ্বাসকোষ্ঠ
Stigmata—শ্বাসরন্ধ্র
Subneural gland—স্বাদনগণ্ড, অধোনাড়ীগণ্ড
Test—নির্যাসাচ্ছাদন
Tentacles of the prebranchial zone—কণ্ঠশুণ্ডিকা
Thaliacea—চক্রাঙ্গীবর্গ

Typhlosole—অন্ত্রবলি, অন্ত্রালি

(গ) পূর্ণদণ্ডী (Cephalochorda)

Afferent branchial artery—শ্বাসাঙ্গাভিগা ধমনী

Amphioxus, lancelet—ফলকী

Atriopore—পায়ুরন্ধ্র

Branchial lamella—শ্বাসফলক

Cerebral nerve—মস্তিষ্কনাড়ী

Dorsal fissure—পৃষ্ঠবিদার

Efferent branchial artery—শ্বাসাঙ্গাপগা ধমনী

Encephalocœle or cerebral ventricle—মস্তিষ্কগহ্বর

Endostyle—বক্ষখাত

Eye-spot—অক্ষিচিহ্ন

Giant cell—মহাকোষ

Gill-slit, branchial aperture—শ্বাসরন্ধ্র

Gonad—জননাঙ্গ

Groove of hatschek—ছাদখাত

Hepatic coecum—পক্বান্ধান্ত্র

Hepatic portal vein—যকৃদভিগা শিরা

Hepatic vein—যকৃদপগা শিরা

Myomere, myotome—পেশীপর্ব্ব, পেশীখণ্ড

Metapleure—পার্শ্ববলী

Nephridia—মূত্রনালিকা

Neurocoele—নাড়ীগহ্বর

Neuropore—নাড়ীরন্ধ্র

Olfactory lobe—ঘ্রাণগদা

Oral hood—মুখবেষ্ট

Pharynx—কণ্ঠাশয়

Rostrum, preoral lobe—তুণ্ড

Subintestinal vein—অন্ত্রাধঃ শিরা

Synapticulae—অনুপ্রস্থযোজক

Tongue lamella—জিহ্বাকার ফলক

Velum—মুখপট্ট

Ventral aorta—বক্ষকণ্ডরা

Vestibule—মুখগহ্বর

Velar tentacle—পট্টশৃঙ্গ

Wheel organ—ঘূর্ণযন্ত্র, ঘূর্ণাঙ্গ

(ঘ) করোটিক, কশেরুক (Craniata, vertebrata)

Abducent—বহিরক্ষিচালক নাড়ী

Acetabulum—বংক্ষণচষক

Alisphenoid—অধোজতুকপক্ষাস্থি

Amphistylic—উভধৃত, হনু করোটি

Articular—হনুসন্ধ্যস্থি

Autostylic skull—স্বধৃতহনু করোটি

Auditory foramen—শ্রবননাড়ী ছিদ্র

Auditory capsule—শ্রবনাঙ্গবেষ্ট

Aquous chamber—জলধরকোষ্ঠ

Aquous humour—তরল রস

Auditory nerve—শ্রুতিনাড়ী

Auricle—শাখাকোষ্ঠ, হৃৎকর্ণ

Arachnoid—জাল মস্তিষ্কচ্ছদ

Basisphenoid—জতুকপাদাস্থি

Basihyal—জিহ্বামূলিকাস্থি

Basioccipital—অধঃ পশ্চাৎকপালাস্থি

Basibranchial—মূলকাষ্কত, চক্রযোজক

Blood vessal—রক্তনালী

Brain—মস্তিষ্ক

Branchial arch—শ্বাসাঙ্গ চক্র

Blood corpuscle—রক্তকণিকা

Buccal cavity—মুখগহ্বর
Bulbus arteriosus—কণ্ডরাপাদ
Cement—সংঘাত
Central canal—সুষুম্নাবিবর
Conjunctiva—যোজনত্বক্
Cornea—স্বচ্ছ পটল
Corpus striatus—চিত্রিতপিণ্ড
Ciliary process—অংশুবলী
Carpal—মণিবন্ধাস্থি
Cartilage bone—উপাস্থিগত অস্থি
Centrum, body—কশেরু পিণ্ড
Ceratohyal—মহাশৃঙ্গ, মধ্যজিহ্বাধর
Cortex—বাহ্যস্তর
Ceratobranchial—মধ্য কাঙ্কত
Cerebellum or epencephalon—অণু-মস্তিষ্ক
Choroid—কৃষ্ণ পটল
Cerebrum—মহামস্তিষ্ক
Choroid plexus—কপিশঝিল্লি
Ciliary muscle—অংশুপেশী
Crus cerebri—মস্তিষ্কস্তম্ভ
Cone—শঙ্কুকোষ
Centralia—মধ্যগুল্ফাস্থি
Conus arteriosus—বামন কোষ্ঠ
Centralia—মধ্য মণিবন্ধাস্থি
Chondrocranium—উপাস্থিময় করোটী
Coracoid—তুণ্ডাস্থি
Claricle—অক্ষকাস্থি
Dentine—রদিন
Dentary—দন্তধরাস্থি
Distalia—অধোগুল্ফাস্থি
Dental papilla—দন্তাঙ্কুর
Diverticulum—অন্ধনলিকা
Duramater—দৃঢ় মস্তিষ্কচ্ছদ
Diencephalon thalamencephalon—মধ্যবর্ত্তী মস্তিষ্ক
Distalia—অধোমণিবন্ধাস্থি
Dorsal fissue—পৃষ্ঠখাত
Enamel—রুচক
Enamel organ—রুচকযন্ত্র
Endbulb—সংজ্ঞাবর্ত্তুল
Ependyme—কোষঝিল্লি
Epicoele—ঊর্দ্ধ গহ্বর
Epiotic—ঊর্দ্ধ শঙ্খাস্থি
Epiphysis—প্রান্তখণ্ড
Enteric canal—অন্নবহনালী
Ecto-ethmoid—পার্শ্বভর্ভরাস্থি
Exoccipital—পার্শ্ব-পশ্চাৎকপালাস্থি
Epibranchial—ঊর্দ্ধকাঙ্কত
Epihyal—লঘুশৃঙ্গ, ঊর্দ্ধজিহ্বাধর
Exoskeleton—বাহ্যকঙ্কাল
Endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল, কঙ্কাল
Facial nerve—বক্ত্রনাড়ী
Fore brain—পুরোমস্তিষ্ক, অগ্রমস্তিষ্ক
Fourth ventricle, metacoele—পশ্চাদ্-গহ্বর
Femur—ঊর্বাস্থি
Fibulare—বাহ্যজঙ্ঘাতলাস্থি
Fibula—অণুজঙ্ঘাস্থি
Frontal—পুরঃকপলাস্থি
Foramen magnum—মহাবিবর
Fontanelle—কপালরন্ধ্র, শিরঃরন্ধ্র
Gallbladder—পিত্তস্থলী
Ganglion—নাড়ীগ্রন্থি

Gasserian ganglion—ত্রিমূলগ্রন্থি
Gill—শ্বাসকক্ত
Glossopharyngeal—জিহ্বকণ্ঠগা নাড়ী
Gustatory—স্বাদগ্রাহী নাড়ী
Glenoid surface—অংসপীঠ
Gullet—কণ্ঠনালী, অন্ননালী
Grey matter—ধূসরবস্তু
Hæmal ridge—ধামন বর্দ্ধন
Haemal arch—ধমনী চক্র
Haemoglobin—রক্তলোহিত
Hard dentine—দৃঢ়রদিন
Heart—হৃদয়
Hind brain—পশ্চাৎ মস্তিষ্ক
Hypoglossal—জিহ্বাচালক নাড়ী
Hepatic portal vein—যকৃদগামিনী শিরা, যকৃদাতিগা শিরা
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি
Hyostylic skull—জিহ্বাধরধৃত হনু করোটি
Hypobranchial—অধঃকাক্ত
Hyoidean suspensorium—জিহ্বাধর ধারণ
Hypohyal—অধোজিহ্বা ধরাস্থি
Hyomandibular, cartilage pharyngohyal—হনুধরোপাস্থি
Hyoid arch—জিহ্বাধর চক্র
Ilium—কট্যাস্থি
Ischium—পশ্চাৎবঙ্ক্ষনাস্থি
Inter orbital—অক্ষিকোটর মাধ্যিক
Intermedium—মধ্যজঙ্ঘাতলাস্থি
Intestine—অন্ত্র, পক্বাশয়
Infundibulum—কূপীবর্দ্ধন
Intermedium—মধ্যপ্রকোষ্ঠ-পাদাস্থি
Jugular vein—নীলাশিরা
Jugal—গণ্ডাস্থি
Mandibular arch—হনু-চক্র
Mandible—নিম্নহনু, অধোহন্বস্থি
Mandibular suspensorium—হ্বধারণ
Labial cartilage—ওষ্ঠোপাস্থি, অধরোপাস্থি
Lymphatic—লাসিকা
Lateral ventricle—পার্শ্বগহ্বর
Lamina terminalis—অন্তঃফলক
Lens—অক্ষিকাচ
Left sympathetic nerve—পিঙ্গলা
Liver—যকৃৎ
Lung—ফুস্‌ফুস্‌
Maxilla—ঊর্দ্ধহন্বস্থি
Maxillary nerve—হনুসংজ্ঞা নাড়ী
Mandibular nerve—নিম্নহনু সংজ্ঞা নাড়ী
Metanephros—নববৃক্ক
Mesonephros—মধ্যবৃক্ক
Mesentery—অন্ত্রধর
Metencephalon or medulla oblongata—সুষুম্নামূল
Mid-ventricle, mesocoele—আদিমধ্যগহ্বর
Mid-brain, mesencephalon—মধ্যমস্তিষ্ক, আদিমধ্যমস্তিষ্ক
Muellerian duct—আদি ডিম্বনালী
Medullary groove—নাড়ীখাত
Metatarsal—পাদশলাকা, পাদতলাস্থি
Mesethmoid—মধ্যঝর্ঝরাস্থি
Membrane or investing bone—ছদনগত অস্থি

Meckel's cartilage—অধোহনুচক্র, অধোহনূপাস্থি
Metacarpal—পাণিশলাকা, করতলাস্থি
Nasal—নাসাস্থি
Nervous system—নাড়ীমণ্ডল
Neurocoele—নাড়ীগহ্বর
Neural arch—পৃষ্ঠচক্র
Neural tube—নাড়ীবেষ্ট উপাস্থিনলক, নাড়ীনলক
Neuromast-organ, lateral line organ—পার্শ্বসংজ্ঞকাঙ্গ
Neuroglia—নাড়ীধর
Notochordal sheath—পৃষ্ঠদণ্ডবেষ্ট
Notochord—পৃষ্ঠদণ্ড
Nostril, anterior naris—নাসারন্ধ্র
Opisthotic—পশ্চাৎ-শঙ্খাস্থি
Orbitosphenoid—ঊর্দ্ধজতুকপক্ষাস্থি
Olfactory capsule—ঘ্রাণাঙ্গবেষ্ট
Optic thalamus—দৃষ্টিধর পিণ্ড
Odontoblasts—দন্তোৎপাদক কোষ
Oculomotor—চক্ষুচালন-নাড়ী
Olfactory bulb, rhinencephalon—ঘ্রাণদণ্ড
Olfactory ventricle, rhinocoele—ঘ্রাণগহ্বর
Optic nerve—দৃষ্টিনাড়ী
Ophthalmic nerve—রক্তস্পর্শনাড়ী, রক্ত সংজ্ঞা নাড়ী
Optocoele—দৃষ্টিগহ্বর
Optic lobes—দৃষ্টিবহখণ্ড
Optic capsule—অক্ষিবেষ্ট
Olfactory foramen—ঘ্রাণনাড়ীরন্ধ্র
Optic foramen—দৃষ্টিনাড়ীরন্ধ্র
Osteocranium—অস্থিময় করোটি
Osteodentine—অস্থিময় রদিন
Ora senata—তরঙ্গপ্রান্ত
Palatine—তাল্বস্থি
Palatoquadrate cartilage—তালুচতুষ্কোপাস্থি, ঊর্দ্ধহনুচক্র
Parachordal—দণ্ডাগ্রপার্শ্বী
Parietal—পার্শ্বকপালাস্থি
Parasphenoid—দণ্ডকালাস্থি
Pancreas—পাচনগ্রন্থি
Pacinian corpuscle—স্পর্শগদা
Parietal organ—পুরোগ্রন্থি
Parapineal eye—শীর্ষচক্ষু
Pallium—মহাচ্ছদ
Parencephalon—মহামস্তিষ্কার্দ্ধ
Pituitary body—পোষণিকাগ্রন্থি
Pineal body, Epiphysis—শীর্ষগ্রন্থি
Pineal eye—পুরোচক্ষু
Piameter—অন্তঃ মস্তিষ্কচ্ছদ
Pronephros—আগুবৃক্ক
Pronephric duct—আগুবৃক্কনালী
Prosencephalon—পুরোবর্ত্তী মস্তিষ্ক
Pelvic girdle—শ্রোণীচক্র
Pectoral arch, Shoulder girdle—অংসচক্র
Perichoral tube—পৃষ্ঠদণ্ডবেষ্টক, উপাস্থি নলক, দণ্ডনলক
Phalanges—অঙ্গুল্যস্থি
Proctodeum—গুহ্যখাত
Pharynx—কণ্ঠগহ্বর, কণ্ঠ

Pharyngobranchial—কণ্ঠচক্রধর
Postanal gut—পশ্চাদন্ত্র
Premaxilla—পুরোহন্বস্থি
Prosocoele, foreventricle—পুরোগহ্বর
Pupil—কনীনিকা
Pro-otic—পুরঃশঙ্খাস্থি
Presphenoid—পুরোজতুকাস্থি
Ptetygiophone—পক্ষধরাস্থি
Pterygoid—উপপক্ষাস্থি
Pulmonary vein—ফুস্‌ফুস্ শিরা
Pubis—পুরোবঙ্ক্ষনাস্থি
Quadrate—চতুরস্রাস্থি
Radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Radiale—বাহ্যপ্রকোষ্ঠপাদাস্থি
Retina—অক্ষিপট
Right sympathetic nerve—ইতা
Rods—দণ্ডকোষ
Renalportal vein—বৃক্কগাশিরা
Redblood corpuscle—লাল কণিকা
Rib—পর্শুকা
Saccus vasculosus—রক্তময় গ্রন্থি
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Sclerotic—শ্বেতপটল
Sinus venosus—শিরাকোষ্ঠ
Spleen—প্লীহা
Spinal accessory—অতিরিক্ত মস্তিষ্কনাড়ী
Spinal nerve—সুষুম্নানাড়ী
Suspensory ligament—কাচধর
Sympathetic nerve—স্বতঃকর্মী নাড়ী
Scapula—অংশফলক
Sella turcica—পর্য্যাণখাত
Shaft—কাণ্ড
Skull—কারোটি
Spinal cord—সুষুম্নানাড়ী
Squamosal—শঙ্খাকারাস্থি
Sternum—বক্ষোহস্থি
Sternal rib—বক্ষঃপর্শুকা
Stomach—পাকস্থলী, আমাশয়
Stomodaeum—মুখখাত
Subintestinal vein—অন্ত্রাধোগা শিরা
Supraoccipital—ঊর্দ্ধ-পশ্চাৎ কপালাস্থি
Suspensorium—হনুধারণ
Tarsal—গুল্ফাস্থি
Taste bud—স্বাদনমুকুল, স্বাদনাঙ্কুর
Thymus—উণ্ডুকগ্রন্থি
Third ventricle, diacoele—মধ্যবর্ত্তী গহ্বর
Thyroid—গলগ্রন্থি
Touch corpuscle—স্পর্শকণিকা
Touch cells—স্পর্শকোষ
Trochlear nerve—সহকর্মী নাড়ী
Tibia—জঙ্ঘাস্থি
Tibiale—অন্তঃজঙ্ঘাতলাস্থি
Tooth—দন্ত
Tooth pulp—দন্তমজ্জা
Trabecula—দন্তপার্শ্বী
Transverse process—বাহ্য প্রবর্দ্ধন
Trigeminal foramen—ত্রিধানাড়ী ছিদ্র
Ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Ulnare—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Vaso-dentine—রক্তময় রদিন
Vagus foramen—দূরগনাড়ীছিদ্র
Vertebra—কশেরুকা
Ventricle—মস্তিষ্কগহ্বর
Ventricle—কাণ্ডকোষ্ঠ, হৃদ্দর

Vitreous chamber—সান্দ্ররস কোষ্ঠ
Vitreous humour—সান্দ্ররস, ঘনরস
Vertebral rib—পৃষ্ঠপর্শুকা
Ventral fissure—বক্ষঃখাত
Visceral arch—কণ্ঠচক্র
Visceral bars—কণ্ঠচক্রার্দ্ধ, কণ্ঠদণ্ড
Visceral skeleton—কণ্ঠকঙ্কাল
Vomer—সীরিকাস্থি
Wolffian duct—মধ্যবৃক্কনালী
White matter—শ্বেতবস্তু

বিবিধ

বিজ্ঞান ও মানবের ভবিষ্যৎ

স্বনামখ্যাত সার্ অলিভর লজ্ ইদানীং প্রেততত্ত্ব লইয়া কিছু বেশী নাড়াচাড়া করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও সুধীসমাজ তাঁহার মুখ হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শুনিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। সেদিন তাঁহার জন্মস্থান ষ্টোক্ নগরের বণিকসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি বলেন—বিজ্ঞানক্ষেত্রে কোথাও বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় না; এক সার্ব্বজনীন প্রীতি-সূত্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ আবদ্ধ। এক জনের আবিষ্কৃত তথ্য আর এক জন কাজে লাগাইয়া থাকেন। জাতিতে জাতিতে বিরোধ নাই; কোথাও কোনও একটা নূতন কিছু করা হইলে উহা সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যায়। একটা নিবিড় বন্ধুত্বের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে; এই আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের কাছে আমি অনেক আশা করি; আমি আশা করি যে সভ্য নেশনগুলির সমর-প্রবৃত্তি অতীতের ইতিহাসে পর্য্যবসিত থাকিবে। এতদিন সমর-প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া উচিত ছিল। যুদ্ধে কোনও কিছুর শেষ মীমাংসা হয় না, পরন্তু বিষম অনর্থের সৃষ্টি হয়। বিজেতা যাহা আশা করেন, তাহা পান না। সমস্ত জিনিষটা আগাগোড়া একটা বিষম প্রমাদমাত্র। ধ্বংসকার্য্যে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করা উচিত নয়। মানুষ আকাশে বিচরণ করিতেছে। এই ব্যোমবিহার সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে; ইহার সাহায্যে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উন্নতির চেষ্টা হওয়া কিছু মাত্র শক্ত নয়। এই খেচরত্ব ও তারহীন বার্ত্তাপ্রবাহ দূরকে নিকট করিয়াছে ও সমস্ত ব্যবধান প্রায় ঘুচাইয়া দিয়াছে। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা যেন পরস্পরের খুব কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছি। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের চেষ্টা সকল দিক হইতে হওয়া উচিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের কথা মনে পড়িতেছে। ক্লার্ক্ ম্যাক্সবেল্ গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে যে তরঙ্গ-হিল্লোলের থিওরি দাঁড় করাইয়াছিলেন, সেই হিল্লোলের কি উপায়ে উৎপত্তি সম্ভবপর, অথবা তাহাকে কেমন করিয়া চিনিতে পারা যাইবে, তাহা তিনি অথবা

তাঁহার সমসাময়িক কোনও পণ্ডিত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। ত্রয়োদশ বৎসর পরিশ্রমের ফলে আমি উহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলাম। কিন্তু হার্ট্‌জ্‌ আরো সুন্দররূপে উহার সহিত পরিচয়-স্থাপনে সমর্থ হইলেন। তদবধি উহা হার্ট্‌জীয় তরঙ্গ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তারহীন বার্ত্তাপ্রবাহকে আমি সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী পণ্যহিসাবে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিতে পারি নাই; সে কাজটি মার্কণি সুসম্পন্ন করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার আবিষ্কৃত টিউনিং প্লেট অবলম্বন করিয়া ফ্লেমিং কিছুদূর অগ্রসর হইলেন; আজ কথা-বার্ত্তা, গান-বাজনা, ছাই-ভস্ম অনেক পাওয়া যাইতেছে।......লোকে কখনও কখনও বলিয়া থাকে যে, ঈথর একটা অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার মাত্র; ঈথর নাই; আইন্‌ষ্টাইন্‌ না কি ঈথরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়াছেন। আইন্‌ষ্টাইন্‌ কিন্তু নিজে তাহা মনে করেন না। তিনটি বক্তৃতায় তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গণিতশাস্ত্রের সীমানা অতিক্রম করিয়া পদার্থবিদ্যার সাহায্যে বিশ্বপ্রহেলিকা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলে ঈথর একান্ত আবশ্যক। ঈথরই একমাত্র মৌলিক সত্য; আমরা অনবরত উহাকে কাজে লাগাইতেছি। অগ্নির সম্মুখে কোনও বস্তুতে তাপ দিতেছ; বল দেখি, অগ্নির উত্তাপ কি করিয়া ঐ দ্রব্যে সংক্রমিত হয়? উত্তপ্ত বায়ু? ভুল, ভুল। বায়ু তপ্ত হয় না। নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইল অতিশীতল শূন্যমার্গের ভিতর দিয়া সূর্য্যের উত্তাপ পৃথিবীতে পৌছায় কি উপায়ে? যখন তোমরা সূর্য্যকিরণ উপভোগ কর, তখন এই ঈথরের স্পন্দন অনুভব কর; আর কিছু নয়। সমস্ত শক্তি ঈথরের ভিতর দিয়া আসে। টেলিগ্রাফি, তার-বেতার বার্ত্তা ঈথরের ভিতর দিয়া চালিত হয়। এই ঈথরকে সব রকমে আমরা ব্যবহার করিতেছি। আণব বস্তুপিণ্ডের মধ্যে ইহা বিদ্যমান। ইহা অবিনশ্বর; বস্তুপুঞ্জের ধ্বংস হইলেও ইহার বিনাশ নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অণুপরমাণু ছাড়া অন্য কিছু আছে। অণুসমষ্টি, বস্তুপুঞ্জই অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। একবার এক জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; তিনি বুঝাইতেছিলেন, নক্ষত্রগুলা কত দূরে দূরে অবস্থিত। একটি উপমা দিয়া তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সূর্য্য ও তৎসমীপবর্ত্তী পাঁচটি নক্ষত্রের কথা ধরা যাক্‌। ছয়টা কমলালেবু লও; একটা ইউরোপে, একটা এসিয়ায়, একটা আফ্রিকায়, একটা উত্তর-আমেরিকায়, একটা দক্ষিণ-আমেরিকায়, একটা অষ্ট্রেলিয়ায় রাখ। আকারের অনুপাতে সূর্য্যের সহিত নক্ষত্রগুলির দূরত্ব ইহাতে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ক্যালিফর্ণিয়া উইল্‌সন মানমন্দিরের জ্যোতির্ব্বেত্তা মিঃ হাব্‌ল্‌ লণ্ডনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি এণ্ড্রোমেডা নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব পরিমাপ করিয়াছেন। আট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ইহা যেমনটি ছিল, ঠিক সেইটিকে আমরা দেখিতেছি;—ইহার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌছিতে আট লক্ষ বৎসর লাগিল। মনে রাখিতে হইবে, আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল! বিশ্বের মানচিত্র এতই বিরাট! আর আমরা এই গ্রহের কীটাণুকীট, আমরা এই অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্বের বিশালতা অস্বীকার করি! ইহার তুলনায় আমাদের

জ্ঞান কতটুকু সীমাবদ্ধ। কিন্তু পদার্থবিদ্যা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। হল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, সর্ব্বত্রই তরুণ অনুসন্ধিৎসু এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে, তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া পা ফেলা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। ঈথর থিওরির সবেমাত্র গোড়াপত্তন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা আমাকে পীড়িত করিতেছে;—ব্যাপকতার আশা করা বাতুলতামাত্র। বিশাল বিজ্ঞানের ভূপৃষ্ঠ আমরা নখাগ্রে বিক্ষত করিতেছি মাত্র। এখন আমার ৭৭ বৎসর বয়স হইয়াছে; শত বর্ষ জীবনধারণ করিতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। জীবনের পরপারে অবশ্যই আমাদের প্রচুর অবসর থাকিবে; কিন্তু যতদিন আমরা এখানে আছি, আমাদের সময়ের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা উচিত। কল্যাণকার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইহাই মহাসুযোগ। তবুও, কালোহ্যয়ং নিরবধি,—ব্যক্তিবিশেষের অথবা জাতিবিশেষের ভবিষ্যৎ সুদূরপ্রসারিত। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন যে, এমন কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কোটি বৎসরের মধ্যে এই পৃথিবাতে মানবের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইবে, অথবা সূর্য্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমোন্নতির ফলে আজি হইতে সহস্র বৎসর পরে মানবের কি অবস্থা হইবে—কে বলিতে পারে? মানবের ভবিষ্যৎ খুব মহৎ। আমরা সবেমাত্র এই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছি। আমরা প্রায়ই ভুল করি, আমরা অর্দ্ধসভ্য,—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। উন্নতি করিবার যথেষ্ট সময় আছে; ইত্যবসরে আমরা এই বিশ্বের বিপুলতা ও সরলতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? সমগ্র ভৌতিক পদার্থের সহজ উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলি নাই। যদি বলি যে, কেবল মাত্র দুইটি তড়িৎ ইউনিট্, প্রোটন ও ইলেক্ট্রন হইতে সমস্ত জিনিষ সমুদ্ভূত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবে। আমরা বৈজ্ঞানিক; আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। গভীরতর বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহল রহিয়াছে। ভগবান্, ভগবদ্বাণী আমাদের চিরবিস্ময়ের সামগ্রী। কি মহান্, অথচ কি সরল!

হার্ভের স্মৃতি উপলক্ষে উৎসব

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাবিকাশের ইতিহাসে যে সকল মনীষীর নাম এ'দেশে সাধারণ পাঠকবর্গের নিকটে পরিচিত, হার্ভে বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অন্ততঃ ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত যিনি মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন, অথবা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনি ইঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। জীবদেহে রক্ত-চলাচলতত্ত্ব তাঁহারই আবিষ্কার। লাপ্লাস্, নিউটন্, কপার্ণিকস্, গ্যালিলিও যে যুগের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছেন, তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া হার্ভের জ্যোতি হয়'ত কতকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার ত্রিশততম শ্রাদ্ধোৎসবে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রায় শতাধিক বিজ্ঞানসেবী ও চিকিৎসককে বাকিংহাম প্রাসাদে আমন্ত্রণ

করিয়া হার্ভের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই মাসে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, হার্ভে জীবরক্ত সম্বন্ধে যে নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী জীববিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা তাহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। সে-দিন যখন স্যর্ জন্ ব্র্যাড্‌ফোর্ড্ সমাগত সুধীবৃন্দকে রাজদরবারে লইয়া গিয়া সম্রাটকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বগামী ইংলণ্ডের রাজারা হার্ভেকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বলিলেন যে, তিনি গৌরববোধ করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজারা হার্ভে-প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নবীন ভেষজ-বিজ্ঞানের উদ্ভবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মিঃ রয় চ্যাপ্‌ম্যান্ এণ্ড্রুজ আবার মঙ্গোলিয়ায়

'প্রকৃতি'র পাঠকবর্গের কাছে মিঃ এণ্ড্রুজের নাম অপরিচিত নাই। ইনি মার্কিণ দেশের অধিবাসী। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে লইয়া তিনি এ'পর্য্যন্ত তিন বার উত্তর-মঙ্গোলিয়ায় লুপ্ত জীবনিদর্শনের অন্বেষণে আসিয়া যে সকল অতিকায় সরীসৃপের ডিম্ব ও কঙ্কাল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা যথাসময়ে পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মার্কিণ যাদুঘরে সযত্নরক্ষিত সেই সকল বিলুপ্ত জীবচিহ্ন লইয়া বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। এবার মিঃ এণ্ড্রুজ মঙ্গোলিয়ায় গিয়াছেন আদিম মানবের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তাহার অন্বেষণের চেষ্টায়। নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা। মার্কিণ দেশে এখনও নানা স্থানে বিদ্বৎসমাজে মানুষ বানরের সগোত্র কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। বানর হইতে নর উদ্ভূত—এই প্রাচীন ডারুইনীয় তথ্য আজকাল জগতের কুত্রাপি স্বীকৃত হয় না বটে; কিন্তু গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং ও মানুষ যে সগোত্র, এ'বিষয়ে বড় একটা মতভেদ কোথাও দেখা যাইতেছে না। তবে আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র। ডেটন্ নগরের নর-বানর মকদ্দমায় সুধী-সমাজ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষক বিদ্যালয়ে ডারুইন্-তত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত ছাত্রগণের সহিত আলোচনা করিতেন, এই অপরাধে তিনি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন। মানবের জন্মকথা খৃষ্টান বাইবেলে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বিদ্যার্থী মানিয়া লইবে, ইহাই আদালত হইতে সাব্যস্ত হইয়া গেল। মিঃ এণ্ড্রুজ বলিতেছেন যে, তিনি মঙ্গোলিয়ায় যাহার অন্বেষণে এবার আসিয়াছেন, তাহা পাইলে এই নর-বানর দ্বন্দ্ব চিরদিনের মত ঘুচিয়া যাইবে; মানুষ বানর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব কি না, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। ক্রমশঃ ইদানীং তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মেরুদণ্ডী ও সরীসৃপ জীব সম্বন্ধে উত্তর-মঙ্গোলিয়ায় যে সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, আদিম মানব সম্বন্ধেও দক্ষিণে সেইরূপ পাওয়া যাইবে। তিনি নিজে জীবতত্ত্ববিদ্; তাঁহার বিশ্বাস, এই স্থানই আদিম মানবের জন্মভূমি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। উষ্ণপ্রধান অথবা অরণ্যসঙ্কুল দেশে সম্ভবতঃ মানবের উদ্ভব হয় নাই; কিন্তু মঙ্গোলিয়ার এই স্বল্পারণ্য মালভূমিতে তাহা সম্ভবপর; কারণ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর

পূর্ব্বেও এই মালভূমির অবস্থা অনেকটা আজিকার মতই ছিল। আপাততঃ গোবি মালভূমির প্রান্তে কাল্গানের উত্তর-পশ্চিমে তিন শত মাইল দূরে তিনি ও তাঁহার নয় জন সহচর খনন-কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন যুগে যখন এ অঞ্চল জীবের আবাসভূমি ও বিচরণস্থল ছিল, তখন ইহার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও অবস্থান ঠিক আধুনিক আফ্রিকার উচ্চ মালভূমির মতই ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পিকিং নগরের বাহিরে কয়েক মাইল দূরে একটি গুহার মধ্যে দুইটি দাঁত পাওয়া যায়; পরীক্ষার ফলে স্থির হইল, ঐ দুইটি দাঁত একটি আট বৎসরের শিশুর ছিল। গত বৎসর ঐ অঞ্চলে আর একটি দাঁত পাওয়া যায়; আবিষ্কর্ত্তা ডক্টর ডেভিড্সন ব্ল্যাক্ এই দন্তবিশিষ্ট মানবকে 'চীন-মানব' (Sinanthropus) বা 'পিকিং মানব' (Peking Man) আখ্যা দিয়াছেন। মিঃ এণ্ড্রুজ ইহাকে 'যব-মানব' (Pithecanthropus) অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন। অন্ততঃ দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে 'যব-মানব' ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত। এবার মঙ্গোলিয়ায় মিঃ এণ্ড্রুজ খুঁজিতেছেন বিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষকে। এখন মহাচীনে প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্জ্বলিত। পাছে তিনি বিফল মনোরথ হন—এই জন্য এক জন চীনা ডাকাত-সর্দ্দারকে অর্থ-প্রলোভনে হস্তগত করা হইয়াছে। সে বলিয়াছে, কোনোও ভয় নাই; যাহাতে নিরুপদ্রবে কার্য্য সমাধা হয়, তাহার ব্যবস্থা সে করিবে। বেশ কথা। কিন্তু গত ১৬ই মে তারিখে নিউ-ইয়র্কের ন্যাচরাল্ হিষ্ট্রী মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ তারযোগে সংবাদ পাইলেন যে, মিঃ রয় চ্যাপ্‌ম্যানের পায়ে কে গুলি মারিয়াছে। মিঃ এণ্ড্রুজের সহচরগণ বলিতেছেন, মানুষের জন্য আসিয়াছি; অন্ততঃ ঘোড়ার ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিব না কি? আধুনিক অশ্বের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ? সেই যাহার পায়ে পাঁচটা আঙ্গুল ছিল? ব্যাপারটা মোটেই হাস্যকর নয়। কেহ যেন না মনে করেন যে,ই হা ঘোড়ার ডিমের অভিযান। মিঃ রয় চ্যাপ্‌ম্যান এণ্ড্রুজ এখন পর্য্যন্ত বিফলপ্রযত্ন হন নাই।

স্যর অরেল্ ষ্টাইনের সম্মান

ইণ্ডোলজিষ্ট্ অথবা ওরিয়েন্টালিষ্ট্ সমাজে স্যর অরেল্ ষ্টাইন্ বিশেষভাবে পরিচিত। সম্প্রতি লণ্ডনের স্যর ফ্লিণ্ডর্স পেট্রি ফণ্ড হইতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। যখন স্যর ফ্লিণ্ডর্স পেট্রি মিসরের পুরাতত্ত্বের নিদর্শন আবিষ্কার করিবার জন্য পিরামিড্ স্ফিংক্সের মধ্যে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন ষ্টাইনের নাম বড় একটা লোকসমাজে পরিচিত হয় নাই। ষ্টাইন্ কাশ্মীরে থাকিতেন; এখনও তিনি কাশ্মীরে আছেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনি মধ্য-এশিয়ার মালভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু প্রাচীন লিপির সন্ধান পান। যেখানে কোনও কিছু লুক্কায়িত থাকিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না, সেরূপ স্থলেও কোনও প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ গোপন গর্ভগৃহ হইতে তিনি অমূল্য পুঁথিপত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্বে ভারত সরকার গৌরবান্বিত হইল বটে; কিন্তু লিপিপাঠ উদ্ধার

করিবার জন্য তাহাদের অধিকাংশই ইউরোপে পাঠান হইল। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফরাসি পণ্ডিত অনেকগুলির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। কাষ্ঠফলকে, চর্ম্মগাত্রে বা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত রাষ্ট্র অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার্লিনে এখন সস্ত্রীক অধ্যাপক লূডর এই পাঠোদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহারা সম্প্রতি মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ স্যর অরেলের আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর লূডর মধ্য-এশিয়ার মালভূমির প্রাচীন সভ্যতার কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। স্যর অরেল্ ষ্টাইনের সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পুরাতনের নূতন করিয়া পরিচয় লইবার জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেহই আর শুধু পুরুষপরম্পরাগত পৌরাণিক কাহিনীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে কোনও কিছু সুধীসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে তবেই তাহা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়। স্যর অরেল্ সেইরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

পথ্য ও দন্ত

সভ্য সমাজে নানা প্রকার ব্যাধির সহিত দন্তের ও পথ্যের সম্বন্ধ-বিচার চলিতেছে; আবার দন্তের নানা প্রকার ব্যাধির সহিত পথ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইদানীং পাশ্চাত্য ভিষক্-সমাজ অনেকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, দেহের স্নায়ুমণ্ডলী ও সমগ্র নরকঙ্কাল যেমন ভোজ্য পদার্থ দ্বারা নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, দন্তের গঠনও সেইরূপ খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, দাঁতে পোকা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দাঁতের গঠনের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সে ধারণা অমূলক। আমাদের খাদ্য দ্রব্য তিন প্রকারে দাঁতকে আক্রমণ করিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যাংশ দাঁতের ফাটলে থাকিয়া গেলে তদ্দ্বারা দন্তের উপরিভাগের চক্‌চকে এনামেল্ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; এমন কি, তাহাতে দাঁতের গঠনের ইতরবিশেষ হইতে পারে। অথবা খাদ্যবিশেষে আমাদের মুখাভ্যন্তরস্থ লালারস পরিবর্ত্তিত হইয়া দশনপংক্তির বিপদ ঘটাইবার সম্ভাবনা আছে। কিম্বা খাদ্যসামগ্রী যেমন সহজে সোজাসুজিভাবে আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ক্রিয়া করে, সেইরূপ সোজাসুজিভাবে হয়' ত উহা আমাদের দন্তকে আক্রমণ করে। খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া দন্ত দ্বারা পিষ্ট হওয়া আবশ্যক। যথাসম্ভব চর্ব্বণে উপযুক্ত লালারস সঞ্চিত হয়; এবং যে বীজাণু মুখাভ্যন্তরস্থ ভুক্তাবশেষের পরিপাকে সহায়তা করে, তাহাকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দাঁতের গোড়া শক্ত করে এবং দাঁতকে পরিষ্কৃত রাখে। শর্করাযুক্ত নরম, চট্‌চটে কার্ব্বো-হাইড্রেট্ খাদ্যসামগ্রী হইতে অম্ল উদ্ভূত হয়; এই অম্ল দাঁতের এনামেল্‌কে আক্রমণ করে; সুতরাং দাঁতে পোকা হয়। কিন্তু শাঁসালো খাদ্য, যথা—ফল, মুলা, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি দাঁতকে পরিষ্কার করে। আহার্য্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তনে লালারসের

পরিবর্ত্তন হয় কি না, এখনও ঠিক জানা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে ভিটামিনের কথা আসিয়া পড়ে; ভিটামিন কম হইলে, দাঁত শক্ত হইতে পারে না। কয়েক জন বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ এই বিষয় লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে রায়বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুয়েজ খালে প্রাণিতত্ত্ববিদের অভিযান

সুয়েজ খাল কাটা হইবার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের জীবজন্তুর মধ্যে অদ্ভুত পার্থক্য দেখা যাইত; অনেক ক্ষেত্রে এক জাতীয় জীব এক সমুদ্রে দেখা যাইলে অপর সাগরে তাহার অস্তিত্ব আদৌ পাওয়া যাইত না। খাল কাটা হইবার পর লোহিত সাগরের চিংড়ি জাতীয় জীব (Crustaceans) ভূমধ্যসাগরের সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। এমন কি উত্তর-মিশর উপকূলে লোহিত সাগরের মুক্তা-শুক্তি পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। এই উভয় সমুদ্রের জীবজন্তুর অদলবদলের রহস্যভেদ করিবার জন্য রয়েল সোসাইটি অধ্যাপক এইচ, মান্‌ড্রো ফক্সের নেতৃত্বাধীনে একটি অভিযানের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। মিশর রাজসরকার এবং সুয়েজ কেনাল কোম্পানি এই বৈজ্ঞানিক অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকের দল সুয়েজ খালের কিনারায় ক্রিটেসস্ এবং ইওসিন্ যুগের প্রথম অবস্থার প্রস্তরাদির সন্ধান পাইয়াছেন। মধ্য-প্লাওসিন্ যুগে ভূমধ্যসাগরের সহিত যে লোহিত সাগর সংযুক্ত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, উক্ত স্তরে লোহিত সাগরের জীবের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। তবে কেমন করিয়া কোন্ সময় যে ভূভাগের উদ্ভব হইয়া দুই সমুদ্রকে পৃথক করিল—তাহা বলা সুকঠিন। এখানে আরও অনেক শঙ্খ-শম্বুকাদির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্ব এখনও নীল নদীতে দেখা যায়। সুয়েজ খালে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদাদির সংখ্যা বিশেষ আশাপ্রদ নহে; তাহার কারণ, সর্ব্বদা জাহাজ-ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে এবং যন্ত্র দ্বারা মাটি তোলা হইতেছে। খালের উভয় প্রান্ত অপেক্ষা উপকূলে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদাদির সংখ্যা এবং জাতিভেদ অনেক বেশী। সুয়েজ খালে প্রাপ্ত দ্বাদশটি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তিরাশীটি জাতির এবং লোহিত সমুদ্রের দুই শত চৌত্রিশটি জাতির প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের কোন ইতিহাস এখানকার জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে থাকিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইত। অভিযানের কার্য্য এখনও ধারাবাহিকরূপে চলিবে বলিয়াই জানা গিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কোন্ নূতন রহস্য ধরা পড়িবে, কে বলিতে পারে।

ডাঃ সার্জ্জ ভরনফ্ এবং গো-মেষাদি জন্তুর উৎকর্ষ-সাধন

ডাঃ সার্জ্জ ভরনফ্ গো-মেষাদি পশুর দেহে নূতন গ্রন্থি (glands) প্রবেশ করাইয়া দিবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ক্রিয়ার ফলে পশুর শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়;

উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং লোমশ পশুর পশমের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক কৃষিতত্ত্ববিদ্-সম্মিলনের বৃটিশ প্রতিনিধিগণ আলজিরিয়ায় ডাঃ ভরনফের কার্য্য-পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া একটি বিবরণ প্রকাশিত করায় সাধারণের দৃষ্টি এ'দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিপ্রজনন-বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এফ, এ, ই, ক্রু; কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-জৈবনীতির অধ্যাপক ডাঃ এফ, এইচ, এ, মার্শাল এবং এডিনবরা ভেটরনারী কলেজের অধ্যাপক মিঃ ডব্লিউ, সি, মিলার ব্রিটিশ প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ডাঃ ভরনফ্ এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দ ফ্রান্স আলজিরিয়া, মরোক্কো, সুদান ও ইটালিতে শত শত প্রাণিদেহে নূতন গ্রন্থি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। অত্যন্ত প্রাচীন এবং অল্পবয়স্ক উভয় প্রকার জীবেই পরীক্ষা-কার্য্য চলিয়াছিল। বৃদ্ধ জীবে উক্ত প্রক্রিয়ার ফলে বলবৃদ্ধি হয়; এবং যৌবনের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়। বৃদ্ধ মেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে সাধারণ জীবনকাল অপেক্ষা ছয় বৎসর বেশী বাঁচিতে পারে এবং বার্দ্ধক্যের পরও পাঁচ ছয়টি শাবক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধ বৃষও উক্ত প্রক্রিয়ায় খুব উদ্যমশীল এবং উৎপাদনক্ষম হয়। পশম এবং মাংসের উৎকর্ষসাধনের জন্য অল্পবয়স্ক জীবে উক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। আলজিরিয়া সরকারের আহ্বানে ডাঃ ভরনফ্ তিন হাজার ভেড়ায় এই পরীক্ষা-কার্য্য চালাইবার জন্য ট্যাড্‌মিটে গিয়াছিলেন। ফল খুব আশাপ্রদ হইবে বলিয়াই মনে হয়।

ক্যান্সার রোগের বৃত্তান্ত

সম্প্রতি ক্যান্সার সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-বিভাগের দুই খানি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। একখানিতে মলদ্বারের ক্যান্সারের বর্ণনা আছে। প্রায় ছয় হাজার রোগী পরীক্ষা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিভাগীয় কমিটি তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। মোটের উপর দেখা গিয়াছে যে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার প্রায় বার মাস পরে তাহারা চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। এই সমস্ত রোগীদিগের আন্দাজ অর্দ্ধেকের উপর চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যেগুলির উপর অস্ত্রোপচার ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাদের ছয় ভাগের এক ভাগ মারা গিয়াছিল। মৃতের আর্দ্ধেক আবার "সেপসিস্" (Sepsis) হইয়া মারা গিয়াছিল; প্রতি পাঁচ জনে দুইজন করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। অপর রিপোর্ট খানিতে মূত্রদ্বারের (Uterus) ক্যান্সারের আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এখানেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণ দেখা দিবার প্রায় ছয় মাস পরে রোগী ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আসে এবং তাহাদের অর্দ্ধেকের চিকিৎসা করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। এ'ক্ষেত্রে অস্ত্র-ব্যবহারের পর শত করা ছয় জন হইতে সাত জন লোক মারা যায়। যোনিদেশের ক্যান্সার অস্ত্র করিবার পর শতকরা চৌত্রিশ জন এবং উদরের ক্যান্সার অস্ত্র করিবার পর শতকরা

চুয়াল্লিশ জনকে পাঁচ বৎসর যাবৎ জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে; জরায়ুর ক্যান্সার চিকিৎসার পর শতকরা সাড়ে একষট্টি জন পাঁচ বৎসর যাবৎ বাঁচিয়াছিল। এই দুইখানি রিপোর্ট হইতে দেখা গিয়াছে যে, নারীদিগের সন্তান-জন্মের সহিত এই রোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; বিশেষতঃ শিশু পূর্ণাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই যদি গর্ভপতন হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধির আক্রমণ-সম্ভাবনা অধিক। এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ রোগীর নিকট কিরূপে প্রকাশ পায়; অস্ত্রোপচার করিবার পর যে মৃত্যু ঘটে, তাহার প্রধান কারণ কি কি; চিকিৎসা না করিলেই বা রোগী কত কাল বাঁচিতে পারে প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ আলোচনা এই দুই খানি রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

তিমির প্লবনশীলতা

তিমি সম্বন্ধে এখনও অনেক অজানা বিষয় রহিয়াছে। কোন তিমি মরিলে ভাসিয়া উঠে, আবার কোন তিমি মরিয়া অতল সমুদ্র-গর্ভে তলাইয়া গেল—ইহা লইয়া মিঃ রবার্ট, ডবলিউ, গ্রে সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ওজনের খোঁচ দিয়া তিমি শিকার করা হয়। খুব কম ওজনের বর্শা দিয়া একবার বিদ্ধ করিলে তিমি তৎক্ষণাৎ জলমধ্যে নিমজ্জিত হয়, আবার কিছুকাল পরে জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে এবং শিকারী পুনরায় বর্শাবিদ্ধ করিবার সুযোগ পায়; দ্বিতীয় বার বিদ্ধ হইয়াও যাহারা ডুবিয়া যায়, তাহারা আর ভাসে না। গ্রীণল্যাণ্ডের সবল, দুর্ব্বল, পুং, স্ত্রী, প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল প্রকার তিমিই জলের উপরিভাগে মরিলে ভাসিয়া উঠে এবং সাগরের গভীরতম প্রদেশে মরিলে জলের মধ্যে তলাইয়া যায়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, তিমির ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট বাতাস থাকে; মরিবার সময় ঐ বাতাস বাহির হইয়া গেলে সাধারণ স্তন্যপায়ীর ন্যায় সেও জলের তলায় ডুবিয়া যায়। বর্শা এবং শিকলের ভারেও বিদ্ধ তিমি অনেক সময় তলদেশ হইতে উপরে উঠিতে বাধা পায় বলিয়া মিঃ গ্রে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আপেক্ষিকতা-বাদের স্থূল কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)
কুম্ভীর-তত্ত্ব—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৫)
কস্তুরীর কথা—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্‌সি (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৫)
জীবতত্ত্বের অ আ—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু (সুবর্ণবণিক সমাচার, চৈত্র ১৩৩৪)
জৈবসার—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক (কৃষক, চৈত্র ১৩৩৪)
তিব্বতে মৃতের সৎকার—শ্রীসত্যভূষণ সেন (মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৫)
নলকূপ প্রস্তুতপ্রণালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে বি-ই, সি-ই, (স্বাস্থ্য-সমাচার, বৈশাখ ১৩৩৫)
নূতন তারার ইতিহাস—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্‌-সি (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৪)
প্রকৃতির খেয়াল ও মানুষের চেষ্টা—(কৃষক, বৈশাখ ১৩৩৫)
ফসলে পোকা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (গ্রামের ডাক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৪)
ফসলের পোকা মারিবার ঔষধাবলী—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (কৃষক, চৈত্র ১৩৩৪)
বিছনাচ—শ্রীসুখদাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৪)
ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী সার—অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাসের সহিত মোলাকাৎ (আর্থিক উন্নতি, বৈশাখ ১৩৩৫)
ভোল্টা শতবার্ষিকী—অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা এফ্‌-আর্‌-এস্ (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫)
মানুষের শত্রু—ইন্দুর—শ্রীমতী গঞ্জলিকা দেবী (স্বাস্থ্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)
মুর্গী-চাষ—জাতিনির্ব্বাচন—শ্রীসুরথকুমার বসুঠাকুর (কৃষিসম্পদ, চৈত্র ১৩৩৪)
রৌদ্র-সেবন—ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন বসু এম-ডি (স্বাস্থ্য-সমাচার, বৈশাখ ১৩৩৫)
শশা—শ্রীদীনেশচন্দ্র দেব বি-এস (কৃষিসম্পদ, চৈত্র ১৩৩৪)

Printed and published by Sj. Raghunath Seal. B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuabazar Street Calcutta.
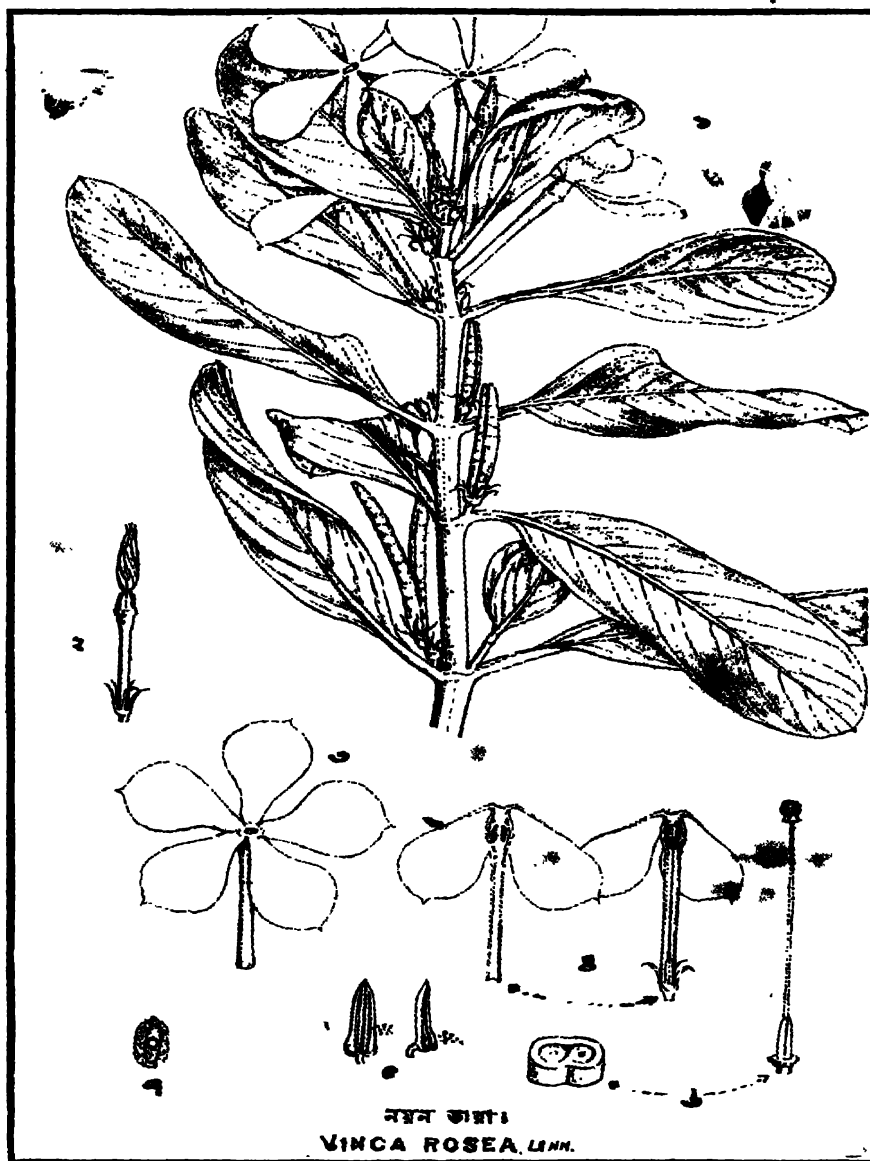
Del. F. B. Das.
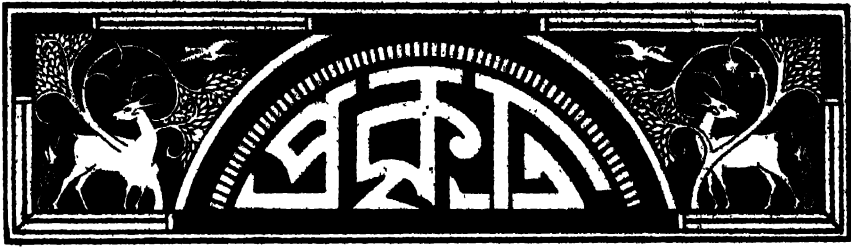
৫ম বর্ষ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৫ ২য় সংখ্যা

পাতিয়ালার উদ্ভিদাবলী

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

পঞ্চনদের শিখরাজত্ব-সমূহের মধ্যে পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভাই প্রধান। তন্মধ্যে পাতিয়ালার আয়তন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মহারাজা আলা সিংহ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহ ঘনসম্বদ্ধ নহে। মাঝে মাঝে বৃটিশ শাসিত ভারত ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের অধিকৃত স্থানসমূহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ পাতিয়ালা রাজ্য ৫টি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—করমগড়, অমরগড়, আনহাদ্‌গড়, পিঞ্জোর এবং মহেন্দ্রগড়। এ'সমস্ত বিভাগেই রাজস্ব আদায় ও বিচারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। অবশ্য সকল বিষয়েই পাতিয়ালা সহরে অবস্থিত রাজদরবারের মতামত লইয়া বিভাগগুলিকে কার্য্য করিতে হয়।

প্রাকৃতিক অবস্থান

পাতিয়ালা রাজ্যের আয়তন ৬ হাজার বর্গ মাইলের কিছু কম; পঞ্চনদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমায় ইহা অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে হিসার এবং রোটক্‌ জিলা। পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের মীরট্, বুলন্দসহর, মজঃফরনগর ও সাহারানপুর এবং পঞ্চনদের অম্বালা ও কর্ণাল জিলা; উত্তরে ফিরোজপুর এবং লুধিয়াণা; দক্ষিণে পাতিয়ালা রাজ্যের অধিকৃত স্থান বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত; সর্ব্বদক্ষিণ সীমা, যথা—নারনাউল, রাজপুতানার আলওয়ার ও জয়পুর রাজ্য-সংলগ্ন। উত্তর-পূর্ব্বে শিবালিক পর্ব্বতমালা বিস্তৃত এবং পাতিয়ালা রাজ্যের কিয়দংশ শিবালিক গিরিশ্রেণী ভেদ করিয়া সিমলা পাহাড়ের সন্নিহিত চাইল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুতঃ, সিমলা পাহাড় এক

সময়ে পাতিয়ালা রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ সরকার উহা পাতিয়ালা দরবারের নিকট গ্রহণ করেন। পাতিয়ালা রাজ্যের অংশ-সমূহ এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় উহাদের উদ্ভিদ্-সমষ্টিও (flora) মিশ্রভাবাপন্ন হইয়াছে।

কর্ষিত উদ্ভিদ্

সর্ব্বপ্রথমে আমরা চাষের শস্য, ফল, ফুল ও সব্জী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। পাতিয়ালা রাজ্যের কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৩৩ লক্ষ একর অর্থাৎ মোট জমির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। সাধারণ হিসাবে দেখিতে গেলে কর্ষিতের সহিত অকর্ষিত জমির এইরূপ অনুপাত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সরকারী কাগজপত্র-নিহিত অঙ্কমাত্র। অনেক স্থলে নামমাত্র চাষ হয়; উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ও ফলনের হার এত কম যে, তাহাতে চাষীর কোন লাভই হয় না। ইহার অন্যতম কারণ—জলাভাব; মৃত্তিকাও অপকৃষ্ট এবং সার কমই ব্যবহৃত হয়। মোট কর্ষিত জমির শতকরা ২৮ ভাগের অধিক জমিতে জলসেচনের কোন ব্যবস্থা নাই। সমতল প্রদেশে কাদা ও বেলে দোঁয়াশ মাটি দৃষ্ট হয়; ভাটিণ্ডা জিলার দিকে উহা ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বেলে মাটিতে পরিণত হইয়াছে। বারিপাত শুধুই যে কম, তাহা নহে—সময়োপযোগী বৃষ্টিও হয় না। বারিপাতের প্রধান সময় দুইটি :—ছোট বরসাত্ (পৌষ-মাঘ) এবং বড় বরসাত্ (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ)। একে বারিপাত কর্ষিত জমির পক্ষে যথেষ্ট নয়, তদুপরি পূর্ব্বকালে অনুচিত রূপে অরণ্য ধ্বংশ করায় যে পরিমাণ বারিপাত হয়, তাহাও মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ না করিয়া উপর দিয়া উদ্দাম বেগে বাহিত হইয়া নদীতে পড়িয়া প্রবল বন্যা উৎপাদিত করে। এই প্রকার জলপ্রবাহ যে উপরিভাগের সূক্ষ্ম স্তর ধুইয়া লইয়া গিয়া মৃত্তিকার শস্য-পোষনের শক্তি নষ্ট করে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রত্যেক ফসল দ্বারা অধিকৃত জমির পরিমাণের হিসাবে পাতিয়ালার ফসল-সমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় :—

জমির পরিমাণ

১। ১ লক্ষ একর এবং তদূর্দ্ধ— { গোধূম (কণক), ভুট্টা (মক্কি), ছোলা (চেনা), জোয়ার, বজরা, কার্পাস।

২। ৫০ হাজার একর এবং তদূর্দ্ধ—যব, সরিষা, রাই, তোরিয়া।

৩। ২০ হাজার একর এবং তদূর্দ্ধ—ধান (শালী)।

ধানের চাষ চণ্ডীগড় হইতে উর্দ্ধ দিকে দিহুঘাট পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কাল্‌কা রেল-ষ্টেসনের ন্যূনতিদূরবর্ত্তী পিঞ্জোর অঞ্চলের কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট ধান জন্মিয়া থাকে। চাউলের দর কিন্তু অধিক—উহা সাধারণের খাদ্য নহে। ভুট্টার আটাই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ;

গ্রাম্য অঞ্চলে টাকায় ৮ সের—সহরে কিছু কম। পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকে ভুট্টার আটা এবং সরিষা অথবা মূলাশাক ভাজি পাইলে খুবই পরিতৃপ্ত হয়। সহরাঞ্চলে ভদ্র ব্যক্তিগণের সাধারণ খাদ্য গোধূম আটার রুটি, কড়ায়ের ডাইল, দধি ও বড়ির রায়তা, যে কোন একপ্রকার সব্জীর তরকারি এবং দু'এক রকমের চাটনী। অবশ্য আমরা এ'স্থলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গের কথা বলিতেছি না।

পাতিয়ালা রাজ্যে ৪০ জাতিরও অধিক ফল আছে; কিন্তু কোনটিই সুলভ নহে। এ'স্থলে সমস্ত ফলের উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যক নাই; কেবল যেগুলি বিশিষ্ট ফল বলিয়া গণ্য করা হয়, সেইগুলিরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) করিল্ (Capparis aphylla Roth.)—করিল্ বর্ষাকালে জন্মে ও গ্রীষ্মকালে পাকে; ইহার নবীন পর্ণপুট এবং ফল চাটনী রূপে ব্যবহৃত হয়। রাজপুতানা হইতে মিশর পর্য্যন্ত সমস্ত শুষ্ক জমিতেই এই কণ্টকময় গুল্ম জন্মিয়া থাকে।

(২) আম্র—পাতিয়ালায় আম যথেষ্ট পাওয়া যায়, যদিও উহার সময় (season) স্বল্প। সমতল প্রদেশ হইতে কাল্কার উপরে পিঞ্জোর পর্য্যন্ত আম দেখিতে পাওয়া যায়। পিঞ্জোরের প্রসিদ্ধ উদ্যানেই কয়েক জাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র আছে।

(৩) খেজুর—পাতিয়ালা সহরের রাজোদ্যানে আরব দেশীয় খেজুরের দুই চারিটি গাছ আছে। এতদ্ভিন্ন পিঞ্জোরের পথে ঘঘ্‌র নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে বন্য খর্জ্জুর বৃক্ষ বিদ্যমান। অন্যান্য কেন্দ্রেও—বণুর, ছাত ইত্যাদি—খেজুর গাছের সংখ্যা ২৫।৩০ হাজারের কম হইবে না। মোট সংখ্যা ন্যূনাধিক এক লক্ষ। দুঃখের বিষয় যে, এই সমুদয় খেজুর গাছের কোন সদ্ব্যবহার হয় নাই। পাতিয়ালায় খাদ্য অথবা শর্করার যেরূপ অভাব, তাহাতে এই পরিমাণ খেজুর গাছ লইয়া একটি মধ্যম গোছের চিনির কারখানা অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু সে দিকে রাজসরকারের বিশেষ চেষ্টা নাই।

(৪) আঙ্গুর, আঞ্জীর, সেও, আড়ু, জরদালু প্রভৃতি মেওয়া ফলেরও অল্পবিস্তর চাষ আছে; কিন্তু বাজারে যে ফল আসে, তাহা সুলভ নয়।

সব্জীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। কতকগুলির ব্যবহার বাঙ্গালীর নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে।

কাচনার, কাঞ্চন (Bauhinia variegata L.)—উদ্যান-জাত মধ্যমাকার বৃক্ষ; ইহার পুষ্পকলি (কাচনার ফলী) রায়তা ও অন্যান্য তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশেও এই জাতীয় কাঞ্চন বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ত্বকের ভিতরের অংশ হইতে রং ও কষ নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। শিমূলের নবীন শুঁটি অর্থাৎ বৃতি (calyx) পঞ্চনদ ও সাহারাণপুরে প্রিয় খাদ্য।

তিন্দো (Cucumis flexuosus)—ইহার আকার ক্ষুদ্র খরবুজ অথবা বেল সদৃশ; সামান্য গন্ধযুক্ত। পাতিয়ালার বাহিরে সাহারাণপুরে যথেষ্ট তিন্দো জন্মিয়া থাকে।

ইহার তরকারি সুস্বাদু। আর একটি শশাকী বর্গীয় (Cucurbitaceae) ফল পঞ্চনদে সুলভ অথচ এতদ্দেশে নাই—উহা কাকড়ি (Cucurbita utilissima), লম্বায় এই ফল প্রায় ১ গজ হয়। তরুণ অবস্থায় দেখিতে সবুজ; তখন ইহাকে চাট্‌নী করিতে অথবা শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারা যায়। পক্কফল শ্বেতাভ ও ফোঁটার ন্যায় দাগযুক্ত। কাকড়ি-বীজে যথেষ্ট পরিমাণ শ্বেতসার ও তেল আছে। পাতিয়ালায় গাজরের আদর খুবই বেশী। সামান্য তরকারি হইতে হালুয়া পর্য্যন্ত গাজর দ্বারা প্রস্তুত হয়। বাজারে গাজরের ন্যায় কোন সব্জী এত অধিক পরিমাণে দেখা যায় না। পাতিয়ালার সজ্‌নে ডাঁটা তিক্ত জাতীয় (Moringa conconensis)। বেলুচিস্থান, রাজপুতানা এবং বোম্বাই প্রদেশের অরণ্য-সমূহে ইহা বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়।

মুংরা (Raphanus sa tivus)—ইহা মূলা জাতীয় উদ্ভিদ্; ইহার ফল মূলার ফল অপেক্ষা অনেক বড় এবং খাইতেও সুস্বাদু।

উদ্ভিদ্-সংস্থান

উদ্ভিদ্-তত্ত্বের হিসাবে পাতিয়ালা রাজ্যে তিন শ্রেণীর উদ্ভিদ্-সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) পশ্চিম হিমালয়; (২) সিন্ধুনদ প্রান্তর এবং (৩) গাঙ্গেয় প্রান্তরের উচ্চাংশ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাতিয়ালা রাজ্যের কিয়দংশ শিবালিক পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম হিমাচলে প্রবেশলাভ করিয়াছে; উহা হইতেই প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদ্-সমষ্টির প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্বদিকে মীরট, বুলন্দসহর, সাহারাণপুর প্রভৃতি যুক্ত প্রদেশের জেলা-সমূহ অবস্থিত হওয়ায় পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্যে গাঙ্গেয় প্রান্তরের কতকগুলি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুনদ-প্রান্তরের বৃক্ষাবলী পঞ্চনদের বিশিষ্ট গাছ। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পাতিয়ালা রাজ্যের সমতল অপেক্ষা পার্ব্বত্য অংশে অধিক সংখ্যক তরুগুল্মাদি বিদ্যমান। পশ্চিম হিমাচলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার দক্ষিণ গাত্রে উদ্ভিদ্-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। পক্ষান্তরে উত্তর গাত্রে বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং উহাদের বৈচিত্র্যও অধিক। নিম্ন পাহাড়-সমূহে থোহড়্ (Euphorbia Royleana Boiss) এবং চির (Pinus longifolia Roxb.) সাধারণ বৃক্ষ। থোহড়ের গাছ মনসাসিজ সদৃশ; ৫-৭ কোণ ও কাঁটাযুক্ত; ১৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ও ২-৩ ফুট ব্যাস-সমন্বিত। চির অথবা সরল গাছ চিরহরিৎ (চিত্র নং ১)। Coniferae শ্রেণীর এই গাছই সমতল প্রদেশে অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। কাল্‌কা হইতে সিমলার পথে গিরিশ্রেণীর নগ্নমূর্ত্তি কতকটা এই দুই জাতীয় গাছ দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে। থোহড় ও চির যথাক্রমে ৬ ও ৭ হাজার ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে। তৎপরে বাণ (Quercus incana Roxb.—Ban-oak—চিত্র নং ২) এবং কায়ল (Pinus excelsa Wall—চিত্র নং ৩) থোহড় ও চিড়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে পাতিয়ালার সমতল অংশে ওষধি শ্রেণীর (herbaceous) উদ্ভিদেরই প্রাধান্য

অধিক। এ'গুলি ভারতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় এবং ইহাদের সহিত প্রতীচ্যের, আফ্রিকার এবং ইউরোপেরও কয়েকটি জাতি মিশ্রিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং উহারা বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট।

চিত্র—১

চিরগাছের ফল

পাতিয়ালার উদ্ভিদাবলী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উক্ত প্রদেশের যে যে অংশে যেরূপ উদ্ভিদ্ পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা আবশ্যক। পাতিয়ালা হইতে

চিত্র—২

বাণগাছের ফল

পিঞ্জোর যাইবার পথে নিম্নলিখিত তরুগুল্মাদি দেখা যায়। সাধারণ প্রবাদ এই যে, পিঞ্জোরের

প্রাচীন নাম পঞ্চপুর এবং ইহা পাণ্ডবগণ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। ঘাঘরের দুই শাখানদী কৌশল্যা ও ঝাঝরের সঙ্গমস্থলে পিঞ্জোর অবস্থিত। প্রথমে ইহা শীরমুয়ের রাজার অধীন ছিল; পরে আলমগীরের ওমরাহ ফিদাইখাঁর অধিকারে আসে। লাহোরের সালিমার উদ্যানের আদর্শে ফিদাই খাঁ এ'স্থলে সুরমা পঞ্চতল উদ্যান প্রস্তুত করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা রাজদরবার এই উদ্যান অধিকার করেন। এখানকার ধর্ম্মমণ্ডল নামক তীর্থ সুপ্রসিদ্ধ ও প্রত্যেক বৎসর বৈশাখী সপ্তমীর দিনে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। অনেক বিদেশী পর্য্যটক ও ফৌজের অফিসার প্রভৃতি পিঞ্জোরের বাগান দেখিতে গিয়া থাকেন। পাতিয়ালা সহর হইতে পিঞ্জোর ৪৫ মাইল।
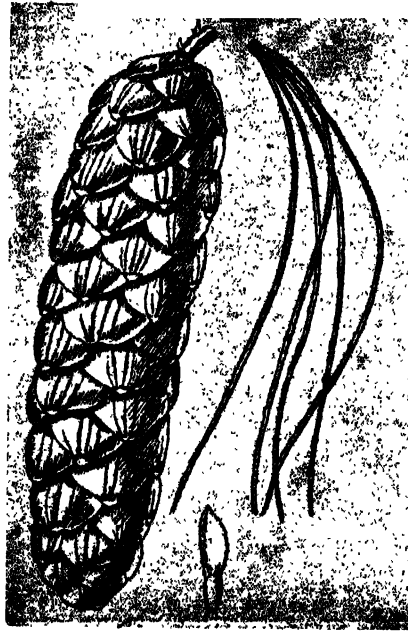
চিত্র—৩

কায়ডু গাছের ফল

পিঞ্জোরের পথে প্রথম স্তর রাজপুরা। ইহা রাজা তোদরমল্ল দ্বারা স্থাপিত। অতীতের সাক্ষীস্বরূপ মোগলসরাই ও ইষ্টক নির্ম্মিত বেষ্টনী বা প্রাচীর অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সরাই এখন তহশীলদারের কাছারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুরা পর্য্যন্ত রাস্তার প্রথম স্তর একবারে সমতলক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণ কর্ষিত ক্ষেত্র এবং পলাশ, কুল ও বাব্‌লাগাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ

করিয়া পঞ্চনদের মধ্য দিয়া হিমালয়ের ৪ হাজার ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত পলাশ প্রসারলাভ করিয়াছে। পুরাকালে ইহা শাস্ত্রীয় উদ্ভিদ্ ছিল। কুরুক্ষেত্রের দিগন্তব্যাপী প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদের উন্মুক্ত প্রান্তরে পলাশ-কুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। লবণাক্ত জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে ; লাক্ষাতরু হিসাবেও ইহার উপকারিতা আছে। মুদির দোকানে বাণ্ডিল বাঁধিতে কিম্বা খাদ্যপাত্র প্রস্তুত করিতে বহু পরিমাণে পলাশ পাতার কাট্‌তি আছে। হস্তী ও মহিষ পলাশ পাতা খাইতে ভালবাসে।

পথপার্শ্বে দৃষ্ট অপরাপর গাছের মধ্যে বাকস, নিসিন্দা এবং পনিরবন্দ (Withania coagulans Dunal) সাধারণ। শেষোক্ত গুল্ম অশ্বগন্ধা জাতীয়। বৈদ্যগণ ইহাকে নাগরী অশ্বগন্ধা বলেন ; ইহার বীজ-চূর্ণ সামান্য মাত্রায় দুধের সহিত মিশাইয়া দিলে দুগ্ধ ছানা বাঁধিয়া জমিয়া যায়। পনির প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইহার নাম 'পনিরবন্দ' হইয়াছে। আফগানিস্থান পর্য্যন্ত পনিরবন্দ জাতি প্রসারিত। রাজপুরা হইতে লালরু—পিঞ্জোর যাইবার পথে—দ্বিতীয় স্তর বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। ইহা কিন্তু পাতিয়ালা রাজ্যের বহির্ভাগে। লালরুর সন্নিকটে দেশ উচ্চ নীচ হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; এবং এখান হইতে বিলাতী সব্জী চাষও অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই রাস্তায় বহুলদৃষ্ট উদ্ভিদ্-সমূহের মধ্যে ধামন (Grewia) এবং লেসোড়ার (Cordia) কয়েকটি জাতি, শিশু এবং ঝান্দ উল্লেখযোগ্য। ঝান্দ (Prosopsis spicigera L.) একটি উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক বৃক্ষ ; শুষ্ক জমিতে জন্মিয়া থাকে। তরুণ ফলের শাঁস Carob ফলের (Ceratonia siliqua) ন্যায় সুমিষ্ট। দুর্ভিক্ষের সময় ফলের শাঁস ও মিষ্ট ত্বক-চূর্ণ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ড ভাল জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহার হয়। আমেরিকায় টেক্সাস্ প্রদেশে সমগণান্তর্ভুক্ত Prosopsis juliflora Dc. গাছের মনুষ্য ও পশুর পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহাও পঞ্চনদে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঘাঘর তীর হইতে পিঞ্জোর পর্য্যন্ত রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ এবং হিমালয়ের পাদদেশে জমি অধিক আর্দ্র বলিয়া উদ্ভিদ্-সংখ্যাও পিঞ্জোরের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্-সমষ্টির প্রকৃতি

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশদভাবে পাতিয়ালার উদ্ভিদ্-সমষ্টির প্রকৃতি বিচার করিবার স্থান নাই। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, পাতিয়ালার বিশেষ উদ্ভিদ-সমূহ যে কয়টি প্রাকৃতিক বর্গের (Natural order) অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির সংখ্যা প্রায় ৬০ হইবে। তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাতি-সমূহের সংখ্যাধিক্যের হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান :—

১। শিম্বীবর্গ
(Leguminosae)—২৯ জাতি

২। গাঁদাবর্গ
(Compositae)— ১৫ ”

৩। তৃণবর্গ
(Gramineae)— ১৪ জাতি

এরণ্ড বর্গ
(Euphorbiaceae)—১৩ ”

৫। গোলাপ বর্গ (Rosaceae)— ১১ জাতি

৬। হস্তিশুণ্ডবর্গ (Boragineae)— ৭ জাতি

দুইটি হইতে তিনটি জাতি আছে—এ'রূপ বর্গের সংখ্যা ৩৩-এর অধিক নয়। এক জাতীয় উদ্ভিদ্‌যুক্ত বর্গ ২৩-এর অধিক হইবে না। বলা বাহুল্য যে, পাতিয়ালা-রাজ্যমধ্যে সংগৃহীত প্রায় দুই শত জাতীয় উদ্ভিদ্ পরীক্ষান্তর আমরা বর্ত্তমান মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। বৎসরের সকল সময় সংগ্রহ করিলে আরও অনেক জাতীয় উদ্ভিদ্ পাওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যে উদ্ভিদ্‌গুলি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, সেগুলি পাতিয়ালার উদ্ভিদ্-সমষ্টির প্রতিভূ স্বরূপ। সেগুলির প্রসার, অবস্থান প্রভৃতি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, পাতিয়ালার উদ্ভিদাবলী মূলতঃ সিন্ধুনদ-প্রান্তরের উদ্ভিদ্-শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ স্যর্ জোসেফ্ হুকার (Sir Joseph Hooker) যে দশটি বর্গকে সিন্ধুনদ-প্রান্তরের বিশিষ্ট বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে ৫টি (Gramineae, Leguminosae, Compositae, Boragineae, Euphorbiaceae) উপরোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন গোলাপবর্গের উদ্ভিদ্ ১১টি উক্ত তালিকায় আছে। গোলাপবর্গীয় গাছ প্রায়ই পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যায়। এ'স্থলেও তাহাই হইয়াছে; পিঞ্জোর তহশিলের মধ্যেই এই বর্গীয় গাছ সাধারণ এবং পিঞ্জোর উদ্ভিদ্-তত্ত্বের হিসাবে উত্তর-পশ্চিম হিমাচলের অন্তর্গত। এই তহশিলটি বাদ দিলে অবশিষ্ট পাতিয়ালা রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই অপুষ্ট ও বন্ধুর প্রকৃতি-সম্পন্ন (scrubby)। পূর্ব্বোক্ত দুইশত জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ৪৫টি শুষ্ক জমি অথবা মরু-প্রান্তের গাছ (Xerophyte); কেবল মাত্র দশটি আর্দ্র মৃত্তিকা অথবা জলাশয়ের তীরের উদ্ভিদ্ (Hydrophyte)। শেষোক্ত প্রকৃতির গাছ শুধু পূর্ব্ব সীমানায় দৃষ্ট হয়; উক্ত সীমানা যুক্ত-প্রদেশের এমন কয়েকটি জিলা-সংলগ্ন যে, সে সকল স্থানে বারিপাত সাধারণতঃ অধিক (Submontane districts)। উদ্ভিদাবলীর প্রসার বিবেচনা করিতে গেলে ভূ-তত্ত্ব হিসাবে দেশের গঠন এবং প্রকৃতিও বিবেচনা করা আবশ্যক। সেইজন্য এ'স্থলে বলা দরকার যে, পাতিয়ালার অন্তর্গত শিবালিক পর্ব্বতমালার দুইটি স্তর আছে:—(১) ঊর্দ্ধ শিবালিক—ইহাতে আবার ঊর্দ্ধ, মধ্যম ও অধঃ তিনটি স্তর আছে; (২) নিম্ন শিবালিক অথবা শিরমুর স্তর। কসৌলী, ডাগসাই, সুবাথু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গিরি-আবাস-সমূহ এই স্তরের অন্তর্গত। পাতিয়ালা ও তদন্তর্গত স্থান-সমূহ হিমাচল পর্ব্বতের তৃতীয় বেষ্টনীর (zone) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। অধিকাংশ স্থানের জমিই দোঁয়াশ; কেবল মাত্র পাহাড়ের সন্নিকটে কোন কোন স্থানে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হাল্‌কা মাটি দৃষ্ট হয়।

ব্যবহারিক উদ্ভিদ্

ব্যবহারিক হিসাবে দেখিতে গেলে পাতিয়ালা রাজ্যের স্বভাবজ সম্পদ অধিক বলিয়া বোধ হয় না। ব্যবহারিক উদ্ভিদাবলীর সংখ্যা অধিক নয় এবং উহাদের সদ্ব্যবহারের

চেষ্টাও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি কতকগুলি গাছ উল্লেখযোগ্য এবং উহাদের রীতিমত ব্যবহারিক প্রয়োগ করিলে লাভও হইতে পারে।

ঔষধের দ্রব্য :—এই শ্রেণীর ব্যবহারিক দ্রব্য প্রায় ১৮টি আছে; সোঁদাল, ইন্দ্রায়ণ (Colocynth), পাহাড়ী ধুতুরা (Stramonium), কুড়চী ও কালাদানা তন্মধ্যে অন্যতম। Colocynth পূর্ব্বে ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আমদানি হইত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে পাতিয়ালার ভাটিণ্ডা বিভাগ ও বিকানীর রাজ্যে শুষ্ক ইন্দ্রায়ণ প্রস্তুত হইতেছে। ভারতীয় Colocynth-এর শাঁস কম; কিন্তু গুণ বিলাতী দ্রব্যের সমতুল্য—কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কালাদানা (Ipomœa hederacea Jacq.—চিত্র নং ৪) কর্ষিত ও বন্য উভয় অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিরেচক বলিয়া ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

চিত্র—৪
কালাদানা গাছ

কষ ও রং :—প্রায় ২১ জাতীয় গাছ কষ ও রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাব্‌লা (স্থানীয় নাম—কিকর)—ইহা উত্তর ভারতের একটি প্রসিদ্ধ কষ-বৃক্ষ। পঞ্চনদে এক সময়ে বহু-সংখ্যক কিকর বৃক্ষ ছিল; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময়, যখন বহুল পরিমাণে চামড়া কষ করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন অনেক বৃক্ষের উচ্ছেদসাধন করা হয়। পাতিয়ালা রাজ্যে কষ-নিষ্কাসনের জন্য একাধিক কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। বাব্‌লার পাতা ও ফল উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। খয়ের—ইহার কাণ্ডান্তর্গত কাঠের পাত্‌লা টুক্‌রা বারম্বার জলে সিদ্ধ এবং উক্ত

জল ঘন করিয়া যে ক্বাথ পাওয়া যায়, তাহার নাম 'খয়ের' অথবা 'কাত্থা'। ইহা ঔষধার্থ ও পানে খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কষের জন্য কিন্তু খয়েরের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং কয়েক প্রকার খয়ের শুদ্ধ কষের জন্যই প্রস্তুত হয়। কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিদের মতে খয়েরের তিনটি উপজাতি আছে—উত্তর-পশ্চিম ভারতের (১) Acacia catechu ; বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের (২) A. catechuoides এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের (৩) A. sundra। পিঞ্জোর তহশিলে খয়েরের জঙ্গল আছে—যদিও উহা বহুবিস্তৃত নয়। পলাশ (স্থানীয় নাম—ঢাক) হইতে একপ্রকার সুন্দর হরিদ্রা বর্ণ প্রস্তুত হয়; দোলের সময় উহার প্রচলন খুব অধিক। দাড়িম্ব অথবা আনার পার্ব্বত্য অংশে খুব সুলভ; ইহার ফল ও ফুল হইতে পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে রং ও কষ প্রস্তুত হইত। বাকলির (Anogeissus latifolia Wall.) নবীন পত্র, জামরোয় (Elaeodendron glaucum Pers) এবং আমলকি ফলও কতক পরিমাণে কষ উৎপাদন করে। সোঁদাল (আমলতাস) ও ধাঁই ফুলের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। চামড়া পুরু করিবার জন্য দুই এক জাতীয় বন্য কুল বিশেষ উপযোগী।

গঁদ ও নির্য্যাস :—বাব্‌লা ও অন্য দুই জাতীয় Acaciaর গঁদ আপাততঃ সংগৃহীত হয়। পলাশের গঁদ (Bengal kino) সংগ্রহের অভাবে এখন নষ্ট হইতেছে। তার্পিণ কারখানা খুলিবার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক চিরগাছ রাজ্যমধ্যে নাই। এখন যে পরিমাণ নির্য্যাস সংগ্রহ হইতেছে, তাহা লাহোরের নিকটবর্ত্তী জাল্লো তার্পিণ কারখানায় বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

গন্ধদ্রব্য :—সদ্গন্ধযুক্ত বায়ী তৈল-উৎপাদক উদ্ভিদের সংখ্যা অধিক নহে। যাহা আছে, সেগুলিরও সদ্ব্যবহার হয় না। ঘোড়বচ (Acorns calamus L) পিঞ্জোরের আর্দ্র স্থান-সমূহে দৃষ্ট হয়; গন্ধ ও ঔষধ প্রস্তুত উভয়বিধ কার্য্যে ঘোড়বচের ব্যবহার আছে। চোহর মূল (Angelica glauca Edgew) ঔষধ ও মশলা রূপে পার্ব্বত্য জাতিসমূহ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ইহা কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বিক্রয় হয় না। একপ্রকার গন্ধতৃণ (Cymbopogon schœnanthus Spreng—Ginger grass) হিমাচলের পাদদেশে দেখা গেলেও পশ্বাদির শয্যা ব্যতীত অন্য কাজে প্রয়োগ করা হয় না। Rosa moschata Wall, R. sericea Lindl. এবং R. macrophylla Lindl.—এই তিন জাতীয় গোলাপ পার্ব্বত্য অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়। প্রথমটির স্থানীয় নাম—ফুল্‌কুজো। বন্য গোলাপ সম্বন্ধে প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে, উন্মুক্ত ও শুষ্ক পর্ব্বত-গাত্রে জন্মিলে গাছে অনেক কাঁটা থাকে। পক্ষান্তরে সিক্ত ও ছায়াযুক্ত স্থানের গোলাপে কাঁটা খুব কম অথবা নাই। রাশি রাশি গোলাপ ফুল গাছতলায় ঝরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। পান্নি অথবা খস্‌খস্ নদী-নালার ধারে নানা স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়; এবং কতক পরিমাণে ব্যবহারেও আসে। ঘাঘর নদীর তীরে কতিপয় স্থান খস্‌খস্ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। আর একটি প্রসিদ্ধ দেশীয় গন্ধদ্রব্য—বনাফ্‌সা। Viola-গণের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতিই এই নামে অভিহিত। বনাফ্‌সা গাছ ও ফুল (গুল বনাফ্‌সা) গৌণ আরণ্য ফসল বলিয়া গণ্য হয়। Viola canescens Wall (চিত্র নং ৫) সমতল ও পাহাড় উভয়

অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়; এবং ইহা খুব সুলভ। ঔষধার্থেও বনাফ্‌সার ব্যবহার সামান্য নয়।

চিত্র—৫

বনাফ্‌সা গাছ

তন্তু :—দুই জাতীয় মুর্গা ও দুই জাতীয় আকন্দ (আক্) রাজ্যের সকল অংশেই দৃষ্ট হয়। আকন্দের তুলা কিয়ৎপরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। আকন্দ ও মুর্গা উভয়ই শুষ্ক, বেলে ও

চিত্র—৬

পাহাড়ী বিছাতি

অনুর্ব্বর মাটির গাছ; কিন্তু মুর্গাচাষ অধিক লাভজনক। পাতিয়ালা রাজ্যের সর্ব্বত্র মুর্গা যেরূপ

সহজে জন্মিয়া থাকে এবং জলাভাবে রাজ্যমধ্যে অকর্ষিত জমির পরিমাণ এত অধিক যে, উক্ত জমি-সমূহে বহুবিস্তৃত ভাবে মুর্গা-চাষের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। চট, পা-পোষ, ঘরের মেজেতে বিছাইবার মাদুর, দড়ি, দড়া প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য মুর্গা-তন্তু হইতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মুর্গা-চাষ সম্বন্ধে রাজদরবার এখনও উদাসীন। দুই একটি বিছাতি জাতীয় গাছ হইতেও উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায়; Girardinia heterophylla Dcne তাহার দৃষ্টান্তস্থল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ রক্সবর্গ বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ভীষণ চেহারার উদ্ভিদ্ আর নাই। ইহা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার কাণ্ড হইতে যে তন্তু পাওয়া যায়, তাহা উজ্জ্বল ও দৃঢ়। সিকিমে এই জাতীয় বিছাতি হইতে সুতলী ও দড়ি ব্যতীত এক প্রকার কাপড়ও প্রস্তুত হয় (চিত্র নং ৬)।
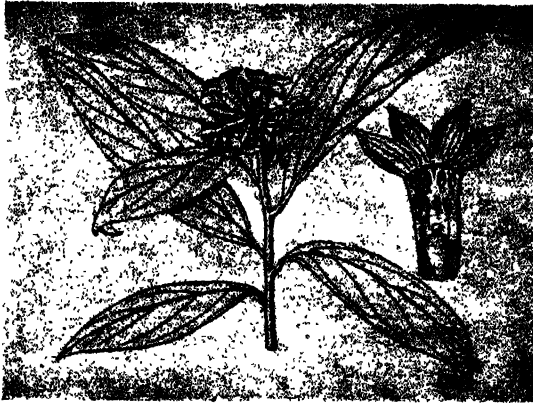
চিত্র—৭

নেপালী কাগজের গাছ

কাগজ-প্রস্তুতের উপাদান:—নানাপ্রকারের ঘাস, নল, খাগড়া, শর প্রভৃতি রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হয়। আপাততঃ এ'গুলি হইতে দড়ি, দড়া, টাট্টি, পরদা ও চালা তৈয়ারী হইয়া থাকে। অনেকগুলি কিন্তু কাগজ-প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; যথা—Arundo donax, Eragrostis cynosuroides, Ischaemum angustifolium, Phragmites karka, Saccharum arundinaceum এবং S. spontaneum। এ'স্থলে নেপালী কাগজ-উৎপাদক বৃক্ষেরও (Daphne cannabina Wall—চিত্র নং ৭) উল্লেখ করা উচিত। হিমাচল পর্ব্বতে চম্বা হইতে ভুটান পর্য্যন্ত ৩-৮ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতিয়ালা রাজ্যের সীমানার মধ্যে এই জাতীয় বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহার স্থানীয় নাম—শ্বেতবুরুজা। এক সময়ে নেপালী কাগজের এত চাহিদা ছিল যে, নেপাল, কুমায়ুন এবং সিকিমে প্রস্তুত কাগজেও তাহা সংকুলান হইত না। তিব্বত হইতেও উক্ত প্রকারের কাগজ

আমদানি করিতে হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় শ্বেতবুরজা হইতে কাগজ-প্রস্তত লাভজনক হইতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই।

তৈলবীজ :—তৈলোৎপাদক উদ্ভিদ্-সমূহের মধ্যে এক জাতীয় রেড়ী সমতল প্রদেশ হইতে পিঞ্জোর পর্য্যন্ত দেখা যায়; ইহার কাণ্ড ও পত্রবৃন্ত রক্তাভ। এই বন্য জাতির ফলন কিরূপ, তাহা জানা যায় নাই। Prinsepia utilis Royle নামক গোলাপবর্গীয় গাছ পার্ব্বত্য অঞ্চলে সুলভ। ইহার বীজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈল আছে। Corthamus oxycantha কুসুম ফুলের সম-গণভুক্ত গাছ—'পোলি' নামে ইহা পরিচিত; ইহা হইতেও ভক্ষ্য তৈল পাওয়া যায়।

খাদ্য উদ্ভিদ্ :—আমরা পূর্ব্বে যে কয়েকটি কৃষিজাত খাদ্য-ফসলের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বন্য অথবা অর্দ্ধবন্য ফলমূলাদিও আহার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়—কালজাম, ফল্‌সা ও পিলু। শেষোক্ত বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম—Salvadora oleoides Dcne। ইহার পীতবর্ণ ক্ষুদ্র গোলাকার সুমিষ্ট ফল দুর্ভিক্ষের সময় যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষিত হইয়া থাকে। শুষ্ক অনুর্ব্বর ও লবণাক্ত মৃত্তিকায় ইহা জন্মে; ইহার প্রসার আফ্‌গানিস্থান ও এডেন পর্য্যন্ত। পিলু গাছের পল্লব উষ্ট্রের প্রিয় খাদ্য হইলেও অপর কোন জন্তু ইহা স্পর্শ করে না। পাহাড়ী ফলের মধ্যে নাসপাতি (Pyrus communis L) এবং আপেল অথবা সেও (P. malus L) উভয়ই উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে সাধারণ। কেহ কেহ বলেন যে, এ'গুলি রোপিত বৃক্ষ। অনেক স্থলে ঐরূপ উক্তি সত্য হইলেও ৫-৯ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে পশ্চিম-হিমালয়ে যে বন্য সেও এবং নাসপাতির গাছ পাওয়া যায়, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। Prunus গণের কতিপয় বৃক্ষ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। P. amygdalus Stokes, বাদাম, প্রধানতঃ কর্ষিত। P. Armeniaca L. অপক্কাবস্থায় জরদালু এবং শুষ্ক ও পক্ক অবস্থায় খোবাণি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য গ্রাম-সমূহে ইহা খুব সাধারণ খাদ্য। শ্বেতাঙ্গগণ জরদালু হইতে জ্যাম্ (Jam) প্রস্তুত করেন। P. cerasus L—গিলাস অথবা অম্ল চেরী—ইহার প্রধান ব্যবহার চাটনী রূপে। P. comunis Huds vor. institia—আলুচা, আলু বোখারা—কাঁচা ও পাকা এবং টাটকা ও সংরক্ষিত অবস্থায় ইহা অনেকে খাইয়া থাকে। P. persica Stokes—পীচ, আড়ু—সুখাদ্য ফল ভিন্ন ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পাক, জ্বালানী ও কেশতৈল রূপে ব্যবহৃত হয়। P. padus L.—কালাকাঠ—ফল ভক্ষ্য ও পত্রাদি পশুখাদ্য। P. puddum Roxb.—হিমালয়ের বন্য চেরী। দেশীয় লোকে ইহার ফল কমই খাইয়া থাকে; কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ ইহা হইতে Cherry Brandy প্রস্তুত করেন।

সাধারণ মন্তব্য :—আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাতিয়ালা রাজ্যের কর্ষিত ও বন্য উদ্ভিদাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাতিয়ালা রাজ্য যে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত বিভাগগুলির উদ্ভিদাবলী একই প্রকারের নহে; বরং বিভাগ অনুসারে কতকগুলি সুলভ ও কতকগুলি বিরল। পাতিয়ালার উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে

আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে প্রত্যেক বিভাগের বিশিষ্ট উদ্ভিদ্-সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়; পরে সমগ্র রাজ্যের উদ্ভিদ্-সমূহের সহিত বিভাগীয় উদ্ভিদাবলীর তুলনা করিয়া উদ্ভিদ্-সমষ্টির সাধারণ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। উক্ত রূপ কার্য্য যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। সাধারণের গোচরার্থ ইহা কিন্তু বলিতে পারা যায় যে, শুষ্ক নিরস মৃত্তিকার খর্ব্বাকার ওষধি ও গুল্ম-শ্রেণীয় উদ্ভিদ্-সমূহই পাতিয়ালার নিজস্ব। অপরাপর উদ্ভিদ্ নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ হইতে চাষের জমির বৃদ্ধির সহিত প্রাকৃতিক উপায়ে আসিয়াছে কিম্বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক শতাব্দীর মধ্যে এরূপ অনেক উদ্ভিদের আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ, জল-সংস্থান দ্বারা জমি যতই রসযুক্ত হইবে, ততই আগন্তুক উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। উদ্ভিদ্-তত্ত্বের হিসাবে ইহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, Plant Ecology সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন ব্যবস্থা রাজদরবার এ'পর্য্যন্ত করেন নাই।

আধুনিক যুগের রাসায়নিক

মেন্দীলীফ্

অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ পৃথিবীতে যে কয়টী অল্পসংখ্যক দেশে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। এ বিরাট মহাদেশের সকল ব্যাপারই যেন রহস্যময়; য়ুরোপ, আমেরিকা, এমন কি প্রাচ্য দেশসমূহের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন বিশ্বজগতের নিকট উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোনরূপ লুকাচুরি নাই। কিন্তু রাশিয়া সভ্যজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াও যেন আপনার স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় বাঁচাইয়া রাখিয়া অন্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে—বহির্জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান যেন তাহার বিশেষ অভিপ্রেত নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক জন রাশিয়ান্ হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া জগতকে ভালরূপেই বুঝাইয়া দেন যে, রাশিয়া বর্ত্তমান জগতের ধারা হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে নাই, তাহার সাধনার উৎস অন্য পাশ্চাত্য দেশ হইতেও স্বতন্ত্র নহে।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েই রাশিয়ার বিশিষ্ট বাণী জগতে প্রচারিত হইয়াছে; টলষ্টয়-টুর্গীনিভের রাশিয়া, পুস্‌কীন্-ডষ্টিওফ্‌স্কীর রাশিয়া শিক্ষিত ভারতে অপরিচিত নহে। সংঘবদ্ধ মানবজীবনের যে সকল শাশ্বত প্রশ্ন ইঁহাদের গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, দেশকালভেদে তাহার পরিবর্ত্তন হইবার নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মহামানব টলষ্টয় যেমন সভ্যজগতের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাঁহারই স্বদেশবাসী একজন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক, রসায়নজগতে এক নূতন সত্য প্রচার করিয়া

রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা এক নূতন পথে পরিচালিত করেন। এই মূল্যবান্ তথ্যের আবিষ্কারক ডিমিট্রী আইভেনোউইচ্ মেন্দীলীফ্।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক প্রকার আবিষ্ক্রিয়ার লক্ষ্য প্রাকৃতিক ব্যাপারকে কতকগুলি সরল স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে মানুষের বোধগম্য করিবার চেষ্টা, প্রাকৃতিক আপাতবৈষম্যের মধ্যে সাম্যের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা। এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যে ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন সম্পর্ক নাই। আর দ্বিতীয় প্রকার আবিষ্কারের লক্ষ্য এই সকল আয়াসলব্ধ সত্যকে দৈনন্দিন জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস করিবার ও প্রকৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে পূর্ণমাত্রায় সুখস্বাচ্ছন্দ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা। মেন্দীলীফের আবিষ্কার এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নহে; সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট মেন্দীলীফ্ বিশেষ পরিচিত নহেন।

রাসায়নিক মেন্দীলীফ্

বৃহৎ পরিবারের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ডিমিট্রী সাইবেরিয়ার টবোলস্ক প্রদেশে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মেন্দীলীফের বংশে প্রাচ্য রক্তের সংমিশ্রণ ছিল। তাঁহার কোন এক পূর্ব্বতন পুরুষ এক তাতার সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মেন্দীলীফের ভ্রাতা-ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেরই বাহ্যিক আকার প্রাচ্য-সংস্পর্শের পরিচয় দিত। মেন্দীলীফের নিজের বেশভূষা ও কেশবিন্যাসের অনবধনতা ও বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাচ্য রক্তেরই ফল। তাহার উপর মেন্দীলীফ্ চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং কতকগুলি মূল পদার্থের নামকরণকালে সংস্কৃত সংখ্যার প্রয়োগ করেন; ইহাও তাঁহার প্রাচ্যপ্রীতির পরিচায়ক।

মেন্দীলীফের জন্মের কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতা অন্ধ হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে

বৃহৎ পরিবারের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার মাতার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই মনস্বিনী মহিলা নিজে একটী কাচের কারখানা চালাইতে আরম্ভ করেন এবং ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে পুত্রগণের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। টবোলস্ক প্রদেশে তখন রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইত ; নির্ব্বাসিতগণের মধ্যে বেসাগ্রীণ নামক একজন সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব-বাদীর সঙ্গে বালক ডিমিট্রির বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। বেসাগ্রীণ পরে মেন্দীলীফের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন ; ইনিই প্রথম মেন্দীলীফ্‌কে বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্ররোচিত করেন। ফলে বিদ্যালয়ে মেন্দীলীফ্‌ অঙ্ক, পদার্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন ; কিন্তু ল্যাটীন্‌, গ্রীক্‌ প্রভৃতি ভাষার প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা জন্মে। কাজে কাজেই শেষ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন না ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রদত্ত বৃত্তিতে উচ্চ শিক্ষালাভের পথও তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রের সামর্থ্যে মাতার বিশ্বাস শিক্ষকগণ অপেক্ষা অধিক ছিল ; বর্ষীয়সী মাতা কিশোর মেন্দীলীফ্‌কে লইয়া প্রথমে মস্কো এবং তথা হইতে রাজধানী পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বামীর বন্ধুগণের সাহায্যে পুত্রকে কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তনে প্রবিষ্ট করাইলেন। তাঁহার অভাগিনী মাতার বিষাদময় জীবনের দুঃখকষ্টের মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ায় সেই বৎসরই তিনি সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। বহু বৎসর পরে মেন্দীলীফ্‌ তাহার 'Solutions' নামক গ্রন্থখানি মাতার নামে উৎসৃষ্ট করিবার সময় লিখিয়াছিলেন--

"মাতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে তদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইতেছে। পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা বর্ষীয়সী মাতার স্বোপার্জ্জিত অর্থেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ছিল উদাহরণের সাহায্যে, ভ্রান্তি তিনি দূর করিতেন প্রেমের সহায়তায়। পুত্রকে বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য তিনি জন্মভূমি হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিতা হ'ন এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব —এমন কি জীবন পর্য্যন্ত—ইহার জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।" মৃত্যুশয্যায় এই মহীয়সী মহিলা মেন্দীলীফ্‌কে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পুত্রের ইষ্টমন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। "মায়ায় মুগ্ধ হইও না, বাক্‌সর্ব্বস্ব হইয়া কর্ম্মে অবহেলা করিও না ; ধীরভাবে অবহিতচিত্তে বৈজ্ঞানিক দিব্য সত্যের অনুসন্ধানে জীবন নিয়োজিত করিও।"

এই শিক্ষায়তন হইতে মেন্দীলীফ্‌ সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'ন ; কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখনকার প্রসিদ্ধ রাশীয়ান্‌ চিকিৎসক পিরোগফ্‌ তাঁহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন ; তবে ভরসা দিলেন যে, অবিলম্বে ক্রিমিয়া অঞ্চলে প্রস্থান করিলে মাস কয়েক টিকিয়া যাইতেও পারেন। মুনিঋষিরও ভ্রম হয়, চিকিৎসক ত' কোন ছার! দৈবক্রমে মেন্দীলীফ্‌ ক্রিমিয়ার সিম্‌ফেরোপল বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হ'ন ; কিন্তু ডাক্তারের দৈববাণী বিফল করিয়া সুদীর্ঘ জীবন ভোগ করিয়াছিলেন।

ক্রিমিয়া যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মেন্দীলীফ্‌ পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে "অসম্পর্কিত

শিক্ষক" (privat docent) পদে নিযুক্ত হ'ন। তিন বৎসর পরে রুশীয় শিক্ষাবিভাগ বিদেশীয় রসায়নাগারে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্ত তাঁহাকে সরকারী বৃত্তি দেন। এই বৃত্তির সাহায্যে মেন্দীলীফ্ ১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে রেনোর যন্ত্রাগারে ও হাইডেল্‌বার্গে বুন্‌সেনের অধীনে কাজ করেন। পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া মেন্দীলীফ্ সুরাসার ও জলের রাসায়নিক সম্মিলন বিষয়ে গবেষণা পেশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্-সি উপাধি লাভ করেন।

তখন রুশভাষায় রাসায়নিক সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল না; রসায়নের ভাল পাঠ্য পুস্তক ছিল না বলিলেই চলে। দুই মাসের মধ্যে অঙ্গারিক রসায়ন সম্বন্ধে মেন্দীলীফ্ পাঁচ শত পৃষ্ঠার এক খানি পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেও তিনি ওয়াগ্‌নারের কার্য্যকরী রসায়নের সুবৃহৎ গ্রন্থ এই সময়ে জর্ম্মাণ হইতে অনূদিত করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মেন্দীলীফ্ তাঁহার যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বাভাষ, "মূল পদার্থের ধর্ম্ম ও আণবিক ভারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধ রুশীয় রসায়ন-সমিতির এক অধিবেশনে পেশ করেন। মেন্দীলীফের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ নিউল্যাণ্ড এবং জর্ম্মাণ লোথার মায়ার এ'সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু মেন্দীলীফ্ ইঁহাদের প্রবন্ধের বিষয় কিছুই জানিতেন না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড়বস্তুসমূহ বিশ্লিষ্ট করিয়া বৈজ্ঞানিক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় একশত মূল পদার্থের সত্বা প্রমাণ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, পরিমিত পরিমাণ জড় পদার্থকে যদি ক্রমশঃ বিভক্ত করিয়া যাওয়া হয়, তবে এই প্রকার ক্রমবিভাজ্যতার কি কোন শেষ থাকিবে না; না সকল বস্তুই কোন এক চরম অবস্থায় পৌছিবে, যাহার পর আর বিভাগ চলিবে না। নানা কারণে বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়া লইয়াছেন যে, বস্তুমাত্রেই এই প্রকার কাল্পনিক বিশ্লেষণের ফলে এক অবিভাজ্য অবস্থায় উপনীত হয় (১); বস্তুর এই অবস্থার নাম পরমাণু। বস্তুভেদে পরমাণুর প্রকৃতি বিভিন্ন; কিন্তু একই পদার্থের সকল পরমাণুর ভার (২) ও অন্যান্য ধর্ম্ম একরূপ। পরমাণুর সংখ্যা এত অধিক ও আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, দুই পাঁচটী পরমাণু বিশ্লিষ্ট করিয়া তৌল করা অথবা তাহাদের স্বভাবধর্ম্ম আলোচনা করা অসম্ভব। সকল মূল পদার্থের মধ্যে আবার হাইড্রোজেন বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু; সুতরাং হাইড্রোজেন পরমাণু লঘুতম মনে করা যাইতে পারে, কারণ পরমাণু-সমষ্টি লইয়াই জড়বস্তু গঠিত। পরমাণুর "প্রকৃত" ভার যদিও তুলাদণ্ডের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু দুইটা ভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর "আপেক্ষিক" ভার—অর্থাৎ একটী অপরটী

---

(১) বিংশ শতাব্দীর 'ইলেকট্রণ' বা তাড়িৎ বিন্দুর আবিষ্কার সত্বেও "রাসায়নিক পরমাণু"র সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় নাই।

(২) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ পদার্থ-তত্ত্ববিৎ এষ্টন্ (Aston) প্রমাণ করিয়াছেন যে, একই মূল পদার্থের মধ্যে সকল পরমাণুর ভার সমান নহে। রসায়নের পুস্তকে দেখা যায় যে, ক্লোরিন্ বাষ্পের আণবিক ভার ৩৫·৬৫। এষ্টনের মতে কতকগুলি ক্লোরিন্ পরমাণুর ভার ৩৫ এবং কতকগুলির ৩৬; সুতরাং গড়পড়তা হিসাবে ইহার আণবিক ভার ৩৫·৬৫।

অপেক্ষা কত অধিক ভারী—তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সকল মাপজোপই আপেক্ষিক—একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অবলম্বনে। হাইড্রোজেন পরমাণু লঘুতম বলিয়া ইহার ভার "এক" ধরিয়া লওয়া হয় এবং অন্যান্য পরমাণুর ভার নির্ণয় করিবার সময় এই আদর্শকে অবলম্বন করা হয়। অক্সিজেনের আণবিক ভার ষোল বলিলে ইহাই বুঝায় যে, অক্সিজেনের এক একটী পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ষোল গুণ ভারী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পদার্থের আণবিক ভার নির্ণয় আরম্ভ হয়; বার্জ্জিলিয়স্, ষ্টা প্রভৃতি রাসায়নিক অশেষ যত্নসহকারে তৎকালীন জানিত সকল মূল পদার্থের পরমাণুর ভার সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আণবিক ভারের একটী সম্পূর্ণ তালিকা মোটামুটিভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আণবিক ভারের এই তালিকা আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই মেন্দীলীফের নজরে এক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িল। আপেক্ষিক আণবিক ভারের এই সংখ্যাগুলি যদি ধারাবাহিকভাবে সাজান যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সাতটী পদার্থের পর অষ্টম পদার্থে প্রথমের স্বভাবধর্ম্ম পুনঃ প্রকাশ পায়; নবমের প্রকৃতি কতকটা দ্বিতীয়ের অনুরূপ এবং এইভাবে সকল মূল পদার্থের স্বভাব-ধর্ম্ম নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। হাইড্রোজেন ঠিক এ'নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না; কারণ ইহাতে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের সমাবেশ দেখা যায়। হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়া আরম্ভ করিলে যে প্রথম সাতটী পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা এই— লিথিয়ম্ (৭), বেরীলিয়ম্ (৯), বোরণ (১১), কার্ব্বণ (১২), নাইট্রোজেন (১৪), অক্সিজেন (১৬) এবং ফ্লুরিন (১৯)—এই সাতটী পদার্থের পরই অষ্টম পদার্থের ঘরে সোডিয়ম্ (২৩) পড়ে; ইহার সহিত লিথিয়মের প্রবল বাহ্যিক ও রাসায়নিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান। নবম পদার্থ ম্যাগ্নীসিয়ম্(২৪)-এর স্বভাব-ধর্ম্ম দ্বিতীয় পদার্থ বেরীলিয়মের অনুরূপ। সুতরাং এই ভাবে সাজাইয়া গেলে মূল-পদার্থগুলি যথাক্রমে পংক্তি ও পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া যায় এবং এক পর্য্যায়ভুক্ত পদার্থগুলির মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহা হইতেই মেন্দীলীফ্ বলিলেন যে—"মূল পদার্থের প্রকৃতি ও স্বভাব-ধর্ম্ম আণবিক ভারের উপর নিয়মিতভাবে (periodically) নির্ভর করে"। বিষয়টী প্রথমে অদ্ভুত মনে হইল। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যেমন প্রথম সাতটী সুরের পর মাত্রাধিক্যের সঙ্গে পূর্ব্বের সুর যথাক্রমে পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, মূল পদার্থের সময়েও সেইরূপ অষ্টমে স্বভাবধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানের এ আশ্চর্য্য যোগাযোগের কারণ কি? কারণ যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন; তবে পদার্থের স্বভাবধর্ম্ম এইরূপ কোন "নিয়মিত" নীতির অনুবর্ত্তন করে —ইহার সন্দেহ মাত্র নাই।

মেন্দীলীফের এই নিয়মিত নীতির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে গেলে কতকগুলি সাধারণের অবোধ্য রসায়ন-শাস্ত্রের জটিল তথ্যের অবতারণা করিতে হয়। তবে এই নিয়মের গুরুত্ব পর পৃষ্ঠার তালিকা হইতে মোটামুটিভাবে বুঝা যাইতে পারে।

মে লীফের তালিক

পংক্তি	শূন্য পর্য্যায়	প্রথম পর্য্যায়	দ্বিতীয় পর্য্যায়	তৃতীয় পর্য্যায়	চতুর্থ পর্য্যায়	পঞ্চম পর্য্যায়	ষষ্ঠ পর্য্যায়	সপ্তম পর্য্যায়	অষ্টম পর্য্যায়
১ ২	হিলিয়ম্ (৪·০)	হাইড্রোজেন (১) লিথিয়ম্ (৬·৯)	বেরীলীয়ম্ (৯·০)	বোরন্ (১০·৪)	কার্ব্বন্ * (১২·০)	নাইট্রোজেন (১৪·০)	অক্সিজেন্ (১৬·০)	ফ্লুরিন্। (১৯·০)	
৩	নিয়ন্ (২০·২)	সোডিয়ম্ (২২·৯৯)	মেগ্নিসিয়ম্ (২৪·৩)	এলুমিনিয়ম্ (২৬·৯)	সিলিকন্ (২৮·০)	ফস্ফরাস্ (৩১·০)	গন্ধক (৩২·০৬)	ক্লোরিন্ (৩৫·৪৫)	
৪	আর্গন্ (৩৯·৯)	পোটাসিয়ম্ (৩৯·০৯)	কেল্সিয়ম্ (৪০·০৭)	স্কেণ্ডিয়ম্ (৪৫·১)	টাইটেনিয়ম্ (৪৮·১)	ভেনাডিয়ম্ (৫০·৯)	ক্রোমিয়ম্ (৫২·০)	মেঙ্গানীস্ (৫৪·৯)	লৌহ, কোবল্ট, নিকেল (৫৫·৮) (৫৮·৯) (৫৮.৬৯)
৫	—	তাম্র (৬৩·৫)	দস্তা (৬৫·৩৮)	গেলিয়ম্ (৬৯·৭)	জারমেনিয়ম্ (৭২·৬)	আর্সেনিক (৭৪·৯)	সিলিনিয়ম্ (৭৯·৯)	ব্রোমিন্ (৭৯.৯)	
৬	ক্রিপ্টন্ (৮২.৯)	রুবিডিয়ম্ (৮৫·৪৪)	ষ্ট্রনসিয়ম্ (৮৭·৬)	ইট্রীয়ম্ (৮৮·৯)	জারকোনিয়ম্ (৯১·০)	নিয়বিয়ম্ (৯৩·১)	মলিবডেনম্ (৯৬·০)	—	রুথেনিয়ম্, রোডিয়ম্, পেলডিয়ম্ (১০১·৭) (১০২·৯) (১০৬·৭)
৭	—	রৌপ্য (১০৭·৮৮)	কেডমিয়ম্ (১১২·৪)	ইণ্ডিয়ম্ (১১৪·৮)	টীন (১১৮·৭)	এণ্টীমণি (১২১·৭)	টেলিউরিয়ম্ (১২৭·৫)	আওডিন্ (১২৬·৯)	
৮	জেনন্ (১৩০·২)	সিজিয়ম (১৩২·৮)	বেরিয়ম্ (১৩৭·৩)	লেন্থেনম্ (১৩৮·৯)	হেফ্নিয়ম্ (১৭৮·৬)	টেণ্টেলাম্ (১৮১·৫)	টাংষ্টেন্ (১৮৪·০)	—	ওস্মিয়ম্, ইরিডিয়ম্, প্লাটিনম্ (১৯০.৮) (১৯৩·১) (১৯৫·২)
৯	—	স্বর্ণ (১৯৭·২)	পারদ (২০০·৬)	থেলিয়ম্ (২০৪·৩৯)	সীসক (২০৭·২)	বিস্মাথ (২০৯·০)	—	—	
১০	রেডন্ (২২২.০)	—	রেডিয়ম (২২৫·৯)	—	থোরিয়ম্ (২৩২·১)	—	ইউরেনিয়ম্ (২৩৮·১)		

অন্য সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ততঃ এই বিষয়ে মেন্দীলীফের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা কতকগুলি অসংবদ্ধ তথ্যের আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, মেন্দীলীফের আলোচনার ফলেই রসায়নে এই খাপছাড়া ভাবের পরিবর্ত্তে শৃঙ্খলা ও নিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত সকল পদার্থে ধাতুর স্বধর্ম্ম পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। লিথিয়ম্, সোডিয়ম্, পোটাসিয়ম্, রিউবিডিয়ম্ ও সিজিয়ম্—এই পাঁচ ধাতুর প্রকৃতি অবিকল একরূপ; ইহাদের যৌগিক পদার্থগুলিও একধরণের। ইহারা সকলেই তীক্ষ্ণ ক্ষার উৎপন্ন করে। ইহাদের মিলন-ক্ষমতাও একরূপ; একটী পরমাণু এক পরমাণুর অধিক হাইড্রোজেন অথবা ক্লোরিন্ বাষ্পের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বেরীলিয়ম্, মেগ্নীসিয়ম্, কেল্সিয়ম্, জিঙ্ক, ষ্ট্রোন্সিয়ম্, কেডমিয়ম্ ও বেরিয়মের মধ্যে যথেষ্ট রাসায়নিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান; ইহাদের সকলেরই সম্মিলন-ক্ষমতা দুই—অর্থাৎ ইহাদের একটী পরমাণু, দুইটী ক্লোরিন্ পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ধাতব ধর্ম্ম বর্ত্তমান; তবে প্রথম পর্য্যায় অপেক্ষা যেন কিছু কম। ইহাদের সকলের যৌগিক পদার্থগুলি একই প্রকারের। এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পর্য্যায়ের অন্তর্গত পদার্থের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান; অথচ এই ভাবে পর্য্যায়ভুক্ত করিবার সময় কেবল একটী ধর্ম্ম—যাহার সহিত রাসায়নিক প্রকৃতির প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্ক নাই—অর্থাৎ আণবিক ভারের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বাম হইতে দক্ষিণে ধাতুধর্ম্ম ক্রমশঃ হ্রাস এবং সম্মিলন-ক্ষমতা এক এক করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—এই নিয়মের এমনই কি সার্থকতা, যাহাতে ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আবিষ্কার বলা যাইতে পারে? বৈজ্ঞানিক মতবাদের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে ইহা দ্বারা শুধু জানিত ব্যাপারের নিখুত ব্যাখ্যা হইয়া ইহার কার্য্য-করত্ব শেষ হয় না; ইহার সাহায্যে নূতন নূতন অজ্ঞাত তথ্যের আবিষ্কারের সহায়তা হয়। নিউটনের "মাধ্যাকর্ষণ বাদ" যদি সৌরজগতের গতিসংক্রান্ত পুরাতন তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত, তবে বিজ্ঞানের রাজ্যে তাহা শীঘ্রই অচল হইয়া দাঁড়াইত। মেন্দীলীফের মতবাদের সাহায্যে যে শুধু মূলপদার্থগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বভাব-ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার ফলে অনেক পদার্থের আণবিক ভার ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—এই সম্পর্কে মেন্দীলীফ্ কয়েকটী অজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। মেন্দীলীফের সময় স্বর্ণের আণবিক ভার ১৯৬·২ বলিয়া ধরা হইত। মেন্দীলীফ্ দেখিলেন যে, এই সংখ্যা অনুসারে স্বর্ণ এমন এক পর্য্যায়ে পড়িয়া যায়, যাহার প্রতিবেশিগণের সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। অথচ ইহার আণবিক ভার ১৯৭ ও ১৯৮ এর মধ্যে হইলে তালিকার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহার কোন পারিপার্শ্বিক অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তী কালে সূক্ষ্ম পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে যে, স্বর্ণের আণবিক ভার ১৯৭·২।

তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় মেন্দীলীফ্‌কে কতকগুলি স্থান শূন্য রাখিতে হইয়াছিল; কারণ তাহা না হইলে জানিত পদার্থগুলিকে অনেক সময় একধর্মী পর্য্যায়ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। মেন্দীলীফ্‌ বলিলেন যে, এই এক একটী শূন্য স্থান একটী অজ্ঞাত মূল পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। শূন্য স্থানের আশেপাশের পদার্থের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া তিনি এ সকল অজ্ঞাত পদার্থের স্বভাব-ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরিবর্ত্তী কালে এমন এক একটী নূতন মূল পদার্থের সন্ধান মিলিয়াছে, যাহার প্রকৃতি ও স্বভাব-ধর্ম্ম মেন্দীলীফ্‌-বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। চতুর্থ পর্য্যায়ে এইরূপ একটী অজ্ঞাত পদার্থের মেন্দীলীফ্‌ নামকরণ করেন "এক সিলিকন" * এবং ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ক্লার জারমেনিয়ম্‌ নামক এমন একটী মূল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করেন, যাহা মেন্দীলীফ্‌-বর্ণিত "এক সিলিকনের" সহিত একেবারে মিলিয়া যায়।

মেন্দীলীফ্‌ বর্ণিত "এক সিলিকন"		উইন্‌ক্লারের "জারমেনিয়ম্‌"
ধাতুর আণবিক ভার	—৭২	৭২·৬
,, আপেক্ষিক গুরুত্ব	— ৫·৫	৫·৪৬৯
অক্সিজেন-সংযুক্ত যৌগিক পদার্থের ,,	— ৪·৭	৪·৭০৩
ক্লোরিন্‌-সংযুক্ত ,, ,,	— ১·৯	১·৮৮৭
	ইত্যাদি	ইত্যাদি

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের ফলে প্রথমে লোকের মনে মেন্দীলীফের নিয়মের সাধারণ অভ্রান্ততার সন্দেহ জন্মে; কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইহাতে মেন্দীলীফের নিয়মের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হইয়া পড়িল। বিষয়টী এই—মেন্দীলীফের আদি তালিকায় "শূন্য পর্য্যায়" বলিয়া কিছু ছিল না; বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে লর্ড র্যালে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সাধারণ বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিতে আরম্ভ করেন। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে তাঁহাকে প্রত্যেক বাষ্প বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করিয়া নানাভাবে শোধনের পর পরিমিত আয়তনের ভাঁর সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের সাহায্যে বাহির করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ঘনত্বের কোন বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে নাই; কিন্তু নাইট্রোজেনের বেলা দেখা গেল যে, বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত "বিশুদ্ধ" নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ হইতে বিতাড়িত বাষ্প অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ অধিক ভারী। অন্য কেহ হইলে হয় ত' এ সামান্য পার্থক্য পরীক্ষা-মূলক ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতেন; কিন্তু র্যালের পরীক্ষা-সংক্রান্ত সূক্ষ্মতা ছিল অতি উচ্চ দরের। পরীক্ষার ভ্রান্তি তিনি মানিতে চাহিলেন না। এই সময়ে স্যার উইলিয়ম্‌ র্যাম্‌সে

* লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, নূতন পদার্থের নামকরণের সময় মেন্দীলীফ্‌ সংস্কৃত সংখ্যার প্রয়োগ করেন

আসিয়া র‍্যালের সহিত যোগ দিয়া প্রকাশ করিলেন যে, বায়ুমণ্ডলে এমন কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব "অসামাজিক" বাষ্প অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান, যাহারা কোন পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয় না। সুতরাং নাইট্রোজেন শোধনের সময় কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া ইহার সঙ্গে বরাবর থাকিয়াই যায়, এবং নাইট্রোজেন অপেক্ষা অধিক ভারী বলিয়া মিশ্রিত বাষ্পের ঘনত্ব সাধারণ নাইট্রোজেন অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। এই সকল বাষ্পের সাধারণ নাম "শ্লথ বাষ্প" (inert gas); আর্গন, নিয়ন, জেনন্, ক্রিপ্টন্, হিলিয়ম্ প্রভৃতি বাষ্পের অস্তিত্ব এইভাবে প্রমাণিত হইল। এই সকল শ্লথ বাষ্পের আণবিক ভার নির্ণয় করিবার পর এক সমস্যার উদ্ভব হইল—মেন্দীলীফের তালিকার শূন্য স্থানগুলির কোনটীরই মধ্যে ইহাদের স্থান হয় না, তবে কি মেন্দীলীফের নিয়ম মিথ্যা? অনেকেই বিজ্ঞের মত মেন্দীলীফের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নূতন বাষ্পগুলির মধ্যে হিলিয়মের আণবিক ভার ৪; সুতরাং ইহাকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে গেলে প্রথম পর্য্যায়ের বামে একটী নূতন পর্য্যায়ের সৃষ্টি করিতে হয় এবং অন্য সকল বাষ্প আর্গন ব্যতীত এই নূতন পর্য্যায়ে যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া যায়। এই সকল বাষ্পের সম্মিলন-ক্ষমতা শূন্য; কারণ আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে কোন জানিত পদার্থের সঙ্গে সম্মিলিত করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং মেন্দীলীফের তালিকায় ইহাদের প্রকৃত স্থান প্রথম পর্য্যায়ের বামে—এই নূতন শূন্য পর্য্যায়ে; ইহার মধ্যে কোনই অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না।

অবশ্য মেন্দীলীফের এই নিয়ম একেবারে নির্ভুল নহে; মেন্দীলীফের তালিকায় লঘুতম পদার্থ হাইড্রোজেন যে যথাযোগ্য স্থান পায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তালিকায় আরো অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, যাহার কারণ নির্ণয় করিতে মেন্দীলীফ্ অসমর্থ হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ পর্য্যায়ের টেলুরিয়মের আণবিক ভার অষ্টম পর্য্যায়ের আওডিন অপেক্ষা অধিক; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে পরস্পর স্থানপরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হইলে রাসায়নিক প্রকৃতির সাদৃশ্য একেবারেই থাকে না। আর্গনের আণবিক ভার পোটাসিয়ম্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; কিন্তু প্রথম পর্য্যায়ে আর্গন এবং শূন্যপর্য্যায়ে পোটাসিয়ম্ আসিতে অবশ্য কিছুতেই পারে না। তাহার উপর তালিকায় একটী অষ্টম পর্য্যায় সংযুক্ত হইয়াছে, ইহার অন্তর্ভুক্ত পদার্থের সাদৃশ্য পর্য্যায়ক্রমে না হইয়া পংক্তিক্রমে হইতেছে—অর্থাৎ লৌহ, কোবল্ট ও নিকেলের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে, এক পংক্তিভুক্ত। কিন্তু এ সকল ছোটখাট ত্রুটী সত্ত্বেও মেন্দীলীফের নিয়ম যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রসায়নজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

গত মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে দার্দ্দেনিলিস্ অভিযানে একজন ইংরাজ যুবক তুর্কীর গুলিতে প্রাণবিসর্জ্জন দেন। বিলাতী সামরিক বিভাগের নিকট হয়'ত এই মৃত্যু একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর বিয়োগ অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ-তন্ত্রে এই

ক্ষতি বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। কারণ তরুণ বয়স্ক হইলেও মোজলী এমন একটী বহুমূল্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার নাম বিজ্ঞানের সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এক নূতন ধরণের বর্ণচ্ছত্র-যন্ত্রের (Mass Spectrograph) সাহায্যে মোজলী সকল মূলপদার্থের পরমাণুর মধ্যস্থিত সংযোগাত্মক তড়িতের পরিমাণ-জ্ঞাপক এক একটী বিশিষ্ট সংখ্যা নির্ণয় করেন।* ইহার সাধারণ নাম আণবিক সংখ্যা (Atomic number)। মোজলীর পরীক্ষালব্ধ সংখ্যা হইতে দেখা গেল যে, আণবিক সংখ্যা সাধারণতঃ আণবিক ভারের উপর নির্ভর করে এবং মেন্দীলীফের নিয়মে আণবিক ভারের পরিবর্ত্তে এই নবাবিষ্কৃত আণবিক সংখ্যার প্রয়োগ করিলে মেন্দীলীফের তালিকার পূর্ব্বোল্লিখিত অনেক গুলি দোষ অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ আর্গনের আণবিক ভার পোটাসিয়ম্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া মেন্দীলীফে্র তালিকায় উভয়ের পরস্পর স্থানপরিবর্ত্তন করা উচিত; কিন্তু আর্গনের "আণবিক সংখ্যা" পোটাসিয়ম্ অপেক্ষা কম; সুতরাং আণবিক সংখ্যা হিসাবে সাজাইয়া গেলে আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। আওডিন্ ও টেলুরিয়ম্ সম্বন্ধেও এ'কথা খাটে।

রসায়নজগতে মেন্দীলীফের মৌলিক দান যে শুধু "নিয়মিত বাদে"ই (Periodic law) পর্য্যবসিত, তাহা নহে; ১৯০৭ সাল অবধি অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তিনি আড়াই শতের অধিক নানাবিধ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা ছিল মেন্দীলীফে্র অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়। তাঁহার মনীষা দ্বারা যে জাতির আর্থিক উন্নতি একেবারে না হইয়াছে, তাহাও নহে; বাকু প্রদেশের তৈলের প্রস্রবণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিয়া তিনি জাতীয় ধনাগম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণের সময় তাঁহার মস্তিষ্কে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়াছিল। তখন বিমান-বিহার এত সহজসাধ্য বা অপেক্ষাকৃত বিপদবিহীন হয় নাই; মেন্দীলীফ্ সূর্য্যগ্রহণের সময়ে এক বেলুনে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে কতকগুলি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার সহকারীগণ বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এই ব্যাপারে স্থানীয় কৃষকবধূগণের নিকট মেন্দীলীফের খ্যাতি বিশেষ বাড়িয়া গেল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমিতি, রয়াল সোসাইটী, মেন্দীলীফ্ ও লোথার মায়ারকে 'ডেভী পদক' প্রদান করেন। পদক দিবার সময় সভাপতি বলিলেন— "এই নিয়মিত তালিকা আবিষ্কারের ফলে আমরা অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। প্রত্যেক মহৎ আবিষ্কারের মত ইহার সাহায্যে রাসায়নিক অনুসন্ধানের অনেক নূতন পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে। রসায়নশাস্ত্রের মহত্তম আবিষ্কার-সমূহের ইহা যে অন্যতম—এ বিষয়ে

* এ সম্বন্ধে 'প্রকৃতি'তে প্রকাশিত অধ্যাপক মেঘনাদ দত্ত লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমার সন্দেহমাত্র নাই।" ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটী পুনরায় মেন্দীলীফ্‌কে 'কোপলী পদক' প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন; ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতী রসায়ন-সমিতি তাঁহাকে 'ফেরাডে পদকে'র জন্য মনোনীত করেন। ইহা ভিন্ন কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড, গটিন্‌জেন্, প্রিন্সটন্ প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিয়া নিজেদের গৌরব বাড়াইয়া ছিলেন।

কিন্তু বিদেশের সুধীবৃন্দ তাঁহাকে এই ভাবে সম্মানিত করিলেও নিজের বিশ্ববিদ্যালয় অযথা উত্যক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অসাধারণ খ্যাতির জন্যই হউক, আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রবল প্রতিপক্ষ বলিয়াই হউক, পেট্রোগ্রাডের শিক্ষা-সংসদ তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগও উদার মতের জন্য তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াই ছিল। ছাত্রমহলে আবার অনেকে তাঁহাকে অতিরিক্ত "রক্ষণশীল" বলিয়া মনে করিত; সুতরাং ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষ কাহারই তিনি মন রাখিতে পারেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে মেন্দীলীফ্ সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতেন; তবে সকল সময়েই তাঁহার সহানুভূতি ছাত্রগণের দিকেই থাকিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিষম গোলমাল বাধিয়াছিল। পূর্ব্বাপর রীতি অনুসারে পুলিশ আসিয়া অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে মহা আতঙ্ক জাগাইয়া তুলে। ছাত্রগণ আসিয়া মেন্দীলীফ্‌কে ধরিয়া বসিল; তিনি উত্তেজিত ছাত্রগণকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, তিনি নিজে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট তাহাদের আবেদন পেশ করিবেন। শিক্ষামন্ত্রী সামান্য কয়েক কথায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রসায়নের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভিন্ন অন্য অনধিকার বিষয়ে তাঁহার মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই অপমানসূচক ব্যবহারে মেন্দীলীফ্ এতদূর মর্ম্মাহত হ'ন যে, অবিলম্বে তিনি অধ্যাপকের পদে ইস্তাফা দেন। তিন বৎসর পর তদানীন্তন রাজস্বমন্ত্রী সহকর্ম্মীর কৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাকে পরিমাণ-বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত করেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত মেন্দীলীফ্ এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাংসারিক জীবনে মেন্দীলীফ্ প্রথম বয়সে বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। প্রথম বিবাহ তাঁহার পক্ষে বিশেষ অসুখকর হইয়াছিল; এবং কিছুদিনের মধ্যেই উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে মেন্দীলীফ্ সাংসারিক শান্তি পাইয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে পারিবারিক সুখভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিদুষী ছিলেন। পত্নীর সাহচর্য্যেই মেন্দীলীফ্ চিত্রকলায় অনুরক্ত হ'ন। তাঁহার পুস্তকাগার পত্নীর অঙ্কিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের প্রতিকৃতিতে পূর্ণ থাকিত।

বাহ্যিক আকারে মেন্দীলীফের মধ্যে প্রচলিত রীতির উপর প্রবল বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইত। বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি কোন সামাজিক অনুশাসনই মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না; রাজদরবারের চাকচিক্য তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। জার তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়া পাঠান যে,

ইচ্ছামত বেশভূষা সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ হইলে তিনি রাজদর্শনের সম্মান গ্রহণ করিতে অক্ষম। আবক্ষবিস্তৃত উড্ডীয়মান শ্বেতশ্মশ্রুভার লইয়া নিজের প্রিয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মেন্দীলীফ্ রাজসন্দর্শন করিয়াছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে মেন্দীলীফের মত একটু অদ্ভুত ধরণের ছিল। নিজের অক্ষমতার জন্যই বোধ হয় তিনি "অপ্রচলিত" ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান জগতে প্লেটোকে বাদ দিলেও সংসার বেশ চলিতে পারে; কিন্তু একাধিক নিউটন না হইলে বর্ত্তমানের ধারার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। তাঁহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে বেশ পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ ছিল। রেলে কখনও তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন ভ্রমণ করেন নাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি বৈপ্লবিক দলভুক্ত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি বরাবর রাশিয়ার বিপ্লববাদের বিপক্ষেই ছিলেন এবং নিজকে "শান্তিপূর্ণ উদার নৈতিক" বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকিলেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অপকর্ষের বিষয় প্রকাশ করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৯০৭ সালে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে মেন্দীলীফের মৃত্যু হয়। অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি জুলেভার্ণের "উত্তর মেরু ভ্রমণ" পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দুইজন শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান্—টলষ্টয় ও মেন্দীলীফের—জীবনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে উভয়েই প্রচলিত জনমতকে উপেক্ষা করিতেন—জ্ঞান-রাজ্যে উভয়ের দান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়াছিল—জীবনে উভয়েই বিদেশে সমাদৃত ও স্বদেশে অনাদৃত হইয়াছিলেন। এই দুই পণ্ডিতের মধ্যে জ্ঞানরাজ্যে কাহার স্থান উচ্চে, সে বিষয় আলোচনা করিতে যাওয়া নিষ্ফল। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না যে, জ্ঞানের সাধারণ-তন্ত্রে উভয়েই অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

নয়নতারা

Vinca Rosea Linn.

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

নয়নতারা একটি ফুলগাছ। অনেকে ইহাকে 'ডাকুর' বলিয়া জানে; হিন্দিতে ইহাকে 'গুলফিরিঙ্গী' বলে। উড়িয়া ভাষায় ইহার নাম—'রতনযোড়'। ইংলণ্ডে ইহা 'পেরিউইন্‌কেল্' (Periwinkle) বলিয়া খ্যাত।

এই গাছটি এপোসাইনেসি (Apocynaceae) বা করবীবর্গের অন্তর্গত। প্রায়

সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার বাস। ভিন্‌কা গণের প্রায় পাঁচ জাতীয় গাছ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদবেত্তা লিনেয়াস্ এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম—ভিন্‌কা রোসিয়া (Vinca rosea) দিয়াছেন। সাদা ও লাল ফুলযুক্ত ভিন্‌কা রোসিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মিতে দেখা যায়। বাংলাদেশে এই গাছটি একপ্রকার আগাছা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়। অধিকাংশ বাগানে ও গৃহস্থের বাড়ীতে জুঁই, মল্লিকা, টগর, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ফুলগাছের সঙ্গে নয়নতারাও অযাচিত ভাবে বিরাজ করে। মন্দির, মস্‌জিদ্, গির্জ্জা ও পেগোডার আশেপাশে ইহার প্রায়ই অবস্থান।

স্যার্ ডেভিড্ প্রেনের (Sir David Prain—Ex Director Royal Botanic Garden, Keew.) মতে নয়নতারা ওয়েষ্ট ইন্‌ডিসের আদিম বাসী। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ্ মিলার (Phillip Miller) সর্ব্বপ্রথমে এই গাছটিকে ইংলণ্ডের গরম পিটের অর্থাৎ ষ্টোভ্-সংযুক্ত কাঁচের ঘরের ভিতর অন্যান্য বিদেশীয় গাছপালার সঙ্গে তৈয়ারী করেন। তিনি এই গাছটির ফুলের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন এবং সারা গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল হয় বলিয়া গাছটিকে অতি সযত্নে তত্ত্বাবধান করেন। ফিলিপ মিলারের মতে ভিন্‌কা রোসিয়া ম্যাডাগ্যাস্কার(Madagascar)-এর এক আগাছা বিশেষ। ম্যাডাগ্যাস্‌কার হইতেই প্রথমে ইহার বীজ প্যারিসের রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনে লইয়া আসা হয়। আনিবার পর সেই বৎসরেই গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল প্রথম ইউরোপ-খণ্ডে দৃষ্ট হয় বলিয়া মিলারের ধারণা। পরে ভারসেঁ (Varsailes) ও ট্রিয়ানোঁ (Trianon)র রাজার মালী রিচার্ড (Richard), উইলিয়াম্ কুরটিস্ (William Curtis)-এর নিকট নয়নতারার বীজ পাঠাইয়া দেন। কুরটিস্ ক্রমে গাছটিকে নানাদেশে প্রচারের চেষ্টা করেন। স্যর্ জোসেফ্ ডল্টন্ হুকার (Sir J. D. Hooker)-এর মতে নয়নতারা পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন নিবাসী। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি সব ঋতুতেই ইহার ফুল দেখা যায়। সাদা ও লাল ফুলের গাছই বেশী। সাদা ফুলের পাপ্‌ড়ির গোড়ায় একটু রক্তিম আভাও প্রায়ই দেখা যায়। রমণীদের কাছে এই ফুলগুলির আদর বড় কম নয়। দেবধর্ম্মে ব্যবহার করা ছাড়াও পল্লীগ্রামে প্রায়ই নয়নতারা ফুলগুলি মেয়েদের খোঁপার শোভা বৃদ্ধি করে।

এই গাছটির সহিত একবার পরিচয় হইলে আর চিনিবার বিশেষ অসুবিধা হয় না। ছোট একটি ফুলের চারাগাছ; লম্বা সাদা শিকড় সরলভাবে মাটির ভিতর থাকিয়া গাছটিকে উপর মুখী ধরিয়া রাখে। বীজোদ্গমের পর গাছটি বেশ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সবুজ ঝাঁটি বাঁধিয়া উঠে। কখন কখন আবার মাটির উপর হেলিয়া পড়িয়া কতকটা গুল্মের আকারও ধারণ করে। উচ্চে প্রায় ১ ফুট হইতে চারি ফুট। সবুজ, মসৃণ চক্‌চকে; ২ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি হইতে ১½ ইঞ্চি চওড়া; ডিম্বাকৃতি, সমান ধারযুক্ত সবুজ পাতাগুলি শাখাপ্রশাখার প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে সাম্‌না সাম্‌নি ভাবে জন্মায়। পাতাগুলির গোড়ার

দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া ডাঁটায় পরিণত হইয়াছে—এই অংশটি অর্থাৎ যাহাকে পাতার বোঁটা বলে, সেটি আধ ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চির একটু বেশী লম্বা ও মসৃণ ; গোড়াটা একটু মোটা। পাতার কোল হইতে একটি করিয়া ফুল উঠে। ফুলগুলি অধিকাংশই ডালের ডগার দিকেই বেশী দেখা যায়। প্রস্ফুটিত ফুলগুলি ১½ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি চওড়া। ফুলের গোড়ায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত সবুজ টুপির মত এক আবরণ থাকে, উহাকে উদ্ভিদজ্ঞেরা 'কেলিক্স হোয়ারেল্, (Calyx whorl) বলেন ; তাহার পর ফুলের দল (corolla whorl) অবস্থিত। উক্ত ফুলদলের দুইটি অংশ বর্ত্তমান ; একটী অংশ সাদা সরু নলের মত হইয়া ফুলের গোড়া অবধি নাবিয়া গিয়া ফুলের পুরুষ ও স্ত্রী-অংশগুলিকে আবৃত করিয়া রাখে ; আর একটি অংশ লাল বা সাদা তারার ন্যায় সম্মুখভাগে বিরাজ করে—যাহাকে আমরা সচরাচর ফুলের পাঁপ্‌ড়ি বলি। পাঁপ্‌ড়িগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ও আকারে কতকটা 'ক্ষোস্তার' মত। পাঁপ্‌ড়িগুলির গোড়া—যেখান হইতে সরু নলের উদ্গম হইয়াছে—সেটি প্রায়ই লাল ও সূক্ষ্ম শুঁয়াযুক্ত। গর্ভাধারের (ovary) দণ্ডটি (style) লম্বা ও মাথা (stigma) চ্যাপ্‌টা—'ডমুরুর' মত ; এবং একপ্রকার চট্‌চটে আঠার ন্যায় পদার্থে আবৃত। উক্ত ষ্টিগ্‌মা বা মাথার আঠায় ফুলের রেণু পড়িলে আট্‌কাইয়া যায় ও রেণুমধ্যস্থ পুং-বীজ ক্রমে গর্ভাধার-দণ্ডের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া স্ত্রী-বীজের সহিত মিশ্রিত হইলে ফলোৎপাদিত হয়। ফল দুইটি—লম্বা সরু ; প্রত্যেকটি দুইটি কক্ষ-বিশিষ্ট—কতকটা সরিষা ফলের ন্যায় এবং ফল সুপক্ব হইলে ফাটিয়া যায় ও বীজগুলি ছড়াইয়া পড়ে। বীজ ছোট, দুই দিক ভোঁতা ; একটু লম্বাটে ও একপ্রকার 'ভুমো ভুমো' আবরণে আবৃত (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই ফুলগাছটির যে কেবল ফুলের বাহার, তাহা নহে ; ইহার আরও অনেক দ্রব্যগুণ আছে। ঔষধেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রসে বোল্‌তা কামড়ান জ্বালার নিবৃত্তি হয়। বহুকাল হইতে নয়নতারার পাতার রস আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বহুমূত্র রোগের মহৌষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ২৭টি পাতার রস দুই চার চামচ জলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত দেশবাসীরা সচরাচর আহারের পর সেবন করে। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ; ইহাতে অন্ততঃ তিন প্রকার এল্‌খেলয়েড্ (alkaloid) আছে। এখন এই এল্‌খেলয়েড্‌গুলির সবিশেষ গুণাগুণ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। কোন্ এল্‌খেলয়েড্‌টি কোন্ রোগের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ, তাহার এখনও সম্যক্ নির্দ্ধারণ হয় নাই।

ছবির ব্যাখ্যা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)

(১) একটি ফুলফল-সংযুক্ত শাখার কিয়দংশ ; (২) একটি ফুলের কুঁড়ি ; (৩) একটি প্রস্ফুটিত ফুল ; (৪) একটি দ্বিধা-বিভক্ত ফুল ; (৫) একটি পুং-বীজের কোষ ও রেণু ; (৬) স্ত্রী-অংশ, গর্ভাধার ; গর্ভাধারদণ্ড ও গর্ভাধারের অগ্রভাগ, গর্ভাধার কর্ত্তিত করিয়া দুইটি শিশু বীজ দেখান হইয়াছে ; (৭) একটি বড় বীজ।

জ্যোতিষ-পরিচয়

৮। চন্দ্রমণ্ডল

অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

পুরাণে চন্দ্রের উৎপত্তির অনেক প্রকার বর্ণনা রহিয়াছে। কখনও তিনি ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মীদেবীর সহিত উদ্ভূত হন, কখনও বা অত্রি ঋষির ঔরসে অনুসূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা হইয়াছে। সে সকলের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ঋগ্‌বেদে তাঁহাকে 'দ্বিজরাজ' বলা হইয়াছে; সুতরাং পুরাণেও তিনি দ্বিজরাজ। কিন্তু বৃহদারণ্যকে তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে চন্দ্র স্ত্রীজাতি। এ'দেশের পুরাণে তিনি পুরুষ; সুতরাং দক্ষ ঋষির অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি শোভান্বিত হইয়াছেন। বিষ্ণু-পুরাণকারের মতে এই সকল কন্যাই পরে অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র রূপে ও নক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পুরাণে চন্দ্রের আরও অনেক নাম আছে; তন্মধ্যে একটী ওষধীশ। বিষ্ণুপুরাণে (২।১২) আছে, "অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র প্রথমে জলে, পরে লতাসমূহে বাস করিয়া পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন। ইনি যখন লতাতে গমন করেন, তখন যদি কেহ লতা ছেদন করে, কিংবা লতার পত্র ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্মহত্যাপাপে পাতকী হয়। চন্দ্রই অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদ্‌গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন।" অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন; তাই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু রাত্রিকালে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হন আর নাই হন, তথাপি তিনি নিশাপতি। অন্ধকারে লতাসমূহের বৃদ্ধি হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও মত। নিশাপতি চন্দ্রের কিরণেই যেন লতাসমূহ বর্দ্ধিত হয়। চন্দ্রের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে। বিষ্ণুপুরাণে (২।৪।৮১) দেখা যায়—"কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই সমুদ্রের জল সমান থাকে—ন্যূনাধিক্য হয় না। কিন্তু অগ্নির উত্তাপে স্থালীস্থিত জল যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, তেমনই সমুদ্রজলও চন্দ্রের বৃদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে সমুদ্রজলের বিলক্ষণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তৎকালে সমুদ্রজল ৫১০ অঙ্গুলি বা ২১।০ হাত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।" অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সঙ্গে জলের হ্রাস-বৃদ্ধি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া পর্য্যবেক্ষণশক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন জোয়ারের সময় সমুদ্রজল একুশ হাত, কি ততোধিক বর্দ্ধিত হয়, তাহা নিরূপণ করিতে পরিমাপ আবশ্যক হইয়াছিল। আরও, চন্দ্র জলময় বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন। সেই জলময় চন্দ্রে সূর্য্যরশ্মি মূর্চ্ছিত হইয়া চন্দ্রকে দীপ্তিমান্ করে। চন্দ্রের শশলাঞ্ছনের কারণও চন্দ্রের জলময়ত্ব। মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব—৫

অঃ) বলেন, "লোকে যেমন দর্পণে নিজের মুখ দেখে, তেমনই চন্দ্রমণ্ডলে সুদর্শন দ্বীপ দেখা যায়। সেই সুদর্শন দ্বীপের দুই দুই অংশে পিপ্পল এবং দুই দুই অংশে শশ আছে।" অর্থাৎ জলময় চন্দ্রদেহে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব শশকাকার দৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে কালিদাস রঘুবংশে (১৪।৪০) বলিয়াছেন—"ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।" অর্থাৎ লোকে বলে, পৃথিবীর ছায়া নির্ম্মল চন্দ্রের কলঙ্ক হইয়াছে। ইহাই মোটামুটি চন্দ্র সম্বন্ধে পৌরাণিক বর্ণনা।*

এইবার আমরা চন্দ্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোচনা করিব। রাত্রিকালে আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক উদিত হইতে দেখা যায়, চন্দ্র তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক। চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে—এইরূপ উহাই একমাত্র জ্যোতিষ্ক। রাত্রিকালে চন্দ্রকে অপর সকল তারকা হইতে বৃহত্তর দেখা যায়; কিন্তু বাস্তবিক যে সকল তারকা নয়নগোচর হয়, চন্দ্র আয়তনে তাহাদের সকলের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। তবে উহা পৃথিবীর অতিশয় নিকটে বলিয়া এত বৃহদাকার লক্ষিত হয়। চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া আধুনিক জ্যোতিষে চন্দ্রকে পৃথিবীর "উপগ্রহ" কহে। চন্দ্র-কক্ষার প্রকৃত আকৃতি বড় জটিল। আধুনিক Lunar Theory বা চন্দ্রতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহার আকৃতির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা চলিতেছে। কোনও চিত্র দ্বারা উহার প্রকৃত আকৃতি বুঝান অসম্ভব; কারণ চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পৃথিবীও তেমনি সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চারিদিকেও ঘুরিতেছে। যদি পৃথিবীর গতি না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্রের কক্ষা একটা দীর্ঘবৃত্তাভাস ক্ষেত্র হইত এবং পৃথিবী তাহার নাভিদেশে (one of the foci) সংস্থিত হইত। কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকায় ঐ নাভিস্থিত পৃথিবী একস্থানে না থাকিয়া নিয়ত চলিয়া বেড়াইতেছে। এই কারণে চন্দ্রের কক্ষাও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। এতগুলি কারণ থাকায় চন্দ্রের কক্ষার আকৃতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রকে দেখিতে গোলাকার বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ গোল নহে; উহার আকৃতি ডিম্বের ন্যায় এবং উহার লম্বা দিকই পৃথিবীর অভিমুখে স্থাপিত। চন্দ্রের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্ফীত, তাহার ব্যাস প্রায় ২১৫০ মাইল—ইহা পৃথিবীর মেরুদণ্ডের আয়তনের প্রায় $\frac{3}{11}$ ভাগ মাত্র। কিন্তু পৃথিবী আয়তনে চন্দ্রাপেক্ষা ৫০ গুণ বৃহৎ হইলেও গুরুত্বে উহাপেক্ষা ৮০ গুণ ভারী। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চন্দ্র যে উপাদানে গঠিত, তাহার গাঢ়তা পৃথিবীর মৃত্তিকার গাঢ়তার $\frac{5}{8}$ অংশ মাত্র। চন্দ্র নিয়ত একমুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া ঘুরিতেছে; সুতরাং পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বহু বার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিয়া থাকে,

* এই সম্বন্ধে যাঁহারা আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থের পৌরাণিক জ্যোতিষ অধ্যায় পাঠ করিবেন।

চন্দ্র সে'রূপ করে না। চন্দ্র স্বীয় মেরুদণ্ডেও আবর্ত্তন করে বটে এবং সেই আবর্ত্তনের ফলে যথাক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু সূর্য্যের এই আপেক্ষিক উদয়াস্ত এক চান্দ্রমাসে সাধিত হয়, অর্থাৎ চন্দ্রের অহোরাত্র পৃথিবীর এক চান্দ্রমাসের সমান। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়াতে উহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রবল হইলেও উহা যে সূর্য্য কর্ত্তৃক একেবারে আকৃষ্ট হয় না—এরূপ নহে। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের আকর্ষণে উহার গতি এত বিচলিত হয় যে, তাহার ফলে চন্দ্রের কক্ষা অতিশয় বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। এই কারণে চন্দ্রের প্রকৃত গতি নির্ণয় করিতে অনেক জটিল গণিত-প্রণালীর প্রয়োজন হয়।

চন্দ্রের ক্ষীরোদসমুদ্রে জন্ম—এ'কথা পুরাণকারেরা বলিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট হইতে সকল সিদ্ধান্তকার চন্দ্রকে সলিলময় বলিয়াছেন। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, "সূর্য্যের অধঃস্থ চন্দ্রের উপরে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় বলিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ মাত্র শুক্লবর্ণ দেখায়। রৌদ্রস্থিত কুম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগ যেমন নিজ ছায়ায় আবৃত থাকে, তেমনই চন্দ্রের অপরার্দ্ধ নিজ ছায়া বশতঃ নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ থাকে।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রের একই অর্দ্ধাংশ আমরা দেখিয়া থাকি, ইহা অবগত হইতে অধিক পরিদর্শন আবশ্যক হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিলেই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু চন্দ্র শুক্লবর্ণ দেখায় কেন? বৈদিক ঋষিগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। বরাহও লিখিয়াছেন, "যেমন দর্পণে পতিত সূর্য্যরশ্মি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া গৃহের অন্ধকার নাশ করে, তেমনই জলময় চন্দ্রদেহে সূর্য্যরশ্মি মূর্চ্ছিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার নাশ করে।" বোধ হয় "জলময়" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জলে যেমন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়, চন্দ্রদেহেও তেমনই মূর্চ্ছিত (reflected) হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য দেশেও চন্দ্রকে জলস্থলময় বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিত। এমন কি, গ্যালিলিও স্বরচিত দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রবিম্ব দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, অসম কিন্তু উজ্জ্বল অংশসমূহ স্থলভাগ এবং সম অথচ কৃষ্ণবর্ণ অংশসমূহ জলভাগ। কৃষ্ণাংশ যে সমুদ্র, তাহা কেপ্‌লারও বিশ্বাস করিতেন।

চন্দ্র একটি জড়পিণ্ড মাত্র। ইহার নিজের যে আলোক-প্রদানের ক্ষমতা নাই—এ'কথা প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও বলিয়াছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণেরও তাহাই মত। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের গাত্রে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়, এই কারণে দূর হইতে তাহাকে আলোকিত দেখা যায় *। চন্দ্রের যদি স্বকীয় আলোক থাকিত, তাহা হইলে উহার কলার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর শৈশবে উহার ঘূর্ণন বেগ যখন অতি প্রবল ছিল, তখন উহার অঙ্গ হইতে এক অংশ স্খলিত হইয়া গিয়া চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। চন্দ্রের দেহ পৃথিবীর গাত্র অপেক্ষা শীতল ও কঠিন; কিন্তু এত গাঢ় নহে। চন্দ্রে এক্ষণে জলবায়ুর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না; কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে

* সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ।—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৪।৭।১

যে, পূর্ব্বে চন্দ্রে জল ছিল। চন্দ্রে অনেক পাহাড়-পর্ব্বত এবং স্থানে স্থানে বহুবিস্তৃত শুভ্র প্রান্তর দেখা যায়, এই সকল হইতে প্রতিফলিত আলোকের পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে ইহা এককালে সমুদ্র ছিল; এক্ষণে তাহার জলরাশি জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বরফাবৃত স্থান হইতে প্রতিফলিত হওয়ায় চন্দ্রের কিরণ এরূপ শুভ্র ও স্নিগ্ধ অনুভূত হয়। চন্দ্রের দেহে যে সকল কালিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে চন্দ্রের 'কলঙ্ক' কহে। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহাদের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইলে তাহাদের ছায়া পড়ে; এবং তাহাদের স্থানে স্থানে অতি গভীর গহ্বর ও উপত্যকা আছে, যাহাতে সহজে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না। এই সকল স্থানকে পৃথিবী হইতে কালিমাযুক্ত দেখা যায় এবং তাহাদিগকেই সাধারণ লোকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকে। গ্রাম্য লোকেরা মনে করিয়া থাকে যে, চন্দ্রের বুড়ী চরকা কাটিতেছে এবং কবিরা চন্দ্রের কলঙ্কে শশকের সাদৃশ্য দেখিয়া চন্দ্রকে শশাঙ্ক বা শশধর আখ্যা দিয়াছেন। আবার চন্দ্রের পর্ব্বতসমূহে যে সকল গহ্বররাজি দৃষ্ট হয়, তাহাদের আকৃতি দেখিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, চন্দ্রে এককালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটিত। কারণ ঐ সকল পর্ব্বত ঠিক আগ্নেয়গিরির অনুরূপ বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এককালে চন্দ্রের নানাস্থানে মুহুর্মুহু অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া তাহার আভ্যন্তরিক উত্তাপ সমস্তই বাহির হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্তই চন্দ্রের দেহ এক্ষণে এত শীতল হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রের যে গতি আছে, তাহা কয়েকদিন উপর্য্যুপরি আকাশে চন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ঋষিগণ জানিতেন, সূর্য্যের তেজেই চন্দ্র তেজোময় দেখায়। তাঁহারা বলিতেন, "আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ (সূর্য্যতেজ) এইরূপে পাইয়াছিলেন।" (ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৫)। যাহা হউক, চন্দ্রকে প্রত্যহ তাঁহারা আকাশে উদিত হইতে দেখিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "উদকময় অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবিত হইতেছে।" যে তারাটির নিকট হইতে আজ চন্দ্র প্রস্থান করিল, ২৭।২৮ দিনের পর আবার সেই তারায় ফিরিয়া আসিবে। আকাশে ত' অনেক তারা আছে, কতকগুলির সহিত চন্দ্র এইরূপ ভাবে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত। ঋষিগণ বলিতেন, "এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।" (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।২) যে সকল তারার সহিত চন্দ্র প্রতিরাত্রে অবস্থান করে, প্রাচীন ঋষিগণ তাহাদিগকে নক্ষত্র নামে অভিহিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সপ্তর্ষি মৃগশিরা প্রভৃতি কতকগুলি নক্ষত্রের নাম সৃষ্টি হইল। আকাশে চন্দ্রের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং ২৭ (প্রথমে ২৮) দিনে চন্দ্র সেই পথ একবার ভ্রমণ করিয়া আসে বলিয়া চন্দ্রপথ কালক্রমে ততগুলি নক্ষত্রে বিভক্ত হইল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, আজ চন্দ্র যেস্থানে অবস্থিত, তাহার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি তারকাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিলে পরদিন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নক্ষত্রগণ প্রায় তাহাদের পূর্ব্বস্থানেই রহিয়াছে; কিন্তু চন্দ্র তথা হইতে অনেক দূর পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। আজ চন্দ্রকে যে সময়ে অস্ত যাইতে দেখা যায়,

কাল উহাকে তাহার এক মিনিট পরে অস্ত যাইতে দেখা যাইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্রের উদয়াস্ত কাল প্রায় ৫০ মিনিট পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। এই অন্তরকাল সর্ব্বদা সমান থাকে না; কখনও ইহার পরিমাণ ৪৮ মিনিট, ৪৯ মিনিট এবং কোন কোনও দিন ৫১ মিনিটের বেশীও হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের ন্যূনাধিক্য হেতু চন্দ্রের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের তারতম্য ঘটাতেই তাহার গতি কখনও দ্রুত এবং কখনও বা মন্দ হইয়া যায়; এই কারণে উহার উদয়াস্তের কালও সেই অনুসারে কিছু অগ্রপশ্চাৎ হয়। একদিনে উদয়াস্তকালের পার্থক্য ৪৯ মিনিট ধরা হয়। প্রথম দিন যদি সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র এক সময়ে অস্ত যায়, তবে দ্বিতীয় দিন চন্দ্র সূর্য্যের ৪৯ মিনিট পরে, তৃতীয় দিন ১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট পরে, চতুর্থ দিন ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট পরে অস্ত যাইবে। এইরূপে তাহাদের অস্তকালের অন্তর ১২ ঘণ্টা হইতে প্রায় ১৫ দিন লাগিবে, অর্থাৎ প্রায় ১৫ দিন পরে সূর্য্যাস্তকালে চন্দ্র পূর্ব্বদিকে সবে মাত্র উদিত হইবে। আরও ১৫ দিন পরে—সূর্য্য ও চন্দ্রের অস্তকালের অন্তর ২৪ ঘণ্টা হইলে—উভয়ে একত্র অস্ত যাইবে। সূক্ষ্ম গণনায় দেখা গিয়াছে যে, উহাদের অস্তকালের অন্তরকাল ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হইতে প্রায় ২৯½ দিন লাগে; ইহা হইতে স্থির হয় যে, সূর্য্যের সহিত তুলনায় চন্দ্র ২৯½ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

প্রাচীন ঋষিগণ দেখিলেন যে, কোন কোন দিন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয়, কোন কোন দিন পূর্ণাকারে আকাশ হইতে সুধা বর্ষণ করিতে থাকে। তাঁহারা দেখিলেন, এক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইতে পুনর্ব্বার অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ বার সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ত্রিশ দিনে মাস* হইল। কিন্তু সূর্য্যের উদয়াস্তকালে আজ যে নক্ষত্র উদিত বা অস্তগত হইল, কয়েকদিন পরে তাহারা সেইরূপ হয় না (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।২।১)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদয় গ্রহের মধ্যে চন্দ্র শীঘ্রগতি। এক রাত্রির মধ্যেই উহাকে তারাগণের মধ্য দিয়া আকাশে কিয়দ্দূর অপসৃত হইতে দেখা যায়। বহু প্রাচীন কাল হইতে চন্দ্রগতি পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে প্রচীন ঋষিরা চন্দ্রের গতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে চন্দ্র ২৭·৩২১৬৭ মধ্যম সাবন দিনে দ্বাদশ রাশিভোগ পূর্ণ করিয়া আসে। আধুনিক জ্যোতিষ-মতে চন্দ্রের ভগন ভোগকাল ২৭·৩২১৬৬ দিবস। ঋষিগণ আরও দেখিলেন, সূর্য্যও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া আকাশে ভ্রমণ করে। তাঁহারা দেখিলেন, চন্দ্রের নক্ষত্রকয়টীর মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসিতে সূর্য্যের যত সময় লাগে, তত সময়ে ১২টী মাস হয়। অতএব ৩০ দিনে "মাস" এবং ১২ মাসে এক সৌর বৎসর হয়। তাঁহারা বলিলেন, "দ্বাদশ পরিধি, একচক্র ও তিন নাভি—এ'কথা কে জানে? ঐ চক্রে ৩৬০ সংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে" (ঋগ্‌বেদ ১মঃ ৪৮ সূঃ)। ইহার ব্যাখ্যায় সকলেই

---

*চন্দ্রমস্ শব্দ হইতে মাস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মাস বলিলে পূর্ব্বে কেবল চান্দ্রমাস বুঝাইত। ইংরাজি moon ও month শব্দদ্বয়ও এইরূপ। মাস শব্দের একটি অর্থ চন্দ্র, যথা—"সূর্য্যামাসা"—সূর্য্য ও চন্দ্র (ঋগ্বেদ ১।৮৫)। চন্দ্রের আর একটী নাম—মাসকৃৎ।

বলেন—চক্রই সংবৎসরাত্মক কালচক্র, উহার দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ পরিধি, তিন চাতুর্মাস্য, তিন নাভি এবং ৩৬০ অহোরাত্র ৩৬০টী চক্রের অর। কিন্তু ৩৬০ দিনে বা এক বৎসরে ১২টী মাস হইয়া প্রায় ৬ দিন অবশিষ্ট থাকে। বৎসরের আরম্ভে কোনও নক্ষত্র হইতে চন্দ্রসূর্য্য প্রস্থান করিলে বৎসরের শেষে তাঁহারা তথায় পুনর্ব্বার একত্র হয় না। অতএব ৩৬০ দিনাত্মক পাঁচ বৎসরে ৩০ দিন বা এক "মাস" অধিক হয়। এই অধিক মাস বা অধিমাস ৫ বর্ষ অন্তর ত্যাগ না করিলে চান্দ্রমাস ও সৌরবৎসরের ঐক্য থাকে না; সুতরাং ঋতুরও ঐক্য থাকে না। হিন্দুদিগের পূজা-যাগযজ্ঞ তিথি-নক্ষত্রও চান্দ্রমাসের সম্পর্কে সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অধিমাসে কোনও ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার বিধি নাই। ইহা যে ঐ মাসের দোষে ঘটে, তাহা নহে; তবে তিথিমতে ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে সৌরবৎসরের হিসাবে তাহার সময় গণনার ব্যতিক্রম ঘটে। একটা নিদর্শন দিলেই ইহা সহজে বোধগম্য হইবে। শরৎকালে শারদীয় দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। যে তিথিতে ঐ পূজা হয়, তাহা সৌরবৎসরের হিসাবে শরৎ ঋতুতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে হওয়া বিধেয়; কিন্তু চান্দ্রমাসের সহিত সৌরমাসের মিল না থাকাতে ঐ পূজার সময়ের প্রতি বৎসর ব্যতিক্রম ঘটিবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা শরৎ ঋতু ছাড়াইয়া অপর ঋতুতে ঘটিতে থাকিবে। এইরূপে যথাক্রমে ঋতুর পর ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারদীয় দুর্গাপূজা যে কোনও ঋতুতে ঘটিতে পারে। কিন্তু "অধিমাস" পরিত্যাগ হেতু তাহা ঘটিতে পারে না; ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা বৎসরের পর বৎসর একই শরৎ ঋতুতেই ঘটিয়া থাকে। মুসলমান পঞ্জিকায় "অধিমাস" পরিত্যাগ না করায় মহরম প্রভৃতি মুসলমান পর্ব্ব বৎসরের পর বৎসর সময় পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে একে একে সকল ঋতুতে ঘটিতে দেখা যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, "যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।" (ঋগ্‌বেদ ১মঃ ২৫ সূঃ) অথবা "তং ত্রয়োদশান্মা-সাদক্রীণং তস্মাৎ ত্রয়োদশো মাসো নানুবিদ্যতে"। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১) যাহা হউক, আর্য্যঋষিগণ গগন-পরিদর্শনে ক্রমশঃ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া চান্দ্র ও সৌর বৎসরের ঐক্য রক্ষা করিবার জন্য অধিমাস (মলমাস) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে দেখিলেন যে, ৩০ চান্দ্রদিনে (তিথিতে) মাস (চান্দ্রমাস) হয়; কিন্তু ৩৬০ চান্দ্রদিনে এক বৎসর হয় না। পরন্তু ৩৬৬ সাবন দিনে সূর্য্য একবার ঘুরিয়া আসেন। সুতরাং তাঁহারা ৩৬৬ দিনে সৌরবৎসর নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তাঁহারা দ্বাদশটী দিনকে স্থলবিশেষে বিশেষ দিন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* ঋষিগণ দেখিলেন, চান্দ্রমাসের পরিমাণও

---

* "They were in fact the supplementary days required to balance the lunar with the solar year...... The sacrificial literature of India still preserves the memory of these days by ordaining that a person wishing to perform a yearly sacrifice should devote 12 days (দ্বাদশাহঃ) before its commencement to the preparatory rites. These facts conclusively establish that the primitive Aryans had solved the problem involved in balancing the solar with the lunar year"—Tilak's Orion page 16.

ঠিক ত্রিশ দিন নহে ; বস্তুতঃ ১২টী চান্দ্রমাসে প্রায় ৩৫৪ দিন। ৩৬৬ দিনাত্মক বর্ষ হইতে ৩৫৪ দিন বাদ দিলে ১২ দিন অবশিষ্ট থাকে। আধুনিক হিসাবে ৩৬৫ দিনে বর্ষ ধরিলে ১১ দিন অবিশিষ্ট থাকে এবং তিন বৎসর পর পর একটী করিয়া অধিমাস আসিয়া পড়ে।

প্রতিমাসে এমন এক রাত্রি উপস্থিত হয় যে, রাত্রে আকাশ নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল মেঘশূন্য থাকিলেও চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে তিথিতে এইরূপ ঘটে, তাহাকে অমাবস্যা কহে। প্রাচীন ঋষিগণের মতে চন্দ্রের একবার অস্তগমন হইতে পরবর্ত্তী উদয় পর্য্যন্ত সময়কে এক তিথি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; যথা—"যাং পর্য্যস্তমিয়াদ ভ্যুদিয়াদিতি সা তিথিঃ।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩২।১০)। অমাবস্যার ধাতুগত অর্থ—একত্র বাস করা এবং ঐ তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র বাস করে বলিয়া ঐ তিথিকে অমাবস্যা কহে (শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম কাণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ, পঞ্চম ঋক্)। ঐ তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র উদয়াস্ত ঘটিয়া থাকে ; এই কারণে রাত্রিতে যেমন সূর্য্যকে দেখা যায় না, তেমন চন্দ্রকেও দেখা যায় না। অমাবস্যার পর হইতে ক্রমে চন্দ্র সূর্য্যের পরে অস্ত যাইতে আরম্ভ করে—এই জন্য সন্ধ্যারাত্রে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখা যায়। অমাবস্যার পর প্রথম তিথিকে প্রতিপদ কহে এবং ইহার পর যথাক্রমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী আখ্যায় তিথিগুলিকে অভিহিত করা হইয়াছে। এই কয়টি তিথিতে চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর আকার ধারণ করে এবং এই পঞ্চদশ তিথির অবসানে সূর্য্যাস্তকালের সহিত চন্দ্রের অস্তকালের ১২ ঘণ্টা বা অর্দ্ধদিবসের অন্তর ঘটে। সুতরাং অমাবস্যার পর পঞ্চদশ তিথিতে চন্দ্রের অস্তগমন সূর্য্যের অস্তগমনের ১২ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ পুনরায় সূর্য্যোদয়ের সময়ে ঘটিয়া থাকে এবং ঐ তিথিতে সূর্য্যাস্তকালে চন্দ্র উদিত হইয়া সমস্ত রজনী আকাশে বিরাজ করিতে থাকে—এই তিথিকে পূর্ণিমা কহে। এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশটী তিথিতে এক চান্দ্রমাস পূর্ণ হয় বলিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয়তিথিকে পূর্ণিমা কহে। "পূর্ণমাস"—এই শব্দ হইতে "পূর্ণিমা" শব্দ হইয়াছে। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৬।৭)॥ যেমন পূর্ণিমান্ত মাসের কথা বেদ ও সংহিতায় উল্লিখিত আছে, সেইরূপ কোনও কোনও স্থলে অমান্ত মাসের কথারও উল্লেখ আছে। যাহা হউক, পূর্ণিমার পর আবার প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে চন্দ্র ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। তাহার পর পঞ্চদশ তিথিতে সূর্য্যাস্তকালের সহিত চন্দ্রাস্তকালের আরও ১২ ঘণ্টার অন্তর ঘটে ; তখন প্রথম অমাবস্যা হইতে চন্দ্রাস্তকালের অন্তর ২৪ ঘণ্টা হওয়ায় ঐ তিথিতে পুনরায় চন্দ্রের ও সূর্য্যের একত্র উদয়াস্ত হয়। এইরূপে একটী চান্দ্রমাস গঠিত হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—"চন্দ্রমা-বৈ পঞ্চদশঃ॥ এষ হি পঞ্চদশ্যামপক্ষীয়তে॥ পঞ্চদশ্যামাপূর্য্যতে॥ (১।৫।১০)" ;—অর্থাৎ চন্দ্রের পঞ্চদশ তিথিতে ক্ষয় এবং পঞ্চদশ তিথিতে পূর্ণতা। এক অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে

চতুর্দ্দশ তিথিতে চন্দ্রের পূর্ণতা হইতে থাকে, তাহাকে "শুক্লপক্ষ" এবং পূর্ণিমা হইতে যে চতুর্দ্দশ তিথিতে চন্দ্রের ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে "কৃষ্ণপক্ষ" আখ্যা দেওয়া হয়। অথর্ব্ব বেদে আছে—"মাসো বৈ প্রজাপতিঃ॥ তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্ল প্রাণঃ॥" এই দুই পক্ষের তিথিকে পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য পক্ষের নাম পূর্ব্বে যোগ করা হইয়া থাকে, যেমন "শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী" (বা সংক্ষেপতঃ "শুক্লত্রয়োদশী") বলিলে অমাবস্যার পরবর্ত্তী ত্রয়োদশী তিথি এবং "কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী" (বা কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী) বলিলে পূর্ণিমার পরবর্ত্তী ত্রয়োদশী বুঝাইবে। বৈদিক কালে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ করা হইত, "এষা হ সংবৎসরস্য প্রথমা রাত্রি র্যা ফাল্গুনী পূর্ণমাসী।" (শতপথ ব্রাহ্মণ) অথবা "ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং চাতুর্মাস্যানি প্রযুংজীত। মুখং বা এতৎবৎসরস্য যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।" (গোপথ ব্রাহ্মণ ৬।১৯)॥

অমাবস্যার পর হইতে প্রতি রাত্রিতে আকাশে চন্দ্রের দৃশ্যমান আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, ইহাকে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রের কলা-পরিবর্ত্তন বলিয়াছেন। ইহার কাল্পনিক ব্যাখ্যা ঋগ্‌বেদে এইরূপ আছে—"যত্বা দেব প্রপিবংতি তত আপ্যায়সে পুনঃ।" (১০।৮৫।৫।) অথবা তৈত্তিরীয় সংহিতায়—"যমাদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ংতি যমক্ষিতমক্ষিতয়ঃ পিবংতি।" (২।৪।১৪)। প্রতিপদের চন্দ্রের আকৃতি একটী সূক্ষ্ম ধনুকাকার রেখামাত্র এবং তাহা সূর্য্যের অল্পক্ষণ পরেই অস্ত যায়; এই কারণে গোধূলির আলোকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। পরদিন সূর্য্যাস্তের পরেই পশ্চিমাকাশে ক্ষিতিজের অব্যবহিত উপরিভাগে দ্বিতীয় বার চন্দ্রের উদয় হয়, উহা ধনুকাকার হইলেও তাহার মধ্যভাগ ঈষৎ স্থূল। যত দিনের পর দিন গত হইতে থাকে, ততই চন্দ্রকে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যভাগের স্থূলতাও ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের দশম অধ্যায়ে শৃঙ্গোন্নতি বর্ণনার কালে চন্দ্রকলার নির্ণয়ের বিশদ আলোচনা আছে; তাহা গণিত-জ্যোতিষের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এ'স্থলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইল না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মোটামুটি বর্ণনা এইরূপ :—"যে বিন্দুতে কোটি ও কর্ণ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্ট সময়ে চন্দ্র-বিম্বানুসারে বৃত্ত রচনা করিবে। কর্ণসূত্র যে দিকে, সেই দিকই—অর্থাৎ কর্ণ ও চন্দ্রবিম্বের ছেদবিন্দুকে পূর্ব্ব জ্ঞান করিবে। এবং কর্ণকে বাড়াইয়া দিলে চন্দ্রবিম্বকে যেখানে ছেদ করে, তাহাকে পশ্চিম বিন্দু জ্ঞান করিবে। যেখানে বিম্ববৃত্ত ও চন্দ্ররেখা যুক্ত, সেই বিন্দু হইতে চন্দ্রকেন্দ্রাভিমুখে কর্ণরেখার স্ফুটশুক্লপরিমাণ দূরে বিন্দু স্থাপন করিবে। সেই বিন্দু ও চন্দ্রের উত্তর বিন্দু এবং সেই বিন্দু ও চন্দ্রের দক্ষিণ বিন্দুর মধ্যে মৎস্যদ্বয় রচনা করিবে। এই মৎস্যদ্বয়ের (the space enclosed by two intersecting arcs) মুখ ও পুচ্ছ বিনিঃসৃত রেখাসংযোগকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত তিন বিন্দু (উত্তর, দক্ষিণ এবং স্ফুটশুক্লাগ্রবিন্দু) স্পর্শ করিয়া ধনু অঙ্কিত করিবে। এই ধনু দ্বারা ছেদিত হইয়া চন্দ্রবিম্ব পূর্ব্বদিকে যেমন দেখাইবে, সেই দিনে চন্দ্র সেইরূপ দৃশ্য হইবে। (৯-১১) কোটি দ্বারা চন্দ্রবিম্বে দিক্ নির্ণয়

করিয়া দক্ষিণোত্তর (অর্থাৎ কর্ণের উপর লম্ব রেখার) তির্য্যক্ সূত্রের শেষভাগে উন্নত শৃঙ্গ দেখাইবে ; তাহাই আকাশস্থ চন্দ্রের আকৃতি। (১২) কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রস্পষ্ট হইতে ৬ রাশিযুক্ত বিয়োগ করিয়া শুক্লের ন্যায় অসিত (কালো অংশ) নির্ণয় করিবে। বাহুর দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিম প্রদেশে অসিত দেখাইবে। (১৩)॥"

ভাস্করাচার্য্য 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে শৃঙ্গোন্নতিবাসনা প্রসঙ্গে চন্দ্রের ক্রমশঃ শুক্লাকৃতির সরল ও বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন—"সূর্য্যের" রশ্মি-সংযোগে অমৃতপিণ্ড চন্দ্র সূর্য্য-দৃষ্টভাগে স্বীয় জ্যোৎস্না দ্বারা প্রকাশিত হয়। অন্য দিক স্বীয় ছায়া দ্বারা ঘটের ন্যায় আবৃত হইয়া বালিকার শ্যামল কুন্তলের স্বরূপ দৃষ্ট হয়। অমাবস্যার সূর্য্যের অধঃস্থিত চন্দ্রের নিম্নদেশে পৃথিবী অবস্থিত হওয়ায় মনুষ্যদৃষ্ট অর্দ্ধভাগ সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ হয়। অন্যথা পূর্ণিমায় ৬ রাশি দূরে অবস্থিত হওয়ায় শুক্লবর্ণ দেখায়। চন্দ্র হইতে সূর্য্য-কক্ষার চতুর্থাংশ দূরে একটী বিন্দু নির্ণয় করিয়া চন্দ্রাভিমুখে চন্দ্রের দূরত্বানুসারে দূরে অন্য বিন্দু নির্ণয় করিবে। সেই স্থানে সূর্য্য আসিলেই অর্দ্ধ শুক্ল দৃষ্ট হইবে। সেই স্থানটী চন্দ্র হইতে ৮৫ অংশ ৪৫ কলা দূরে। চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া যত দূরে গমন করে, ততই চন্দ্রের শুক্লতা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গতা লাভ করে। সূর্য্য ও চন্দ্রের উত্তর দক্ষিণ অন্তর বাহু, কোটি উর্দ্ধাধঃ, তির্য্যক রেখা (চন্দ্র ও সূর্য্যরেখা) কর্ণ। ভুজের মূলে সূর্য্য, সেই ভুজ চন্দ্রের দিকে, ভুজশেষে (তির্য্যক ভাবে) কোটি, কোটির শেষে চন্দ্র। চন্দ্র হইতে সূর্য্যাভিমুখে কর্ণ। সেই দিকেই সূর্য্য শুক্লতাদান করে (১-৫ শ্লোক)।"

চন্দ্রের এই আকৃতি-বিপর্য্যয় বুঝিতে হইলে একটি চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে সুবিধা হয়। নিম্নে একটী চিত্র অঙ্কিত হইল। চন্দ্রের আকৃতি বিভিন্ন স্থানে কিরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই চিত্রে (চিত্র—১) দর্শিত হইল।

এখানে পৃ পৃথিবী, $চ_১$ $চ_২$ $চ_৩$ প্রভৃতি দ্বারা চন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে স্থিতি নির্দ্দেশিত হইতেছে। 'পৃ স' রেখা দ্বারা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দিক বুঝায়। বিভিন্ন তীরের দ্বারা সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের দেহে যে দিক হইতে পতিত হইতেছে, সেই দিক নির্দ্দেশিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক—চন্দ্র পৃথিবী হইতে কতদূরে অবস্থিত। বলা বাহুল্য, স্থূল পরিমাপের দ্বারা অসাধ্য দূরস্থ বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সম্মুখের কোন ভূমির দৈর্ঘ্যযোজন এবং সেই ভূমির দুই প্রান্ত হইতে সেই বস্তু পর্য্যন্ত দুইটী সূত্র বিস্তৃত করিলে উভয় সূত্রের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা বস্তুটীর অন্তর পরিমিত হইবে। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে গ্রহণবাসনা প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভূপৃষ্ঠগত স্থান হইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত একটী সূত্র রচনা করিবে এবং ভূমধ্য হইতে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত আর একটী সূত্র রচনা করিবে ; এই দুই সূত্রের মিলনগত কক্ষাস্থিত কোণকে লম্বন কলা বলে। দৃক্‌সূত্র হইতে চন্দ্র লম্বিত অর্থাৎ নিম্নগত বলিয়া দৃষ্ট হইবে—এইজন্য লম্বন কথিত হইয়াছে।"

মনে করুন—'ভূকে' পৃথিবীর কেন্দ্র, "দ্র" দ্রষ্টা, "চ" চন্দ্র ; তাহা হইলে "ভূকেদ্র" পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ, "দ্র চ" পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব (চিত্র—২)। কোণ "দ্রচভূকে" চন্দ্রের লম্বন। তাহা হইলে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ÷ লম্বন = চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ÷ দৃগ্‌জ্যা।
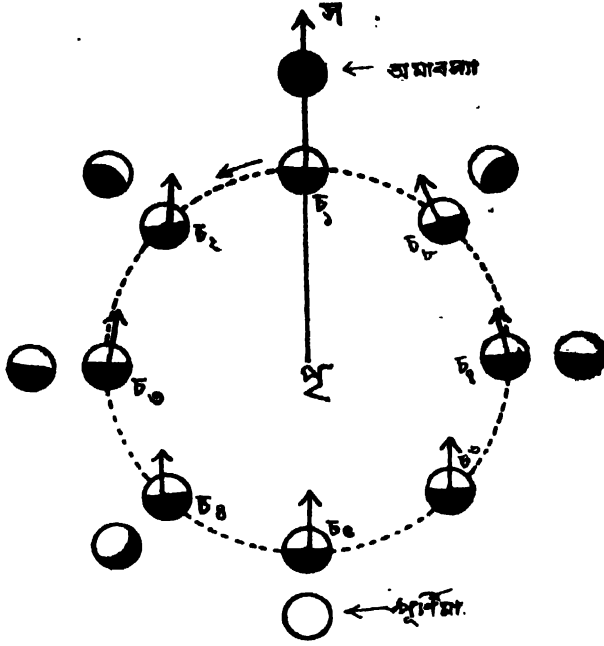
চিত্র—১

অতএব লম্বন = দৃগ্‌জ্যা × ব্যাসার্দ্ধ ÷ দূরত্ব ; অথবা দূরত্ব = দৃগ্‌জ্যা × ব্যাসার্দ্ধ ÷ লম্বন। দৃগ্‌জ্যা বৃহত্তম হইলে পরমলম্বন হইবে, অর্থাৎ পরমলম্বন = ব্যাসার্দ্ধ ÷ দূরত্ব ; অতএব লম্বন = পরমলম্বন × দৃগ্‌জ্যা (এখানে ত্রিজ্যা = ১, হিন্দু মতে)। এই নির্দ্ধারণ স্থলে পৃথিবীর মধ্য হইতে ও
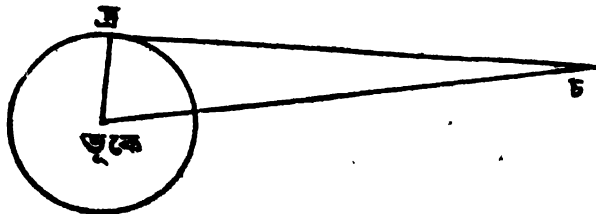
চিত্র—২

পৃষ্ঠ হইতে দূরত্বের পার্থক্য অতি সামান্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। দূরত্ব = পরমলম্বন × ব্যাসার্দ্ধ।

'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' চন্দ্রের পরমলম্বন নিম্নলিখিত অঙ্কপাতের আকারে দেওয়া আছে ; যথা—

$$\frac{৫০৫৯}{৩২৪০০০} \times ৩৪৩৮ \text{ কলা} = ৫৩\cdot৬৮১ \text{ কলা।}$$

ইহা এইরূপ ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে :—

'খ চ' পৃথিবী ; 'গ ঘ' চন্দ্রকক্ষা ; 'ক' ভূ-কেন্দ্র ; 'খ গ' ক্ষিতিজ ; 'খ গ ক' কোণ পরম লম্বন। সুতরাং $\frac{\text{খক}}{\text{কগ}} = \frac{\text{'খ গ ক' কোণ}}{\text{"কগ"র কৌণিক পরিমাণ}}$

অতএব 'খগক'কোণ (পরমলম্বন) $= \frac{\text{খক}}{\text{কগ}} \times$ কগ' র কৌণিক পরিমাণ। 'গ'-কে কেন্দ্র করিয়া 'গক' ব্যাসার্দ্ধ করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে এই বৃত্তের পরিধিতে 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া একটী বৃত্তাংশ ব্যাসার্দ্ধ 'গক'-এর সমান করিয়া কাটিয়া লওয়া গেল। এই বৃত্তাংশের সম্মুখস্থ কোণ "কগ" র কৌণিক পরিমাণ। ইহার পরিমাণ ৩৪৩৮ কলা, পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাপ (Earth's radius in radian according to Hindu Astronomy)।

এক্ষণে খ ক = ৮০০ যোজন (পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ) ; চন্দ্রকক্ষা = ৩২৪০০০ যোজন জানা আছে। সুতরাং 'কগ' চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধ $= \frac{৩২৪০০০}{২\sqrt{১০}}$ $(\pi = \sqrt{১০})$

অতএব $\frac{\text{খক}}{\text{কগ}} \times$ 'কগ'র কৌণিক পরিমাণ $= \frac{৮০০ \times ২ \times \sqrt{১০}}{৩২৪০০০} \times ৩৪৩৮' = \frac{৫০৫৯}{৩২৪০০০} \times ৩৪৩৮' = ৫৩\cdot৬৮১$।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদেরা ধারণা করেন যে, প্রত্যেক গ্রহ স্বীয় কক্ষায় প্রত্যহ প্রায় ১২০০০ যোজন ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে সংলগ্ন ক্ষিতিজ রেখা ও ভূকেন্দ্র-সংলগ্ন ক্ষিতিজ রেখার মধ্যস্থ দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের সমান, অর্থাৎ ৮০০ যোজন,—এই ৮০০যোজন ১২০০০ যোজনের $\frac{১}{১৫}$ ভাগ ; তাহা হইলে আহ্নিক গতির $\frac{১}{১৫}$ অংশই পরমলম্বন অর্থাৎ $\frac{১}{১৫} \times ১৩^\circ১২' =$ পরমলম্বন (প্রায়)।

ইংরাজী মতে চন্দ্রের পরমলম্বন ৬১'৫৩৩' হইতে ৫২'৮৮' হয়। পূর্ব্বে যখন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বায়ুবলনের (refraction) ব্যাপার জানিতেন না, তখন তাঁহারা যে পরমলম্বন এত কাছাকাছি বাহির করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের প্রতিভার পরিচায়ক। য়ুরোপ-খণ্ডে টাইকোব্রাহি ও কেপ্‌লার পর্য্যন্ত বায়ুবলনের ব্যাপার কেহই জানিতেন না। তবে কমলাকরভট্টের 'সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক' নামক জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে (১৫৮০ শক) একটী শ্লোক আছে, যাহাতে বায়ুবলনের উল্লেখ বুঝাইতে পারে।

চন্দ্রের পরমলম্বন জ্ঞাত হইলে এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ জানা থাকিলে, ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব বাহির করা যাইতে পারে। এই দূরত্ব ৫১৫৬৬ যোজন ; চন্দ্রকক্ষার পরিধি ৩২৪০০০ যোজন ধরা হইয়াছে। আধুনিক জ্যোতিষ মতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২,৩৮,৮৩৫

মাইল; ইহা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৩০ গুণ। কিন্তু চন্দ্র সর্ব্বদা পৃথিবী হইতে সমান দূরে থাকে না; যখন উহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার দূরত্ব ২,২৪,৭২০ মাইল; এবং যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী হয়, তখন ২,৫২,৯৫০ মাইল হইয়া থাকে।

পৃথিবীর উপগ্রহ হিসাবে চন্দ্রের একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। এই কারণে চন্দ্রমণ্ডল সম্বন্ধে সকল দিক দিয়া যতদূর সম্ভব গণিতের জটিলতা পরিত্যাগ করিয়া আলোচনা করা হইল। চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে এইস্থলে কোনও কথা বলা হয় নাই; কারণ গ্রহণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ একত্র আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ও ঋষিগণ জ্যোতিষ ও পুরাণ সংহিতায় চন্দ্র সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের গতি, আকৃতি, অবয়ব, আয়তন কিছুর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে বাকি রাখেন নাই। সেই সমস্ত আলোচনার একটা মোটামুটি ধারা এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

বৃষ্টি-কৃমি

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে উদ্ভিদ্ রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে। প্রাণিগণ উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। সেই কারণে খাদ্যের জন্য উহারা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ্-দেহের ন্যায় প্রাণীদেহেও আহার্য্য বস্তু অনেক পরিমাণে থাকে; সুতরাং প্রাণী মাংসাশীও হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রাণী অন্য প্রাণীর রক্ত ও রস শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। শেষোক্ত প্রাণীদিগের পরিপাক-শক্তি অন্য রকম এবং ইহারা উদ্ভিদ্ বা কাঁচা মাংস খাইতে অক্ষম; ইহারা প্রস্তুত বা পরিপক্ক খাদ্যের অথবা অপরের শারীরিক রসাস্বাদনের পক্ষপাতী। এইরূপ আহার-প্রণালী অবলম্বনের জন্য এক শ্রেণীর জীব অপর প্রাণীর দেহে সংযুক্ত থাকে ও আহারের জন্য ইহাদের পরমুখাপেক্ষী ও ক্রমে পরান্নপুষ্ট ও পরাশ্রয়ী হইতে হয়। ফলতঃ প্রাণিজগতে এক জন আশ্রয়দাতা ও একজন আশ্রিত হয়। প্রাণিজগতে পরস্পরের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর জীব পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করে—দেখা যায়। এই পরস্পর নিরপেক্ষ সাম্য অবস্থা হইতে আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার সম্বন্ধও ক্রমে শত্রুতায় পরিণত হয়; খাদ্য-সমস্যাই এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ।

আশ্রিত প্রাণী অপরের শরীরের রস শোষণ করিয়া নিজ দেহ পুষ্ট করে; আর

আশ্রয়দাতাকে অকালে জীবন হারাইতে হয়। ইহাতে একের সুবিধা ও অপরের অনিষ্ট হয়।

পরপুষ্ট বিনা পরিশ্রমে জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ সুগম করে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্য দিকে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া ক্রমশঃ পরিশ্রমকাতর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অকর্ম্মণ্যতার ফলে দেহের পরিবর্ত্তন হয়—হস্তপদাদির ক্ষয়প্রাপ্তি এবং দর্শনশক্তির লোপ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহে অক্ষমতার পরিচয় দেয়। এই সময়ে পরাশ্রয়ী আশ্রয়দাতার শরীর হইতে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার বাঁচিবার আর কোন উপায় থাকে না।

আবার আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, একের অকালে মৃত্যু হইলে অপরের মৃত্যুও অনিবার্য্য। আশ্রয়দাতার মৃত্যু হইলে খাদ্যাভাবে পরাঙ্গভুকের অকাল মৃত্যু ও বংশলোপের খুবই সম্ভাবনা। এইরূপ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরপুষ্ট ও পরাশ্রয়ী প্রাণী কতিপয় উপায় অবলম্বন করে। প্রথমতঃ, পরপুষ্ট প্রাণীর দেহের অগ্রভাগ বঁড়শীর মত কাঁটাযুক্ত; ইহা দ্বারা উহারা আশ্রিতের শরীরে বিদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং আশ্রিতের দেহ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা অনেক প্রাণীর শরীরের অভ্যন্তরে—পাকনালী, মাংসপেশী বা ধমনীতে—গুপ্তভাবে লুক্কাইত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ চিত্রে কয়েকটী পরাশ্রিত প্রাণী দেখান হইল (চিত্র—১,২ ও ৩)। আবার বংশরক্ষা হেতু তাহারা অনেক ডিম্ব ও সন্তান উৎপাদন করে। সন্তানসন্ততি আশ্রিতের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া নূতন আশ্রয়ের অন্বেষণ করে ও কৃতকার্য্য হইলে নূতন আশ্রয়দাতার রক্ত বা রস পান করিয়া স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করে। পরাঙ্গভুকের শিশুগণ এই রকমে নিত্য নূতন প্রাণী-দেহে আশ্রয় লইয়া নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

কোন কোন পরাঙ্গভুকের শিশুগণ প্রথম আশ্রয়দাতার শরীর হইতে মলের সহিত বাহির হইয়া কিছু দিন ভিজা মাটীতে বাস করে। কিন্তু এই সময়ে যদি আশ্রয়দাতা শ্রেণীর প্রাণীর শরীরে কোন রকমে পৌছিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জীবন শেষ হইয়া যায়। সকল পরপুষ্ট জীবের পক্ষে এরূপে একদেহ হইতে অন্য দেহে যাওয়া বিপদজনক। এ বিপদে পতঙ্গ ও শম্বুক জাতীয় প্রাণীরা ইহাদের বিশেষ সাহায্য করে। তাহারা এই শিশুগুলিকে নিজেদের শরীরে থাকিতে দেয় ও নিজেদের রক্ত খাওয়াইয়া ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে এবং উপযুক্ত সময়ে আশ্রয়দাতা শ্রেণীর কোন প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে উহাদিগকে পৌছাইয়া দিয়া পরম বন্ধুর কাজ করে। Liver flukeকে এইরূপ কতকগুলি প্রাণী এইভাবে সাহায্য করে। মশাও এই রকমে ম্যালেরিয়া বীজের ও Filaria কৃমির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া আমাদের শরীরে অনেক সন্তান ছাড়িয়া দেয়। মশা কামড়াইবার সময় এই কৃমি-শিশুকে মুখে করিয়া রক্তের সহিত টানিয়া লইয়া আর এক ব্যক্তির শরীরে filaria কৃমি (চিত্র—১) ছাড়িয়া দেয়।

পরপোষণ ও পরাশ্রয়ে জীবন-যাপনের বাসনা প্রায় সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। এককোষ-প্রাণী হইতে মানব পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ এই পথাবলম্বী। তবে
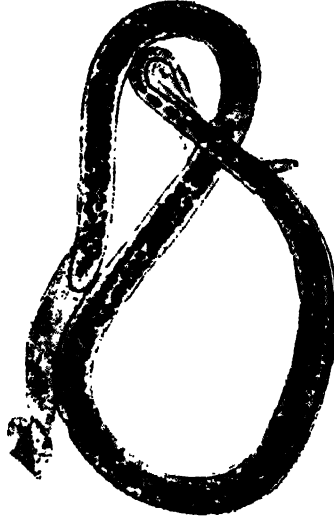
চিত্র—১

ফাইলেরিয়া (Filaria) কৃমি

প্রাণিজগতে এইরূপ স্বভাবানুবর্ত্তী জীবের সংখ্যা বহুল হইলেও সংখ্যাতীত নহে। সকল শ্রেণীর

চিত্র—২

এণ্টামিবা হিষ্টোলাইটিকা (Entamœba histolytica)

প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পরান্নভুক্; কিন্তু বেশীর ভাগই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। আমিবা, Amœba proteus, Entamœba Coli, Entamœba histolytica

(চিত্র-২)—ইহারা এককোষ-প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটী একই শ্রেণীর হইলেও স্বতন্ত্র প্রাণী; এবং ইহাদের স্বভাব বিভিন্ন।

Amœba proteus স্বাধীনজীবী—জলে বাস করে। Entamœba coli আমাদের অন্ত্রে থাকে, পরপুষ্ট হইলেও অনিষ্টকারী নহে; কিন্তু Entamœba histolytica (চিত্র-২) আমাদের শরীরে থাকিয়া রক্তামাশয় আনয়ন করে। চিংড়ী জাতের প্রাণী সকলেই প্রায় স্ব স্ব আহার সংগ্রহ করে; কিন্তু ইহাদের কেহ কেহ পরের গলগ্রহ হইয়া বাস করে। Sacculina চিংড়ী জাতের প্রাণী; ইহাদের কাঁকড়ার উপর অত্যাচারের কথা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য (চিত্র—৩)। ইহারা যৌবনে কাঁকড়ার দেহে অবস্থান করে এবং ইহাদের আক্রমণের ফলে পুং-কাঁকড়া স্ত্রী আর স্ত্রী-কাঁকড়া ক্লীব হইয়া যায়। এইরূপ অন্য শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কতক পরাঙ্গভুক্; কিন্তু বেশীর ভাগই স্বাধীনজীবী। কৃমি শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে সকলেই পরাঙ্গভুক্ ও পরাশ্রিত।

চিত্র—৩

কাঁকড়ার সহিত সংযুক্ত—স্যাকিউলিনা (Sacculina)

কৃমি প্রায় সকল প্রাণি-দেহের মধ্যে পাওয়া যায় ও বড় অনিষ্টকারী। কৃমির প্রায় সমস্ত জীবনটা পরাশ্রয়ে থাকে এবং প্রাণীদেহের রক্ত ও রস শোষণ করিয়া জীবন কাটায়। কৃমি বিভিন্ন রকমের হয়। কাহার শরীর গোল; কাহারও ফিতার মত চ্যাপ্টা। কতকগুলি কৃমি শিশু-অবস্থায় নূতন আশ্রয় অনুসন্ধানের সময় ভিজা মাটীতে অল্পকালের জন্য অবস্থান করে; কেহ কেহ সমস্ত জীবনটা পরের শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া কাটাইয়া দেয়। আমি যে কৃমির কথা বলিব, উহারা স্বভাবে সাধারণ কৃমি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা যৌবন ও পূর্ণাবস্থায় স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে; নিজেদের আহার নিজেরাই আহরণ করে এবং কাহারও শরীরের

ভিতর প্রবেশ করিয়া পরাশ্রিতের মত থাকিতে হয় না। সাধারণতঃ এই কৃমি ডোবা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীতে পাওয়া যায়। অন্যান্য কৃমি-শিশুর মত ইহাদের শিশুগুলি কিছুকাল ভিজা মাটি বা জলাশয়ে অবস্থান করে; কিন্তু বাল্যকালে ইহারা কোন প্রাণীর রক্ত ও রস পান করে এবং এই সময়ে সাধারণতঃ ইহারা কৃমির মত পরাশ্রয়ী ও পরাঙ্গভুক্ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মধ্যজীবন ব্যতীত ইহারা অন্য কোন সময়ে পরাশ্রয়ী নহে। মধ্যজীবনে ইহারা যে কোন্ প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করে, তাহা এখনও সম্যক নির্দ্ধারিত হয় নাই। অধ্যাপক কেমরাণ্ মেন্টিস্ (Mantis) নামক ফড়িং-এর (চিত্র-৪) শরীরের ভিতরে এই জাতের একটী কৃমি পাইয়াছিলেন। সেইজন্য বাল্যাবস্থায় ইহারা যে কোন প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বাস করে ও যৌবনে জননকার্য্যের জন্য আশ্রিতের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া জলে আসে—ইহা সহজেই অনুমেয় এবং বৈজ্ঞানিকেরাও

চিত্র—৪
মেন্টিস্ (Mantis)

এই মত অনুমোদন করেন। এই কৃমি বারিপতনের সঙ্গে সিক্ত ভূমিতে আবির্ভূত হয়; আসামে ইহাকে 'শ্বেত সচাল' বলে ও বিষাক্ত বলিয়া কথিত। আমি ইহাকে 'বৃষ্টি-কৃমি' বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে এই কৃমি মনুষ্যের অনিষ্টকারী নহে। ইংরাজীতে এই কৃমিকে—Rain worm বলে। দেখিতে কেশের মত বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে—Horse-hair worm নামে অভিহিত করেন। ইহাদের শরীরের বেড় গোল বলিয়া ইহারা Nemathelminthes Phyllum-এর অন্তর্গত। মানুষের পেটে যে গোল বড় কৃমি পাওয়া যায় ও ছোট ছেলেদের পেটে যে সরু ছোট সুতা-কৃমি পাওয়া যায়—ইহারাও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। Nemathelminthes শ্রেণীর কৃমি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। বৃষ্টি-কৃমি Gordiidae জাতির অন্তর্গত। বৃষ্টি-কৃমির বৈজ্ঞানিক নাম—Gordius। বৃষ্টিকৃমি দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত; কেশের মত সরু ও গোল। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত হইলেও প্রস্থে ⅛ ইঞ্চির ন্যূন। পুরোভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ প্রস্থে প্রায় সমান। বর্ণ বিভিন্ন রকমের—শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ। আমি যে বৃষ্টিকৃমি হালিসহর

হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার বর্ণ শ্বেত ও পীতাভ; গলদেশে গোল কৃষ্ণবর্ণ রেখা আছে। দেহ মসৃণ ও গোল—সর্পের ন্যায় শল্ক-মণ্ডিত নহে; কেঁচোর ন্যায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুরীতে বিভক্তও নহে। পুং-কৃমির পশ্চাদ্দেশ কিঞ্চিৎ বক্র ও শেষভাগ দুই ভাগে বিভক্ত (চিত্র—৫ক এবং ৫খ); পুচ্ছদেশ এ'রূপ বিভক্ত হওয়ায় সাপের মুখের মত দেখায়। ইহাদের গমন-ভঙ্গিও সাপের মত; সুতরাং হঠাৎ দেখিলে ইহাদিকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। স্ত্রী-কৃমির পুচ্ছদেশ পুং-কৃমির ন্যায় বক্র বা বিভক্ত নহে। পুং-কৃমির পুচ্ছদেশ বক্র ও বিভক্ত থাকায় যৌনসম্মিলনে সুবিধা হয় (চিত্র-৬)। বৃষ্টিকৃমির পুরোভাগে (চিত্র-৭) মুখ-বিবর ও পুচ্ছদেশের শেষে গুহ্যাশয়-ছিদ্র বর্ত্তমান। ইহাদের পাকনালী আছে; কীটাণু ইহাদের খাদ্য। যৌবন বা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহারা জলে

চিত্র—৫ক

একটী পুং-বৃষ্টিকৃমি—লতায় জড়িত
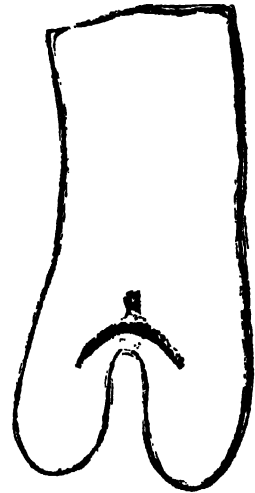
চিত্র—৫খ

বৃষ্টিকৃমির পশ্চাদ্ভাগ

বাস করে। জননের সুবিধা ও ডিম্বপ্রসব করিবার নিমিত্ত ইহারা জলে আসে। জলা-ডোবা ও ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলের ভিতর ঘাসে বা জলজ লতাগুল্মে জড়িত হইয়া থাকে (চিত্র-৮)। জলে নিমজ্জিত থাকে বলিয়াই ইহাদের সাধারণতঃ দেখা যায় না। অনেক সময় তিন চারিটা কৃমি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া 'তাল পাকাইয়া' থাকে। কখন কখন ইহারা সর্পের ন্যায় সন্তরণ করে। অধ্যাপক কেমরাণু ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত প্রায় ১৪।১৫ রকমের বৃষ্টি-কৃমির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বঙ্গদেশের বৃষ্টি-কৃমির কথা কেহ এ'পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। গত বৎসর বর্ষাকালে হালিসহর হইতে অনেক বৃষ্টিকৃমি আমি সংগ্রহ করি। সেই সময় উহাদের গতিবিধিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বৃষ্টির পর যখন মাঠ-পথ জলে ভাসিয়া যায়, তখন ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের কথা, বৃষ্টির পূর্ব্বে

ইহাদের কোথাও দেখা যায় না ; কিন্তু বারিপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এত সংখ্যায় কোথা হইতে আসে—বিস্মিত হইতে হয়। যেস্থানে ইহাদের পাইয়াছিলাম, তাহা পুষ্করিণীর অনেক উচ্চে এবং বর্ষায় পুষ্করিণীর জল প্লাবিত হইয়া সেস্থানে পৌছিতে পারে না। পুষ্করিণী বা ডোবা হইতে বৃষ্টি-

চিত্র—৬
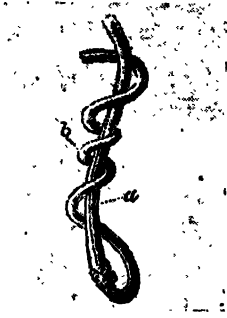
বৃষ্টি-কৃমির সঙ্গম;—a—স্ত্রী [illegible] মি ;
b—পুং-বৃষ্টিকৃমি

চিত্র—৭

বৃষ্টিকৃমির পুরোভাগ

কৃমির এত অল্প সময়ের মধ্যে এ'স্থানে আসা অসম্ভব। মাটি খুঁড়িয়া দেখিয়াছি, ইহারা মাটির ভিতর থাকে না; শুষ্ক স্থানেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং বারিপতনের

চিত্র—৮

বৃষ্টিকৃমি—নিমজ্জিত লতায় জড়িত রহিয়াছে ও
প্রসূত ডিম্বশ্রেণী লতার নিম্নে রক্ষিত ;
a—ডিম্বশ্রেণী

সঙ্গেই ইহারা পতঙ্গ বা অন্য কোন প্রাণীর শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে—এইরূপ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। বর্ষার জলধারার সহিত পুষ্করিণীতে বা জলাশয়ে পৌঁছিবার আশায় বোধ হয় ইহারা এই সময়ে আশ্রিত দেহ ত্যাগ করে। যাহা হউক, আমি এই সময়ে একটী বৃষ্টিকৃমিকে সন্তরণ দিয়া একটী ডোবার মধ্যে যাইতে দেখিয়াছি ; এবং অন্যগুলিকে সিক্ত ভূমিতে জলের সময় কেঁচোর মত অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। বৃষ্টির জলে যখন মেঠো পথ ভাসিয়া যায়, এই কৃমি তখন তাহার দেহের অগ্রভাগ মাটি হইতে বাহির করিয়া জলের স্রোতের দিকে সঞ্চালন করিতে থাকে ; পশ্চাৎভাগ মাটীর ভিতর থাকে। কতক বা ঘাসের সহিত 'তাল পাকাইয়া' থাকে ; সেইজন্য ইহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন হয়। জল শুকাইয়া গেলে মেঠো রাস্তার উপরে মৃত কৃমি এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক ভূমিতে ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।
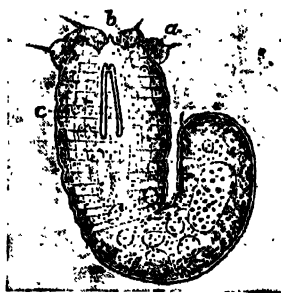
চিত্র—৯
বৃষ্টিকৃমি-শিশুর অগ্রভাগে আংটীর
মত দাগ দেখান হইয়াছে

রাস্তার উপর মৃত কৃমিকে বৃক্ষের বা লতার উৎপাটিত সূক্ষ্ম মূল বলিয়া ভ্রম হয় ;—দূর হইতে চেনা যায় না। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষভাবে জানিবার জন্য অনূন ১৪।১৫ টা বৃষ্টিকৃমি পুকুরের জলের সহিত আনিয়া ল্যাবরেটারীতে একটী বড় কাঁচ পাত্রে রাখিয়াছিলাম। পাত্রে পুষ্করিণীর জল এবং কিছু লতাপাতাও রাখিয়াছিলাম। জল একদিন অন্তর বদলাইয়া দিতাম। বৃষ্টি-কৃমি ল্যাবরেটারীতে প্রায় দুই মাস কাল জীবিত ছিল। নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে বৃষ্টির জলে রাখিতাম ; বৃষ্টির ছাট লাগিলে বেশ সজীব হইয়া উঠিত। প্রায় এক মাস পরে পাত্রের মধ্যে থাকিয়া ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল। অনেকগুলি ডিম্ব এক সঙ্গে প্রসূত হয়। ডিম্বগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও থুতুর মত পদার্থ দ্বারা আবৃত ; দেখিতে টুক্‌রা টুক্‌রা সূতার ন্যায়। ঐরূপ একটী টুক্‌রার ভিতর অনেক ডিম্ব থাকে।

ডিম্ব অতিশয় ক্ষুদ্রাকার, গোলাকৃতি, কঠিন আবরণ-যুক্ত ও শ্বেতবর্ণ। ডিম্বপ্রসব হওয়ার পর ঘাসে সংলগ্ন থাকিত; কিংবা জলের তলে পড়িয়া থাকিত।

ডিম্ব প্রসূত হইবার প্রায় একমাস পরে কৃমি-শিশু ডিম্বের আবরণ ছিদ্র করিয়া বহির্গত হইয়া পাত্রের নিম্নে থাকিত; জলের ভিতর চলাফেরা করিত। পুং কিংবা স্ত্রী-কৃমি ডিম্ব বা শিশুর কোন তত্ত্বাবধান বা যত্ন লইত না। ডিম্বপ্রসবের প্রায় এক মাসের মধ্যে পুং ও স্ত্রী মারা যায়। বোধ হয় বংশরক্ষার পর বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করে না। শিশুগুলিকেও একমাস জীবিত থাকার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল; তাহারা

চিত্র—১০

:খর

ভিতর গুটান রহিয়াছে।

অতিশয় ক্ষুদ্র—অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। শিশু-দেহ দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ ও অগ্রভাগে শরীরের উপরে অনেক আংটীর মত দাগ থাকে (চিত্র—৯)। একটী করিয়া শুঁড় (proboscis) আছে। শুঁড়টী ইচ্ছামত শরীরের ভিতর টানিয়া লইতে কিংবা বাহির করিতে পারে (চিত্র—১০)। শুঁড়ের পাদদেশে অনেকগুলি কাঁটা আছে, কিন্তু শরীরের পশ্চাতে আছে একটী কাঁটা। শুঁড় ও কাঁটার সাহায্যে ইহারা কোন প্রাণীর দেহ ছিদ্র করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে পৌছিতে পারে; শুঁড়ের দ্বারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। শিশুটীকে দেখিতে অনেকটা একান্থোসিফালা (Acanthocephala) (চিত্র

—১১) নামক কৃমির মত। একান্‌থোসিফালা কৃমি মৎস্য, সর্প ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরের ভিতর পাওয়া যায়। এই কৃমিরও শুঁড় আছে এবং শুঁড়টী বৃষ্টি-কৃমির মত ইচ্ছানুযায়ী দেহের ভিতর টানিয়া লইতে ও দেহ হইতে বাহির করিতে পারে। ইহার শুঁড়ের চতুর্দ্দিকে কাঁটা থাকে। কিন্তু বৃষ্টিকৃমি-শিশুর শুঁড়ের অগ্রভাগে তিনটা সূক্ষ্ম কাঁটা ও শুঁড়ের পাদদেশে অনেক কাঁটা থাকে; শুঁড়কে আবেষ্টন করিয়া কোন কাঁটা থাকে না।

বৃষ্টিকৃমি-শিশুর পাকনালী নাই; অনুমান হয়—ইহারা শিশু অবস্থায় কিছু আহার করে না। আমার সংগৃহীত শিশুগুলি জলে প্রায় এক মাস কাল জীবিত ছিল; কিন্তু তাহাদের আর বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারি নাই। অনুমান হয়—কৃমি-শিশু কোন প্রাণীর শরীর ভিতরে যাইতে পারিলে উপযুক্ত আহার পাইত ও বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইত। কোন প্রাণীর শরীরের ভিতর ইহারা বাল্যাবস্থা কাটায় কি না জানিবার জন্য আমি শামুক, গুগ্‌লি, মাছ, ব্যাঙাচী, মশকশিশু প্রভৃতি ইহাদের সহিত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কৃমি-শিশু যদি
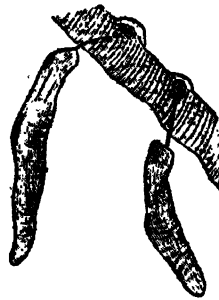
চিত্র—১১

একান্‌থোসিফালা(Acanthocephala)

কোন পতঙ্গের শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইত। অনেকে এই কৃমিশিশুকে পতঙ্গের দেহে থাকিতেও দেখিয়াছেন। সুতরাং বাল্যাবস্থায় ইহারা কোন পতঙ্গের শরীরের ভিতর অবস্থান করিয়া তাহাদের রসপানে জীবনধারণ করে ও যৌবন-কালে উক্ত পতঙ্গের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া জলে আসিয়া বংশরক্ষা করে। দেখা যাইতেছে যে, এই কৃমির শৈশবাবস্থার সহিত পূর্ণাবস্থার বা যৌবনাবস্থার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। কৃমি-শিশুর দেহ ভিন্ন ভাবে গঠিত; কিরূপে এই কৃমি-শিশুর দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার অনুসন্ধানে এখনও প্রবৃত্ত আছি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টি-কৃমি শৈশব ও যৌবন অবস্থায় স্বাধীন ভাবে জলে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে; কিন্তু মধ্য-জীবনে অন্যের রক্তে শরীর পোষণ করে।

বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমসাময়িকতার আপেক্ষিকতা

কালের আপেক্ষিকতা প্রতিপাদনের জন্য আইন্‌ষ্টাইনের অনুসরণ করিয়া আমরা নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করিব।

ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া রাম দেখিতেছে যে, শ্যামের ট্রেনখানা ঠিক প্ল্যাট্‌ফরমের পাশ কাটিয়া সমবেগে—'ব' পরিমিত বেগে—উত্তরের দিকে (অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে) ছুটিয়া চলিয়াছে। ট্রেনের বেগ সম্বন্ধে রাম যে পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে, উহা তাহার পরিমাপের ফল—উহার মধ্যে আন্দাজি কোন কথা নাই। এ'রূপ অবস্থায় শ্যাম দেখিবে যে, প্ল্যাট্‌ফরমটাই দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং পরিমাপের ফলে উহার বেগ সম্বন্ধে শ্যামও 'ব' সংখ্যাই নির্দ্দেশ করিবে।
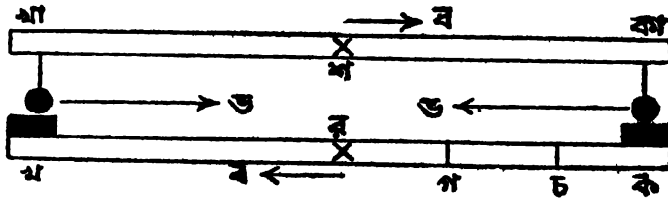
২নং চিত্র

মনে করা যা'ক, (২ নং চিত্র) ট্রেনের ঠিক মাঝখানটায় * দাঁড়াইয়া শ্যাম ('শ') দেখিতে পাইল যে, প্ল্যাট্‌ফরমের উত্তর প্রান্তে বা 'ক' স্থানে অবস্থিত একটা দেশলাই-এর বাক্সের সহিত ট্রেনের উত্তর প্রান্ত বা 'কা' স্থানে অবস্থিত একটা দেশলাই-এর কাঠির ঘর্ষণের ফলে, উভয়ের সংযোগ স্থলে, একটা লাল আলো এবং প্ল্যাট্‌ফরমের ও ট্রেনের দক্ষিণ প্রান্তেও (খ ও খা প্রান্তে) ঠিক ঐরূপ একটা ব্যাপার ঘটিয়া ঐ স্থলে একটা নীল আলো জ্বলিয়া উঠিল। আরও অনুমান করা যা'ক, এই দুইটা ব্যাপার শ্যাম একসঙ্গেই দেখিতে পাইল অর্থাৎ শ্যামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক হইয়া দাঁড়াইল।

---

* এখানে অনুমান করা যাইতেছে—শ্যাম যদি ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে একটা বিশিষ্ট অনুপাতে ভাগ করিয়া লয়, তবে রামও বলিবে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা ঐ অনুপাতেই বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রষ্টা তাহার নিজের জগতের দৈর্ঘ্য মাপিয়া উহার মধ্য-স্থলটা চিহ্নিত করিয়া লইলে অপর দ্রষ্টার পরিমাপেও ঐ চিহ্নটাই উহার মধ্য-স্থল বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

এখন ট্রেনের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াইয়া শ্যাম ঘটনা দু'টাকে সমসাময়িকরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সুতরাং শ্যামের বাস্তব জগতেও উহাদিগকে সমসাময়িকই হইতে হইবে। কারণ,—পূর্ব্ব কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতে পারা যায়—রামের দৃষ্টিতে ট্রেনখানা বেগসম্পন্ন হইলেও '১ নং স্বীকার্য্য' অনুসারে ('প্রকৃতি' গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৩৫—৬৩-৬৪ পৃঃ) শ্যামের দৃষ্টিতে ট্রেনের বেগের কোন অর্থ নাই; সুতরাং '২ নং স্বীকার্য্য' অনুসারে শ্যাম বলিবে যে,উভয় স্থানের (তাহার জগতের 'কা' ও 'খা' চিহ্নিত স্থলের) আলোক রশ্মিই সমান সমান বেগে—'ভ' বেগে—তাহার কাছাকাছি হইয়াছে; এবং ট্রেনের দৈর্ঘ্য যদি শ্যামের মাপে (অর্থাৎ ট্রেনে অবস্থান কালে শ্যামের ফুটরুলের মাপে) 'ট' পরিমিত হয়, তবে শ্যামের হিসাবে দাঁড়াইবে যে, উভয় আলোই জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের $\frac{\frac{1}{2}ট}{ভ}$ সেকেণ্ড পূর্ব্বে। এইরূপে শ্যাম ঐ ঘটনা দু'টার বাস্তব কাল নিরূপণ করিবে এবং এইরূপে শ্যামের বাস্তব জগতেও উহারা সমসাময়িক হইয়াই দাঁড়াইবে।

কিন্তু '১ নং স্বীকার্য্য' অস্বীকার করিলেই অর্থাৎ শ্যাম নিজেকে বেগসম্পন্ন মনে করিলেই একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবে; তাহা হইলে '২ নং স্বীকার্য্যও' মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে;—অর্থাৎ শ্যামের আর অনুমান করা চলিবে না যে, উভয় আলোক রশ্মিই সমান বেগে তাহার কাছাকাছি হইতে পারিয়াছে। সুতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক হইলেও এবং উহারা সমান সমান দূরের ঘটনা হইলেও, শ্যামের বাস্তব জগতে উহারা অসমসাময়িক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু "ট্রেনের বেগের অর্থ নাই" শ্যামের হিসাব-প্রণালী তাহার এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেই স্বভাবানুমোদিত হইবে; এবং এইরূপ হিসাবেই শ্যাম তাহার প্রত্যক্ষ কালের বর্ণনার সহিত বাস্তব কালের বর্ণনার বরাবর মিল দেখিতে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

তা'রপর শ্যামের মতে রামের দৃষ্টিতে ঘটনা দু'টা কিরূপ হওয়া উচিত—দেখা যা'ক। মনে করা যা'ক, রামও তাহার প্ল্যাট্‌ফরমের ঠিক মাঝখানটায় ('র' চিহ্নিত স্থানে) দাঁড়াইয়া ঘটনা দু'টা প্রত্যক্ষ করিতেছে। এ'রূপ ক্ষেত্রে শ্যাম হিসাব করিবে যে, "যেহেতু আমার জগতে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক এবং আমার বাস্তব জগতে যখন উহারা ঘটিয়াছে, তখন (অর্থাৎ আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের $\frac{\frac{1}{2}ট}{ভ}$ সেকেণ্ড পূর্ব্বে) প্ল্যাট্‌ফরমের উভয় প্রান্ত ট্রেনের উভয় প্রান্তের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্ল্যাট্‌ফরমের ঠিক মাঝখানটায় অবস্থিত রামও ঠিক তখনই আমার মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, প্ল্যাট্‌ফরমের খানখানটা রামকে লইয়া 'ব' বেগে দক্ষিণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং '১ নং স্বীকার্য্য' অনুসারেএই প্রত্যক্ষটাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আমার জগতে যাহাই হউক, বেগসম্পন্ন রামের জগতে দক্ষিণ দিককার নীল রশ্মিগুলিই রামের কাছাকাছি হইতেছে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি (ভ+ব বেগে); এবং উত্তরের দিককার লাল রশ্মিগুলি উহার

কাছাকাছি হইতে পারিতেছে অপেক্ষাকৃত ধীরে (ভ-ব বেগে)। ফলে, রামের জগতের 'খর' দূরত্বটা ঘুচাইয়া দিয়া রামের চক্ষুতে পৌঁছিতে নীল রশ্মিগুলির যতটা সময়ের আবশ্যক হইতেছে, লাল রশ্মিগুলির পক্ষে, ঐ দূরত্বের সমান পরিমাণের 'কর' দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়া রামের চক্ষুতে পৌঁছিতে সময় লাগিতেছে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণের। সুতরাং আমার প্রত্যক্ষে (এবং বাস্তব জগতে) ঘটনা দু'টা সমসাময়িক হইলেও রামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠাটাই একটু আগেকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" এইরূপ সিদ্ধান্তেই শ্যাম নিজের জগৎটাকে স্থির এবং রামের জগৎটাকে বেগসম্পন্নরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং সমসাময়িকতা সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াও রামের প্রত্যক্ষের সহিত নিজের প্রত্যক্ষের বাস্তবিক মিল রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

এখন রামের মতে, তাহার প্রত্যক্ষ দু'টা কিরূপ হওয়া উচিত—দেখা যা'ক। বলা বাহুল্য, রাম নীল আলোটাকেই একটু আগে দেখিল কি না, সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে পারিবে না। কেন না, আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ; সুতরাং প্ল্যাট্‌ফরম্ ও ট্রেনখানা যদি অতিরিক্ত মাত্রায়—১০।২০ লক্ষ বা ১০।২০ কোটি মাইল—দীর্ঘ না হয়, তবে এ'ক্ষেত্রে রামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দু'টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত সামান্য হইবে যে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া রাম কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিবে না। কিন্তু ঐ সময়ের ব্যবধানটা ছোট, না বড়—সে'টা একটা বড় কথা নহে। আসল কথা হইতেছে—ঐরূপ একটা ব্যবধান আছে কি নাই? পুরাতন যুগের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু শ্যামের বাস্তব জগতে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক অতএব রামের বাস্তব জগতেও উহাদিগকে সমসাময়িকই হইতে হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। আইন্‌ষ্টাইনের মত এই যে, রামের দৃষ্টি সম্বন্ধে শ্যাম যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে, বাস্তবিক রাম সেইরূপই দেখিয়া থাকে;—রামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠাই একটু আগেকার ঘটনারূপে উপস্থিত হইয়াছে এবং যেহেতু রাম তাহার জগতের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াইয়া ব্যাপারটাকে ঐরূপ দেখিতে পাইয়াছে, রামের বাস্তব জগতেও নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠাটাই ঐ পরিমাণের আগেকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, রামকেও নিজের জগৎটাকে স্থির এবং শ্যামের জগৎটাকে বেগসম্পন্ন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে শ্যামের সমসাময়িক প্রত্যক্ষ দু'টাকে সমসাময়িক ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ইহা সম্ভব হয়, যদি রামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে (সুতরাং রামের বাস্তব জগতেও) নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠাটাই একটু আগেকার ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, রাম দেখিতেছে শ্যামের ট্রেনখানা 'ব' বেগে উত্তরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। '১ নং স্বীকার্য্য' অনুসারে রাম ইহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাম বলিবে যে, দক্ষিণ দিককার নীল রশ্মিগুলিই অপেক্ষাকৃত ধীরে (ভ-ব বেগে) এবং উত্তরের দিককার লাল রশ্মিগুলি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি (ভ+ব বেগে) শ্যামের

কাছাকাছি হইতে পারিতেছে। অর্থাৎ রাম সিদ্ধান্ত করিবে যে, শ্যামের চক্ষুতে পৌঁছিতে গিয়া (অথবা শ্যামের জগতের 'খাশ' দূরত্বটা ঘুচাইয়া দিতে গিয়া) নীল রশ্মিগুলি পথে সময় কাটাইতেছে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং লাল রশ্মিগুলি ঐ ব্যাপারে (অর্থাৎ সমান পরিমাণের 'কাশ' দূরত্বটা ঘুচাইতে গিয়া) সময় কাটাইতেছে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণের। সুতরাং, বাস্তবিক রাম যদি নীল আলোটাকেই একটু আগে জ্বলিয়া উঠিতে দেখে, তবেই রাম বলিতে পারিবে যে, তাহার বাস্তব জগতেও ঐ ব্যাপারটাই ঐ পরিমাণের আগেকার ঘটনা এবং আগেকার ঘটনা বলিয়াই নীল রশ্মিগুলি পথে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় কাটাইয়াও লাল রশ্মিগুলির সহিত একযোগে শ্যামের চক্ষুতে আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সমসাময়িকতার ধারণা আপেক্ষিক—শ্যামের বাস্তব জগতে যে দুই ঘটনা সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, রামের বাস্তব জগতে তাহারা আগে-পরের ঘটনারূপে উপস্থিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ শ্যামকে রাম যে-দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখে, ঐ দিককার ঘটনাটা রামের নিকটে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের—'ষ' সেকেণ্ড পরিমিত—পরের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়; এবং এই 'ষ' এর মূল্য নির্ভর করে রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ ('ব') এবং আলোকের বেগের ('ভ' এর) উপর।

উপরের কথাগুলি সংক্ষেপে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করিয়া যাহার যাহার জগৎ হইতে রাম-শ্যাম পরস্পরের সহিত কারবার করিতে চাহে। এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেকেই নিজেকে স্থির এবং অপরকে বেগসম্পন্ন রূপে গ্রহণ করিবে; এবং প্রত্যেকেই অপরের সমসাময়িক প্রত্যক্ষগুলিকে সমসাময়িক ঘটনারূপে মানিয়া লইবে ('প্রকৃতি' গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৩৫—৭২পৃঃ)। এই সিদ্ধান্তের অনুরোধেই বাস্তব সমসামকিকতার ধারণা আপেক্ষিক হইয়া দাঁড়ায়—শ্যামের জগতে যে দুইটা দূরের ঘটনা সমসাময়িক ভাবে উপস্থিত হয়, রামের জগতে তাহা কেবল দূরের ঘটনা রূপে নহে, আগে পরের ঘটনারূপেও প্রতীয়মান হইয়া হইয়া থাকে; এবং এইরূপ না হইলে প্রত্যেক দ্রষ্টার পক্ষে, তাহার প্রত্যক্ষ কালের সহিত বাস্তব কালের মিলটা বজায় রাখিয়া বাহ্য ঘটনা সম্পর্কে নিজের বর্ণনার সহিত অপরের বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হইত না; অর্থাৎ ঘটনা একটা, না দু'টা—সে সম্বন্ধে রাম-শ্যাম একমত হইতে পারিত না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ('প্রকৃতি' গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৩৫—৬৭ পৃঃ) অথবা রামের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দু'টার কথা বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান উদাহরণেও দেখা যাইতে পারে যে, (১) যে দুইটা ঘটনার মধ্যে একজন দ্রষ্টা কেবল কালের ব্যবধান দেখিতে পায়, আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা তাহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধানও সৃষ্টি করিয়া লয়। বর্ত্তমানে আমরা পাব যে, (২) যে দুই ঘটনার মধ্যে একজন দ্রষ্টা (শ্যাম) কেবল দেশের ব্যবধান অনুসারে অপর জগতের দ্রষ্টা (রাম) তাহাদিগকে তাহার দেশে এবং কালে উভয়ত্রই হউক, বো দেখিয়া থাকে। ফলে দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেক দ্রষ্টার কালবুদ্ধি অথবা দেশ-অপেক্ষাকৃ

বুদ্ধির সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ এবং কাল উভয় বুদ্ধিই এমন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, যাহার ফলে একজন দ্রষ্টা যে দুই ঘটনাকে কেবল তাহার কালপ্রবাহে অথবা দেশের কোঠায় বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহে এবং এইরূপে ঘটনা দু'টাকে দুই ঘটনারূপে অনুভব করিতে চাহে; অপর দ্রষ্টা তাহাদিগকে কতকটা তাহার দেশের মধ্যে এবং কতকটা তাহার কালপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দুই ঘটনারূপে অনুভব করিয়া থাকে। আমরা আরও দেখিয়াছি (অথবা শ্যামের মাপে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা শুদ্ধ পরিমিত হইলে, বর্তমান ক্ষেত্রেও দেখা যাইতে পারে) যে,—(৩) যে দুই ঘটনাকে একজন দ্রষ্টা সমসাময়িকরূপে এবং একই স্থলের—অর্থাৎ মোটের উপরে 'একটা' ঘটনা রূপে বর্ণনা করিতে চাহে—অপর দ্রষ্টাও তাহাদিগকে তাহার দেশের কোঠার এবং কালপ্রবাহের একই স্থলে সাজাইয়া লইয়া একটা ঘটনা রূপেই বর্ণনা করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল যে, যদিও বাস্তব দেশ ও বাস্তব কালের সৃষ্টি করিয়া লইয়াই প্রত্যেক দ্রষ্টা বাহ্য ঘটনাসমূহকে এক দুই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া থাকে এবং যদিও এই বিশ্লেষণ ব্যাপারে, ঘটনায় ঘটনায় কালের ব্যবধান (বা দেশের ব্যবধান) দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তথাপি তাহার ফলে ঘটনার সংখ্যা-সম্বন্ধে (অথবা যে কোনও খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের বর্ণনায়) দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ উপস্থিত হয় না। আইন্‌ষ্টাইনের সমসাময়িকতার সংজ্ঞাটা পুরাতন যুগের সমসাময়িকতার ধারণা হইতে ভিন্ন হইয়াও এই মূল সত্যটাকে ভিত্তিরূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা

এখন সমসাময়িকতার ধারণা যদি রাম-শ্যামের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইতে হয়, তবে পদার্থের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উহাদের ধারণাও (পরিমাপের ফলও) ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা সহজেই দেখা যাইতে পারে।

ট্রেনের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াইয়া শ্যাম ঐ আলো দু'টাকে একই সময়ে জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে। সুতরাং শ্যামের মতে নীল কাঠির সহিত নীল বাক্সের ঘর্ষণটা যখনকার ঘটনা, লাল কাঠির সহিত লাল বাক্সের ঘর্ষণটাও তখনকারই ঘটনা। অর্থাৎ শ্যাম বলিবে যে, ট্রেনের উভয় প্রান্তের সহিত প্ল্যাটফরমের উভয় প্রান্তের মিলন ('ক কা' ও 'খ খা' মিল দু'টা) একই সময়ে ঘটিয়াছে; সুতরাং প্ল্যাটফরমটা ট্রেনের সমান।

অন্য পক্ষে, প্ল্যাটফরমের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াইয়া রাম নীল আলোটাকেই একটু আগে জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে। সুতরাং রাম বলিবে, নীল বাক্সের সহিত নীল কাঠির ঘর্ষণটাই একটু আগেকার ঘটনা; এবং যখন ইহা ঘটিয়াছে, তখন পর্যন্ত লাল কাঠিটা লাল বাক্সের কাছে (বা প্ল্যাটফরমের 'ক' প্রান্তে) উপস্থিত হইতে পারে নাই—উহা তখন পৌঁছিতে পারিয়াছে তাহার জগতের 'গ' স্থান পর্যন্ত, অর্থাৎ 'খ' ও 'ক'-এর মাঝখানকার একটা জায়গায় (২নং চিত্র)। ফলে, রামের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দাঁড়াইবে এই যে, একই সময়ে

ট্রেনের দুই প্রান্তের মিলন ঘটিতেছে তাহার জগতের 'খ' ও 'গ' স্থানের সঙ্গে; অর্থাৎ রাম বলিবে যে, ট্রেনের দৈর্ঘ্য 'খ গ' পরিমিত। সুতরাং দেখা গেল যে, শ্যামের সমসাময়িকতার ধারণা অনুসারে ট্রেনটা যদি প্ল্যাট্‌ফরমের সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে রামের সমসাময়িকতার ধারণা অনুসারে ট্রেনটা প্ল্যাট্‌ফরমের তুলনায় ছোট ($\frac{\text{খগ}}{\text{খক}}$ অনুপাতে ছোট) বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ট্রেন ও প্ল্যাট্‌ফরমের আপেক্ষিক বেগের ফলেই রাম-শ্যামের এই মতের পার্থক্য। সুতরাং ঐ আপেক্ষিক বেগটা যদি কমিতে থাকে, তবে এই মতের পার্থক্যটাও ক্রমে কমিয়া আসিবে; অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে শ্যাম প্ল্যাট্‌ফরমের তুলনায় ক্রমে ছোট করিয়া লইয়া এবং রাম উহাকে 'খ গ' দূরত্বের তুলনায় ক্রমে বড় করিয়া লইয়া (২ নং চিত্র) পরস্পরে একমত হইতে চেষ্টা করিবে; এবং শেষকালে উহারা যখন পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, তখন উহাদের মতের পার্থক্যটা সম্পূর্ণরূপেই দূর হইয়া যাইবে। তখন উভয়েই বলিবে, ট্রেনের দৈর্ঘ্য 'খ চ' দূরত্বের সমান—যাহা, 'খগ' দূরত্বের তুলনায় একটা বিশিষ্ট অনুপাতে বড় এবং প্ল্যাট্‌ফরমের তুলনায় (বা 'খক' দূরত্বের তুলনায়) ঐ অনুপাতেই ছোট। এই $\frac{\text{খচ}}{\text{খগ}}$ বা $\frac{\text{খক}}{\text{খচ}}$ অনুপাতটাকে আমরা 'ঐ' সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিব। দেখা যাইতেছে, 'ঐ' ১ অপেক্ষা বড় হইবে; এবং ইহার মূল্য রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করিবে। এখন শ্যাম যদি ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে তাহার জগতের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে 'এক মাইল' রূপে বর্ণনা করে, তবে রামের পক্ষে 'খ চ' দূরত্বটাকে তাহার জগতের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকেই 'এক মাইল' বলা স্বাভাবিক হইবে। এইরূপে বেগহীন অবস্থায় শ্যামের জগতের কোন্ দূরত্বটা রামের জগতের কোন্ দূরত্বের সমান, ইহা দেখিয়া রাম-শ্যাম তাহাদের দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি মিল করিয়া লইবে; এবং এই অর্থেই একই কারখানায় প্রস্তুত ভিন্ন ভিন্ন ফুটরুলকে পরস্পরের সমান বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি।

এখন বেগের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে দেখা যাইবে যে, এই অবস্থাতেও প্রত্যেক দ্রষ্টাই তাহার মাপকাঠিকে 'এক মাইল' রূপেই গ্রহণ করিবে। সুতরাং বেগের অবস্থায় শ্যাম বলিবে যে, রামের 'খ চ' মাইলটা আমার প্ল্যাট্‌ফরম্-পরিমিত ট্রেনরূপ-মাইলের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র; এবং রাম বলিবে যে, শ্যামের 'খ গ' পরিমিত-ট্রেনরূপ-মাইলটা আমার 'খ চ' মাইলের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বেগহীন অবস্থায় রাম-শ্যাম যদি দেখিতে পায় যে, একজনের মাইল অপরের মাইলের সমান, তবে বেগের অবস্থায় প্রত্যেকে দেখিবে যে, অপরের মাইল তাহার মাইলের 'ঐ' ভাগের ভাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে, আপেক্ষিক বেগের ফলে, সমসাময়িকতার ধারণাটা বদলাইয়া গিয়া দৈর্ঘ্যের মাপকাঠির সমতা সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ ঘটিবে।

প্রত্যেকের জগতের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও রাম-শ্যাম ঠিক উক্ত মতই প্রকাশ করিবে। শ্যাম

বলিবে—সকল অবস্থাতেই ট্রেনের দৈর্ঘ্য এক মাইল পরিমিত ; রাম বলিবে—বেগহীন অবস্থায় উহা এক মাইল (অর্থাৎ 'খ চ' পরিমিত) হইলেও বেগের অবস্থায় উহা 'খ গ'-এর সমান —আমার মাইলের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র। অন্য পক্ষে, প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্যটাকে রাম বরাবর $\frac{খক}{খচ}$ বা 'ঐ' মাইল রূপেই নির্দ্দেশ করিবে ; কিন্তু শ্যাম বলিবে যে, বেগহীন অবস্থায় উহা 'ঐ' মাইল হইলেও বেগের অবস্থায় প্ল্যাট্‌ফরমটা ট্রেনের সমান বা এক মাইল মাত্র ; অর্থাৎ রাম ঐ দৈর্ঘ্যটাকে যে সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, যদি ট্রেনে অবস্থান কালে শ্যাম তাহার ফুটরুলের মাপে দেখিতে পায় যে, ট্রেনের দৈর্ঘ্য 'ট' পরিমিত এবং প্লাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া রাম তাহার ফুটরুলের মাপে দেখিতে পায় যে, প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য 'প' পরিমিত ; তবে ঐ দুইটা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে; বেগহীন অবস্থায় উভয়েই উক্ত মত প্রকাশ করিলেও বেগের অবস্থায় রামের মাপে ট্রেনের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইবে $\frac{ট}{ঐ}$ পরিমিত এবং শ্যামের মাপে প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য দাঁড়াইবে $\frac{প}{ঐ}$ পরিমিত।

অতএব দেখা গেল যে, আপেক্ষিক বেগের ফলে, এক জগতে অবস্থিত কোনও পদার্থের দৈর্ঘ্য—অপর জগতের মাপে, ঐ বেগের দিক বরাবর—'ঐ' গুণ ছোট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে দৈর্ঘ্যটা—যেমন ট্রেন বা প্ল্যাট্‌ফরমের প্রস্থ বা উচ্চতা—ঐ বেগের আড়ভাবে অবস্থিত, তাহার উপরে আপেক্ষিক বেগের কোনরূপ প্রভাব স্বীকার করা যায় না ; সুতরাং ঐ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উভয় দ্রষ্টার পরিমাপের ফল মিলিয়া যাইবে। আরও দেখা গেল যে, বেগের দিক বরাবর অবস্থিত এক জগতের মাপকাঠি, অপর জগতের মাপে, 'ঐ' গুণ ছোট হইয়া দাঁড়ায়। কোন ফুটরুলেরই বাস্তবিক কোনরূপ সঙ্কোচন ঘটে না—যাহার যাহার জগৎ হইতে দেখিলে উহার দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না ; কিন্তু আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন ভিন্ন জগৎ হইতে মাপিলেই উহাকে 'ঐ' গুণ ছোট দেখা যাইবে ; এবং ঐ বেগটা শূন্য পরিমিত হইলে উভয়ের মাপেই উভয় ফুটরুল সমান হইয়া দাঁড়াইবে।

ইহাও দেখা যাইতে পারে যে, (২নং চিত্র) রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ (ব) যদি আলোকের বেগের (ভ-এর) সমান হইয়া দাঁড়ায়, তবে রাম হিসাব করিবে যে নীল রশ্মিগুলি (ভ-ভ)=০ পরিমিত বেগে শ্যামের কাছাকাছি হইতেছে ; অর্থাৎ উহারা যেন শ্যামের নিকটে পৌঁছিয়া উঠিতেই পারিতেছে না ; কিন্তু লাল রশ্মিগুলি অক্লেশেই শ্যামের চক্ষুতে আঘাত করিতে সমর্থ হইতেছে। কারণ উহারা (ভ+ভ)=২ভ বেগে (অর্থাৎ একটা সসীম বেগে) শ্যামের কাছাকাছি হইতেছে ; অথচ সমান সমান 'খাশ' ও 'কাশ' পরিমিত) রাস্তা ভাঙ্গিয়াই উভয় রশ্মি একই সময়ে শ্যামের চক্ষুতে আঘাত করিতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে রাম সিদ্ধান্ত করিবে যে, ঐ রাস্তা দু'টার প্রত্যেকেরই দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ মোটের উপর ট্রেনের দৈর্ঘ্য শূন্য পরিমিত ; কিন্তু শ্যামের মাপে ট্রেনটা মাইল পরিমিত ছিল, মাইল পরিমিতই থাকিবে।

ঐ আপেক্ষিক বেগটা যদি আলোকের বেগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত, তবে রামের

পক্ষে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটাকে একটা বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইত অর্থাৎ রামের কাছে উহা একটা 'ফাজিল রাশি' হইয়া দাঁড়াইত। একটা জড়দ্রব্যের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ কোন দ্রষ্টার কাছেই ফাজিল সংখ্যা হইয়া দাঁড়াইতে পারে—এ'রূপ কল্পনা করা যায় না; সুতরাং সাব্যস্ত করিতে হইবে, ট্রেন ও প্ল্যাটফরমের আপেক্ষিক বেগটা (অর্থাৎ জড়ের সম্পর্কে জড়ের বেগ) বড় জোর আলোকের বেগের সমান হইতে পারে, কিন্তু উহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

'ঐ'-এর মূল্য

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, (২ নং চিত্র) $\frac{খচ}{খগ}$ বা $\frac{খক}{খচ}$ অনুপাতটা দ্বারাই দুই জগতের দেশ ও কালের মাপকাঠির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই অনুপাতটাকে আমরা 'ঐ' সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সুতরাং 'ঐ' -এর মূল্য কত,—অর্থাৎ ঐ দুই জগতের আপেক্ষিক বেগ এবং আলোকের বেগের সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ—তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। পূর্ব্বের উদাহরণের সাহায্যেই ইহা সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে।

প্রথমে ঐ ঘটনা দু'টার মধ্যে (আলো দু'টা জ্বলিয়া ওঠার মধ্যে) রামের মতে বাস্তব কালের ব্যবধান কত, নির্ণয় করা যা'ক। শ্যাম ঐ সময়ের ব্যবধান নির্দ্দেশ করিয়াছে শূন্য পরিমিত; কিন্তু রামের মতে উহা দাঁড়াইয়াছে ভিন্ন পরিমাণের, যাহাকে রাম 'য' দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছে—ঐ পরিমিত।

'য'-এর মূল্য এইরূপে নিরূপণ করিতে পারা যায়। ট্রেনের দৈর্ঘ্য শ্যামের ফুটরুলের মাপে দাঁড়াইয়াছে, ধরা যাউক 'ট' পরিমিত। ফলে রামের মাপে উহা দাঁড়াইবে $\frac{ট}{ঐ}$ পরিমিত; এবং ট্রেনের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে শ্যামের দূরত্ব রামের মাপে দাঁড়াইবে $\frac{\frac{1}{2}ট}{ঐ}$ পরিমিত। রাম আরও দেখিয়াছে যে, উক্ত নীল ও লাল রশ্মি শ্যামের কাছাকাছি হইয়াছে যথাক্রমে (ভ-ব) ও (ভ+ব) বেগে। সুতরাং রামের মতে, শ্যামের চক্ষুতে আঘাত করিতে যাইয়া

$$\text{নীল রশ্মির পথ-অতিবাহন কাল} = \frac{\frac{১}{২}\frac{ট}{ঐ}}{ভ-ব}$$

$$\text{এবং লাল রশ্মির পথ-অতিবাহন কাল} = \frac{\frac{১}{২}\frac{ট}{ঐ}}{ভ+ব}$$

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম। রাম আরও বলিবে, এই দুই রশ্মির পথ-অতিবাহন ব্যাপারে সময়ের পার্থক্য যাহা, ঐ দুই ঘটনার মধ্যে বাস্তব কালের ব্যবধানও ঠিক তাহাই হইবার দরকার; নতুবা শ্যামের প্রত্যক্ষে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক হইতে পারিত না। সুতরাং রামের মতে

$$\text{ষ}=\frac{\frac{১}{২}\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}}{\text{ভ}-\text{ব}}-\frac{\frac{১}{২}\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}}{\text{ভ}+\text{ব}}=\frac{১}{২}\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\left(\frac{১}{\text{ভ}-\text{ব}}-\frac{১}{\text{ভ}+\text{ব}}\right)$$

$$=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\times\frac{\text{ব}}{\text{ভ}^{২}-\text{ব}^{২}}\quad\cdots\cdots(১)$$

সুতরাং 'ষ'-এর মূল্য (রামের মতে ঘটনা হু'টার মধ্যে বাস্তব কালের ব্যবধান) প্রাওয়া গেল।

এখন প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্যটা রামের ফুটরুলের মাপে যদি 'প' পরিমিত হয়, তবে রাম বলিবে—

$$\text{প}=\text{খগ}+\text{গক}$$

এখানে 'খগ' দুরত্বটা, রামের মতে, ট্রেনের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ট্রেনের দৈর্ঘ্য শ্যামের মাপে 'ট' পরিমিত দাঁড়াইয়াছে ; সুতরাং রামের মাপে উহা $\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}$ পরিমিত হইবে। ফলে, রাম বলিবে 'খগ'$=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}$। আর 'গক' দুরত্বটা সম্বন্ধে রামের মত হইবে এই যে, ট্রেনের লাল কাঠিটা 'ব' বেগে অগ্রসর হইয়া 'ষ' সময়ের মধ্যে ঐ দূরত্বটাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ; সুতরাং 'গক'$=\text{ব}\times\text{ষ}$; অর্থাৎ '১নং সমীকরণের' 'ষ'-এর মূল্য অনুসারে

$$\text{গক}=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\times\frac{\text{ব}^{২}}{\text{ভ}^{২}-\text{ব}^{২}}$$

ফলে দাঁড়ায়—

$$\text{প}=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}+\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\times\frac{\text{ব}^{২}}{\text{ভ}^{২}-\text{ব}^{২}}=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\left(১+\frac{\text{ব}^{২}}{\text{ভ}^{২}-\text{ব}^{২}}\right)$$

$$=\frac{\text{ট}}{\text{ত্র}}\times\frac{\text{ভ}^{২}}{\text{ভ}^{২}-\text{ব}^{২}}\quad\cdots\cdots(২)$$

এইরূপে রাম প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে নিজের 'পরিমাপের ফলের সহিত ট্রেনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে শ্যামের পরিমাপের ফলের সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।

আবার শ্যামও ট্রেন সম্বন্ধে নিজের পরিমাপের সহিত প্ল্যাট্‌ফরম্ সম্বন্ধে রামের পরিমাপের ফলটার নিম্নোক্তরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিবে। শ্যামের মতে প্ল্যাট্‌ফরম্‌টা ট্রেনের সমান। প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য রাম মাপিয়াছে 'প' পরিমিত ; সুতরাং শ্যামের মাপে উহা $\frac{\text{প}}{\text{ত্র}}$ পরিমিত হইতে হইবে ; এবং ট্রেনের দৈর্ঘ্য শ্যাম নিজে মাপিয়াছে 'ট' পরিমিত ; সুতরাং শ্যাম বলিবে

$$\text{ট}=\frac{\text{প}}{\text{ত্র}}\quad\cdots\cdots(৩)$$

উভয়ের পরিমাপের ফলই স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত '২নং ও ৩নং সমীকরণের'

প্রত্যেকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; উহাদিগকে পূরণ করিয়া একত্র করিলে (প × ট) রাশিটা কাটাকাটি হইয়া নিম্নোক্ত সম্বন্ধটা পাওয়া যায়—

$$ঐ^২ = \frac{ভ^২}{ভ^২ - ব^২} \quad অথবা = \frac{১}{১ - \frac{ব^২}{ভ^২}}$$

$$অর্থাৎ\ ঐ = \frac{১}{\sqrt{১ - \frac{ব^২}{ভ^২}}} \quad \cdots\cdots(৪)$$

সুতরাং 'ঐ'-এর মূল্য নির্ণীত হইল।

'৪নং সমীকরণ' হইতে দেখা যায় যে, 'ঐ'-এর মূল্য নির্ভর করে 'ব' ও 'ভ' এর উপরে—রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ ও আলোকের বেগের উপরে। 'ভ' একটা নির্দিষ্ট রাশি—উহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। 'ব' ছোট-বড় হইতে পারে; সুতরাং 'ঐ'-এর পরিমাণও ছোট-বড় হইতে পারে। কিন্তু একটা বিশিষ্ট আপেক্ষিক বেগের পক্ষে 'ঐ' একটা বিশিষ্ট পরিমাণেরই হইবে। আরও দেখা যায়, যদি 'ব' শূন্য হইতে বাড়িতে বাড়িতে আলোকের বেগের সমান হইয়া দাঁড়ায়, তবে 'ঐ'-এর মূল্য ১ হইতে বাড়িতে বাড়িতে শেষটা অসীম হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধারণ ধরণের আপেক্ষিক বেগের পক্ষে 'ঐ' সসীম এবং ১ অপেক্ষা বৃহত্তর সংখ্যা হইয়া থাকে।

প্ল্যাট্‌ফরম্ সম্পর্কে ট্রেনটা স্থির হইয়া দাঁড়াইলে অর্থাৎ ব = ০ হইলে, ঐ = ১ পরিমিত হইবে; ফলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য রাম-শ্যাম উভয়ের মাপেই 'ট' পরিমিত এবং প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য উভয়ের মাপেই 'প' পরিমিত হইবে।

'ব' একেবারে শূন্য না হইয়াও যতক্ষণ 'ভ'-এর তুলনায় নগণ্য (ঘণ্টায় ২।৩ শত বা ২।৪ হাজার মাইল এইরূপ) হইবে, ততক্ষণ '৪নং সমীকরণের' $\frac{ব^২}{ভ^২}$ প্রায় শূন্য পরিমিত; এবং 'ঐ'-এর মূল্য প্রায় ১ পরিমিতই রহিয়া যাইবে। সুতরাং প্ল্যাট্‌ফরম্ সম্পর্কে ট্রেনের বেগটা যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল অথবা ইহার ১০।২০ গুণ অধিকও হয়, তথাপি উহাদের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মাপের পার্থক্যটা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

উক্ত আপেক্ষিক বেগটা যদি আলোকের বেগের প্রায় সমান সমান হয়—উদাহরণ স্বরূপ যদি ধরা যায় যে $\frac{ব}{ভ} = \frac{৪}{৫}$ অর্থাৎ $ঐ = \frac{৫}{৩}$, তবে শ্যামের ফুটরুল রামের মাপে (বা রামের ফুটরুল শ্যামের মাপে) $\frac{৩}{৫}$ ফুট বা '৬ ফুট হইয়া দাঁড়াইবে। এ'রূপ ক্ষেত্রে ফুটরুলের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে এই মতভেদটা ধরা পড়িবার কথা। কিন্তু $\frac{ব}{ভ} = \frac{৪}{৫}$ হওয়ার অর্থ প্ল্যাট্‌ফরম্ সম্পর্কে ট্রেনের বেগটা সেকেণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ মাইলে পরিণত হওয়া।

এতটা বেগের সহিত সচরাচর আমাদের সাক্ষাৎ হয় না। পৃথিবী সম্পর্কে গ্রহনক্ষত্রাদির বা ধূমকেতুর বেগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম ; সুতরাং মঙ্গল বা বুধ গ্রহের অধিবাসীর সহিত তাহার আদান-প্রদান সম্ভব হইলেও আমাদের ফুটরুলের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উহাদের মতভেদটা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম ; এবং সাধারণ ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা কম বলিয়াই এতদিন উহা ধরা পড়ে নাই। কয়েক বৎসর মাত্র হইল ইলেক্‌ট্রন্ বা তড়িৎকণার আবিষ্কারে আলোকের বেগের সহিত তুলনা হইতে পারে—এইরূপ বেগসম্পন্ন পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রায় বায়ুহীন কাঁচের নলে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিলে ইলেক্‌ট্রনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রেডিয়ম্ ও রেডিয়ম্ জাতীয় পদার্থ হইতেও ইলেক্‌ট্রন্ স্বতঃই নির্গত হইয়া থাকে। ইহাদের আয়তন নগণ্য, বস্তুমানও নগণ্য—কিন্তু বেগ অতি ভীষণ। নগণ্য হইলেও ইলেক্‌ট্রনের ব্যাস ও বস্তুমান নির্ণীত হইয়াছে ; এবং ঐ ভীষণ বেগের ইতরবিশেষ ঘটিলে উহার ব্যাস এবং বস্তুমানও যে বদলাইয়া যায়, তাহাও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

'ব' যদি 'ভ'-এর সমান হয়, তবে $\left(\frac{\text{ব}^{২}}{\text{ভ}^{২}}\right)$ রাশিটা ১ পরিমিত এবং 'ঐ'-এর মূল্য অসীম হয় ; সুতরাং রামের মাপে ট্রেনের দৈর্ঘ্য বা $\frac{\text{ট}}{\text{ঐ}}$ এবং শ্যামের মাপে প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য বা $\frac{\text{প}}{\text{ঐ}}$ শূন্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা আমরা ভিন্ন ভাবে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

'ব' যদি 'ভ' কে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত, তবে $\left(\frac{\text{ব}^{২}}{\text{ভ}^{২}}\right)$ রাশিটা ১ অপেক্ষা বড় এবং 'ঐ' একটা কাল্পনিক সংখ্যা হইয়া দাঁড়াইত। সুতরাং এক জগতের দৈর্ঘ্য অপর জগতের দ্রষ্টার নিকটে একটা কাল্পনিক রাশি হইয়া দাঁড়াইত—রামের পক্ষে ট্রেনের অথবা শ্যামের পক্ষে প্ল্যাট্‌ফরমের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটা পরিমাণ-নির্দ্দেশই সম্ভব হইত না। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদের বিচারে জড়ের সম্পর্কে জড়ের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না—এক জগতের দ্রষ্টা অপর একটা জগৎকে বড় জোর সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে ছুটিয়া যাইতে দেখিতে পারে ; কিন্তু সেকেণ্ডে দেড় লক্ষ বা দু'লক্ষ ক্রোশ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—এ'রূপ জড় জগতের সহিত অপর কোনও জগতের দ্রষ্টার পরিচয় ঘটিতে পারে না। ইহাও আমরা ভিন্ন দিক হইতে পূর্ব্বেই একবার আলোচনা করিয়াছি।

কালের আপেক্ষিকতা

এক জগতের দেশের মাপ (বা ফুটরুল) অপর জগতের মাপে ছোট হইয়া থাকে—ইহা আমরা দেখিলাম। এক জগতের কালের মাপ (বা 'সেকেণ্ড' পরিমিত সময়) অপর জগতের দৃষ্টিতে কিরূপ হইবে—এখন আমরা তাহাই দেখিব। প্রশ্নটা এইরূপ—

শ্যামের ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে। পর পর দুটা 'টিক্‌টিকের' মধ্যে শ্যাম সময় নির্দ্দেশ করিতেছে এক সেকেণ্ড ; রামের মাপে ঐ সময়টা কত দাঁড়াইবে? এখানে

দেখিবার বিষয় এই যে, শ্যামের মতে উক্ত টিক্‌টিক্ শব্দ দু'টা একই স্থলের ঘটনা ; কিন্তু রামের দেশে উহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থলের ঘটনারূপে উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং প্রশ্নটা এইরূপ দাঁড়ায় —"শ্যামের জগতের একই স্থলে, কিন্তু পর পর দু'টা ঘটনা ঘটিতেছে ; শ্যামের ঘড়ির মাপে ঐ দুই ঘটনার সময়ের ব্যবধান যদি 'শা' পরিমিত হয়, তবে রামের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে ঐ সময়ের ব্যবধানটা কত হইবে ?" এই প্রশ্নের উত্তরও পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের সাহায্যেই পাওয়া যাইতে পারে।

আপেক্ষিক বেগের ফলে শ্যামের জগতের লাল কাঠিটা বা 'কা' প্রান্তটা (২নং চিত্র) রামের জগতের নীল বাক্স (খ) এবং লাল বাক্সের ('ক' এর) সহিত পর পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইবে। উভয়ের মতেই 'খ কা' মিলটা আগেকার ঘটনা এবং 'ক কা' মিলটা পরের ঘটনা হইবে। কিন্তু রাম দেখিবে যে, ঐ মিল দু'টা ঘটিতেছে তাহার জগতের 'খ' ও 'ক' প্রান্তে আর শ্যাম দেখিবে যে, উভয় মিলই ঘটিতেছে তাহার জগতের একই স্থলে—'কা' প্রান্তে। এই মিল দু'টাকেই এখানে শ্যামের জগতের একই স্থলের দুইটা পর পর ঘটনা রূপে গ্রহণ করা যাইতেছে।

এখন শ্যামের ঘড়ির মাপে এই দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি 'শা' পরিমিত হয়, তবে শ্যাম বলিবে যে দক্ষিণ দিকে ধাবমান 'ব' বেগসম্পন্ন রামের প্লাটফরমের সমগ্র অংশটা—যাহার দৈর্ঘ্য রাম মাপিয়াছে 'প' পরিমিত, সুতরাং শ্যামের মাপে যাহা দাঁড়াইয়াছে $\frac{\text{প}}{\text{ঐ}}$ পরিমিত—'শা' সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে তাহার জগতের 'কা' স্থানটাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং শ্যামের মতে $\frac{\text{প}}{\text{ঐ}} = \text{ব} \times \text{শা}$।

অন্য পক্ষে, রামের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে ঐ দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি 'শ' পরিমিত হয়, তবে রাম বলিবে যে 'ব' বেগে উত্তর দিকে ধাবমান শ্যামের ট্রেনের 'কা' প্রান্তটা 'শ' সময়ের মধ্যে তাহার জগতের—যাহার দৈর্ঘ্য রামের মাপে দাঁড়াইয়াছে 'প' পরিমিত—'খ' প্রান্ত হইতে 'ক' প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং রামের মতে $\text{প} = \text{ব} \times \text{শ}$

উপরের সমীকরণ দু'টার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, রামের 'শ' ও শ্যামের 'শা' সমান সমান হইতে পারে না ; এবং তাহার কারণ হইতেছে এই যে, প্লাটফরমের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে রাম-শ্যাম ভিন্ন মত—রাম উহাকে যে সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছে, শ্যাম উহাকে তাহার একটা ভগ্নাংশরূপে বর্ণনা করিতেছে। উভয়ের পরিমাপের ফলই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ উক্ত সমীকরণ দু'টাকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে। উহাদের একটাকে অপরটা দিয়া ভাগ করিলে 'শ' ও 'শা'র মধ্যে নিম্নোক্ত সম্বন্ধটা পাওয়া যায়।

$$\frac{\text{শ}}{\text{শা}} = \text{ঐ} \; ; \; \text{অর্থাৎ} = \frac{১}{\sqrt{১ - \frac{\text{ব}^২}{\text{ভ}^২}}} \quad ....(৫)$$

সুতরাং রামের 'শ' শ্যামের 'শা-এর 'ঐ' গুণ; অর্থাৎ শ্যামের জগতের একই স্থলে যদি পর পর দুইটা ঘটনা ঘটে, তবে শ্যামের মাপে উহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যাহা হইবে, রামের মাপে ঐ ব্যবধানটা তাহার 'ঐ' গুণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বড় হইবে।

উক্ত ঘটনা দু'টাকে আমরা শ্যামের জগতের 'কা' স্থানের ঘটনারূপে বর্ণনা করিয়াছি; উহারা 'কা' স্থানেই ঘটুক বা শ্যামের কাছেই ঘটুক—ফল একই দাঁড়াইবে *। শ্যামের হাত-ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ দু'টাকে শ্যাম একই স্থলের দু'টা পরপর ঘটনারূপে বর্ণনা করিতেছে এবং উহাদের অন্তর্গত সময়ের ব্যবধানটাকে 'এক সেকেণ্ড' বলিয়া নির্দেশ করিতেছে; কিন্তু রাম বলিবে, ঐ টিক্ টিক্ শব্দ দু'টা ঘটিয়াছে তাহার জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং তাহার ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে উহাদের অন্তর্গত সময়ের ব্যবধানটা হইতেছে 'ঐ' সেকেণ্ড। ফলে শ্যামের ঘড়ি রামের মাপে 'ঐ' গুণ ধীরে চলিতেছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; এবং ঠিক একই কারণ বশতঃ রামের ঘড়িও শ্যামের মাপে 'ঐ' গুণ 'স্লো' বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে এবং ঘড়ি দু'টা হাত-ঘড়িই হউক বা মন-ঘড়িই হউক—ফল একই দাঁড়াইবে।

প্রত্যেক দ্রষ্টা তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনগুলিকে একই স্থলের পরপর ঘটনারূপে অনুভব করিয়া থাকে। আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা উহাদিগকে তাহার দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সাজাইয়া লয় এবং নিজের বক্ষস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া ও ফুটরুলের সাহায্যে উহাদের অন্তর্গত দূরত্ব মাপিয়া দেখিতে পায় যে, ঐ সকল স্পন্দন নিজের বক্ষস্পন্দনের তুলনায় মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। † ফলে, অপর জগতের সহিত দৃষ্টি বদলাইতে পারিলে প্রত্যেক জগতের দ্রষ্টা দেখিতে পাইবে যে, তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী সহসা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি পাইলে দেখিবে যে, উহা পুনরায় দ্রুততর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্যাম যদি নিদ্রাগমনকালে দেখিতে পায় যে, তাহার হাত-ঘড়ির কাঁটাটা ১২ টার ঘরে অবস্থান করিতেছে এবং ঘুম ভাঙ্গিয়াই যদি উহাকে ১ টার ঘরে দেখিতে পায়, তবে শ্যাম যদিও বলিবে আমি ঠিক এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছি তথাপি রাম কি বলিবে, না বলিবে তাহা নির্ভর করে উহাদের আপেক্ষিক বেগের উপরে। 'ব' যদি শূন্য পরিমিত হয়, তবে রাম-শ্যাম একমত হইবে; উহা যদি আলোকের বেগের ৪/৫ অংশ হয় (অর্থাৎ 'ঐ' = ৫/৩ হয়), তবে রাম বলিবে শ্যাম ঘুমাইয়াছে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট; 'ব' যদি আলোকের বেগের ৯/১০ অংশ হয়, তবে রাম বলিবে শ্যাম ঘুমাইয়াছে প্রায় সওয়া দুই ঘণ্টা;

* অথবা শ্যাম তাহার ঘড়িসহ 'কা' স্থানে অবস্থিত—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

† এখানে বিভিন্ন দ্রষ্টার হৃদ্‌যন্ত্র অবিকল একরূপ অর্থাৎ একই মেকার কর্তৃক নির্মিত হইয়া বিভিন্ন জগতে স্থাপিত হইয়াছে—এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে।

আর যদি 'ব' আলোকের বেগের ঠিক সমান হইয়া দাঁড়ায়, তবে রাম বলিবে আমার কাল-প্রবাহে শ্যামের ঘুম ভাঙ্গিতে জানে না। অন্য পক্ষে, রামের দৃষ্টিতে শ্যামের নিদ্রাটা ধরা না পড়িয়া যদি জাগরণটাই ধরা পড়িত, তবে রাম বলিত—"আমার কালপ্রবাহে শ্যামের চক্ষু চিরবিনিদ্র।"

(ক্রমশঃ)

কালিদাসের বৃক্ষলতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগণপতি সরকার

৯। কঙ্কেলি :—

শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণ-বাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাস-বিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিম্
কঙ্কেলি-পুষ্পরুচিরা নবমালতী চ॥ ঋতু ৩।১৮॥

শ্যামালতা কিসলয় ফুলভারে নত হয়
ভূষিত-ললনা-কর তার কান্তি হরে,
বিশদ দশন ভাস চন্দ্রকান্তি ধরে হাস
কঙ্কেলি মালতী তারে শোভাহীন করে॥

এই "কঙ্কেলি" লইয়া খুব গোল আছে। কঙ্কেলিকে সকলেই অশোক বলে। "অশোকো হেমপুষ্পশ্চ কঙ্কেলিঃ পিণ্ডপুষ্পকঃ—ইতি রত্নকোষঃ। "স্ত্রীপ্রিয়ে বঞ্জুলোঽশোকঃ কংকেলিঃ কর্ণপূরকঃ"—ইতি বৈজয়ন্তী। হেমচন্দ্র এবং হলায়ুধ উভয়েও ইহাকে অশোক বলিয়াছেন। অমর তো ইহার নামই ধরেন নাই। আমি যখন ১৩২০ সালে ঋতুসংহারের পদ্যানুবাদ করি, তখন ইহাতে অভিধানকারগণের মতানুসারে অশোক বলিয়াছি। কিন্তু তারপর পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ হইলে পর যখন তাহাকে আমার ঋতুসংহার উপহার দিই, তাহার কিছুদিন পরে আলোচনা কালে তিনি বলিলেন যে,—"দেখিলাম সকলে যে ভুল করে, তুমিও তাই করিয়াছ"। তখন জানিলাম যে, কঙ্কেলিকে অশোক বলা ভুল হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, যোধপুরের পুরাতন রাজধানী মণ্ডপপুর বর্ত্তমান মণ্ডোরে প্রথমে এই কঙ্কেলি বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। একটি মাঝামাঝি রকমের গাছ শাদা ফুলে ভরে গেছে। আর তারি বাহার হয়েছে। গাছের পাতা কতবেলের গাছের পাতার মত। সে সময় সেপ্টেম্বর

বা অক্টোবর মাস। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উহার নাম "কঙ্কেড়"; তখন তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কালিদাসের "কঙ্কেলি"। র, ল, ড় ব্যাকরণে বিকল্পে ব্যবহার হয়। সুতরাং কঙ্কেড়ও যা', কঙ্কেলও তাই। আমিও দেখিতেছি—সত্যই তো, কঙ্কেলি কখনই অশোক হইতে পারে না। শাস্ত্রী মহাশয় যদি ঐ গাছ ও ফুল চাক্ষুষ করিয়া না আসিতেন, তা' হলেও উহা অশোক হইতে কখনই পারে না। তা'র কারণ কালিদাসেই স্পষ্ট আছে। অশোক হইতেছে—"বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তি" অর্থাৎ বসন্তপুষ্প। আর ঋতুসংহারে কালিদাস বলিতেছেন যে, "কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ দন্তাবভাস-বিশদ স্মিতচন্দ্রকান্তি হরতি"—কঙ্কেলি পুষ্পের সৌন্দর্য্য এবং নবমালতী দাঁতের প্রভার দ্বারা নির্ম্মল মৃদু হাসিরূপ চাঁদের শোভাকে হরণ করছে। ইহাতে প্রকাশ পাইল যে, চাঁদের শোভা শুভ্র, দাঁতের প্রভাও শুভ্র, তখন কঙ্কেলি ফুলের শোভাও শুভ্র; সুতরাং কঙ্কেলি ফুল শাদা। কিন্তু অশোক ফুল লাল; অতএব কঙ্কেলি কি করিয়া অশোক হয়। তারপর অশোক হইতেছে বসন্ত পুষ্প। আর কঙ্কেলি হইতেছে শরৎ পুষ্প; কারণ শরৎ বর্ণনায় কালিদাস কঙ্কেলির বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল কারনে কঙ্কেলি ও অশোক দুইটি পৃথক পৃথক বৃক্ষ; অশোক বসন্ত পুষ্প এবং কঙ্কেলি—শরৎ পুষ্প। কালিদাস একবার মাত্র ঋতুসংহারে এই ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন, আর কোথাও করেন নাই।

১০। কদম্ব:—

"কদম্ব-সর্জ্জার্জ্জুন-কেতকী-বনম্" (ঋতু ২।১৭)
"মালাঃ কদম্ব-নবকেশর-কেতকীভিঃ" (ঐ ২।২০)
"বিকচ নব কদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাম্" (ঋতু ২।২৪)
"গন্ধশ্চ ধারাহত পল্বলানাং
কাদম্বমর্দ্ধোদ্গতকেসরঞ্চ।
স্নিগ্ধশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুঃ
যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে॥ (রঘু ১৩।২৭)
কদম্বমুকুলস্থূলৈঃ অভিবৃষ্টাং প্রজাশ্রুভিঃ" (রঘু ১০।৯৯)
অংশলম্বি কুটজার্জ্জুনস্রজঃ
তস্য নীপ রজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদ বর্হিণেষভূৎ
কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ। (রঘু ১৯।৩৭)
বৃবৃধতী শৈলসুতাপি ভাবং
অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বাল কদম্বকল্পৈঃ। (কু ৩।৬৮)
"নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং"। (মেঘ ১।২১)

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোঃ
ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্য স্ত্রী রতিপরিমলোদ্গারিভি র্নাগরাণাং
উদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভি র্যৌবনানি॥ (মেঘ ১।২৫)
হস্তে লীলাকমল-মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব রজসা-পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমান্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধুনাম্॥ (মেঘ ২।২)

অভিধান :—

নীপ, প্রিয়ক, কদম্ব, হলিপ্রিয় (অমর)।
হলিপ্রিয়; নীপ, কদম্ব (হেমচন্দ্র)।
কদম্বে পুলকী শ্রীমান্ প্রাবৃষেণ্যোহলীমকঃ।
মহাকদম্বকে নীপো ধূর্ত্তো ধূর্ত্তারদীপনৌ॥ (বৈজয়ন্তী)

অর্থাৎ—কদম্ব, পুলকী, শ্রীমৎ, হলীমক, প্রাবৃষ্যেণ্য—এইগুলি কদম্বের নাম। ইহার বোটানিক নাম—Nauclea Kadamba। নীপ, ধূর্ত্ত, ধূর্ত্তার, দীপন—এগুলি মহাকদম্বক অর্থাৎ বড় কদম্ব (species of large Kadamba)। তামিল—Peruṅkaḍamba। Nauclea cordifolia—ইহা গেল বৈজয়ন্তী অভিধান মতে।

মল্লিনাথ—"নীপ" বলিতে সর্ব্বত্রই "কদম্ব" বলিয়াছেন—"নীপং কদম্ব কুসুমং" (উ, মেঘ ২); "নীপরজ সাঙ্গরাগিণঃ"—নীপানাং কদম্বকুসুমানাং রজসা অঙ্গরাগিণঃ অঙ্গরাগবতঃ"—(রঘু ১৯।৩৭); কিন্তু মেঘদূতের পূর্ব্বার্দ্ধের ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হরিতং পালাশবর্ণম্। 'পালাশো হরিতো হরিৎ' ইত্যমরঃ। কপিশং শ্যামবর্ণম্। 'শ্যাবঃ স্যাৎ কপিশো ধূম্র ধূমলো কৃষ্ণলোহিতে' ইত্যমরঃ। হরিতং চ তৎ কপিশং চ হরিতকপিশম্। 'বর্ণো বর্ণেন' ইতি সমাসঃ। নীপং স্থলকদম্ব কুসুমম্। 'অথ স্থল কদম্বকে। নীপঃ স্যাৎ পুলকে' ইতি শব্দার্ণবে।

ইহা হইতে ধরা যাইতে পারে যে, মল্লিনাথের মতে কদম্ব ও নীপ দুইটি পৃথক বৃক্ষ। "কদম্ব" হইতেছে সাধারণ "কদম গাছ" এবং "নীপ" হইতেছে "স্থল কদম্ব'। অবশ্য "স্থল কদম্ব" কাহাকে বলে, তাহা কোন পুস্তকে পাই নাই। তবে যদি ইহা 'মহাকদম্বক' হয়, তাহা হইলে গোল মিটিয়া যায়। কালিদাস নীপের বর্ণনায় বলিয়াছেন—হরিত কপিশ বর্ণ। হরিৎ বলিতে সবুজ এবং কপিশ বলিতে লালচে কালো (brown) অর্থাৎ সবুজ, লাল ও কালোর মিশ্রণ। এই রং দেখিয়াই মল্লিনাথ নীপকে কদম্ব হইতে আলাহিদা করিয়াছেন। বৈজয়ন্তী তো দুইটি পৃথক করিয়াই দিয়াছে। কদম্ব—সাধারণ কদম; আর নীপ—বড় কদম।

কদম্ব ও নীপ—একই হউক বা দুই হউক—বর্ষাকালেই ফুল ফোটে।

কালিদাস যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কদম্ব ও নীপ একই বৃক্ষ, কি দুইটি পৃথক্ বৃক্ষ—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যেখানে নীপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেখানেও এবং যেখানে কদম্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেখানেও—ফুল বর্ষাতেই ফুটাইয়াছেন। নীপের বর্ণনায় একস্থানে "হরিতকপিশ"—এই বিশেষণ দিয়াছেন; তাহাতেই নীপকে মল্লিনাথ কদম্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। আর যখন একজন অভিধানকার দুইটিকে পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছেন, তখন দুইটিকে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ ধরা চলে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কালিদাস দুইটিকে পৃথক্ করিয়া গিয়াছেন।

কদম্ব সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আছে; তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১১। কদলী :—

"ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলী বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ। (উ, মেঘ ২।১৫)
"বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈ র্মুচ্যমানো মদীয়ৈঃ
মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্॥" (উ, মেঘ ২।৩৩)
"নাগেন্দ্র-হস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাৎ
একান্তশৈত্যাৎ কদলী বিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং
জাতাস্তদূর্বোরুপমানবাহ্যাঃ"। (কুমার ১।৩৬)
কবিরাজ-কর বলিয়ে খর,
রামরম্ভা চির শীতলতর,
হয়ে রূপবান্ লোকে বিপুল,
উমা-উরুসনে নহিল তুল।

অভিধান :—কদলীবৃক্ষের নাম—

কদলী, বারণবুষা, রম্ভা, মোচা, অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা (অমর)।

অন্যনাম :—বালকপ্রিয়া, বনলক্ষ্মী, অম্বুসারা, নিঃসারা, দীর্ঘপত্রা, স্বাদুফলা, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা।

বাংলা নাম :—কলা। হিঃ—কেরা। সিং—কেহেল্।
মঃ—কেঠ্ঠা। গুঃ—কেল্য। কঃ—কদলী।
তৈঃ—চক্রাকেলী। তাঃ—বাঠ্ঠ। বঃ—হগাপী।
আঃ—মেয়জ্। ফাঃ—মাঙ্গ্। ইং—প্লান্টেন্।
বোটানিক্ :—Musa Paradeseaca, Linn.
Musa Sapientum, Linn. (Materia Medica of the Hindus)

ইহা আমাদের সাধারণ কলা। ইহার পরিচয়ের আবশ্যক নাই—যেহেতু সকলেই চেনেন, সকলেরই প্রিয়।

কলার বহু ভেদ আছে। আসামে ১৫ প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় (বনৌষধিদর্পণ—দ্রষ্টব্য)। আমাদের এদেশেও কলার বহু ভেদ আছে। কালিদাস কিন্তু একমাত্র "রাম রম্ভার" বর্ণনাই করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উরুদেশের সঙ্গে তুলনায় একমাত্র এই কলাই দাঁড়াইতে পারে। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন।

১২। কন্দলী :—

"আসারসিক্ত-ক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন কোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণ-লোচনশ্রীঃ॥ (রঘু ১৩।২৯)
"কর্ত্তুং যত্র প্রভবতি মহীমচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং (পূ, মেঘ—১।১১)
"নীপং দৃষ্টা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ
আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারাঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥ (পূ, মেঘ ১।২১)
"প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈ স্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলীদলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥ (ঋতু ২।৫)
নীলমণি সম বিকসিত তৃণাঙ্কুর,
নির্গত কন্দলী-দল হয়েছে প্রচুর,
ইন্দ্রগোপে ব্যাপি মহী হয়েছে শোভনা,
নীল-রক্ত-রত্নে যেন শোভে বরাঙ্গনা।

অভিধান :—

"কন্দল্যাঞ্চ শিলীন্ধ্রা স্যাৎ"—(ইতি শব্দার্ণবে)।
"দ্রোণপর্ণী স্নিগ্ধকন্দা কন্দলী ভূকদল্যাপি" (ইতি শব্দার্ণবে)।

(এ দুইটিই মল্লিনাথ ধরিয়াছেন—প্রথমটি ১১ শ্লোকের টীকায় এবং দ্বিতীয়টি ২১ শ্লোকের টীকায়)।

"ছত্রকে বৃক্ষজাতৌ চ শিলীন্ধ্রং কথ্যতে বুধৈঃ। (হলায়ুধ)

বাংলা নাম :—কেহ ইহাকে "ভুইচাঁপা" বলেন, কেহ বলেন "কলাফুল"; আর কেহ বলেন

"ব্যাঙের ছাতা"। ইংরাজিতে ইহাকে Mushroom বলিয়াছে। আমার মতে ইহা "ব্যাঙের ছাতা"। এই ছাতা সাদা এবং লাল্‌চে হয়। শুনিয়াছি লাল রঙের ছাতা লোকে খায়। কালিদাস এই লালবর্ণের ছাতারই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একমাত্র বর্ষাতেই হয়।

১৩। কর্ণিকার :—

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ
প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং
তদলকে দলকেসরপেশলম ॥(রঘু ৯।৪০)

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং
ছুনোতি নির্গন্ধ তয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্রবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥(কুমার ৩।২৮)

অশোকনির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগম্‌
আকৃষ্ট হেমদ্যুতি কর্ণিকারম্‌।
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ (কু, ৩।৫৩ ॥)

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি
বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্‌।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন
মূর্ধ্ন প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ (কু, ৩।৬২ ॥)

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারম্‌

পুষ্পঞ্চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ
প্রয়াতি কান্তিং প্রমদাজনানাম ॥ (ঋতু ৬।৫)

কর্ণে অবতংস প্রায় কর্ণিকার শোভা পায়,
অশোক চঞ্চল নীল অলকে কি শোভিছে
ফুল্ল নবমল্লিকায় সুন্দরী কামিনী কায়
মানস মোহিনী ছবি আহা মরি ধরিছে।

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং
কিং কর্ণিকার-কুসুমৈ র্ন কৃতং নু দগ্ধম্‌।
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈ র্বচোভিঃ
যূনাং মনঃ সুবদনা-নিহিতং নিহন্তি ॥(ঋতু—৬।২০)

যুবা-মন নারীগত পলাশ কুসুম যত
শুক মুখ ছবি ধরি ভিন্ন কি না করিছে ?
কিংবা ফুল কর্ণিকারে দগ্ধ কি করে না তারে ?
তবে মধুরবে পিক কেন প্রাণ নাশিছে।

সমদ-মধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চ নাদৈঃ
কুসুমিত-সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ।
ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈর্মানসং মানিনীনাং
তুদতি কুসুমমাসো মন্মথোদ্বেজনায় ॥ (ঋতু—৬।২৭ ॥)

মানিনী-যুবতী-চিতে কামভাব উদ্দীপিতে
মত্ত অলি পিকধ্বনি সহ মধু মিলিয়া
কুসুমিত সহকারে আর ফুল কর্ণিকারে
নিশিত সায়ক করি ব্যথা দেয় বিঁধিয়া ॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ডাঃ উদয়চাঁদ দত্তের "The Materia Medica of the Hindus" নামক পুস্তকে যে 'A glossary of Indian Plants' আছে, তাহাতে কর্ণিকারের বাংলা নাম 'কনকচাঁপা'; হিন্দি নাম 'কনিয়ার' (Kaniar) এবং বোটানিক্ নাম Pterospermum acerifolium Willd. পাওয়া যায়। কিন্তু বনৌষধিদর্পণে ইহার বাংলা নাম "সোঁদাল" এবং হিন্দি নাম "অমলতাস" দিয়াছে। ডাঃ দত্তের পুস্তকের মত ভুল—ইহা দেখান হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "সোঁদালই" বলেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা সোঁদাল কি না, তাহাতে একটু সন্দেহ ছিল। এখন বিশ্লেষণ করিয়া সে সন্দেহ গিয়াছে। কর্ণিকার হইতেছে আমাদের "সোঁদাল"। কালিদাস ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে সোঁদাল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। কালিদাস বলিতেছেন কর্ণিকারের রং হইতেছে—"আকৃষ্ট হেমদ্যুতি-কর্ণিকারম্" অর্থাৎ হেমদ্যুতি; আবার বলিতেছেন "হুত হুতাশন দীপ্তি বনশ্রিয়ঃ, প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্ত যৎ" অর্থাৎ হোমে আহুতি প্রদানে অগ্নির যে স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তি হয়, সেইরূপ স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট কর্ণিকার ফুল বনলক্ষ্মীর সোনার গহনার প্রতিনিধি হইয়াছিল। আর ইহা যে রমণীদিগের প্রিয় কর্ণভূষণ, তাহাও মহাকবি দেখাইয়াছেন— "যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেসর পেশলম্"—অর্থাৎ যুবতীগণ সুন্দর দল ও কেসরযুক্ত ঐ কর্ণিকার ফুল অলকে পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া "কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং" বলিয়াছেন। আবার 'কুমার সম্ভবে' বলিয়াছেন—"নূতন ফোটা কর্ণিকার ফুল উমার কৃষ্ণ অলকের (চূর্ণ কুন্তলের) মধ্যে শোভা পাইতেছিল।" আবার মহাকবি এই কর্ণিকারকে মদনের বাণ করিয়াছেন (ঋতুসংহার ৬।২৭ দ্রষ্টব্য)। ইহা করা ঠিক হইয়াছে। সোঁদাল ফুল লম্বা, শ্রেণীবদ্ধ এবং সোনার রং-এর। লম্বা বলিয়া বাণের সঙ্গে তুলনায় বেশ খাটিয়াছে। কালিদাসের এই

বর্ণনার সঙ্গে সোঁদাল ফুল হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং কর্ণিকারই হইতেছে বাংলার সোঁদাল। ইহা বসন্ত পুষ্প।

১৪। কল্পদ্রুম :—

"হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণ মুখপট প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম কিশলয়ান্যংশুকানী ববাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতে নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥ (পূ, মে—১৬২)
"কল্পদ্রুমোত্যৈ রবকীর্য্য পুষ্পৈঃ—(রঘু ৫।৫২)
"কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ"—(রঘু ৬।৬)
"কল্পবৃক্ষফলধর্মি কাঙ্ক্ষিতম্"—(রঘু ১১।৫০)

অভিধান :—(অমর)

পঞ্চতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥

মন্দার (১), পারিজাত (২), সন্তান (৩), কল্পবৃক্ষ (৪), এবং হরিচন্দন (৫)—এই পাঁচটি দেববৃক্ষ। ইহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না—জানা নাই।

কালিদাসের বর্ণনা হইতে ইহাই আন্দাজ করিতে হয় যে, হিমালয়ে মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই কল্পবৃক্ষ থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ কেহ এই পাঁচটি দেববৃক্ষের নির্ণয় (Identification) করিতে পারে নাই। A fabulous tree of Svarga granting everything desired—(Gloss. হলায়ুধ)।

১৫। কহ্লার :—

কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহু-বিধুন্বং-
স্তৎ সঙ্গমাদধিক শীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে
পত্রান্তলগ্ন তুহিনাম্বুবিধূয়মানঃ॥ (ঋতু—৩।১৫॥)

কাঁপাইছে বার বার কহ্লার কুমুদ আর
কমলে, সংসর্গে অতি শীতল হইয়া,
প্রভাত পবন বয় পত্র যত জলময়
কাঁপায়ে আকুল বায়ু করিতেছে হিয়া॥

অভিধান :—

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারম্—(অমর ও হেমচন্দ্র)
সৌগন্ধিকঞ্চ কহ্লারম্—(হলায়ুধ)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে "পদ্ম" এবং "কুমুদ্বতী" দ্রষ্টব্য।

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে কুমুদের পর্য্যায়ে কহ্লার ধরিয়াছে। কিন্তু "ভাবপ্রকাশে" কহ্লার ও কুমুদ বিভিন্ন করিয়াছে, যথা—

কহ্লার :—সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্ত সন্ধ্যকম্।
কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্॥

এবং কুমুদ :—(কোঈ ইতি লোকে)
শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।
কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্॥

আবার দেখিতেছি, কহ্লারকে 'সৌগন্ধিক' অনেকেই বলিয়াছেন। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুর মতে—"সৌগন্ধিকং নীলপদ্মম্"। তাহা হইলে কহ্লারকে নীলপদ্ম বলিতে হয়। কহ্লারকে কুমুদ বলিলে আমাদের শালুক ফুল হয়। শালুক শরতে ফোটে; সুতরাং কালিদাসের বর্ণনার সঙ্গে মিশ খায়; কিন্তু শালুক যদি "সৌগন্ধিক" হয়, তাহা হইলে তো ঠিক হয় না। অত্যন্ত সুগন্ধি না হইলে তো সৌগন্ধিক হয় না। আর সুশ্রুতের ব্যাখ্যাকার ডহ্বণের মতের সহিত বিরোধও ঘটে। তিনি বলেন—"সৌগন্ধিকং গর্দ্ধভপুষ্পাভিধানমত্যন্ত সুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি"—'গর্দ্ধভপুষ্প' কথাটা বুঝিলাম না এবং ইহা হয় তো কোন প্রদেশের ভাষানাম হইবে। নীল পদ্মই এই সৌগন্ধিক বা কহ্লার কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নীলপদ্ম তো পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সুগন্ধি কি না, অথবা ইহা চাঁদের আলোয় ফোটে কি না—জানা নাই। তবে শালুককে সাধারণতঃ কহ্লার বলা হয়। এই শালুক রাত্রে ফোটে বটে, কিন্তু গন্ধ তো পাওয়া যায় না। আর চক্রপাণি বলিয়াছেন—"সৌগন্ধিকঃ শুন্ধী:" (সুঃ ৪ অঃ)। 'শুন্ধী' বলিতেই শালুক বুঝায়। সৌগন্ধিক যদি কেবল নাম হয়; সুগন্ধ আছে বলিয়া সৌগন্ধিক, ইহা না হয়, তাহা হইলে গোল মিটিয়া যায়। কহ্লারকে নির্ভাবনায় শালুক ধরিতে পারা যায়। অবশ্য কালিদাস যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কহ্লারের যে গন্ধ আছে, তা' বলেন নাই। কহ্লারের শীতলত্ব গুণের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং শালুকই কহ্লার হইবে। হলায়ুধের Glossary maker Th. Aufrecht কহ্লারকে বলিয়াছেন—White water lily। এই সকল দেখিয়া বিবেচনা হয় যে, কুমুদ ও কহ্লার বিভিন্ন; কিন্তু এক জাতীয়। অনেক সময় অভিধানকারগণ এক জাতীয় বস্তুকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। এখানেও তা'ই হইয়াছে। নীলপদ্ম পাওয়া যায় না। অনেকে নীল শালুককেই ভ্রমবশতঃ নীলপদ্ম বলিয়া থাকে। নীল শালুক অনেক পাওয়া যায়। শাদা শালুকই কুমুদ; আর গন্ধযুক্ত নীল শালুকই কহ্লার। কহ্লার শরৎকালের ফুল।

১৬। কালাগুরু :—

চকম্পে তীর্ণ লৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ (রঘু ৪।৮২)

অভিধান :—

কালাগুরু কাকতুণ্ডং—(হেমচন্দ্র)
বনমায়ঃ পুরমদঃ কাকতুণ্ডো বনদ্রুমঃ।
কালাগুরু তু মঙ্গল্যা মল্লিকাসমগন্ধি চেৎ ॥ (বৈজয়ন্তী)
কালাগুর্ব্বগুরুঃ স্যাত্তু মঙ্গল্যা মল্লিগন্ধি যৎ—(অমর)

টীকাকার—কালাগুরুঃ চ অগুরু উচ্যতে। মল্লিকাপুষ্পগন্ধিঃ অগুরুঃ মঙ্গল্যা—অর্থাৎ 'কালাগুরু' শব্দে অগুরু এবং 'মঙ্গল্যা' শব্দে মল্লিকা ফুলের গন্ধযুক্ত অগুরু।

কালাগুরু = কাল + অগুরু—অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অগুরু। অতএব অগুরুভেদ। মদ্রদেশ হইতে Gustav oppert যে বৈজয়ন্ত্রী মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার vocabularyতে কালাগুরুকে Black Agallocham বলিয়াছেন এবং তামিল নাম Kār Akil (কর অকিল) লিখিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনা হইতে পাই যে—"কালাগুরু" প্রাগ্‌জ্যোতিষের অর্থাৎ কামরূপের দ্রব্য। বস্তুতঃ কালাগুরু কামরূপেই পাওয়া যায়।

১৭। কালীয়ক :—

"প্রিয়ঙ্গু <u>কালীয়ক</u> কুঙ্কুমাক্তম্
স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভিঃ
মদালসাভি র্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ (ঋতু ৬।১২)

কালীয়ক শ্যামালতা কুঙ্কুম কস্তুরী তথা
মিলায়ে চন্দনরসে গৌর-কুচে লেপিছে,
মধুর মদিরা পানে নারীগণ ফুল্লপ্রাণে
অলস হইয়া মরি কি মধুর শোভিছে ॥

অভিধান :—

কালীয়কং তু জাপকম্—(হেমচন্দ্র)
অথ জায়কম্। কালীয়কঞ্চ কালানুসার্য্যং—(অমর)

টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন—"কালীয়কঞ্চ কালেয়ং জাবকং কান্তিদায়কমিতি ব্যাড়িঃ"। কালিয়া ইতিখ্যাতে (পীতকাষ্ঠে গন্ধদ্রব্যে)—অর্থাৎ একপ্রকার পীতকাষ্ঠ গন্ধদ্রব্য। কালানুসার্য্যং কালেয়ং জাবকং—yellow fragrant soot—(বৈজয়ন্তী)। ইহাতে কালীয়ক শব্দ না থাকিলেও কালীয়ক ও কালের এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে; টীকাকার চক্রবর্ত্তী তাহা ধরিয়াছেন। 'জায়ক' অর্থে অঙ্গ গন্ধ জয় করিয়াছেন যে। 'কালীয়ক' অর্থে কালী (বর্ণ বিশেষ) দেখা যায় ইহাতে—অর্থাৎ কালবর্ণের সুগন্ধি বস্তু।

কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্। হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালীসুসার্য্যকম্।

কালীয়কম্ রক্তগুণং বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনম্ ॥(ভাবপ্রকাশ)—অতএব ইহা পীতচন্দন। ইহাকে সাধারণতঃ 'হরিচন্দন' বা 'পীতচন্দন' বলা হয়। ঋতুসংহারে ফুটনোটে আমি ভুলক্রমে ইহাকে কৃষ্ণচন্দন বলিয়াছি।

১৮। কালেয় :—

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলাম্
আশ্যান-কালেয়-কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং
নার্যশ্চতুষ্কাভিমুখং ব্যনৈষুঃ॥ (কু—৭।৯)

অভিধান :—

অথ পীতদ্রু-কালেয়ক-হরিদ্রবঃ। দার্ব্বী পচম্পচা
দারুহরিদ্রা পর্জ্জনীত্যপি—(অমর)
কুঙ্কুমং ঘুস্থণং বর্ণং প্রোক্তং লোহিত চন্দনম্।
কাশ্মীরজং চ বিদ্বদ্ভিঃ কালেয়ং জাগুড়ং স্মৃতম্ ॥—(হলায়ুধ)
কাশ্মীরজন্ম-ঘুসৃণং বর্ণং লোহিত চন্দনম্।
বাহ্লীকং কুঙ্কুমং বহ্নিশিখং কালেয়-জাগুড়ে।
সঙ্কোচ পিশুনং রক্তং ধীরং পীতন-দীপনে ॥—(হেমচন্দ্র)
দার্ব্যাং দারুহরিদ্রা স্যাৎ পীতদারুশ্চ পর্জনী।
পঞ্চপচা কর্কটিনী পর্প্পরা পর্প টী বরা।
কণ্টকটেরী কালেয়ঃ—(বৈজয়ন্তী)
কালানুসার্য্যং কালেয়ং জাবকং—(বৈজয়ন্তী)

এখানে কালেয় ও জাবক এক পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায় জানা যাইতেছে যে, কালীয়কেরও যখন জাবক নাম, তখন কালেয় ও কালীয়ক এক বস্তু ("কালীয়ক" দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কালেয় নামক আর এক বস্তু আছে ; এখানে তাহাই দেখান যাইতেছে।

ভাষানামঃ—বাঃ—দারুহরিদ্রা। হিঃ—দারুহল্দি। মঃ—দারুহঠ্‌ঠ। গুঃ—দারুহলদর। কঃ—মরদর্শিনা। তৈঃ—মনিপস্পুপু। তাঃ—মরমঞ্জিল। ফাঃ—দারচোব। অঃ—দার-হলদ্। সিং—বনুবেল। তামিল—Mara manjal. (মরমঙ্জল্)। (বৈজয়ন্তী মতে) বোটানিক্ নাম—Amonum Xanthorrhezon, Curcuma Xanthrrheza। কিন্তু Glossary of Indian plant এবং বনৌষধিদর্পণ মতে—Berberis asiatica, Roxb. also B. aristata, Dc। সং নাম—দারুহরিদ্রা, দার্বী, কটঙ্কটেরী। অন্বর্থ সংজ্ঞা—"পীতদারু, "বর্ন্নাগা"।' Glossary of হলায়ুধ মতে—saffron।

কালেয় যদি কালীয়ক হয়, তাহা হইলে কুঙ্কুম কখনই কালেয় নয়। কারণ, কালিদাস

বলিতেছেন—"প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তং"। সুতরাং কুঙ্কুম ও কালীয়ক প্রত্যেকটি বিভিন্ন। অতএব কালেয় ও কালীয়ক বিভিন্ন। তবে পূর্ব্বে কালীয়ক আলোচনা কালে দেখাইয়াছি যে, কেহ কেহ কালেয় এবং কালীয়ক এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেখানে কালেয় যে বস্তু, এখানে তাহা নয়। তবে কালেয়, কুঙ্কুম, দারুহরিদ্রা—এগুলিকে অভিধানকারগণ এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দারুহরিদ্রা ও কুঙ্কুম—এক নহে। "বনৌষধিদর্পণ" কুঙ্কুমকে Crocus Sativus এবং দারুহরিদ্রাকে Berberis asiatica বলিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ দেখাইয়াছে। উভয়ের বর্ণনা এবং ঔষধে ব্যবহারও আলাহিদা দেখাইয়াছে।

কালিদাস অঙ্গরাগের জন্য কালেয় ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা কুঙ্কুম হইলে তো কথাই নাই। কুঙ্কুম গায়ে মাখা এখনও আমাদের মধ্যে আছে। আর যদি দারুহরিদ্রা হয়, তা' হ'লেও গায়ে বোধ হয় মাখা যায়। কারণ, "বনৌষধিদর্পণ" বলিতেছেন যে, দারুহরিদ্রা পর্ব্বতজাত গুল্ম। পুরাণ ত্বকের উপরি ভাগ পাঁশুটে রঙের, অভ্যন্তরে পীত, কণ্ঠও পীত; পুষ্প বৃহৎ এবং পীতবর্ণ। ফল ঘোর পাটল বর্ণ, অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ। আমাদের দেশে হলুদ-মাখা প্রথা আছে। দারু-হরিদ্রার রং যখন হলুদবর্ণ, তখন ইহাও সম্ভবতঃ মাখা যায়।

হেমচন্দ্র ও হলায়ুধ কালেয়কে যেমন কুঙ্কুম বা কাশ্মীরজাত বলিয়াছেন, সেইরূপ লোহিত চন্দনও বলিয়াছেন। একরূপ লাল চন্দন আমরা ব্যবহার করি। ইহা লাল চন্দনও হইতে পারে। কিন্তু লালচন্দন পূজায় এবং ঔষধেই এখন ব্যবহার হয়। অঙ্গরাগের জন্য ব্যবহার অন্ততঃ বাঙ্‌লা দেশে নাই। অমরসিংহ এ'সকল অভিধানকারগণ হইতে প্রাচীন; তিনি ইহাকে "দারুহরিদ্রাই" বলিয়াছেন। এখন ইহা কুঙ্কুম, কি দারুহরিদ্রা? কালিদাস কুমার-সম্ভবে ৭ম সর্গের ৯ম শ্লোকে বলিতেছেন যে, "লোধ্রকল্ক (চূর্ণ) মাখাইয়া উমার গায়ের তেল তুলিয়া ফেলা হইল; তারপর অল্প শুষ্ক কালেয় গায়ে মাখাইয়া অঙ্গরাগ করা হইল; তখন স্নান করাইবার উপযোগী কাপড় পড়াইয়া পার্ব্বতীকে চতুষ্কের (স্নান-গৃহের) দিকে লইয়া যাওয়া হইল।" এখানে মল্লিনাথ কালেয় শব্দের অভিধান দিয়াছেন—"অথ জায়কং কালেয়কঞ্চ কালানুসার্য্যঞ্চ ইত্যমরঃ।" আমরা কালীয়ক আলোচনা কালে ঐ অভিধান তুলিয়াছি, সেখানে "কালেয়কঞ্চ" স্থানে "কালীয়কঞ্চ" পাইয়াছি। অতএব বুঝা গেল যে, অমরের ঐ দুইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু চন্দন লাল হউক, শাদা হউক বা পীত হউক, উহা মাখাইয়া স্নান করান কেমন কেমন ঠেকে। ধনীর গৃহে শুধু হলুদ মাখান বা দারুহরিদ্রা কাটিয়া বা ঘষিয়া মাখান, তাহাতে আবার দারুহরিদ্রার কোন সুগন্ধ নাই—এরূপ দ্রব্য কালিদাস মাখিবেন না। কালিদাস, সুগন্ধ ও সুন্দর কুঙ্কুম থাকিতে, অন্য কিছু মাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে কালেয় বলিতে কুঙ্কুম ব্যতীত অন্য মাখিবার মত বস্তু যখন পাইতেছি, তখন কালেয়কে কুঙ্কুম না ধরিতে তো পারি। আর মল্লিনাথের মতে কালেয় ও কালীয়ক যদি এক ধরা হয়, তা হলে তো চুকিয়াই যায়। কিন্তু একই কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিভিন্ন বস্তু পাইলে ভেদ করাই ভাল বোধে এখানে কালেয়কে দারুহরিদ্রাই স্থির করা হইল।

১৯। কাশ ঃ—

সা মঙ্গল স্নান-বিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীত পত্যুদ্ গমনীয়-বস্ত্রা।
নির্বৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ (কু—৭।১১)

অর্থাৎ পার্ব্বতী মাঙ্গল্য স্নান করিয়া বিশুদ্ধ শরীর হইয়া পতির সহিত বিবাহিত হইবার উপযুক্ত ধৌতবস্ত্র পরিয়া বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত বিকশিত কাশফুলে পরিশোভিত বসুধার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

কাশাংশুকা বিকচ পদ্ম মনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদ হংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তাশরন্নববধূরিব রূপরম্যা ॥ (ঋতু—৩।১)

পরি কাশফুল-বাস, ফুল্লপদ্ম মুখভাস,
উন্মাদ মরালরব বাজিছে নূপুর,
পক্কশালি মনোহর দেহলতা ক্ষীণতর
নববধূ বেশে আসে শরৎ মধুর।

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ (ঋতু ৩।২)

কাশফুলে এবে ধরা, চাঁদে নিশি মনোহরা,
মরালে তটিনী, সর কুমুদ বিকাশে,
সপ্তচ্ছদে ভারাক্রান্ত ফুলদলে বনপ্রান্ত
জাতিফুলে উপবন ধরে শুক্ল ভাসে।

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী
বিকশিত নবকাশ শ্বেতবাসোবসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং
প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ (ঋতু ৩।২৬)

বিকচ কমলাননা নীলোৎপল সুনয়না
ফুল্ল নবকাশ ফুলে পরিশুভ্রবাস,
কুমুদিনী শোভা ধরি শরৎ করুক মরি
মত্তনারী সম হৃদে প্রীতির বিকাশ।

অভিধান :—

(হেমচন্দ্র) কাশ, ইষীকা [ইহা এক প্রকার তৃণের নাম]।

(হলায়ুধ) ইষীকা কাশ উচ্যতে—A kind of reed (Saccharum spontaneum).

(বৈজয়ন্তী) দর্ভোঽশ্ববালঃ কাশিন্যা কাশোঽস্ত্রী স্ত্রীক্ষুগন্ধিকা—অর্থাৎ দর্ভ, অশ্ববাল, কাশি, কাশ, ইক্ষুগন্ধি—ইহারা একার্থ বাচক। Sacrificial grass, Poa cynosuroides।

(অমর)—অথ কাশমস্ত্রিয়াং। ইক্ষুগন্ধা পোটগলঃ। অর্থাৎ কাশ, ইক্ষুগন্ধা, পোটগল—একার্থ বাচক। ইহার সাধারণ নাম কাশিয়া বা কেশ্যা; আমাদের চিরপরিচিত 'কেশে'।

শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়—এ'গুলিও কাশের পরিচায়ক সংজ্ঞা।

ভাষানাম :—বাং—কেশে। হিন্দুস্থানে—কাংস। মহারাষ্ট্রে—কসল, লঘুকসল, থোর কসল। কর্ণাটে—কিরীয়কাগছু, কডসু, কাজলু। তৈলঙ্গে—রেলু। কোঙ্কণে—কসাড়। গুজরাটে—কাংসড়ো। ল্যাটীনে—Coxbavarta। বোটানিক্—Saccharum spontaneum বা সাচরম্ স্পন্টেনিয়ম্।

কাশ বাঙলার সর্ব্বত্র 'কেশে' নামে সুপরিচিত। ইহা আর্দ্র ও নিম্নভূমি, খাল, পবল বা নদীর ধারে প্রায়শঃ জন্মায়। নদীর ধারে জন্মায় বলিয়া নিঘণ্টুকার ইহাকে 'নাদেয়' বলিয়াছেন। কাশের ফুল শরতে ফোটে। কালিদাস ইহাকে শরতেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অপর্য্যাপ্ত ফোটে বলিয়াই মহাকবি এই কাশফুলকে শরৎসুন্দরীর শ্বেতবস্ত্র করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দ

দগ্ধ—Burnt

দাহ, দহন—Burning

দণ্ড—Measure of time i.e., 24 minutes

দণ্ডাপতানক—Rigid spasm ; epilepsy with convulsion

দদ্রু, দদ্রুক, দর্দ্দ্রূ, দদ্রূক—Ringworm

দদ্রুঘ্ন, দদ্রূঘ্ন—Antidote for ringworm

দদ্রূণ, দদ্রুণ, দর্দ্রূণ, দদ্রুরোগী, দদ্রূণ—A man suffering from ringworm

দধি—Curd

দধিকূর্চ্চিকা—Particles of curd

দধিচার—Churning rod

দধিজ, দধিসার—Butter
দধিস্বেদ, দধিমণ্ড—Whey
দন্ত, দশন—Tooth
দন্তকাষ্ঠ—Tooth-wood
দন্তকীট, দশনকৃমি—Tooth-worm
দন্তকোষ—Socket of teeth
দন্তখালন—Looseness of teeth
দন্তঘর্ষ—Gnashing of teeth
দন্তচ্ছদ, দন্তবস্ত্র, দন্তবাস—Upper lip
দন্তবৈদর্ভ—Looseness of tooth with inflammatory swelling of the gum
দন্তধাবন—Cleansing of teeth
দন্তনাড়ী—Dental sinus
দন্তপুপ্পুট—Gum boil
দন্তবর্দ্ধন—Extra tooth ; eruption of the wisdom tooth
দন্ত-বেদনা, দালন, দন্তশূল, দন্তশূল, দাল্ল —Tooth-ache
দন্তভেদ—Cracking of teeth
দন্তমূল—Roots of tooth
দন্তার্ব্বুদ, দন্তমূল, দ্বিজব্রণ, দন্তশোফ —Swelling of gums
দন্ত্য—Dental
দন্তরোগ—Diseases of teeth
দন্তরোগী—Man suffering from diseases of teeth
দন্তলেখা—Tooth-scaler
দন্তবেষ্ট, দন্তমাংস, দন্তশিরা—Gum ; inflammation of socket
দন্তশর্করা, দন্তমল—Sordes ; tartar of the teeth
দন্তশঙ্কু—Tooth-forceps ; toofh-scaler
দন্তশোধনী—Tooth pick
দন্তসেবনী—Sutura dentata
দন্তহর্ষ—Sensitive tooth
দন্তহীন—Toothless
দন্তাগ্র—Point of a tooth
দন্তাদ—Tooth eating worm
দন্তুর—Having prominent tooth
দন্তোদ্ভেদ—Dentition
দবথু—Inflammation of the eye
দ্বন্দ্ব—A kind of disease
দ্বন্দ্বজ জ্বর—Fever due to two deranged *doshas* or humours
দ্ব্যণুক—Binary
দর্ভপুষ্প, দর্ভকুসুম—A kind of intestinal worm
দম্পতি—Husband and wife
দমিত—Trained
দ্রব—Liquid substance
দ্রবস্বেদ—Moist fomentation ; hot bath
দ্রবাঞ্জন—Liquid collyrium
দ্রবার্হ—Fusible
দ্রবীকরণ—Liquification
দর্ব্বী, দর্ব্বি, দর্ব্বিক, দর্ব্বিকা—Large spoon ; a ladle
দর্ব্বীকর, দন্দশূক, দীর্ঘজিহ্ব—Sna ke
দশমাস্য—Ten months' child
দশমী—The tenth stage of life
দশমীস্থ—Moribund condition ; 90 to 100 years of life
দশমূল—A medicament composed of ten roots

দর্শন—Eyes ; to see

দশা—Ten stages of life

দশাঙ্গ—Ten members of the horse's body

দস্র—Name of one of the Asvins

দহনীয়, দাহ্য, দহনার্হ—Inflammable

দহ্রাগ্নি—Digestive fire

দক্ষিণ কর্ণ—Right ear

দক্ষিণ চক্ষু—Right eye

দক্ষিণ নাসিকা—Right nose

দক্ষিণ-পদ—Right leg

দক্ষিণ পার্শ্ব—Right side

দক্ষিণ হস্ত—Right hand

দংশ—Gnats

দংশন—Biting

দংশী—Smaller variety of gnats

দংষ্ট্রা—Canine tooth

দাকোদর যন্ত্র—Trocar and canula

দাকোদর—Dropsy

দাতব্য—Charitable

দারণ—Incison ; the act of tearing, lacerating or splitting

দারিত—Incised

দারী—One of the minor diseases

দারুহস্তক—Wooden hand

দারুণক—Hard and dry roots of hairs with itching sensation ; ringworm of scalp ; tænia versicolor of scalp

দারদ, দিব্যরস—Mercury

দ্রাবক—Solvent

দ্রাবিকা—Saliva

দাল—Pulse

দালব—A sort of poison

দ্ব্যাহিক—Fever lasting for two days ; tertian fever

দাহ—Burning of body

দাহক—Inflammation

দাহজ্বর—Inflammatory fever

দিগ্ধ—Poisoned arrow

দিক্ষ—Eggs of louse

দিগু—Warm breath with burning sensation of the nostrils

দিব্যচক্ষু—Supernatural vision

দিব্যজ্ঞান—Supernatural knowledge

দ্বিতাল—Double pick-lock-like instrument

দ্বিব্রণ—The two kinds of ulcers, Idiopathic and traumatic

দিবান্ধতা—Nyctalopia ; hemaralopia

দিব্যা—Nurse

দিব্যোদক—Rain water

দ্বিমুখ—A kind of intestinal worm ; distomidæ ; flukes

দ্বিহায়নী—A cow two years old

দিষ্টান্ত—Death

দীর্ঘ—Long

দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ু—Long-lived

দীর্ঘতুণ্ডা—Mole

দীর্ঘনিশ্বাস—A sigh ; long breath

দীর্ঘবক্ত্র—Long-mouthed knife

দীর্ঘাস্থি—Long bone

দীপন—Digestive

থ—Panther forceps

দুঃখ—Disease

দুঃখবর্দ্ধন—Painful suppuration of an ear-lobe due to ear pulling

দুগ্ধ—Milk

দুর্গন্ধ—Bad smell

দুর্ব্বল—Weak

দুর্ম্মনোজ্ঞান—Science of symptoms of approaching death in healthy horses

ধ্মাত—Inflamed

দুশ্চর্ম্মণ—Attacked with a skin disease ; rough skin ; nodular leprosy

দুশ্চর্ম্মা—One having his glans penis uncovered ; urticaria

দুষ্পচ—Indigestible

দুষ্টব্রণ—Malignant ulcer

দুষ্টরক্ত—Disease caused by deranged blood

দুষ্ট ক্ষুধা—Malacia

দুষ্পাচ্য—Difficult to digest

দুষ্যোদর—A disease in which the patient becomes pale, yellow and emaciated due to slow poisoning

দূত—Messenger from patients

দূষি, দূষিকা—Rheum of the eye

দূষীবিষ—Slow poison whose active properties have been mitigated

দৃতি—Leather jars for honey, curds etc

দৃষ্টি—Eyes ; vision ; sight

দৃষ্টিমণ্ডল—Field of vision

দেবদত্ত—One of the five vayus (vital air)

দেবমাস—Eighth month of pregnancy

দেবহূ—Left ear

দেশিনি—Index finger

দেহ—Body

দেহকূপ—Vagina

দেহধারক—Bones

দেহসার—Marrow

দেহক্ষয়—Disease

দেহী—Living being ; corporeal

দৈব—Divine ; accidental

দৈহিক—Corporal

দ্রোণ, দ্রোণি দ্রোণী—Bucket measuring 32 seers ; a tub 1½ cubits long and high

দোর্ম্মধ্য—Middle of arm

দোর্ম্মূল—Axilla

দোলন—Oscillation

দোষ—Humour

দোষত্রয়—*Vayu*, *pitta* and *kafa*—the three humours

দোষহরবস্তি—Enema to rectify deranged humour

দোহন—Milking

দোহদ, দৌর্হৃদ—The longing of a pregnant woman

দোহদ লক্ষণ—Signs of pregnancy

দোহদবতী—Pregnant woman longing for food

দৌর্গন্ধ্য, দুর্গন্ধতা—Bad smell

দৌমনস্য—Mental pain

ধন্বন্তরি—The name of heavenly physician ; the originator of medicinal science

ধনুবৎ—Curved

ধনুষ্টঙ্কার, ধনুস্তম্ভ—Tetanus

ধ্বজভঙ্গ—Impotency

ধমনী, ধমণি, ধমনী—Artery

ধর্ম্মশালা—Hospital

ধম্মিল্লক—Pons varolii

ধান্যাম্ল—Fermented gruel from paddy

ধাত্রী—Mother ; nurse ; midwife ; wet-nurse

ধাতু—Elements ; the root principles of the body ; metal

ধাতুপ—Chyle

ধাতুপুষ্ট—Nutritious

ধাতুরাজক—Semen

ধাব—Cleansing the teeth

ধাবিত—Running of horses

ধাবণ—Lotion

ধারোষ্ণ—Tepid milk just drawn from the udders of the cow

ধূম্রদৃষ্টি—Smoky sight

ধুম—Cynaache tonsillaris

ধূলক, ধূনা—Resin

ধূপ—An aromatic vapour from the burning of an incense

ধূপিত—Fumigated

ধূমনাড়ী—Pipe used for inhalation

ধূমপান—Inhalation

ধেনু—A milched cow which has lately calved

ধেনুকা—Mother with a living son

নকুলান্ধ, নকুলান্ধতা—Variagated sight ; multicoloured vision in day-time

নক্তব্রত—A vow to eat only in the night

নক্তান্ধতা—Night-blindness ; hemaralopia

নখ—Nails

নখচ্ছেদ—The pairing of the nails

নখরঞ্জনী, নখশস্ত্র—Instrument for pairing nails ; nail clipper

নখভেদ—Cracking of nails

নখশূল—Whitlow

নখাদ—Nail-eating worms

নখী—A bivalve shell used as a medicine or perfume

নগ্ন—Naked

নচ্ছ—Dirty water

নতনাসিক—Small-nosed ; having a depressed nose

নথ্‌ করণী—Nose-spoon

নন্দিমুখ—A cruciform instrument

নপুংসক—Eunuch ; hermaphrodite

নবগ্রহ—Nine planets causing diseases of infant life

নবজ্বর—A new attack of fever lasting generally for nine or ten days ; acute fever

নবদ্বার—Nine vents in the human body

নবনী, নবনীত—Fresh butter

নবনীতক—Ghee

নবপ্রসূতিকা—Newly delivered

নবান্ন—New rice

নমনীয়—Flexible

নয়কণ্ঠ—Nipple

নচ্ছ—Chloasma ; lentigo

নরসার—Sal-ammoniac

নল, নাল—Tube

নলক, নলকাস্থি—Cylindrical long bones ; hollow bone

নলকিনী—Leg ; knee-pan ; patela

নলকীল—Knee

নলাম্বু—Bronchial

নলিকা, নাড়ি, নাড়ী—Nerves ; vessels

নষ্টপ্রসূতিকা—Mother of still-born child

নসা, নাসিকা, নাসা, নক্রটক, নস্ত নস্যা, নাসিক্যক, নাসিক্য } —Nose

নস্য, নস্ত—Snuff ; hairs in nose

নস্তোত, নস্তিত, নস্তা—Perforation in the nose of heifer

নলি [illegible]—A constipation of the bowels

নষ্টরক্ত—Amenorrhœa

নয়ন—Eye

নয়নবর্ত্ম—Eyelids

নয়নবুদ্বুদ—Eyeball

নয়নাম্বু, নেত্রাম্বু—Tears

নয়নী—Pupil of the eye

নয়নোপান্ত নেত্রপর্যন্ত—Outer corner of the eye

নাভি—Navel

নাভিগুড়ক, নাভিকণ্টক—Naval hernia ; fleshy navel

নামন—Depression

নালী, নালীব্রণ, নাড়ীব্রণ—Fistula

নালী, নাড়ী—Vessels

নাসত্য—One of the Asvins,—the twin physicians of the gods

নাসারোগ, নাসাগত রোগ—Diseases of nose

নাসাজ্বর—Nasha fever

নাসানাহ, নাসাপ্রতিনাহ—Stuffiness of the passages of the nostrils due to a surcharge of phlegm

নাসাপরিস্রাব—Fluent coryza

নাসাপাক—Suppuration in the nostrils ; pustute in nose

নাসাপুট—Alæ nasi

নাসাবংশ—Nasal bone

নাসার্বুদ—Nasal tumour

ন্যাক্য—Fried rice ; *mudi*

নাসিকা, নাসারন্ধ্র—Nostrils ; nares

নাসার্শ—Nasal polypus

নাসাশোষ, নাসাপরিশোষ—Parchedness of the nostrils

নাসাস্রাব—Nasal discharge

নাসিকাপান—Nasal drinking
নাসিকধ্বন—Snoring
নাসিকামল—Snot ; mucus of the nose
নাড়ীকন্দ—Nerve ganglion
নাড়ীকেন্দ্র—Nerve centre
নাড়ীচক্র—Plexus of nerves
নাড়ীপুরীতৎ—Pericardial sac
নাড়ীব্রণ—Sinus
নাড়ীস্বেদ—Application of medicated fumes through a pipe
নির্ঘাতন—Withdrawal of a foreign body by moving it to end fro
নির্জ্জন্ন—Cranium
নিতম্ব—Hip or buttock
নিদান—Pathology ; Ætiology or cause
নিদ্রা—Sleep
নিদ্রালু—Sleepy
নিদিধ্যাসন—Desire to fix the mind intensely on an object
নিপান—Stone reservoirs for drinking water for animals
নিবন্ধ—Flatulence
নিবাত—A room not exposed to strong wind
নিবার—A kind of unhealthy rice
নিৰ্বেধ—Marrow inside the cranium
নিমজ্জন—Bathing ; immersion
নিমিষ, নিমেষ—Blepharo-spasm ; closing and opening of eyelids
নির্ধাপক—A disease of the corner of horse's eye
নির্যাস, নির্য্যাস—Extract
নিরঞ্জন—Pure ; free from antimony or collyrium
নিরব, নীরব—Silent
নিরম্বু—Destitute of water
নিরাজন, নিরাজনা—Expiatory ceremonies for bliss and peace of horses and elephants
নিরুদ্ধপ্রকাশ—Stricture of urethra ; phimosis
নিরুদ্ধগুদ—Stricture of rectum
নিরূহবস্তি—Application of a clyster
নিরূহবস্তি—A variety or clyster
নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠীব, নিষ্ঠেব, নিষ্ঠ্যুবি, নিষ্ঠ্যুতি, নিষ্ঠেবন—Spittle
নির্হরণ—Cremation
নির্হার—Extraction of foreign body
নিঃশ্বাস—Breath ; respiration
নিঃসরণ—Going out ; death
নিঃসারণ—Expressing the juice of fruits
নিক্ষা—Louse ; nit
নিয়তি—Necessity ; destiny
নীর—Water
নীরজ—Aquatic
নীরদ—Yielding water
নীরস—Juiceless
নীরুক, নীরুজ—Healthy ; a man without a disease ; sound
নীলকণ্ঠ—Having a blue throat
নীলাঞ্জন—Antimony ; blue vitriol
নীলমেহ—A kind of morbid secretion

of urine ; blue coloured urine

নীলাস্থু—A kind of worm

নীলিকা—Black spots on face; cataract

ন্যুব্জদেহ—Hunch-backed

নৃপাময়—Phthisis

নেত্র—Eye ; enema-tube

নেত্রদোষ—Defects of the pipe of an enema ; defects of eye

নেত্রনাড়ী—Lachrymal fistula

নেত্রপিণ্ড—Eye-ball ; eye compress

নেত্রপুট, নেত্রচ্ছদ—Eyelids

নেত্রবর্ত্ম—Conjunctiva

নেত্রবস্তি—The pipe, nozzle and apparatus of an enema syringe

নেত্ররঞ্জন—Collyrium

নেত্ররোগ, নেত্রাময়, চক্ষুরোগ—Diseases of eye

নৈচিক—Head of a cow

নৈগমেষগ্রহ—One of the nine diseases causing planet

অরন্ধন বা আরন্দ

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে প্রচলিত অম্বুবাচীর সময়ে আষাঢ় মাসে যেমন তিন দিনব্যাপা পাক-নিষেধের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তেমনি ভাদ্র মাসেও একদিন পাক করিবার নিষেধ আছে। অন্য কথায় অম্বুবাচীর সময়ে এবং "অরন্ধন" বা চলিত কথায় "আরন্দের" দিন পাক করিতে নাই। ঐ পাকাভাব যদি কন্যাসংক্রান্তি অর্থাৎ আশ্বিনসংক্রান্তিতে হয়, তবে তাহাকে "বৃদ্ধারন্ধন" বলে। তত্তু কন্যাসংক্রান্ত্যাং কৃতং চেৎ, বৃদ্ধারন্ধনং কথ্যতে। এই অরন্ধনের চলিত ভাষাগত নাম আরন্ধ বা আরন্দ। এই অরন্ধন ভাদ্র মাসের যে কোন দিন ইচ্ছাস্বরূপ করিলে তাহার নাম "ইচ্ছা আরন্দ"। সৌর ভাদ্রস্য যস্মিন্ কস্মিন্ দিনে কৃতং চেৎ, ইচ্ছারন্ধনং ইত্যুচ্যতে ইতি লোক প্রসিদ্ধম্। এই দিনে কর্কান্ন বা বাসী ভাত খাইতে হয়। কর্কান্নং অদ্যাৎ সিংহার্কে সিংহান্নং সিংহকন্যয়োঃ, মনসা শেষ নাগেভ্যো দত্বা সর্ব্বং নিশোখিতং ইতি আচারমার্ত্তণ্ড-ধৃতবচনং। ভাদ্র মাসে সূর্য্য সিংহ রাশিতে অবস্থান করেন এবং আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন মনসা পূজার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে এই অরন্ধন শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। ইহা একটি প্রাচীন প্রথা মাত্র। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের মধ্যে ইহার স্থান নাই। কাশকুসুম দিয়া মনসার পূজা করিতে হয়।

কর্কান্ন শব্দে কড়্‌কড়ে অর্থাৎ বাসী ভাত বা শুষ্ক অন্ন বুঝায়। কড়্‌কড়ে ভাত অপেক্ষা

জলে ভিজান বা পান্তাভাত একটু স্বাদু বলিয়া অরন্ধনের দিনে পান্তাভাতের ব্যবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, এই অরন্ধন অনার্য্য প্রথা। আর্য্য জাতির শাখা-প্রশাখা অনার্য্যগণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে করিতে এই অরন্ধনের প্রথা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এদেশে পূর্ব্বে আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের বিরোধ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। পরে মৈত্রী স্থাপিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রথা অবাধে গ্রহণ করিয়া ফেলেন। আরন্দের পান্তাভাতের তরকারি হইতেছে প্রধানতঃ শাক, কচু ও ওল। সাঁওতালপ্রমুখ অনার্য্যগণ আজও এইরূপ তরকারি নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা আমাদের মত আলু-পটলের মুখাপেক্ষী নহে। আমরা দেখিতে পাই, যখন দুইটি বিরোধী জাতি পরস্পরের সহিত ক্রমে কতকটা মিলনের দিকে অগ্রসর হয়, তখন পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একের আচরণ অন্যে কতকটা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া ফেলে। পশ্চিমাঞ্চলে মহরমের সময় হিন্দুরাও মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়া গোঁয়ারায় লাঠি খেলিয়া থাকে—ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। গভীর চিন্তাশীল ইমারসন্ সাহেব তাঁহার Ability নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যথাক্রমে সাক্সন, পরে ডেন্‌স জাতি ও তৎপরে নর্ম্মাণগণ আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। প্রথম অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিতে থাকে। ক্রমে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। সাক্সন্‌গণ নর্ম্মাণ জাতির নিকট পরাজিত হইলেও "They had managed to make the victor speak the language and accept the law and usage of the victim", অর্থাৎ তাহারা নর্ম্মাণ-বিজেতাগণকে বিজিতগণের (সাক্সন্‌গণের) ভাষা ও প্রথা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। আমাদের দেশে অনেক অনার্য্য দেবতাদের পূজা-পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পল্লবিত করিয়া ও তাহাকে নূতন আকার দিয়া আমাদের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছি—ইহা অনেক চিন্তাশীল ও গবেষণা-পরায়ণ ব্যক্তির অভিমত। তান্ত্রিক যুগে ইহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই অনেকে বলিতে চান যে, অনেক অনার্য্য দেবতা আর্য্যপরিচ্ছদে এদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছে; এবং উহার প্রভাবে প্রাচীন অমূর্ত্তের পূজা বিবিধ মূর্ত্তির পূজায় পরিণত হইয়াছে।

গীতাকার ১৭ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে সাত্ত্বিক আহারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ৯ম শ্লোকে বলিতেছেন—কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ রুক্ষ, ক্ষার হইতেছে রাজসিক আহার এবং ১০ম শ্লোকে বলিতেছেন,

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।

অর্থাৎ রন্ধনের পরে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় যাহা বাসী, যাহা রসহীন বা স্বাদহীন, যাহা পচিয়া গিয়াছে, পান্তাভাত, উচ্ছিষ্ট অন্ন, অপবিত্র খাদ্য—ইহা হইতেছে তামস আহার। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পান্তাভাত তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের আহার; তাহা সত্ত্বেও আরন্দের পান্তা ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষে ব্যবস্থেয় হইল। প্রথা বলিয়া একটি সামগ্রী

আছে, যাহা ধীরে ধীরে সমাজের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার বল সামান্য নহে। উহার প্রভাব অনেক সময়ে ধর্ম্ম, নীতি ও সংযমের ভাবকে অনেক বিষয়ে অতিক্রম করে। অনেকে বলেন, প্রথা শাস্ত্র অপেক্ষাও বলবান। তাই দেখিতে পাই তামসপ্রকৃতিসম্পন্ন অনার্য্য জাতির যে আহার কচুর শাক, ওল ও পান্তাভাত, তাহা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক দিন আর্য্যগণ তাঁহাদের ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে বক্তব্য, যে আর্য্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বপ্রথমে অনার্য্য প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতিনিবন্ধন আপনাদের মধ্যে অরন্ধনের প্রথা প্রচলন করেন; পরে সেই বংশের সন্তানসন্ততি সেই প্রথা অবাধে রক্ষা করিয়া চলিয়া আসেন; এবং ক্রমে তাহা সেই পরিবারের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অন্যে এই পরিবারের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য এবং একই নিয়মে বা ঐক্যে গ্রথিত হইবার জন্য নিজেদের মধ্যে অরন্ধন প্রথা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং তাহাদের মধ্যে ইহা ইচ্ছা-রন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অরন্ধনের দিনে মনসা পূজার ব্যবস্থা আছে। সর্পভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই মনসা পূজার ব্যবস্থা। অরন্ধনের সময় এই মনসা পূজা কাশ-পুষ্পে সম্পন্ন হয়। এই সময়ে উচ্চ মাঠ, যেখানে ধান্যরোপণ অসম্ভব, কাশপুষ্পে ভরিয়া যায়। ইহা অনায়াসলভ্য, জবা বা অন্য পুষ্পের ন্যায় সেরূপ দুর্লভ নহে। এই অরন্ধন সময়ে অনুষ্ঠিত মনসাপূজায় সংযমের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় এবং কাশপুষ্পে মনসার পূজা হইতে থাকায় এই পূজা মূলে যে অনার্য্যসেবিত—এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

এই অরন্ধনের সময় উনুনের বা চুলার ভিতরে মনসা গাছের একটি ডাল পুরিয়া দিতে হয়। অবশ্য উনুনে অগ্নি থাকে না। ঐ উনুনের চারিপার্শ্বে আলপনা দিয়া ৮ টি সর্পের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হয়। ঐ আটটি সর্পের নাম—

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোথ তক্ষকঃ
কুলীর কর্কটঃ শঙ্খো অষ্টো নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতা।

কেহ কেহ বলেন—অনন্ত অর্থে ময়াল, বাসুকি গৃহসর্প, পদ্ম অর্থে কেউটে, মহাপদ্ম অর্থে গোক্ষুরা বা গোকুরো, কুলীর অর্থে বিচু, কর্কট কাঁকূড়া বিচে বা কাঁকড়া, শঙ্খ অর্থে শঙ্খিনী বা শঙ্খচুর।

মনসাপূজার সংকল্প হইতেছে—"অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামো মনসা দেবীপূজামহং করিষ্যে, ইতি সঙ্কল্প্য স্নুহীবৃক্ষে পূজয়েৎ।" স্নুহীবৃক্ষের অপর নাম সিজবৃক্ষ বা মনসা গাছ। তাহার পর অষ্ট নাগের পূজা করিতে হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেন—"অশক্তৌ, গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ, নিম্বপত্রাণি গৃহে স্থাপয়েৎ"। পূজায় অশক্ত হইলে গন্ধ ও পুষ্প দিলেই পূজা হইল। গৃহে নিম্বপত্র রাখিলে তাহার কটু গন্ধে সর্প গৃহ হইতে পলাইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। মনসা পূজায় ৮ টি সর্পের উপর আরও কয়েকটি সর্পের নামের ও তাহার পূজার ব্যবস্থা রঘুনন্দনস্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মনসাদেবীর প্রণাম মন্ত্র এই—

আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জগৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে।

এই মনসা কশ্যপের মানসকন্যা "কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী"; এই মনসা "নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী"। পরেই বলা হইয়াছে—"নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ"। মনসাকে নাগেশ্বরী ও নাগ-ভগিনী দুইই বলে। ইনি আস্তীকের মাতা, জগৎকারুর পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যস্থানের (বা দ্রব্যগুণের) ভিতরে সুহী বা মনসা বৃক্ষের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়—"ইহা জ্বর, শূল, কফ, গুল্ম, মূর্চ্ছা অর্শাদি রোগে প্রযোজ্য; "ব্রণ শোথ জ্বর প্লীহ বিষ দূষী বিষং হরেৎ"। অধিকন্তু মনসা বৃক্ষের মূলের ত্বক ও নির্য্যাস দ্বারা বিষ ও দূষী-বিষ বিনষ্ট হয়। ইহার মাত্রা ২ মাষা মাত্র। এই ঔষধ বিরেচনীয় বর্গের অন্তর্গত। সম্ভবতঃ প্রাচীন সময়ে এই মনসাবৃক্ষের মূলের রসে বিশেষ ভাবে সর্পবিষের চিকিৎসা চলিত, তাই সর্পভয় হইতে রক্ষা পাইবার কারণ অরন্ধনের সহিত মনসা পূজার যোগ পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ পুরাণের যুগে সংযোজিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অরন্ধন একটি প্রথা মাত্র এবং প্রথা বলিয়াই ইহা চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার তাঁহার অদ্ভুত কল্পনাবলে মনসার যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, আমাদের বুদ্ধিতে তাহা দুর্ভেদ্য। এই দিনে বিশ্বকর্ম্মা পূজার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উহার সহিত অরন্ধনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

বিবিধ

ইটালি দিগ্বিদিকে

মুসোলিনির নবীন ইটালি দিকে দিকে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। আমরা রাষ্ট্রীয় জীবন-চাঞ্চল্যের কথা বলিতেছি না। মস্কোর ব্যবস্থা লইয়া রাজনীতিজ্ঞেরা আলোচনা করুন। বিজ্ঞানের দিক হইতে আমরা দেখিতেছি যে, বায়ুপথে মুসোলিনির স্বদেশবাসী কোনও কিছু আবিষ্কারের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। একজন ইটালি হইতে বাহির হইয়া ভূমধ্যসাগর ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কোথাও না থামিয়া সোজা পাঁচ হাজার মাইল একদমে পার হইয়া যাওয়া—ইহার পূর্ব্বে আর কাহারও সামর্থ্যে কুলায় নাই। ওদিকে একটি নব-নির্ম্মিত ব্যোমতরী আরোহণ করিয়া কয়েকজন পণ্ডিত উত্তরমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বিগত মে মাসে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রেডিও যন্ত্র ছিল। উত্তরমেরুর বরফপিণ্ডের মাঝে তরীখানি দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আর তাহাদের বে-তার সংবাদ পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন গেল; সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; দেশ-বিদেশ হইতে বায়ুযান ছুটিল। কেবল এইটুকু শেষ খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, "ইটালিয়া" তরীখানি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর অভিযান-কারীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিতে থাকেন। তারপর একেবারে নিরুদ্দেশ। প্রবীণ এমাণ্ড্‌সেন অন্বেষণে বাহির হইলেন। পূর্ব্বে কত বার তিনি এই পথে যাতায়াত করিয়াছিলেন; কিন্তু এবার আর তিনি ফিরিলেন না। গভীর পরিতাপের বিষয়, —সন্দেহ নাই। শেষে রুশিয়ার "ক্রাসিন" জাহাজ বরফ ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া চলিল। "ইটালিয়া"র অধ্যক্ষ জেনারল্ নোবিলকে প্রথমে তুলিয়া আনা হইল। পরে আরো কয়েকজন রক্ষা পাইলেন। কেবল সুইডেনের একজন পণ্ডিত একমাস পূর্ব্বে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বল্‌শেভিক রুশিয়াকে যাহারা অসভ্য হিংস্র বর্ব্বর প্রতিপন্ন করিতে এতদিন সচেষ্ট ছিল, আজ তাহারা মাথার টুপি খুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতেছে। দেশ-বিদেশের পত্রিকায় এই বিষয় লইয়া মুসোলিনির বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতেছে। কিন্তু ইটালি জাগিয়াছে; তাহার সমস্ত পৌরুষ দিগ্বিজয়চেষ্টায় আজ প্রবুদ্ধ; বিজ্ঞানের নানা প্রকোষ্ঠে সে তত্ত্বান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণপণে কার্য্য সাধিতে তৎপর। মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে,—এ'শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, মনুষ্যত্বের সাধনায়।

ভারতের ম্যালেরিয়া-দমনে স্যর্ মালকম্ ওয়াট্‌সন্

সম্প্রতি স্যর্ মালকম্ ওয়াট্‌সন্ লণ্ডনের 'Ross Institute for tropical diseases' প্রতিষ্ঠানের ম্যালেরিয়া-দমনবিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যর্ মালকম্ প্রাচ্য অঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাশালী ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ। মালয়রাজ্যের ম্যালেরিয়া-দমনে তিনি সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহার চেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার আকর মালয়রাজ্য মালকমের ঐকান্তিক চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং কার্য্য-কুশলতায় আজ ম্যালেরিয়া-বিমুক্ত স্যানিটরিয়াম্। খ্রীঃ ১৯২৪ অব্দে ম্যালেরিয়া-গবেষণার বিশিষ্টতার জন্য তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। বিগত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসামের চা-বাগিচায় ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য পরামর্শ দিয়া গিয়াছিলেন। আগামী নভেম্বর মাসে এ'দেশের ম্যালেরিয়া-নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য স্যর্ মালকম্ ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার মালকমের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিবেন,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে মালকমের উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি দীর্ঘ-কাল এদেশে থাকিয়া ভারতকে মালয়রাজ্যের ন্যায় ম্যালেরিয়া-মুক্ত করুন—ইহাই বাঞ্ছনীয়।

মিঃ পপভ এবং প্রাচীন মহাদ্বীপের মরু-অঞ্চলের উদ্ভিদাদির ইতিহাস

প্রসিদ্ধ রুষ উদ্ভিদ্‌বিৎ মিঃ এম, জি, পপভ মধ্য-এসিয়ার মরু-অঞ্চলের উদ্ভিদের আলোচনা

করিয়া প্রাচীন মহাদ্বীপের মরু-অঞ্চলের উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পপভ মনে করেন—মরুভূমির আদি উদ্ভিদ্ ক্রিটেশস্, এমন কি, জুরাসিক যুগেও ছিল। ঐ সময় Welwitchia, Ephedra প্রভৃতি ধরণের উদ্ভিদ্ পাওয়া গিয়াছিল; এবং তাহাদের কেন্দ্রস্থল গণ্ডয়োনা মহাদেশের মধ্যস্থল। পূর্ব্বোক্ত মহাদেশ লয় পাওয়ায় প্রধান মরু-অঞ্চল দক্ষিণ প্রান্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; সেখানে ক্রিটেশস্ যুগে ভূখণ্ডের ধারাবাহিক সংযোগ ছিল, কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদাদির সহিত মরু-অঞ্চলের উদ্ভিদাদির অদল বদল সম্ভবপর ছিল। ঐ সময়ে Zygophyllaceae, Geraniaceae, Rulaceae, Capparidacea প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদের প্রসার ছিল। তখন আবার আফ্রিকা মহাদেশ লেমুর দিয়া ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মরু-অঞ্চলের উদ্ভিদাদি দক্ষিণ ভারত দিয়া মধ্য-এসিয়ায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। এ'দিকে মরু-উদ্ভিদ্ আফ্রিকার উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া থেটিস্ (Thetis) সমুদ্রের দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত পৌঁছে; থেটিস্ সমুদ্র সাহারা মরুর স্থানে অবস্থিত ছিল। আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে মরু-বৃক্ষাদি যেমন উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা পূর্ব্ব আফ্রিকার সংযোগস্থল দিয়া পশ্চিম এশিয়ায়াও বিস্তারলাভ করে; এই উপায়ে এরিকা (Erica) বৃক্ষ দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত হয়। লেমুর-যোজক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার মরু-অঞ্চল এশিয়া হইতে পৃথক হইয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের ফলে মেডিটারেনিয়ন্ উদ্ভিদাদির উদ্ভব হইল। পপভের অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে; অনেক অজানা বিষয় জানা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

বৃটিশ এসোসিয়েসনের অধিবেশন

স্যর্ উইলিয়ম্ ব্র্যাগের সভাপতিত্বে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই হইতে ১২ই—এই আট দিন ব্যাপী গ্লাসগোয় বৃটিশ এসোসিয়েসনের অধিবেশন বসিবে। খ্রীঃ ১৯০১ অব্দে (অর্থাৎ সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে) আর একবার এই এসোসিয়েসনের অধিবেশন গ্লাসগোয় হইয়াছিল। এবারের আমন্ত্রণও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহরের তরফ হইতে পাঠান হইয়াছে। সভাপতির বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন শাখার কার্য্যাবলি হইতে জানা গিয়াছে যে, "পদার্থ দিয়া ইলেকট্রনের প্রতিবিম্ব", "Radiation-এর আলোকচিত্র এবং পরিমাপ কিরূপে সম্ভবপর হইবে",—তাহার আলোচনা চলিবে। অধ্যাপক জে, এল, মায়ার্স আধুনিক শিক্ষায় প্রাচীন ভূগোলের উপকারিতা কি, তাহার আলোচনা করিবেন। অধ্যাপক টি, এইচ, পিয়ার "কার্য্যনিপুণতার প্রকৃতি কিরূপ"; স্যর্ উইলিয়ম্ এলিস্ "নব্য সভ্যতার উপর পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যের কতটা প্রভাব আছে"; স্যর জর্জ্জ ম্যাকডোনাগু, "স্কট্ল্যাণ্ডের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে" এবং অধ্যাপক এলিন্ ইয়ং "অর্থনৈতিক উন্নতির পন্থা কি কি" —তাহা আলোচনা করিবেন। ডাঃ সাইরিল্ নরউড্ শিক্ষা-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ

করিবেন। শিক্ষা-ব্যাপারে বেতার-বার্ত্তা-প্রচার কতটা কার্য্যকরী, সে বিষয়ে আলোচনা হইবে। সম্মিলনে যে কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গই চলিবে, তাহা নহে; আমোদ-আহ্লাদের যথেষ্ট আয়োজনও হইয়াছে। করপোরেশন্ এবং ইউনিভারসিটির তরফ হইতে অভ্যর্থনার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্, পুরাতত্ত্ববিদ্, এঞ্জিনিয়ার, পদার্থবিজ্ঞানবিদ্, রসবিজ্ঞানবিদ্ প্রভৃতি সকলেরই জন্য চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপক স্থান এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠান-সমূহে অভিযানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। গ্ল্যাসগোর সীমানায় ব্যবহারিক বিজ্ঞান কতটা প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার বিশেষ আয়োজন চলিতেছে।

পরলোকে ডাঃ হিডিয়ো নগুছি

বিগত ২১শে মে, ডাঃ নগুছি পীতজ্বরে আথ্রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। পীতজ্বর কিরূপে সংক্রমিত হয় এবং তাহার বীজাণুর প্রকৃতি কিরূপ, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি পীতজ্বরে আক্রান্ত হন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ঠিক এই ভাবে অধ্যাপক আদ্রিয়ান্ ষ্টোকস্ও বিগত সেপ্টেম্বর মাসে পীতজ্বর-গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯০১ অব্দে ওয়াল্টার্ মায়ার প্যারায় পীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিলেন।

ডাঃ নগুছি খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দে জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংক্রামক ব্যাধি-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯০১ অব্দে নগুছি পেন্সিল্ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Pathologyর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যে গিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯১৪ অব্দ হইতে তিনি রক্ফেলার ইন্ষ্টিটিউটে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। বিগত দশ বৎসর যাবৎ নগুছি পীতজ্বরের বীজাণুতত্ত্ব-গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পীতজ্বর ছড়াইয়া পড়িলে তিনি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-বোর্ডের সহযোগিতায় কার্য্য করিয়া ঐ সকল অঞ্চল হইতে পীতজ্বর প্রায় একেবারে তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯১৮ অব্দে ইকোয়ডরে কার্য্য করিবার সময় তিনি একপ্রকার spirochaete আবিষ্কার করেন, যাহা গিনিপিগ্ বা অন্য জীবদেহে বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে পীতজ্বরের সমস্ত লক্ষণই প্রকটিত হয়। উক্ত প্রকার বীজাণু টিম্সন্ একটি মৃত পীতজ্বররোগীর মূত্রাশয়ে(Kidney)দেখিয়াছিলেন। নগুছি ধারণা করিয়াছিলেন যে, Leptospira icteroides নামক spirochaete-র সহিত পীতজ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনি আরও মনে করিতেন যে, পীতজ্বরের বীজাণু মশক দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বিদ্ধ হইয়া যখন নূতন জীবে সংক্রমিত হয়, তখন বীজাণুর আকার এত সূক্ষ্ম থাকে যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার এই ধারণা অনেকের সমর্থন করিবার কারণ এই যে, অনেক spirochaete-র জীবন-ইতিহাসে এমন একটা পর্য্যায় আছে, যাহা অণুবীক্ষণেও অদৃশ্য। নগুছি পূর্ব্বোক্ত

বীজাণুকে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি (culture) করাইয়া তাহার বীজটীকা এবং সীরা (Sera) প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই বীজটীকা ও সীরার চিকিৎসা এবং রোগ-নিবারণে যে কতটা উপযোগিতা আছে, তাহা পরীক্ষা করিবার সন্তোষজনক সুযোগ আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে কি না, তাহা বলা সুকঠিন। যে Leptospiraকে নগুছি পীতজ্বরের বীজাণু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক আড্রিয়ান্ ষ্টোকস্ পশ্চিম আফ্রিকায় পীতজ্বর-গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত প্রকার Leptospiraর সন্ধান পান নাই; বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করেন যে, আমেরিকার পীতজ্বর আফ্রিকার পীতজ্বর হইতে স্বতন্ত্র। পীতজ্বর-গবেষণা ছাড়া নগুছি spirochaete নামক বীজাণুর শ্রেণী-বিভাগ, জীবদেহের বাহিরে তাহাদিগকে কেমন করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায়—তাহা স্থির করিয়াছেন। তিনি মস্তিষ্কের ভিতর হইতে spirochaete pallidaর সন্ধান পান এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পক্ষাঘাত (general paralysis) ব্যাধি উপদংশ হইতে উদ্ভূত। সম্প্রতি তিনি পেরুতে উরুয়া জ্বরের কারণ-নির্দ্দেশে ব্যাপৃত ছিলেন;—ইহার বীজাণু অতীব সূক্ষ্ম এবং রক্তকণাকে আক্রমণ করে বলিয়া অনেকের ধারণা। Journal of Experimental Medicineএ নগুছির ধারাবাহিক প্রবন্ধ হইতে তাঁহার মনীষা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নগুছির তিরোধানে জগৎ একটি বিশিষ্ট ব্যবহারিক বিজ্ঞানসেবী হারাইল; রক্‌ফেলার কমিশনের একটা দিক্‌পাল খসিয়া গেল।

ভিটামিন্-তত্ত্ব

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জৈব রসায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রোগে জীবদেহে কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে; খাদ্যের সহিত রোগের কিরূপ সম্পর্ক; কোন্ কোন্ খাদ্যের অভাবে কি কি রোগের আক্রমণ সম্ভবপর; সেই সকল রোগকে আবার কি কি খাদ্যের দ্বারা উপশমিত করা যাইতে পারে প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক অনুসন্ধান চলিল। বিভিন্ন খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইল। কোন্ কোন্ খাদ্যে কিরূপ সার-পদার্থ আছে, তাহার তালিকা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এমন অনেক জিনিষের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহার প্রকৃত রাসায়নিক উপাদান আজ পর্য্যন্ত খাঁটি জানা গেল না বটে, কিন্তু তাহার সত্ত্বা ধরা পড়িল এবং জৈব খাদ্যে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়; খাদ্যের এই অংশকে বিশেষজ্ঞরা 'ভিটামিন্' আখ্যা দিলেন। বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন্ পাওয়া যায়। ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ হয়, তাহার অনুপাতে বিশেষজ্ঞরা ভিটামিন্‌কে A, B, C, D, E—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভিটামিন "A"—কড্‌লিভার অয়েল (Cod-liver Oil), মাখন প্রভৃতি জৈব খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। খাদ্যে "A" ভিটামিনের অভাব হইলে দেহের অস্থি বিশেষ পরিপুষ্ট হয় না; ফলে রিকেট ব্যাধি হয়। ভিটামিন্ "B"—চাউল, গম, যব প্রভৃতি শস্যের উপরিস্তন খোসায়, আলুর খোসায়, কোন কোন জৈব খাদ্যে ও লেবুর রসে থাকে। খাদ্যে "B" ভিটামিনের অভাব হইলে সংক্রামক

স্কার্ভি এবং বেরিবেরি রোগ হয়। ভিটামিন্ "C"—বাঁধাকপি, আলু, টোম্যাটো ও লেবুতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; মাংস এবং দুগ্ধে স্বল্প পরিমাণে বর্ত্তমান। খাদ্যে "C" ভিটামিনের অভাব হইলে দাঁতের গোড়ায় পুঁজ পড়ে, দাঁতের গোড়া ফোলে, দেহের অন্যান্য স্থানেও হাড়ের ব্যাধি হয়। ভিটামিন্ "D" অনেক জৈব পদার্থে থাকে; ইহা জৈব খাদ্যের চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত থাকে। খাদ্যে "D" ভিটামিনের অভাব হইলে চক্ষের রোগ হয়; রাত্রিকালে ভাল দৃষ্টিশক্তি থাকে না, চোখ উঠে ইত্যাদি। ভিটামিন "E"—উদ্ভিদের পত্র ও কাণ্ডের বর্দ্ধনশীল ডগায় থাকে; বাঁধাকপি, শাক, শালগমের পাতা প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত ভিটামিন্ বর্ত্তমান। খাদ্যে "E" ভিটামিনের অভাব হইলে স্ত্রী ও পুং উভয় বীজকোষই শক্তিহীন হইয়া পড়ে; ফলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

ইষ্ট, ব্যাক্‌টিরিয়া, ফাঙ্গাস্ প্রভৃতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদে এবং অতি উচ্চ স্তরের উদ্ভিদেও কোন না কোন প্রকারের ভিটামিন্ থাকে। জীবজগতেও আদ্যপ্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, উভচর, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী—এই বিভিন্ন জীবের দেহের পুষ্টিসাধনে বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিনের আবশ্যক; এবং এই সমস্ত জীবেই ভিটামিনের সত্ত্বা পাওয়া যায়। ভিটামিনের অভাবে যে সকল রোগ হয়, ভিটামিন-যুক্ত খাদ্যের সাহায্যে ঐ সকল রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হয়। ভিটামিনের উপর উত্তাপের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই নিমিত্ত বিভিন্ন ভিটামিন-যুক্ত খাদ্যকে রন্ধন করিলে বিভিন্ন সময়ের পর ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যকে শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহার ভিটামিন্ নষ্ট হয় কি না, সে বিষয় খুব কমই জানা গিয়াছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে, কারণ শুষ্ক খাদ্য সংরক্ষণ এবং চালানির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রেসকটের মতে বিশিষ্ট ধরণে শুকাইতে পারিলে খাদ্যের "C" ভিটামিন্ নষ্ট হয় না। সিভেন্স্ এবং কোহেন্ ৪০ হইতে ৫২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্ উত্তাপের বায়ুতে আলু এবং বাঁধাকপি শুষ্ক করিয়া দেখিয়াছেন যে, খাদ্যগুণের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। খাদ্যকে গুদামজাত করিয়া রাখিলে তাহার ভিটামিনের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, সে বিষয়ে এখনও বিশেষজ্ঞরা একমত নন। মিঃ হালসফ্ পল তিন বৎসরের পুরাতন মটর-কলাই খাওয়াইয়া মানুষের বেরিবেরি সারাইতে পারিয়াছিলেন। ডেফ্ এবং স্কেল্‌টন্ কিন্তু বাঁধা-কপিকে শুকাইয়া তিন সপ্তাহকাল রাখিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার খাদ্যগুণের শতকরা তিরানব্বুই অংশ হ্রাস পাইয়াছে। লেবুর রস এবং তরকারী গুদামজাত করিয়া রাখিলে খাদ্যগুণের কমবেশী হ্রাস পায়। হেস এবং আঙ্গার স্থির করিয়াছেন যে, শুষ্ক আনাজকে (Vegetables) গুদামজাত করিয়া রাখিলে, তাহাতে "C" ভিটামিন্ তাজা তরকারির মত না থাকিলেও তাহার খাদ্যগুণ ঠিক বর্ত্তমান থাকে। অনেক কচি ফলে পাকা ফল অপেক্ষা বেশী ভিটামিন্ থাকে। যে দেশ, জলবায়ু এবং মৃত্তিকায় উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহার উপর উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ভিটামিনের তারতম্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সংক্রামক বেরিবেরির সহিত "B" ভিটামিন্ অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি এদিকে বিশেষ ভাবে

আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ইহাতে অন্ততঃপক্ষে দুইটি যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ আছে; উক্ত পদার্থ দুইটির রাসায়নিক গুণ এবং জীবদেহের উপর উহাদের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "B" ভিটামিনের অভাবে কিরূপে জীবদেহে বেরিবেরির লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়, তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। সম্প্রতি মিঃ জে, সি, ড্রামণ্ড এবং মিঃ জি, এফ, মেরিয়ান্ দেখাইয়াছেন যে, ভিটামিন্ "B"র সহিত দেহকলার (tissue) অম্লজানযোগের (oxidation) কোনই সম্পর্ক নাই,—যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন। ড্রামণ্ড এবং মেরিয়ান্ আরও দেখাইয়াছেন যে, জীবের খাদ্যে ভিটামিন্ "B"র অভাব হইলে খাদ্যে অরুচি, দেহোত্তাপের হ্রাস, শ্বাসগ্রহণে কষ্টবোধ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, জীবজন্তুকে উপবাসী রাখিলেও তাহাতে ঐ সকল লক্ষণ প্রকটিত হয়। উপবাস এবং "B" ভিটামিনের অভাবে জীবদেহের শর্করার পরিমাণ প্রায় সমানই থাকে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সর্ব্বত্রই ভিটামিন-গবেষণা বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে; অনেক জনহিতকর তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়াই মনে হয়।

ইরাকে পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযান

বিগত এপ্রিল মাসে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পঙ্গপালের দল আরবের মরু-অঞ্চল হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিয়া উড়িয়া ইউফ্রেটিজ্ জেলায় পৌছিতেছে। ইরাকে যে পঙ্গপাল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাহা হইতে বিভিন্ন। কৃষকদিগের মধ্যে যদিও কিঞ্চিৎ উদ্বেগ দেখা দিয়াছে, তথাপি এই পঙ্গপালের দল কৃষির অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইবে না বলিয়াই তাহারা বিশ্বাস করে। পঙ্গপাল উন্মুক্ত জায়গায় ডিম পাড়িয়া মরিয়া যাইতেছে। ডিম আবার জলীয় বাষ্প ছাড়া ফোটে না; কিন্তু ঐ অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক, এবং শীঘ্র বর্ষা নামিবারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই; তাই মনে হয়—ঐ ডিমগুলা পূর্ণাঙ্গ পঙ্গপালে পরিণত হইবার বিশেষ সুযোগ পাইবে না। ইরাক সরকার এই পঙ্গপালকুলের উচ্ছেদসাধনে অত্যন্ত তৎপর হইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার একজন পঙ্গপাল-বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া দিয়াছেন। পুরাদমে কাজ চলিতেছে; যে যে অঞ্চলগুলায় দুষ্ট পঙ্গপাল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তথায় তাহাদের নিধনের ব্যবস্থা হইতেছে; যেখানে তাহারা ডিম পাড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, শত শত মাইলব্যাপী সেই স্থানে বিষাক্ত পদার্থ দিয়া ঐ ডিমগুলা বিনষ্ট করা হইতেছে। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে এই অভিযান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পার্শ্ববর্ত্তী দেশের সরকারদিগের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি মধ্যে মধ্যে সাইবিরিয়ায় সমবেত হইয়া ইরাক সরকারের এই অভিযানের সহায়তা করে। পারস্য সরকার কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন। তাই একজন সদস্য পারস্য পার্লামেণ্টে উক্ত সরকারের

কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পারস্য সরকার সমস্ত কৃষিবিভাগের ব্যয়ের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেন, ইরাক সরকার তদপেক্ষা অধিক অর্থ কেবল এই পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য খরচ করিতেছেন।

চিঠিপত্র

কাঁকড়ার চিৎসাঁতার

হেদুয়া পুকুরে একটি পূর্ণবয়স্ক কাঁকড়ার চিৎসাঁতার দেখিয়াছিলাম। কাঁকড়াটা জলের উপর হইতে ৮।১০ ইঞ্চি নীচে এবং পুকুরের পাড় হইতে ১৪।১৫ ফুট দূরে সাঁতার দিতেছিল। যদিও কাঁকড়ার সাঁতার সম্বন্ধে কিছু অজানা নাই, তবে চিৎসাঁতার জানা আছে কি না, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না—এজন্য ইহা লিপিবদ্ধ করা হইল। কাঁকড়াটি কি জাতীয়, তাহা বলিতে পারিলাম না। ইহার রঙ্ হলদে ও লাল মিশ্রিত, তবে ইহা চিতি কাঁকড়া বলিয়া মনে হয় না। আমরা হেদুয়া পুকুরে নৌকায় দাঁড় টানিতে টানিতে কাঁকড়াটিকে সাঁতার দিতে দেখি; নৌকার দাঁড় দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র কাঁকড়াটি জলের ভিতর নামিয়া গেল।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
কলিকাতা

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৫)

এড়ি রেশম—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার (জীবনের আলো, শ্রাবণ ১৩৩৫)

কাশ্মীরের রেশম-শিল্প—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

কুইনাইনের কথা—শ্রীকালীপদ বিশ্বাস (মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩৫)

গোজনন ও গোজাতির উন্নতি—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার (কৃষক, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

জল-চাষ ও মৎস্য-বিজ্ঞান—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার (জীবনের আলো, আষাঢ় ১৩৩৫)

নব্যভারতে রসায়ন-চর্চ্চা—অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

পশু-সংজনন নীতি—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, এম-আর-এ-এস (জীবনের আলো, শ্রাবণ ১৩৩৫)

পৃথিবীর কথা—জীবোৎপত্তি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার (সৌরভ, আষাঢ় ১৩৩৫)

" " —জীবের ক্রমবিকাশ— " " " (শ্রাবণ ")

বঙ্গদেশের ভক্ষ্য মৎস্য—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৫)

বাংলার গরু—শ্রীঅরবিন্দ সিংহ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫)

বীরভূমের কৃষি-কথা—শ্রীগৌরীহর মিত্র (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৫)

Printed and published by Sj. Raghunath Seal. B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuabazar Street, Calcutta.
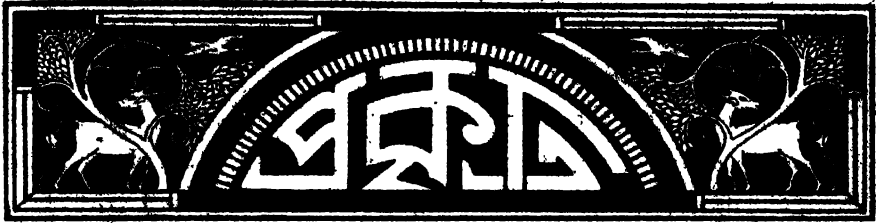
৫ম বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৫ ৩য় সংখ্যা

তারা-পরিচয়

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীর পক্ষে তারা-চিত্র বিশেষ মূল্যবান। সূর্য্য, চন্দ্র, অন্যান্য গ্রহ ও ধূমকেতু-সমূহের অবস্থান ও পরিক্রমণ সম্যক বুঝিতে হইলে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এ'বিষয়ে তারাচিত্র বিশেষ সহায়ক। পাশ্চাত্য তারাভিধানে তারাসমূহের বিষুবাংশ ও বিক্ষেপ দেওয়া থাকে; উহা হইতে উপকার পাইতে হইলেও প্রধান তারাগুলির সহিত পূর্ব্ব হইতে বিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক।

ইউরোপীয় ভাষায় অনেক তারা-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ইউরোপীয় দেশ-সমূহের জন্য উদ্দিষ্ট। তদ্দ্বারা আমাদের দেশের তারাবীক্ষণ সুচারুরূপে সম্ভবপর হয় না।

এরূপ অনেক তারা দক্ষিণ দিকে আছে, যাহা ইউরোপে কখনও দেখা যায় না; যেমন— ⍺ Eridenus, ⍺ Argus (অগস্ত্য), ⍺ Crux ইত্যাদি। এই তারাগুলি অতিশয় উজ্জ্বল; কিন্তু ইউরোপে অদৃশ্য বলিয়া ইহাদিগকে ইউরোপীয় তারাচিত্রে দেখান হয় না। ভারতবর্ষে এ'গুলি দেখা যায়; এইজন্য ভারতীয় তারাচিত্রে ইহাদের অবস্থান প্রদান আবশ্যক।

এরূপ অনেক তারা আছে, যাহা ইউরোপে খমধ্য হইতে দক্ষিণ দিকে দেখা যায়; কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সেগুলি খমধ্যের উত্তরে দেখি; যেমন—⍺ Andromeda (উত্তর ভাদ্রপদ), ⍺ Lyra (অভিজিৎ), ⍺ Perseus, ⍺ Auriga (ব্রহ্মহৃদয়), ⍺ Aries

(অশ্বিনী), β Taurus (অগ্নি), α Cygnus ইত্যাদি। ইউরোপীয় চিত্রে এগুলিকে খমধ্যের দক্ষিণে দেখাইতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের চিত্রে উহাদের অবস্থান খমধ্যের উত্তরে হইবে। সুতরাং এদেশে ইউরোপীয় তারা-চিত্রের অনুসরণ করিলে অনেক তারার সন্ধান পাওয়া কষ্টসাধ্য হইবে।

উত্তরদিকের কতকগুলি তারা কখনও অস্তমিত হয় না। উহারা, সর্ব্বদা ক্ষিতিজের (Horizon) উপরে থাকিয়া, ধ্রুববিন্দুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Circumpolar stars বলা হয়। ইংলণ্ডে Ursa Minor (শিশুমার); Ursa major (সপ্তর্ষি), Draco, Cygnus, Cepheus, Cassiopeia, Perseus, Auriga ও Lyra তারাপুঞ্জ Circumpolar; ইহারা তথায় কখনও অস্ত যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে কেবল Ursa Minor তারাপুঞ্জ ও Cepheus তারাপুঞ্জের কয়েকটি মাত্র অনুজ্জ্বল তারা অনস্তমিত থাকে।

ইহা ছাড়াও, ইউরোপীয় ও ভারতীয় তারাচিত্রে উদয়াস্ত সম্বন্ধীয় আরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বা বৈষম্যের কারণ ইউরোপের দেশসমূহ হইতে আমাদের দেশের অক্ষাংশের পার্থক্য।

বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অক্ষাংশের উপযোগী করিয়া বর্ণনা সহ তারা-চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়। পরে মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন হইতে তত্তৎস্থানের উপযোগী আরও দুইখানি তারা-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এগুলির তারা-বিবরণ সমস্তই ইংরাজি ভাষায় লিখিত।

বাংলা ভাষায় তারা-বিবরণী পূর্ব্বে কখন লেখা হইয়াছে বলিয়া জানি না। আমরা আমাদের বিবরণ বাংলাতেই দিব। কিন্তু তারাচিত্রে বিভিন্ন তারাপুঞ্জের নাম ও অক্ষর ইংরাজিতেই রাখা হইবে। ইহার অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক।

এ'পর্য্যন্ত তারা-সমূহ সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি জানা গিয়াছে, তাহার সমস্তই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। এই আবিষ্কৃত তথ্য-সমূহের আলোচনাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সমস্ত আকাশ-মণ্ডলকে ৭০-এর অধিক ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতি ভাগের তারা-সমূহের সমষ্টিকে আমরা 'তারাপুঞ্জ' নামে অভিহিত করিব। প্রতি তারাপুঞ্জের অন্তর্গত মুক্ত-চক্ষুগোচর প্রতি তারার ইঁহারা নামকরণ (Latin ভাষায়) করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যুক্ত-তারকা (double or multiple stars) এবং নীহারিকা-সমূহেরও নামকরণ তাঁহারা করিয়াছেন। এ সমস্ত নামের মাত্র চারি পাঁচটি ব্যতীত অপরগুলির বাংলা অনুবাদ কিছু হয় না। গায়ের জোরে পাশ্চাত্য নাম-সমূহের শ্রুতিসুখকর অনুরূপ বাংলা নাম হয়'ত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; যেমন—Cassiopeiaকে কশ্যপ, Perseusকে পুরুষ ইত্যাদি বলা; কিন্তু আমি এরূপ করিতে সাহসী হই নাই। পাশ্চাত্য নামগুলিকে হয়'ত বাংলা অক্ষরে লিখিলেও চলিত। কিন্তু আমার মনে হয়, উহাতে

জিনিষটাকে অধিকতর উৎকট করিয়া তোলা হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি-অভিজ্ঞ; কাজেই আশা করা যায়, তারাপুঞ্জ ও তারকাগুলির পাশ্চাত্য নাম ও অক্ষর দেওয়ায় কাহারও অসুবিধা হইবে না। যেখানে যেখানে সম্ভব হইবে, আমরা অবশ্য বিশেষ বিশেষ তারার বাংলা বা ভারতীয় নাম দিব।

আমাদের দেশীয় জ্যোতিষেও আকাশ-বিভাগ আছে। ইহাতে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিভাগে সেরূপ কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। আমাদের বিভাগ এইরূপ:—

রবিমার্গের একটি বিশেষ বিন্দু * হইতে আরম্ভ করিয়া রবিমার্গকে সমান ২৭ ভাগে (arc = ধনু) বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতি ভাগের বা ধনুর পরিমাণ ১৩°-২০´ হয়। এইরূপ ধনুর প্রত্যেকটির প্রান্তবিন্দু হইতে উত্তর-দক্ষিণে উভয় ধ্রুব পর্য্যন্ত বিক্ষেপ-রেখা টানিলে সমস্ত আকাশ মোট ২৭ ভাগে বিভক্ত হয়। এইরূপ এক একটি ভাগের অন্তর্গত সমস্ত তারার সমষ্টিকে হিন্দু জ্যোতিষে 'নক্ষত্র' এই পারিভাষিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইউরোপীয় আকাশ-বিভাগ এরূপ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নয়। ইউরোপীয় একাধিক তারাপুঞ্জের তারা ভারতীয় এক নক্ষত্রের মধ্যে পড়িয়াছে; এবং ভারতীয় একাধিক নক্ষত্রের তারা ইউরোপীয় এক তারাপুঞ্জের অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্য উহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুবাদ সম্ভবপর নয়। তারা-বিশেষের ইউরোপীয় নাম ও সংখ্যাকে ভারতীয় নাম ও সংখ্যায় নিম্নলিখিত ভাবে হয়'ত পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; যেমন—

δ Ursa major — ৫ হস্তা
α Crucis — ১০ হস্তা
α Virginis — ১০ চিত্রা
η Ursa major — ২ স্বাতী
α Draco — ৯ স্বাতী
α Bootes — ১৩ স্বাতী ইত্যাদি।

এরূপ পরিবর্ত্তন দুরূহ নয়; কিন্তু উহা কতদূর গ্রহণীয় হইবে—তাহাই বিবেচ্য। যদি অভিজ্ঞগণ এ'বিষয়ের আবশ্যকতা বোধ করেন, তবে ভবিষ্যতে এইরূপ নামকরণ ও তদনুরূপ নামাভিধান সহজেই প্রস্তুত হইতে পারিবে। কিন্তু যতদিন না ইহা হইতেছে, ততদিন আমাদের পাশ্চাত্য নামেই সন্তুষ্ট থাকা সমীচীন। এইরূপ ভাবিয়াই আমরা তারাচিত্র ও তাহার বিবরণে তারা-সমূহের পাশ্চাত্য নামই রাখিয়া দিলাম।

* ζ Piscium তারার ১° পূর্ববর্ত্তী বিন্দু। ৪২১ শকে এই বিন্দুতে বিষুব ছিল। এখন বিষুব তথা হইতে প্রায় ১৯°।৫২´ পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে।

তারা

সংখ্যা—আকাশে যে কত তারা আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু মুক্ত চক্ষে ইহাদের মাত্র ন্যূনাধিক ৭০০০টি দেখা যায়।

শ্রেণীবিভাগ—ঔজ্জ্বল্য অনুসারে তারাসমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ধ্রুবতারার (α Ursa Minor-এর) ঔজ্জ্বল্যমান ২ ধরা হয়। ইহা হইতে যে তারার ঔজ্জ্বল্য ২½ গুণ বেশী, তাহার ঔজ্জ্বল্যমান ১, এবং তদপেক্ষা ২½ গুণ উজ্জ্বলতর তারার মান ০। অপর পক্ষে ২য় মান তারা হইতে ২½ গুণ ক্ষীণতর তারার ঔজ্জ্বল্যমান ৩; তদপেক্ষা ২½ গুণ ক্ষীণতর তারার মান ৪। এইরূপে তারা-সমূহের ঔজ্জ্বল্যমান নির্ণীত হইয়াছে।

তারাচিত্রে আমি পার্শ্বের চিত্রানুরূপভাবে বিভিন্ন তারার ঔজ্জ্বল্যমান দেখাইয়াছি।

ঔজ্জ্বল্যমান	চিহ্ন
১ হইতে উজ্জ্বলতর তারা	✹
১ এবং ২ ” ”	✱
২ এবং ৩ ” ”	+
৩ ও ৩ হইতে ক্ষীণতর ”	∘
নীহারিকা ও ক্ষীণ তারাগুচ্ছ	·

যুক্তভারা—আকাশে এরূপ অনেক তারা আছে, যেগুলি মুক্ত চক্ষুতে একক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও যন্ত্র-সহযোগে ক্ষুদ্রতর দুইটি, তিনটি বা ততোধিক তারার সমষ্টি বলিয়া প্রমাণিত হয়। এগুলিকে যুক্তভারা বলা যায়।

α Lyra, α Aquila, α ও η Cassiopeia, γ Aries, α Piscium, γ Andromeda, ζ Ursa Major, ε Bootes, β Scorpio, α Hercules, β Cygnus, δ Cepheus প্রভৃতি দ্বিতারক বা ২টি ক্ষুদ্রতর তারার সমষ্টি।

β Lyra, γ Argus, α Crucis প্রভৃতি ত্রিতারক বা তিনটি তারার সমষ্টি।

এতদ্ব্যতীত চারটি বা ততোধিক তারার সমষ্টি বহু তারা আকাশে আছে; তাহাদিগকে আমরা 'বহুতারক' বলিতে পারি।

দ্বিতারক, ত্রিতারক, প্রভৃতি তারার অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর তারাগুলি পরস্পরের অতি নিকটে দেখা গেলেও বস্তুতঃ উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। উহাদের মধ্যের ক্ষীণতর তারা হয়'ত সন্নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারার বহু পশ্চাতে রহিয়াছে; কেবল উহারা প্রায় একই লাইনে (দিকে) অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, একটি অপরটির সঙ্গী বা অংশ।

বাইনারি তারা (Binary Stars—সংযুক্ত তারা)—কতকগুলি দ্বিতারক তারার উপাদানভূত সঙ্গীদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে সত্যসত্যই একটা সম্বন্ধ আছে। উহারা পরস্পরের

আকর্ষণের অধীন এবং একটি অপরটির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাভাস কক্ষায় পরিক্রমণ করে। η Cassiopeia, ζ Ursa Major, γ Centaurus, γ Vergo, α Centaurus ইত্যাদি তারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত ; ৪" ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এগুলি দেখা যায়।

পরিবর্ত্তনশীল তারা—বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, অনেক তারার জ্যোতিঃ সর্ব্বদা সমান থাকে না ; উহা কখন বাড়ে, কখনও কমে। ইহাদিগকে পরিবর্ত্তনশীল তারা বলা যায় ; যথা—OvCetus, β Lyra, δ Cepheus, β Perseus ইত্যাদি।

তারাগুচ্ছ (Star-cluster)—অতি অল্প স্থানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার একত্র সমাবেশ হইলে আমরা তাহাদিগকে 'তারাগুচ্ছ' বলি। ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

নীহারিকা (Nebula)—বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদগণের বিশ্বাস—বিশ্বগঠনের প্রারম্ভে সমস্ত আকাশ অতিশয় উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল বাষ্পময় পদার্থ বিশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে ঐ বাষ্প দ্রবীভূত হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়। ঐ তরল পদার্থ আবার পরে কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফলই বর্ত্তমান বিশ্ব। এইরূপেই তারা, সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহাদি সৃষ্ট হইয়াছে। আকাশে এখনও স্থানে স্থানে সৃষ্টির আদিভূত উজ্জ্বল বাষ্প রহিয়া গিয়াছে ; ইহাদিগকে আমরা 'নীহারিকা' বলিয়া থাকি ; ইহাদের পরিবর্ত্তন-কার্য্য এখনও চলিতেছে। তারাচিত্রে প্রধান প্রধান নীহারিকাগুলির স্থান-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তারাপুঞ্জের বর্ণনায় ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইবে।

তারাচিত্রের সাধারণ বর্ণনা

প্রতি চিত্রের বৃত্তাকার সীমা-রেখা স্থানীয় ক্ষিতিজ। E, N, W, S—যথাক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক। Z—খমধ্য ; ইহা চিত্রবৃত্তের কেন্দ্র ; P—উত্তর ধ্রুব। ১ম চিত্রে δ Hercules ও α Vulpecula—এই উভয় তারার মধ্যে Z বা খমধ্য রহিয়াছে। α Ursa Minor-এর অতি নিকটে P বা উত্তর ধ্রুব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের তারাচিত্র-সমূহ ২৩° অক্ষাংশের (latitude) জন্য অঙ্কিত। কলিকাতার অক্ষাংশ ২২°।৩৪´। উত্তর কিম্বা দক্ষিণে প্রায় প্রতি ৬৭ মাইল ব্যবধানে ১° অক্ষাংশ পার্থক্য হয়। যদি ২৩° হইতে ঊর্দ্ধতর (উত্তর দিকের) কোন অক্ষাংশে তারাবীক্ষণ করা হয়, তবে ২৩° হইতে সেই অক্ষাংশের পার্থক্য যতটুকু, সেই পরিমাণে Z বা খমধ্য উত্তর দিকে সরিয়া যাইবে। লণ্ডনের অক্ষাংশ ৫১°।৩২´। ২৩° হইতে ইহার পার্থক্য ২৮°।৩২´। সুতরাং লণ্ডনে যদি তারাবীক্ষণ করা হয়, তবে তথায় Z বা খমধ্য γ Draco তারার নিকট হইবে (১ম চিত্র)। দক্ষিণের তারাগুলিও তথায় ঐ পরিমাণে (২৮°।৩২´) নীচে নামিয়া যাইবে। ফলে, δ, μ, k Centaurus, α, β γ ও ζ Lupus, Norma, α, β ও ζ Ara, α ও k Pavonis, ζ, k, 3 θ Scorpio ও α Indus প্রভৃতি তারা দক্ষিণের ক্ষিতিজের নীচে চলিয়া যাইবে অর্থাৎ ইহাদিগকে লণ্ডনের আকাশে দেখা যাইবে না। এইরূপ ২৩° হইতে

নিম্নতর (বা দক্ষিণ দিকের) কোন অক্ষাংশে তারাবীক্ষণ করিলে Z বা খমধ্য ২৩° হইতে সেই অক্ষাংশের পার্থক্য-পরিমাণে দক্ষিণে সরিয়া যাইবে ; এবং দক্ষিণ-ক্ষিতিজের নীচে হইতে সেই পরিমাণে, ২৩° অক্ষাংশে অদৃশ্য—এমন বহু তারা উপরে উঠিয়া দৃষ্টিগোচর হইবে। Z বা খমধ্য উত্তরে সরিয়া যাওয়ার ফলে, যখন দক্ষিণের কতকগুলি তারা দক্ষিণ-ক্ষিতিজের নীচে নামিয়া যায়, তখন উত্তর-ক্ষিতিজের নিম্নস্থ অনেক তারা উত্তর-ক্ষিতিজের উপরে উঠিয়া আসে ; আবার খমধ্য দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে যখন দক্ষিণ-ক্ষিতিজের নিম্নস্থ কতকগুলি তারা ক্ষিতিজের উপরে উঠিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ক্ষিতিজের উপরস্থ কতকগুলি তারা ক্ষিতিজের নিম্নে নামিয়া যায়।

নভোমণ্ডল প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার করিয়া আবর্তিত হয়। তারা-সমূহের মধ্য দিয়া যদি চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি প্রত্যহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে। সূর্য্যও ক্রমশঃ এইরূপে অগ্রসর হইতেছে। Ecliptic-এর অর্থ রবিমার্গ। এই মার্গ অনুসরণ করিয়া সূর্য্য ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিটে একবার পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। এই গতি অবশ্য আপেক্ষিক। সুতরাং গড়ে সূর্য্যের দৈনিক গতি প্রায় ১°। অর্থাৎ সূর্য্য আজ আকাশের বা রবিমার্গের যে বিন্দুতে থাকিয়া অস্ত গিয়াছে, আগামী কল্য তথা হইতে উহা ১° পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া অস্ত যাইবে। আকাশ-মণ্ডলের এই ১° ডিগ্রির আবর্ত্তনকাল প্রায় ৪ মিনিট ; ইহার ফলে আজ কোন বিশেষ সময়ে আকাশের যে অবস্থা আছে অর্থাৎ আকাশে যেখানে যে তারা আছে, আগামী কাল ঠিক সেই সময়ের ৪ মিনিট পূর্ব্বে আকাশের সেই অবস্থা দেখা যাইবে। ধরা হউক, আজ রাত্রি ঠিক ৯ টার সময় একটি উজ্জ্বল তারা ঠিক মাথার উপর আছে ; আগামী কল্য উহা ঠিক ৮।৫৬ মিনিটের সময় ঠিক ঐ স্থানে অর্থাৎ মাথার উপর আসিবে ; তাহার পরদিন উহা ৮।৫২ মিনিটে এবং তৎপর দিবস ৮।৪৮ মিনিটে মাথার উপর আসিবে। এইরূপে একমাস পরে ঐ তারা ৯ টার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ টার সময় মাথার উপর আসিবে। এই ভাবে মাসের পর মাস পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে একবৎসর পরে ঠিক আবার রাত্রি ৯ টার সময় পুনরায় ঐ তারা মাথার উপর আসিবে।

তারাচিত্র সাহায্যে আকাশে তারাবিশেষের অবস্থান-নির্ণয় কঠিন নয়। যে মাসে তারা দেখা হইবে, সেই মাসের তারাচিত্র লও। প্রতি চিত্রের বর্ণনার নিম্নে উহা কোন্ মাস, তারিখ ও সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহা বর্ণিত আছে ; তদনুসারে উহার ব্যবহার করিতে হইবে।

দক্ষিণাকাশের তারা দেখিতে হইলে, চিত্রে প্রদর্শিত S বা দক্ষিণ-ক্ষিতিজ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া, Z বা খমধ্য মাথার উপরে ধর। দক্ষিণ দিকের সমস্ত তারা এখন সম্মুখে দেখিতে পাইবে। এখন দক্ষিণাকাশের তারাগুলি মিলাইতে কোন কষ্ট হইবে না। অন্য দিকের তারাগুলিও এইরূপে মিলাইতে হইবে। চিত্র-বর্ণনায় তারাপুঞ্জ-সমূহের অবস্থান মাত্র বর্ণিত হইবে ; উহাদের বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

তারাচিত্র-বর্ণনা

(১ম চিত্র)

উত্তর-পূর্ব্ব আকাশে ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia) সম্পূর্ণ উদিত হইয়াছে। ইহার আকার ইংরাজি অক্ষর W-এর মত ; এখন উহা খাড়া ভাবে অর্থাৎ ∑ এইভাবে রহিয়াছে। ঐদিকেই ক্যাসিওপিয়া হইতে আরও কিছু উপরে Cepheus নক্ষত্রপুঞ্জ। Ursa Minor-এর মাথা (γ, ও β) এখন খানিকটা পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। ইহার সংস্কৃত নাম শিশুমার ; ইহার পুচ্ছে ধ্রুবতারা (α Ursa Minor) অবস্থিত। ইহারই অতি নিকটে এবং একটু পশ্চিমে উত্তর ধ্রুববিন্দু ; ইহা P অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার একটু উপরে ড্রেকো (Draco) নক্ষত্রপুঞ্জ। α Draco প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুবতারা ছিল ; এখন উহা ধ্রুববিন্দু হইতে অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। Dracoর পশ্চিমে Ursa Major বা সপ্তর্ষি তারাপুঞ্জ। ইহার দুইটি তারা α ও β কে একটি রেখা দ্বারা যোগ করিয়া ঐ রেখাকে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত করিলে উহা বর্ত্তমান ধ্রুববিন্দুর অতি নিকট দিয়া যায় ; এইজন্য এই উভয় তারাকে Pointer stars বা ধ্রুব-নির্দ্দেশক তারা বলা হয়। Ursa Major-এর অনেকখানি উপরে পশ্চিম গগনে Bootes তারাপুঞ্জ। α Bootes স্বাতীনক্ষত্রের যোগতারা (=প্রধান তারা)। Bootes-এর পূর্ব্বে পর পর Corona, Hercules, Lyra, Cygnus ও Pegasus। Corona-র আকৃতি অনেকটা মালা বা মুকুটের মত। α Lyra-র সংস্কৃত নাম 'অভিজিৎ তারা' ; উহা এখন মধ্যরেখার (উত্তর-দক্ষিণ রেখার) অতি নিকটে আছে—প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে উহা মধ্যরেখায় আসিবে। পূর্ব্বোত্তর কোণে Andromeda উঠিতেছে। α Andromeda ও α, β, γ Pegasus—এই চারিটি তারাকে এক সঙ্গে Square of Pegasus বলা হয়। α Pegasus ও α Andromeda তারাদ্বয় যথাক্রমে পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগতারা। Pisces তারাপুঞ্জ (মীনরাশি) ঠিক পূর্ব্ব দিকে উঠিতেছে ; ইহার মধ্যে কোন উজ্জ্বল তারা নাই। পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে Aquarius (কুম্ভ) ও Capricornus (মকর) সম্পূর্ণ উদিত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যেও উজ্জ্বল তারার বিশেষ অসদ্ভাব। Piscis Australis ইহাদের নীচে ; ইহার প্রধান ও উজ্জ্বল তারা α Piscis Australis এখনই উদিত হইয়াছে। দক্ষিণাকাশে—খমধ্য ও দক্ষিণ ক্ষিতিজের প্রায় মধ্যস্থলে—Sagittarius (ধনু) তারাপুঞ্জ। বহু উজ্জ্বল তারা এই পুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ; এখন ইহার কতক অংশ মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাকাশে অগ্রসর হইয়াছে। Sagittarius ও Cygmus-এর মধ্যে Aquila ; ইহার মধ্যে তিনটি তারা α, β ও γ সমধিক উজ্জ্বল। ইহাদের মধ্যস্থিত তারা অর্থাৎ α Aquila শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা। দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে Scorpio (বৃশ্চিক) তারাপুঞ্জ দেখা যাইতেছে। উহার নিম্নে Ara ও Norma। Norma-র অল্প পশ্চিমে Lupus। Lupus-এর পশ্চিমে Centaurus এখন অস্তগমন

করিতেছে। Scorpio-র পশ্চিমে Libra (তুলা) ও উত্তরে Ophiuchus ও Serpens। Virgo (কন্যা) তারাপুঞ্জ এখন পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতেছে; ইহার প্রধান তারা ধ (চিত্রাযোগতারা) এখনও পশ্চিম ক্ষিতিজের কিছু উপরে দেখা যাইতেছে।

১ম চিত্র দেখিবার সময়

মাস	তারিখ	সন্ধ্যা সময়	মাস	তারিখ	সন্ধ্যা সময়
		ঘ — মি			ঘ — মি
	৭	১১ — ০ রাত্রি	আগ	১	৯ — ২০
	১২	১০ — ৪০	”	৬	৯ — ০
	১৭	১০ — ২০	”	১১	৮ — ৪০
	২২	১০ — ০	”	১৬	৮ — ২০
	২৭	৯ — ৪০	”	২১	৮ — ০
				২৬	৭ — ৪০
				৩১	৭ — ২০

(২য় চিত্র)

Ursa Major (সপ্তর্ষি) উত্তর-পশ্চিম ক্ষিতিজে অস্ত যাইতেছে। Draco এখন Ursa Major ও Ursa Minor-এর উপরে দেখা যাইতেছে। Cepheus মধ্যরেখার নিকটবর্ত্তী হইতেছে; ইহার পশ্চিমে Cassiopeia; তাহার নীচে Perseus এখন উদিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে Square of Pegasus অনেক উপরে উঠিয়াছে। Piscis (মীন) তারাপুঞ্জ এখন সম্পূর্ণ উদিত হইয়াছে এবং তাহার নিম্নে Aries (মেষ) দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে Toucan, Phœnix, Sculptorus ও Cetus তারাপুঞ্জ উঠিয়াছে। Grus তারাপুঞ্জ দক্ষিণ-গগনে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছে। Grus-এর অল্প উত্তরে Piscis Australis এবং তাহার উত্তরে Aquarius (কুম্ভ) ও Capricornus (মকর)। ইহাদের পূর্ব্বে Sagittarius মধ্যরেখা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া এখন পশ্চিমাকাশে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ক্ষিতিজের নিকটে Scorpio তারাপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। Libra (তুলা) কয়েক মিনিটের মধ্যেই অস্ত যাইবে। Scorpio-এর উপরে পশ্চিমাকাশে Ophiuchus ও Serpens। Ophiuchus-এর পূর্ব্বে Aquila। Aquila ও Pegasus-এর মধ্যে Equuleus ও Delphinus নামক দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তারাপুঞ্জ। উত্তর দিকে, Aquila-র উত্তরে মধ্যরেখার উপর Cygnus। Cygnus-এর পশ্চিমে Lyra, Lyra-র পশ্চিমে—একটু নীচে—Hercules। Hercules-এর উত্তর-পশ্চিমে Corona ও Bootes।

২য় চিত্র দেখিবার সময়

মাস	তারিখ	সান্ধ্য সময় ঘ—মি	মাস	তারিখ	সান্ধ্য সময় ঘ—মি
আগষ্ট—	৬	১১— ০	সেপ্টেম্বর—	৬	৯— ০
	১১	১০—৪০		১১	৮—৪০
	১৬	১০—২০		১৬	৮—২০
	২১	১০— ০		২১	৮— ০
	২৬	৯—৪০		২৬	৭—৪০
	৩১	৯—২০			
			অক্টোবর—	১	৭—২০
				৬	৭— ০
				১১	৬—৪০

তারাপুঞ্জের বিবরণ

১ম ও ২য় চিত্রে যে তারাপুঞ্জ সমূহ রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রবিমার্গের উত্তরের তারাপুঞ্জ

Ursa Minor—২০শে জুলাই রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে; ইহার সংস্কৃত নাম 'শিশুমার'। ইহার প্রধান তারা ∝ Ursa Minor বর্ত্তমান সময়ের ধ্রুবতারা (উত্তর)। এখন ইহা উত্তর ধ্রুব বিন্দু হইতে প্রায় ১$\frac{1}{4}$° দূরে আছে। ইহা দ্বিতারক (double)। এই তারাপুঞ্জে প্রায় ২৪টি তারা মুক্ত চক্ষে দেখা যায়; তন্মধ্যে মাত্র ৭টি চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

Ursa Major—৮ই মে সন্ধ্যা প্রায় ৮ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। এই তারাপুঞ্জের সংস্কৃত নাম 'সপ্তর্ষি'। ইহার ৭টি তারার সংস্কৃত নাম আছে—

∝ Ursa Major = ক্রতু
β " " = পুলহ
γ " " = পুলস্ত্য
δ " " = অত্রি
ε " " = অঙ্গিরা
ζ " " = বশিষ্ঠ
η " " = মরিচী

এতদ্ব্যতীত ζ তারার অতি নিকটে অতি ক্ষুদ্র একটি তারা দেখা যায় ; সংস্কৃতে উহার নাম অরুন্ধতী। α ও β—এই দুই তারাকে নির্দ্দেশক তারা (pointer star) বলা হয় ; কারণ ঐ দুইটি তারা একটি রেখা দ্বারা যোগ করিয়া ঐ রেখাকে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত করিলে উহা বর্ত্তমান ধ্রুবের অতি নিকট দিয়া যায় ; কাজেই ইহা দ্বারা কোন্‌টি ধ্রুবতারা, তাহা সহজে বুঝা যায়। প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে δ ও γ Ursa Mrjor তারাদ্বয় নির্দ্দেশক তারার কাজ করিত ; তখন ইহাদিগকে 'ঋষিরেখা' বলা হইত। α Draco সেই সময়ে ধ্রুবতারা ছিল। ζ তারা দ্বিতারক। এই পুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলি নীহারিকা আছে ; তন্মধ্যে M81, M82 ও M97 নামক তিনটি সমধিক বৃহৎ। চিত্রে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে M97 কে ইংরাজীতে Owl nebula নামেও অভিহিত করা হয় ; ইহা β Ursa Major-এর প্রায় ২° পূর্ব্ব-দক্ষিণে।

Corona Borealis—১ লা জুলাই সন্ধ্যা প্রায় ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় ইহা মধ্যরেখায় উপস্থিত হয়। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে একটি নূতন তারা β Corona-র নিকট হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে ; এবং পরে ধীরে ধীরে উহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ইহার পরে আর কখনও উহা দেখা যায় নাই। মুক্ত চক্ষুতে প্রায় ২১টি তারা এই তারাপুঞ্জে দেখা যায় ; তন্মধ্যে মাত্র ৬টি চিত্রে দেওয়া হইয়াছে।

Hercules—α তারাটি বহুতারক ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে দ্বিতারক বলিয়া ধরা হয়। ইহা ক্রমপরিবর্ত্তনশীল ; প্রায় ৬৭ দিনে ইহা ঔজ্জ্বল্যমান ৩ হইতে ৩·৫ এ পরিবর্ত্তিত হয়। α, ζ, δ তারা দ্বিতারক। M13 একটি নীহারিকা। বড় দূরবীক্ষণে ইহা অতি সুন্দর দেখায়। Sir W. Herschel বলেন—ইহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৪০০০ তারা আছে। M92 অপর একটি নীহারিকা ; ইহার উপাদান সূর্য্যের মত। ৫ই জুলাই রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় Hercules তারাপুঞ্জ মধ্যরেখায় আসে। একটি সুন্দর তারাগুচ্ছের মধ্যে ইহা অবস্থিত।

Serpens—১৩ই জুলাই সন্ধ্যা ৮ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে।

Ophiuchus—ইহার মধ্যে অনেকগুলি দ্বিতারক তারা আছে ; তন্মধ্যে η, λ, σ ও 70—এইগুলি চিত্রে দেওয়া হইয়াছে। ২১শে জুলাই সন্ধ্যা ৯ টার সময় Ophiuchus মধ্য-রেখায় আসে। M9, M10, M12, M14 গুলি নীহারিকা তারাগুচ্ছ।

Draco—১লা আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় উপস্থিত হয়। সংস্কৃত পুরাণে ইহার নাম 'উত্তানপাদ'। α Draco প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুবতারা ছিল। β, η, γ Draco দ্বিতারক।

Lyra—২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৮ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। বিশেষ শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে α Lyra তারার সহিত আরও ৩৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা দেখা যায়। প্রায় ১৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা তৎকালীন ধ্রুববিন্দুর নিকটে ছিল। ইহার সংস্কৃত নাম

'অভিজিৎ' যোগতারা। ε Lyra দ্বিতারক; তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক মুক্ত চক্ষুতে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে। β Lyra বহু তারক ও ε Lyra দ্বিতারক; β ও ε উভয় তারাই পরিবর্ত্তনশীল। β Lyra-র পরিবর্ত্তন প্রায় ১৩ দিনে সংঘটিত হয়। β ও γ তারাদ্বয়ের প্রায় মধ্যস্থলে M57 নীহারিকা। M56 একটি সুন্দর তারাগুচ্ছ।

Aquila—৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α Aquila সংস্কৃত শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা। ε, β, μ, γ, π তারা দ্বিতারক। η তারা পরিবর্ত্তনশীল।

Delphinus—α Delphinus ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগতারা। ১লা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টায় ইহা মধ্যরেখায় আসে।

Cygnus—৬ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ টায় এই তারাপুঞ্জ মধ্যরেখায় আসে। ইহার আকৃতি অনেকটা যুক্ত (+) চিহ্নের মত। α Cygnus দ্বিতারক; χ তারাটি দ্বিতারক এবং পরিবর্ত্তনশীল; ইহার পরিবর্ত্তনকাল ৪০৬ দিন। 61 Cygnus একটি ক্ষুদ্র তারা; ইহার ঔজ্জ্বল্যমান ৫। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৪৯,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ইহা ঘণ্টায় প্রায় ১৪০০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই তারাটি দ্বিতারক ও বাইনারি। যে দু'টি ক্ষুদ্রতর তারা সহযোগে ইহা গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকের ব্যাস আমাদের সূর্য্যের প্রায় ⅓ গুণ; ইহারা পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া পরিক্রমণ করিতেছে। এই পরিক্রমণকাল প্রায় ৫৪০ বৎসর। β, δ, γ তারাগুলিও দ্বিতারক।

Vulpecula—আগষ্টের গোড়ায় ইহা মধ্যরেখায় আসে। প্রসিদ্ধ নীহারিকা M27 এই তারাপুঞ্জে অবস্থিত; ইহার আকৃতি ডাম্বেলের (dumb-bell) মত।

Cepheus—৩১ এ অক্টোবর সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। β তারা দ্বিতারক। M52 একটি সুন্দর তারাগুচ্ছ।

Bootes—ইহা ২১এ জুন সন্ধ্যা প্রায় ৮ টার সময় মধ্যরেখায় আসে। α Bootes সংস্কৃত স্বাতীতারা—পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব নির্ণয় করা গিয়াছে; ইহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে 61Cygnus-এর দূরত্বের প্রায় ৩ গুণ। ε Bootes দ্বিতারক; আমাদের সূর্য্য যে যে উপাদানে গঠিত, ইহাও প্রায় সেই সেই উপাদানে গঠিত। i, k, θ ও Bootes তারাগুলিও দ্বিতারক। ξ Bootes দ্বিতারক—বাইনারি (Binary); সঙ্গীদ্বয়ের পরস্পরের পরিক্রমণকাল ১১৭ বৎসর। ε Bootes অপর একটি বাইনারি; ইহার সঙ্গীদ্বয়ের পরস্পর পরিক্রমণকাল ৯৫০ বৎসর।

Canes Venatici—২১ এ জুন সন্ধ্যা প্রায় ৮ টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। β তারা দ্বিতারক। ইহার মধ্যে অনেক নীহারিকা আছে; তন্মধ্যে M94, M63, M51 ও M3 চিত্রে দেখান হইয়াছে।

Pegasus—১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α, β ও γ Pegasus এবং α Andromeda—এই চারিটি তারা লইয়া Square of Pegasus কল্পিত হইয়াছে। α Pegasus পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগতারা।

Cassiopeia—২২এ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৮টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। ১৫৭২ খৃষ্ট অব্দে k তারার সন্নিকটে একটি নূতন তারা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে। কয়েক দিনের মধ্যে উহার ঔজ্জ্বল্য শুক্র ও বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করে; কিন্তু ১৮ মাসের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; পরে উহা আর কখনও দেখা যায় নাই। α Cassiopeia পরিবর্ত্তনশীল। α, β, γ, δ—ইহারা দ্বিতারক।

Andromeda—ডিসেম্বরের শেষে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α Andromeda উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগতারা। নিম্নশক্তি দূরবীক্ষণে ইহা দ্বিতারক রূপে দৃষ্ট হয়; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা বহুতারক। M31 একটি উজ্জ্বল নীহারিকা; ইহা মুক্ত চক্ষুতেও দেখা যায়।

Perseus—১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। δ Cassiopeia ও α Perseus তারাদ্বয়ের মধ্যে একটি তারাগুচ্ছ আছে; ইহা মুক্ত চক্ষুতে দেখা যায়। β Perseus-এর নাম Algol; ইহা পরিবর্ত্তনশীল। ইহার পরিবর্ত্তনকাল মাত্র ২ দিন ২১ ঘণ্টা। এই সময়ে ২·৩ হইতে ৩·৫ পর্য্যন্ত ইহার ঔজ্জ্বল্যমানের পরিবর্ত্তন ঘটে। M34 একটি তারাগুচ্ছ।

রবিমার্গস্থ তারাপুঞ্জ

Virgo (কন্যা)—২৩এ জুন সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α Virgo সংস্কৃত চিত্রাতারা। γ Virgo দ্বিতারক। এই তারাপুঞ্জে অনেকগুলি ক্ষীণাভ নীহারিকা আছে। M83, M49 দুইটি নীহারিকা।

Libra (তুলা)—২২এ জুলাই প্রায় সন্ধ্যা ৭টায় ইহা মধ্যরেখায় আইসে। α ও β তারাদ্বয় দ্বিতারক। α Libra বিশাখা নক্ষত্রের যোগতারা।

Scorpio (বৃশ্চিক)—বহু উজ্জ্বল তারা সহযোগে ইহা গঠিত। ইহার আকারও অনেকটা বৃশ্চিকের মত। দক্ষিণ-আকাশে সহজেই ইহা চোখে পড়ে। ১১ই জুলাই সন্ধ্যা প্রায় ৯টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α Scorpio-র সংস্কৃত নাম জ্যেষ্ঠা তারা। প্রাচীন কালে ইহার অপর নাম 'রোহিণী' ছিল। এই তারার ১৮০° পূর্ব্বে অবস্থিত α Taurus (Aldebaran) নামক তারার নামও রোহিণী। ৩১০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে α Taurus তারাতে বাসন্তবিষুব ও α Scorpio তে শারদবিষুব ছিল। তখন হইতে আমাদের প্রচলিত কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হয়। এখন কলির ৫০২৯ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই উভয় তারার 'রোহিণী'—এই একই নাম হওয়ার কারণ আছে। 'রোহিণী' শব্দটি রুহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে;

রুহ্ ধাতুর অর্থ উঠা। সূর্য্য তৎকালীন বাসন্তবিষুব অর্থাৎ α Taurus-এ উপস্থিত হইলে উহার আকাশের উত্তরার্দ্ধে বা ঊর্দ্ধার্দ্ধে আরোহণ এবং α Scorpioতে উপস্থিত হইলে দক্ষিণার্দ্ধে বা নিম্নার্দ্ধে অবরোহণ আরম্ভ হইত। এইজন্য এই উভয় তারার নাম 'রোহিণী' হইয়াছে। ঐ Scorpio তারার অপর নাম জ্যেষ্ঠা রাখারও কারণ আছে। কলির আদিতে বৎসরের শেষে α Taurus বা রোহিণী তারার সহিত সূর্য্য যখন সন্ধ্যার সময় পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইত, ঠিক তখনই পূর্ব্বাকাশে অপর রোহিণী α Scorpio উদিত হইত। এই তারার প্রথম উদয় আরম্ভ হইতে তৎকালীন বৎসরারম্ভ সূচিত হইত। বৎসরের প্রারম্ভে এই তারা সন্ধ্যার সময় সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে আসিত বলিয়া ঐ তারার নাম 'জ্যেষ্ঠা' দেওয়া হইয়াছিল। ঐ তারা (জ্যেষ্ঠা) যাঁর উদয় দ্বারা বৎসরান্ত সূচিত করিত বলিয়া তৎকালে বৎসরের প্রথম মাসের নামও হইয়াছিল 'জৈষ্ঠ'। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রাচীন কালে অন্য নাম দ্বারা মাসসমূহ অভিহিত হইত। λ Scorpio সংস্কৃত মূলাতারা।

Scorpio তারাপুঞ্জের α, β, ও, γ তারাগুলি দ্বিতারক। নীহারিকা ও তারাগুচ্ছের মধ্যে M80, M4, M62 উল্লেখযোগ্য।

Sagittarius (ধনু)—২০এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। β, μ, ν, ও ζ তারাগুলি দ্বিতারক। তন্মধ্যে μ ও ζ বাইনারি। M20 নীহারিকা তারাগুচ্ছের বিচিত্র সমাবেশ। M8 ও M22 অপর দুইটি সুন্দর তারাগুচ্ছ। δ তারা পূর্ব্বাষাঢ়া ও T তারা উত্তরাষাঢ়ার যোগতারা।

Capricornus (মকর)—ইহাতে উজ্জ্বল তারার বিশেষ অভাব। ইহা অক্টোবরের প্রারম্ভে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় মধ্যরেখায় আসে; α বহুতারক ও β দ্বিতারক।

Aquarius (কুম্ভ)—ইহা ১লা নবেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় মধ্যরেখায় আসে। λ তারাটি শতভিষা নক্ষত্রের যোগতারা। β, ζ, η, ψ তারাগুলি দ্বিতারক।

Pisces (মীন)—১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় ইহা মধ্যরেখায় আসে। ζ Piscium নামক একটি ক্ষুদ্র তারার ঠিক ১° পূর্ব্ববর্ত্তী এক বিন্দুতে ৪২১ শক বা ৪৯৯ খৃঃ অব্দে বাসন্তবিষুব ছিল। হিন্দু জ্যোতিষে উহাই রাশিচক্রের আদি বিন্দু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ বিন্দু হইতে এখন বিষুব ১৯°।৫২' মিনিট পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ইহাই (১৯°।৫২') এখনকার ১৮৫০ শকের অয়নাংশ।

Aries (মেষ)—৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α, ও γ Aries দ্বিতারক। γ তারার দ্বিতারকত্ব মুক্ত চক্ষুতেই ধরা পড়ে। ζ Piscium তারার ১° পূর্ব্ববর্ত্তী রবিমার্গের বিন্দু বিশেষ হইতে হিন্দু রাশিচক্রের আরম্ভ। খৃঃ ৪৯৯ অব্দে এখানে বিষুব ছিল। এখন তথা হইতে বিষুব ১৯°।৫২' পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ζ Piscium এর ১° পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিন্দু—হিন্দু মেষরাশি ও আশ্বিনী নক্ষত্রের—আদি বিন্দু। বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য এই বিন্দুতে ১১ই এপ্রিল উপস্থিত হয়।

রবিমার্গের দক্ষিণের তারাপুঞ্জ

Centaurus—২২শে মে সন্ধ্যা প্রায় ৮টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α তারাটি অতিশয় উজ্জ্বল। পৃথিবী হইতে α Centaurus-এর দূরত্ব ২০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ইহার ব্যাস আমাদের সূর্য্যের ৮½ গুণ। সমস্ত তারার মধ্যে এই তারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। ইহা দ্বিতারক।

Cetus—২১এ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। O Cetus পরিবর্ত্তনশীল তারা, ইহার পরিবর্ত্তন অতীব বিস্ময়কর—এইজন্য ইহার অপর নাম 'The wonderful'। ইহা ১·৭ ঔজ্জ্বল্যমান হইতে নামিতে নামিতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার প্রায় ৩৩২ দিনে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

Piscis Australis—নবেম্বরের প্রথমে—সন্ধ্যা প্রায় ৭টায়—ইহা মধ্যরেখায় আসে।

Grus—ইহা নবেম্বরের প্রথমে সন্ধ্যার সময় মধ্যরেখায় আসে।

বঙ্গোপসাগরে ঝড়*

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র

বঙ্গোপসাগরের বাতাবর্ত্ত বা ঝড় (Cyclone), উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের টাইফুন, (Typhoon) এবং পশ্চিম ভারতের (West Indies) প্রবল ঝটিকার (Hurricane) একই স্বভাব। এই সকল বাতাবর্ত্তে বায়ু প্রবল বেগে কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বে বামাবর্ত্তনে ঘুরে, কিন্তু কেন্দ্রস্থ বায়ু নিশ্চল থাকে। নাবিকেরা এই কেন্দ্রকে "ঝড়ের চক্ষু" বলিয়া অভিহিত করে। এই ঘূর্ণ্যমান বায়ুর অগ্রগামী গতি আছে।

এই আবর্ত্তের যে কোন অংশের বায়ুর দুইটি ভাগ দেখা যায়—প্রথমটি ঝড়ের স্বাভাবিক গতির জন্য এবং দ্বিতীয়টি আবর্ত্তের ঘূর্ণ্যনের জন্য। ঝড়ের গমনপথের দক্ষিণে উপরোক্ত দুই ভাগের বায়ু একই দিকে প্রবাহিত হয়; কিন্তু বামে বিপরীতগামী হইয়া থাকে। ইহার ফলে, ঝড়ের গমনপথের দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ-অর্দ্ধবৃত্তে (Semicircle) বায়ুর বেগ বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

আবহবিভাগের মানচিত্রে ঝড়ের বিবরণীতে দেখা যায় যে, সমবায়ুচাপ-জ্ঞাপক রেখাগুলির (Isobaric lines) বিভাগ কদাচিৎ একরূপ হয়। ঝড়ের কেন্দ্রের

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আকার অনুযায়ী ঐ রেখাগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকে এবং প্রায়ই দেখিতে অণ্ডাকৃতি হয়। ঝড়ের সময় বায়ুর গতি অল্পবিস্তর বৃত্তাকারে কেন্দ্রাভিমুখী থাকে; উহাতে সমবায়ুচাপ-জ্ঞাপক রেখার সহিত ঐ বায়ুর বিভিন্ন বৃত্তপাদে (quadrant) বিভিন্ন কোণের (angle) সৃষ্টি করে এবং ঐ কোণের পরিমাণ সাধারণতঃ ৩০° ডিগ্রী হইয়া থাকে। ইহা মনে রাখা উচিত যে, ঝড়ের বেগ প্রান্তভাগে অত্যন্ত বেশী হয় এবং কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

ঝড়ের বেগ ও আয়তন।—বায়ুর গতি ঘণ্টায় ৪০ হইতে ৫০ মাইল হইলে বাতাবর্ত্ত বা ঝড় (cyclone) বলিয়া অভিহিত হয়। যখন বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল বা তদূর্দ্ধ হয়, তখন তাহাকে ভীষণ ঝড় (hurricane) বলে।

সকল ঝড়ই ক্রমশঃ বাড়ে এবং প্রারম্ভে বায়ুর গতি অতি অল্পই থাকে। ঝড়ের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। ঝড়ের বেগের সহিত ঝড়ের আয়তনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বড় আয়তনের ঝড়ের বেগ কম, ছোট আয়তনের ঝড়ের বেগ অত্যন্ত বেশী। বাতাবর্ত্তের ক্ষেত্রকে তিন অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে :—

১। ঝড়ের প্রান্তভাগে (Outer Zone) বায়ুচাপ অল্প অল্প কমিতে থাকে ও তথায় বায়ু ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়।

২। ঝড়ের মধ্যভাগে (Middle Zone) বায়ুচাপ শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া থাকে ও তথায় বায়ু ঘণ্টায় ৬০ হইতে ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়।

৩। ঝড়ের চক্ষুতে (eye or centre) অর্থাৎ কেন্দ্রে বায়ু একেবারে নিশ্চল থাকে; এবং প্রায়ই আকাশ পরিস্কার ও বৃষ্টিশূন্য হয়। ইহার পরিধি কদাচ ১৫ হইতে ২০ মাইলের বেশী হয়।

ঝড়ের মধ্যভাগের প্রশস্ততার হিসাবে ঝড়ের আয়তন স্থির করা হয়; কিন্তু কেন্দ্রের বায়ুচাপের হ্রাস হিসাবে ইহার বেগ নির্ণীত হইয়া থাকে। স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাবর্ত্তের বেগ বাড়ে; এবং উপকূলে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বেই কেন্দ্রের বায়ুচাপ অত্যন্ত কম হইয়া যায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ঝড় যখন উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সেই ঝড়ের মধ্যে পড়িলে বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেশী।

বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের পরিধি কদাচিৎ ৬০০ মাইলের বেশী হয়। অধিকাংশ ঝড়েই ১৫০ মাইলের বেশী পরিধি প্রায় হয় না এবং ইহার বেগও অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। বড় ঝড়ের কেন্দ্র বলিলে যাহা বুঝায়, ছোট ছোট ঝড়ে তাহা প্রায় প্রকট হয় না এবং ঝড়ের মধ্যবর্ত্তী অংশের বায়ুর বেগও বেশী বৃদ্ধি পায় না। ছোট ছোট ঝড়ের বায়ুর গতি, ও তৎকালীন সমুদ্রের অবস্থা ও আবহাওয়া ঠিক বড় ঝড়ের প্রান্তভাগের (Outer Zone) অনুরূপই থাকে।

ঝড়ের সময়।—বঙ্গোপসাগরে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমের (N. E. Monsoon) জন্য বায়ু নিয়মিতভাবে উত্তর-পূর্ব্ব হইতে মধ্যমবেগে প্রবাহিত

হয়। মার্চ মাসের প্রারম্ভ হইতে উত্তর- ও মধ্য-এশিয়ার উত্তাপের ক্রত বৃদ্ধির জন্য মৌসুমবায়ুর আরম্ভ হয় এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগে বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এপ্রিল মাসে এই বেগ ক্রমশঃ নিম্নদিকে (অর্থাৎ উপসাগরের দিকে) বিস্তৃত হয়। এপ্রিল ও মে মাসে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু আর বহে না। তখন বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে বিভিন্ন গতির মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। জুন মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বহমান থাকে। অক্টোবর মাস হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ঐ মাসে আবহাওয়ার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিমগামী হয়। তৎপরে বক্র গতিতে ক্রমে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইয়া শেষে মাদ্রাজ উপকূলে আর্দ্র উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুরূপে উপনীত হয়; এবং মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে নাতিপ্রবল হইতে অতি-প্রবল বারিপাতের কারণ হইয়া থাকে। উপরোক্ত কারণে বৎসরকে চারি অংশে বিভক্ত করা হয়।

(১) উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমের (N. E. Monsoon) সময়—১লা জানুয়ারী হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

(২) প্রথম ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়—১৫ই মার্চ্চ হইতে ৩০শে মে পর্য্যন্ত।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের (S. W. Monsoon) সময়—১লা জুন হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।

(৪) শেষ ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়—১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত।

দক্ষিণ-পশ্চিম গতির বায়ু যে সময়ে প্রায় অবিচলিতভাবে বঙ্গোপসাগরের প্রবেশ-পথে ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়, কেবল সেই সময়েই বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমের সময় ইহা হয় না। তাহা হইলেই কেবলমাত্র এপ্রিল মাসের প্রারম্ভ কিম্বা মধ্য হইতে ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা যায় এবং সেইজন্যই ইহা ঝড়ের কাল বলিয়া অভিহিত হয়।

ঝড়ের পৌনঃপুনিকতা (Frequency of storms)।—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের সময় অর্থাৎ ১লা জুন হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধারাবাহিক ঝড় হইয়া থাকে। ইহারা বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে উদ্ভূত হয়; এবং স্থলপথের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের মধ্য ও উত্তর ভাগে প্রবল গতিতে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সকল ঝড়ের আয়তন এবং বেগ বিশেষ বেশী নহে; ইহারা কদাচিৎ কেন্দ্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে ও ইহাদের ভিতরের অংশে বায়ু বিশেষ প্রবল হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝড়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব বৃত্তপাদে বায়ুর বেগ ঘন্টায় ৩৫ মাইলের বেশী হয় না।

মে ও অক্টোবর মাসে—ঋতুপরিবর্ত্তনের সময়—পূর্ব্ববর্ণিত সময়াপেক্ষা ঝড়ের সংখ্যা কম হইয়া থাকে; কিন্তু এই ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় যে ঝড় হয়, তাহার বেগ ও পরিমাণ খুব বেশী। উহার

এক-তৃতীয়াংশ ঝড়ে কেন্দ্র বেশ পরিস্ফুটভাবে দৃষ্ট হয় এবং ভিতরের অংশের বায়ুর বেগও খুব প্রবল হইয়া থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তিস্থান ও তাহার গতিপথ।—বিষুবরেখার উপরে বা সন্নিকটে ঝড়ের উৎপত্তি হয় না। পঞ্চম অক্ষরেখার (Latitude) দক্ষিণে ঝড়ের উৎপত্তির কথা এ'পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বঙ্গোপসাগরই প্রায় অধিকাংশ ঝড়ের উৎপত্তিস্থান; এবং ইহারা অষ্টম অক্ষরেখার উত্তরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্যাম-উপসাগর হইতে মালয়-উপদ্বীপের উপর দিয়া বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু আরব সাগরে উৎপন্ন কোন ঝড় ভারতবর্ষের উপর দিয়া বঙ্গোপসাগরে আসে নাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের সময় বঙ্গোপসাগরে যে কারণে (আর্দ্র দক্ষিণ বায়ুর স্থলাভিমুখে অগ্রগমন) ঝড়ের উৎপত্তি হয়, তাহা উক্ত সাগরের যে কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চম অক্ষরেখার উত্তরে, উপকূলের নিকটে, বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে কিংবা মার্ত্তাবান্ উপসাগরে, এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ঝড়ের উৎপত্তি সম্ভব; বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তনের উপর ঝড়ের উৎপত্তিস্থান নির্ভর করে।

ভিন্ন ভিন্ন মাসে ঝড়ের উৎপত্তিস্থান ও তাহাদের গতিপথের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এপ্রিল—এই মাসে ঝড় অপেক্ষাকৃত বিরল। তবুও এ'মাসে যে সকল ঝড় হয়, তাহারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকট কিংবা উপসাগরের দক্ষিণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শেষোক্ত অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত স্থানেই ইহাদের উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বেশী। সাধারণতঃ ইহাদের গতি উত্তর দিকে কিংবা ঈশান কোণে (N. E.)—ব্রহ্ম উপকূলের দিকে।

মে—এই মাসে ঝড় বারংবার হইয়া থাকে। যেগুলি মাসের প্রথমার্দ্ধে হয়, তাহারা সাধারণতঃ উপসাগরের দক্ষিণে কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাসের শেষার্দ্ধে কিন্তু সাধারণতঃ ষোড়শ অক্ষরেখার উত্তরে উপসাগরের যে কোনও স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাদের গতি পশ্চিম, উত্তর এবং ঈশান কোণের (N. E) মধ্যবর্ত্তী স্থানের দিকে হইয়া থাকে।

জুন—এই মাসে ঝড় খুব ঘন ঘন হয়; কিন্তু উহাদের বেগ প্রায়ই মাঝামাঝি ধরণের। অধিকাংশ ঝড়ই অষ্টাদশ অক্ষরেখার উত্তরভাগে উৎপন্ন হয়; কিন্তু কখন কখন দশম অক্ষরেখার উত্তরেও হইয়া থাকে। ইহাদের গতি পশ্চিমে অথবা বায়ু কোণে (N. W.)—বঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলের দিকে; কিন্তু কখনও কখনও ব্রহ্ম উপকূলের দিকেও হইয়া থাকে।

জুলাই—এমাসেও গত মাসের ন্যায় মধ্যম বেগের ঝড় ঘন ঘন হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরার্দ্ধে উৎপন্ন হইয়া ইহারা উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণ ভেদ করিয়া পশ্চিম দিক অথবা পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম (W. N. W.) দিকে গমন করে।

আগষ্ট—এই মাসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসাপেক্ষা ঝড়ের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ষোড়শ অক্ষরেখার উত্তরে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদিক অথবা বায়ু-কোণগামী (N. W.) হইয়া বঙ্গ ও উড়িষ্যা উপকূলের দিকে গমন করে। সাধারণতঃ ইহাদের বেগ মধ্যম।

সেপ্টেম্বর—এই মাসে ঝড়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসাপেক্ষা ইহাদের উৎপত্তিস্থান সচরাচর কিছু দক্ষিণে; কিন্তু সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ অক্ষরেখার উত্তরেই হইয়া থাকে। ইহাদের বেগ মধ্যম কিংবা প্রচণ্ড দুই রকমই হয়। ইহাদের গতি পশ্চিম এবং উত্তর-উত্তরপূর্ব্বদিকের (N. N. E.) মধ্যবর্ত্তী যে কোন দিকে হইয়া থাকে।

অক্টোবর—এই মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসাপেক্ষা ঝড় অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমের সাগরের দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ঝড়ের উৎপত্তিস্থান ও গতিপথের (track) স্থানপরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। তখন সাগরের যে কোন স্থানে ঝড়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহার গতি পশ্চিম এবং ঈশান কোণের মধ্যবর্ত্তী যে কোন দিকে হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ যে সব ঝড় ৯০ দ্রাঘিমার (Longitude) পশ্চিমে উৎপন্ন হয়, তাহাদের গতি পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী; কিন্তু যেগুলি উক্ত দ্রাঘিমার পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়ই প্রথমে উত্তর-উত্তরপশ্চিমগামী (N. N. W.) হয়। পরে বক্রগতি হইয়া ঈশান কোণাভিমুখে গমন করে। এই মাস জাহাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

নবেম্বর—অক্টোবর মাসাপেক্ষা এই মাসে ঝড় অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু ঐ মাসের ঝড়ের ন্যায় প্রায়ই ইহাদের বেগ অত্যন্ত ভীষণ হয়। ইহারা সাগরের যে কোন স্থানে—কিন্তু ষোড়শ অক্ষরেখার দক্ষিণে—উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ঝড়গুলি দ্বাদশ ও ষোড়শ অক্ষরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হয়, সেগুলির গতি প্রথমে বায়ুকোণের দিকে, পরে উত্তর দিকে এবং সর্ব্বশেষে ঈশানকোণে বাঁকিয়া সাগরের উত্তরাংশের দিকে অগ্রসর হয়। যেগুলি ১২শ অক্ষরেখার নিম্নে উৎপন্ন হয়, তাহারা সাধারণতঃ পশ্চিম কিম্বা বায়ুকোণাভিমুখী হইয়া মান্দ্রাজ উপকূলের দিকে গমন করে।

ডিসেম্বর—সাগরে এই মাসে ঝড় একরূপ বিরল। কিন্তু যদি হয়, তাহা হইলে ভীষণাকার ধারণ করে এবং ১৬শ অক্ষরেখার দক্ষিণে সাগরের মধ্যভাগে কিম্বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই মাসে ঝড়ের উৎপত্তির কথা জানা যায় না। কতক ঝড় পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম (W. N. W.) গতিতে মান্দ্রাজ উপকূলের দিকে এবং কতকগুলি বক্রগতিতে সাগরের উত্তর দিকে অথবা ব্রহ্ম কিম্বা পেগু উপকূলের দিকে গমন করিয়া থাকে।

ঝড়ের গতির হার।—বিভিন্ন ঝড়ের গতির হার বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন অবস্থায় একই ঝড়ের গতিও বিভিন্ন প্রকার হয়। ঝড়ের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় ইহার গতি প্রায়ই স্থির, কিম্বা ঘণ্টায় ৪ মাইলের অধিক হয় না; কিন্তু যখন পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন

ঘণ্টায় ১০।১২ মাইল বেগে অগ্রসর হয় এবং সাগরে অবস্থানকালীন প্রায় এই বেগই থাকে। কিন্তু উপকূলের দিকে যত অগ্রসর হয়, ইহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া পড়ে প্রায় ১৫ মাইল হয়। যে সব ঝড়ের গতি বক্র, তাহাদের বেগ সেই সময়ে সাধারণতঃ একটু কম থাকে।

বার্লিনের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান

৭। প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যাপীঠ

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম (১৮০৯) হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহালয় (ৎসোলোগিশেস্ মুজেয়ুম্) তৈয়ারী করা হয়। এই সংগ্রহালয়ের জন্য সর্ব্বপ্রথম বস্তু পাওয়া যায়—রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয় হইতে। পরে নানা লোকের উপহার আসিয়া জুটিয়াছে। অনেক জিনিষ কিনিয়াও আনা হইয়াছে।

রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয়ের সবকিছুই প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহালয়ের কপালে জুটে নাই। তখনকার দিনে বার্লিনে নামজাদা অস্থিতত্ত্ববিৎ ছিলেন রুডোল্‌ফি। তিনি আর একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার কারবার ছিল—প্রাণিপুঞ্জের হাড়গোড়, মাংসপেশী ইত্যাদির কাটা-ছিঁড়া করা। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি রাজকীয় প্রাকৃতিক সংগ্রহালয় হইতে অনেক কিছু পাইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠানের নাম—"ৎসোটোমিশে ৎসাম্‌লুঙ্।"

প্রাণিতত্ত্ব-মুজেয়ুমের একটা বড় যুগ হইতেছে ১৮১৫ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত। এই সময়ে তাহার কর্ণধার ছিলেন নামজাদা বিজ্ঞানবীর লিখ্‌টেনষ্টাইন্। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও ছিল তাঁহার অন্যতম কাজ। ১৮৪৩ সনে তিনি বার্লিনের "ৎসো" বা জুঅলজিক্যাল্ গার্ডেন গড়িয়া তোলেন। তাঁহার আমলে মিউজিয়ামের বস্তুগুলা সাজানো-গুছানো হয়। অধিকন্তু প্রথম প্রথম অনেক নতুন নতুন চিজ্ কেনাও চলিতে থাকে। কিন্তু এই বহর বাড়াইবার কাজ পয়সার খেলা। আর ডিরেক্টার-বিজ্ঞানবীরদের খেয়াল মাফিক বিজ্ঞানসেবার জন্য পয়সা জুটা সর্ব্বদা সম্ভবপর নয়। বার্লিনের সরকার লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন্‌কে শেষ পর্য্যন্ত জবাব দিলেন,—"এ পর্য্যন্ত যা পেয়েছ, বাবা, তাতেই যা পার করে চল। আজ থেকে চরে খাও।" মিউজিয়ামের দারিদ্র্য বেশ একটু উল্লেখযোগ্য কোঠায় আসিয়াই ঠেকিয়াছিল। গৃহস্থ লোকেরা যেমন দায়ে পড়িলে অনেক সময় লোটাবাটি, আসবাব-পত্র, স্ত্রীর গহণা ইত্যাদি বাঁধা দিয়া অথবা একদম বেচিয়া কোনোমতে একবেলা বা দু'বেলা আঁচাইবার ব্যবস্থা করে, লিখ্‌টেন্‌ষ্টাইন্‌কেও মুজেয়ুমটা বাঁচাইবার জন্য সেই নীতিই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। "সর্ব্বনাশে

সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতাঃ"—এই বুঝিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের পণ্ডিত মহাশয় নিজ মুজেয়ুমের বস্তুগুলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক সেরা মাল বাজারে বেচিতে বাধ্য হন। কথাটা যুবক-ভারতেও মাঝে মাঝে মনে রাখা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রশিয়ার "ৎসোয়োগিসেস্ মুজেয়ুম্" পয়সার অভাবে নিজ সংগৃহীত বস্তু বেচিয়া কোনোমতে জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হয়। বিজ্ঞানজগতে জরুরি অনেক জিনিষ বটে,—কিন্তু জরুরি বলিলেই জিনিষ আসিয়া জুটে না। দারিদ্র্য-দুর্য্যোগ সত্ত্বেও মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা চাই—ইহারই নাম বিজ্ঞান-"সাধনা।"

"বাঘা" "বাঘা" অধ্যাপকেরা এক একটা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত অথবা নতুন নতুন গবেষণা-প্রণালীর জন্মদাতা বা প্রচারক নামে বিজ্ঞানজগতে সুপরিচিত। লিথ্‌টেনষ্টাইনের আমলে প্রাণিতত্ত্ববিদ্যাটা চামড়া, খোলস ইত্যাদিতেই অনেকটা আবদ্ধ ছিল। জনোয়ারের ভিতরে প্রবেশ করা তখনও বড় একটা দস্তুর ছিল না। জীবজন্তুর বাহ্য লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেই লোকেরা প্রাণিতত্ত্ববিৎরূপে বাজারে দাঁড়াইয়া যাইত। কিন্তু লিথ্‌টেনষ্টাইনের পর বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যক্তি প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক বাহাল হন, তিনি ছিলেন জানোয়ারের ভিতরে প্রবেশের পক্ষপাতী। "সেকেলে" প্রাণিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁহার গবেষণা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। "নবীন প্রাণিবিজ্ঞানের" বিশেষত্ব হইল জানোয়ারের হাড়গোড়, মাংশপেশী ইত্যাদি কাটাছিঁড়া করা। 'অ্যানাটমি' বা অস্থিবিদ্যা ছাড়া জীবজন্তুর রূপভেদ, গড়ন-ভেদ, জাতি-ভেদ আবিষ্কার চলিতে পারেনা। এই হইল নয়া বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত—পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই গবেষণা-প্রণালীর কাজ চলিতে থাকে। প্রবর্ত্তক ছিলেন অধ্যাপক পেটার্স। জানোয়ারের বাহ্য লক্ষণ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার খেয়াল পেটার্স লাভ করেন—তাঁহার গুরু ম্যিলারের নিকট হইতে। ম্যিলার ছিলেন সেকালের জগৎ-প্রসিদ্ধ "ফিজিওলজিষ্ট"। তাঁহার অধ্যাপনায়, শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিদ্যায় ওস্তাদি লাভ লাভ করিবার ফলে পেটার্স সেকেলে প্রাণিতত্ত্ববিদ্যায় একটা নতুন দস্তুর লাগাইতে সমর্থ হন।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার আর এক ধাপ সুরু হয় ১৮৮৪ সনে। সেই বৎসর শুল্‌ৎসে অধ্যাপক বাহাল হন। বাহাল হইবার সময়ই তিনি কড়ার করেন যে, সংগ্রহালয়-পরিচালনার সঙ্গে অধ্যাপনার কোন যোগাযোগ থাকিতে পারিবে না। অধিকন্তু প্রাণিতত্ত্ব শিখাইবার জন্তই একটা স্বতন্ত্র "ইন্‌ষ্টিটুট্" খাড়া করিতে হইবে। "ইন্‌ষ্টিটুট্" হইতেছে খাঁটি ল্যাবরেটরী-জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এখানে যা কিছু সবই লেখাপড়া, পরীক্ষা-পরখ ইত্যাদির সহায়ক। মামুলি দর্শনযোগ্য বস্তুর ঠাঁই "ইন্‌ষ্টিটুটে" থাকিতে পারে না। শুল্‌ৎসের তত্ত্বাবধানে এইরূপ লেখাপড়ার সহায়ক মালপত্র আকারে-প্রকারে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের ব্যবহারোপযোগী বহুসংখ্যক দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে ; তাহার সাহায্যে প্রাণীদের শ্রেণী, জাতি, উপজাতি ইত্যাদি বংশপরিচয় নির্দ্ধারণ করিতে সুযোগ জুটে। জানোয়ারে জানোয়ারে হাড়গোড় মাংসপেশীর

তুলনায় সমালোচনাসাধনও এই সব বস্তুর সাহায্যে সহজ হইয়া আসে। অধিকন্তু জীবজন্তুর ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষেও আণুবীনিক দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক হয়। তাহা ছাড়া "ইনষ্টিটুটে" সংগৃহীত হইয়াছে—কাঠ, প্লাষ্টার, কাচ ইত্যাদি উপকরণে প্রস্তুত নানাপ্রকার "মডেল" বা অনুকরণ-বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক জীবজন্তুর নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের নমুনা ও গবেষণা-পরীক্ষার জন্য মজুত রহিয়াছে। কাটাছিঁড়ার ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতির রেওয়াজ খুব বেশী বলাই বাহুল্য। কাজেই "ইনষ্টিটুটে"র "ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টারিয়ুম" বা যন্ত্র-ভবন বেশ বড়; তাহাতে আছে গণ্ডা গণ্ডা অণুবীণ, আণুবীনিক ফটো তোলার আসবাব ও কলকব্জা, আর অন্যান্য "অস্ত্রশস্ত্র।" "ইনষ্টিটুটের" অন্যতম সম্পদ গ্রন্থশালা। ৮,০০০ খানা ছোট বড় মাঝারি কেতাব আর ৩৪ টা প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক দেশী-বিদেশী পত্রিকা ছাপার হরপে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাইয়া থাকে।

"পঠন-পাঠনের" কায়দা ঋতু অনুসারে বিভিন্ন। গ্রীষ্মকালে শিক্ষাপ্রণালী "মাক্রো-স্কোপিশ-ৎসোটোমিশ"—অর্থাৎ খোলা চোখে জানোয়ারের ভিতর-বাহির যতটা বুঝা সম্ভব, তাহার আলোচনা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটাছিঁড়া করার কৌশলও ইহার অন্তর্গত। শীত কালের পাঠ-চর্চ্চা "মিক্রোস্কোপিশ-ৎসোলোগিশ।" অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন-সংক্রান্ত যে সকল খুঁটিনাটি মামুলি চোখে দেখা-বুঝা অসম্ভব, তাহার জন্য দরকার হয় অণুবীন। শীতকাল এই অণুবীনের পালা। ছাত্রসংখ্যা প্রত্যেক ঋতুতেই গড়ে প্রায় ২০০।

এই গেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত ছেলে পিটাইয়া মানুষ করিবার ব্যবস্থা। বার্লিনে প্রাণি-তত্ত্ব চর্চ্চার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। একটা পরিষদের নাম—"গেজেলশাফ্‌ট্ নাটুর-ফোর্শেণ্ডার-ফ্রয়ণ্ডে" (প্রকৃতি-গবেষক-সুহৃৎ-সমিতি)। "ডায়চে এণ্টোমোলোগিশে গেজেল-শাফ্‌ট্" (জার্ম্মাণ-কীটতত্ত্ব-সমিতি) নামে একটা পরিষৎ আছে। "ডায়চে ওর্ণিথোলোগিশে গেজেলশাফ্‌ট্" (জার্ম্মাণ-পক্ষিতত্ত্ব-সমিতি) একটা স্বতন্ত্র পরিষৎ। তাহা ছাড়া প্রকৃতিতত্ত্ব-সংগ্রহালয়ের সুহৃৎ-সঙ্ঘ নামে চলিতেছে "ফারাইণ ডার ফ্রয়ণ্ডে ডেস্ মুজেয়ুম্‌স্ ফ্যির নাটুর-কুণ্ডে।"

৮। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-সংগ্রহালয়

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক "মুজেয়ুম" এক সঙ্গে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তরুলতার শ্রেণী ও জাতিভেদ শিখাইবার জন্য এটা ল্যাবরেটরী বা বিদ্যাপীঠ। উদ্ভিদজগতের ভূগোল শিখাইবার কাজেও এই মুজেয়ুম হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। অধিকন্তু ওষুধপত্রের গাছগাছড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনও এই কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া "ঔপনিবেশিক" তরুলতার চর্চ্চা এখানকার অন্যতম লক্ষ্য। "কোলোনিয়াল" শব্দে জার্ম্মাণরা ইয়োরামেরিকার বহির্ভূত গোটা দুনিয়াটাকেই ধরিয়া লয়। এই পারিভাষিকে আমাদের ভারতীয় শাকশাজী লতাপাতা ফলমূল ঔপনিবেশিক উদ্ভিদ-তত্ত্বেরই অন্তর্গত।

"বোটানিশেস্ মুজেয়ুম"টা "ইনষ্টিটুটের" উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইহা একমাত্র সংগ্রহালয় নয়। লেখাপড়া, গবেষণা, পরীক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই এই আওতায় চালানো হইয়া থাকে।

আজকালকার সংগ্রহালয়টা বিপুল বিদ্যাকেন্দ্র। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সংগ্রহালয়ের মতন এটারও বিপুলতা আস্তে আস্তে বাড়িয়াছে। এখানে যে সব তরুলতা গাছগাছড়া ফলফুল সংগৃহীত দেখিতে পাই তাহার কোনো কোনোটা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একত্র করা হইয়াছিল। এই সংগ্রহের কাজ দুই একজন গাছ-"বাতিকওয়ালা" লোকের ব্যক্তিগত খেয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। পরে এইসব সংগ্রহ "আকাডেমী ড্যর হ্বিসেন্‌সেন্‌শাফ্‌টেন" (বিজ্ঞান-পরিষদ) নামক রাজকীয় সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে সঁপিয়া দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত একটা স্বতন্ত্র "হার্বারিয়ুম" বা উদ্ভিদ-সংগ্রহালয় সরকারী তাঁবে দেখা দেয়। সে ১৮১৮ সনের কথা। তাহার ভিতর প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ ফোন হুম্বল্ড সংগৃহীত দক্ষিণ আমেরিকার তরুলতাসমূহ আসিয়া জুটে। এই অবস্থায় "হার্বারিয়ুম" টাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক লিঙ্ক্।

একমাত্র উদ্ভিদ-সংগ্রহালয়ের কেন, সকল প্রকার সংগ্রহালয়েরই জীবনলীলা নির্ভর করে পর্য্যটনের উপর। দেশের লোকের মাথায় পর্য্যটনের বাতিক না চাপিলে আর সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-সংগ্রহের নেশা না চাপিলে মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেখাও দেয় না, বাড়েও না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কতকগুলা জার্ম্মাণ "ভবঘুরে" নামজাদা হয়। তাহাদের কয়েকজনের বাতিক ছিল "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ"-সম্পর্কিত। হুম্বল্ডের নাম প্রথমেই করা হইয়াছে। কামিসো নামক একজন বিজ্ঞানসেবী পালে টানা জাহাজে দুনিয়া টহল দিয়া আসেন। এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণার ফলে "হার্বারিয়ুমে"র সংগ্রহ বেশ পুরু হয়। জেল্লোজ ঘুরিয়াছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন লিখটেন-ষ্টাইন। মেক্সিকোর বনে জঙ্গলে টহল দিয়াছিলেন শীডে আর ডেপ্পে। কানারী দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করেন বুক্স্। এই সকল "ভবঘুরে"দের দৌলতে "হার্বারিয়ুম" নানাদিকে বাড়িতে পারিয়াছে।

লিঙ্ক ছিলেন কর্ত্তা ১৮৫১ পর্য্যন্ত। তাঁহাদের পর ব্রাউন ১৮৭৭ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছেন। এই সময়ের বিশেষ সংগ্রহগুলা কুণ্ঠ, এজেনবেক, এবং ক্লোটোস্ব ইত্যাদি সংগ্রাহকের নামের সহিত জড়িত। দেশের লোকের ভিতর কতকগুলা "ভবঘুরে" জুটিলে না হয় দুনিয়ার এখান ওখান সেখান হইতে নানাপ্রকার মাল সংগৃহীত হইল। কিন্তু কোনো এক কেন্দ্রে এই গুলা মজুত করা আবার মুখের কথা নয়। সংগ্রহের খরচের চেয়ে মজুতের খরচ আর মজুত করার পর সে সব রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আরও বেশী। বামুন ঠাকুর হাতীটা না হয় বিনা পয়সাই দানস্বরূপ পাইয়া বসিল। কিন্তু হাতী পুষে কে? সংগ্রহালয়ের কাণ্ড গরীবের হাতী পোষা বিশেষ। বার্লিনের উদ্ভিদ-সংগ্রহালয় বহুবার স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজ যে বাড়ীতে ইহার ঠাঁই কাল সেই বাড়ীতে আর কুলায় না। মাল-বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে

এইরূপ ঘরবাড়ীর দুর্যোগ মিউজিয়াম মাত্রেরই অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানটা যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহার বয়স আজ মাত্র বিশ বাইশ বৎসর। ১৯০৭ সনে এই নবীন ভবনে গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভবন বিপুল। পঠন-পাঠনের ঘর, শাসনপরিচালনার ঘর, গ্রন্থশালা, ল্যাবরেটরী, অনুসন্ধান-গবেষণাগার ইত্যাদি সবই এক জায়গায়। ল্যাবরেটরীতে একশ জন ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে অনুবীণের কাজ চালাইতে পারে। লাইব্রেরীতে আছে ৫০,০০০ কেতাব আর ৮১টা পত্রিকা। তাহা ছাড়া জনসাধারণের জন্য খোলা আছে প্রদর্শনী-গৃহ।

উদ্ভিদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে একটা "বাইঅলজিক্যাল" বা প্রাণতত্ত্ব বিষয়ক বিভাগ চলিতেছে। তরুলতার জীবনবিকাশ, বাড়তি ও বিস্তার ইত্যাদি জীবনঘটনা অণুবীণের সাহায্যে অনুসন্ধান করা হয়। পরে সব ছবির মারফৎ সেই বৃহদাকারে দেখানো হইয়া থাকে। পরগাছা, কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদ ইত্যাদির জীবনবৃত্তান্ত এই বিভাগের বিশেষরূপে আলোচ্য বস্তু।

মুজেয়ুমের বড় ঘরে অনেকগুলা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ-জগতের বংশলতিকা এই সকল ছবির ভিতর ধরিয়া রাখা হইয়াছে। "পাল্যেও-বোটানিশ" বিভাগে উদ্ভিদজগতের প্রত্নতত্ত্ব আলোচিত হয়। দর্শনযোগ্য বস্তুর ভিতর দক্ষিণ আল্পস পাহাড়ে আবিষ্কৃত "সেকেলে" তালগাছের "ফসিল" বা প্রস্তরীভূত রূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পারিবারিক, সাংসারিক বা আর্থিক জীবনে যে সকল গাছ-গাছড়া কাজে লাগে তাহার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার জন্য যে ঘরগুলা দেখা যায় তাহার ভিতর নিম্নতম উদ্ভিদ হইতে সুরু করিয়া উচ্চতম উদ্ভিদজীবনের গড়ন স্তরে স্তরে বুঝানো রহিয়াছে।

আজকালকার পরিচালক হইতেছেন অধ্যাপক ডীল্স্। ইনি উদ্ভিদ-জগতের ভূগোলতত্ত্বে ওস্তাদ। রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের গাছ গাছড়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ফী বৎসর গড়ে প্রায় ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকে।

বার্লিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এই বিদ্যার জন্য কতকগুলা প্রতিষ্ঠান আছে। "ডয়চে বোটানিশে গেজেলশাফট্" (জার্ম্মাণ উদ্ভিদ-তত্ত্ব সমিতি), "ফ্রাইয়ে ফারাইনিগুঙ ফিয়র প্লান্ৎ-সেন-গেওগ্রাফী উণ্ড সিষ্টেমাটিক" (উদ্ভিদভূগোল ও উদ্ভিদজাতি চর্চ্চার জন্য বেসরকারী সমিতি) আর "বোটানিশার ফারাইন ফ্যির ডী প্রোভিন্‌ৎস ব্রাণ্ডেনবুর্গ" (ব্রাণ্ডেনবুর্গ জেলার উদ্ভিদতত্ত্ব সমিতি) ইত্যাদি পরিষৎ উল্লেখযোগ্য।

৯। উদ্ভিদ-শরীরাভ্যন্তর প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য বিদ্যার মতন উদ্ভিদতত্ত্বেও যুগে যুগে আকার প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ সন পর্য্যন্ত একজন অধ্যাপকই এই বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচিত হইতেন। অধ্যাপক ব্রাউনের আমল পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছে। পরে দুইটা স্বতন্ত্র বিভাগ কায়েম হয়।

একটার নাম "সাধারণ উদ্ভিদতত্ত্ব", অপরটার নাম "বিশিষ্ট উদ্ভিদতত্ত্ব"। এই সাধারণ বিভাগে "ফিজিঅলজি" বা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়। এইজন্য একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে। নাম "প্লান্ৎসেন-ফিজিওলোগিশেষ ইন্‌ষ্টিটুট"। এই প্রতিষ্ঠানের নবীন গৃহে প্রবেশ ঘটিয়াছে মাত্র সেদিন,—মহা লড়াইয়ের পূর্ব্ব বৎসর, ১৯১৩ সনে। একালের পরিচালকদের মধ্যে হাবার্ল্যাণ্ড বিশেষ নামজাদা। ১৯২৩ সনে তিনি পেন্‌শন পাইয়াছেন।

নতুন বাড়ীতে ৭০ জন এক সঙ্গে গবেষণা চালাইতে পারে। লাইব্রেরিতে আছে ৪০০০ বই, হাজার চারেক পুঁথি, ২৪টা পত্রিকা। খাঁটি ফিজিঅলজি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির জন্য ঘর-দুয়ার ত আছেই। অধিকন্তু রসায়ন এবং ব্যাক্টিরিঅলজি (কীটাণুতত্ত্ব) ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। একটা ঘর সর্ব্বদাই সমান তাপে রাখিবার আয়োজন করা হইয়াছে। কতকগুলা অন্ধকার ঘর, ফটোগ্রাফি কামরা, টীকা লাগাইবার ঘর, জীবনের বাড়তি দেখিবার ঘর ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘর এই ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্তর্গত।

প্রায় শ' দুয়েক ছাত্রছাত্রী এই ইন্‌ষ্টিটুটে লেখাপড়া করে। তাহা ছাড়া গবেষণা চালাইবার জন্য কয়েকজন সর্ব্বদাই মোতায়েন আছে। বর্ত্তমানে পরিচালক অধ্যাপক কীপ।

হাজারিবাগ জেলার ভূঁইয়া জাতির মহারাণী পূজা

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলার ভূঁইয়ারা দ্রাবিড়ী জাতি হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এক্ষণে তাহারা হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে এবং হিন্দু দেব-দেবীরও উপাসনা করিয়া থাকে। আজকাল তাহাদিগকে সমাজে কিঞ্চিৎ উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা জল-আচরণীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই জন্য দ্বিজশ্রেণীভুক্ত লোকেরা তাহাদিগের হস্তে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

ছোট নাগপুরের অন্তর্বর্ত্তী হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলায় ভূঁইয়ারা বাস করে। হাজারিবাগ জেলার হণ্টারগঞ্জ, চাতরা, চম্পারণ, সেমেরিয়া এবং হাজারিবাগ থানায় বহুসংখ্যক ভূঁইয়ার বসতি; কিন্তু রামগড়, গুমিয়া এবং পেটারবার থানা ব্যতীত উক্ত জেলার অপর সকল স্থানে তাহাদিগকে তদাপেক্ষা কম সংখ্যায় দেখা যায়।**

---

* স্যার এইচ রিজ্‌লে প্রণীত The people of India (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামক গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

** Hazaribagh Gazetteer (১৯২৭ খৃঃ সংস্করণ) নামক গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

হাজারিবাগের সন্নিহিত রাঁচি জেলায়ও ভূঁইয়াদের বসতি আছে। হাজারিবাগের ভূঁইয়াদের অপেক্ষা রাঁচির ভূঁইয়ারা অধিকতরভাবে হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে ও হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে। কোনও কোনও লেখক বলেন যে, রাঁচির ভূঁইয়ারা গোঁড়া হিন্দুয়ানির পথে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের বিবাহের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা ব্যতীত অপর কোনও উপলক্ষে তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে পুরোহিত নিযুক্ত করে না। কখনও কখনও তাহাদিগকে মন্ত্রপাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে।

ভূঁইয়াদের বিশ্বাস যে বহু সংখ্যক ভূত প্রেত আছে; যদিও সেই সমস্ত প্রেতদিগের কোনও রূপ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই, তত্রাচ তাহারা মানবজাতির যথেষ্ট অপকার করিয়া থাকে। তাই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহাদের নিকট ছাগ ও কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। ভূঁইয়ারা মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা ভূত ও প্রেতদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১৯১১ খৃঃ লোক গণনায় ১৬৭০০০ ভূঁইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া, এবং ৩০০ অপেক্ষা কিছু বেশী ভূঁইয়া আপনাদিগকে প্রেত-উপাসক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল।*

হাজারিবাগের ভূঁইয়ারা যে সমস্ত ভূত ও প্রেতের উপাসনা করিয়া থাকে এবং যাহাদের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ভূত ও প্রেতেদের মধ্যে "মহারাণী নারী আর একটী প্রেতিনী বা উপদেবী আছে"; এই প্রেতিনীর আর একটী নাম "দেবী"। গত ১৯২৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে আমি হাজারিবাগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেই উপলক্ষে হাজারিবাগের সদর সিভিল হাঁসপাতালের আসিস্টেন্ট সার্জ্জন ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, বি, মহাশয়ের বাটীতে ১৯শে আক্টোবর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলাম। সদর হাঁসপাতালের সম্মুখ দিয়া লিপো রোড নামক রাস্তা দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। হাঁসপাতাল হইতে এই রাস্তা দিয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে পঞ্চ মন্দির নামক রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই মন্দিরের ঠিক পশ্চিম দিক হইতে আর একটি রাস্তা পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে এই রাস্তা দিয়া গমন করিলে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কূলে উপনীত হওয়া যায়। এই নদীতে রজকেরা বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে।

বৃহস্পতিবার ২৭ অক্টোবর প্রাতঃকালে লিপো রোডে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চ মন্দিরের পশ্চিমবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যখন আমি নদীটির দিকে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে উপদেবী মহারাণীর একটা অস্তানায় উপনীত হইয়াছিলাম। নদীটির উপকূলের সন্নিহিত স্থানে একটি শুষ্ক বৃক্ষের গুঁড়িসংবদ্ধ দুইটি বংশদণ্ড দেখিতে পাই। এই বংশ দণ্ড দুইটির শিরোভাগে দুই খণ্ড শ্বেত বস্ত্র নির্ম্মিত দুটি পতাকা সংলগ্ন ছিল, এবং পতাকা দুইটি বায়ুতে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়াছিলাম। সেই স্থলে একজন ভূঁইয়া কৃষক ধান্য সাজিবার জন্য একটি খরিহান নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে জমি খনন করিতেছিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা

---

* Ranchi Gazetteer (১৯২৭ খৃঃ সংস্করণ) নামক গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

করিয়াছিলাম "বাবু হে, তুমি কে এবং কি জন্য শ্বেত পতাকা সংলগ্ন এই বংশ দুইটি শুষ্ক বৃক্ষ-গুঁড়িতে সংবদ্ধ করিয়াছ?" উত্তরে ভূঁইয়া বলিল :—"মহাশয়, এই দুইটি পতাকা সংলগ্ন বংশদণ্ড আমাদের উপদেবী মহারাণীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। যখন কোনও অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে আমরা কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, সেই কার্য্যে যাহাতে আমাদের সিদ্ধিলাভ হয়; কিম্বা যখন আমরা পীড়িত হই, তখন যাহাতে আমরা সেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, এই দুই বর প্রার্থনা করিয়া আমরা আমাদের দেবী মহারাণীর উপাসনা করিয়া থাকি। যখন দেবী আমাদের অভিষ্ট বর দেন, আমরা তাঁহার উদ্দেশে দুই খণ্ড বংশে শ্বেত পতাকা সংলগ্ন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করি। মহাশয়, আপনি এই যে দুইটি বংশদণ্ড দেখিতেছেন, তাহা মহারাণীর উদ্দেশেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে! আমাদের দেবীর কোন স্বরূপ বা প্রতিকৃতি নাই, তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই এবং তাঁহার কোনও প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয় নাই।"

ভূঁইয়া কৃষক আমার নিকট তাহাদের দেবী মহারাণীর যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, দেবী মহারাণী তাঁহার উপাসকদের মঙ্গলই করিয়া থাকেন; Ranchi Gazetteer নামক পুস্তকের লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—ভূঁইয়াদের উপাস্য উপদেবদেবিগণ অনিষ্টকারক এবং তাঁহারা তাঁহাদের উপাসকদিগের অপকারই করিয়া থাকেন, সেই মন্তব্যটি কিন্তু আমাদের দেবী মহারাণীর সম্বন্ধে খাটে না।

হাজারিবাগ ও রাঁচি জেলা নিবাসী ভূঁইয়া জাতির মধ্যে দেবী মহারাণীর যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দক্ষিণ বিহার অঞ্চলের মৌর্য্য রাজবংশাবলীর প্রাক্কাল নিবাসী লোকদিগের মধ্যে দেবীমার যে পুজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

পাটলিপুত্রের অবস্থানভূমি খনন করিতে করিতে সর্পবিজড়িত মস্তক বিশিষ্ট এই দেবীমাতার একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি এখন পাটনার যাদুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে। ক্রীট দ্বীপের নোশাস্ নামক স্থান খনন করিতে করিতে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যার আর্থার ইভান্স ফণীভূষিত মস্তকবিশিষ্ট দেবীমাতার আর একটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন; পাটনার মূর্ত্তির সহিত এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটার অনেক সাদৃশ্য আছে।

বিহার এবং উড়িষ্যার গবেষণাসমিতির পত্রিকায় জনৈক লেখক দেবীমাতার উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"পাটলিপুত্রের অবস্থানভূমিতে যে সমস্ত দেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক। একটি মূর্ত্তির মস্তক সর্পবিজড়িত; ক্রীট দ্বীপের নোশাস্ নামক স্থানে স্যার আর্থার ইভান্স যে দেবীমাতার মূর্ত্তিটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মস্তকও এইরূপ সর্পবিজড়িত। এই দুইটি মূর্ত্তির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। পাটলিপুত্রে প্রাপ্ত আর একটি দেবীমূর্ত্তির মস্তক মুকুটদ্বারা ভূষিত। সেইরূপ

মুকুটভূষিত মস্তকবিশিষ্ট আর একটি দেবীমূর্ত্তি ক্রীটদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে এবং এই দুইটি মূর্ত্তিরও সাদৃশ্য আছে। পাটলিপুত্রে যে দেবীমূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের পরিচ্ছদ পারস্যের প্রাচীন নগরগুলির অবস্থান ভূমি খনন করিয়া যে সমস্ত সুমেরিয়া এবং ব্যাবিলোনীয়া দেশীয় দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিচ্ছদের সহিত তুলনা করিলে—দুই শ্রেণীর মধ্যে যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সুমেরিয়া, ব্যাবিলোনীয়া, হিটাইটরাজ্য এবং ক্রীটদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসিগণ দেবীমাতার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের ন্যায় মৌর্য্য বংশাবলীর প্রাক্কালে মগধরাজ্যে যে সমস্ত লোকেরা বাস করিত তাহারাও দেবীমাতার এবং তাঁহার পার্শ্বচর দেবতাগণের পূজা করিত। পাটলিপুত্র এবং পারস্যের প্রাচীন নগর সমূহের অধিষ্ঠানভূমি খনন করিয়া যে সমস্ত দেবীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির সম্যক্ আলোচনা করিলে, উপরোক্ত বিষয়দ্বয় আমাদের বিশদরূপে উপলব্ধি হইবে।"*

এ স্থলে ছোটনাগপুরনিবাসী আর একটি দ্রাবিড়ী জাতির দেবীপূজা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। এই জাতির নাম 'বীরহোর'; ইহারা মান্দারী ভাষার একটি উপভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহাদের 'বীরহোর' নাম মান্দারী ভাষায় 'জঙ্গলনিবাসী' বুঝায়। মান্দারীরা আপনাদিগকে 'হোরো' বলে, এই 'হোরো' কথাটি 'বীরহোর' নামের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বীরহোর এবং মান্দারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ১৯১১ খৃঃ লোকগণনায় ৯২৭ জন বীরহোর রাঁচি জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৫০০ জন প্রেতোপাসক ও অবশিষ্ট ৪২৭ জনকে হিন্দু বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। স্যার হারবর রিজ্‌লে বলেন যে, বীরহোরদিগের ধর্ম্ম কতকটা হিন্দুধর্ম্মমূলক এবং কতকটা প্রেতোপাসনালম্বক।

তাহারা হিন্দুদিগের সহিত থাকিয়া হিন্দু দেবীমাতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে; স্বীয় দেবতামণ্ডলীতে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় উপদেবিগণকে হিন্দুদেবীর কন্যা বা দৌহিত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।†

উপসংহারে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবশিষ্ট রহিল। বিষয়টা এই যে:—ভূঁইয়ারা তাহাদের উপদেবী মহারাণীর উদ্দেশে শ্বেত পতাকাভূষিত বংশদণ্ড কেন উৎসর্গ করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নিম্নে কয়েকটি কথা বলিব। অনেক জাতি তাহাদের দেবদেবীর উদ্দেশে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সকল উৎসর্গ করে। ভূঁইয়ারা তাহাদের দেবী মহারাণীর উদ্দেশে যে শ্বেত পতাকাভূষিত বংশদণ্ড উৎসর্গ করে, সেই প্রথাটিও পূর্ব্বোক্ত প্রথার রূপান্তর মাত্র। দেবদেবীর

* The Journal of the Bihar and Orissa Research Society নামক পত্রিকার একাদশ খণ্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

† রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় প্রণীত The Birhors (১৯২৫ খৃঃ সংস্করণ) নামক গ্রন্থের ৩৬—৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

উদ্দেশে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড উৎসর্গ করিবার প্রথা আমি প্রবন্ধান্তরে* সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এই প্রথার মূলে চারিটি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

উক্ত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি এই যে, যখন কেহ কোনরূপ দৈহিক পীড়ায় আক্রান্ত হয় বা অন্য কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হয়, সেই ব্যক্তি স্বীয় পীড়া বা বিপদটিকে এক খণ্ড জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে স্থানান্তরিত করিয়া কোনও একটি বৃক্ষে বা কাষ্ঠখণ্ডে সংলগ্ন করতঃ অন্য কোনও স্থানে প্রোথিত করে। আমার বিশ্বাস, ভুঁইয়ারাও তাহাদের পীড়া এবং বিপদগুলি শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে স্থানান্তরিত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ডগুলি বংশদণ্ডে বাঁধিয়া প্রোথিত করে। এইরূপে ভুঁইয়ারা তাহাদের পীড়া এবং বিপদ সকলকে বিতাড়িত করে এবং সেই সঙ্গে বিতাড়ণের চিহ্নগুলিকে দেবী মহারাণীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট করে।

পদার্থের অবস্থাত্রয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ মালী

আমরা সকলেই জানি যে, যে কোনও পদার্থ তিন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে, যথা কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা। সার জে, জে, টমসন্ প্রমুখ মনীষীরা আজকাল তড়িৎযুক্ত অবস্থা বলিয়া পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই চতুর্থ অবস্থা পদার্থের অন্য তিনটি অবস্থার রূপান্তর মাত্র, এজন্য ইহাকে সচরাচর একটি পৃথক অবস্থা বলিয়া না ধরিলেও চলে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রত্যেক পদার্থকেই ভাঙ্গিয়া অতি ক্ষুদ্র পরমাণুসমষ্টিতে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অন্য কোনও সত্ত্বায় পরিণত করিতে পারা যায় না; পরন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা পদার্থের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কণায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, এই কণাগুলিকেই ধনতাড়িৎ কণা বা proton এবং ঋণতাড়িৎ কণা বা electron বলে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থই ধনতাড়িৎ কণা এবং ঋণ তাড়িৎ কণার সমষ্টি মাত্র। পদার্থের মধ্যে এই তাড়িৎ কণার বিভিন্নরূপ সন্নিবেশই সার জে, জে, টমসনের মতে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়,—প্রথম তিন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পদার্থের এই তিন অবস্থার কথা

---

* Man in India নামক পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৯—২৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মৎ প্রণীত Supplementary Remarks on Tree Cults in the District of Midnapore শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধ দেখুন।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন হইতেই জানেন, কিন্তু কঠিন ও তরল পদার্থ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তত্ত্ব ইদানীং মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেজন্ত 'পদার্থের অবস্থা' নূতন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানের সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া এই অধুনালব্ধ জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যে কোনও পদার্থকে উষ্ণতা ও চাপের পরিবর্ত্তনদ্বারা ইচ্ছামত কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। কঠিন পদার্থে উত্তাপ দিলে ক্রমেই তাহার তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে, কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে সেই কঠিন পদার্থ গলিয়া তরল অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে; এবং যতক্ষণ সেই পদার্থ গলিতে থাকে ততক্ষণ তাহার উষ্ণতার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যেরূপ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থ এইরূপে গলিতে আরম্ভ করে, তাহাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সেই কঠিন পদার্থের melting point বা দ্রবণাঙ্ক বলা হইয়া থাকে। melting point পদার্থের উপরিস্থিত বায়ুর (বা অন্য কোনও বায়বীয় পদার্থের) চাপের উপর নির্ভর করে; চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত পদার্থের melting point-এর হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ এতই অল্প যে চাপের অত্যন্ত অধিক পরিবর্ত্তন না হইলে সাধারণ তাপমানযন্ত্রদ্বারা এই হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। এখন এই গলিত তরল পদার্থে যদি ক্রমাগত আরও উত্তাপ প্রয়োগ করা যায় তবে ইহার উষ্ণতা ক্রমেই বাড়িবে, এইরূপে সেই তরল পদার্থের উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, সেই তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করিবে, আর যতক্ষণ সে তরল পদার্থ ফুটিবে, ততক্ষণ তাহার উষ্ণতার কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। যে উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করে, সে উষ্ণতাকে তরল পদার্থের boiling point বা স্ফুটনাঙ্ক বলে। এই boiling pointও তরল পদার্থের উপরিস্থিত চাপের উপর নির্ভর করে; চাপের পরিমাণ যত বেশী হইবে, তরল পদার্থের boiling pointও তত বেশী হইবে। কোনও তরল পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার কতকগুলি উত্তপ্ত অণু সর্ব্বদাই তরল পদার্থ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসে। অনাবৃত পাত্রে তরল পদার্থ রাখিয়া তাহাতে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই উত্তপ্ত অণুগুলি বাহিরে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়। পরন্তু আবৃত পাত্রে তরল পদার্থ রাখিয়া তাহাতে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে একদিকে যেমন কতকগুলি উত্তপ্ত অণু তরল পদার্থ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবে, সেইরূপ অন্য কতকগুলি অণু আবার তরল পদার্থের উপরিস্থিত পাত্রের অভ্যন্তরস্থ স্থান হইতে পুনরায় বিগলিত হইয়া তরল পদার্থে প্রবেশ করিবে। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি অণু তরল পদার্থ হইতে উত্তাপ প্রয়োগহেতু বাহির হইয়া আসে, যদি তাহার সমসংখ্যক অণু পুনরায় তরল পদার্থে প্রবেশ করে, তবে উত্তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও সেই তরল পদার্থের পরিমাণ কিছুতেই কমিবে না। উত্তাপ প্রয়োগহেতু যে সকল অণু তরল পদার্থ ছাড়িয়া উপরদিকে চলিয়া আসে উহারা তরল পদার্থের বিপরীত দিকে একটা চাপ দিয়া থাকে; তরল পদার্থের উপরিস্থিত বায়ুরাশি (অথবা অন্য কোনও বায়বীয় পদার্থ) তরল

পদার্থের উপরও একটা চাপ দিয়া থাকে। যখন এই দুই চাপ পরস্পর সমান হয়, তখন তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করে। যে কোনও উষ্ণতায় তরল পদার্থের বহির্গামী অণুগুলির চাপকে সেই উষ্ণতায় ঐ তরল পদার্থের saturation pressure বা বৃহত্তম চাপ বলে। প্রত্যেক উষ্ণতায় প্রত্যেক কঠিন এবং তরল পদার্থের একটি বৃহত্তম চাপ আছে। যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনও তরল পদার্থের বৃহত্তম চাপ সেই তরল পদার্থের উপরিস্থিত বায়ু বা অন্য গ্যাসের চাপের সমান হয়, তবে সেই তরল পদার্থ ঐ উষ্ণতায় ফুটিতে আরম্ভ করে। এইরূপে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনও কঠিন পদার্থের saturation pressure তাহার উপরিস্থিত গ্যাসের চাপের সমান হয়, তবে ঐ কঠিন পদার্থ তরল অবস্থায় পরিণত না হইয়াই একেবারে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ করে। এই প্রকার পদার্থকে volatile বা উদ্বায়ী পদার্থ এবং এই প্রক্রিয়াকে sublimation বা উদ্গমন-ক্রিয়া বলে। তরল পদার্থ ফুটিয়া বা কঠিন পদার্থ উদ্বায়ী হইয়া যদি বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়, তবে ঐ বায়বীয় অবস্থাকে ঐ তরল বা কঠিন পদার্থের vapour state বা বাষ্পীয় অবস্থা বলা হইয়া থাকে। যদি এই বাষ্পের উপর উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার উষ্ণতা এবং হয়ত বা চাপেরও বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক বায়বীয় পদার্থেরই critical temperature বা সন্ধি-তাপমান নামক এক তাপমান (temperature) আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বায়বীয় পদার্থের তাপমান এই critical temperature-এর নীচে থাকে, ততক্ষণ শুধু চাপের বৃদ্ধি করিয়া এবং তাপমান অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া সেই বায়বীয় পদার্থকে আবার তরল অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে। বায়বীয় পদার্থের তাপমান যতক্ষণ পর্য্যন্ত critical temperature-এর নীচে থাকে ততক্ষণ ঐ বায়বীয় পদার্থকে vapour বা বাষ্প বলা হয়। ঐ বায়বীয় পদার্থের তাপমান critical temperature-এর উপরে হইলে আর শুধু চাপের বৃদ্ধি করিয়া ও উষ্ণতা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া উহাকে তরল অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না। এই অবস্থায় ঐ বায়বীয় পদার্থকে আর বাষ্প বলিতে পারা যায় না, গ্যাস বলিতে হয়।

কোনও বিশেষ তাপমানে কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন ও চাপের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে; সে সম্বন্ধ এই যে, গ্যাসের আয়তন ও চাপের গুণফল সর্ব্বদাই সমান, সে চাপের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন। এই নিয়ম রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে ইহা Boyles Law বা বয়েল সাহেবের নিয়ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ইহার উষ্ণতার পরিবর্ত্তন করা হয়, তবে যে পরিমাণে ইহার উষ্ণতা বাড়িবে ঠিক সেই পরিমাণে ইহার আপও বাড়িবে। আবার সেই পরিমাণ গ্যাসের চাপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যদি তাহার উষ্ণতার পরিবর্ত্তন করা হয়, তবে যে পরিমাণে সেই গ্যাসের উষ্ণতা বাড়িবে ঠিক সেই পরিমাণে ইহার আয়তনও বাড়িবে। শেষোক্ত দুই নিয়ম চার্লস্ সাহেবের নিয়ম (Charles Law) বলিয়া অভিহিত। চার্লস্ সাহেবের এই নিয়মকে ভিত্তি করিয়া যে কোনও গ্যাসকে তাপমান যন্ত্ররূপে

ব্যবহার করা যাইতে পারে। পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থায় কিন্তু উল্লিখিত তিনটি নিয়ম ঠিকমত খাটেনা।

এই প্রকারে দেখা গেল যে কঠিন পদার্থকে উত্তাপ দিয়া তরল পদার্থে, এবং তরল পদার্থকে উত্তাপ দিয়া, ও দরকার হইলে তাহার উপরিস্থিত চাপের হ্রাস করিয়া বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। যদি বায়বীয় পদার্থ লইয়া আরম্ভ করা যায় ও তাহার উপর চাপের বৃদ্ধি ও তাহার উষ্ণতার হ্রাস করা যায়, তবে ক্রমে তাহা তরল পদার্থে পরিণত হইবে, এবং তরল পদার্থকে আরও শীতল করিলে ক্রমে তাহা কঠিন পদার্থে পরিণত হইবে। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা ছিল যে, কোনও কোনও বায়বীয় পদার্থকে কিছুতেই তরল পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায় না, এবং এই সকল বায়বীয় পদার্থকে তাঁহারা স্থায়ী (permanent) গ্যাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। আজকাল কিন্তু সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজকাল আর এমন কোন গ্যাস নাই যাহা কোনও-না-কোনও উপায়ে তরল অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় নাই। বায়বীয় পদার্থের মধ্যে হিলিয়ম্ (helium) গ্যাসকে তরল করা সব চেয়ে শক্ত, কিন্তু হল্যাণ্ডের অন্তর্গত লাইডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতাপমানের পরীক্ষাগারে (Cryogenic Laboratoryতে) জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় কেমার্লিং ওনস্ (Kammerlingh Onnes) ১৯০৮ খৃঃ অব্দে হিলিয়মকে তরল অবস্থায় পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং কয়েক বৎসর হইল ওনস্-এর মৃত্যুর পর তাঁহার সহকর্ম্মিগণ হিলিয়ম্‌কে কঠিন অবস্থায় পরিণত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। কঠিন হিলিয়মের তাপমান −২৭২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের খুব কাছাকাছি। এই স্থলে একটি কথার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছিলেন যে, যদি কোনও পদার্থকে ক্রমাগত শীতল করা যায়, তবে কখনও সেই পদার্থকে একেবারে তাপশূন্য করিতে পারা যাইবে কিনা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও পদার্থ একেবারে তাপশূন্য হইলে তাহার তাপমান −২৭৩·৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্ হইবে। কোনও পদার্থকে একেবারে তাপশূন্য করা যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তবে বিশিষ্ট উপায়ে যে, যে কোনও পদার্থের তাপমান −২৭৩·৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের খুব কাছাকাছি লইয়া গিয়া সেই পাদর্থকে প্রায় তাপশূন্য করা যাইতে পারে, তাহা কেমার্লিং ওনস্ প্রমুখ মনীষীরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এক গ্রাম (gramme) পরিমাণ কোনও পদার্থের উষ্ণতা এক ডিগ্রি বাড়াইতে যে পরিমাণ তাপ লাগে, তাহাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ (specific heat) বলে। পদার্থের আপেক্ষিক তাপ তাহার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। পদার্থের উষ্ণতা যত কম হইবে, তাহার আপেক্ষিক তাপের পরিমানও তত কম হইবে। অতি নিম্ন তাপমানে এই আপেক্ষিক তাপের পরিমান অতি অল্প। যে উষ্ণতায় হিলিয়ম্ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে উষ্ণতায় পদার্থের আপেক্ষিক তাপ প্রায় শূন্য হইয়া যায়। পদার্থের যে সামান্য পরিমান তাপ এই উষ্ণতায়ও বর্ত্তমান থাকে,

তাহা হরণ করা বড়ই শক্ত ব্যাপার, এবং এই জন্যই কোনও পদার্থকে একেবারে –২৭৩·৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ তাপমানে লইয়া যাওয়া আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

যদি কোনও কঠিন পদার্থে ক্রমাগত উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তবে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার (Saturation pressure) বা বৃহত্তম চাপও বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট তাপমানে কঠিন পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট Saturation pressure আছে। কোনও কঠিন পদার্থকে এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় ও তদুপযোগী চাপে রাখিলে তাহার কঠিন ও বায়বীয় অংশের আপেক্ষিক পরিমাণ বহুকাল অব্যাহত থাকিবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির দ্বারা কঠিন পদার্থ সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যখন তরল পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে তখনও উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তরল পদার্থের Saturation pressure ক্রমেই বাড়িবে এবং এক ডিগ্রি তাপমান বৃদ্ধি হেতু চাপের যে বৃদ্ধি হইবে তাহার পরিমাণ উষ্ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই বাড়িবে। যদি আংশিক গলিত কোনও কঠিন পদার্থে তাপ দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক মত ইহার উপরের চাপের পরিবর্ত্তন করা যায়, তবে উত্তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও ঐ পদার্থ আংশিক গলিত অবস্থায়ই বহুকাল থাকিয়া যাইবে। আবার একটা নির্দ্দিষ্ট তাপমানে ও নির্দ্দিষ্ট চাপে কোনও পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অংশই দীর্ঘকাল আপেক্ষিক পরিমাণ হিসাবে অব্যাহত অবস্থায় থাকিতে পারে, এই তাপমানকে ঐ পদার্থের Triple point temperature বা ত্রিবিন্দু তাপমান বলা হইয়া থাকে।

পদার্থের বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমানে ও পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তরের চাপের সমান চাপে Hydrogen বা উদ্‌জানের অণুগুলি গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইলের অধিক বেগে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এই প্রকার বেগে ভ্রাম্যমান্ অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়, এবং সংঘর্ষের ফলে অণুগুলির গতির দিক্ এবং বেগের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অণুতে অণুতে এই প্রকার সংঘর্ষ অতি অল্পকালস্থায়ী হয় এবং যে কোনও অণুর গতির অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার সহিত অন্যান্য অণুগুলির সংঘর্ষের স্থিতি কালের তুলনায় পর পর দুই সংঘর্ষের ভিতরে অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়। এই প্রকার পর পর দুই সংঘর্ষের ভিতরে কোনও অণু গড়-পরতা যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহাকে ঐ অণুর free path বা অবাধ গতিপথ বলে। এই প্রকার অবাধ গতিপথের দূরত্ব বায়বীয় পদার্থের চাপের এবং অণুর আকারের উপর নির্ভর করে। গণনার সুবিধার জন্য বায়বীয় পদার্থের অণুগুলিকে সাধারণতঃ গোলকাকৃতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবিক অণুগুলি ঠিক্ গোলকাকৃতি নয়।

যদি বায়বীয় পদার্থকে ক্রমে শীতল করা যায় এবং তাহার চাপের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই পদার্থের অবাধ গতিপথ ক্রমেই কমিতে থাকে, কোনও বিশেষ অণুর সহিত অন্যান্য অণুর প্রতিসেকেণ্ডে যতগুলি সংঘর্ষ হয় তাহার সংখ্যা বাড়িতে থাকে, এবং

সেই বায়বীয় পদার্থ খাঁটি গ্যাসের নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই বায়বীয় পদার্থ বাষ্পে এবং বাষ্প তরল পদার্থে পরিণত হয়। পদার্থের তরল অবস্থা ও বায়বীয় অবস্থার প্রভেদ এই যে, বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি পরস্পরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না, কিন্তু তরল অবস্থায় বিশেষভাবে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করে। বায়বীয় অবস্থায় চাপ দিলে পদার্থ বিশেষ পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তরল অবস্থায় চাপ দিলে উহা খুব সামান্য পরিমাণেই সঙ্কুচিত হইয়া হইয়া থাকে। তরল অবস্থায় অণুগুলি জমিয়া গেলে তাহার বহিরাবরণের উপর একটা টান উৎপন্ন হয়। ইহাকে তাহার Surface tension বা পৃষ্ঠবল বলে; বাষ্পীয় অবস্থায় এইরূপ কোনও টান থাকে না। ফুটন্ত তরল পদার্থে উত্তাপ দিলে সেই উত্তাপের কিয়দংশ তরল পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের আকর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য ব্যয়িত হয়। এই উত্তাপকে তরল পদার্থের internal latent heat বা আভ্যন্তরীন প্রচ্ছন্নতাপ বলে। বাষ্পায় বা বায়বীয় অবস্থায় পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের ভিতর বিশেষ কোনও আকর্ষণ না থাকাতে সেই সব অবস্থায় পদার্থের কোনও বিশেষ আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছন্ন তাপও নাই। তরল অবস্থায় পদার্থের অণুগুলি সামান্য পরিমাণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, অথচ পরস্পরের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ইহার ফল এই যে তরল পদার্থের আকার যদিও পরিবর্ত্তনীয়, তবু তাহার আয়তন প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়।

তরল পদার্থকে আরও শীতল করিলে তাহা জমিয়া কঠিন আকার ধারণ করে। কঠিন পদার্থে ও তরল পদার্থে প্রভেদ এই যে, কঠিন পদার্থের একটা নির্দ্দিষ্ট আকার আছে, তরল পদার্থের তাহা নাই। কঠিন অবস্থায় পদার্থের অণুগুলি প্রত্যেকে পরস্পর সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে, কিন্তু তরল অবস্থায় তাহা করে না। কঠিন অবস্থায় প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের অণুগুলির পরস্পর সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট সন্নিবেশ রহিয়াছে; এক জাতীয় কঠিন পদার্থের অণুগুলির পরস্পর সম্পর্কে সন্নিবেশ অন্য জাতীয় কঠিন পদার্থের অণুগুলির পরস্পর সম্পর্কে সন্নিবেশের তুল্য নহে। এই জন্য আমরা কঠিন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন crystalline from বা দানাদার আকার দেখিতে পাই। সাধারণ লবণের দানার আকার যে প্রকার, হীরকের দানার আকার তাহা হইতে ভিন্ন, এবং তুঁতের দানার আকার উল্লিখিত প্রত্যেকটি হইতেই ভিন্ন। কঠিন পদার্থের crystalline form বা দানাদার আকার পরীক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ব্র্যাগ (Sir William Bragg)।

ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো প্রেরণ করিলে দেখা যায় যে, সে আলো বিবিধ বর্ণের আলোতে বিভক্ত হইয়াছে। এই উপায়ে সূর্য্যের আলোতে কি কি বর্ণের আলো রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের রণ্টগেন্ রশ্মি (X ray) দানাদার কোন কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া প্রেরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই রণ্টগেন্ রশ্মি সোজা একদিকে না গিয়া চারিপাশে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিক দিয়া

গিয়াছে। এই সকল দিক জানা থাকিলে সেই দানাদার কঠিন পদার্থের অণুগুলি পরস্পর সম্পর্কে কোন দিকে এবং কতদূরে রহিয়াছে তাহা আমরা হিসাব করিয়া বলিতে পারি। এ তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন লাও (Laue), এবং এ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই Bragg তাঁহার X' ray Spectrometer অথবা রন্টগেন্ রশ্মির বর্ণ-বিশ্লেষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশীয় বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় অধুনা রন্টগেন্ রশ্মির বর্ণ-বিশ্লেষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং কঠিন পদার্থের অত্যন্ত জটিল দানাদার আকার নির্দ্ধারণও সম্ভবপর হইয়াছে।

কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হইতে হইতে যখন প্রায় গলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার দানাদার আকারও নষ্ট হইতে থাকে। বর্ণ-বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা এইরূপ দানা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রন্টগেন্ রশ্মি এইরূপ দানার ভিতর কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিক দিয়া সূক্ষ্ম রশ্মির মত না গিয়া অনেকটা ছড়াইয়া পড়ে। Debye (ডেবায়া) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, তরল অবস্থায় পদার্থের অণুগুলির কোনও দানাদার আকার নাই। কিন্তু ইদানীং প্রফেসার রমণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও তরল পদার্থের সব জায়গা জুড়িয়া কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের দাদানার গঠন নাই, তবু তরল পদার্থের ভিতর স্থানেস্থানে দানাগুলি অনবরতই গঠিত হইতেছে এবং আবার ভাঙ্গিয়াও যাইতেছে। একটা অণুর চারিদিকে আরও অনেকগুলি অণু জমিয়া কোন মুহূর্ত্তে দানার আকার গঠন করে, আবার হয়ত কোন কারণে পর মুহূর্ত্তেই সেই আকার ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে যে কোনও তরল পদার্থের নানাস্থানে বিভিন্নদিকে-বিন্যস্ত (oriented) এক সাধারণ প্রণালীতে গঠিত অস্থায়ী দানাগুলি সর্ব্বদাই জমিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে। প্রফেসার রমণ আর একটি বিষয় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহা এই যে, তরল পদার্থে যে সকল অণুদ্বারা দানাদার আকার গঠিত হয়, তাহার সবগুলি এক জাতীয় নহে, বিভিন্ন জাতীয়। প্রফেসার রমণ বলেন যে, একই তরল পদার্থের ভিতরে দীর্ঘাকার অণু, চেপ্টা অণু প্রভৃতি নানাবিধ অণু বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ড দেশীয় প্রফেসার হারবার্ট ব্রেরেটন বেকার (Herbert Brereton Baker) দেখাইয়াছিলেন যে, আমরা যে সকল তরল পদার্থকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ এক জাতীয় অণুবিশিষ্ট তরল পদার্থ বলিয়া মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক এক জাতীয় অণুবিশিষ্ট তরল পদার্থ নহে, তাহাতে নানা জাতীয় অণুর সমষ্টি রহিয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রহিয়াছে এবং সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রত্যেক তরল পদার্থের সঙ্গেই মিশিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কোনও তরল পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইলে সর্ব্বদাই সেই তরল পদার্থকে বিশেষ বিশেষ উপায়ে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ কাচ পাত্রে তরল পদার্থ রাখিয়া তাহার উপর বিশুদ্ধ Phosphorus pentoxide ঢালিয়া দিলে যা তাহা কাচ পাত্রের ভিতর

একপার্শ্বে রাখিয়া দিলে, সেই তরল পদার্থ কালে বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, জলের কণার জন্য Phosphorus pentoxide-এর কণার প্রবল আকর্ষণ রহিয়াছে। বাষ্পাবস্থায় জলের কণা একবার Phosphorus pentexideএর নিকটে আসিলেই Phosphorus pentoxide সেই কণাকে আকর্ষণ করিয়া লয়, সে কণা আর মুক্ত হইয়া তরল পদার্থের সঙ্গে গিয়া মিশিতে পারে না। কয়েকটি তরল পদার্থ Phosphorus pentoxide-এর সাহায্যে ৮৷৯ বৎসর কাল ধরিয়া বিশুদ্ধ করিয়া প্রফেসার বেকার দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সব তরল পদার্থের গুণ বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সব তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বর্দ্ধিত হইয়াছে ও উহাদের বৃহত্তম চাপের হ্রাস হইয়াছে। প্রফেসার G. N. Lewis ও A. Smits ইহাতে অনুমান করেন যে, সাধারণ অবস্থায় তরল পদার্থের ভিতর দুই প্রকার অণু-সমষ্টি রহিয়াছে, এবং ঐ তরল পদার্থের অবিশুদ্ধ অবস্থায় ঐ দুই প্রকার অণুর প্রত্যেকটি অন্যটিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে প্রথম প্রকারের যে পরিমাণ অণু দ্বিতীয় প্রকারের অণুতে রূপান্তরিত হইতেছে, দ্বিতীয় প্রকারের অণুও ঠিক সেই পরিমাণে প্রথম প্রকারের অণুতে রূপান্তরিত হইতেছে; ফলে অবিশুদ্ধ তরল পদার্থে ঐ দুই প্রকার অণু সমষ্টির আপেক্ষিক পরিমাণের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। কোনও কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপাদান ব্যতীত এমন আরও একটী অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় যে, সেই অতিরিক্ত দ্রব্যটি না থাকিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি সহজে বা দ্রুত সম্পন্ন হয় না, অথচ সেই দ্রব্যটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে যে রকম ছিল প্রক্রিয়ার পরেও ঠিক সেই রকমই অবিকৃত থাকে। ইহাদিগকে Catalytic agent বা সঙ্ঘটক পদার্থ বলে।

জি, এন, লুই এবং স্মিটস্ বলেন যে, তরল পদার্থের বিভিন্ন প্রকার অণু-সমষ্টির মধ্যে পরস্পর রূপান্তর ক্রিয়ার পক্ষে ঐ তরল পদার্থে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প Catalytic agent-এর কার্য্য করিয়া থাকে।

মনে করা যাক্, কোনও তরল পদার্থে ক ও খ বলিয়া দুই প্রকার অণুসমষ্টি রহিয়াছে। অবিশুদ্ধ অবস্থায় প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ ক অণুসমষ্টি খ অণুসমষ্টিতে পরিণত হইতেছে ঠিক সেই পরিমান খ অণুসমষ্টি ক অণুসমষ্টিতে পরিণত হইয়া থাকে। যদি জলীয় বাষ্প সহযোগে ক অণুসমষ্টির খ অণুসমষ্টিতে পরিণতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং খ অণুসমষ্টির ক অণুসমষ্টিতে পরিণতির কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ঐ তরল পদার্থকে শুষ্ক করিলে ক অণুসমষ্টির খ অণু-সমষ্টিতে পরিণতিক্রিয়ার বেশ হ্রাস পাইবে, এবং ফলে ঐ মিশ্র তরল পদার্থের শুষ্ক অবস্থায় ক উপাদানের আপেক্ষিক আতিশয্য ও খ উপাদানের আপেক্ষিক দৈন্য হইবে। এই প্রকারে জলীয় বাষ্প সহযোগে যদি খ উপাদানের ক উপাদানে পরিণতির বৃদ্ধি হয় এবং ক উপাদানের খ উপাদানে পরিণতি অবিকৃত থাকে, তবে বিশুদ্ধ তরল পদার্থে খ উপাদানের আতিশয় ও ক উপাদানের দৈন্ত হইবে। কিন্তু জলীয় বাষ্প সহযোগে যদি ঐ দুই প্রকার প্রক্রিয়াই সমান

ভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ তরল পদার্থেও ঐ দুই প্রকার উপাদানের আপেক্ষিক পরিমানের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না; আর এই তিন স্থলেই উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গেও এই দুই প্রকার উপাদানের আপেক্ষিক পরিমানেরও কোন হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ তরল পদার্থের বিশুদ্ধ অবস্থায় ঐ দুই উপাদানের মধ্যে যে সাম্যাবস্থা, তাহা স্থায়ী হইয়া যাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তরল পদার্থে সাধারণতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিয়াই সাধিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ অবস্থায় তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ও বাষ্পীয় চাপ প্রায়ই বাড়িয়া থাকে, কদাচিৎ দুই এক স্থলে এই গুলি কমিয়া যায়। প্রফেসার স্মিট্‌স্ আয়োডিন প্রভৃতি কঠিন পদার্থ লইয়া ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শুষ্ক হইলে ইহাদের Vapour pressure বা বাষ্পীয় চাপের পরিমাণ কমিয়া যায়।

Platinum black, Thoria, Carbon প্রভৃতি উৎকৃষ্ট Catalytic agent বলিয়া বিখ্যাত। সম্প্রতি প্রফেসার বেকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তরল পদার্থকে এই সব Catalytic agent সংস্পর্শে রাখিলেও তরল পদার্থের গুণের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে।

তরল পদার্থের অণুগুলির আর একটি গুণের কথা বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অনেক দিন হইতেই জানা আছে। তরল পদার্থের অনেকগুলি অণু মিলিয়া এক বৃহৎ ও শ্লথসংস্পৃষ্ট (loosely connected) অণুগঠনের প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রক্রিয়াকে অণুগুলির association বা সংগঠন বলে। জলে এই association প্রক্রিয়া প্রভূত পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। কোনও বিশেষ তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থের শতকরা কতগুলি অণু সংগঠন করিবে বা কতগুলি অণু মিশিয়া এক অণু সংগঠিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। বস্তুতঃ একই তরল পদার্থে একই তাপমানে কোন কোন জায়গায় মোটেই অণু সংগঠিত হইতেছে না। কোথাও কোথাও বা ২।৪টি অণু মিলিয়া অণু সংগঠিত হইতেছে, আবার কোনও কোনও জায়গায় হয়ত ২০।৩০টিতেও সংগঠিত হইতেছে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা এতদিন তরল পদার্থের যে সব গুণের কথা জানিয়া আসিতেছি, সেগুলি বিশুদ্ধ-তরল পদার্থের গুণ নয়, মিশ্র-তরল পদার্থের গুণ। বিশুদ্ধ তরল-পদার্থের গুণ জানিতে হইলে, শুষ্ক করিয়াই হোক্ বা অন্য যে উপায়েই হোক্, তরল পদার্থকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ এক জাতীয় অণুসম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে।

পদার্থের বায়বীয় ও কঠিন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তরল অবস্থা সম্বন্ধে বেশী কাজ হয় নাই। ইংলণ্ডের প্রফেসার বেকার, হল্যাণ্ডের প্রফেসার স্মিট্‌স্ আজকাল পদার্থের তরল অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিতেছেন। কলিকাতার প্রফেসার রমণ এবং তাহার শিষ্যবর্গও তরল পদার্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে গবেষণা করিয়া থাকেন। আশা করা যায় যে, এইসব বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে পদার্থের তরল অবস্থা সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব।

মুক্তা

ডাক্তার বেণীপ্রসাদ

সকলেই জানেন যে, মুক্তা ক্ষুদ্রাকার, প্রায় বর্ত্তুল; উজ্জ্বল সুচিক্কণশুক্তি-জাত এবং বিচিত্রবর্ণ। আমি কিন্তু প্রাকৃতিক মুক্তার বিষয়ই আলোচনা করিব; কাচ কিংবা অন্যান্য উপাদানে গঠিত অসংখ্য নকল মুক্তার নয়। এই সকল নৈসর্গিক মুক্তার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ইহারা শুক্তি বা তাদৃশ জীবের দেহে উৎপন্ন হয়। পরে আমি মুক্তা-উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এখন, যে সকল প্রাণীতে মুক্তা পাওয়া যায়, শুধু তাহাদের বিষয়ই বলিব। সাগর এবং মহাসাগরাম্বু মধ্যে, তীরদেশের অদূরে, কঠিন খোলকদ্বয়যুক্ত একপ্রকার mollusc বাস করে; ইহা মুক্তাশুক্তি নামে খ্যাত; ইহাদেরই দেহে মুক্তা দৃষ্ট হয়। ইহাদের জাতিস্থানীয় আরও কতকগুলা জীব মুক্তা উৎপন্ন করে বটে; কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সকল মুক্তার বাজার দর অধিক নহে; সেগুলি অত্যন্ত নরম, আকারেও খুব বড় হয় না; বর্ণও বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে; এবং ইহাতে রামধনুর ন্যায় বর্ণ প্রতিফলিত হয় না। অলবণাক্ত মিঠা জলের শুক্তিতেও মুক্তা পাওয়া যায়। এই জীবটির সহিত বোধ হয় পাঠকদিগের পরিচয় আছে। ইহা পুষ্করিণী, ডোবা, এমন কি ভারতবর্ষের নদী ও স্রোতোস্বতীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার জাতিসম্পর্কীয় কতিপয় জীব পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে ছোট ছোট মুক্তা পাওয়া যায় তাহার জন্য চীনে, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে এবং অন্যান্য দেশে স্থানীয় লোক দ্বারা পরিচালিত ছোট ছোট মুক্তার চাষ আছে। আমরা কেবলমাত্র মুক্তাশুক্তির বিষয়ই আলোচনা করিব। সিংহলের পশ্চিমোপকূলের পার্শ্বে এবং পক-প্রণালীস্থ টিউটিকোরিণসান্নিধ্যে ম্যানার উপসাগরের মুক্তাচাষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পারস্যোপসাগর এবং মাদাগাস্কার, অষ্ট্রেলিয়া এবং জাপানের কোন কোন অংশেও যে মুক্তার চাষ চলে, তাহা নিতান্ত হেয় নহে। মার্কিণে মেক্সিকো, পেরু এবং চিলির উপকূলেও মুক্তাশুক্তির আবাদ আছে। কিন্তু উৎকর্ষ হিসাবে ইহাদের কেহই সিংহল, দক্ষিণ-ভারতবর্ষ এবং পারস্যোপসাগরের মুক্তা-চাষের সমকক্ষ নহে।

টিউটিকোরিণের চতুঃপার্শ্বস্থ উপকূলে যে অগভীর সাগরজলে মুক্তা-শুক্তি থাকে, তাহার অধিকাংশ যেন একটা অনুচ্চ মালভূমি—যাহার পরিধি ১৫-৩০ ফুট এবং তলদেশ বালুকাময়। এই বালুকাময় তলদেশে এবং কোথাও কোথাও বালুকা এবং মৃত শম্বুকাদির সংযোগজনিত কঠিন ভূমিতে লক্ষ লক্ষ মুক্তাশুক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করে। এই সকল স্থানই শুক্তি-সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ত। এইখানে যে কেবলমাত্র মুক্তা-শুক্তি বাস করে—এমন নহে; শুক্তির সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জীবও অবস্থান করে। ইহাদের কেহ

শুক্তির বন্ধু; কাহাকেও বা নিঃসন্দেহে শত্রু বলা যায়। যতদিন এই প্রাণীগুলার মধ্যে পরস্পর জীবনসংগ্রামের প্রাচুর্য্যের অভাবে কতকটা প্রাণশক্তির সামঞ্জস্য বজায় থাকে, মুক্তা-শুক্তি ততদিন স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্তি-সংগ্রহের ক্ষেত্রও প্রশস্ত থাকে। পক্ষান্তরে

শুক্তিক্ষেত্রবিহারী নানা জীব

এমন অপর কয়েকটি উপসর্গ আসিয়া পড়ে, যাহাদের উপর মানুষের কোনও হাত নাই। কিন্তু এই শত্রুমিত্র-সম্বলিত পরিবেষ্টনের মধ্যে মুক্তাশুক্তি জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও, তিনটি প্রবল কারণ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত সামঞ্জস্যবিধানে বিশেষরূপে বাধা পায়
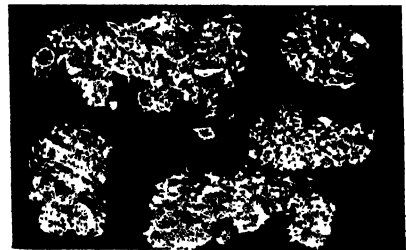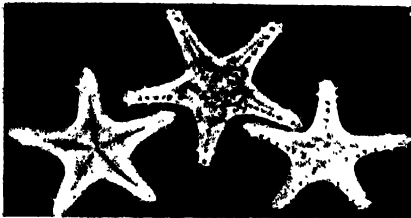
শুক্তি-ধ্বংসকারী তারামৎস্য প্রভৃতি মীন

এবং শুক্তিসংগ্রহ চেষ্টার সাফল্য একেবারে নষ্ট হয়। প্রথম কারণ,— হাঙ্গর, তারামৎস্য প্রভৃতি বড় বড় হিংস্র বুভুক্ষু মীন দলে দলে গভীর জল হইতে শুক্তি-ক্ষেত্রে আসিয়া শুক্তিখোলক নিষ্পেষিত করে অথবা মধ্যে মধ্যে শুক্তিগুলাকে আশ্রয়স্থলচ্যুত করতঃ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় কারণ,—প্রবল ঝড় এবং তজ্জনিত প্রচণ্ড জল-স্রোত ও বালুকা-বিক্ষেপে

উর্ব্বর শুক্তি-ক্ষেত্র অপসৃত হয় বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে মানুষ সময় সময় দলে দলে আসিয়া তাহাদের ধ্বংসকারী আদিম যন্ত্রপাতি লইয়া জলে ডুবিয়া লক্ষ লক্ষ ছোট বড় শুক্তি ক্ষেত্রের উচ্ছেদসাধন করে। মাংসাশী মীন এবং ঝড়-বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না; কিন্তু পরে বলা হইবে—জাপানে কেমন করিয়া বিশেষরূপে সংরক্ষিত ক্ষেত্রে বিনা আয়াসে শুক্তির চাষ ও রক্ষার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। এই বিষয়টি এবং যে সকল কৃত্রিম উপায়ে শুক্তিকে মুক্তা উৎপাদনে উত্তেজিত করা হয়,—জাপানীরা যে উপায় অবলম্বন করিয়া প্রায় নৈসর্গিক মুক্তার সমতুল্য কৃত্রিম মুক্তা (culture pearl) প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা অন্যান্য নেশন কর্ত্তৃক তাহাদের অধিকৃত স্থানের মধ্যে অনুসৃত হইতে পারে কিনা বিবেচ্য। একটি শুক্তির খোলা ছাড়াইয়া অভ্যন্তরীণ অঙ্গনিচয় দেখিলে দেখা যাইবে যে, জীবটার কোমল অংশ-সমূহ প্রায় আহার্য্য শম্বুকের (Oyster) ন্যায়, যাহা পাশ্চাত্য ভোজনবিলাসীর নিকটে অতীব উপাদেয়।

বিভিন্ন অংশের সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম অঙ্গনিচয়ের আলোচনা করা আবশ্যক নাই; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করা বোধ হয় অবান্তর হইবে না। শুক্তির কোমল অংশেই যে কেবল মুক্তা খোলক-সংলগ্ন থাকে—তাহা নহে; পরন্তু ঐ খোলার বিভিন্ন অংশেও মুক্তা সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়।

জীব কিরূপে মুক্তা উৎপন্ন করে, তাহার বিষয় এখন কিছু বলা আবশ্যক। মুক্তাপ্রজনন শুক্তিজীবের সহজ ধর্ম্ম নহে, উহা বাস্তবিকই ঐ প্রাণীটার রোগ বলিয়া পরিগণিত হয়। একটা পরাঙ্গভুক্ কীটের, অথবা বালুকাকণার, অথবা কোন জৈব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে
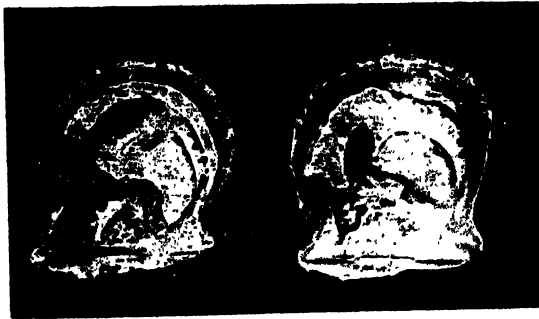
শুক্তিজীব; বামের চিত্রে শুক্তিকোষ দেখা যাইতেছে

মৌক্তিক উপাদান সঞ্চিত হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না; উৎপন্ন মুক্তা কিন্তু ঐ জীবের স্নায়ুমণ্ডলীর বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। শুক্তিজীব (Oyster) কিম্বা পরাঙ্গভুক্ কীট, বালুকাকণা কিংবা জৈবকেন্দ্র—ইহাদের কেহই একা মুক্তা তৈয়ারী করিতে পারে না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শেষোক্ত তিনটি উপকরণের কোন

একটির উত্তেজনায় মুক্তার উপাদান নিঃসৃত হইয়া উক্ত উপকরণত্রয় ঘটিত কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ধরণের যে কোনও এক প্রকার বাহিরের পদার্থের আকস্মিক আবির্ভাব সমীপবর্ত্তী স্নায়ুতন্ত্রীকে চঞ্চল করিতে এবং উহার চতুর্দ্দিকে মুক্তা-উপকরণ নিঃসৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের কিংবা অন্য কোন জীবের দেহের উপর কোন পতঙ্গাদির দংশনজনিত, অথবা উহাদের স্নায়ুমধ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ বশতঃ স্ফীতির সহিত উক্ত প্রক্রিয়ার তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রাচীন কাল হইতে শুক্তিজীব কর্ত্তৃক মুক্তা-উৎপাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন থিওরি প্রচলিত আছে। যে হিন্দু কিম্বদন্তী আজও প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহুস্থানে প্রচলিত, তাহা এই যে, রাত্রে কিংবা ঘন বর্ষায় শুক্তি তাহার শয্যা হইতে উত্থিত হয় এবং খোলক উন্মুক্ত করিয়া
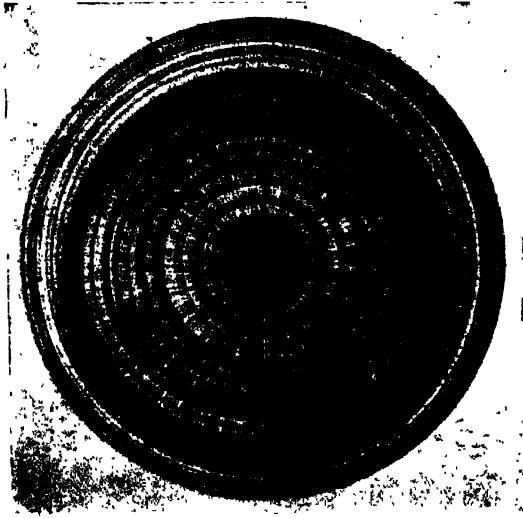
মুক্তার অংশবিশেষের বর্দ্ধিতায়তন চিত্র; মুক্তামধ্যস্থ জৈবকেন্দ্র ও তাহার চারিদিকে সমকেন্দ্র চক্রাকারে মৌক্তিক উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে

শিশির অথবা বারিবিন্দু গ্রহণ করে; ইহাই কঠিন হইয়া মুক্তায় পরিণত হয়। প্লিনির ন্যায় প্রাচীন (Classical) লেখকেরও মত ইহা হইতে বিশেষ ভিন্ন ছিল না; কেবলমাত্র তফাৎ ছিল যে, উক্ত শিশিরবিন্দু প্রত্যূষে খোলকমুখে প্রবেশ করে—যখন শুক্তিগুলি ভাঁটার সময় সাগরতটে অনাবৃত থাকে। জলদেবীর অশ্রু মুক্তায় পরিণত হয়—এবম্বিধ কল্পিত ধারণার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক ধারণা এই যে, মুক্তাগুলি একটি বিজাতীয় ঘন বস্তুর চারিপার্শ্বে সঞ্চিত মৌক্তিক উপাদান ব্যতীত আর কিছু নয়। বহু প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ

মুক্তা-উপকরণ দ্রবীভূত করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলের আকার কি—এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছেন। সিংহলে হার্ডম্যান্ এবং হর্ণেল, ইংলণ্ডে ম্যাকিন্টস্ এবং জেম্‌সন, ফ্রান্সে ডুবোয়া, সিউরাট, জিয়ার্ড এবং বুট্‌ এবং জাপানের মিকিমটো কৃত্রিম উপায়ে শুক্তিকে উত্তেজিত করাইয়া কেন্দ্র-বিশেষের চতুঃপার্শ্বে মৌক্তিক উপাদান নিঃসারণে যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র থাকে না যে, মুক্তা-গঠন কেবলমাত্র শুক্তি জীবটির স্নায়ুতন্ত্রীর অভ্যন্তরে অকস্মাৎ অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রবিষ্ট একটা ঘন পদার্থের চারিধারে মৌক্তিকউপাদান-সঞ্চয় ব্যতীত—আর কিছু নয়। যদি কোন মুক্তার অংশ-বিশেষের বর্দ্ধিতায়তন ছায়াচিত্র লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মুক্তার মধ্যস্থলে পূর্ব্বকথিত যে কোনও ধরণের একটি কেন্দ্র থাকে এবং তাহার চারিদিকে মুক্তা-উপাদান বহু সমকেন্দ্র চক্রাকারে সঞ্চিত হইয়া নিরেট কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। সময় সময় কেন্দ্রের চারিদিকে জীবের স্নায়ুমণ্ডলী হইতে মুক্তা-উপকরণ নিঃসৃত হয়। উহাদের আকার এবং সঞ্চয়-শৃঙ্খলা, কেন্দ্র-উপাদানটির অবস্থিতির এবং জীবটির মুক্তানিঃসরণ শক্তির
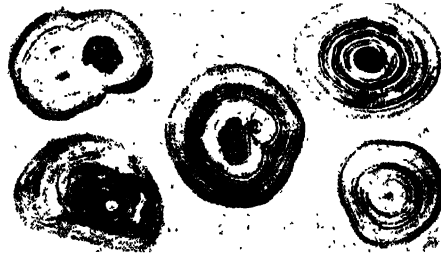
বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট মুক্তার আংশিক চিত্র; কেন্দ্র-উপাদান ও তাহার চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত মুক্তা-উপকরণ।

উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। যে মুক্তা বর্ত্তুল নয়, তাহার অংশ-বিশেষের ছায়াচিত্র দেখিলে এত সহজে উহার পার্থক্য প্রকটিত হয় যে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আবশ্যক হয় না।

শুক্তি, তাহার আবাস, এবং মুক্তাগঠন প্রণালীর বিষয় বর্ণিত হইল; প্রাচ্যদেশে মুক্তা-চাষের জন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হয়—এখন তাহারই বিষয় আলোচনা করা যাক্। সাধারণতঃ এই চাষ ভারত গবর্ণমেণ্টের মৎস্যবিভাগের (Fishery) অধীন; উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অতি সন্তর্পনে উহা রক্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে মুক্তাচাষের ক্ষেত্রগুলির মানচিত্র-প্রস্তুত ও জরিপ্ হইয়া থাকে। জরিপ করিবার সময় সমুদ্রতল হইতে সুনিপুণ ডুবুরীরা শুক্তির নমুনা তুলিয়া আনে এবং তীরে আনার পর খোলা ছাড়াইয়া অভ্যন্তরীণ মৌক্তিক পদার্থের পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞের দ্বারা উহার বাজারমূল্য নিরূপণ করা হয়; সেই সময়ে

বিশ্বাসযোগ্য বণিকগণ তথায় উপস্থিত থাকে। যদি দেখা যায়, মুক্তা এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে যে শুক্তিচাষ বিশেষরূপ লাভজনক হইবে, তাহা হইলে উক্ত বণিকদিগের খাঁটি অভিমত সহ প্রতি হাজার শুক্তিতে কি পরিমাণ মুক্তা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা তাহা জানাইয়া প্রস্তাবিত চাষক্ষেত্রগুলা সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র জারি করা হয়, এবং চাষকার্য্য পরিচালনের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করা হয়। এ' বিষয়ের সমস্ত ব্যবস্থা মৎস্যবিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনেই সম্পন্ন হয়; কিন্তু শুক্তি ধরার কার্য্য—অন্ততঃ ভারতবর্ষ ও সিংহলের সমুদ্রোপকূলভাগে—প্রধানতঃ 'পরুয়া' নামক একজাতীয় ডুবুরীরাই করিয়া থাকে। শুক্তি ধরিবার তারিখ বিঘোষিত হইলে ডুবুরীর দল নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া, আবশ্যকমত সাহায্যকারী লোকজন ও ডুবিবার উপযোগী অতি সহজ কার্য্যকরী যন্ত্রপাতি সহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় কিছুদিন থাকিবার ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ এই বৃহৎ মেলায় সমবেত লোকসংখ্যা দশ পনের হাজার হইয়া থাকে। খ্রীঃ ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সালের বসন্তকালে টিউটিকোরিণে দুইবার এইরূপ শুক্তিসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমিও একটিতে উপস্থিত ছিলাম। ডুবুরী এবং অন্যান্য লোকজনের থাকিবার ঘর নির্ম্মাণের জন্যই যে কেবল মাত্র ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল—তাহা নহে, একটি বিশেষ বাজারেরও বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমগ্র স্থানটি যেন হঠাৎ একটি ছোটখাট নগরে পরিণত হইয়াছিল। সমুদ্রতীর হইতে আট দশ ফুট দূরে আঠার উনিশটি নৌকা সজ্জিত ছিল। প্রত্যেক নৌকায় ছয়জন নাবিক, আট দশ জন ডুবুরী এবং তাহাদের পনের কুড়িজন সহকারী থাকিত। প্রতি রাত্রি তিনটার সময় একটি তোপধ্বনি ডুবুরীদের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় নির্দ্দেশ করিত। তখন তাহারা তীর হইতে দশ বার মাইল দূরবর্ত্তী মুক্তাক্ষেত্র-অভিমুখে তাহাদের নৌকা ছাড়িয়া দিত। তথায় পৌঁছিবামাত্র তাহারা দেখিতে পাইত যে, বয়ার উপর সজ্জিত পতাকা দ্বারা শুক্তি তুলিবার স্থানটি চিহ্নিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিত। এই ডুবুরীরা ডুবিবার উপযোগী বিশেষ কোনও পরিচ্ছদ ব্যবহার করে না; কৌপীন ব্যতীত সমস্ত দেহ অনাচ্ছাদিতই থাকে। নৌকা-পার্শ্ব হইতে ইহারা ১০।১৫ ফুট নিম্নে ডুব মারে। ইহার জন্য তাহারা একরূপ অতি সহজ ও ফলপ্রদ উপায় অবলম্বন করে;—পঁচিশ ত্রিশ সের ওজনের একটা পাথর দৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া একটি কপিকলে অতি দ্রুতগতিতে নিম্নে নামাইয়া দেওয়া হয়। ইহার অবলম্বনে প্রস্তরভারে ডুবুরী অবিলম্বে জলের তলায় পৌঁছিতে সমর্থ হয়; এবং তথায় পৌঁছাইয়া সে পাথর ও তৎসংলগ্ন রজ্জুটিকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু অপর একটি অপেক্ষাকৃত সরু রজ্জু ধরিয়া থাকে—তাহাতে একটা বড় ঝুড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া ডুবুরী যে ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত জলের নীচে থাকিতে সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে যতটা পারে শুক্তি সংগ্রহ করে। যথাসম্ভব শুক্তি সংগ্রহের পর জলের তলা হইতে খুব জোরে রজ্জুটি নাড়িয়া সঙ্কেত করিবামাত্র নৌকার উপর হইতে তাহার দুই-তিন জন সহকারী সবলে দড়িতে টান

দেয়। সহকারীদের নিকট সে এইটুকু মাত্র সাহায্য লয় এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উপরে ভাসিয়া উঠে। তাহার সহকারীরা ইত্যবসরে ঝিনুকের ঝুড়িটা টানিয়া তুলিয়া শুক্তিগুলাকে নৌকার তলায় ঢালিতে থাকে; সেই অবকাশে ডুবুরী দ্বিতীয়বার ডুব দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ প্রাতে ৭-৮টা হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়বার তোপ পড়িলে, সে দিনের মত শুক্তি-সংগ্রহ-কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নৌকাগুলি তখন তীরে ফিরিয়া আসে। ডুবুরীদিগকে শুক্তি সংগ্রহ করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া করস্বরূপ সংগৃহীত শুক্তির তিন-ভাগের দুই-ভাগ সরকার বাহাদুর আদায় করিয়া লন। বাকি একভাগ ডুবুরীরা তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় শুক্তিগুলা নীলামে বিক্রীত হয়। বহু ক্রেতা সেখানেই সরকার বাহাদুর কিম্বা ডুবুরিগণের নিকট হইতে ক্রীত শুক্তিগুলির খোলা ছাড়াইয়া তন্মধ্যস্থ মুক্তা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে।

শুক্তিগুলির অধিকাংশই কিন্তু পচিতে দেওয়া হয়। তাহাতে উহাদের কোমল মাংসল-অংশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; অথবা নানা পতঙ্গ-মক্ষিকা প্রভৃতির শূককীটেরা উহা
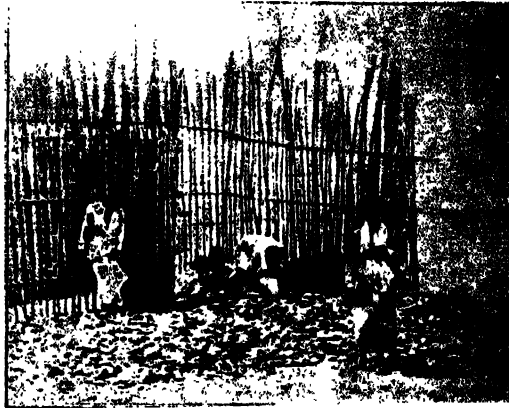
শুক্তিস্তূপের মধ্যে লোকেরা সাগ্রহে মুক্তা অন্বেষণ করিতেছে

খাইয়া ফেলে। তখন কেবলমাত্র খোসাটি ও তদভ্যন্তরীণ মুক্তাগুলি অক্ষত ও অবিকৃত পড়িয়া থাকে। পরে এই খোসাগুলিকে ধৌত করিয়া তাহাদের স্তূপের মধ্য হইতে লোকেরা সাগ্রহে মুক্তা অন্বেষণ করিয়া বাহির করে। আর এক রকমের মুক্তাব্যবসায়ীও আছে। তাহারা ডুবুরীদের অথবা যাহারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য অল্প পরিমাণ শুক্তি ক্রয় করে, তাহাদের নিকট উহা ক্রয় করিয়া ছোটখাট ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ প্রায় কেহই ঠকে না—অর্থের বিনিময়ে যথামূল্য বস্তুই লাভ করে। এই বৎসর টিউটিকোরিণে যে সমস্ত

মুক্তা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনটি সম্পূর্ণ গোলাকার, কোনটি বা নাসপাতি-সদৃশ, কোনটির একপ্রান্ত চেপ্টা কিন্তু অপরপ্রান্ত কম বেশী গোলাকার, কোনটির আবার অপর প্রান্ত কিঞ্চিৎ লম্বা ও গোল।
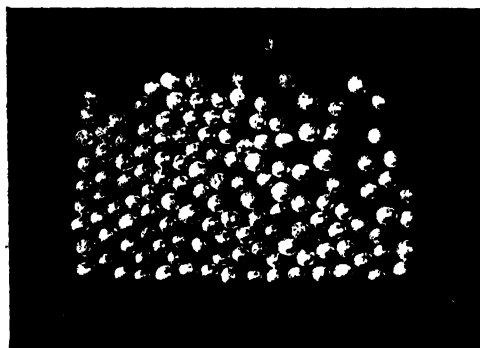
নানা আকারের মুক্তা; অতঃপর আকৃতি অনুযায়ী বাছাই হইবে

উপসংহারে আর একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, ফিতাক্রমির (tape worm) শূককীটই মুক্তার প্রকৃত জন্ম-কেন্দ্র। এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে—এই ফিতাক্রমিগুলি পূর্ব্ববর্ণিত হাঙ্গর ও তারা মৎস্যের পাকস্থলীতে পাওয়া যায়। সুতরাং মুক্তা-উৎপাদনের জন্য সমুদ্রমধ্যে এই উদরসর্ব্বস্ব মৎস্যগুলির অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে, যখন এই সকল মাছের ঝাঁক তীরের দিকে কম আসে, তখন শুক্তিতে মুক্তাও কম পাওয়া যায়। পরন্তু, যখন তাহারা তীরাভিমুখে অধিক পরিমাণে আসে, (ইহাই সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে), তখন মুক্তাসংগ্রহে আশাতীত ফল লাভ হয়। প্রকৃতির রহস্যই এইরূপ। তবে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, পৃথিবীতে অবিমিশ্র মঙ্গল কোথাও নাই। যে মৎস্যগুলি লক্ষ লক্ষ শুক্তির উচ্ছেদ সাধন করিতেছে, মানব-সুবিধার দিক হইতে বিচার করিলে শুক্তির উৎকর্ষের জন্য তাহাদেরই আবার একান্ত প্রয়োজন।*

* মূল ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

কৃত্রিম রেশম বা "রেয়ন"

শ্রীজীবনতারা হালদার

আজকাল বাজারে যে সকল নকল রেশম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নূতন নামকরণ হইয়াছে "রেয়ন" (Rayon)। এই কৃত্রিম রেশমের ইতিহাস অতি মনোরম। কত গবেষণা, কত বিফলতা, কত অর্থব্যয়, কত অধ্যবসায়ের ফলে আজ মানুষের পরিচ্ছদে এই রেয়নের ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক সময়ে যাহা রাসায়ণিকের কল্পনার বিষয় মাত্র ছিল, এক্ষণে তাহা নিজগুণে পৃথিবীর বস্ত্রতন্তু সকলের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। পরিচ্ছদ প্রস্তুত উপযোগী আঁইশ প্রধানতঃ পাঁচটি; ব্যবহার হিসাবে ইহাদের পর্য্যায়ক্রম এইরূপ :—

(১) তুলা, (২) পশম, (৩) ক্ষৌম, (Flax) (৪) রেয়ন, (৫) রেশম।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রয়মার নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের আভাষ দেন। তল্লিখিত কীটপতঙ্গের কাহিনীতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতিক রেশম একপ্রকার আঠা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহা শুকাইয়া সুতার আকারে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে, আমরাও কি গঁদ কিম্বা রজন হইতে রেশম প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইব না? ইহা প্রথমে আজগুবি মনে হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহার সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, স্বাভাবিক রেশমের ন্যায় গুণ সম্বলিত বার্ণিশ সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। তবেই, যদি কোন উপায়ে এইরূপ বার্ণিশ সুতার মত টানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে রেশমের কাজ চলিতে পারে। উহা স্বাভাবিক রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম না হউক, তাহার ন্যায় চক্‌চকে হইবে সন্দেহ নাই।"

ইহাতে কিন্তু বিশেষ কিছু ফললাভ হয় নাই। তারপর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সারডনে নামক একজন ফরাসী কাউণ্ট প্রথম কৃত্রিম রেশমের আঁইশ (fibre) তৈয়ার করিতে সক্ষম হয়েন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তুঁত গাছের ডাল পালা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এইরূপে রেয়নের সৃষ্টি হইল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার প্রসার অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে একটি মাত্র কারখানা ছিল ও তাহাতে কয়েক হাজার পাউণ্ড মাত্র সুতা উৎপন্ন হইত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১০০টী কারখানায় ১৭২,০০০,০০০ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছে।

রেয়ন প্রস্তুতনিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন জিনিষ ব্যবহার হইতে পারে, যথা—(১) নানাবিধ তুলার আঁইশ, (২) বৃক্ষকাণ্ড। এই দুইটি দ্রব্যেরই প্রধান উপাদান "cellulose" নামক একটি পদার্থ—ইহাই হইল রেয়নের ভিত্তি। অবশ্য ইহাদের অন্তর্ভুক্ত অবান্তর জিনিষগুলি

পরিত্যক্ত হয়। রেয়ন প্রস্তুতের নানাবিধ উপায় আছে। সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে বটে, কিন্তু অমিলও অনেক।

কাষ্ঠ হইতে সুতার উপকরণ সংগ্রহ করা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের মূল প্রণালীটি এইরূপ :—

কাঠসিদ্ধ (wood pulp), তুলা, পাট, শণ, খড়, ঘাস প্রভৃতি cellulose কে কোন উপযুক্ত দ্রাবকপুটে (solvent) দ্রব করা হয়। তাহাতে যেন আদৌ খিঁচ না থাকে ; এবং পরিশেষে যেন ঘনভাবযুক্ত হয়। এই তরল পদার্থটি প্রস্তুত করিবার সময় খুব সাবধান হইতে হয়। উহাকে সর্ব্বক্ষণ প্রায় ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপে রাখিতে হইবে, নচেৎ জমিয়া যাইবে। এখন এই অর্দ্ধতরল পদার্থটিকে অতিশয় সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাতাসের জোরে (air pressure) নিঃসারণ করা হয়। উহা কোন একটি কার্য্যোপযোগী তরল পদার্থে গিয়া পতিত হয় এবং অবিলম্বে জমিয়া যায়। এই কার্য্যের জন্য চুলের মত সরু ছেঁদাওয়ালা কাচের নল এক সঙ্গে অনেকগুলি ব্যবহৃত হয়। এবং প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৬৫০ পাউণ্ডের চাপ আবশ্যক হয়। এই সকল ছিদ্র হইতে বেগে বাহির হইয়াই ঐ তরল দ্রব্যটি জমিয়া গিয়া সিল্কের মত সুতায় পরিণত হয়। ফলতঃ তখনও উহা তুলাই থাকে কিন্তু দেখিতে ঠিক রেশমের মত হয়। এক একটি ছেঁদা হইতে প্রতি সেকেণ্ডে এক গজ রেয়ন তৈয়ার হয়।

উপরোক্ত উপায়ে cellulose বিস্ফোটক gun cotton-এর অনুরূপ পদার্থে পরিণত হয়। অতএব ইহা হইতে রেয়ন প্রস্তুত হইলে তখনও উহাতে দাহশক্তি বর্ত্তমান থাকে ; তজ্জন্য উহাকে নানা উপায়ে নিরাপদ করা হয়। তারপর সুতাগুলি পাক দেওয়া হয়। এক সঙ্গে ২।৩টি সুতা পাকাইয়া মোটা করা হয় ও উহাদের মলিনতা দূর করিবার জন্য জলে ও অন্যান্য রাসায়নিক উপকরণে ধৌত করা হয়। পরে সুতার পেইগুলি কাচের বা রবারের নলীতে জড়াইয়া রাখা হয়। পরিশেষে উহাকে চাপ দিয়া শুকান হয়। একেবারে শুকাইয়া গেলে উহা দেখিতে আসল রেশমের মত হয়।

অধুনা রেয়ন প্রস্তুতের চারিটি কার্য্যোপযোগী উপায় উদ্ভূত হইয়াছে।

১। Nitro-cellulose প্রণালী।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য এযাবৎ যে সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা প্রথম। ইহাতে collodion solvent ব্যবহৃত হয়। সুতা জমাইবার জন্য মাত্র ঠাণ্ডা জল ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে প্রস্তুত নকল রেশমকে সার্‌ডনে সিল্ক (Chardonnet silk) বা সংক্ষেপে nitro silk বলা হয়। ইহাই প্রথম বাণিজ্য পণ্য।

২। Viscose প্রণালী।

ইহাতে cellulose-কে গলাইবার জন্য caustic soda ব্যবহৃত হয়। উহাকে চট্‌কাইয়া দুধে-ভিজা পাউরুটির শাঁসের মত নরম করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ রেয়ন এখন এই উপায়ে তৈয়ার হয়। (প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ)।

৩। Acetate প্রণালী।

ইহাতে acetic acid প্রভৃতি solvent হিসাবে ব্যবহৃত হয়; এবং জমাইবার জন্য সুরাসার ব্যবহৃত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত সূতার একটি বিশেষগুণ এই যে ইহাতে সহজে আগুণ ধরে না। ইহা অধিক ক্ষণ জলে ভিজিলেও খারাপ হয় না। অতএব বেশী কাচা যাইতে পারে। ইহাকে বিলাতে celaucse সিল্ক ও কহে।

৪। Cuprammonium প্রণালী।

ইহাতে copper ammonium oxide দ্রাবকপুটরূপে ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে জার্ম্মাণিতে রেয়ন প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত চারিপ্রকার উপায়ে তৈয়ারী রেয়নগুলির প্রত্যেকটির কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

এই কয়টি উপায়ের মধ্যে এক পাউণ্ড Viscose silk তৈয়ার করিতে ২৲ টাকা খরচ পড়ে এবং সেই পরিমাণ Nitro silk তৈয়ার করিতে প্রায় ৪৲ টাকা খরচ পড়ে।

রেশমের অনুকরণ এই খানেই শেষ হয় নাই। প্রত্যহ নূতন ধরণের রেয়ন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে এবং পুরাতন প্রণালীর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতে একজন বৈজ্ঞানিক বিকৃত দুগ্ধ হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রেয়ন যে কেবলমাত্র স্বাভাবিক রেশমের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য বিশেষ, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যদিও এই উদ্দেশ্যেই উহা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি এখন ইহা পরিচ্ছদ জগতে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ, ইহাতে বহুবিধ নিজস্ব গুণাবলী বিদ্যমান।

রেশমের সহিত রেয়নের তুলনা করিলে মনে হয়, আপাততঃ রেয়ন রেশম অপেক্ষা কম মজবুত, কিন্তু রেয়ন যাহাতে টেঁকসই হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। পরন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে রেয়ন রেশম অপেক্ষা বেশী চক্‌চকে। ফলতঃ রেয়নের অনেক বিশেষত্ব আছে, যদ্বারা ইহা একটি প্রধানতম আঁইশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বয়ন-শিল্পের উপযোগিতা হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য কয়টি পরিস্ফুট হয়।

এই কৃত্রিম রেশমের এমন একটি ঔজ্জ্বল্য আছে যাহা অন্যত্র লক্ষিত হয় না। এই কারণে ইহা দ্বারা সাজসজ্জার কাজ সুন্দর হয় এবং ইহা তুলা বা পশমের সহযোগে অতি মনোরম বস্ত্র উৎপাদন করে। ইহা অতীব মসৃণ—এই জন্য শীঘ্র ময়লা হয় না। অতএব অভ্যন্তরীণ পোষাকের উপযোগী। ইহাকে অতি অল্প আয়াসে সুন্দর, সুদৃশ্য ও অসংখ্য রঙে রঞ্জিত করা যাইতে পারে। রং করা ও মাজা হইলে উহা আরও বেশী 'চটকদার' হয়। আবশ্যকীয় ও সৌখীন উভয়রূপ পোষাকেই ইহার ব্যবহার চলিতেছে। ইহার মূল্যও অতি অল্প—সর্ব্বসাধারণ সেই জন্য ইহা ব্যবহার করিতে পারে। (উদাহরণ স্বরূপ বাজারে প্রচলিত "আলপাকা শাড়ী"র উল্লেখ করা যাইতে পারে)।

তথাপি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অদ্যাপি কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হয় নাই। দিন দিন পরিচ্ছদের উপাদানরূপে উহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে। বস্ত্রশিল্পে উহার নিত্যনূতন প্রয়োগ হইতেছে।

রেয়ন হইতে শুধু যে পরিধানযোগ্য শাড়ীকাপড়, জামার থান প্রভৃতি হইতেছে তাহা নহে, উহা হইতে রুমাল, মোজা, গেঞ্জি, নেকটাই, এমন কি 'লেস' পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে। রেয়নের একটি সুবিধা এই যে, ফ্যাশনের পরিবর্ত্তনের সহিত ইহাও নূতন নূতন পোষাকের কাজে অতি সহজে লাগান যাইতে পারে। অনেকের মতে পোষাকপরিচ্ছদে রেশম অপেক্ষা রেয়ন উপযোগী ও প্রিয়। এই সকল কারণে কৃত্রিম রেশম স্বাভাবিক রেশমকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রেশমের ব্যবহার কমিয়া নকল রেশমের ব্যবহার বাড়িবে—এরূপ ধারণা অমূলক নহে। রেশম একেবারে লুপ্ত হইবে না বটে, কিন্তু রেয়ন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ম এই কয় দেশই রেয়নের প্রধান জন্মস্থান ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ও অষ্ট্রীয়া প্রত্যেকে মাত্র ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড রেয়ন উৎপন্ন করিতেছিল। সেই সময়ে ইটালী বার্ষিক মাত্র ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড উৎপাদন করিতেছিল। কিন্তু ১০ বৎসরে ঐ দেশ পৃথিবীর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মানীতে এখন সর্ব্বসমেত ১৮টী কারখানা আছে এবং তাহাতে প্রায় ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড রেয়ন উৎপন্ন হয়। রেয়ন প্রস্তুত ব্যবসায়ে জাপান সকলের শেষে নামিয়াছে। ১১৯৮ সালে মাত্র ১,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ দেশে এখন ৬০ কোটি পাউণ্ড রেয়ন উৎপন্ন হয়।

এখন পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রেয়ন উৎপন্ন, ব্যবহৃত এবং আমদানী হয়। আমেরিকা মাত্র ১৩ বৎসরে এইরূপ অসম্ভাবিত উন্নতি করিয়াছে।

৯।

গাছের কথা

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু

উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে

সচরাচর আমরা চোখের সাম্‌নে যে সকল ছোট বড় সবুজ রংএর গাছ বা লতা দেখি, তাহাদেরই চলিত কথায় 'গাছ' বলিয়া থাকি। কিন্তু ঘাসকে আমরা ঘাস বলি, 'ঘাস গাছ' বলি না; সেইরূপ শেওলা, ব্যাঙের ছাতা, জুতা, বই প্রভৃতির উপর যে ছাতা ধরে, তাহাদের কাহাকেও চলিত কথায় গাছ বলি না—কিন্তু ইহারা সকলেই গাছ। ছাতা জাতীয় ও অন্যান্য

ঐ প্রকারের অনেক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ আছে, তাহা আমরা চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু অণুবীক্ষণ (microscope) বলিয়া একটা যন্ত্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া দেখিলে উহাদের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বড়, ছোট ও অতি ছোট গাছকে 'উদ্ভিদ্' বলে।

শ্রেণী-বিভাগ

উদ্ভিদ্ জাতি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে সকল উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয়, তাহাদের 'সপুষ্পক উদ্ভিদ্' বলে। আবার আর এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের ফুল হয় না; যেমন—ঢেঁকি শাক (Fern), ছাতা, শেওলা—ইহারা 'অপুষ্পক উদ্ভিদ্'।

এই দুই শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদের রং সবুজ এবং তাহাদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলির রং সবুজ হয়; কিন্তু তাহাদের ফুল, ফল ও বীজ হয় না; যেমন—ঢেঁকি শাক,—ইহারা পাতা-বিশিষ্ট; শেওলা জাতীয় উদ্ভিদেরও রং সবুজ কিন্তু তাহারা পাতা-বিশিষ্ট নহে ও তাহাদেরও ফল, ফুল ও বীজ হয় না। আবার কতকগুলি সবুজ ছাড়া অন্য রংএর হয়; কিন্তু কখনও সবুজ রংএর হয় না। ইহা ছাড়া তাহাদের শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি কিছুই থাকে না। এই সকল উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ খালি চোখে ভাল ভাবে দেখা যায় না। তাহাদিগকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণের দরকার হয়; যেমন—ব্যাঙের ছাতা ও অন্যান্য ছাতা।

সর্ব্বপ্রথমে প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ ফুল ফল সমন্বিত সবুজ রঙের (সপুষ্পক) উদ্ভিদের কথা বলিব।

উদ্ভিদ্-দেহ

জন্তুদের যেমন কতকগুলি অংশ লইয়া দেহ বা শরীর গঠিত, উদ্ভিদেরও তেমনি কতকগুলি অংশ লইয়া দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা সকল সময়ে মাটির উপরে গাছের কাণ্ড ও পাতা দেখিতে পাই; মাটির নীচে গাছের যে শিকড় আছে, তাহা গাছ উপ্‌ড়াইলে বা গাছের গোড়া খুঁড়িলেই দেখিতে পাই। গাছ জন্মাইবার সময় হইতেই আমরা এই তিনটি অংশ দেখিতে পাই। তাহার পর গাছের বয়স বাড়িলে তাহাতে ফুল ধরিতে দেখি এবং ফুল হইতে ফল হয়, আর ফল হইতে বীজ। আবার সেই বীজ হইতে নূতন করিয়া গাছ জন্মায়। সুতরাং বীজকে আমরা গাছের 'সন্তান' বলিতে পারি।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদেরও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া আছে; তাহারাও ঘামে ও ঘুমায়। কিন্তু তাহাদের ঐ সকল ক্রিয়ার যন্ত্র প্রাণীদের মত নয়—অন্যরূপ।

বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি

গাছের অঙ্কুরের উৎপাদন, পুষ্টি ও বর্দ্ধনের নিমিত্ত চিনি, চর্ব্বি, শ্বেতসার (Starch)

প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা বীজটি পূর্ণ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি দুই প্রকারে হয়—

প্রথম প্রথায়—যখন বীজ মাটিতে পোতা হয়, তখন তাহা সুবিধা মত জল, তাপ ও বাতাস পাইয়া ফুলিয়া উঠে এবং বীজের খোসায় যে একটা ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া সাদা কলি বাহির হয়। বীজের ভিতরের অংশ—আয়তনে বাড়িয়া ভিতর হইতে বীজের খোসা বা আবরণের উপর চাপ দিয়া ঠেলিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া—বাহির হইয়া পড়ে। তখন আমরা দেখিতে পাই যে, বীজের মধ্যে একটি ডাঁটা আছে; আর সেই ডাঁটার মাঝখানে সাদা পাতার মত জিনিষ আটকান রহিয়াছে। এই ডাঁটার নীচের দিকটা সাদা ও তাহা মাটির দিকে গিয়াছে; এবং তাহার ডগায় ছোট ছোট কচি পাতার মত কোন জিনিষ নাই—ইহাই গাছের 'ভ্রূণ-মূল'। এই ভ্রূণমূল একটি মাত্র শিকড়ে পরিণত হয়।

ডাঁটার উপরের অংশ ঈষৎ হরিদ্রাভ সবুজ ও তাহার ডগায় ছোট ছোট কচি পাতা আছে; ডাঁটার সেই অংশ আকাশের দিকে উঠে—ইহা গাছের 'ভ্রূণ-কাণ্ড'।

ভ্রূণ-মূল ও ভ্রূণ-কাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সংলগ্ন সাদা পাতার মত অংশটিকে 'বীজপত্র' বলে। গাছবিশেষে এই বীজপত্র একটি হইতে পারে; আবার দুইটিও হইতে পারে। যে সকল গাছের দুইটি করিয়া বীজপত্র, তাহাদের সাধারণতঃ অঙ্কুরের উৎপত্তি এই প্রকারেই হয়। বুট, মটর, আম, কাঁঠাল, বেগুন প্রভৃতি গাছ এই শ্রেণীর।

ধান, সুপারী, ভুট্টা প্রভৃতির একটি করিয়া বীজপত্র থাকে। ইহাদের বীজের অঙ্কুর দ্বিতীয় প্রথায় উৎপন্ন হয়। ইহাদের ভ্রূণ-মূল, প্রথম প্রথায় উৎপন্ন অঙ্কুরের ভ্রূণ-মূলের ন্যায় লম্বা না হইয়া, দুই তিনটি সাদা কলি সম্পন্ন ও একটি শিকড় না হইয়া দুই তিনটি শিকড়ে পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় এই ভ্রূণ-মূলটি একটি আবরণে ঢাকা থাকে; কিন্তু যখন ইহা হইতে শিকড়গুলি উৎপন্ন হয়, তখন তাহারা এই আবরণটিকে ছিঁড়িয়া ফেলে।

কোন কোন গাছের বীজপত্র মাটির উপরে থাকে; যথা—তেঁতুল, সীম। আবার কোন কোন গাছের বীজপত্র মাটির ভিতরে থাকে; যথা—মটর, আম।

বীজের মধ্যে গাছের অঙ্কুরের খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা বলা হইয়াছে। সেই খাদ্য বীজের কোন্ অংশে সঞ্চিত থাকে; তাহাই এখন বলিব। যে সকল বীজপত্র খুব মোটা, তাহাদের খাদ্য এই বীজপত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে—যথা তেঁতুল, মটর, বুট ইত্যাদি। যে সকল বীজ-পত্র পাত্‌লা, তাহাদের বীজের মধ্যে শাঁস থাকে—দেখা যায়। সেই শাঁসই এই সকল বীজের সঞ্চিত খাদ্য; যথা—ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

অঙ্কুরের দেহ ছোট ছোট কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। এই কোষগুলি নিজ নিজ দরকার মত খাদ্যসামগ্রীকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

জল, তাপ ও বাতাস পাইয়া অঙ্কুরগুলি শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে; তখন অঙ্কুরের কোষ হইতে এক প্রকার রস (enzyme) নির্গত হইয়া থাকে। অঙ্কুর এই রস দ্বারা

বীজের ভিতরকার সঞ্চিত আহার্য্যদ্রব্যগুলিকে ব্যবহারোপযোগী খাদ্যে পরিণত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন বীজের অঙ্কুর বাহির হয়, তখন তাহাকে যেমন করিয়াই হউক মাটি ও বাতাস হইতে খাবার সংগ্রহ করিতে হয়। বীজ হইতে চারাগাছ জন্মিলে যতক্ষণ না সেই চারাগাছের সবুজ পাতা জন্মে, ততক্ষণ বীজের মধ্যস্থ সঞ্চিত খাদ্য হইতেই চারাগাছের খাদ্য যোগান হইয়া থাকে। তাহার পরে সবুজ পাতা জন্মিলে, চারাগাছ পাতার সাহায্যে নিজের খাবার নিজেই তৈয়ার করিতে সক্ষম হয়; সেই সময়ে সঞ্চিত খাদ্যের আধার—বীজপত্র—প্রায়ই খসিয়া পড়ে।

বীজ হইতে চারাগাছ কিরূপে জন্মে, তাহা বলিলাম। এখন ঐ চারাগাছ কি করিয়া বড় হয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তাহার আগে শিকড়, কাণ্ড ও পাতা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

শিকড়, কাণ্ড ও পাতা

শিকড়—একটা কচি চারাগাছ সাবধানে মাটি হইতে উঠাইয়া তাহার শিকড় সাবধানে জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে—যেন ছিঁড়িয়া না যায়। ঐ শিকড়টিকে আলোর দিকে ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, শিকড়টির ডগায় একটা টুপির মত আচ্ছাদন আছে; ইহাকে শিকড়ের আচ্ছাদন বা মূলের আচ্ছাদন বলে; ইংরাজীতে ইহাকে রুট্ ক্যাপ (root cap) বলিয়া থাকে। কচি শিকড়কে আঘাত হইতে রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। শিকড়টি মোটা হইতে ক্রমে সরু হয় ও আকাবাঁকা হইতে আরম্ভ করে। তখন ঐ শিকড়ের অনেক শাখাপ্রশাখা বাহির হইতে থাকে।

মূলকেশ—সরু সরু সাদা শিকড়গুলির ডগার দিকে খুব সরু সরু সাদা চুলের মত রোঁয়া আছে; এই সকল রোঁয়াকে 'মূলকেশ' বলে। ইংরাজীতে 'রুট্ হেয়ার' (root hair) বলে। এই মূলকেশই মাটি হইতে জল শুষিয়া গাছকে জল ও জলের সহিত গলিত লবণ প্রভৃতি পদার্থ সরবরাহ করে। কিরূপে করে তাহা যথাস্থানে বলিব। মূলকেশ কোনরূপে নষ্ট হইলে গাছ মাটি হইতে জল শোষণ করিতে পারে না। একটা চারাগাছ উপ্ড়াইয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে প্রথমে দিন কয়েক তাহা নিস্তেজ হইয়া নেতাইয়া বা ঝুলিয়া পড়ে; তাহার পর আবার সতেজ হইয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে, ঐ গাছ উপ্ড়াইবার সময় মূলকেশ ছিঁড়িয়া নষ্ট হয় ও জল শোষণ করিতে পারে না; তাই জলাভাবে গাছ নেতাইয়া পড়ে। তাহার পর যখন নূতন মূলকেশ জন্মে, তখন তাহারা জল শোষণ করে; গাছ সেই জল পাইয়া আবার সতেজ হয়।

ছাল—ধীরে ধীরে শিকড় ও কাণ্ডের ছাল ছাড়াইলে দেখা যায় যে, একই ছাল কাণ্ড ও শিকড়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। শিকড় ও কাণ্ডের ছালের বর্ণ কিন্তু একরূপ নহে। কাণ্ড আলো পায়, শিকড় আলো পায় না তাই, বর্ণের তফাৎ।

কাষ্ঠ-অংশ বা কাঠ—ছালের তলায় কাষ্ঠ-অংশ বর্ত্তমান। একটা ছুরী দিয়া কাণ্ড হইতে শিকড় পর্য্যন্ত এই কাষ্ঠ-অংশকে বরাবর লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে, একই কাষ্ঠ-অংশ শিকড় হইতে কাণ্ডে গিয়াছে।

পাতা—একটা পাতা লইয়া ভাল করিয়া দেখিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, পাতার রং সবুজ। তাহার পর দেখা যাইবে—পাতার উপর ও তলায়—দুই দিকেই পাত্‌লা সাদা ছাল বা চামড়ার আবরণ আছে। এই চামড়া চাঁছিয়া তুলিয়া ফেলিলে সবুজ রংয়ের শাঁসাল অংশ বাহির হইয়া পড়ে। পাতার মাঝখানে একটা ডাঁটা বা শিরা আছে; তাহা হইতে সরু সরু শিরা, উপশিরা বাহির হইয়া জালের মত সমস্ত পাতাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে (পচা বট বা অশ্বত্থ পাতায় ইহা ভাল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়)। একটি সূক্ষ্ম জালের উপর সবুজ বর্ণের শাঁসের প্রলেপ দিয়া ও তাহার উপরে ও তলায় সাদা চামড়ার আবরণ দিয়া যেন পাতাটি তৈয়ারী। এই ডাঁটা ও শিরা-উপশিরার জালটি পাতার কাষ্ঠ-অংশ। পাতার সবুজ রংটিকে 'পত্রহরিৎ' (chlorophyll) বলে।

গাছের ডালের যে স্থানে পাতাটির সংযোগ, একটু ভাল করিয়া দেখিলে নজরে আসিবে যে, ডালের ছালের সহিত পাতার ছাল ও সবুজ শাঁসাল অংশের যোগ আছে এবং পাতার মাঝের ডাঁটাটি পাতার বোঁটা হইয়া ডালের বা কাণ্ডের কাষ্ঠ-অংশের সহিত মিলিত হইয়াছে।

পত্র-ছিদ্র বা বায়ুপথ

ইহা ছাড়া পাতার তলার দিকে সরু সরু অনেক ছিদ্র আছে। কোন কোন পাতার উপর দিকে বা উভয় দিকে ঐরূপ ছোট ছোট ছিদ্র থাকে; তাহারা এতই ছোট যে, শুধু চোখে প্রায়ই দেখা যায় না। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (magnifying glass) বা অণুবীক্ষণের (microscope) সাহায্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা "পত্রছিদ্র" বা "বায়ুপথ"। ইংরাজীতে ইহাদিগকে 'ষ্টোমাটা' (Stomata) বলে। পত্রছিদ্রকে বেষ্টন করিয়া তাহার দুইধারে সীমবীজের আকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি কোষ আছে; তাহাদিগকে "গার্ড (Guard) সেল" বলে।

লেণ্টিসেল (Lenticel)

সেইরূপ শিকড় ও কাণ্ডের গায়েও অনেক ছোট ছোট ছিদ্র আছে; তাহারা ঐ সকল অঙ্গের বায়ুপথ। ইংরাজীতে তাহাদের নাম "লেণ্টিসেল" (Lenticel)।

ইহা ছাড়া কাণ্ডের গায়ে পাতার কোলে একটি বা দুইটি করিয়া কুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। পাতার কোল ছাড়াও কাণ্ডের গায়ে কুঁড়ি থাকে। এই সকল কুঁড়ি হইতে গাছের শাখা উৎপন্ন হয়। আবার অনেক পাতার তলার দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া থাকে। এখন মোটামুটি জানা গেল যে,

শিকড়ে—(১) একটি-মূল আচ্ছাদন আছে;
(২) পাতা বা কুঁড়ি নাই;
(৩) মূলকেশ আছে;

ক

(৪) লেণ্টিসেল আছে ;
(৫) ছাল আছে ;
(৬) কাষ্ঠ-অংশ আছে ;
কাণ্ডে—(১) পাতা ও কুঁড়ি আছে ;
(২) লেণ্টিসেল আছে ;
(৩) ছাল আছে ;
(৪) কাষ্ঠ-অংশ আছে ;
পাতায়—(১) ছাল আছে ;
(২) সবুজ শাঁসাল অংশ আছে ;
(৩) কাষ্ঠ-অংশ (শিরা, উপশিরা) আছে ;
(৪) পত্রছিদ্র আছে ;

এবং মূলকেশের সহিত শিকড়ের ছালের সংযোগ আছে। আবার শিকড়ের সহিত কাণ্ডের (ছাল ও কাষ্ঠের) এবং কাণ্ডের সহিত পাতার সংযোগ আছে ; অর্থাৎ মূলকেশ হইতে পাতার ডগা পর্য্যন্ত—শিকড় ও কাণ্ডের ভিতর দিয়া—বরাবর দুইটি অংশ আছে। একটি ছাল ও অপরটি কাষ্ঠ-অংশ। ছাল অনেক রকম কোষ দিয়া নির্ম্মিত ; কাষ্ঠ-অংশের ভিতর সরু সরু নলের আকৃতি-বিশিষ্ট কোষ আছে, ছালে কিন্তু সেরূপ কোষ নাই। কাষ্ঠ-অংশ নিরেট নহে—তাহা ফাঁপা নলের সমষ্টি।

গাছ কি করিয়া জীবনধারণ করে ও কি ভাবে বর্দ্ধিত হয় ; এবং গাছের কোন্ অংশ কি কাজ করে—এক এক করিয়া তাহার আলোচনা করিব।

উদ্ভিদের ক্রিয়া

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাবারের যে আগে দরকার, তাহা আমরা খুব ভাল ভাবেই জানি। তাহা ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসেরও সমান দরকার। আমাদের যেমন জল, বাতাস, আলো, তাপ প্রভৃতির দরকার, গাছেরও তাই। আমরা যেমন খাবার খাই, শ্বাসপ্রশ্বাস লই ও ফেলি, শরীর হইতে ঘামরূপে জল বাহির করিয়া দিই, বিশ্রাম করি, ঘুমাই ; গাছও ঠিক তেমনি খায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস লয় ও ফেলে, শরীর হইতে ঘামরূপে জল বাহির করিয়া দেয়, বিশ্রাম করে ও ঘুমায়। খুব পরিশ্রম করিলে আমরা যেমন শ্রান্ত হই, উদ্ভিদেরাও তেমনি শ্রান্ত হয়। আমাদের যেমন রোগ হয়, উদ্ভিদেরও সেইরূপ রোগ হইয়া থাকে। আমাদের যেমন সন্তানাদি জন্মে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ সন্তানাদি হয়। আমাদের যেমন মৃত্যু আছে, গাছেরও তেমনি আছে।

অন্য বিষয়ের আলোচনার আগে কয়েকটি বাক্যের অর্থ জানা দরকার।

(১) আকার কাহাকে বলে? বস্তুর আকার তিন প্রকার—(ক) তরলাকার ; (খ) বাষ্পাকার ; ও (গ) কঠিনাকার।

অবস্থাভেদে বস্তুর আকারের পরিবর্ত্তন হয়। জলের তিন অবস্থায় তিন রকম আকার হয়; যথা জল—তরলাকার, ভাপ বা বাষ্প—বাষ্পাকার, ও বরফ—কঠিনাকার বা নিরেট্। ইংরাজীতে এই আকারকে 'ষ্টেট্' (State) বলে। বাংলায় আমরা ইহাকে আকার বা দশা বলিব। যে অবস্থায় যে দশা বা আকার প্রাপ্তি হয়, সেই অবস্থাকে ইংরাজীতে 'কণ্ডিসান' (condition) বলে—আমরা ইহাকে 'অবস্থা'ই বলিব। ইংরাজীতে যাহাকে 'ফর্ম' (form) বলে, তাহাকে বাংলায় 'আকৃতি' বা 'গঠন' বা 'আকার' বলিব। ইংরাজীতে যাহাকে 'সাইজ' (size), বলে, তাহাকে 'আকার' বা 'আয়তন' বলিব।

(২) দানা কাহাকে বলে? মিশ্রি, চিনি, লবণ তুঁতে প্রভৃতি দানার আকারে আছে। এইরূপ আকৃতিকে দানাদার বলিব। জলের পরিমাণ হিসাবে দানার আকৃতি হয়।

(৩) এসিড বা অম্ল কাহাকে বলে? টক বস্তুকে অম্ল বলে। হাইড্রোজেন অন্য দ্বিতীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে যে যৌগিক পদার্থ হয়, তাহাই এসিড। কিন্তু এই দ্বিতীয় পদার্থে প্রায় সকল সময়ে অক্সিজেন থাকে। এসিড নীল লিট্‌মাসকে (এক প্রকার রং=litmus) লাল রঙে পরিবর্ত্তিত করে।

(৪) অক্সাইড্ (Oxide) কাহাকে বলে? একটি বস্তুর সহিত অক্সিজেনের সংমিশ্রণ হইয়া যে বস্তু হয়, তাহাকে অক্সাইড্ বলে; যেমন—CO_2=কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড, (C= কার্ব্বণ=অঙ্গার; O= অক্সিজেন); এক ভাগ অঙ্গারের সহিত দুই ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে এক ভাগ অঙ্গারক বাষ্পের সৃষ্টি।

(৫) হাইড্রক্সাইড (hydroxide) কাহাকে বলে?—একটি বস্তুর সহিত একভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের (OH; O=অক্সিজেন=অম্লজান্, H=হাইড্রোজেন =উদ্‌জান্) সংমিশ্রণে যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহাকে হাইড্রক্সাইড বলে; একভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত বস্তুটিকে (OH) হাইড্রক্সিল (Hydroxyl) বলে; দৃষ্টান্ত— KOH=পটাসিয়াম্ হাইড্রক্সাইড্ (K= পটাসিয়াম্, OH=হাইড্রক্সিল)।

যে সকল হাইড্রক্সাইড্ জলে দ্রবণীয় ও এসিডের সহিত মিলিত হইয়া এসিডের হাইড্রোজেনের সহিত নিজের হাইড্রক্সিলকে মিলিত করিয়া জলে পরিণত করে ($OH+H=H_2O$) ও বাকি বস্তুটি এসিডের হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করিয়া এসিডকে রূপান্তরিত করে, তাহাদের এলকালি (alkali) বা ক্ষার পদার্থ বলে; এবং এই রূপান্তরিত পদার্থকে লবণ (salt) বলে। এসিড যেমন নীল লিট্‌মাসকে লাল করে, ক্ষার বা এলকালি সেইরূপ লাল লিট্‌মাসকে নীল করে—ঠিক এসিডের উল্টা। অথবা হলুদকে লাল করে। KOH (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড্—ক্ষার) $+HNO_3$ (নাইট্রিক এসিড)$=KNO_3$ (পটাসিয়াম নাইট্রেট্—লবণ) + H_2O (জল); এখানে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড্ (KOH) এর হাইড্রক্সিল (OH) নাইট্রিক এসিডের (HNO_3র) হাইড্রজেনের (H) সহিত মিলিত হইয়া H_2Oতে (জলে) পরিণত হইতেছে ও KOH এর বাকী পদার্থ K (পটাসিয়াম) HNO_3র (নাইট্রিক এসিডের) H (হাইড্রোজেন)-এর

স্থানে বসিয়া KNO_3 (পটাসিয়াম নাইট্রেট্)-এতে এসিডকে রূপান্তরিত করিতেছে। এখানে KNO_3 পটাসিয়ামের লবণ।

(৬) লবণ কাহাকে বলে ?

(ক) এসিডের হাইড্রোজেনকে তাড়াইয়া যদি কোন ধাতু তাহার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে এই রূপান্তরিত বস্তুকে লবণ বলে ; যথা—Zn (দস্তা) + H_2SO_4 (সালফিউরিক্ এসিড) = $ZnSO_4$ লবণ (জিঙ্ক সালফেট্) + H_2 (হাইড্রোজেন)।

(খ) যদি কোন ক্ষার বস্তু এসিডের হাইড্রোজেনকে তাড়াইয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে এই রূপান্তরিত বস্তুকেও লবণ বলে ; যথা—

$$KOH + HNO_3 = KNO_3 + H_2O$$
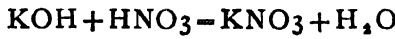
কষ্টিক্ পটাস্ + নাইট্রিক্ = সোরা + জল
ক্ষার এসিড লবণ

(গ) আবার যদি কোন ধাতব অক্সাইড্ এসিডের হাইড্রোজেনকে তাড়াইয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে সেই রূপান্তরিত বস্তুকে লবণ বলে ; যথা—

$$Ag\,O + 2HNO_3 = 2Ag\,NO_3 + H_2O$$
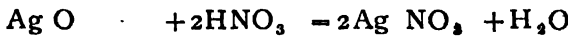
সিলভার অক্সাইড + নাইট্রিক্ = সিলভার (রূপার) নাইট্রেট + জল
রূপার অক্সাইড্ এসিড লবণ

ক্ষারের সহিত এসিডের যোগ হইলে ক্ষারের ক্ষারত্ব চলিয়া যায় (নষ্ট হয়) ও এসিডের অম্লত্ব ক্ষারের পরিমাণ হিসাবে কমে। ক্ষারে অম্লত্ব একেবারে মারিয়া দিতে পারে।

(৭) বেস্ (Base) কাহাকে বলে ?

যে সকল ধাতব অক্সাইড্ এসিডকে লবণে পরিণত করে, তাহাদিগকে বেসিক্ অক্সাইড্ বা বেস্ বলে।

(৮) তাপ বা উত্তাপ (Temperature ও Heat)—আগুনে তাপ প্রদান করে। ইন্ধন (কাঠ, কয়লা, তেল ও গ্যাস) জ্বালাইলে আগুন হয়। একটা শীতল বস্তুতে তাপ লাগিলে তাহা উত্তাপিত হয় ; যেমন—আগুনে জল গরম হয়। আগুনের যে তাপ জলকে গরম করে, তাহাকে ইংরাজীতে 'হীট্' (heat) বলে। জল আগুন হইতে তাপের কিছু অংশ লইয়া নিজের মধ্যে সেই তাপ রাখিতেছে ও তাহার জন্য গরম বা উত্তপ্ত হইতেছে। তাপ একপ্রকার শক্তি এবং এই শক্তি বস্তুর পরমাণুকে গতিশীল করে। জল যখন গরম হয়, তখন দেখা যায় যে—যতই গরম হইতে থাকে, জল ততই আন্দোলিত হইতে থাকে। এই তাপের একটা পরিমাণ আছে এবং তাহার একটা তেজও আছে। অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ইন্ধন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের তাপ বিকীর্ণ করে বা বাহির করে ; এবং তাহার তেজেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এই নিষ্কাশিত বা বহির্গত তাপের পরিমাণ 'ব্রিটিশ থারমাল্ ইউনিট' (British

thermal unit) বা 'গ্রাম ক্যালোরী' (Gram calorie) বা 'থার্‌ম্‌ ইউনিটে' (Therm Unit) নিরূপিত হয় ; এবং তেজের পরিমাণ থারমমিটারের দ্বারা—ডিগ্রির হিসাবে—নিরূপিত হইয়া থাকে। একক ওজনের জলকে এক ডিগ্রি তাপে উত্তাপিত করিতে যতটা পরিমাণের তাপ লাগে, তাহাকে 'থারমাল ইউনিট' বলে। তাপের একটা প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকল বস্তুকে আয়তনে বাড়ায়—অর্থাৎ ঠাণ্ডা বস্তু গরম হইলে তাহার আয়তন বাড়ে। সকল বস্তুর তাপ লইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ; সেই পরিমাণের বেশী তাপ পাইলেও বস্তু তাহার ক্ষমতার বেশী তাপ লইতে পারে না। সুতরাং বাড়্‌তি যে তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা সেই বস্তুর কোন কাজে আসে না। গাছের উপর যতটা সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, তাহার সমস্তটা গাছের কাজে লাগে না। গাছ মাত্র তাহার (সূর্য্যরশ্মির) তাপ-শক্তির কতক অংশ নিজের কাজে লাগায়।

উদ্ভিদ্‌-খাদ্যের উপাদান

জল—যে সকল মূল পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদের খাদ্য তৈয়ারী হয়, তাহাদের মধ্যে জলই সর্ব্বপ্রধান। জলের সহিত কঠিন খাদ্যদ্রব্য গলিত হইয়া উদ্ভিদ্‌-শরীরে প্রবেশলাভ করে ; আবার ঐ গলিত অবস্থায় উদ্ভিদ-শরীরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে। ইহা ছাড়া উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় দুইটি বাষ্প—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—প্রধানতঃ জলের আকারেই উদ্ভিদ্‌-শরীরে প্রবেশ করে। দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে জল হয়। উদ্ভিদের সকল অংশেই জল আছে—কোন কোন অংশে শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ জল বর্ত্তমান।

অন্যান্য দ্রব্য—জলের পরেই অঙ্গার বা কার্ব্বণ (Carbon) ; তারপরই নাইট্রোজেন (Nitrogen), গন্ধক (Sulphur), ফস্ফরাস্‌ (Phosphorus), ক্যাল্‌সিয়াম্‌ (Calcium), পটাসিয়াম্‌ (Potassium), ম্যাগ্‌নেসিয়াম্‌ (Magnesium) ও লৌহ (Iron)। মোট ঐ দশটি অমিশ্র (simple) মূল পদার্থ, যথা—হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen), কার্ব্বন বা অঙ্গার (Carbon), নাইট্রোজেন (Nitrogen), গন্ধক (Sulphur), ফস্ফরাস (Phosphorus), ক্যাল্‌সিয়াম্‌ (Calcium), পটাসিয়াম্‌ (Potassium), ম্যাগ-নেসিয়াম (Magnesium) ও লৌহ (Iron)—উদ্ভিদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদার্থের অভাব হইলেই গাছের অপকার হয়—এমন কি গাছ মরিয়াও যাইতে পারে। এই সকল পদার্থ ছাড়া অন্যান্য পদার্থও উদ্ভিদ্‌-শরীরে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেগুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা মাটিতে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া জলের সহিত গাছের মধ্যে প্রবেশ করে। তবে তাহাদের মধ্যে দুই একটি কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে সময়ে সময়ে উপকারে আসে বটে, কিন্তু সাধারণ উদ্ভিদ্‌-জীবনের পক্ষে তাহারা অত্যাবশ্যকীয় নয়। উপরোক্ত সমস্ত পদার্থই উদ্ভিদ্‌-খাদ্যের কাঁচা মাল। এই কাঁচা মাল অঙ্গবিশেষে—প্রধানতঃ

পাতায়—বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া (পাক্ হইয়া বা রন্ধন হইয়া) আসল খাদ্যে পরিণত হয়।

উদ্ভিদ্ জাতির খাদ্যের মূলপদার্থের উৎপত্তি-স্থান

উদ্ভিদ্-জাতির খাদ্যের মূলপদার্থ সকল বাতাস ও মাটি হইতে আসে। যে সকল পদার্থ মাটিতে থাকে, তাহারা শিকড় দ্বারা সংগৃহীত হয়। শিকড় মাটি হইতে জলরূপে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এবং জলে গলিত লবণরূপে নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফস্ফরাস, ক্যালসিয়াম্, পটাসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্ ও লৌহ, মূল-কেশ দ্বারা শোষণ করিয়া গাছের পাতায় প্রেরণ করে।

বায়ু হইতে গাছ সবুজ অংশ দ্বারা—প্রধানতঃ পাতা দ্বারা অঙ্গারক বাষ্প (কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড্) শোষণ করে; এবং মাটি ও বায়ু হইতে সংগৃহীত উক্ত দশটি মূলপদার্থ পাতার মধ্যে একত্রিত হয়। তাহার পর পাতার মধ্যস্থিত পত্রহরিৎ—পাতায় পতিত সূর্য্যরশ্মি হইতে তাপ শোষণ করিয়া তাহার সাহায্যে—অঙ্গারক বাষ্পকে অঙ্গার ও অক্সিজেনে বিভক্ত করিয়া অঙ্গারটি রাখিয়া অক্সিজেনটিকে পত্রছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া দেয়; এবং অঙ্গার ও বাকি নয়টি পদার্থ—এই মোট দশটি পদার্থ পরস্পর রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত বা সম্মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় ও তখন তাহা গাছের ব্যবহারোপযোগী খাদ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কাঁচা মাল পাতায় আসিলে খাদ্যে পরিণত হইয়া প্রয়োজনমত গাছের নানা অংশে সরবরাহ হয়। গাছ তাহার দরকারমত খাদ্য ব্যবহার করে ও উদ্বৃত্ত খাদ্য—পাতা, কাণ্ড, শিকড় এবং বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখে। গাছের খাদ্য মোটামুটি এইরূপে প্রস্তুত হয়।

কি উপায়ে গাছ বায়ু ও মাটি হইতে খাদ্যের মূলপদার্থ (কাঁচা মাল) শোষণ করে ও পাতায় পাঠায়, তাহা বিশদ ভাবে বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই সকল বস্তুর মূলাধার—বায়ুমণ্ডল ও মাটি—সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

বায়ুমণ্ডল (atmosphere)

বাতাসের কোন আকৃতি নাই। আমরা ইহাকে চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু অনুভবে ইহার অস্তিত্ব টের পাই। আমরা যখন নড়াচড়া করি বা যখন বাতাস প্রবাহিত হয় বা ঝড় উঠে, তখনই আমরা তাহাকে টের পাই। পৃথিবীর যেখানে যত ফাঁকা বস্তু আছে, সমস্তই বাতাসে পূর্ণ। আমরা যাহাকে শূন্য বা খালি বলি, বাস্তবিক তাহারা শূন্য বা খালি নহে—বাতাসে পূর্ণ থাকে। এমন কি, মাটির ভিতরেও বাতাস আছে। মাটির ভিতর বাতাস কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করা শক্ত। মাটির কথা যখন আলোচনা করিব, তখন ইহা জানা যাইবে। বাতাস সঙ্কোচ-প্রসারশীল; অর্থাৎ চাপ দিলে ইহার সঙ্কোচ হয় বা আয়তন কমে এবং চাপ সরাইলে আবার ইহার প্রসার হয়—অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। উত্তপ্ত হইলেও ইহার আয়তন বাড়ে এবং ঠাণ্ডা

হইলে আয়তন কমে। ইহার গুরুত্ব বা ওজন আছে; এবং ইহার একটা চাপ বা ভারও বর্ত্তমান। বাতাসে $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন, $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন, দশ হাজার ভাগ বাতাসে তিন ভাগ অঙ্গারক বাষ্প (কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড্) আছে। ইহা ছাড়া অল্প পরিমাণে এ্যামোনিয়া গ্যাসও বিদ্যমান।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদ্ তাহার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটি হইতে গ্রহণ করে। বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ্ তাহা বাতাস হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। মাটি হইতে নাইট্রোজেন কি অবস্থায় গ্রহণ করে—তাহা পরে বলিতেছি।

বায়ুমণ্ডলের কথা কিছু বলিলাম; অতঃপর মাটির কথা বলিব।*

(ক্রমশঃ)

বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিভিন্ন দ্রষ্টার দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ

অতঃপর আমরা আরও সাধারণ রকমের দুইটা ঘটনার মধ্যে রাম শ্যামের দেশ-বুদ্ধি ও কাল-বুদ্ধির অনৈক্য নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইব। প্রথমে আমরা যে ঘটনা দুইটির উল্লেখ করিয়াছি, (অর্থাৎ লাল আলো ও নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠা) উহারা উভয় দ্রষ্টার পক্ষে দূরে-দূরের ঘটনা হইলেও শ্যামের মতে উহারা সমসাময়িক; এবং শ্যামের এই সমসাময়িকতার ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই এক জগতের দেশের মাপ (ফুট রুল) অপর জগতের দৃষ্টিতে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা আমরা দেখিয়াছি (অর্থাৎ শ্যামের ট্রেণের 'ক' প্রান্তের সহিত রামের প্লাট-ফরমের দুই প্রান্তের মিলন) উহারা উভয় দ্রষ্টার মতে আগে পরের ঘটনা হইলেও শ্যামের মতে উহারা একই স্থলের ঘটনা; এবং শ্যামের এই 'একই স্থানের' ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই এক জগতের কালের মাপ (ঘণ্টা বা সেকেণ্ড) অপর জগতের দৃষ্টিতে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন আমরা আরও সাধারণ ধরণের—অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধান বা কালের ব্যবধান কোনটাই, কাহারও মতে, শূন্য পরিমিত নহে এইরূপ—একজোড়া ঘটনার উল্লেখ করিব; এবং উহাদের মধ্যে ঐ দুই ব্যবধান সম্পর্কে

* এই বিষয়ের সমালোচনা বা যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা জানাইলে সাদরে গৃহীত হইবে—লেখক।

দুই জগতের পরিমাপফলের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা দেখিব। ইহার জন্যও পূর্ব্বোক্ত ট্রেণ ও প্লাটফরমের সাহায্য গ্রহণ করিলেই চলিবে।

শ্যামের ট্রেণের লাল কাঠিটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইবে। উহার জ্বলিয়া ওঠা ও নিবিয়া যাওয়া শ্যামের মতে, একই স্থলের ঘটনা—যদিও রামের মতে উহারা দূরে-দূরের ঘটনা, কেননা রাম ঐ কাঠিটাকে 'ব' বেগে ছুটিয়া যাইতে দেখিতেছে। কিন্তু নীল আলোর জ্বলিয়া ওঠা ও লাল আলোর নিবিয়া যাওয়া—উভয়ের মতেই দূরে-দূরের ঘটনা এবং উভয়ের মতে আগে-পরের ঘটনাও বটে। এই দুই বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান রামের মাপে যাহা দাঁড়ায়, তাহাকে আমরা যথাক্রমে 'ত' ও 'স' দ্বারা এবং শ্যামের মাপে যাহা দাঁড়ায় তাহাকে 'তা' ও 'সা' দ্বারা নির্দ্দেশ করিব; এবং 'ত' ও 'স' প্রত্যেকের সহিত 'তা' ও 'সা'-এর সম্বন্ধ নিরূপণ করিব।

এখন, শ্যামের বাস্তব জগতে, আলো দু'টা জ্বলিয়া উঠিয়াছে একই সময়ে, সুতরাং শ্যাম বলিবে যে, লাল আলোটা যতক্ষণ ধরিয়া জ্বলিয়াছে, নীল আলো জ্বলিয়া ওঠার ঠিক ততক্ষণ পরেই উহা নিবিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ শ্যামের মতে লাল আলোর জীবন কাল = সা।

শ্যাম আরও বলিবে যে, ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধান বা 'তা' ট্রেনের দৈর্ঘ্য বা 'ট' এর সমান, কেননা উহারা ট্রেনের উভয় প্রান্তে ঘটিয়াছে; ফলে

$$তা = ট \cdots (৬)$$

তারপর রামের মত। আলোচ্য ঘটনা দু'টার মধ্যে কালের ব্যবধানটা রামের মাপে 'স' পরিমিত হইয়াছে; সুতরাং রাম বলিবে,

স = আলো দু'টা জ্বলিয়া ওঠার মধ্যে কালের ব্যবধান + লাল আলোর জীবন কাল;

কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, রামের মতে অলো দু'টা জ্বলিয়া উঠিয়াছে 'য' সেকেণ্ড আগে পরে এবং ১ নং সমীকরণ অনুসারে

$$য = \frac{ট}{ঐ} \times \frac{ব}{ভ^২ - ব^২}$$

$$= \frac{তা}{ঐ} \times \frac{ব}{ভ^২ - ব^২}$$

কারণ, ৬নং সমীকরণ অনুসারে 'তা' ও 'ট' শ্যামের একই পরিমাপের ফল নির্দ্দেশ করে। আর, লাল আলোর জীবনকালটা শ্যামের মাপে যাহা ('সা' পরিমিত) হইয়াছে, রামের মাপে তাহার 'ঐ' গুণ হইতে হইবে, কারণ ঐ আলোর প্রজ্বলন ও নির্ব্বাণ শ্যামের জগতের একই স্থলের ঘটনা; অর্থাৎ

রামের মতে লাল আলোর জীবন কাল = ঐ × সা

ফলে দাঁড়ায়

$$স = \frac{তা}{ঐ} \times \frac{ব}{ভ^২ - ব^২} + ঐ \times সা$$

$$=\frac{\text{তা}}{\text{ঐ}}\times\frac{\text{ভ}^2}{\text{ভ}^2-\text{ব}^2}+\frac{\text{ব}}{\text{ভ}^2}+\text{ঐ}\times\text{সা}$$

$$=\frac{\text{তা}}{\text{ঐ}}\times\text{ঐ}^2+\frac{\text{ব}}{\text{ভ}^2}+\text{ঐ}\times\text{সা}\quad\left[\text{কারণ ঐ}^2=\frac{\text{ভ}^2}{\text{ভ}^2-\text{ব}^2}\ \text{(৪নং সমীকরণ)}\right]$$

$$=\text{ঐ}\left(\text{সা}+\frac{\text{ব}}{\text{ভ}^2}\times\text{তা}\right)\text{..................(ক)}$$

সুতরাং আলোচ্য ঘটনা দু'টার মধ্যে রামের মাপের কালের ব্যবধান বা 'স' এর সহিত শ্যামের মাপের দেশ ও কালের ('তা' ও 'সা' এর) সম্বন্ধ নির্ণীত হইল। অতঃপর ঘটনা দু'টা সম্পর্কে রামের মাপের দেশের ব্যবধান বা 'ত'-এর সহিত শ্যামের মাপের 'তা' ও 'সা'-এর সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। এখন রামের মতে, আলোচ্য ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধান অর্থাৎ

ত = প্লাটফরমের দৈর্ঘ্য + নিবিতে নিবিতে লালকাঠিটা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

প্লাটফরমের দৈর্ঘ্য, শ্যামের মতে, ট্রেনের সমান ('ট' বা 'তা' পরিমিত) সুতরাং রামের মাপে উহা তাহার 'ঐ' গুণ অর্থাৎ (ঐ × তা) পরিমিত হইবে; আর রাম দেখিবে যে, নিবিতে নিবিতে অর্থাৎ (ঐ × সা) সময়ের মধ্যে লাল কাঠিটা ব × (ঐ × সা) পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়াছে; ফলে দাঁড়ায়

$$\text{ত}=\text{ঐ}\times\text{তা}+\text{ব}\,(\text{ঐ}\times\text{সা})$$

$$=\text{ঐ}\,(\text{তা}+\text{ব}\times\text{সা})\text{.........(খ)}$$

সুতরাং আলোচ্য ঘটনা দু'টার মধ্যে রামের মাপের দেশের ব্যবধানের সহিত শ্যামের মাপের দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্ণীত হইল।

এযাবৎ আমরা যে সকল ঘটনার আলোচনা করিয়াছি উহারা সকলেই উত্তর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ট্রেন ও প্লাটফরমের আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। সাধারণ ক্ষেত্রে এ'রূপ অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। ঘটনা জোড়ার সংযোগ রেখাটা আপেক্ষিক বেগের দিক সম্পর্কে হেলাভাবে অবস্থান করিলেও উক্ত 'ক' ও 'খ' সম্বন্ধ দু'টা খাটিবে। তবে, এ'রূপ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বেগের দিকটাকে উভয় দ্রষ্টার পক্ষে সম্মুখের দিকরূপে এবং উহার সহিত সমকোণভাবে অবস্থিত অপর দিক দু'টাকে ডাহিন দিক ও ঊর্দ্ধদিক রূপে গ্রহণ করিয়া ঘটনা জোড়ার অন্তর্গত দূরত্বটাকে এই তিন দিক বরাবর বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হইবে; এবং এই পাদত্রয় রামের দেশের পক্ষে যথাক্রমে 'ত' 'থ' ও 'দ' পরিমিত এবং শ্যামের দেশের পক্ষে যথাক্রমে 'তা' 'থা, ও 'দা' পরিমিত দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত সূত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষেত্রে, 'ক' ও 'খ' সমীকরণের 'ত' ও 'তা' রাশি দু'টাকে ঘটনা জোড়ার অন্তর্গত পুরাপুরি দূরত্ব রূপে গ্রহণ না করিয়া উহার সম্মুখের পাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সমগ্র দূরত্বটা নির্দ্দেশ করিবার জন্য

উহার বাকি পাদ দু'টাকেও হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আড়ভাবে অবস্থিত দৈর্ঘ্যের উপরে আপেক্ষিক বেগের প্রভাব নাই ; সুতরাং রামের মাপের 'ত' ও 'থ' পাদদ্বয়কে শ্যামের মাপের 'থা' ও 'দা' পাদদ্বয়ের সমান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে দুই জগতের দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে আমরা নিম্নোক্ত সাধারণ সূত্রটা পাইতেছি।

$$\left.\begin{array}{l} স = ঐ\left(সা + \dfrac{ব}{ভ^{২}} \times তা\right) \\ ত = ঐ\,(তা + ব \times সা) \\ থ = থা \\ দ = দা \\ \text{যেখানে } ঐ = \dfrac{১}{\sqrt{১ - \left(\dfrac{ব}{ভ}\right)^{২}}} \end{array}\right\} \cdots\cdots\cdots (৭)$$

অধিকাংশ স্থলেই আমরা ঘটনা দু'টা 'ব' দিক বরাবর ঘটিতেছে বলিয়া অনুমান করিব ; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে 'ত' ও 'তা' রাশি দু'টাই ঘটনা দু'টার অন্তর্গত পুরাপুরি দূরত্ব নির্দ্দেশ করিবে এবং ৭ নং সূত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ সমীকরণের প্রত্যেক পাদশূন্য পরিমিত হইয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই সূত্র হইতে দেখা যায় যে, রামের মাপের দেশ এবং কাল ('ত' ও 'স') প্রত্যেকেই শ্যামের মাপের দেশ এবং কাল ('তা' ও 'সা') উভয়ের সহিতই এক একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। শ্যামের মাপের 'তা' অথবা 'সা'-এর সহিত রামের মাপের 'ত' এবং 'স'-এর সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহাও উক্ত সূত্রই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। ৭নং সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সমীকরণকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্য হইতে সহজেই 'তা' অথবা 'সা' রাশিটাকে তুলিয়া দিতে পারা যায়। 'তা' টাকে তুলিয়া দিলে 'সা' এর সঙ্গে এবং 'সা' টাকে তুলিয়া দিলে 'তা'-এর সঙ্গে 'ত' ও 'স'-এর সম্বন্ধে পাওয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে যে

$$\left.\begin{array}{l} সা = ঐ\left(স - \dfrac{ব}{ভ^{২}} \times ত\right) \\ তা = ঐ\,(ত - ব \times স) \end{array}\right\} \cdots\cdots\cdots\cdots (৮)$$

৭ ও ৮ নং সূত্রের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, রামের 'স' অথবা 'ত'-এর সহিত শ্যামের 'সা' এবং 'তা'-এর যে সম্বন্ধ, শ্যামের 'সা' অথবা 'ত'-এর সহিত রামের 'স' এবং 'ত'-এরও অবিকল সেই সম্বন্ধ ; অর্থাৎ ৭ নং সূত্রের 'স' ও 'ত' স্থানে 'সা' ও 'তা' এবং 'স' ও 'তা' স্থানে 'স' ও 'ত' বসাইলে ৮ নং সূত্রটা আপনি আসিয়া পড়ে—কেবল 'ব'-এর যোগ চিহ্নটাকে বিয়োগ চিহ্নে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার আবশ্যক হয়। সহজেই দেখা যে, দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় আপেক্ষিক বেগের জন্যই যখন দেশ ও কালের পরিমাপের ফলটা উহাদের পক্ষে ভিন্ন

ভিন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ বেগটাকে রাম যে দিকে দেখিতে পায়, শ্যাম দেখে তাহার উল্টা দিকে, তখন রাম তাহার দেশ বা কালের সহিত শ্যামের দেশ ও কালের যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, শ্যামও তাহার দেশ বা কালের সহিত রামের দেশ ও কালের অবিকল সেই সম্বন্ধই স্থাপন করিবে—কেবল ঐ সম্বন্ধের মধ্যে 'ব'-এর চিহ্নটাকে বদলাইয়া লইবে।

পরস্পর সম্বন্ধ ৭ ও ৮ নং সূত্র দু'টাকে একই সূত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক জগতের দেশ বা কালকে অপর জগতের দেশ ও কালে রূপান্তরিত করিবার পক্ষে ইহাই সূত্র। লোরেঞ্জই প্রথমে তাড়িত-চৌম্বক ব্যাপারের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সূত্রটার আবিষ্কার করেন, এজন্য ইহা লোরেঞ্জ-রূপান্তর-সূত্র নামে পরিচিত; কিন্তু দেশ এবং কালের নিরপেক্ষ সত্তার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আইনষ্টাইনই প্রথমে ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সাধারণ ধরণের ঘটনা হইতেও কিরূপে এই সূত্রটাকে পাওয়া যাইতে পারে তাহা প্রদর্শন করেন। বলা বাহুল্য, উক্ত সূত্রে 'স' ও 'সা' রাশি দু'টা ঘটনা দু'টার অন্তর্গত বাস্তব কালের ব্যবধান নির্দেশ করে। এই কাল প্রত্যক্ষের কাল হইতে ভিন্ন এবং ইহার উল্লেখ করিয়াই, ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টা পরস্পরের সহিত কারবার করিয়া থাকে।

আরও দেখা যাইবে যে, রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ যদি আলোকের বেগের তুলনায় নগণ্য হয়, তবে $\frac{ব}{ভ}$ অনুপাতটা প্রায় শূন্য পরিমিত এবং 'ঐ' সংখ্যাটা প্রায় ১ পরিমিত হইয়া ৭ বা ৮ নং সূত্রটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে

$$\left.\begin{array}{l} স = সা \\ ত = তা + ব \times স \\ থ = থা \\ দ = দা \end{array}\right\} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (৯)$$

সহজেই দেখা যায়, এই সূত্রটা উক্ত (নীল আলো জ্বলিয়া ওঠা ও লাল আলো নিবিয়া যাওয়া রূপ) ঘটনা দু'টা সম্পর্কে পুরাতন যুগের মতে, উভয় দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দেশ করে। এই সূত্রটাকে গ্যালিলিও-রূপান্তর-সূত্র বলা যায়। ইহা লোরেঞ্জ-সূত্রেরই বিশেষ আকার মাত্র এবং ইহাকে সাধারণ সূত্ররূপে গ্রহণ করা চলে না। ছোটখাট বেগের পক্ষে গ্যালিলিও-সূত্রকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে; কিন্তু এই সূত্রটা যে কোনও বেগ সম্পন্ন যে কোনও জগতের পক্ষে খাটিতেছে, পুরাতন যুগের এই অনুমানটাকে ভিত্তিহীন বিবেচনা করিয়া লোরেঞ্জ-সূত্রটাকেই যে কোনও বেগসম্পন্ন বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞাপক সাধারণ সূত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

উক্ত লোরেঞ্জ-সূত্র হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সহজেই প্রতীয়মান হইবেঃ—

(১) ৭ নং সূত্র হইতে দেখা যাইবে যে, যে দুই ঘটনার মধ্যে শ্যাম কেবল দেশের ব্যবধান ('তা' সসীম, 'সা' = ০ পরিমিত) অথবা কেবল কালের ব্যবধান ('সা' সসীম, 'তা' = ০

পরিমিত) দেখিতে পায়, রামের মতে উহাদের মধ্যে দেশ ও কাল ('ত' ও 'স') উভয় জাতীয় ব্যবধানই সসীম হইয়া থাকে। সেইরূপ, ৮ নং সূত্র হইতে সহজেই দেখা যাইবে যে, রামের মতে যে দুই ঘটনার মধ্যে কেবল দেশের ব্যবধান অথবা কেবল কালের ব্যবধান বিদ্যমান শ্যাম তাহাদের মধ্যে উভয় জাতীয় ব্যবধানই দেখিতে পায়। অর্থাৎ যে দুই ঘটনাকে এক-জন দ্রষ্টা কেবল দেশের কোঠায় অথবা কেবল কালপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহে অপর দ্রষ্টা তাহাদিগকে দেশ এবং কাল উভয়ত্রই বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। বুঝিতে হইবে দ্রষ্টা বিশেষের দেশ অথবা কাল অপর দ্রষ্টার পক্ষে কতকটা দেশরূপে, কতকটা কালরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে।

(২) যে দুই ঘটনার মধ্যে একজন দ্রষ্টার মতে দেশের ব্যবধান এবং কালের ব্যবধান উভয়ই শূন্য পরিমিত, অপর দ্রষ্টার মতেও এই উভয় ব্যবধান শূন্য পরিমিত হইয়া থাকে। কারণ ৭ নং সূত্র হইতে দেখা যাইবে তা=০ এবং সা=০ হইলে 'ত' ও 'স' প্রত্যেকেই শূন্য পরিমিত হয় ; এবং ৮নং সূত্র হইতে ইহার উল্টা সম্বন্ধটাও সহজেই দেখা যায়। বুঝিতে হইবে, যে দুই ঘটনাকে একজন দ্রষ্টা 'একটা' ঘটনারূপে অনুভব করিতে চাহে, অপর দ্রষ্টা উহাদিগকে 'একটা' ঘটনা করিয়া লইয়া ঘটনার সংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরে একমত হইতে চাহে।

উপরের সিদ্ধান্ত দু'টাকে একত্র করিয়া দেখিলে বলিতে পারা যায়, প্রকৃতি দেবীর অভিপ্রায়ই যেন এইরূপ যে, দেশ ও কালের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ঘটনা হইতে ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে এবং বিচ্ছিন্ন করিয়াও ঘটনাসমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে একমত হইতে হইবে ; কিন্তু এই বিশ্লেষণ ব্যাপারটা দেশের পথ ধরিয়া করিতে হইবে কি কালের পথ ধরিয়া করিতে হইবে অথবা কতকটা দেশের পথ এবং কতকটা কালের পথ ধরিয়া করিতে হইবে, এ বিষয়ে যেন দ্রষ্টার কতকটা স্বাধীনতা রহিয়াছে। ফলে, দ্রষ্টার দ্রষ্টাত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং দেশ ও কাল স্বাধীনতা হারাইয়া দ্রষ্টাও ঘটনার অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ বা 'ব' যদি শূন্য পরিমিত অর্থাৎ 'ব্রে'=১ পরিমিত হয় তবে ৭ বা ৮ নং সূত্রে 'স' ও 'ত' যথাক্রমে 'সা' ও 'তা'-এর সমান হইয়া দেশ বা কাল সম্পর্কে উভয় দ্রষ্টার মতভেদ দূর হইয়া যায়। বুঝিতে হইবে যে, সকল দ্রষ্টা পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেশবুদ্ধি বা কালবুদ্ধি অবিকল একরূপ ; অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, একটা বিশিষ্ট জগতের সকল দ্রষ্টার পক্ষেই ঘটনায় ঘটনায় দেশের ব্যবধান কিম্বা কালের ব্যবধান সমান সমান হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়মের বর্ণনা মাত্রেই দেশ ও কালের প্রসঙ্গ তুলিবার আবশ্যক হয়। পুরাতন যুগের বিশ্বাস ছিল যে, এই বর্ণনায় সকল দ্রষ্টাই—উহারা পরস্পর সম্পর্কে স্থির হউক বা বেগ সম্পন্ন হউক—একই আকারের দেশ ও একই আকারের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে। আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে দেশও ভিন্ন

ভিন্ন, কালও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের দেশ বা কাল অপরের দেশ ও কালের সহিত লোরেঞ্জ সূত্র দ্বারা সম্বদ্ধ। এইরূপে সম্বদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক দ্রষ্টা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া থাকে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নিজের মাপের দেশ ও কালের মধ্যে সম্বদ্ধ স্থাপন দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে এক-একটা মূর্ত্তি দান করিয়া থাকে। এইরূপে যে নিয়মটা সকল দ্রষ্টার কাছে একই আকারে উপস্থিত হয় উহাকেই একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সংখ্যার নিরপেক্ষতা অথবা আলোকের বেগের দ্রষ্টানিরপেক্ষতা এইরূপ এক-একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম। যে সকল নিয়ম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না—অর্থাৎ লোরেঞ্জ-সূত্র দ্বারা সম্বদ্ধ বিভিন্ন দ্রষ্টার দেশ ও কালের মাপকাঠিতে একই মূর্ত্তি ধারণ করিতে সক্ষম হয় না—বুঝিতে হইবে, উহারা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। আরও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় আপেক্ষিক বেগ নগণ্য বলিয়াই কতকগুলি আপাত খাঁটি নিয়ম এ যাবৎ প্রাকৃতিক নিয়মের মর্য্যাদালাভে সক্ষম হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উহাদের সংশোধনের প্রয়োজন; কেননা আপেক্ষিক বেগটা বড় হইয়া দাঁড়াইলেই উহারা আর খাটে না বলিয়া ধরা পড়িবে। নিয়মটা খাঁটি নিয়ম কিনা, ইহা নির্ণয়ের জন্য উহার অন্তর্গত দেশ ও কালের লোরেঞ্জ-সূত্রানুবর্ত্তিতাকেই লক্ষণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। এই লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জড়ের জড়ত্ব অথবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম নহে—বর্ত্তমান আকারে উহাদিগকে সার্ব্বভৌমিক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। উহাদের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দ্রষ্টানিরপেক্ষ আকার দান করিতে হইলে উহাদিগকে সংশোধন করিয়া লইবার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

আমরা দেখিলাম, আপেক্ষিকতাবাদের বিচারে, স্থিতি ও গতির এবং দেশ ও কালের মাত্র আপেক্ষিক সত্তা রহিয়াছে। কিন্তু পদার্থ মাত্রেরই আপেক্ষিকতা প্রতিপাদন উক্ত মতবাদের উদ্দেশ্য নহে; কোন্‌টা আপেক্ষিক কোন্‌টা দ্রষ্টানিরপেক্ষ তাহা বাছাই করিয়া লইয়া খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসন্ধান করা এবং আপাত খাঁটি প্রচলিত নিয়মগুলির সংশোধন করিয়া উহাদিগকে সার্ব্বভৌমিকতা দান করা—ইহাই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

লোরেঞ্জ-সূত্র প্রয়োগের উদাহরণ

পূর্ব্বের অধ্যায়ের লোরেঞ্জ-সূত্রটাকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের কেন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমরা প্রশ্নোত্তর আকারে এই সূত্রটার প্রয়োগ প্রণালী প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব; এবং এইরূপে দেখিব যে, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সকল কথাই ইহার অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে।

প্রশ্ন।—রাম ও শ্যামের জগৎ পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া রহিয়াছে। উহারা যদি

আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন হয় এবং ঐ বেগটা (ব) বাড়িতে বাড়িতে শেষটা আলোকের বেগের (ভ-এর) সমান হইয়া দাঁড়ায় তবে 'ঐ'-এর মূল্য কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে?

উত্তর।—'ব' বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ $\frac{ব}{ভ}$ অনুপাতটা বাড়িয়া যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ' সংখ্যাটা (৭ নং লোরেঞ্জ-সূত্রের অন্তর্গত 'ঐ'-এর মূল্য অনুসারে) নিম্নোক্তরূপে বাড়িয়া যাওয়া :—

ব সেকেণ্ডে যত মাইল	০	১,৮৬০	১৮,৬০০	৯৩,০০০	১১১,৬০০	১৪৮,৮০০	১৬৭,৪০০	১৮৪,১৪০	১৮৬,০০০
ব/ভ	০	$\frac{১}{১০০}$	$\frac{১}{১০}$	$\frac{১}{২}$	$\frac{৩}{৫}$	$\frac{৪}{৫}$	$\frac{৯}{১০}$	$\frac{৯৯}{১০০}$	১
ঐ	০	১·০০০০৫	১·০৫	১·১৫	১·২৫ বা $\frac{৫}{৪}$	১·৬৬ বা $\frac{৫}{৩}$	২·৩	১৪·১	অসীম

'ভ' রাশিটাকে (শূন্যদেশে আলোকের বেগটাকে) আমরা বরাবর সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ রূপে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। স্থূল হিসাবের জন্য উহার উক্ত মূল্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার প্রকৃত মূল্য সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। উপরের হিসাবে আমরা 'ভ'-এর এই মূল্যটাই গ্রহণ করিয়াছি। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সাধারণ রকমের আপেক্ষিক বেগের পক্ষে 'ঐ' প্রায় ১ পরিমিতই রহিয়া যায়। এমন কি আপেক্ষিক বেগটা যদি সেকেণ্ডে ১,৮৬০ মাইলও হয় তথাপি 'ঐ' = ১ পরিমিতই রহিয়াছে এইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। আরও দেখা যাইবে যে, ঐ বেগটা যখন আলোকের বেগের খুব কাছাকাছি হইতে থাকে তখনই কেবল 'ঐ'-এর দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া শেষটা উহা অসীম হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা দেখিয়াছি, দুই জগতের দেশের অথবা কালের মাপকাঠির মধ্যে সম্বন্ধটা কেবল 'ঐ'-এর মূল্যের উপরে নির্ভর করে; ভিন্ন জগতের দ্রষ্টার মাপে দেশের মাপকাঠি 'ঐ' গুণ ছোট এবং কালের মাপকাঠি 'ঐ' গুণ বড় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং উপরের 'টেব্‌ল' (table) হইতে দেখা যায় যে, সাধারণ ধরণের আপেক্ষিক বেগের পক্ষে, মাপকাঠি সম্বন্ধে মতের পার্থক্যটা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই এবং উহা সম্ভব হয় যখন উভয় দ্রষ্টার আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের ঠিক কাছাকাছি না হউক, উহার আধাআধি, অথবা অন্ততঃ দশভাগের-ভাগ পরিমিত হয়। কিন্তু আলোকের বেগের দশমাংশটাও সেকেণ্ডে ১৮,৬০০ মাইল পরিমিত বেগ!

প্রশ্ন। উভয় জগতের আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের তুলনায় নগণ্য হইলে 'ঐ'-এর মূল্য মোটামুটি কত হইবে?

উত্তর। $ঐ = \frac{১}{\sqrt{১ - \frac{ব^২}{ভ^২}}} = \left(১ - \frac{ব^২}{ভ^২}\right)^{-\frac{১}{২}}$

ব' যদি 'ভ'-এর তুলনায় নগণ্য হয় তবে $\left(\frac{ব^২}{ভ^২}\right)$ রাশিটা ১ এর তুলনায় আরও নগণ্য হইবে; এরূপ স্থলে উপরের সমীকরণের ডাহিন দিককার রাশিটা প্রায় $\left(১ + \frac{১}{২}\frac{ব^২}{ভ^২}\right)$ পরিমিত হয়; সুতরাং ঐরূপ সকল ক্ষেত্রেই

$ঐ = ১ + \frac{১}{২}\frac{ব^২}{ভ^২}$ ....(১০)

এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্ন। শ্যামের মতে একজোড়া ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান = ০ এবং কালের ব্যবধান = ০; রামের মতে ঐ ব্যবধান দু'টা কি কি পরিমাণের হইবে?

উত্তর। শ্যামের মতে দেশের ব্যবধান শূন্য হওয়ার অর্থ, তা = ০ এবং কালের ব্যবধান শূন্য হওয়ার অর্থ, সা = ০ হওয়া; সুতরাং ৭ নং সূত্র অনুসারে

$$স = ঐ\left(০ + \frac{ব}{ভ^২} \times ০\right) = ঐ \times ০$$
$$ত = ঐ\ (০ + ব \times ০) = ঐ \times ০$$

অর্থাৎ রামের মতেও ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধান (ত) এবং কালের ব্যবধান (স), প্রত্যেকটাই, শূন্য পরিমিত হইবে। পূর্ব্বেই আমরা এ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে, ইহা লোরেঞ্জ-সূত্র হইতে প্রাপ্ত একটা নূতন কথা নহে; ইহা একটা চির পুরাতন সত্য এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়াই লোরেঞ্জ-সূত্রটা দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে লোরেঞ্জ সূত্রের এই ইঙ্গিতটা দেখা যাইতে পারে যে, সাধারণ ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তটা সত্য হইলেও, রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগটা যদি আলোকের বেগের সমান হয় অথবা উহাকে ছাড়াইয়া যায় তবে ঐরূপ সিদ্ধান্ত খাটিবে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। কারণ পূর্ব্বোক্ত 'টেব্‌ল' হইতে দেখা যায় যে, 'ব' = 'ভ' হইলে 'ঐ' = অসীম হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে উপরের সমীকরণের 'স' ও 'ত' প্রত্যেকেই একটা অনির্দ্দেশ্য রাশি (indeterminate quantity) হয়; এবং 'ব' 'ভ' অপেক্ষা বড় হইলে 'ঐ' একটা কাল্পনিক সংখ্যা হয় সুতরাং 'স' ও 'ত' রাশি দুটা অনির্দ্দেশ্য অবস্থারও ওপারে যাইয়া উপস্থিত হয়।

ইহার অর্থ এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাহির হইতে একটা লালরশ্মি ও একটা নীল রশ্মি শ্যামের চক্ষুতে আঘাত করিল। শ্যামের মতে আঘাত দু'টা যদি তাহার চক্ষুর ঠিক একই স্থলে এবং ঠিক একই সময়ে ঘটে তবে শ্যামের প্রত্যক্ষে হয়ত উহারা 'একটা' ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে; অর্থাৎ শ্যাম হয়ত আলো দু'টাকে পৃথক করিয়া না দেখিয়া উহাদের মিলিত সত্তা না-লাল, না-নীল গোছের একটা আলো দেখিতে পাইবে; এবং এইরূপ হইলে শ্যাম ঐ ঘটনা

দু'টাকে একটা ঘটনারূপে বর্ণনা করিবে। এ'রূপ অবস্থায়, সাধারণ ক্ষেত্রে, রামও ঐ আঘাত দু'টাকে একটা বলিয়াই বর্ণনা করিবে ; কিন্তু রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ যদি 'ভ'-এর সমান অথবা উহা অপেক্ষা বৃহত্তর হয় তবে—'স' ও 'ত' অনির্দ্দেশ্য অথবা ঐ অবস্থারও অতীত হইবার ফলে—রাম ঐ ঘটনা দু'টাকে একটা বলিবে, না, দশটা বলিবে, তাহার একটা কোন নিশ্চয়তা থাকিবে না। ফলে এরূপ ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনার সংখ্যা সম্বন্ধেও উভয় দ্রষ্টার পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে একটা ওলট পালটের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। আরও দেখা যাইবে যে, এ'রূপ অবস্থায় স = ০ হইয়াও ত = ০ নাও হইতে পারে ; অর্থাৎ রামের কাছে শ্যামের ঐ আঘাত দু'টা একই সময়ে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঘটিতেছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে এবং রামের পক্ষে এ'রূপ সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব হইতে পারে যে, তাহার দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে শ্যামের চক্ষু একই সময়ে বর্ত্তমান ! সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন অবস্থাতেই 'ব' 'ভ'কে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, এবং এমন কি, ঠিক উহার সমান হইয়াও দাঁড়াইতে পারে না।

প্রশ্ন। শ্যাম দু'টা ঘটনাকে একই স্থলে কিন্তু ১ সেকেণ্ড আগে-পরে ঘটিতে দেখিল। রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ যদি আলোকের বেগের অংশ হয় তবে রামের মতে ঐ ঘটনা দুটার মধ্যে কালের ব্যবধান ও দেশের ব্যবধান কত হইবে ?

উত্তর। এখানে তা = ০ ; সা = ১ সেকেণ্ড ; এবং $\frac{ব}{ভ} = \frac{৪}{৫}$ হওয়ার অর্থ পূর্ব্বোক্ত টেব্‌ল অনুসারে, ঐ = $\frac{৫}{৩}$ পরিমিত হওয়া। অতএব ৭ নং সূত্র অনুসারে

$$স = \frac{৫}{৩}\left(১ \text{ সেকেণ্ড} + \frac{ব}{ভ^২} \times ০ \right)$$

$$= \frac{৫}{৩} \text{ সেকেণ্ড বা } ১\cdot৬৬ \text{ সেকেণ্ড}$$

$$\text{এবং } ত = \frac{৫}{৩}\left(০ + \frac{৪}{৫}ভ \times ১ \text{ সেকেণ্ড} \right)$$

$$= \frac{৪}{৩} \text{ লক্ষ ক্রোশ [ভ = সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ ধরিলে]}$$

$$= ২৬৬,৬৬৬ \text{ মাইল}$$

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, শ্যাম যে দুই ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া কেবল কালের ব্যবধান বজায় রাখিতে চাহে রাম তাহাদের কালের ব্যবধানটাকে কিছু বড় করিয়া তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবধানটাকে—কমাইবার পরিবর্ত্তে—একটা অতিরিক্ত মাত্রাতেই বাড়াইয়া তোলে। ঠিক এইরূপে, ভিন্ন একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাইতে পারে যে, যে ঘটনা জোড়ার মধ্যে শ্যামের মতে কেবল দেশের ব্যবধান রহিয়াছে, রামের মতে উহাদের অন্তর্গত উভয় জাতীয় ব্যবধানই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রশ্ন। শ্যামের ঘড়ি যে সময়টাকে এক ঘণ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করে রামের ঘড়ির মাপে ঐ সময়টা কত হইবে ?

উত্তর। শ্যামের ঘড়ির 'এক ঘণ্টা' দুইটা পর-পর ঘটনার মধ্যে (অর্থাৎ উহার ঘণ্টার

কাঁটাটা একবার ১২টার ঘরে এবং একবার ১টার ঘরে উপস্থিত হওয়া রূপ ঘটনা দু'টার মধ্যে) কালের ব্যবধান নির্দ্দেশ করিতেছে ; এবং উহাদের মধ্যে, শ্যামের মতে, দেশের ব্যবধান শূন্য পরিমিত। অর্থাৎ এস্থলে 'সা' = ১ঘণ্টা 'তা' = ০ এবং 'স' কত হইবে, ইহাই প্রশ্ন। ৭নং লোরেঞ্জসূত্রের প্রথম সমীকরণে এই তিনটা রাশির সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে ; সুতরাং উক্ত সমীকরণ অনুসারে

$$স = ঐ \left(১ \text{ ঘণ্টা} + \frac{ব}{ভ^২} \times ০ \right) = \text{'ঐ' ঘণ্টা}$$

অর্থাৎ রামের মতে, উক্ত ঘটনা দু'টার অন্তর্গত কালের ব্যবধানটা ১ ঘণ্টার 'ঐ' গুণ, অথবা অপেক্ষাকৃত বড় হইবে। রাম বলিবে, যতক্ষণে শ্যামের ঘড়ির কাঁটাটা একঘর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে ততক্ষণে তাহার ঘড়ির কাঁটাটা 'ঐ' ঘর পরিমিত অর্থাৎ এক ঘর ছাড়াইয়া আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং রাম বলিবে, শ্যামের ঘড়ি 'ঐ' গুণ ধীরে চলিতেছে। ঠিক ঐরূপ হিসাবেই দেখা যাইবে যে, রামের ঘড়িও শ্যামের মাপে 'ঐ' গুণ 'শ্লো' হইয়া দাঁড়াইবে।

আপেক্ষিক বেগের অবস্থায় প্রত্যেকে বলিবে অপরের ঘড়ি 'ঐ' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে (ঐ − ১) ঘণ্টা অথবা ঘণ্টায় $\left(১ - \frac{১}{ঐ} \right)$ ঘণ্টা পরিমিত শ্লো চলিতেছে। ঐ বেগটা যদি আলোকের বেগের $\frac{৪}{৫}$ অংশ হয় ('ঐ' = $\frac{৫}{৩}$ পরিমিত হয়) তবে প্রত্যেকে বলিবে অপরের ঘড়ি ঘণ্টায় $(১ - \frac{৩}{৫})$ ঘণ্টা বা ২৪ মিনিট করিয়া শ্লো চলিতেছে। আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের সমান হইলে (ঐ = অসীম হইলে) প্রত্যেকে বলিবে, অপরের ঘড়ি স্থির হইয়া রহিয়াছে ; এবং ঐ বেগটা দূর হইয়া গেলে ('ঐ' = ১ পরিমিত হইলে) প্রত্যেকের ঘড়ি অপরের দৃষ্টিতে ঠিক চলিতেছে বলিয়া অনুভূত হইবে। পূর্ব্বে আমরা এই উদাহরণের একবার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে দেখা গেল যে, এই সিদ্ধান্ত এবং এই জাতীয় সকল সিদ্ধান্তই লোরেঞ্জ সূত্র হইতে সহজেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। শ্যামের ট্রেনের দৈর্ঘ্য শ্যামের মাপে ১ মাইল পরিমিত হইলে রামের মাপে কত হইবে ?

উত্তর। দৈর্ঘ্য নিরূপণ অর্থ দু'টা সমসাময়িক দূরের ঘটনার মধ্যে দূরত্ব নিরূপণ করা। চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্য নিরূপণে রামকে দেখিতে হইবে যে, উহার উভয় প্রান্তের সহিত তাহার জগতের কোন্ স্থান দু'টার একই সময়ে মিলন ঘটিল। এই মিলনরূপ ঘটনা দু'টার মধ্যে শ্যাম ১ মাইল পরিমিত দূরত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে ; রামের মতে ঘটনা দু'টা সমসাময়িক ; রামের জগতে উহাদের দূরত্ব কত হইবে ? অর্থাৎ তা = ১ মাইল এবং স = ০ হইলে 'ত' কত হইবে ইহাই প্রশ্ন।

৮নং সূত্রের দ্বিতীয় সমীকরণ এই তিনটা রাশির মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে ; সুতরাং উক্ত সমীকরণ অনুসারে

১ মাইল : : ঐ (ত - ব × ০) = ঐ × ত

$$ত = \frac{১}{ঐ} \quad মাইল$$

ফলে রামের মাপে ট্রেনের দৈর্ঘ্য ১ মাইল অপেক্ষা কম হইবে। এই উদাহরণেরও পূর্ব্বে একাধিকবার উল্লেখ করা গিয়াছে।

রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগটা যদি আলোকের বেগের $\frac{৪}{৫}$ অংশ হয় ('ঐ' = $\frac{৫}{৩}$ পরিমিত হয়) তবে রাম বলিবে যে, ট্রেনের দৈর্ঘ্য $\frac{৩}{৫}$ মাইল বা ১০৫৬ গজ। আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের সমান হইলে ('ঐ' = অসীম হইলে) রাম বলিবে টেনের দৈর্ঘ্য শূন্য পরিমিত।

শ্যামের টেনরূপ জগৎটা যদি শ্যামের মাপে গোলাকার হইত, তবে অপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন রাম বলিত যে উহা ঠিক গোলাকার নহে, ডিম্বাকার—উত্তর-দক্ষিণদিক বরাবর (বা আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর) কিঞ্চিৎ চেপ্টা, এবং ঐ বেগটা যদি আলোকের বেগের সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, তবে রাম বলিত, শ্যামের জগৎটা একখানা থালার মত—উহার বিস্তৃতি দুই দিকে মাত্র এবং উত্তর বা দক্ষিণ দিকে এক পা চলিতে গেলেই ঐ জগতের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং দেখা যায়, আপেক্ষিকতাবাদের বিচারে 'সমতল পিঠ,' 'সরল রেখা' প্রভৃতি কথার অর্থ নাই অথবা উহাদের অর্থ রহিয়াছে কেবল দ্রষ্টার দৃষ্টি প্রণালীর ভিতর দিয়া; এবং এই সকল সংজ্ঞাকে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্যের মর্য্যাদা দান করিতে হইলে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলির পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

প্রশ্ন। শ্যাম দেখিতে পাইল তাহার জগতের 'চ' স্থানে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং উহা হইতে উদ্ভূত একটা আলোক রশ্মি ১ সেকেণ্ড পরে, লক্ষ ক্রোশ দূরে—'ছ' স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। রাম ও শ্যামের আপেক্ষিক বেগ যদি আলোকের বেগের $\frac{৪}{৫}$ অংশ হয় তবে রাম ঐ ঘটনা দু'টার মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান কিরূপ নির্দ্দেশ করিবে?

উত্তর। এখানে সা = ১ সেকেণ্ড, তা = লক্ষ ক্রোশ এবং $\frac{ব}{ভ} = \frac{৪}{৫}$ অথবা ঐ = $\frac{৫}{৩}$; 'স' ও 'ত' কত দেখিতে হইবে।

৭ নং প্রথম সূত্র অনুসারে

$$স = \frac{৫}{৩} \left(১ \ সেকেণ্ড + \frac{ব}{ভ^২} \ লক্ষ \ ক্রোশ\right)$$

$$= \frac{৫}{৩} \left(১ \ সেকেণ্ড + \frac{ব}{ভ} \times \frac{লক্ষ \ ক্রোশ}{ভ} \right)$$

$$= \frac{৫}{৩} \left(১ \ সেকেণ্ড + \frac{৪}{৫} \times ১ \ সেকেণ্ড \right)$$

$$= \frac{৫}{৩} \left(১ + \frac{৪}{৫} \right) সেকেণ্ড = ৩ \ সেকেণ্ড$$

এবং দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে

$$ত = \frac{৫}{৩} (লক্ষ \ ক্রোশ + ব \times ১ \ সেকেণ্ড)$$

$= \frac{৫}{৩}$ (লক্ষ ক্রোশ $+ \frac{৪}{৫}$ভ $\times$ ১ সেকেণ্ড)

$= \frac{৫}{৩}$ (লক্ষ ক্রোশ $+ \frac{৪}{৫}$ লক্ষক্রোশ)

$= \frac{৫}{৩}$ (১ $+ \frac{৪}{৫}$) লক্ষ ক্রোশ $=$ ৩ লক্ষ ক্রোশ

অর্থাৎ শ্যাম যদি বলে যে, আলোক রশ্মিটা এক সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ রাস্তা পার হইয়া গিয়াছে রাম বলিবে যে, উহা এক সেকেণ্ডে নহে, তিন সেকেণ্ডে এবং লক্ষ ক্রোশ নহে, তিন লক্ষ ক্রোশ রাস্তা পার হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আলোক রশ্মির পথ অতি-বাহন কাল অথবা পথের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ থাকিলেও উহার বেগ সম্বন্ধে উভয়ে একমত হইয়া থাকে। সহজেই দেখা যায়, 'ব' যদি 'ভ' এর ভিন্ন একটা ভগ্নাংশ হইত তথাপি আলোকের বেগ সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ ঘটিত না। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই, কেন না আলোকের বেগের উক্ত সমতার উপরেই লোরেঞ্জ-সূত্র প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন। রাম দেখিতেছে শ্যামের ট্রেনটা উত্তর দিকে 'ব' বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ট্রেনের ভিতর হইতে শ্যাম উত্তর দিকে একটা ঢিল ছুড়িয়া দিল। শ্যামের মাপে ঢিলটার বেগ দাঁড়াইল 'পা' পরিমিত ; রামের মাপে উহা কত হইবে ?

উত্তর। মনে করা যা'ক শ্যাম দেখিল, ঢিলটা তাহার জগতের 'চ' স্থান হইতে যাত্রা করিয়া 'ছ' স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং শ্যামের মাপে এই ঘটনা দু'টার মধ্যে দেশের ব্যবধান ('চ' ও 'ছ' স্থানের মধ্যে দূরত্ব) 'তা' পরিমিত এবং উহাদের মধ্যে কালের ব্যবধান 'সা' পরিমিত হইল ; সুতরাং শ্যাম বলিবে 'পা' $= \frac{তা}{সা}$। অন্য পক্ষে, রামের মাপে ঘটনা দু'টার দেশ ও কালের ব্যবধান যদি 'ত' ও 'স' পরিমিত হয় এবং ঢিলের বেগটাকে রাম 'প' চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করে তবে রাম বলিবে যে প $= \frac{ত}{স}$। এখন ৭ নং সূত্রের দ্বিতীয় সমীকরণটাকে প্রথমটা দ্বারা ভাগ করিলে

$$\frac{ত}{স} = \frac{তা + ব \times সা}{সা + \frac{ব}{ভ^২} \times তা} = \frac{\frac{তা}{সা} + ব}{১ + \frac{ব}{ভ^২} \times \frac{তা}{সা}}$$

এবং $= \frac{ত}{স}$ স্থানে 'প' ও $\frac{তা}{সা}$ স্থানে 'পা' বসাইলে

$$প = \frac{পা + ব}{১ + \frac{ব}{ভ^২} \times পা} \quad \text{..............(১১)}$$

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। পুরাতন যুগের মতে, দূরত্ব এবং পরিমাপে রাম শ্যাম একমত হইয়া থাকে ; সুতরাং ঐ মত অনুসারে রাম বলিবে যে, যেহেতু শ্যাম ঢিলটাকে 'পা' বেগে উত্তরদিকে ছুটিতে দেখিতেছে এবং আমি শ্যামকে 'ঐ' দিকেই 'ব' বেগে ছুটিতে দেখিতেছি ;

অতএব আমার সম্পর্কে ঢিলটার বেগ (পা+ব) পরিমিত হইতে হইবে; অর্থাৎ পুরাতন যুগের দেশ ও কালের ধরণা অনুসারে

$$প = পা + ব \cdots\cdots\cdots (১২)$$

এই সম্বন্ধটা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। ইহার সঙ্গে ১১নং সমীকরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, রামের মতে ঢিলটার বেগ (পা+ব) অপেক্ষা কিছু কম হইয়া থাকে, কারণ $\left(\frac{ব}{ভ^২} \times পা\right)$ রাশিটা শূন্য পরিমিত নহে। ব = ০ হইলেই এই রাশিটা শূন্য পরিমিত হইয়া অপেক্ষিকতাবাদের ১১নং সূত্রটা পুরাতন মতের ১২নং সূত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়। $\left(\frac{ব}{ভ^২} \times পা\right)$ রাশিটা সসীম হওয়ার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ১১নং সমীকরণের শ্যামের মাপের 'পা' রাশিটা যে পরিমাণে বাড়িয়া যায় রামের মাপের 'প' রাশিটা বাড়ে তাহা অপেক্ষা কমপ রিমাণে।

আরও দেখা যাইবে যে, যদি শ্যামের মাপে ঢিলটার বেগ (পা) বাড়িতে বাড়িতে শেষটা আলোকের বেগের ('ভ'-এর) সমান হইয়া দাঁড়ায় তবে রামের মাপও উহা ক্রমে বাড়িয়া শেষটা আলোকের বেগের সমান হইয়াই দাঁড়াইবে—ঐ বেগটাকে ছাড়াইয়া যাইবে না; কারণ পা = ভ হইলে ১১নং সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে

$$প = \frac{ভ + ব}{১ + \frac{ব}{ভ^২} \times ভ} = \frac{ভ + ব}{১ + \frac{ব}{ভ}} - ভ$$

অর্থাৎ এক্ষেত্রে রামের মাপেও ঢিলটার বেগ 'ভ' পরিমিত হয়; এবং 'ব' রাশিটা ছোট হউক বা বড় হউক অথবা 'ভ' পরিমিতই হউক তাহাতে এ সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

দেখা গেল যে, কোনও পদার্থের বেগ যদি এক জগতের মাপে আলোকের বেগের সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে তবে যে কোন পরিমাণের আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন ভিন্ন জগতের মাপেও ঐ বেগটা আলোকের বেগের সমানই হইবে। অবশ্য এ'রূপ হওয়াটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা যে লোরেঞ্জ সূত্র হইতে ১১নং সমীকরণটা পাওয়া যাইতেছে আলোকের বেগের এই দ্রষ্টা নিরপেক্ষতার উপরেই উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আরও দেখা যাইবে যে, উভয় জগতের আপেক্ষিক বেগ (ব) আলোকের বেগের তুলনায় সামান্য হইলে ১১নং সূত্রটাকে নিম্নোক্তরূপেও প্রকাশ করা যাইতে পারে

$$প - (পা + ব)\left(১ + \frac{ব}{ভ^২} \times পা\right)^{-১}$$

$$= (পা + ব)\left(১ - \frac{ব}{ভ^২} \times পা\right)$$

$$=\text{পা}+\text{ব}-\text{ব}\times\frac{\text{পা}^২}{\text{ভ}^২}-\text{পা}\times\frac{\text{ব}^২}{\text{ভ}^২}$$

$$=\text{পা}+\text{ব}-\text{ব}\times\frac{\text{পা}^২}{\text{ভ}^২}\left[\text{কারণ এক্ষেত্রে } \frac{\text{ব}^২}{\text{ভ}^২}=\text{প্রায় শূন্যপরিমিত}\right]$$

অর্থাৎ $\text{প}=\text{পা}+\text{ব}\left(১-\frac{\text{পা}^২}{\text{ভ}^২}\right)$.........(১৩)

এই আকারে এই সূত্রটার পরে প্রয়োজন হইবে।

প্রশ্ন। নদীর নির্ম্মল জল উহার তীর সম্পর্কে 'ব' বেগে উত্তর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ জলের ভিতর দিয়া একটা আলোকরশ্মিও ঐ দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। তীরটা রামের জগৎ, নদীটা শ্যামের জগৎ—তীরে দাঁড়াইয়া রাম দেখিতেছে যে, নদীর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামও 'ব' বেগে উত্তরদিকে ধাবমান। ঐ আলোকরশ্মির বেগটা যদি রামের মাপে 'প' পরিমিত এবং শ্যামের মাপে 'পা' পরিমিত হয়, তবে 'প'-এর সহিত 'পা'-এর সম্বন্ধ কিরূপ হইবে?

উত্তর। এক্ষেত্রে 'প' ও 'পা' কে যে পরস্পরের সহিত সমান হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। আলোকের বেগের দ্রষ্টা নিরপেক্ষতা কেবল শূন্যদেশে আলোকের বেগের—যাহাকে আমরা বরাবর 'ভ' দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছি উহার—সম্বন্ধেই খাটে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি ভিন্ন ভিন্ন বেগে অগ্রসর হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই ঐ বেগের পরিমাণ 'ভ'-এর তুলনায় অল্পবিস্তর ছোট হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে নদী সম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগটা (বা 'পা') 'ভ' অপেক্ষা ছোট হইবে এবং তীর সম্পর্কে উহার বেগও (বা 'প') 'ভ' অপেক্ষা ছোট কিন্তু ভিন্ন পরিমাণের হইবে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ঢিলের বেগ সম্বন্ধে রামের পরিমাপের ফলের সহিত শ্যামের পরিমাপের ফলের যে সম্বন্ধ এস্থলে আলোক রশ্মির বেগ সম্পর্কেও উভয় দ্রষ্টার পরিমাপের ফলের ঠিক সেই সম্বন্ধই বর্ত্তমান। অধিকন্তু 'ব' টা (তীর সম্পর্কে নদীর বেগ বা রামের সম্পর্কে শ্যামের বেগ) বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নগণ্য; সুতরাং এস্থলে 'প' ও 'পা'-এর মধ্যে ১৩ নং সম্বন্ধটা খাটিবে।

উক্ত রাশি দু'টার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়োদ্দেশ্য প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ফিঁজো সাহেব একটা পরীক্ষা করেন। ফিঁজোর পরীক্ষা হইতে দেখা গেল, 'প' ও 'পা' র মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদের ১৩ নং সম্বন্ধটাই খাটে, পুরাতন মতের ১২ নং সূত্রটা খাটে না। অর্থাৎ পুরাতন যুগের দেশ ও কালের ধারণা অনুসারে তীর সম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগটা (প) যত বড় হওয়া উচিত বাস্তবিক পক্ষে উহা তাহা অপেক্ষা $\text{ব}\times\frac{\text{পা}^২}{\text{ভ}^২}$ পরিমাণে ছোট হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য তখন আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ কল্পনার অগোচর ছিল; সুতরাং দেশ ও কালের প্রচলিত ধারণা অনুসারে ঐ অসামঞ্জস্যের একটা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ফ্রেনেল ঐ ব্যপাটার যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ। আলোক তরঙ্গ-ধর্ম্মী—উহা তরঙ্গের আকারে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং শূন্য দেশেই হউক অথবা অচল বা

সচল যে কোন স্বচ্ছ পদার্থের অভ্যন্তরেই হউক—আলোকতরঙ্গ বহন করিবার জন্য স্থল-জল-ব্যোম্-ব্যাপী একটা 'মিডিয়মের'—ঈথর নামক একটা বিশিষ্ট ধরণের পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।" আলোক-বাহী ঈথরের ধর্ম্ম দ্বারাই আলোকরশ্মির বেগ নিয়মিত হইয়া থাকে। শূন্যদেশস্থ ঈথরের ধর্ম্ম যাহা, জড় দ্রব্যের অভ্যন্তরে উহার ধর্ম্ম তাহা হইতে কিছু ভিন্ন হইয়া থাকে এবং জড়দ্রব্যটা বেগ বিশিষ্ট হইলে ঈথরের ধর্ম্ম আরও খানিকটা বদলাইয়া যায়। ফলে শূন্য দেশে আলোকের বেগটা যত অধিক হইবে জড়দ্রব্যের অভ্যন্তরে উহার বেগটা তাহা হইতে কিছু ভিন্ন পরিমাণের হইবে এবং ঐ জড়দ্রব্যটা বেগসম্পন্ন হইলে ঐ বেগটাও আরও খানিকটা বদলাইয়া যাইবে। ফ্রেনেলের পূর্ব্বেই এইরূপ ঈথর কল্পনা বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ফ্রেনেল বলিলেন যে, জড়পদার্থ বেগ বিশিষ্ট হইলে উহার অভ্যন্তরস্থ ঈথরটাও সঙ্গে সঙ্গে—কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবেগে—ছুটিয়া চলে এবং ইহার জন্যই বেগ সম্পন্ন জড়দ্রব্যের অভ্যন্তরে আলোকরশ্মির বেগটা বদলাইয়া যায়। ফিঁজোর পরীক্ষার জলমধ্যস্থ ঈথরটা যদি নদীর সঙ্গে পুরাবেগে ('ব' বেগে) ছুটিতে পারিত তবেই 'প' ও 'পা'র মধ্যে ১২ নং সূত্রটা খাটিতে পারিত; অর্থাৎ তীরসম্পর্কে নদীর বেগ যাহা তাহার সহিত নদীসম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগটা যোগ করিলেই তীরসম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগ পাওয়া যাইত। কিন্তু নদীর তুলনায় ঈথরটা অপেক্ষাকৃত অল্পবেগে—নদীর বেগের $\left(১ - \frac{পা^২}{ভ^২}\right)$ ভগ্নাংশ পরিমিত বেগে—অগ্রসর হয় বলিয়াই তীরসম্পর্কে আলোকের বেগটা অপেক্ষাকৃত কম বা ১৩ নং সম্বন্ধ অনুযায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্যদিকে, আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ ব্যাপারের ব্যাখ্যা অতি সহজ অথবা উহা কোন ব্যাখ্যারই অপেক্ষা রাখে না। যদি বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের মধ্যে লোরেঞ্জ সূত্রের সম্বন্ধটা স্বীকার করা যায় তবে ১৩ নং সমীকরণটা আপনি সত্য হইয়া দাঁড়ায়—উহার সত্যতার জন্য ঈথর আছে কি নাই, উহার ধর্ম্ম কিরূপ অথবা উহা নদীর সঙ্গে সমান বেগে ছুটিয়া চলে কিনা, এসকল প্রশ্ন তুলিবারই প্রয়োজন হয় না। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে নদী সম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগটা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ('পা' পরিমিত) হইতে হইবে—নদীটা (তীর সম্পর্কে) স্থির হইক বা বেগসম্পন্ন হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। সুতরাং, তীরসম্পর্কে আলোক রশ্মির বেগটাও—পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের রামের জগৎসম্পর্কে ঢিলের বেগটার মত—১৩ নং সূত্র হইতেই পাওয়া যাইবে। আইনষ্টাইনের মতে, ঈথরের কথা না তুলিয়াও, আলোকের বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে এবং অনেকস্থলে অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে। ফিঁজোর পরীক্ষার ফলটা আপেক্ষিকতা-বাদের বেগ-সংযোজন সূত্রের সহিত সহজে মিলিয়া যায় সুতরাং ঐ পরীক্ষাটা পরোক্ষভাবে এবং একটা বিশিষ্ট দিক হইতে আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা সমর্থন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঈথর কল্পনাকেও ম্লান করিয়া তোলে। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান-সাধিকা শ্রীমতী কুরী

অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

রেডিয়াম আবিষ্কর্ত্তা মাদাম মেরী কুরীর জীবন রেডিয়ামেরই মত আশ্চর্য্যজনক। জ্ঞান যে কত বড় সাধনার জিনিষ, আর এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন যাঁরা, তাঁরা যে কত মহিমময় এ কথা কয় জন বুঝেন ?

শ্রীমতী কুরী

এই ধীমতি মহিলা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠা। ইঁহার পিতা শ্রীযুত Sklodowski ছিলেন ওয়ারস নগরীর এক কলেজের আচার্য্য এবং ইঁহার মা ছিলেন এক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ছেলেমেয়েদের ভালমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কুমারী মেরী ছয় বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ছাত্রীজীবনে তিনি বড় ভীরু ও লজ্জাশীলা ছিলেন ; আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টাই ছিল না। ভাল ছাত্রী বলিয়া শিক্ষকরা

চেষ্টা করিতেন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক আসিলে মেরীকে দিয়া আবৃত্তি করাইতে বা প্রশ্নোত্তর দিতে। মেরী ইহাতে বড় মুস্কিলে পড়িতেন। সময়ে সময়ে এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্ত পলাইয়া লুকাইয়া থাকিতেন।

কিন্তু মেরীর বিদ্যার্জ্জনের পিপাসা অসম্ভব মাত্রায় বেশী ছিল। বালিকাবস্থায় তাঁর প্রধান আনন্দ ছিল, মায়ের কাছে বসিয়া প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভাল ভাল কাহিনী শ্রবণ করা। গাছ-পালা, পোকা-মাকড়, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতির মূক ও মৌন জীবনে যে উপন্যাসের চেয়েও মনোহর কতই রহস্য আছে, তাহা এই বালিকা তন্ময় হইয়া শুনিত; এবং এ সব কথা সত্য বলিয়াই তাহার আরো ভাল লাগিত।

যেমন দেশ তেমনি মানুষ! যেমন মা তেমনি মেয়ে হইবেই তো! আমাদের ছেলেরা মা-দিদিমার কোলে বসিয়া ভূত-প্রেত বা পরীর গল্প শোনে! মানুষ হইতেই মানুষ হয়!

যথাকালে মেরীকে দেশী স্কুল ছাড়িয়া রুশ সরকারী স্কুলে যাইতে হইল। এ সময়ে পোলাণ্ড ছিল ভারতেরই মত হতভাগ্য পরাধীন দেশ; রুশ সরকারী স্কুলের সব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেমবৃদ্ধির বিরোধী। এ সব সরকারী স্কুলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ ছিল পুলিশ ও অপরাধীর সম্বন্ধের মত। ছাত্রদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা, সন্দেহ করা, মিথ্যা সন্দেহে পীড়ন করা, এবং এইরূপ ব্যবহারে শিক্ষার্থীর জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই ছিল এ সব শিক্ষকের কাজ।

এরূপ অবস্থায় সর্ব্বত্রই ছেলেদের জীবন নিরানন্দ হয়, শক্তি উদ্যম শুকাইয়া যায়, মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ অভাবে বিকৃত হইয়া পশুত্বে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেরা সহ্য করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসে যখন তাহাদের মন সম্পূর্ণ অসাড় হইয়া পড়ে। কুমারী মেরীর কিন্তু এই ব্যবহারে অসহ্য যন্ত্রনা বোধ হইত, তার কারণ তাঁহার জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল। দেশের অপমান তাঁদেরই বেশী লাগে, যাঁদের অন্তর দেশপ্রেমে ভরা।

এই যন্ত্রনা হইতে কুমারী মেরী মুক্তি পাইতেন যখন বাড়ী আসিয়া পিতামাতার সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। রস সাহিত্যে প্রীতি থাকিলেও বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁহার কাছে ছিল—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার"। পদার্থবিজ্ঞানে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। নিজের একটি পরীক্ষাগার থাকিবে এবং তাহাতে তিনি মনের সুখে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণে কাল কাটাইবেন, ইহাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা।

যখন পনেরো বছর বয়স তখন মেরীকে স্কুল ছাড়িতে হইল। তাঁহার পিতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তাঁহাকে বিশ্রাম দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সংসারের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল;—কাজেই মেরীকে পড়ার সময় ছাড়া বাকী সময়টা খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইল।

মেরী বাড়ী হইতে দূরে এক গ্রাম্য ভদ্রলোকের মেয়েদের গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ জোগাড় করিলেন।

মেরীর ছাত্রাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিল মেরীরই সমবয়স্কা। আর দুইটি ছিল ছোট।

ইহাদের সঙ্গে তাঁহার খুব সৌহার্দ্দ্য হয়। শিক্ষাদান, সদালাপ, নির্দ্দোষ খেলা-ধূলা ও ভ্রমণে বেশ দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বাড়ীছাড়া মা-বাপ-ভাই-বোনের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত মেরীর মন বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত।

এ সময়ে রুশ সরকারের ব্যবস্থায় গ্রাম্য ছেলেদের শিক্ষাদান বে-আইনি কাজ বলিয়া গণ্য হইত; তথাপি মেরী দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপনে ইহাদের শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী মতে এরূপ সংকল্পকারীর শাস্তি ছিল সাইবিরিয়ায় যাবজ্জীবন কারাবাস! কাজেই মেরী যে কি দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সন্ধ্যাকালে বাড়ীর সকলে কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে মেরীর সময় আসিত নিজের বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার। মনোমত পুস্তক ও বিধিবদ্ধ অধ্যয়নপ্রণালীর সুযোগঅভাবে তাঁহার শিক্ষা পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছিল না। তবু এই পাঠাভ্যাস ফলে তাঁহার স্বাধীন জ্ঞানচর্চ্চা প্রবৃত্তি প্রাবল্য লাভ করিত।

চার বৎসর পরে মেরী রাজধানী ওয়ার্‌স নগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে পিতার সাহায্যে একটি পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারে প্রবেশ লাভ করেন এবং প্রতি রবিবার তথায় আসিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পোলণ্ড-দেশীয় যুবক ছাত্রছাত্রীরা একটি গোপন সমিতি স্থাপন করেন; ইহার উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয় জীবনকে জ্ঞান, বিদ্যা ও চারিত্র্য-নীতি বলে পুষ্ট করিয়া তোলা। মেরী এই সমিতির একজন তেজস্বিনী সভ্য ছিলেন। সভার যাবতীয় সান্ধ্য অধিবেশনে যোগ দিয়া শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত করিয়া তোলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, জাতীয় উন্নতির মূল—জ্ঞান ও চরিত্রবলের উৎকর্ষতা সাধন। তাঁহার কথা এই,—"You cannot hope to build a better world without improving the individual" অর্থাৎ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে উন্নত না হইলে ব্যক্তির সমষ্টি জাতি উন্নত হইবে না। পরাধীন পশ্চাৎপদ দেশের যুবকযুবতীদের এই অমূল্য উপদেশটি মনে রাখা উচিত।

যথাকালে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন সফল হইবার সুযোগ আসিল। বিজ্ঞানসাধনার পূর্ণতার জন্য মেরী সযত্ন সঞ্চিত অর্থ-পুঁজি সম্বল করিয়া সভ্য জগতের জ্ঞানকেন্দ্র প্যারিস মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে একটি ছয়তালা বাড়ীর সর্ব্বোপরি তালাতে একটি ছোট চিলেকোঠায় (garret) বাসা লইলেন। এখানে ছেলে পড়াইয়া বাসা খরচ সংগ্রহ করতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতে লাগিলেন।

কি কষ্টে এই বাসাঘরে এই জ্ঞানপিপাসু অসহায় ছাত্রীর দিন কাটিত, তা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুর্দ্দান্ত শীতে এই কোটরের চৌবাচ্চার জল জমিয়া বরফ হইয়া যাইত এবং তাহাতে মেরীর বিছানা এত ঠাণ্ডা হইত যে তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত পোষাকপরিচ্ছদ শয্যার উপর বিছাইয়া তবে কথঞ্চিৎ শীত নিবারণ করিতে হইত। একটা ছোট লোহার

উনান (stove) ছিল বটে, কিন্তু ছয় তালার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে হইতে তাহার জন্য কয়লা বহন করিয়া আনিতে হইত; তাও আবার অর্থাভাবে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না একটা ছোট spirit lamp-এ নিজের যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য নিজেই তৈয়ারী করিতেন। এমন কত দিন যাইত, যখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক কাপ্ কোকো বা কাফি ও একটা ডিম মাত্র খাইয়া থাকিতেন।

তথাপি এই ধীমতি সহিষ্ণুশীলা ছাত্রীর প্রফুল্লতার অভাব ঘটিত না; জ্ঞানসাধনা যাঁহার জীবনে ইষ্টপূজার সমান তাঁহার কি দৈহিক ক্লেশ মনে স্থান পায়? বিজ্ঞান-দেবতা তাঁহাকে যে অরূপ লোকের অমৃত আস্বাদ জানাইয়াছেন তাহা স্থূল জগতের অনুভূতির বহু ঊর্দ্ধে। মেরী যথাকালে যোগ্যতার সহিত পদার্থবিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষা পাশ করিলেন।

অতঃপর তিনি Sorbonne-এর জগৎ-বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্যালয়ের ছাত্রী হইলেন এবং তথাকার বীক্ষণাগারে পরীক্ষা কার্য্য করিবার অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহার চিরপোষিত জীবন-স্বপ্ন এতদিনে সফল হইতে চলিল। এই বিদ্যালয়েই তিনি তাঁহার ভাবী স্বামী Pierre Curieর সহিত পরিচিত হন। উভয়ের প্রগাঢ় বিজ্ঞানপ্রীতিই উভয়কে বন্ধুরূপে মিলিত করে; এই বন্ধুত্বই পরে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হয়। অনতিকাল পরে উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। Pierre Curie ছিলেন Paris Schoolএর পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপক। তাঁহার বেতন অল্প হওয়াতে সংসার খরচের জন্য উভয়কেই উপরি খাটুনী খাটিয়া রোজকার করিতে হইত। ঘরকরণার ও রন্ধনাদির কাজ সবই মাদাম কুরী করিতেন, এবং এসব কাজ সারিয়াও তিনি স্বামীকে বীক্ষণাগারের কাজে সাহায্য করিতেন; তদুপরি নিজের অধ্যাপকপদবী লাভ জন্য Certificate-পরীক্ষার পড়াশুনাও করিতে হইত।

যথাকালে তিনি এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খৃঃ তাঁহাদের প্রথম সন্তান জন্মলাভ করে। বালিকার নাম Irene। কন্যা জন্মিবার পর মায়ের কাজ আরো বাড়িল। ভাগ্যক্রমে আচার্য্য কুরীর বৃদ্ধ পিতা এই সময়ে পুত্র ও পুত্রবধূ-ভবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি পৌত্রীর লালনপালনের ভার লইলেন। মাদাম কুরী ইহাতে অনেকটা অবসর পাইয়া বিজ্ঞান-আলোচনায় বেশী মন দিতে পারিলেন।

অতঃপর রেডিয়াম আবিষ্কারের ইতিহাস।

এই সময়ে হেন্‌রি বেক্‌রেল্ (Henri Becquerel) Uranium-Salt (য়ুরেনিয়াম্) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইনি এই দ্রব্যটার একটু একটা Photographic plateএ রাখিয়া কালো কাগজ ঢাকা দিয়া দেখিলেন, আলোক-সংযোগে plateএ যেমন দ্রব্যছাপ পড়ে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে! পতি-পত্নী তাহা অবগত হইয়া বিস্মিত হন এবং ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে তৎপর হন। শ্রীমতী কুরী পরে আবিষ্কার করেন যে, থোরিয়াম্- (Thorium) ধাতু-যুক্ত দ্রব্যও উক্তরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইনি তখন য়ুরেনিয়াম্ ও থোরিয়াম্—দুটী পদার্থ লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষা করিতে

করিতে এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া বসেন। কতকগুলি খনিজদ্রব্য (minerals) পরীক্ষা করিবার সময় তিনি দেখেন, তাহাদেরই কয়েকটা থোরিয়াম্-য়ুরেনিয়ামের মিশ্রণ না হইলেও বিশেষ ক্রিয়ালক্ষণ (activity) প্রকাশ করে। তিনি এই গুলার ভিতর একটা নূতন ধাতুর সন্ধান পান। নিজের মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের (Poland-এর) নামানুসারে উহার নাম দিলেন পোলোনিয়াম্ (Polonium)। কিন্তু এখানেই আশ্চর্য্য পর্ব্বের শেষ নহে। এই পোলোনিয়াম্ লইয়া অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা আর এক আশ্চর্য্যতর ধাতুর পরিচয় পান। ইহাই বিশ্ববিখ্যাত রেডিয়াম্ (Radium)।

যৌগিকাবস্থায় (Compound State) ইহার অস্তিত্বের খোঁজ পাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; কাজেই ইহাকে বিমিশ্রাবস্থা হইতে অমিশ্র-অবস্থায় বা নিছক মৌলিকাবস্থায় নিষ্কাশন করার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু সহায়সম্বলহীন দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একাজ খুবই কঠিন কাজ! তথাপি কোন্ উৎসাহী—তা সে যতই দীন হউক—অমূল্য মণির সন্ধান পাইয়া তাহা লাভ করিতে নিরস্ত থাকে? এই অপূর্ব্ব ধাতুকে একবার মৌলিকরূপে ধরিতে পারিলে যে অসীম সমৃদ্ধি লাভ হইবে! অবশ্য নিষ্কাম বৈজ্ঞানিক এখানে পার্থিব সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতছেন না! বিজ্ঞানরাজ্যের সমৃদ্ধিই তাঁর কাম্য।

যাহাই হউক, দম্পতিযুগল রাশি রাশি রেডিয়াম্ মিশ্রিত খনিজ (Ore) পদার্থ সংগ্রহ করিলেন এবং বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে উহা হইতে রেডিয়াম্ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় লাগিলেন।

Physics-School-এর উঠানে একটা ভাঙ্গা ছাউনিতে এই পরীক্ষা ব্যাপারের আড্ডা হইল। ছাউনির কাচের ছাত ভাঙ্গা;—বর্ষাতে বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায়। গ্রীষ্মে অসহ্য উত্তাপ; শীতে হাড়ভাঙ্গা ঠাণ্ডা; এই জঘন্য, সর্ব্বকষ্টের আশ্রয়ভূমি ভাঙ্গা ছাউনির তলে দরিদ্র দম্পতির সর্ব্বশ্রান্ত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জ্ঞানসন্তান রেডিয়াম্ জন্ম গ্রহণ করে। Bethelham-এর ভাঙ্গা আস্তাবলে মেরী-নন্দন যিশুর জন্মরূপ অলৌকিক ঘটনা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর এই মেরী-সুত রেডিয়ামের জন্ম বড় কম অলৌকিক নয়!

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই জ্ঞানযোগিনী অনিদ্রা-অনাহারে রাশি রাশি খনিজ রেডিয়াম্ (radium-ore) লইয়া শোধন, মার্জ্জন ও বর্জ্জন চালাইয়াছেন! ঐখানেই আবার স্বহস্তে স্পীরিট-ল্যাম্পে (Spirit lamp এ) যা-কিছু একমুঠা খাবার তৈয়ারী করিয়া স্থূল দেহটাকেও সাধনক্ষম করিয়া রাখিতে হইয়াছে! স্বামী রেডিয়াম্ রশ্মির পরীক্ষায় ব্যাপৃত, স্ত্রী radium-ore এর শোধনে নিযুক্ত।

শ্রীমতী কুরীর কৃচ্ছ্র সাধনার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব।—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে জলন্ত উনানের উপর ফুটন্ত গলিত ধাতু নাড়িতে হইত একটা প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড দিয়া, আর সে দণ্ডটা ছিল তাঁহার দেহেরই সমান লম্বা।

চার বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা এইটুকু প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে,

রেডিয়াম্ একটা মূল-ধাতু; উপযুক্ত যন্ত্রাগার থাকিলে হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই—অনেক পূর্ব্বেই ইহা প্রমাণিত হইত। রাত্রির অন্ধকারে নিজেদের পরীক্ষাগার দেখিতে আসা তাঁহাদের একটা বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয় ছিল। আলমারির তাকে অন্ধকারে রেডিয়ামপূর্ণ শিশিগুলা অন্তরস্থ জ্যোতিষ্মান ধাতুর দীপ্তিতে "Silhouette"-এর মত দেখাইত। রেডিয়াম-আধার শিশি ও টেষ্ট্-টিউব্ (Test Tube) গুলা যেন অশরীরী আলোর মত ঘরকে পরী-রাজ্যে পরিণত করিয়া রাখিত।

বেকারেলের সহিত একযোগে ইঁহারা নোবেল্-প্রাইজ্ (Nobel-prize) পাইলেন। সিদ্ধি আসিল, কিন্তু বহু বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। প্রায় ৪ বৎসর তাঁহারা কার্য্যশক্তি হারাইলেন। এদিকে দেশবিদেশ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে নানাশ্রেণীর লোক আসিয়া এই অজ্ঞাতনামা দম্পতির ক্ষুদ্র গৃহ ভরিয়া ফেলিতে লাগিল—কেহ বা দর্শক, কেহ বা স্তুতিবাদক, কেহ বা অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নকারী; এছাড়া ব্যবসাদার কেহ কেহ পাটোয়ারী বুদ্ধির বশে পয়সা করিবার ফন্দী বাৎলাইতেও আসিল। সংবাদপত্রের সংবাদদাতারও ভিড় কম হইল না। দেশ-বিদেশে নানা কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণও আসিল অসংখ্য। কুরী-দম্পতির সময় ও শক্তির নিদারুণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

যশোলাভের ফলে অধ্যাপক কুরী সরবন্ কলেজের পদার্থবিদ্যার নূতন আচার্য্যপদ (চেয়ার) লাভ করেন; এবং আচার্য্য-পত্নী সেথাকার পরীক্ষাগারের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্রীর পদ পাইলেন।

এরপর তাঁহাদের দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়।

রেডিয়ামের সূতিকাগৃহরূপ সেই ভাঙ্গা আটচালার বদলে এখন নব সাজসরঞ্জামযুক্ত প্রকাণ্ড পরীক্ষাভবন গঠিত হইল; কিন্তু ভগবানের ক্রূর ইচ্ছায় আচার্য্য এই নবভবনে কাজ করিতে পারিলেন না। নিষ্কাম জ্ঞান-ঋষি প্যারিসের রাস্তায় কুকুর-বিড়ালের মত একটা Lorry চাপা পড়িয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এইরূপে একটি মহিমময় জীবন অকালে ঝরিয়া পড়িল।

জীবনসঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নীর যে ইহাতে কি ধাক্কা লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বামী, সচিব, সহচর, সখা, সহপাঠী, সহকর্ম্মী, জ্ঞানবন্ধু—একাধারে সব এমন প্রিয়জন হারানো যে কি তাহা সাধারণ নারী বুঝিবে কিরূপে? তবু এই নিষ্কাম জ্ঞানসাধিকা সাধনা হইতে বিরত হইলেন না। বিজ্ঞানালোচনা চলিতেই লাগিল। তাঁহার সমস্ত সময়কে দুইভাগ করিয়া একভাগ বিজ্ঞানের সেবায়, অপরভাগ কন্যা-দুইটির লালনপালনে সমর্পন করিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মাদাম কুরী Military Hospitalএ রেডিয়ামকে চিকিৎসা ব্যাপারে লাগাইবার ব্যবস্থা করেন। নানা স্থানে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইলে, যাহাতে রেডিয়াম্ সর্ব্বত্র সুলভ হয়, তাহারও সুবিধার জন্য রেড্‌ক্রস্ (Red cross) সমিতির সাহায্যে গাড়ীযোগে রেডিয়াম্ সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীতে রেডিয়াম্ উৎপাদনের ব্যবস্থা

ছিল, এবং মাদাম কুরী নিজে এই গাড়ী চালাইতেন ও রেডিয়াম্-উৎপাদন-সহায়ক যন্ত্রাদি পরিচালনা করিতেন।

পরে বুঝা গেল, খাঁটি Radium এর কোনো আবশ্যকতা নাই, Radium emanation অর্থাৎ রেডিয়াম্-রশ্মিতেই কাজ হইবে। এই নিষ্কাশিত radium দ্যুতিরই ভয়ানক চাহিদা (demand) বাড়িয়া গেল। এবং মাদাম নিজে ঐসব ইমানেশন্ তৈয়ারী করিয়া সমস্ত হাসপাতালে জোগাইতে লাগিলেন।

জগতে যাঁহারা একটা বিশুদ্ধ উন্নত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করেন, তাঁহাদের বলা হয় আদর্শবাদী। আদর্শবাদী অর্থে কল্পনাবিলাসী নহে।

আচার্য্য কুরী ও তাঁহার পত্নী ছিলেন বিজ্ঞান সাধনা রাজ্যের 'idealist'—ভাবসাধক।

কুরী-দম্পতি ইচ্ছা করিলে আজ ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন; কিন্তু স্বপ্নেও একবার এ চিন্তা তাঁহাদের মনে উঠে নাই। কি উপায়ে এবং কি প্রক্রিয়ায় রেডিয়াম্ লাভ করা যায়, তাহা তাঁহারা মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেন। ব্যবসাদারী-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া পেটেণ্ট্ (patent) লওয়া বা সর্ব্বসত্ব সুরক্ষিত করার সুবুদ্ধি তাঁহাদের হইল না। মাদাম নিজে এতদিন ধরিয়া দেহপাত করতঃ যে পরিমাণ radium লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সরবন্ কলেজের পরীক্ষাগারে দিয়া দেন। কেন?—বিজ্ঞানের সেবার জন্য!

আর আমাদের দেশে যদি কেহ সাপের বা কুকুরের বিষের সত্যই কোনো ঔষধ বাহির করিতে পারেন, তাহা বিশ্বের উপকারার্থে না জানাইয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের ও পুত্রপৌত্রাদির দারিদ্র্যের মহৌষধিরূপে সর্ব্বসত্ব সুরক্ষিত করিয়া রাখেন!

রেডিয়াম্ এখনো অগ্নিমূল্য, তবে বাঁচোয়া এই যে, হাসপাতালাদিতে ব্যবহার্য্য রেডিয়ামের মাত্রা কণা-পরিমাণ হইলেই চলে।

তবু এই ত্যাগ যে কত বড় ত্যাগ তাহা এই শ্রেণীর ত্যাগীরাই বুঝেন। মানুষের হিত যাঁদের কাছে সর্ব্বাগ্রে, তাঁহাদের নজরে নিজের ছোটখাটো সাংসারিক লাভ ক্ষতি নগন্য মাত্র।

এ'বিষয়ে মাদাম কুরীর উক্তি অনুধাবন করিবার মত। তিনি বলেন—

"Humanity surely needs practical men who make the best of their work for the sake of their own interests; but it also needs dreamers for whom the unselfish following of a purpose is so imperative that it becomes impossible for them to devote much attention to their material benefit" অর্থাৎ—"সংসারে অবশ্য এমন হিসাবী লোকও থাকা দরকার, যাঁরা নিজেদের কৃতকর্ম্মের ১৬ আনা ফল নিজের সুখসুবিধার জন্য ব্যয় করেন; কিন্তু সংসারে এরূপ পাটোয়ারীবুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রিয় লোকেরও স্থান আছে—যাঁদের কাছে বিশ্বের হিতের জন্য নিষ্কাম চিত্তে কাজ করার মূল্য এত বেশী যে, তাঁরা এ অবস্থায় নিজের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসরই পান না!"

কুরীপত্নী এই বিশ্বাস অনুসারেই জীবনে কাজ করিয়া যাইতেছেন তাঁহার সারাটি জীবন এইরূপ নিষ্কাম বিজ্ঞানসাধনার মহান আদর্শে উজ্জ্বল।

"ধনং দেহি ধান্যং দেহি"—ইঁহার কাম্য ও কামনা-মন্ত্র নয়।

ইঁহার ধ্যানমন্ত্র—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" ই—১৫।

বিবিধ

ইটালীয়া ও কাপ্তেন এমুণ্ডসেন

পাঠকগণ অবগত আছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে (গত মে মাসে) "ইট্যালীয়া" বিমান-পোত জেনারেল্ নোবীলের কর্ত্তৃত্বাধীনে উত্তরমেরু-প্রদেশ-অভিযানে বাহির হইয়াছিল। তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

* * * *

হারানো "ইটালিয়া" হাত-পা ভাঙ্গিয়া উত্তর মহসাগরের তীরে বরফস্তূপের মধ্যে কোথায় পড়িয়া আছে, বিগত ৯ই জুন তারিখে তাহা জানিতে পারা যায়। সেই সঙ্গে ইহাও জানা যায় যে, আরোহীরা তখনও সকলেই জীবিত ছিল, কিন্তু নানা দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

* * * *

জেনারেল নোবীল্ কোথায় আছেন জানিতে পারার পর তাঁহার খোঁজে ভাগে ভাগে অনুসন্ধানকারীদের দল বাহির হইয়া পড়ে। ১৮ই জুন বেতারে খবর পাওয়া যায় যে, নোবীল কাপ্তেন লার্স্ ও লেফটানেণ্ট হোম্ পরিচালিত বিমানপোত দুইটি দেখিতে পাইয়াছেন। তখনও কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা নোবীলকে দেখিতে পান নাই। অবশেষে ২৩শে জুন একদল সুইডীয় অনুসন্ধানকারী নোবীল্‌কে উদ্ধার করেন। এত করিয়াও মিলান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পন্‌ট্রিমলি, সংবাদপত্রসেবী ল্যাগো, এঞ্জিনিয়ার সিওকা প্রভৃতির আজও কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

* * * *

নরওয়ে দেশীয় বিমান-বীর কাপ্তেন এমুণ্ডসেন এই হারানো "ইটালীয়া"র খোঁজে বিগত ১২ই জুন একখানা ফরাসী "হাইড্রোপ্লেন্" নিয়া ট্রোম্‌সো হইতে যাত্রা করেন। ইটালীয়াকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এমুণ্ডসেনের এখনও কোন খোঁজ নাই। মেরু-অভিযান উপলক্ষে এই-রূপ দুর্ঘটনা এই নূতন নহে; ইহার পূর্ব্বেও বহুবার এ'প্রকার ঘটিয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে

বিমান-বিহারী এণ্ডি্রর অন্তর্দ্ধানের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যতবার মেরু-অভিযানের চেষ্টা হইয়াছে, একবারও নিরুপদ্রবে তাহা সম্পন্ন হয় নাই।

এমুণ্ডসেন বায়ু-বিহারে ইতঃপূর্ব্বেই যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিমান-বিহারীদের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠাও কম ছিল না। পূর্ব্বেও তিনি কয়েকবার বিমানপোতে মেরু-অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃঃ জেনারেল নোবীলের সঙ্গেই তিনি একবার উত্তর-মেরু অভিযানে গিয়াছিলেন।

এবার ইটালীয়ার অভিযানের প্রারম্ভে তাঁহার সঙ্গে জেনারেল নোবীলের কোনও কারণে একটু মনোমালিন্য ঘটে। তাই তিনি বর্ত্তমান অভিযানে যোগ দেন নাই। কিন্তু যখন ইটালীয়ার হারানোর খবর জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই সামান্য ঝগড়ার কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্তে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

জেনারেল্ নোবীল তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, এই বীর বিমান-বিহারীও নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসুন! পূর্ব্বে একবার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেও পূরা একমাস তাঁহার কোনই খোঁজ-খবর ছিল না, কিন্তু তারপর তিনি সুস্থ শরীরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আর সত্যই যদি তাঁহার কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে, তবে এই বীরোচিত কার্য্যের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহৎ ও বিরাট কার্য্যের ভিতর দিয়া যে জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, মহত্তর কার্য্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বের মানব শ্রদ্ধায় তাঁহার স্মৃতির নিকট নতশির হইবে।

* * * *

ট্রোমসোর ১লা সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, একটা জেলে-নৌকা সমুদ্রের উপর "সী-প্লেনের" একটা প্লবমান-অংশ (float) খুঁজিয়া পাইয়াছে। উহা নাকি কাপ্তেন এমুণ্ডসেনের পোতেরই অংশ। ইহাতে মনে হয়, এমুণ্ডসেন হারানো ইটালীয়ার খোঁজে বাহির হইয়া সত্যই নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

* * * *

এই মেরু-অভিযান উপলক্ষে আরও একটি মহৎ প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। জেনারেল নোবীলের দলে ডাঃ ফিন্ ম্যাল্ম্গ্রেন্ নামক একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বরফস্তূপের মধ্যে নিজের জীবন বলি দিয়াছেন। ১৬ই জুন তারিখে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর অগ্রসর হইবার শক্তি থাকে না। তখন তিনি বরফস্তূপের মধ্যে স্বহস্তে নিজের কবর খনন করিয়া শান্তভাবে তাহার ভিতর শয়ন করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে এইরূপে জীবন্ত সমাধি দিয়া অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করায় তিনি বলেন—"তোমরা চলিয়া যাও, আমার জন্য বিলম্ব করিও না। আমি আর অগ্রসর

হইব না। আমার প্রাণের বিনিময়ে অন্য অনেকের প্রাণ রক্ষা হইবে।" তাঁহার এই দুর্ব্বল শরীর নিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে পাছে তিনি সঙ্গীদের দুর্ব্বহ ভার হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় তিনি আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। সজ্ঞানে জীবন্ত সমাধিশায়ী হইলেন।

* * * *

পরে ইটালীয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অধ্যাপক ম্যাল্ম্‌গ্রেনের নোট বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহার সাঙ্কেতিক লিপিগুলির পাঠ- ও অর্থোদ্ধার করিবার জন্য নোটবইখানা সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে।

সিংহলের সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব

সিংহলের ১৯২৬ সালের সরকারী রিপোর্টে সেখানকার সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব-গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে সহকারী সামুদ্রিকজীব-তত্ত্ববিদ্ মিঃ এ, এইচ, ম্যালপাস,—সিংহলের মুক্তা-শুক্তি, window-pane বা সার্সি-শুক্তি এবং ক্যাঙ্ক (chank) নামক শম্বুকাদির চাষের উৎকর্ষের বিষয় লিখিয়াছেন। এখন হইতে চারি বৎসরের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে মুক্তা-শক্তি সংগ্রহের বিশেষ সম্ভাবনা নাই; তবে সামুদ্রিক জীব-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ জে, পিয়ারসন খ্রীঃ ১৯২৮ অব্দে সমুদ্র-তীরে কিছু শক্তি-সংগ্রহ প্রশস্ত মনে করেন। এবার শুক্তি আর সাধারণকে বিক্রয় না করিয়া সরকারী বিভাগ হইতে সমস্ত মুক্তা-সংগ্রহের ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছে। ফলে সমস্ত মুক্তা সরকারের হাতে আসিবে। খ্রীঃ ১৯২৬ অব্দে ট্যামব্লিগাম হ্রদে window-pane-শুক্তি আবাদ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছিল, সরকার মাত্র ১৮০০০৲ টাকা করস্বরূপ পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা লিজ্ লইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। খ্রীঃ ১৯২৩ অব্দে সিংহল-সরকার ক্যাঙ্ক বিক্রয় করিয়া বার হাজার টাকারও বেশী লাভ করিয়াছিল। মিঃ এ, এইচ, ম্যালপাস এবং মিঃ এস, গোমেজ সিংহলের ফিশারি সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতেছেন। এই সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব গবেষণার ফলে সিংহলে আধুনিক ধরণে মৎস্য ধরিবার প্রণালী প্রচলনের জন্য একটি ব্যবসায়ীর দল গঠিত হইয়াছে। সিংহলে সামুদ্রিক জীবতত্ত্বের উৎকর্ষসাধনের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। খ্রীঃ ১৯২৫ অব্দে এখানে সংরক্ষিত মৎস্যের রপ্তানি-শুল্ক স্বরূপ সরকার আশী লক্ষ টাকার উপর পাইয়াছিল; তাই মৎস্য সংরক্ষণের উৎকর্ষসাধনের দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। মিঃ পি, ই, পি, ডেরানিয়াগ্যালা সিংহলের মিঠা-জলের মৎস্যের বিষয় গবেষণা করিতেছেন। তিনি সিংহলের মৎস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন; ইহা কি বৈজ্ঞানিক, কি অবৈজ্ঞানিক সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশেষ উপকার সাধন করিবে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, 'ভোছুয়া' নামক এক প্রকার মৎস্য মে মাসে কয়েক সপ্তাহের জন্য গভীর জল হইতে কিনারার দিকে আসে। এই মাছগুলা তীরভূমি হইতে বহুদূরে সমুদ্রের গভীর জলে ডিম পাড়ে। সামুদ্রিক বিভাগের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট—

লেপ্‌টেনেণ্ট্‌ কমাণ্ডার, ই, এল, পর্শি,—মুক্তা-শুক্তির ক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত তাহা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। সিংহলের সামুদ্রিক বিভাগের কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। সিংহলের মুক্তা-শুক্তি সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ 'প্রকৃতি'র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

নেপালের মানচিত্র

নেপালের মহারাজা নেপাল রাজ্যের জরিপ-মানচিত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত সরকারের জরিপ-বিভাগের সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। তিন বৎসরের কার্য্যের পর এখন নেপালের মোটামুটি জরিপ-নক্সা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নেপালের বিস্তারিত নক্সা ছিল না। মাপে দেখা গিয়াছে যে পার্ব্বত্য নেপালরাজ্য পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। এখন মোটামুটি যে মানচিত্র খাড়া হইয়াছে তাহাতে দেশটার একটা সাধারণ বিবরণ এবং জলপ্রবাহগুলি চিত্রিত আছে। ইহার পর যে সকল নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে, তাহা বিস্তৃত মানচিত্রে দেখান হইবে। কোথাও নদী, কোথাও উন্নত পর্ব্বতশিখর, কোথাও জঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভূপৃষ্ঠ এবং প্রতিকূল জলবায়ু জরিপের কার্য্যে বহু বাধা-বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল কিন্তু উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই ম্যাপ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার যে সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি রহিয়া গেল, পরবর্ত্তী সঙ্কলনে তাহার সংশোধন হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করা যায়। জরিপে নেপালের অনেক অজানা স্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেছেন। এখন ঐ সমস্ত অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব, প্রাণী-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অভিযান চলিবে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস।

অধ্যাপক মলীশ্‌ ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

অধ্যাপক এইচ্‌, মলীশ্‌ (Molisch) ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌-শারীর-বিজ্ঞানের (plant physiology) অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার নাম সুপরিচিত। তিনি তাঁহার মৌলিক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌-মহলে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানের উদ্ভিদ্‌-তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের সংগঠন-জন্য আহুত হইয়া কয়েক বৎসর তথায় কাটাইয়া গিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অতি-আধুনিক আবিষ্কার সমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য বিগত মার্চ্চ মাসে য়ুরোপে গিয়াছিলেন। তথায় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে "উদ্ভিদের রস শোষণ-প্রণালী", "উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্র", "উদ্ভিদের উপর ঔষধাদির ক্রিয়া" প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণা ও অভিনব তথ্যপূর্ণ কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া ও আচার্য্যের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির অপূর্ব্ব

কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া অধ্যাপক মলীশ্ একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি জগদীশচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার যন্ত্রাদি চাহিয়া নিয়া তদীয় বিজ্ঞানাগারে নিজের হাতে পরীক্ষাগুলি করিয়া দেখিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে য়ুরোপের আর কোনও বিজ্ঞানাগারে এরূপভাবে ভারতীয় যন্ত্রাদি সাহায্যে কেহ কোন পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। মলীশ্ নিজের হাতে পরীক্ষাগুলি করিয়া জগদীশচন্দ্রের তথ্যাদির যাথার্থ্য ও যন্ত্রগুলির অদ্ভুত সূক্ষ্মানুভূতি-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত কুঞ্চনমান-যন্ত্র (Contraction recorder) সাহায্যে বৃক্ষদেহস্থ কোষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকুঞ্চন পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। যে ক্ষীণতম আঘাতের উত্তেজনা মানুষের দেহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, তেমন আঘাতেও যে বৃক্ষকোষ সঙ্কুচিত হয়, এই যন্ত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

বৃক্ষদেহে রস-সঞ্চালন কালে দেহস্থ কোষ প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের মত নিয়তই স্পন্দিত হইতে থাকে—ইহা জগদীশচন্দ্রের অভিমত। স্পন্দন-লিপি-যন্ত্র (Sphygmograph, ইহাও জগদীশচন্দ্রেরই আবিষ্কৃত) দ্বারা এই স্পন্দন অতি সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়। উত্তেজক ও অবসাদক ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রে যেমন উত্তেজনা ও অবসাদ আসে, বৃক্ষকোষেরও তেমনি পরিবর্ত্তন ঘটে। স্পন্দনলিপি-যন্ত্র সাহায্যে মলীশ্ তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

এতকাল বিশ্বাস ছিল, শিকড়ের চাপ (root pressure) ও বৃক্ষদেহস্থ রসের বাষ্পাকারে উদ্গমন (transpiration) জন্যই বৃক্ষদেহে রস সঞ্চালিত হয়। আচার্য্য জগদীশ গাছের যে কোনও একটা শিকড়বিহীন অংশকে (কাণ্ডের যে কোনও অংশ) বাষ্পোদ্গমন-প্রতিরোধী প্রলেপ দ্বারা আবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শিকড় না থাকিলে ও বাষ্পোদ্গমন রুদ্ধ করিলেও বৃক্ষ রস আকর্ষণ করে। এমন কি ইচ্ছানুযায়ী উপর হইতে নীচে বা নীচে হইতে উপরে—যে কোনও দিকে রস সঞ্চালিত করা যায়। স্পন্দনলিপি-যন্ত্রে এই ছিন্নমূল বৃক্ষাংশেরও কোষ-স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়। মলীশ্ সাহেব ও পরীক্ষা করিয়া ঠিক অনুরূপ ফল পাইয়াছেন। বিগত ৪ঠা আগষ্টের "ন্যাচার" পত্রিকায় তিনি নিজের হাতে-করা এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল উল্লেখ করিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে আচার্য্য জগদীশের তথ্যাদির ও যন্ত্রসমূহের প্রশংসা করিয়াছেন।

* * * * * * *

অধ্যাপক মলীশ্ জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদ্-শারীর-বিজ্ঞানে আচার্য্যের প্রণালী অনুযায়ী গবেষণা করিবার জন্য আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিবেন।

শিশুদের চারি-পায়ে চলা

হাঁটিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিশুদের চারি পায়ে চলার বিষয় নিয়া ডাঃ এলেস্ হ্রড্‌লিকা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। বহু দৃষ্টান্ত ও বহু তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া ইদানীং তিনি

একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পর্য্যবেক্ষণাদির ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তিনি বলেন—পুংস্ত্রীনির্ব্বিশেষে প্রায় সকল জাতির শিশুরাই হামাগুড়ি না দিয়া প্রায়শঃই তৎপরতার সহিত চারিপায়ে দৌড়াইবার অভ্যাস আয়ত্ত করে। এইরূপে চারি-পায়ে চলার সঙ্গে হামাগুড়ি দেওয়ার যথেষ্ট তফাৎ আছে। হাঁটিতে আরম্ভ করিলে তবে শিশুরা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে। বহুক্ষেত্রে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিবার পরও কোন কোন শিশু মাঝে মাঝে ঐভাবে চলাফেরা করে। তাহাতে মনে হয়, সে উহাতে খুব আনন্দ ও আমোদ পায়। যে শিশুদের মধ্যে এই বিশেষত্ব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই কিন্তু স্বাস্থ্যবান্, শক্তিশালী ও কর্ম্মঠ। সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা তাহাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যও অনেক বেশি উন্নত।

ডাঃ এলেস্ বলেন—এইরূপ চারি-পায়ে চলা স্বভাবের সঙ্গে যে শারীরিক গঠন-ত্রুটি বা দুর্ব্বলতার কোন সম্বন্ধ আছে—এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বিশ্বাস, সুস্থ ও সবল শিশুদের দৈহিক গঠন ও হামা-দেওয়া অপেক্ষা দ্রুত চলিবার উৎসাহ ও অভিপ্রায় হইতেই এই স্বভাবের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ তাহার আদিম-তম পুরুষের প্রকৃতির প্রভাব আজিও অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাই তাহার সঙ্গে শিশুদের চলাফেরার সাদৃশ্য এখনও প্রকাশ পাইতেছে। দুই-তিন-পুরুষ পূর্ব্বের লোকের সঙ্গে তো ইহার খুব নিবিড় সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না! তবে অবশ্যই এ বিষয়ের আর গভীরভাবে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

ডাঃ এলেস্ আরও বলেন যে, যে সব শিশু চারি-পায়ে চলে, শীঘ্রই তাহাদের দেহে ও চালচলনে নানারূপ বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তাঁহার মতে এবিষয়েও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

উদ্ভিদের রোগ-নিবারণ

২৫ বৎসরের অধিক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে উদ্ভিদ্‌জাতির সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর পাঁচটি শত্রুর কথা আজ জানিতে পারা গিয়াছে। প্রধানতঃ (১) জমির অবস্থা (২) আবহাওয়ার অবস্থা (৩) ছত্রক বা ছাতা (fungus) (৪) নানা প্রকার পীড়াউৎপাদক জীবাণু (Bacteria) ও বড় গাছ এবং (৫) পঙ্গপালের অত্যাচার ও অন্যান্য নানারকমের আঘাত প্রভৃতির উপরই বৃক্ষজীবনের দীর্ঘ বা স্বল্পায়ুতা নির্ভর করে। কিন্তু ইহাদের হাত হইতে উদ্ভিদ্ জাতিকে বাঁচাইতে হইলে ইহাদের প্রত্যেকটির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হইলে জানা দরকার পঙ্গপালের স্বভাব, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাহাদের বিনাশের অমোঘ ঔষধ। ছত্রকের হাত

হইতে বাঁচাইতে হইলে জানিতে হইবে, কোন্ বিশেষ প্রকারের ছত্রক বৃক্ষদেহ আক্রমণ করিয়াছে এবং কিরূপে তাহা বিনাশ করা যায়। জমির জন্য যদি বৃক্ষ পুষ্টিলাভ করিতে না পারিয়া থাকে, তবে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে জমির কোথায় ত্রুটি, এবং কি জন্য সে ত্রুটি হইয়াছে, কি করিলে বা সে ত্রুটি নিবারণ করা যায়। কোনরূপ আপাত দৃশ্য কারন ব্যতীতও যদি বৃক্ষ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, ক্রমেই যদি শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, তবু অনুসন্ধান করিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে কি সে ব্যাধি। তবেই চিকিৎসা চলিতে পারিবে।

খুব সম্ভব শিকড়ই বৃক্ষের প্রকৃত ব্যাধিমন্দির। দৃষ্টির অগোচরে থাকে বলিয়া সহজেই সেখানে ব্যাধির আক্রমণ প্রবল হইয়া উঠে। শিকড়ের দেহস্থ অসংখ্য মূল-কেশ (Root hair) দ্বারাই বৃক্ষ তাহার জলীয় খাদ্য গ্রহণ করে। এই জলীর খাদ্য অবশেষে বৃক্ষদেহ-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পত্রশীর্ষ পর্য্যন্ত পৌছিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই সুকুমার (delicate) মূলকেশগুলিও উন্মুক্ত করিয়া রোগ নিবারণ এবং বৃক্ষের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য জোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে বৃক্ষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

উদ্ভিদ-দেহের যে বিকৃতি অমনি দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা তজ্জনিত বৃক্ষদেহে যে সকল কোটরাদির সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ লোকে তাহারাই চিকিৎসা করিয়া থাকে। কেননা, এ চিকিৎসার ফলাফল সহজেই দেখিতে ও উপলব্ধি করিতে পারা যায়! সুতরাং সে বিষয়ে দু'এক কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ছত্রক বা ছাতা (Fungus) এবং রোগ-জীবাণু (Bacteria) উদ্ভিদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। যতক্ষণ উদ্ভিদদেহের বহিরাবরণ অর্থাৎ বল্কল অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ ছত্রক তাহার কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু যেই মাত্র বল্কলে একটু আঘাত লাগিল, বা অন্য কোনও রকমে একটু ছিন্ন হইয়া গেল, অমনি ছত্রক ও রোগজীবাণু প্রবলবেগে তাহাকে আক্রমণ করে এবং ক্রমশঃ বৃক্ষসার বিনষ্ট করিয়া তাহাকে চিরতরে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। এ অবস্থায় সাধারণ লোকে মনে করে, গাছটা বুঝি অমনি শীর্ণ হইয়া যাইতেছে—একপ্রকার অতিক্ষুদ্র জীবন্ত উদ্ভিদ (ছত্রক) যে একটু একটু করিয়া তাহার দেহ নাশ করিতেছে, একথা কয়জন জানে? তখন উদ্ভিদকে বাঁচাইতে হইলে তাহার যতটা অংশ ছত্রকাক্রান্ত হইয়াছে সবটা নিঃশেষে কাটিয়া ফেলা দরকার। রোগগ্রস্ত একটি কোষও অবশিষ্ট থাকিলে আর রক্ষা নাই।

আক্রান্ত অংশ কাটিয়া ফেলার পর বৃক্ষকোটরটিকে ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সিমেন্ট্ (Cement) দিয়া গর্ত্ত ভরিয়া দিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে কিন্তু খুদিয়া গর্ত্তটিকে এমন করিতে হইবে যেন তন্মধ্যে অতি সহজেই সিমেন্ট প্রবেশ করাইয়া দৃঢ় স্থাপিত করা যায়। খুদিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন গর্ত্তমুখপার্শ্বস্থ বল্কলের পরবর্ত্তী সূত্রস্তর (Cambium) এবং রস-সঞ্চালন-স্তর (Sapwood) কোনও রকমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়!—এই কার্য্যটাই সমস্ত ব্যাপারটার ভিতর কষ্ট ও বিরক্তিকর।

এইরূপে ভর্ত্তি করিবার প্রধান উদ্দেশ্যেই এই, রোগ যেন আর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে। কেননা ছত্রক প্রভৃতির সিমেণ্টের আবরণ ভেদ করিয়া বৃক্ষদেহে প্রবেশ করতঃ আহতস্থান আক্রমণ করা সহজ হইবে না। রোগক্ষয়-জনিত শক্তিহীন অন্তঃসারশূন্য বৃক্ষের যে কোনও সময় ভাঙিয়া পড়া সম্ভব ; যাহাতে সহজে ভাঙিয়া পড়িতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেও
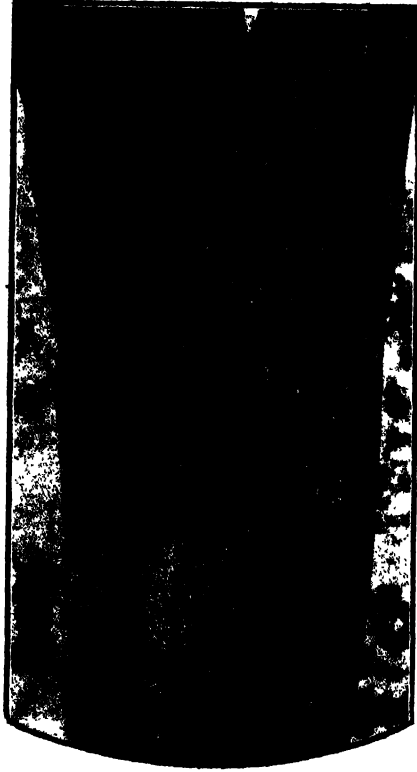
সিমেণ্টের উপর দিয়া নূতন বল্কল জন্মিয়াছে ;
সিমেণ্ট বৃক্ষদেহের অংশরূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ করা হইয়া থাকে। মানুষের ভগ্নাস্থি সংযুক্ত হইবার কালে যেমন একপ্রকার অস্থিময় পদার্থ (Callus) উপজাত হয়, তেমনি একপ্রকার বল্কল পদার্থ উপজাত হইয়া এই সিমেণ্টের উপর দিয়া ক্রমে নূতন বল্কল গড়িয়া উঠে এবং সিমেণ্টসহ বৃক্ষদেহ আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে অবশেষে সিমেণ্ট বৃক্ষদেহেরই একটা অংশ হইয়া পড়ে। সোলা, কাষ্ঠ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং অন্যান্য বহু অজৈব পদার্থ (inorganic = খনিজ) দ্বারা গর্ত্ত পরিপূরণের চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছে। কিন্তু পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের মত এত কার্য্যকরী

আর কোনও বস্তুর এতাবৎ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বন্ধনী দণ্ড দ্বারা থাকে থাকে সাজাইয়া পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টে গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। খণ্ড খণ্ড অস্থিসহ-যোগে নির্ম্মিত প্রাণীর মেরুদণ্ড যেমন জীবদেহে শক্তিদান করে, অথচ প্রয়োজন মত অবনত বা আকাবাঁকা হইবার সুযোগও দেয়, তেমনি এইরূপে থাকে থাকে সজ্জিত সিমেণ্ট বৃক্ষদেহকে শক্তিশালী, নমনীয়, ও দীর্ঘায়ুঃ করে; আহত স্থানও শীঘ্রই পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়।

বন্ধনী-দণ্ড সাহায্যে থাকে-থাকে সিমেণ্ট সাজাইয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করা হইয়াছে

তুলার ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত রোগ

তুলার ব্যাকটিরিয়া-রোগ সম্প্রতি সুদানে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। এ যাবৎ এই রোগের প্রতিকারের বিশেষ উপায় ছিল না। তাহার প্রধান কারণ নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম কি কি আবেষ্টনের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায় এবং কোন কোন আবেষ্টনেই বা ব্যাকটিরিয়া জন্মায় না, তাহা এ যাবৎ জানা ছিল না। মরুভূমি এবং আর্দ্রভূমি সকল

স্থানেই তুলায় এই রোগ দৃষ্ট হয়, কাজেই জলবায়ুর কতটা প্রভাব আছে তাহা বলা সুকঠিন। মাটির অম্লতা এবং ক্ষার অথবা বায়ুর তাপের সহিত এই রোগের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞরা স্থির করিয়াছেন। মিঃ আর, ই, ম্যাসী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মৃত্তিকার উত্তাপের সহিত এই রোগের প্রাদুর্ভাবের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান। এই রোগের আক্রমণ একটা নির্দ্দিষ্ট মৃত্তিকা-উত্তাপের মধ্যেই লক্ষিত হয়। মৃত্তিকার উত্তাপ ১১° হইতে ২০° সেন্টিগ্রেড হইলে রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ অত্যন্ত অল্প দেখা যায়; ২১° হইতে ২৬° সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে রোগের প্রকোপ পূর্ণ মাত্রায় লক্ষিত হয়; ২৮° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে কদাচিৎ রোগ দেখা যায় এবং ৩০° উত্তাপে সাধারণতঃ বৃক্ষ রোগাক্রান্ত হয় না। কৃত্রিম উপায়ে রোগের বীজাণু সুস্থ বৃক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। বৃক্ষে দুষ্ট ব্যাকটিরিয়া মিশ্রিত জল সিঞ্চন করিয়াও পরীক্ষা করা হইয়াছে;—পারিপার্শ্বিক বায়ু এবং মৃত্তিকার উত্তাপ ৩৪° হইতে ২২° সেন্টিগ্রেডে পরিণত করাইলে, রোগের প্রকোপ পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতে মনে হয়, ফাউল ওয়েটারের ধারণা কতকটা সত্য;—বৃষ্টির জন্য এই রোগ সংক্রমিত হয়।

আলুর পোকা

বহুদিন হইতে কি কি পোকা গ্রেট ব্রিটনের আলুর চাষের উচ্ছেদ সাধন করে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। সম্প্রতি কেম্ব্রিজ কৃষি বিদ্যালয় হইতে মিঃ কেনেথ, এস, স্মিথ গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, Myzus persical নামক ক্ষুদ্র এফিস্ (aphis) পতঙ্গই আলুর 'পাতা গুটানরোগ' সৃষ্টি করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সতেজ আলু গাছে উক্ত পতঙ্গ সংক্রমিত করিয়া দিলে গাছে এই রোগ দেখা যায়। এই পতঙ্গটা ছাড়া আরও আট নয় জাতের পতঙ্গ আলু গাছে দিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই রোগ তাহাদের দ্বারা সংক্রমিত হয় না। আলুর মোজেক (mosaic) রোগ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত এফিস্ দিয়া বিশেষ সংক্রমিত হয় না। এই রোগ হইলে আলুর পাতায় গোল গোল সাদা দাগ হয় এবং পাতার কিনারাগুলি কুঁকড়াইয়া যায়। একটি রোগযুক্ত আলুর পাতায় সূচিকা বিদ্ধ করিয়া অন্য একটি সুস্থ সতেজ আলুর পাতায় উক্ত রোগ সংক্রমিত করা যায়। এই রোগ তামাকেও সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। রোগযুক্ত আলু হইতে তামাকে এবং রোগযুক্ত তামাক হইতে আলুতে, এই রোগ সংক্রমিত করা যায়। মোজেকরোগ-বিহীন আলুর রস দিয়া আলু বা তামাকে উক্ত রোগ সংক্রমিত করা যায় না। স্মিথের গবেষণা এখনও চলিতেছে,—আলুর রোগ সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যকীয় জিনিষ জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তিমির চর্ব্বি

তিমির চর্ব্বির উপযোগিতা কি, ঋতু বিশেষ ইহা অল্প বিস্তর ঘন হয় কিনা, অন্য জলজ জন্তুর চর্ব্বির সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য আছে কি না, প্রভৃতি তিমিসম্বন্ধীয় বহু তথ্যের

আলোচনা পাশ্চাত্য দেশে বিশষভাবে চলিয়াছে। পূর্ব্বে এ বিষয় এত নাড়াচাড়া হয় নাই। বিশেষজ্ঞরা ভাবিতেন ইহা তিমির লোমের মূলদেশ মাত্র এবং ক্রিয়া হিসাবে জীবদেহে তাপ সঞ্চালন রোধক মাত্র। এখন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই চর্ব্বি তাহার চর্ম্মের রূপান্তর মাত্র; ঠিক যতটুকু পরিবর্ত্তন হইলে তিমি জলচরত্ব লাভ করিতে পারে এই চর্ব্বি ঠিক ততটুকু নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন। সিলের চর্ব্বির প্রকৃতি তিমির চর্ব্বি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সিলের চর্ব্বি ঋতুভেদে পুরু এবং পাত্‌লা হয়। তিমির চর্ব্বির প্রকৃতি কিন্তু সেরূপ নহে, কেবলমাত্র বয়সের অল্পাধিক্যের সঙ্গে ইহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তিমিচর্ব্বির ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেন যে, ইহা কেবল তাপ চলাচলের সহিত সম্পর্কিত; কিন্তু এখন দেখা গিয়াছে যে, একই সাগরের দুই জাতীয় তিমিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে চর্ব্বির পুষ্টিলাভ ঘটে, কাজেই ইহার ক্রিয়া যে কেবল তাপ সংক্রান্ত তাহা মনে হয় না। চর্ব্বির লঘুত্ব হেতু তিমির Specific gravity কমিয়া যায়। ফলে তাহার ভাসিয়া থাকার খুব সুবিধা হয়। ইহার প্রকৃতি স্থিতিস্থাপক হওয়ায় তিমি যখন গভীর জলে নিমজ্জিত হয়, উপরিস্থ জলস্তরের ভার তাহার পক্ষে আদৌ কষ্টদায়ক হয় না। তিমি যখন শ্বাস পরিত্যাগ করে বায়ুর স্বল্পতা হেতু তাহার ফুসফুস সঙ্কুচিত থাকে;—সেই অবস্থায় এই চর্ব্বির লঘুত্বই কেবল তাহাকে ভাসাইয়া রাখে। তিমির চর্ব্বির পরিমাণের সহিত তাহার দেহের ভারের সাধারণতঃ একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীণলণ্ড সমুদ্রে কয়েকটি তিমি ধরা পড়িয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের দেহের যে অংশ ভাসিয়া থাকে তাহা ওজনে এবং আকারে যত বৃহৎ, সেই পরিমাণে তাহার চর্ব্বিও তত ঘন। আরও দেখা গিয়াছে যে, অল্প বয়স্ক তিমির কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, তিমির দেহাস্থির লম্বত্বের অনুপাতে তাহার চর্ব্বি নিঃসৃত তৈলের ওজন হয়; অর্থাৎ জীবটার আকারের অনুপাতে তাহার চর্ব্বির গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়।

দুগ্ধাদি খাদ্যে মৎস্যের ন্যায় গন্ধ হয় কেন

দুগ্ধ এবং দুগ্ধজ খাদ্যে আঁশের ন্যায় গন্ধ হয় কেন, কি উপায়ে তাহা বন্ধ করা যায়, গবাদি পশুর খাদ্যের সহিত দুগ্ধের এই গন্ধের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, দুগ্ধে কি কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখা যাইতেছে। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া অথবা উক্ত প্রকার গন্ধ হেতু বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়; অর্থনৈতিক হিসাবে ইহাতে ভয়ানক লোকসান হয়। সম্প্রতি রেডিং-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জাতীয় ডেয়ারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে' মিঃ ডবলিউ, এল, ডেভিজ এবং মিঃ এ, টি, আর, ম্যাটিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দুগ্ধের মাখনে যে চর্ব্বি থাকে তাহা তাঁবার যৌগিক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। ফলে এমন একটা নূতন যৌগিক রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়, যাহাতে মাছের ন্যায় গন্ধ থাকে।

ধাতুর সংস্রবে না রাখিয়া দুগ্ধ সংরক্ষণ করিলে এই বিকৃত গন্ধের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অনেক বিকৃত গন্ধযুক্ত দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ ডেভিজ ও মিঃ ম্যাটিক তাঁহার যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা এখনও চলিতেছে;—এ বিষয় অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। দুগ্ধ বিকৃতগন্ধ হইলে ইহার চর্ব্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে কি না তাহা বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

চিঠিপত্র

জ্যোতিষ পরিচয়

(প্রতিবাদ)

"প্রকৃতির" ১৩৩৪ সালের হেমন্ত সংখ্যায় "জ্যোতিষ পরিচয়" পরিচ্ছেদে পৃথিবীর গতি ও আকৃতির বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভূভ্রমণের (অর্থাৎ পৃথিবী ঘোরার) আপত্তিকর প্রমাণ "উড্ডীয়মান পক্ষী সকলের কুলায় ফিরিয়া আসা অসম্ভব" ইত্যাদি যুক্তি খণ্ডন সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন যে;—

"আসল কথা এই যে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার একমাত্র কারণ আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব (Law of relative velocity) সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বোধ হয় সে সময়ে গণিতে "আপেক্ষিক গতিতত্ত্ব" বিষয়টি আবিষ্কৃত হয় নাই; হইলে, সহজেই এই গোল মিটিয়া যাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীর সহিত অনন্ত বায়ুমণ্ডলও সমান বেগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই জন্য পাখী যখন কুলায় পরিত্যাগ করিল, তখন উহার গতিবেগ পৃথিবীর বেগবল ও নিজের বেগবলের সমষ্টি। সুতরাং পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলকে নিশ্চল অবস্থায় আনিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত পাখীর গতিবেগ হইতে বায়ুর গতিবেগ বাদ যাইবে) পাখীর বেগবলই একমাত্র গতির পরিচালক হইবে। কারণ, সমস্ত ব্যাপারটাই পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে হইতেছে; এবং এই যে কুলায়প্রাপ্তি ইহাও পৃথিবীর সহিত আপেক্ষিক ভাবে সংশ্লিষ্ট।"

ভাল বুঝা গেল না। পৃথিবীর সহিত বায়ুর গতি হইবে কেন? পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু পৃথিবীর সম্পত্তি বলিয়া কি? আর বায়ু যে পৃথিবীর সহিত যায় তাহারই বা প্রমাণ কি? গাড়ীর চাকার উপরিস্থিত বায়ু তো চাকা ঘুরিবার সময় চাকার সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিয়া চাকাকে ঊর্দ্ধে তোলে না। * * * * *

পুরাকালে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও সুধীমণ্ডলের ("Law of relative velocity")

এই ইংরাজী শব্দটি জানা না থাকুক কিন্তু মুষলে দৃঢ়সংযুক্ত হস্ত উদূখলে অবঘাতজনিত মুষলসহ সেই হস্ত ঠিকরাইয়া উঠে—এ প্রমাণ-প্রয়োগ অনেক স্থানে করিয়াছেন ও তাহার কারণও অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আছে। তাহাই—"Law of relative velocity" নহে কি? উহা কঠিন ও দৃঢ়রূপে সংযুক্ত পদার্থ সম্বন্ধে খাটে, শুধু স্পর্শ থাকিলেই সঙ্গে যাওয়া হয় না। * * * * * *

বায়ুর ভিতরে কোন পদার্থ ফেলিলে বায়ু তাহাকে সহজেই স্থান ছাড়িয়া দিয়া থাকে। বায়ুর জমাটত্ব নাই। সামান্য অঙ্গুলীহেলনেই সে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ চলিয়া থাকে, ইহা সত্ত্বেও সে পৃথিবীর (কল্পিত) প্রচণ্ড আবর্ত্তনের কালে নিজে বিপর্য্যস্ত না হইয়া স্থিররূপে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিবে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। তবে কল্পনা ও অঙ্ককষার পক্ষে সেরূপ ধরিলে আশ্চর্য্যের বিষয় নাও হইতে পারে। * * * * *

তারপর কথা, পৃথিবী ঘোরে বলিয়া বায়ু ঘোরে; আর বায়ু ঘোরে কেন?—না, পৃথিবী ঘোরে বলিয়া। ইহা ভিন্ন আর কোন বিশেষ প্রমাণ দেখা যায় না। দুইটিই প্রমাণের বিষয়। পৃথক পৃথক রূপে দুইটিকে প্রমাণ করা প্রয়োজন। অসম্ভব হইলে একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটিকে প্রমাণ করিতে হইবে। বাজে কথায়—যেমন "দাদা তুমি বাড়ী থাক আমি খেতে যাই অথবা আমি খেতে যাই তুমি দাদা বাড়ী থাক" এরূপ উক্তির দ্বারা বুঝাইলে কাজ চলে না।

ফুকোর (Foucault) Pendulum বা দোলক এবং নিউটনের সুউচ্চ দেউলের চূড়ার উপর হইতে দ্রব্য নিক্ষেপাদির কথা গোঁভায় আণ্ডা দিয়া মিল দেখান রূপ। আকাশে নিরবলম্বনে (Pendulum) দোলক ঝুলে না এবং এক স্থানের পেণ্ডুলাম দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের বেড়ে বৃত্তাকারে দাগ পড়ে না। আর দেউলের চূড়ার পূর্ব্বপাশ হইতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ (Body) পশ্চিমদিকে গিয়া পড়ে না। * * * সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় আমার মাথায় এখনও পৃথিবী-ঘোরার বিষয় প্রবেশ করিল না। ইহা পাগলামীই হউক আর যাহাই হউক বলিব যে "পৃথিবী স্থিরা"।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়

(উত্তর)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় "প্রকৃতি"তে প্রকাশিত "পৃথিবীর গতি ও আকৃতি" শীর্ষক আমার লিখিত প্রবন্ধের যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিব। আমার মূল বক্তব্য ছিল যে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে যে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ আপেক্ষিক গতিতত্ত্বের (Law of relative velocity) বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞতা। যতীন্দ্রবাবু উহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, "পুরাকালে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ও সুধীমণ্ডলের "Law of relative velocity" এই ইংরাজি শব্দটি জানা না থাকুক কিন্তু মুষলে দৃঢ়সংযুক্ত হস্ত উদূখলে অবঘাত

জনিত মুষলসহ সেই হস্ত ঠিকরাইয়া উঠে—এ প্রমাণ প্রয়োগ অনেক স্থলে করিয়াছেন।” ইহা হইতে যতীন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহারা আপেক্ষিক গতিতত্ত্বের বিষয় জানিতেন। আমার মনে হয় যতীন্দ্রবাবু আপেক্ষিক গতিতত্ত্বের সহিত ঘাত ও প্রতিঘাতের ব্যাপারটি (action and reaction) গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

তারপর আমি Foucaultর দোলকের ও নিউটনের সু-উচ্চ দেউলের চূড়ার উপর হইতে দ্রব্যনিক্ষেপের প্রমাণ দিয়াছিলাম। যতীন্দ্রবাবু উহাদিগকে গণ্ডায় আণ্ডা মিলান বলিয়াছেন। কিন্তু Foucault ও নিউটনের প্রমাণ এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে; ইহাতে অবিশ্বাস করিলে যতীন্দ্রবাবুকে নূতন প্রমাণ দিয়া বুঝান কঠিন। মোটের উপর যতীন্দ্রবাবু একটি ধারণা দৃঢ়মূল মনে গাঁথিয়া লইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর নিশ্চলতা; সেটা তিনি নিজে দূর না করিলে আর কেহ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আদর্শ খাদ্য— * * * (স্বাস্থ্যসমাচার, আশ্বিন, ১৩৩৫)
অভিব্যক্তির ধাধা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার (সৌরভ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৩৫)
আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৩৫)
ইথার রাজ্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বঙ্গলক্ষ্মী, ভাদ্র ১৩৩৫)
কৎস্থ—ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৩৫)
কাঁঠাল—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (ঐ ঐ)
কুটীর শিল্প—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী (জীবনের আলো, আশ্বিন, ১৩৩৫)
কেঁচো ও কৃষি—শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুর্ত্তা (কৃষি সম্পদ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৫)
গাছের সবুজ রঙ্ হওয়ার উপকার—শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় (কৃষক, আষাঢ়, ১৩৩৫)
চাষবাসের কয়েকটী কথা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস (ঐ ঐ)
জাপানে কর্পূর কৃষি—ডাঃ শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার, এম্-এ ; ডি-এস্-সি। (স্বাস্থ্য, আশ্বিন, ১৩৩৫)
জীবতত্ত্বের অ-আ—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু (সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ভাদ্র, ১৩৩৫)
দীর্ঘজীবন—ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, (মাতৃমন্দির, ভাদ্র, ১৩৩৫)
ধূম দ্বারা বায়ুমণ্ডলের অবিশুদ্ধতা— * * * (স্বাস্থ্য সমাচার, আশ্বিন, ১৩৩৫)
নরওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ—অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, এফ্-আর-এস্, (প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩৫)
পশুসংজনন নীতি—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, এম্-এ ; এম্-আর-এ-এস্ ; এল্-এল্-বি। (জীবনের আলো, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৩৫)
প্রাকৃতিক বিধান—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৩৫)
ফসলের খাদ্য— * * * (কৃষক, শ্রাবণ ১৩৩৫)
বিশ্ব-রহস্য—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (উত্তরা, ভাদ্র, ১৩৩৫)
মধু-কথা—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৩৫)
ষ্টোভ ও বাতি—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত (মাতৃমন্দির, আশ্বিন, ১৩৩৫)
সিফিলিস্—ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল্-এম্-এস্ (স্বাস্থ্য, আশ্বিন, ১৩৩৫)
সুগন্ধের কথা—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্-সি, (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৫)

Printed and published by Sj. Raghunath Seal, B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuabazar Street, Calcutta.
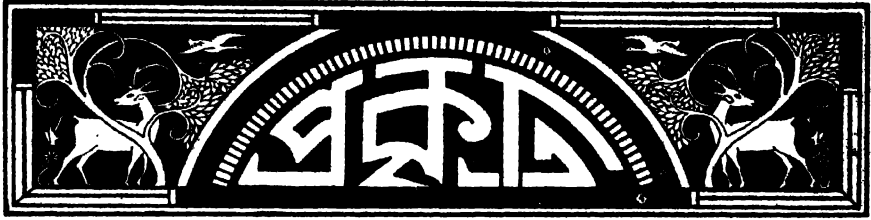
৫ম বর্ষ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ৪র্থ সংখ্যা

আসামের বনজঙ্গল

ডাক্তার শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র

আসামপ্রদেশ বিশাল হিমালয়ের প্রান্তে সুদূর চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যভাগে নাতি-উচ্চ গিরিশ্রেণী ও সুবিস্তৃত উপত্যকাসমূহে সমাবৃত এবং সুবিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদী দ্বারা পরিধৌত হইয়া সমতল বঙ্গদেশের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। চলিত কথায় ইহাকেই "আসামের জঙ্গল" বা কালাজ্বর-ম্যালেরিয়ার আদিম নিবাস বলা হইয়া থাকে। এই সুদূর ও ব্যাধিসঙ্কুল প্রদেশের নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসু উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এখানে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বাস্তবিক বড়ই দুঃখের বিষয় যে, খাঁটি উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ আজও ভারতে তেমন বেশী দেখা যায় না। শিলং-পাহাড়ের বৃদ্ধ রায়বাহাদুর কাঞ্জিলাল মহাশয়ের আসন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিৎগণের মধ্যে উচ্চ সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকটই শুনিয়াছি যে, প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে আসামের জঙ্গলে সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ওয়ালিক্ (Wallich) এবং গ্রিফিথ্ (Griffith) অনেক উদ্ভিদ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ইংরাজ সখ করিয়া অনেক উদ্ভিদের নমুনা (Specimen) শিবপুর উদ্ভিদাগারে (Harbariumএ) পাঠাইয়াছেন; তাহাদের মধ্যে কাছাড়ের ক্লিন্ (Kleen,) শ্রীহট্টের ডি সিল্‌ভা, শিবসাগরের পর্ল (Pearl), কামরূপের জেঙ্কিন্স, নাগাপাহাড়ের হাটন (Hutton) এবং শিলং-এর কাঞ্জিলাল মহোদয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক (Clarke) আসামের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অনেক উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। সার জর্জ্জ ওয়াট্ (Sir George Watt) এবং সার হেনরী কলেট (Sir Henry Collett) কর্ত্তৃক মণিপুর ও তৎসংলগ্ন উপত্যকা ও গিরিশ্রেণী হইতেও অনেক উদ্ভিদ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত

আসামের জঙ্গল-বিভাগের প্রধান রক্ষাকর্ত্তা (Conservator of Forests) ম্যান্ (Gustav Mann) আসামের নানা স্থান হইতে বহু উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া শিলং বনবিভাগের আপিসে ও শিবপুর বাগানের উদ্ভিদাগারে রাখিয়াছেন। এই সব সংগৃহীত নমুনা হইতেই শিলং-এ একটি উদ্ভিদাগারের সৃষ্টি হইয়াছে। বেশী দিনের কথা নয় বার্‌টিল্ (Burtill) আবর সীমান্ত ও খাসিয়া পাহাড়ের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এমন কি বর্ত্তমানেও Botanical Survey of Indiaর কর্ম্মচারীরা মাঝে মাঝে আসামের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অনেক উদ্ভিদের নমুনা লইয়া থাকেন। এইরূপে অনুসন্ধিৎসু বহু লোকের সহায়তায় বর্ত্তমানে শিবপুরের বাগানে আসামের প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদেরই নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। এমন কি তথা হইতে বিলাতের কিউ (Kew) ও অন্যান্য উদ্যানের উদ্ভিদাগারে আসামের উদ্ভিদের নমুনা স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু এতকাল কেবল উদ্ভিদের নমুনাই সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, উহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আসামের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার সার আর্কডেল্ আর্ল (Sir Archdale Earle)-এর এ-বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক হয় এবং তিনি আসামের "Forest Hora" নামে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য আসামের বনবিভাগকে অনুরোধ করেন। এই কাজের ভার বঙ্গের সুসন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ আসাম বনবিভাগের ভূতপূর্ব্ব Extra Assistant Conservator of Forests অবসরপ্রাপ্ত রায় বাহাদুর কাঞ্জিলাল মহাশয়ের উপর প্রদত্ত হয়। শিলং-ভ্রমণকারীরা এখনও বন-বিভাগের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্তূপাকার উদ্ভিদ-নমুনার মধ্যে কাঞ্জিলাল মহাশয়কে এই "Assam Flora" লিখিবার কাজে ব্যস্ত দেখিতে পাইবেন।*

আসামের আবহাওয়া (Climate)

সাধারণতঃ বৃষ্টি ও জমির উচ্চনীচতার দরুণ উদ্ভিদের প্রসারণ (distribution) হইতে দেখা যায় এবং তদনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবদ্ধতা (grouping) হইতে নানা প্রকারের উদ্ভিদসঙ্ঘ (Association) উৎপন্ন হইয়া থাকে। আসামের এই উদ্ভিদসঙ্ঘের মধ্যে একদিকে শাল (Shorea) এবং অন্যদিকে বাঁশের (Bamboo) সঙ্ঘ খুব বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে (prominent)। আসামের মানচিত্রের উপর নজর করিলে দেখা যায় যে, পাতকই নামে অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রাকৃতিক সীমার একদিকে বাঙ্গালী ও অপরদিকে আসামী লোকের বাস। এই পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের শিলংই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ,—৬৫৪৫ ফুট মাত্র। ইহাই আসামের রাজধানী।

* "Assam Flora"র ১ম ভাগ যন্ত্রস্থ।

বাস্তবিক শ্রীহট্ট হইতে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, খাসিয়াপাহাড় বিশাল চীনের প্রাচীরের (Chinese wall) ন্যায় সুরমা উপত্যকার উত্তরপ্রান্ত পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মাঝখানে পদ্মা ও মেঘনা নদীর মোহানা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাহাড় সমস্ত উত্তরাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং সে-জন্য এই পাহাড়গুলি দক্ষিণপশ্চিম ঝড়বাতাসের (S. W. Monsoon) মুখে একেবারে মুক্ত। অপর দিকে পূর্ব্ব সীমান্তে লুসাই (Lushai) হাফ্‌লঙ (Haflong) ইত্যাদি গিরিশ্রেণী থাকায় মেঘের গতি সাধারণতঃ এই খাসিয়াপাহাড়ের দিকেই বেশী হয়, এবং তজ্জন্য এত বেশী বৃষ্টি হইয়া থাকে যে, প্রতি বৎসর সুরমা উপত্যকা প্লাবিত

শালবন, গোয়ালপাড়া

হইয়া যায়। খাসিয়াপাহাড়ের চেরাপুঞ্জি সকলেরই পরিচিত; এখানে গড়ে ৪০০ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই চেরা সহর উপরোক্ত গিরিশ্রেণীর একটি গহ্বর- (pocket) বিশেষের মধ্যে অবস্থিত।

সুরমা উপত্যকায়—বিশেষতঃ খাসিয়াপাহাড়ে—অত্যধিক বারিপাতের প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গোপসাগরের ঝড়বাতাসের (Monsoon) গতি রোধ করিবার কোন প্রাকৃতিক অবরোধ না থাকায় অবিভক্ত মেঘরাশি বরাবর এই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া খাসিয়াপাহাড়ে আসিয়া প্রতিহত হয় এবং চতুর্দ্দিকে পাহাড়বেষ্টিত চেরাপুঞ্জিতেই অধিকাংশ বারিপাত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে মেঘরাশি খাসিয়াপাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়, সেগুলি আসামের হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিশেষভাবে জল-বর্ষণ করিয়া

থাকে। মোটের উপর এরূপ অতি বৃষ্টি হইলেও আসামের দুইটি স্থানে কিন্তু খুব কম বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১ম-টি পাতকই ও নাগা পাহাড়ের মাঝামাঝি নওগাঁও (Nowgong) জিলায় অবস্থিত; এবং অপরটি গোয়ালপাড়া ও দরং (Durrang) জিলায় হিমালয়ের পাদদেশে চম্পামতি নদী হইতে পঞ্চনদ পর্যান্ত বিস্তৃত। এই উভয় স্থলে ৪০।৫০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না এবং তজ্জন্য এতদ্দেশস্থ অধিকাংশ উদ্ভিদই পত্রপতনশীল (Deciduous); পরন্তু, যে সকল স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক সেগুলির অধিকাংশই চিরহরিৎ (Ever green) বনরাজিতে পরিশোভিত। আসামের বিখ্যাত শালবন এতদুভয়ের মাঝামাঝি স্থানে, অর্থাৎ যেখানে ১০০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না, এরূপ স্থানে অবস্থিত। কিন্তু শালবন অধিকাংশ স্থলে সাময়িক পত্রপতনশীল হইলেও, গোয়ালপাড়া ও কামরূপের কোন কোন স্থানে অধিক বৃষ্টিবশতঃ চিরহরিৎ পত্ররাজিতে শোভিত দেখিতে পাওয়া যায়। গাছপালা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক জলবায়ুসহনশীল বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে।

আসাম-উপত্যকাতে (Assam Valley), হিমালয়ের নিম্নদেশে গোয়ালপাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষীমপুর (Lakhimpur) জিলা পর্য্যন্ত অনেক ডোবা-বা বিল-(Swamp) জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বড় বড় বিল সুরমা-উপত্যকাতেও আছে; তবে এতদুভয়ের উদ্ভিদসঙ্ঘের মধ্যে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অতি প্রাচীন কালে (Geologic age) পৃথিবীর আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে জমি নীচু হইয়া যাওয়ায় এবং তন্নিম্নে আঁঠাল (Clayey)বা পাহাড়ের স্তর (Rocky bed) বর্ত্তমান থাকার দরুণ জল নিষ্কাশিত হইতে না পারায় সেগুলি বিলরূপে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে এই সব বিলের জঙ্গল বিশেষ এক রকমের (type) জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্যই ইহাদের সঙ্গে পাহাড়ি জঙ্গলের কোন সাদৃশ্য নাই।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার নদীতটে ও যে-সব-স্থানে পত্রপতনশীল জঙ্গল আছে সে-সব স্থলে, নূতনতর গাছপালার সৌন্দর্য্যপূর্ণ সবুজ ঘাসাচ্ছাদিত বিস্তৃত সমতল ভূমিও দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত আসাম প্রদেশের জঙ্গল বিশ্লেষণ করিতে হইলে উপরোক্ত চারিবিধ জঙ্গলই আলোচনা করা দরকার। পরিমণ্ডল-তত্ত্ববিদের (Ecologist) গবেষণাতে এই চারিবিধ জঙ্গলের মধ্যে কি কি উদ্ভিদশ্রেণী বা সঙ্ঘ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে বলা যাইতেছে। এই চারি শ্রেণীর জঙ্গলের নাম, যথা,—

১। চিরহরিৎ জঙ্গল (Ever green forest).

২। পত্রপতনশীল জঙ্গল (Deciduous forest).

৩। বিল জঙ্গল (Swamp forest).

৪। ঘাসাবৃত ভূমি (Grass lands).

১। চিরহরিৎ জঙ্গল

এই চিরহরিৎ জঙ্গল সদীয়াসীমান্তপ্রদেশ, লক্ষীমপুর, শিবসাগর, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি জিলার অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের পদপ্রান্তে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দরং (Darrang) জিলা পর্য্যন্ত ছোট ছোট পাহাড় গুলিতে ইহার বিস্তৃতি রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন নওগাঁও (Nowgong)-এর আসামবেঙ্গল-রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে, খাসিয়া (Khasia) পাহাড়ে এবং পত্রপতনশীল জঙ্গলের মধ্যেও স্থানে স্থানে এই চিরহরিৎ বন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্ভিদবর্গের (Families) নাম উল্লেখযোগ্য। যথা, Dillaniaceae (Karmal fam.—চালিতাবর্গ), Anonaceae (Custard apple fam.—আতাবর্গ), Magnoliaceae (Magnolia fam.—ম্যাগনোলিয়াবর্গ), Guttferea (Mangosteen fam.—ম্যাঙ্গোষ্টিন বর্গ) Leguminosae (Pea fam.—শিম্বিবর্গ), Myrtaceae (Myrtle fam—জামবর্গ), Styraceae (Benzoin fam.—লুবান বর্গ), Ebanaceae (Ebony fam.—গাব বর্গ), Myristicaceae (Nutmeg fam,—জায়ফলবর্গ), Lauraceae (Laurel fam.—কর্পূর বর্গ), Euphorbiaceae (Castor fam.—এরণ্ডবর্গ), Fagaceae (Oak fam.—ওক বর্গ) Palmae (Palm fam.—তালি বর্গ), এবং Gramineae (Grass fam.—ঘাস বর্গ)। এতদ্ব্যতীত কেবল মাত্র পাহাড়গুলিতেই নিম্ন লিখিত বর্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, Coniferae (Pine fam.—সরল কাঠ বর্গ), Vaccinaceae (Huckle-berry fam.—জলামুত বর্গ), Ericaceae (Heath fam.—হিথ্ বর্গ), এবং Ternstroemiaceae (Tea fam.—চা বর্গ)। তাছাড়া আরও অনেক ওক-বর্গীয় (Fagceous) উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে বর্গবিশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (Scattered) বা সঙ্ঘবদ্ধও থাকে, কোন স্থলে আবার উহার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না।

এই চিরহরিৎ বনরাজিকে সমতল ভূমি হইতে পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত তিনটি স্তরে (Zone) বিভক্ত করা যায়। ইহার উচ্চ স্তরে অনেক বড় বড় পত্রপতনশীল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এগুলির মধ্যে Dipterocarpus pilosus (গর্জ্জন), Artocarpus chaplasha (চাপলাস), Lagerstroemia minuticarpa (জারুল), এবং Tetrameles nudiflora (ময়না কাঠ) প্রধান। এই গাছগুলি পাহাড়ের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ত্তমান। এই সব পত্রপতনশীল গাছ খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। এগুলি দ্বিতীয় স্তরেও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায় এবং কোন কোন স্থানে বেশ প্রকট ভাবে বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের কোন কোন স্থলে Mesua ferreaর (নাগেশ্বর) বন, কোন স্থলে বা উপরোক্ত নানা বর্ণের মিশ্রিত বনরাজি বিদ্যমান। এই দ্বিতীয় স্তরেই নানাবিধ মূল্যবান বৃক্ষ পাওয়া যায়। আসামের বিখ্যাত Bansum (Phoebe) কাঠের বনও

এই স্তরেই বর্ত্তমান। ইহাই "Assam Teak" নামে অভিহিত বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে ইহার কাটতি নাগেশ্বর হইতে অনেক অধিক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও কয়েকটি ভাল কাঠের গাছ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—Terminalia myriocarpa, (হরিতকি বিশেষ), Amoora wallichii (রণা বিশেষ), Duabanga sonneratioides (বান্দর হুলা) প্রভৃতি।

তৃতীয় স্তরে যে সব ছোট ছোট গাছপালা বর্ত্তমান সেগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। এখানে নানা প্রকার লতাজাতীয় গাছ (Lianas) বিদ্যমান। যথা,—Acacia (লতানে
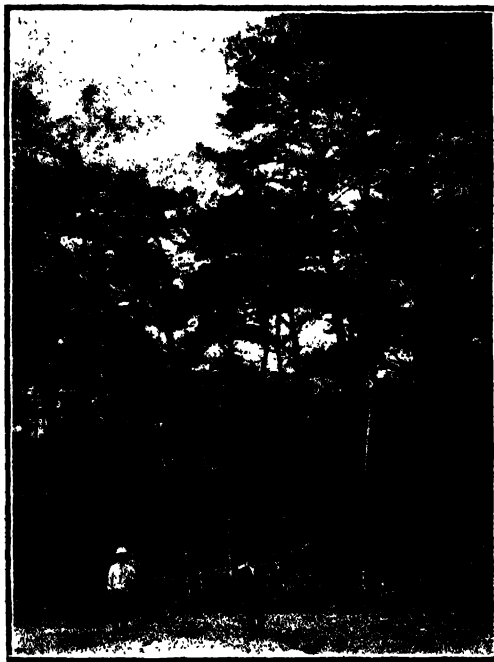
পাইনবন, খাসিয়াপাহাড়

বাবলা), Bauhunia (কাঞ্চন) Vitis (দ্রাক্ষা জাতীয় লতা বিশেষ), Unona (লতা বিশেষ) Uvaria (রাম বংঙ্গা লতা), Mezoneuron (লতা বিশেষ) Calamus (বেত) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রকমের গাছ দৃষ্ট হয়, যথা, Tapiria hirsuta (ছোট চারা গাছ বিশেষ), Entada scandens (গীলা), Dalhousica bracteata (গুপুরি), Gnetum gneum (লতা বিশেষ) প্রভৃতি।

খাসিয়াপাহাড়ের চিরহরিৎ পাইন্ (Pinus cossya) বনের দিকে লক্ষ্য করিলে

দেখা যায় যে, উহার গাছগুলি প্রায় অধিকাংশই সমবয়সী এবং সামান্য ঢালু পাহাড়ের গায়ে ২৫০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে জন্মিয়াছে। এই পাইন্ গাছের শীর্ষগুলি ছোট হইতে বড় অবস্থা পর্য্যন্ত ছত্রের ন্যায় মণ্ডিত থাকে। এইরূপ বনে লতা গাছ (Lianas) বড় একটা দৃষ্ট হয় না। পাইন্ বন সাধারণতঃ আপনা হইতে বর্দ্ধিত হয়; তবে কোন কোন স্থলে লোকেও উহা রোপন করে এবং গরু প্রভৃতি পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা ঘন বনে পরিণত হয়। পাইন্-এর সঙ্গে কয়েক রকমের ওক (Quercus), বাদামের (Castanopsis) গাছ, ভূর্জ্জ পত্র (Brich) এবং কোন কোন স্থলে Yew (সরলকাঠ বিশেষ), Hornbeam (ওক গাছ বিশেষ) এবং Podocarpus nerifolia (সরল কাঠ বিশেষ) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই পাইন্-এর বন ব্যতীত খাসিয়াপাহাড়ে আর এক প্রকার বন আছে। উহাকে খাসিয়ারা পবিত্র বন (Sacred forest) বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। সেগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের অত্যুচ্চ চূড়ায় পাইন্ বনের উপরে—বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে বর্ত্তমান। সেগুলি স্থানীয় রাজা বা প্রধান (Chief) লোকদের সম্পত্তি। এ সব জায়গায় জঙ্গল কাটা নিষেধ। এই জন্য এখানে আদিম কালের বন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সব গিরিশৃঙ্গে নানা প্রকার বিস্ময়কর উদ্ভিদ বর্ত্তমান। এই বনগুলির জন্যই বোধ হয় বর্ত্তমানে খাসিয়াপাহাড় ভারত কেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিদের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। এখানে খুব বড় বড় Magnolia, Oak এবং Laurel জাতীয় বৃক্ষ আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত এখানে অন্যান্য নানা জাতীয় গাছও বর্ত্তমান, যথা,—Dendropanax japonicum, Randia wallichii (পিয়ালু) Croton laevigatum (জয়পাল জাতীয় গাছ বিশেষ), Myrsine capitellata, Taxus bacata (সরল কাঠ জাতীয় গাছ বিশেষ), Podocarpus nerifolia, Daphniophyllum, Eriobotrya bengalevsis (লেটেকু) প্রভৃতি। এই চিরহরিৎ বনের মধ্যে ছোট ছোট ঝোপ (Shrubs), তন্নিম্নে আরও ছোট ছোট চারা গাছ (Undershrubs), এবং কোমল গাছপালা (Herbs) যদিও বড় জমকাল ভাবে দেখা যায় না সত্য এবং তাহাদের মূল্য যদিও খুব কম, তথাপি সেগুলি উদ্ভিদ হিসাবে কম দরকারী নহে। বস্তুতঃ এগুলির সংখ্যা এত অধিক যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু লেখা অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য-শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বনজঙ্গলের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভয় চলিয়া যাওয়ায় এই সব পবিত্র বনও ক্রমশঃ আবাদ হইতেছে। ফলে এই সকল আদিম বনের অস্তিত্ব আর যে কত দিন থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

২। পত্রপতনশীল জঙ্গল

আসামের পত্রপতনশীল বনের মধ্যে আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন শালের শ্রেণী এবং অধিকাংশ স্থলে খর্ব্বাকৃতি ছোট ছোট বন (Scrub forest) দেখিতে পাই; এই প্রকার জঙ্গলে গোয়াল-

পাড়া ও গাড়োপাহাড়ের অধিকাংশ আবৃত। এমন কি ইহা কামরূপ, নওগাঁও এবং উত্তরকাছাড়-পাহাড় (North Cachar Hills) গুলিতেও বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত দরং-এর পশ্চিমাংশ এবং সুরমা উপত্যকার অপেক্ষাকৃত-অল্প-বৃষ্টি-সম্পন্ন স্থানগুলিতেও এরূপ জঙ্গল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ শালের বনে দেখা যায় যে, স্থানবিশেষের পরিবর্ত্তনানুযায়ী অন্যান্য গাছও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়; সেই সকল স্থলে নিম্নলিখিত গাছগুলি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, Lagerstroemia parviflora (জারুল), Kydia calycina (পোলা), Shima Wallichii, Careya arborea (ভুঁই ডালিম) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভিদও স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, Gmelina arborea (গাম্ভার), Cassia fistula (বান্দর লাঠী), Albizzia lucida (শীল করই) Albizzia Odoratissima (সুগন্ধি শিরিষ), Milusa Velutina এবং Stereospermum chelonioides (আট্ কপালি) ইত্যাদি।

এই সকল পত্রপতনশীল বনের মধ্যে যেখানে শালের বন নাই, সে সব জায়গায় সাধারণতঃ মিশ্রিত বন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গাছগুলি দেখা যায়, যথা, Bombax malabaricum (শিমুল), Adina cordifolia (কেলিকদম্ব), Stephegyne diversifolia (কদম) Cassia nodosa (সোনালী) এবং কতকগুলি ডুমুর জাতীয় (Ficus) গাছ। এতদ্ব্যতীত শাল-বনে যে সব গাছের নাম উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলিও দৃষ্ট হয়

চিরহরিৎ বনকে যেমন বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, পত্রপতনশীল বনে তাহা করা যায় না; কারণ ইহা নানা প্রকার মিশ্রিত গাছপালা সমাকীর্ণ। এমন কি এখানে নানা রকমের ঘাসও জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু একটা বিশেষত্ব এই যে, যেখানে চিরহরিৎ গাছের বন, বা জলপূর্ণ বিল বা ডোবা (Marsh) আছে, কেবল মাত্র সেখানেই বেত (Calamus) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩। বিল জঙ্গল

যে সব নিম্ন ভূমির জলনিষ্কাশনের কোন সুবিধা নাই সেগুলি বিলে পরিণত হইয়া এক ভিন্নপ্রকার বনের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে অনেক বড় বড় বিল আছে, যাহাকে চলিত কথায় "হাওর" (Haor) বলা হইয়া থাকে। এ গুলিকে প্রাকৃতিক হ্রদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীহট্টের হাকালুকি হাওর দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল এবং প্রস্থে ৩ মাইল। এই বিলগুলি দেখিলে মনে হয় যে, নদীর গতিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গোয়ালপাড়া, দরং প্রভৃতি স্থানের বিল দেখিলে সেগুলি ভূমিকম্পের আলোড়নজনিত বলিয়াই মনে হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী এই সব বিলের কিনারাতে নিম্নলিখিত গাছপালা বিশেষ ভাবে দেখা যায়, যথা—Crataeva lophosperma (তিক্ত শাক), Engenia cuneata

(জাম বিশেষ), Duabanga sonneratioides, Terminalia myriocarpa, Lagerstroemia flos-regina, Hyptianthera stricta, Symplocos pealii (লোধ), Ardisia khasiana (বন জাম), Rhabdia lycioides, Litsaea Zeleynica এবং angustifolia (কুকুর চিতা), Homonoia riparia, Antidesma bunius (ক্ষুদি জাম) Trewia nudiflora (পিটালী), Ficus pyriformis (ডুমুর), Heterophylla cunia এবং glomerata, Eugelhardtia polystachya, Dracaena spicata, Clinogyne dichotoma (গোত্রা) প্রভৃতি। এই সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘাসগুলিও জন্মিতে দেখা যায়, যথা Hygrorhiza aristata (জঙ্গলী দল ঘাস floating), Vossia procera (দল ঘাস floating), Panicum proliferum (বোয়াতি ঘাস floating), P. Khasianum (খাসিয়া ডুলা ঘাস), P. interruptum (নরডুলা ঘাস), P. plicatum (কলস নর), P. myurus (দামছিরি ঘাস), P. crusgalii (বড় শ্যামা ঘাস), P. caesium (ঘন ডুলা ঘাস), Phragmitis communis and karka (নল ঘাস), Arundo donax (গাবা নল), Arundinella avenacea (গঙ্গাবীয়া), Thysanolaena (কাসর ঘাস), Agrostis (বীন্নাজলি ঘাস) প্রভৃতি। উপরোক্ত ঘাসগুলির কতকগুলি—যেমন Hygrorhiza, Vossia ইত্যাদি জলে ভাসমান থাকিয়া বৰ্দ্ধিত হয় এবং তজ্জন্ত হাওরের কিনারার জল অনেক দূর পর্য্যন্ত এই সব ঘাসে আবৃত থাকে।

এতদ্ব্যতীত অনেক জলজ উদ্ভিদ্‌ও পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে Nymphaeaceae (সাপ্‌লা) Araceae (কচু), Lemnaceae (শুঁড়িপানা), Eriocaulaceae, Alismaceae (রামকলা), Naiadaceae (বাইচা), এবং Cyperaceae (মাদুর কাঠী) ইত্যাদি প্রধান।

৪। ঘাসাবৃত জমি

আসামে খাঁটি ঘাসের জমি প্রধাণতঃ দুই প্রকার, যথা, (১) নদীতীরবর্ত্তী জমি এবং (২) অল্প-বৃষ্টি-সম্পন্ন জমি। প্রথমোক্ত স্থানগুলি বর্ষার সময় ভসিয়া যায়। এখানে জল কখনও এত নীচে নামে না, যাহাতে শিকড়গুলির জলাভাব হয়। এখানে নানা প্রকার ঘাস দৃষ্ট হয়, যথা—Saccharum, Anthisteria, Erianthus, Arundo, Phragmitis প্রভৃতি। বড় বড় নদীতীরবর্ত্তী খুব নীচু স্থানগুলি এই রকম ঘাস দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, আর এই ঘাসগুলি তথাকার পলিপড়া জমিতে খুব বৰ্দ্ধিত হয়। কোন কোন স্থানে এইগুলিকে ২০।২৫ ফুট লম্বা হইতে দেখা যায়। এরূপ ঘাসের বনে অনেক সময় মহিষ ও হাতীর পাল লুকাইয়া থাকিতে পারে।

অপর পক্ষে, শেষোক্ত স্থানের শুক্‌না জমিতে ঘাসগুলি সাধারণতঃ ছোট হইয়া থাকে এবং তাহাদের খড় খুব শক্ত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে কোন কোন স্থানে এরূপ ঘাসাবৃত জমির জল-সমতা (water level) ২০০-৫০০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্ত শীতকালে

শিশিরসিক্ত জমি হইতে যে অতি সামান্ত জল পাওয়া যায়, তাহতেই এরূপ ঘাস জীবিত থাকে। এরূপ শুকনা জমিতে নিম্নলিখিত ঘাস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যথা—Imperata arundinacea (উলু ঘাস), Apluda varia (গো-রোমা), Andropogon Iwarankusa (ইরাং কুশ ঘাস) A. nardus (গন্ধ-বীন্না), A. contortus (বীন্না), A. squarrosus (খস্ খস্), Pollinia ciliata, Erianthus elephantus, Panicum assamicum, Anthisteria gigantea এবং strigosa, Setaria glanca (পিঙ্গীনাচী ঘাস), Rottboellia protensa (পানসেরু ঘাস), Isachne australis, Saccharum narenga (টেঙ্গু ঘাস), Neyrandia madagas carensis, Paspalum scrobiculatum (খোদোয়া ধান), Ischoemum ciliare (মোরারো ঘাস) প্রভৃতি।

ডেবিড্ প্রেন্ (Sir David Prain) তাঁহার "Bengal plants" নামক গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালার বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন ; বর্ত্তমানে তাঁহার পুস্তক পড়িয়া আমরা বাঙ্গালার একটি গাছপালা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হইতে পারি। কিন্তু আসামের গাছপালা সম্বন্ধে জানিবার তেমন কোন সুবিধা নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আর একটি বিষয় বলিবার আছে। অনেক গাছেরই বিশেষ কোন বাঙ্গালা নাম নাই এবং পুস্তকেও তাহা পাওয়া যায় না। যদি কেহ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া সকল গাছের বাঙ্গালা নামকরণ করিয়া গাছ চিনিবার সুবিধা করিয়া দিতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে।*

ফেরেটিমা কেঁচো

সৃষ্ট জগতের শীর্ষস্থানে বসিয়া মানব সমগ্র প্রাণীজগতকে উচ্চ ও নীচ, মহৎ ও ইতর শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়াছে, এবং এই বিভাগের ফলে তথাকথিত ইতর-জীবের প্রতি সাধারণ মানবের অবজ্ঞা ও ঘৃণার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের চক্ষে ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম মানব পর্য্যন্ত একটি অক্ষুণ্ণ জীবধারা প্রতিভাত হইয়া থাকে ; সেই উদার দৃষ্টি কিন্তু অবৈজ্ঞানিক মানবের নাই বলিলেই চলে।

অথচ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জীবনধারায় যে সব বিচিত্র জটিল রহস্য থাকে, সেগুলিকে ত'

---

* রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহোদয়ের "Notes on Assam Flora" হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হওয়ায় লেখক তাঁহার নিকট ঋণী।

অস্বীকার করা যায় না। যে সমস্ত প্রাণীর সহিত পথে, ঘাটে, মাঠে আমাদের নিত্য পরিচয়, যাহাদের সহিত আমাদের নিত্য আদান প্রদান, যাহারা গোপনতার বাহিরে আমাদের দৃষ্টিপথে সদাসর্ব্বদা সঞ্চরমান—তাহাদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ত' নয়ই বরং ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। সব সময়ে এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ যে ঠিক আমাদের কৌতূহলের অভাব তাহা নহে, বরং ঘৃণা ও ভয়ই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়া থাকে। যে সব প্রাণীদিগকে দেখিলে সমগ্র দেহ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়—তাহাদের সম্বন্ধে আমরা যে-কোনরূপ একটা অদ্ভুত কল্পনা করিয়া লইয়া কাজ চালাইয়া দিয়া থাকি। আমাদের এই কুসংস্কার ও ঘৃণার আড়ালে থাকিয়া প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টিকার্য্য চালাইয়া থাকেন, কারণ সব সৃষ্টির মূলেই থাকে গোপনতা—সেই আদিম বিশ্বসৃষ্টির কুহেলিকা এবং রহস্য। নিখিল পৃথিবীর এই রহস্য কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের আলোকে উদ্‌ঘাটিত হইয়া মানবমণ্ডলীকে জ্ঞানে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতেছে।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় যে-প্রাণীটি সেইটিও কম ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি করে নাই। এক সময়ে জার্ম্মাণদেশে কেঁচোকে চলতি ভাষায় বৃষ্টিকৃমি (regenwurm) বলা হইত,—বোধ হয় বৃষ্টিধারার সহিত ইহারা ভূতলে অবতরণ করে এইরূপ একটি অদ্ভুত বিশ্বাসই এই নামকরণের মূল কারণ ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনও প্রকার কিংবদন্তী আছে কিনা তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার প্রচলিত কেঁচো বা কেঁচুয়া নামকরণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না। তবে অনুমানে বোধ হয় এই নামটি সংস্কৃত কিঞ্চুলুকঃ* শব্দের অপভ্রংশ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ দ্বারা বিশিষ্ট রূপ নিরূপণ করিয়া প্রকৃতিরাজ্যে তাহাদের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন,—ইহার ফলে আজ প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশে প্রাণিজগতের একটি মনোরম ইতিহাস আমরা দেখিতে পাইতেছি। জীবধারায় যে একটি বিশিষ্ট গতি আছে তাহা এই বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রাণীসমূহের জীবনেতিহাসের তথ্যগুলিই বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে।

ভারতে প্রাণীবৈচিত্র্যের অভাব কোনকালেই ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজ্ঞানসম্মত কোনও বিবরণ আমরা অদ্যাবধি পাই নাই। সম্প্রতি ভারতের প্রাণীর ইতিহাস মূল সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে;* কিন্তু এই অনুবাদে একদিক দিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার যেমন অভাব, অপর দিক দিয়া ইহা তেমনি নানা ভাবে অসম্পূর্ণ। যাহাই

---

* অমরকোষে কিঞ্চুলুকঃ অথবা কিঞ্চিলকঃ-মহীলতা (earthworm) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এই হেতু প্রচলিত কেঁচো কথাটি উক্ত সংস্কৃত পদের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

হউক, আমাদের দেশের প্রাণিসমূহের যে সামান্য ইতিহাসটুকু Fauna of British India নামক পুস্তকে দেখিতে পাই তাহা পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট পণ্ডিতগণের সচেষ্ট অনুধাবনের ফল। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে অধুনা তাঁহাদের পথানুসরণে আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ এই বিষয়ের গবেষণা কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন।

কেঁচোপর্য্যায়ের প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ Stephenson সাহেব (১৯২৩) Fauna of British India পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে ভারতবর্ষের কেঁচো-জাতির যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা কল্পনাতীত। এই সংখ্যা যে কিরূপ বেশী হইতে পারে তাহার উদাহরণ স্বরূপ এই স্থানে একটি গণের (genus) উল্লেখ করিলাম। এই গণের নাম ফেরেটিমা (Pheretima)। ফেরেটিমা গণের মধ্যে বাইশ জাতীয় (species) কেঁচোর শুধু ভারতবর্ষেই বাস, এবং তন্মধ্যে সাত জাতীয় কেঁচোর সম্পর্ক শুধু বাংলার মাটির সহিত। অতএব সমগ্র পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষে কেঁচোর সংখ্যা যে কত অধিক তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষীয় কোনও একটি বিশেষ কেঁচোর বিচিত্র বাহ্যগঠন ও জীবনেতিহাসের বিবৃতি। এই উদ্দেশ্যে আমরা ফেরেটিমা-গণান্তর্গত কেঁচোদের কথা তুলিব। কারণ ইহারা অল্পায়াসলব্ধ এবং বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এইস্থানে একটি জাতির নাম করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কলেজ ইত্যাদি বিদ্যাপীঠে ছাত্রেরা যে কেঁচো পরীক্ষা করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করে তাহার নাম "ফেরেটিমা পস্থুমা" (Pheretima posthuma)। যে বাহ্যগঠন এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উক্ত জাতীয় কেঁচোর সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে ফেরেটিমা-গণান্তর্গত অন্যান্য জাতির সহিত ফেরেটিমা পস্থুমার বাহ্যগঠনের বেশী প্রভেদ না থাকায় সাধারণ ভাবে এই প্রবন্ধে 'ফেরেটিমা কেঁচো'—এই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোন সময় পাওয়া যায় ও বাসস্থানের নিশানা

ফেরেটিমা কেঁচোর বাসস্থান কাহারও অজ্ঞাত নয়। সাধারণতঃ ইহাদিগকে আর্দ্র মাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—বালুকাময় শুষ্ক স্থানে ইহারা বিরল। বর্ষাকালে এক পশলা বৃষ্টির পর মাঠে, ঘাটে, পথে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদের কিল্‌বিল্ করিয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে নিশাকালে মাটি যখন শিশিরে আর্দ্র হইয়া যায়, সেই সময় ইহারা ভূগর্ভাবাস হইতে বাহির হইয়া নৈশবিহার করে এবং সূর্য্যালোক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার মাটির ভিতর লুকাইয়া পড়ে। এই দুই কাল ব্যতীত অন্য সময়ে ইহাদিগকে মাটি হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। একটু লক্ষ্য করিয়া খুঁজিলেই ইহার বাসস্থান সহজেই নিরূপণ করা যায়। আশা করি

* Sanskrit Text of Mriga-Pakshi-Sastra or the Science of Animals and Birds, originally compiled by Hamsadeva—a Jain author of 13th century. Translated into English by M. Sundracharya (1927).

অনেকেই পথে, ঘাটে, মেঠোপথের ধারে অনেক স্থলেই মাটির ছাঁচের কুণ্ডলী দেখিয়া থাকিবেন। এই গুলি কেঁচোর পরিত্যক্ত বিষ্ঠা, ইহা খারাপ কিছু নয়, শুধু মাটির গুঁড়া, কেঁচোর আকৃতিগত ভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ও প্রচণ্ড শীতে যখন উপরিস্থ মাটি শুষ্ক থাকে তখন এই সব বিষ্ঠাছাঁচ (worm-casting) প্রায়ই দেখা যায় না। স্তূপীকৃত মাটির বিষ্ঠাছাঁচ বর্ষাকালে এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে অপর্য্যাপ্ত দেখা যায়। অতএব বিষ্ঠাছাঁচের নিশানা দেখিয়া চেষ্টা করিলে সেই স্থানেই ইহাদের খুঁড়িয়া বাহির করা যাইতে পারে।

'গর্ত্তবাসা'

মাটির ভিতর গর্ত্তের মধ্যেই ইহাদের বসবাস। গর্ত্ত-বাসাগুলি (Burrows) প্রায়ই সোজাসুজি,—মাটির নিম্নে ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চি পরিধির ভিতর। দারুণ গ্রীষ্মে ও প্রচণ্ড শীতে ইহারা মাটির ছয় সাত ফুট পর্য্যন্ত নিম্নে গিয়া বাস করিয়া থাকে। মাটির ভিতর এত তলায় বাস করিবার একমাত্র কারণ এই যে, উপরিস্থ মাটি অপেক্ষা নিম্নের মাটি অধিক আর্দ্র, এবং আর্দ্র স্থানই ইহাদের একমাত্র প্রিয় বাসভূমি।

গর্ত্ত-বাসা-আবরণ ও ডারুইন্

স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের ফলে ইহারা আত্মরক্ষার জন্য এমন দু'চারিটি কার্য্য করিয়া থাকে যাহা দেখিলে মনে হইতে পারে, মন ও বুদ্ধি বলিয়া জিনিষ ইহাদের মধ্যেও কিছু পরিমাণে আছে। ছোট খাটো কাঁকর বা ঢিল দ্বারা অথবা পাতার কুচি দিয়া গর্ত্ত-বাসার বহির্মুখ ইহারা সদাসর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখে। নিস্তব্ধ নিশীথে এই সব কুচি পাতা টানিয়া আনার একটি খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহাও দেখা যায় যে, কুচি পাতার সরু দিকটা গর্ত্তবাসার ভিতর কিয়দংশ ঢুকিয়া আছে। বিজ্ঞানবিদ্‌শ্রেষ্ঠ চার্লস্ ডারুইন্* কেঁচোদের ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে বহু ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন যে পাতা টানিয়া আনার কৌশল অবলম্বনে ইহারা কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। তাঁহার লিপিবদ্ধ বিবরণীর মধ্যে পাওয়া যায় যে, ইহাদের পাতার সরু মোটা দিক বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। এই মন্তব্য আমাদের দেশের ফেরেটিমা কেঁচোর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য কিনা ঠিক বলিতে পারিলাম না। তবে পাতার কুচি গর্ত্তবাসার মুখ আবৃত করিয়া আছে, এইরূপ এ'দেশেও প্রায়ই দেখা যায়। এই আবরণ দিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম ইহারা করে, তাহার সার্থকতা দুই প্রকার; প্রথম,—নিজেকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়,—আহার্য্য আহরণ।

খাদ্য

গাছের টাট্‌কা বা গলিত পাতা ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহার অভাবে মাটির ভিতর যে সব জৈব-পদার্থ (organic material) থাকে, মাটির সহিত গ্রহণ করিয়া ইহারা তাহা নিজ জীববস্তুতে পরিণত করে। চর্ব্বি ইহাদের প্রিয় খাদ্য বলিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ঠাছাঁচের আধিক্য ইহাদের খাদ্য নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করে। পাতা বা শাকসব্জীজাতীয় আহার্য্য বেশী পরিমাণে

* Charles Darwin—Vegetable moulds and Earthworms (1881).

খাইতে পাইলে, ইহাদের বাসার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিষ্ঠাছাঁচ বেশী দৃষ্ট হয় না। যেখানে মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জৈব পদার্থ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয় সেখানে মাটির বিষ্ঠাছাঁচ স্তূপরাশিতে পরিণত হয়।

ইহারা নৈশবিহারী,—দিবাভাগে গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, এবং রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। গর্ত্তবাসা হইতে সচরাচর ইহারা সমস্ত শরীর বাহির করে না; এরূপ করিবার কারণ এই যে, কোনও প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে চক্ষুর নিমেষে গর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইবার সুবিধা আছে। বিপদের আশঙ্কা কম থাকিলে মাটির উপরে আসিয়াও ইহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে।

নৈশবিহার

সাধারণতঃ ইহারা বাসা পরিবর্ত্তন করে না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্ব সময়ে ইহারা মাটির উপর পরিভ্রমণ করে; তাহার কারণ আর্দ্র স্থান ইহাদের স্বতঃই প্রিয় এবং প্রাণধারণোপযোগী। এই সময়ে ইহারা প্রত্যহই নূতন নূতন গর্ত্ত-বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে।

বাসা পরিবর্ত্তন

কতকটা ঘৃণা এবং কতকটা অজ্ঞাত ভয়ে অনেকেই ইহাদের স্পর্শ করিতে চাহেন না। ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার ধোঁয়াটে সাদা রস নির্গত হয়; সেই রস যে বিষাক্ত নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়; তবে ঘৃণার বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। কাজেই ভয় তাড়াইতে পারিলেও ঘৃণা দূর করা কঠিন। যাহাই হউক, এই নিরুপদ্রব জীব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানসঞ্চয় করিতে হইলে ইহাকে প্রথমে মারিয়া ফেলা দরকার,—কারণ জীবিত অবস্থায় কেঁচোরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে। মারিয়া ফেলিবার একটি সহজ উপায় আছে; মেথিলেটেড্ স্পিরিট (Methylated Spirit) কিছু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া (১০ ভাগ জল ১ ভাগ স্পিরিট) তন্মধ্যে ইহাদিগকে নিক্ষেপ করিলে অত্যল্প কালের মধ্যেই সমস্ত দেহ প্রসারিত করিয়া মরিয়া যায়। এই প্রকার স্পিরিট মিশ্রিত জলে ইহারা শরীর হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত ধোঁয়াটে সাদা রস নির্গত করিয়া দেয়,—সেই রস ধুইয়া ফেলিয়া ইহাদের বহিরবয়ব পরীক্ষা করা উচিত।

কেঁচো মারিবার প্রণালী

ফেরেটিমার শরীর লম্বা ও গোলাকৃতি (চিত্র ১)। একটি পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত কেঁচোর শরীর প্রায় ৭ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। পুরোভাগ কিছু ক্ষীণ। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার সর্ব্বদেহ অঙ্গুরীয়ের ন্যায় অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক <u>অঙ্গুরীয়াংশ</u> (চিত্র ১,—১, ৮, ১৩, ৩০) (segment or metamere) নালীরূপ রেখা দ্বারা পরবর্ত্তী অঙ্গুরীয়াংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। এই প্রকার সর্ব্বশুদ্ধ ১০০ হইতে ১২০টি অঙ্গুরীয় অংশ যোগে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত একটি ফেরেটিমার শরীর গঠিত। শরীর মধ্যে একটি স্থান কিছু বিভিন্ন—এই স্থানটি মাংসপিণ্ডের ফিতা দিয়া ঘেরা বলিয়া মনে হয়। ইহাকে <u>বেষ্টনী</u> (cingulum=clitellum) (চিত্র ১ ও ২, বেঃ) বলে। বেষ্টনী তিনটি অঙ্গুরীয় অংশের স্থান লইয়া গঠিত; এই স্থানে অঙ্গুরীয় অংশের কোনও বাহ্য রেখা নাই। বেষ্টনীর

অবস্থান দ্বারা শরীরের অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। বেষ্টনীর অগ্রভাগে ১৩টি অঙ্গুরীয় অংশ, তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গুরীয়ের পৃষ্ঠাংশদেশে (dorsal side) একটি অতিক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড আছে, তাহাকে ওষ্ঠ (prostomium) (চিত্র ১ ও ২, ওঃ) কহে। উদরদেশে (ventral side) ওষ্ঠ ও প্রথম অঙ্গুরীয় অংশের মধ্যে যে ছিদ্র

আকৃতি
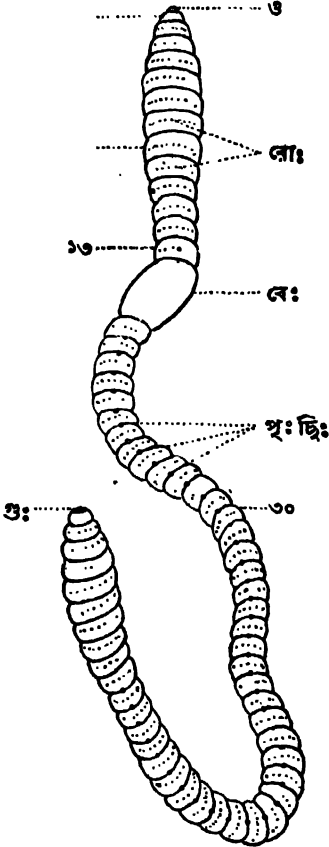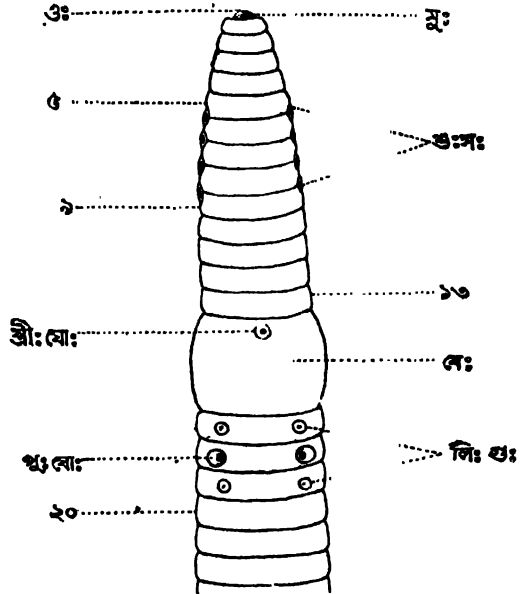
চিত্র—১ চিত্র—২

দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে মুখ (mouth) (চিত্র ২, মুঃ) বলে। শেষ অঙ্গুরীয় অংশে গুহ্যদ্বার (anus) (চিত্র ১, গুঃ) অবস্থিত। ইহার পৃষ্ঠদেশ উদরদেশ অপেক্ষা কিছু অধিক কৃষ্ণবর্ণ; পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে যে আরও একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা লম্বালম্বি দেখা যায়, তাহা দেহপ্রাকারমধ্যস্থিত একটি লম্বা পেশী (longitudinal muscle)। ইহাদের সর্ব্বশরীর মসৃণ, স্বচ্ছ, উপত্বকে (cuticle) আবৃত।

উদরদেশে পুং ও স্ত্রী-যোনিছিদ্র আছে। স্ত্রীযোনিছিদ্র (female generative

apertare) (চিত্র ২, স্ত্রীঃ যোঃ) একটি এবং ইহা বেষ্টনীর পুরোভাগে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ অঙ্গুরীয় অংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সপ্তদশ হইতে উনবিংশ অঙ্গুরীয় অংশত্রয়ে ছয়টি ছিদ্র আছে ; তন্মধ্যে অষ্টাদশ অঙ্গুরীয়াংশের উদরদেশের দুই পার্শ্বে দুইটি পুংযোনিছিদ্র (male generative aperture) (চিত্র ২, পুঃ যোঃ) অবস্থিত। সপ্তদশ ও উনবিংশ অঙ্গুরীয় অংশদ্বয়ের উদরদেশে ও পুংযোনিছিদ্রের সমান্তরালে চারিটি গুল্ম আছে,—তাহাদের ছিদ্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক উহারা ছিদ্র নহে। ইহাদিগকে লিঙ্গগুল্ম (genital papillæ) (চিত্র ২, লিঃ গুঃ) বলা হয়।

উদর-পার্শ্বস্থিত (ventro-lateral side) ৫।৬, ৬।৭, ৭।৮ ও ৮।৯ অঙ্গুরীয়াংশের প্রত্যেকটির দুই পার্শ্বে একটি করিয়া শুক্রসঞ্চয়াশয় ছিদ্র (spermathecal aperture) (চিত্র ২, শুঃ সঃ) আছে। ইহাদের মোট সংখ্যা আটটি। শুক্রসঞ্চয়াশয়গুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।
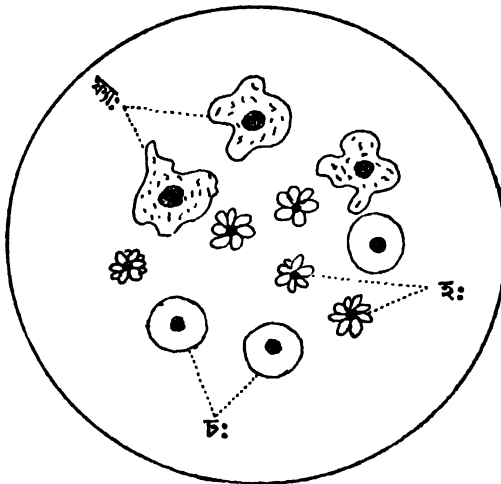
চিত্র—৩

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে স্পিরিট মিশ্রিত জলের মধ্যে ইহারা ধোঁয়াটে সাদা রস নির্গত করে। সেই রসকে শরীরগাহ্বরিক রস (cœlomic fluid) বলে। দেহ-প্রাকার (Body-wall) ও আহার-নালীর (alimentary canal) মধ্যস্থিত স্থানকে শরীর-গহ্বর বলে—এই স্থানেই উক্ত রস সঞ্চিত হইয়া থাকে। শরীরগাহ্বরিক রস নির্গমনের জন্য পৃষ্ঠ-দেশে দুইটি অঙ্গুরীয়াংশের নালীবৎ রেখাসমূহের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, তাহাকে পৃষ্ঠ-ছিদ্র (dorsal pore) (চিত্র ১, পৃঃ ছিঃ) বলে। ফেরেটিমা কেঁচোতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অঙ্গুরীয় অংশের সংযোগস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই ছিদ্রগুলি বর্ত্তমান। প্রথম চিত্রে মাত্র

কতকগুলি পৃষ্ঠছিদ্র দেখান হইয়াছে। এই রসপদার্থকে ইহারা পিচকারীর মত ১০।১২ ইঞ্চি দূর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিতে পারে। জীবিত অবস্থায় কেঁচোকে পাশাপাশি চাপ দিলে উক্ত রস নির্গত হইতে দেখা যায় এবং তাহা দেখিয়া পৃষ্ঠছিদ্রের অবস্থান সহজেই নিরূপণ করা যায়। এই রসের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে স্থির করিতে হইলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এই রস লবণাক্ত জলে (normal saline solution) (১০০০ ভাগ জলে ৬ ভাগ লবণ) মিশ্রিত করিয়া দেখা যুক্তিসঙ্গত। মাটি হইতে যে সব জীবাণু ও বীজাণু ইহাদের শরীর আক্রমণ করে, তাহাদিগকে ইহারা এই রস দ্বারা মারিয়া ফেলে। শরীর-গাহ্বরিক রসের মধ্যে নিম্নলিখিত তিন প্রকার কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে তাহাদের চিত্র দেওয়া হইল।

শরীরগাহ্বরিক রস

(ক) ফ্যাগোসাইট কোষ (phagocytic cell) (চিত্র ৩, ফ্যাঃ)। ইহারা বৃহদাকার এবং ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জীববস্তু বা কোষবস্তুর (cytoplasm) মধ্যে বহু জীবাণু দেখা যায়। 'আমিবার' মত ইহাদের আকৃতির একটি সঠিক গঠন নাই। ইহাদিগকে শরীররক্ষী কোষ বলা যাইতে পারে।

(খ) হরিদ্র-কোষ (yellow cell) (চিত্র ৩, হঃ)। ক্ষুদ্র, কিন্তু সংখ্যায় প্রায় ফ্যাগোসাইট কোষের সমান। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা পাপ্‌ড়ি-খোলা ফুলের মত্‌ন। শারীরক্রিয়ার ফলে দেহের মধ্যে যে সমস্ত অতিরিক্ত ও অব্যবহার্য্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা হরিদ্র-কোষরূপে বৃদ্ধি পায় এবং পৃষ্ঠছিদ্র হইতে নিঃসৃত রসের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। ইহারা জীবাণু মারিতে পারে না।

(গ) চক্র-কোষ (circular cell) (চিত্র ৩, চঃ)। গোল, সংখ্যাও অল্প নয়। ফ্যাগোসাইট কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও হরিদ্রকোষ হইতে কিছু বড়। ইহারাও শরীররক্ষী।

এই রস ক্ষার জাতীয়। সন্দেহ হইতে পারে যে, পৃষ্ঠছিদ্র দিয়া ইহা সর্ব্বদাই নির্গত হয়, কিন্তু তাহা হয় না। পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণবর্ণ লম্বা পেশী পৃষ্ঠছিদ্র-পথের সমান্তরালের অবস্থানের জন্য ইহারা ছিদ্র ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে।

চলিবার ফিরিবার জন্য সমস্ত শরীরব্যাপী এক প্রকার বিশেষ পদ আছে, যাহার জন্য এই শ্রেণীগত প্রাণীদিগকে রোমপদী (chætopoda) বলা হয়। প্রথম নিরীক্ষণে ইহা ভাল বুঝা যায় না; রোম যে আছে তাহা বুঝিতে হইলে একটি কেঁচোকে হস্তের উপর পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া টানিলে বেশ খস্‌খসে মনে হয়। ফেরেটিমাতে এই রোমগুলি এক একটি অঙ্গুরীয় অংশের মধ্যস্থলে চক্রাকারে চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। কেঁচোর প্রসারিত অবস্থায় যে একটু সাদা রেখা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইটিই রোমশ্রেণীরেখা (চিত্র ১, রোঃ)। প্রথম ও শেষ অঙ্গুরীয় অংশে এবং বেষ্টনীতে কোনও প্রকার রোম দেখা যায়

না। এক একটি অঙ্গুরীয় অংশে বহু রোম সন্নিবেশিত ; ইহারা শরীর হইতে অল্প পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে এবং অবশিষ্টাংশ দেহপ্রাকারের মধ্যে নিমজ্জিত।

দেহপ্রাকারের গঠন

দেহপ্রাকার (Body-wall) ও রোমের (setæ) গঠন ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য এই স্থানে দেহপ্রাকারের কিয়দংশের (আড় ছেদনের = transverse section) চিত্র দেওয়া হইল।

দেহপ্রাকারের কতকগুলি স্তর (layer) আছে :—

(১) উপত্বক (cuticle) (চিত্র ৪, উঃ ত্বঃ)—ত্বকনিঃসৃত পদার্থের দ্বারা গঠিত এবং অস্ফুট দীপ্তিময় (iridescent)।
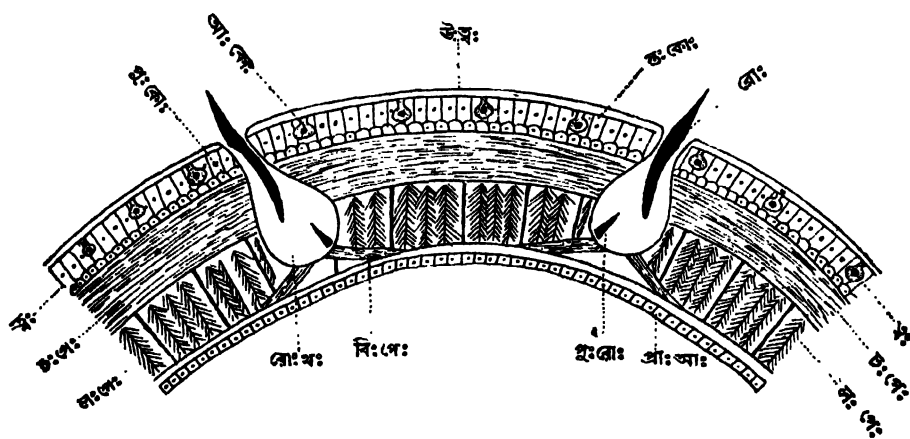
চিত্র—৪

(২) ত্বকস্তর (epidermal layer) (চিত্র ৪, ত্বঃ)—ইহা তিন প্রকার কোষে গঠিত।

(ক) আমগ্রন্থি কোষ (mucous gland cell) (আঃ কোঃ)

(খ) স্তম্ভকোষ (columnar cell) (স্তঃ কোঃ)

(গ) পুনর্গঠনীকোষ (replacing cell) (পুঃ কোঃ)

আমগ্রন্থিকোষ দ্বারা ইহারা আমরস (mucous secretion or slime) নিঃসৃত করে। এই জন্য ইহাদের শরীর সর্ব্বদা আর্দ্র দেখায়। এই সমস্ত কোষ স্তম্ভকোষের মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত।

পুনর্গঠনীকোষ অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে—যখন উক্ত কোষদ্বয় খসিয়া পড়ে, তখন ইহারা তাহাদের স্থান অধিকার করে। বেষ্টনী-ত্বকের অভ্যন্তরে আমগ্রন্থির সংখ্যাবাহুল্য হেতু ইহাকে স্থূল দেখায়।

(৩) পেশীস্তর (muscular layers) দুই প্রকার :—

(ক) চক্রপেশীস্তর (layer of circular muscles) (চঃ পেঃ)

(খ) লম্বপেশীস্তর (layer of longitudinal muscles) (লঃ পেঃ)

এই দুই প্রকার পেশীস্তর থাকার দরুণ ইহারা শরীর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে সমর্থ।

(৪) শরীরগাহ্বরিক প্রাকারাবরণ স্তর (parietal layer of cœlomic epithelium) (প্রাঃ আঃ) এক সারি কোষের দ্বারা গঠিত।

রোম (setæ) (চিত্র ৪, রোঃ) একটি রোমকথলীর (setal sac) (চিত্র ৪, রোঃ থঃ) ভিতর অবস্থিত। এই থলী ত্বকস্তর হইতে গঠিত হয় এবং ইহার মধ্যে একটি করিয়া অতি ক্ষুদ্র পুনর্গঠনী রোম (replacing seta) (পুঃ রোঃ) দেখা যায়। থলীর তলদেশে বিশেষ পেশী (special muscle) (বিঃ পেঃ) থাকার দরুণ ইহারা রোম বাহির করিতে ও ভিতরে টানিয়া লইতে পারে। রোমগুলি দেখিতে অনেকটা ইংরাজী '*f*'এর মতন।

দুই প্রকার পেশীস্তর ও রোমশ্রেণী ইহাদের পরিভ্রমণের প্রধান সহায়। অগ্রগতির সময় ইহাদের শরীর পর্য্যায়ক্রমে ছন্দে ছন্দে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে এবং রোমগুলিকে মাটিসংলগ্ন করিয়া ইহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে। রোমসকল গতিনির্ণয়েও সাহায্য করিয়া থাকে। মাটি যদি নরম হয় তবে ইহারা শুধু সম্মুখ ভাগের সরু মুখ মাটিতে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শরীর সঙ্কুচিত করে; তাহাতে ছিদ্রপথের প্রসারণ হয়—এই প্রকারে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহারা তাহাদের গর্ত্তবাসা প্রস্তুত করিয়া লয়। আবার দরকার হইলে মাটি কাটিয়া অর্থাৎ মাটি খাইয়া ফেলিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করে। প্রয়োজন বুঝিলে ইহারা গর্ত্তের চারিদিক আমরস দ্বারা আর্দ্র করিয়া রাখে।

গতি

ফেরেটিমার মত সর্ব্বজাতীয় কেঁচোতেই রোমশ্রেণী যে চক্রাকারে দেখা যায় তাহা নয়; অন্যান্য এরূপ রোমপদী কেঁচো অনেক আছে যাহাদের রোমসংখ্যা ইহাদের চেয়ে কম এবং এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এই গণান্তর্গত জাতিসমূহে চক্রকার রোমশ্রেণী (perichaetine type) থাকার দরুণ রোমপদী-বিশেষজ্ঞ বেডার্ড সাহেব [১] বলেন—

গমনাগমন ও বেডার্ড সাহেবের মত

"This circular ring of setæ would seem to be a character specially suited to an underground life where there is an equal pressure all round the body and where progression would seem, therefore, to be best attained by a continual leverage round the circular body."

বেডার্ড সাহেব আরও বলেন যে তাহারা অগ্রগমনের জন্য মুখগহ্বরের (Buccal cavity) সাহায্য লইয়া থাকে। মুখগহ্বর সেই সময় শোষক নলের (sucker) কার্য্য করে। এই

১। Beddard, F. E.,—Earthworm and their allies (1912) P. 56

শোষক-নলরূপ-মুখগহ্বর পুরোভাগের মাটি কামড়াইয়া ধরে এবং শরীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে ; এবং ইহা হইতে বেডার্ড অনুমান করিয়াছেন যে, এইরূপ মুখগহ্বর থাকার দরুণ ইহারা বৃক্ষাদি আরোহণ করিতেও সমর্থ। ইহা যে ভ্রান্ত ধারণা তাহা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ করম নারায়ণ বহ্‌ল[২] সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম,—

অধ্যাপক করম নারায়ণ বহ্‌লের মত

"I doubt if the protruded buccal cavity functions as a sucker and aids the worm in locomotion. After a prolonged observation of worms kept on moist blotting paper, I am led to believe that locomotion is brought about only by the setæ and muscles of the body-wall ; and that the buccal cavity serves the same purpose in the process of feeding as the upper and lower lips of animals."

ডাঃ করম নারায়ণ ব্লটিং কাগজের উপর কতকগুলি কেঁচো ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছেন যে, ওষ্ঠ বা মুখগহ্বর উহাদের গতিবিধিকে কোনরূপেই সাহায্য করে না। অনেকের কিন্তু ধারণা যে, যদিও বন্ধুর ক্ষেত্রের উপর দিয়া গতায়াত করিবার সময় ইহাদের রোম এবং পেশীগুলিই যথেষ্ট, তবু ইহারা যে ওষ্ঠ ব্যবহার করিবে না এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ওষ্ঠ দিয়া কামড়াইয়া ধরিতে হইলে অমসৃণ ক্ষেত্র চাই, এবং উক্ত রূপ কামড়াইয়া ধরিলে ইহারা শরীর সঙ্কোচন যে সহজেই করিতে পারিবে এবং তাহার ফলে গতিক্রিয়ার যে প্রচুর সাহায্য পাইবে, এরূপ বিশ্বাস সহজে দূর করা কঠিন। অনেকের মুখে শুনা যায় যে, ইহারা বৃক্ষারোহণে সমর্থ। বৃক্ষারোহণ করিতে হইলে ওষ্ঠের একান্ত প্রয়োজন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। করম নারায়ণের মত ধরিয়া লইলে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব ইহারা বাস্তবিকই বৃক্ষারোহণে সমর্থ কিনা তাহার সত্যতা নিরূপিত হওয়া দরকার ; কারণ এই তথ্য সংগ্রহের ফলে ওষ্ঠের এইরূপ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। Latter সাহেব Natural History of Common Animals-এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, তিনি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, বিলাতি কেঁচো (অর্থাৎ Lumbricus) সোজা দেওয়ালের উপর উঠিতে পারে। আমাদের দেশের কেঁচোও কতকটা উঠিতে পারে বলিয়া আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; কাজেই এ বিষয়ে প্রামাণিক কিছু বলা কঠিন।*

বৃক্ষারোহণ মন্তব্য

২। Karm Narayan Bahl,—Pheretima (1926) P. 19

* সম্প্রতি আমি ইহাদের মসৃণ জিনিষের গা' বাহিয়া সোজা উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। এবিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধান না করিয়া সঠিক কিছু এখন বলিতে চাহি না।—লেখক

আর্দ্র স্থান ইহাদের জীবন ধারণের প্রধান সহায়; শুষ্ক স্থানে ইহারা অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না,—একথা পূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়ার বিশেষ কোন যন্ত্র ইহাদের নাই,—ত্বকই এক্ষেত্রে ইহাদের প্রধান যন্ত্র। ত্বকের ভিতর বহু রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ুমধ্যস্থিত অক্সিজেন-গ্যাস সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। এই গ্যাস লইবার জন্ম ইহারা সদাসর্ব্বদা শরীর আর্দ্র রাখে।

শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালী

কেঁচোরা উভলিঙ্গ (hermaphrodite) অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী উপস্থ (male and female generative organs) একই প্রাণীর দেহে দেখা যায়। একই কেঁচোর দেহে শুক্র ও ডিম্ব (sperm and ova) থাকিলেও উহাদের মিলিত হইবার কোন উপায় বা প্রণালী নাই; সেই জন্ম প্রজননক্রিয়া দুইটি প্রাণী ব্যতিরেকে হয় না। সংযোজন কালে উভয়ে শুক্রবীজের বিনিময় করে; কিন্তু উক্ত শুক্রবীজ তৎক্ষণাৎ ডিম্বকে সঞ্জীবিত করে না—ইহাই এই বিনিময়ের বিশেষত্ব। বাহ্য গঠনের বিবরণ কালে স্ত্রীযোনি-ছিদ্র ও পুংযোনিছিদ্র সকলের উল্লেখ করিয়াছিলাম। (দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

লিঙ্গনির্ণয়
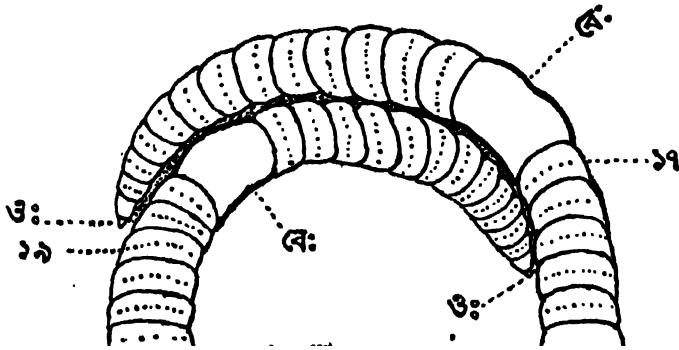
ভূঃ রেঃ

চিত্র—৫

বর্ষাকালে ও আশ্বিনকার্ত্তিক মাসে উপরিস্থিত মাটি যখন বেশ আর্দ্র থাকে, তখন রাত্রিকালে ইহারা সংযোজনকার্য্যে নিযুক্ত হয়। দুইটি কেঁচো পাশাপাশি গর্ত্তবাসা হইতে শরীরের তিন-চতুর্থাংশ বাহির করিয়া দেয়; এবং গর্ত্ত হইতে নির্গত দেহের অংশদ্বয় একটি অপরের উপর স্থাপন করে। একটির উদরদেশ অপরের উদরদেশের উপর স্থাপিত হয়, এবং একটির মুখ অপরটির লেজের দিকে থাকে (চিত্র ৫)। ইহারা এমনভাবে নিজেদের সংযুক্ত করে যে, একটির পুংযোনিছিদ্রদ্বয় (অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্গুরীয়) অপরটির শুক্রসঞ্চয়াশয় ছিদ্র-

সংযোজনক্রিয়া ও শুক্রবিনিময়

গুলির নিকট অবস্থিত হয়। সংযোজনক্রিয়ার দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য গ্রন্থিসকলের রস এবং রোমকশ্রেণী খুবই সাহায্য করিয়া থাকে। তৎপরে ইহাদের শুক্র বিনিময় হয়, একটির পুরুষযোনিছিদ্রদ্বয় হইতে শুক্র একটি অস্থায়ী নালী দিয়া অপরটির শুক্রসঞ্চয়াশয়-ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। এই সময়ে স্ত্রীযোনিছিদ্র কোন কার্য্যই করে না। শুক্র-সঞ্চয়াশয়গুলি শুক্রবীজে পরিপূর্ণ হইলে উহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। ঐ শুক্রবীজ শুক্রসঞ্চয়াশয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। এই সব ব্যাপার ফেরেটিমাতে (বিশেষতঃ ফেরেটিমা পস্থুমাতে) ভাল করিয়া আজও পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা হয় নাই। আমাদের দেশে অধ্যাপক করম নারায়ণ বহ্‌ল এই তত্ত্বানুসন্ধানে বর্ত্তমানে নিযুক্ত আছেন।*

সংযোজন কার্য্যের পর কাল ও স্থান সুবিধাজনক হইলে বেষ্টনীস্থ গ্রন্থিসকল এক প্রকার রস ক্ষরণ করে এবং উহা বাতাসের সংস্পর্শে শক্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহাকে গুটী (Cocoon) বলে। চতুর্দ্দশ অঙ্গুরীয়ের নিকট অবস্থানকালে ইহার মধ্যে স্ত্রীযোনিছিদ্র হইতে ডিম্বাণু পড়িয়া থাকে; যখন গুটী পুরোভাগে অগ্রসর হইতে থাকে তখন শুক্রসঞ্চয়াশয়ছিদ্র হইতে শুক্রবীজ গুটীর মধ্যে পড়ে। ডিম্ব ও শুক্র মিলিয়া ভ্রূণ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বভাগের অঙ্গুরীয় অংশসকল হইতে ভ্রূণের খাদ্যের নিমিত্ত শ্বেত শর্করা বা শ্বেত পদার্থ (albumen) নিঃসৃত হয়। যখন ঐ গুটী সম্পূর্ণ খুলিয়া যায় তখন ইহার দুই দিক বন্ধ হইয়া যায়। মাটির মধ্যে কিয়দ্দিবস পড়িয়া থাকিবার পর গুটীর মধ্য হইতে বাচ্ছা বাহির হয়। গুটীর মধ্যে দুই তিনটি ডিম্ব থাকিতে পারে বটে, কিন্তু দেখা যায় যে, একটি গুটীর মধ্য হইতে একটি বাচ্ছাই বাহির হয়।

প্রজনন ক্রিয়া

বহির্জগতের সহিত জীবজগতের যে সম্বন্ধ তাহা ইন্দ্রিয়বিকাশ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ স্থাপনকল্পে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। সমভাবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ আমরা উচ্চতর প্রাণীতে দেখিতে পাই, কিন্তু কেঁচো জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই না। তবে কার্য্যের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বের কথা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

ইন্দ্রিয়

* অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, গত বৎসর ডাঃ করম নারায়ণ বহ্‌ল Eutyphœus waltoui নামক এদেশীয় একটি কেঁচোর সংযোজনক্রিয়া ও শুক্রবিনিময়প্রণালী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা দ্বারা অনেক তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (On the Reproductive Processes of Earthworms: Part I. The process of Copulation and Exchange of Sperms in Eutyphœus waitoui Mich. By Karm Narayan Bahl, Q. J. Micros Sci., London, Vol. 71. Part 111, 1927, pp. 479-502. দ্রষ্টব্য) উপরি লিখিত বিবরণ খুব সাধারণ ভাবে লিখিত,—কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য নহে। ডাঃ বহ্‌লের লিখিত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক

স্পর্শেন্দ্রিয় (tactile sense) এই শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ বলিয়া খ্যাত আছে। এই ইন্দ্রিয় ইহাদের সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত এবং ত্বকস্তরের কোষ মধ্যে লুক্কায়িত। শরীরের কোন স্থানে কোনও কিছু দিয়া স্পর্শ করিলে ইহারা দেহ সঙ্কুচিত করে। শব্দ ইহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু শব্দের স্পন্দনে ইহারা সাড়া দিয়া থাকে। এই প্রকার অনুভূতিকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের একটি বিশিষ্ট বিকাশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ডার্‌উইনের পরীক্ষাতে জানা গিয়াছে যে, পিয়ানোর সুরে ইহারা কোনও প্রকার সাড়া দেয় না, তবে শব্দতরঙ্গ সুবিধামত তরঙ্গায়িত হইয়া উহাদের নিকট পৌঁছাইলে, উহারা সাড়া দিয়া থাকে। টব মধ্যস্থিত কেঁচোকে প্রথমে মাটিতে এবং পরে পিয়ানোর উপর রাখিয়া খুব জোরে পিয়ানো বাজাইয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

স্পর্শেন্দ্রিয় বনাম শ্রবণেন্দ্রিয়

জগতে অন্ধের চেয়ে দুঃখী আর কেহ নাই,—সেই দর্শনেন্দ্রিয় ইহাদের গঠিত হয় নাই। তবে কি ইহাদের আলোকানুভূতি নাই? জানা গিয়াছে ইহাদের শরীরের অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগের কতকগুলি অঙ্গুরীয় অংশ আলোকরশ্মিপাতে সাড়া দিতে পারে। অন্ধকার রাত্রে যখন ইহারা নৈশবিহারে বাহির হয় তখন ইহাদের উপর তীব্র চকিত আলোক পতিত হইলে ইহারা অচিরে ভূগর্ভাবাসে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাদের অনুভূতির তীব্রতা বা স্বল্পতা আলোক-রশ্মির প্রাখর্য্য বা ক্ষীণতার উপর নির্ভর করে। অল্পালোকে ইহাদের গতিবিধির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। তীব্র আলোক ইহাদের সহনাতীত। এই আলোকরশ্মি অনুভব করিবার শক্তি সম্বন্ধে একজন ইংরাজ অনুসন্ধিৎসু বলিয়াছেন যে, দেহপ্রাকারমধ্যস্থিত ত্বকস্তরে একরূপ কোষ আছে, যদ্বারা ইহারা আলোক অনুভব করিতে পারে এবং এইরূপ কোষকে তিনি আলোক-কোষ (light cell) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সব কোষ ইহাদের অগ্রভাগের ত্বকস্তরে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত।

দর্শনেন্দ্রিয়

প্রাণীদের মধ্যে খাদ্যমনোনয়ন শক্তির যে বিকাশ দেখিতে পাই তাহাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ইহাদের কোনও রসনেন্দ্রিয় নাই, অথচ খাদ্যাখাদ্য বিচারে ইহাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। চর্ব্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ, পেঁয়াজকলির পাতা ইহারা তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া থাকে। এই সব নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিয়া কিছু যে থাকিতে পারে তাহা এই আহার্য্য নির্ব্বাচনের শক্তি হইতে সহজেই অনুমিত হয় না কি?

রসনেন্দ্রিয় বনাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়

ইহাদের শত্রুর সংখ্যা অগণিত। এখানে প্রধান ও প্রবল শত্রুগুলির নামোল্লেখ করিলাম। যথা—ছুঁচো, পাখী, সাপ, গোসাপ, বেঙ, মৎস্য, ইত্যাদি। মানুষকেও শত্রুদের মধ্যে গণনা করিব কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

শত্রু

কেঁচোর গতিবিধি এত মন্থর যে অধিকাংশ সময়ে পাখী বা অন্যান্য শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত

হইয়া দেহের অংশবিশেষ হারাইয়া বসে; কিন্তু বিনষ্ট অথবা ছিন্ন অংশকে ইহারা এত সহজে পুনর্গঠন করিয়া লইতে পারে যে, মনে হয় প্রকৃতি যেন ইহাদের আত্মরক্ষার অক্ষমতাকে অপর দিক দিয়া পূরণ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে দেহের কতক অংশের পুনঃসৃষ্টিকে নবোৎপত্তি (regeneration) বলা হয়। সামনে কি পিছনের কতকগুলি অঙ্গুরীয় ছেদনের পর দেখা গিয়াছে যে, তাহারা আবার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ'শক্তির কথা আমার পাঠকপাঠিকাগণের নিকট নূতন জিনিষ নহে। তাঁহারা একথা কেহ কেহ হয়ত শুনিয়াছেন, আবার কেহ বা প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। এই বিষয়ে যে সমস্ত বিশদ তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলাম।

নবোৎপাদিকা শক্তি

পুরোভাগের প্রথম অঙ্গুরীয় হইতে অষ্টাদশ অঙ্গুরীয়ের মধ্যে কোনও স্থান দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, আর একটি নূতন পুরোভাগ গঠিত হইয়াছে,—কর্ত্তিত পুরোভাগটি
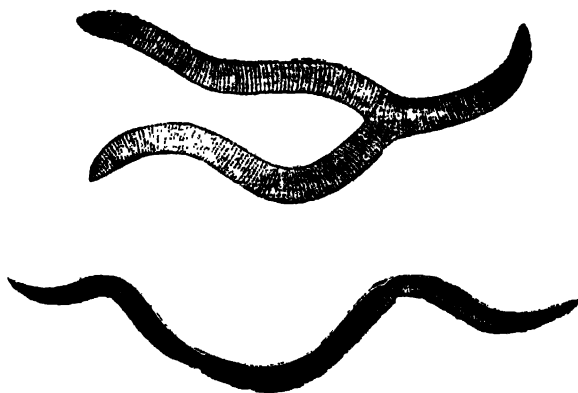
চিত্র—৬

বিনষ্ট হইয়াছে। পুরোভাগের প্রথম অঙ্গুরীয় অংশের একটি কর্ত্তিত হইলে একটি, দুইটি কর্ত্তিত হইলে দুইটি নূতন অংশের সৃষ্টি হয়; কিন্তু পাঁচটি অঙ্গুরীয় অংশের বেশী কর্ত্তিত হইলে পাঁচটির বেশী আর পুনর্গঠিত হয় না।

অষ্টাদশ অঙ্গুরীয়াংশের পরস্থিত অংশ দ্বিখণ্ডিত করিলে দেখা যায় যে, আর একটি দেহপ্রান্ত বা পশ্চাদ্‌ভাগ (tail end) গঠিত হইয়াছে। এরূপ পুনর্গঠিত প্রাণীর মুখ না থাকাতে অনাহারে মরিয়া যায়। কর্ত্তিত পুরোভাগটিতেও আর একটি দেহপ্রান্ত বা পশ্চাদ্‌ভাগ গঠিত হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে গুহ্যদ্বার অঙ্গুরীয় অংশ (anal segment) গঠিত হয় এবং পরে নব নব অঙ্গুরীয় অংশ উক্ত দুটি অংশের মধ্যে পুনঃ সন্নিবেশিত হইতে থাকে। এরূপ প্রাণী বাঁচিয়া থাকে, কারণ ইহার অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগ দুই-ই আছে।

কর্ত্তিত অংশ সম্মিলিত করিবার শক্তিও ইহাদের আছে। ইহাকে কলম করা (grafting) বলে। তিনটি কেঁচোকে এমনভাবে কলম করা যায় যে, সমস্তগুলি মিলিয়া একটি প্রকাণ্ড কেঁচোতে পরিণত হয় (চিত্র ৬, ক)। কোনও একটি কেঁচোর পশ্চাদ্‌ভাগ আর একটির পশ্চাদ্‌ভাগের সঙ্গে কলম করিলে দেখা যায় —ইহার দুইটি মুখ ও একটি দেহপ্রান্ত (চিত্র ৬, খ) গঠিত হইয়াছে। এরূপ প্রাণী কতদিন বাঁচিয়া থাকে তাহা জানা যায় নাই। এই সমস্ত পরীক্ষা করিতে হইলে অঙ্গুরীয়াংশের কলম করার স্থানটি প্রথমে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

কলম

এই অবজ্ঞাত প্রাণীটি মানবের যে কত উপকার সাধন করিতেছে তাহা আমরা জানি না বলিলেই হয়। যাঁহারা ছিপে মাছ ধরিতে ভালবাসেন তাঁহারা ইহাদের উপকারিতার কথা সানন্দে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইহা ব্যতীতও ইহাদের অন্য উপকারিতা কম নয়। আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মতে কেঁচো হইতে অনেক মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়। সরিষার তেলে ইহাদের ভাজিয়া সেই "মহীলতা তৈল" যে কোন প্রকার ক্ষতস্থানে লেপন করিলে উহা আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রয়োগ আমাদের দেশ হইতে ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। ঔষধ হিসাবে ইহার মূল্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র এখনও স্বীকার করেন না।

উপকারিতা

ঘৃণা ও অবজ্ঞার আড়ালে থাকিয়া ইহারা কৃষিকার্য্যে আমাদের যে উপকার সাধন করে তাহা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক, তেমনি বিস্ময়কর। হল ও লাঙ্গল উদ্ভাবিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রাকৃতিক উপায়ে ভূমি কর্ষিত হইয়া যেটুকু উর্ব্বর হইয়া উঠিত তাহা এই সব ইতর প্রাণীর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা। কেঁচোর মাটিকাটা বা চাষসহায়ক ক্রিয়া সম্বন্ধে ডারউইন্ যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটা জিনিষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, যেস্থানে কেঁচোরা মাটি কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, সেখানে নিম্নের মাটি বিষ্ঠাছাঁচরূপে উপরে আসে এবং উপরস্থ জিনিষগুলিকে আবৃত করিয়া মাটিকে বীজাণু ও রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ, গর্ত্তবাসানির্ম্মাণের ফলে নিম্নের মাটি আল্‌গা হইয়া যাওয়ায় বাতাসের চলাচল সুগম হয়।

মাটির বিষ্ঠাছাঁচ চারা-গাছ ও বীজ বর্দ্ধনে খুবই সহায়ক এবং তৎসঙ্গে উন্মুক্ত আল্‌গা মাটির ভিতর বাতাস-প্রবেশ সুগম হওয়ায় মূলের দ্রুত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কর্ষণ দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি-বর্দ্ধনে সাহায্য করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোনও প্রাণীর ইতিহাসে বিরল।

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেঁচোর জীবনেতিহাস আলোচনার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা কি—এরূপ প্রশ্ন অনেককেই দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। বাণীর বীণামন্দিরে বসিয়া কবিগণ যে পূজা করিয়া আসিতেছেন তাহার সার্থকতা যেরূপ বিপুল, মৌন প্রকৃতির বিস্তৃত প্রান্তরে যে প্রাণের স্পন্দন নিত্যই লীলায়িত হইতেছে তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সার্থক হইলে সাধকগণও সেইরূপ চরিতার্থ হন।

উপসংহার

সৃষ্টি-রহস্য

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

জড় ও শক্তি

বিশ্ব-শিল্পী বিরচিত এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কোন্ দ্রব্য কিরূপ আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপ ধারণা করাই অসম্ভব। তথাপি মানবগণ এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-রহস্যকে সম্যক উদ্ঘাটন করিবার জন্য যুগে যুগে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রমাণ হিন্দুর বেদ ও মনুসংহিতা, খৃষ্টানের বাইবেল এবং মুসলমানের কোরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ। এখানে আমরা কোন ধর্ম্মগ্রন্থের মতামত সমালোচনা না করিয়া কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দিক দিয়াই এই দুর্ব্বোধ্য বিষয়টিকে অতি সংক্ষেপে "প্রকৃতির" পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

সসীমের পক্ষে অসীমের ধারণা একান্ত অসম্ভব। সুতরাং আমরা কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইব? সকলেই জানেন যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জীবগণ ঘটপটাদি স্থূল পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারাই অদৃষ্ট ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহুবিধ পদার্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশবিশেষ এই বসুন্ধরার অঙ্গীভূত কতকগুলি স্থাবর ও জঙ্গমের কার্য্যকলাপ আলোচনা দ্বারাই আমরা উহাদের ও সেই সঙ্গে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব মাত্র।

আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেই দিকেই জল, স্থল ও উদ্ভিদাদি জড়-পদার্থকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। বায়ু ও জলীয় বাষ্প চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না বটে, কিন্তু আমরা উহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। বায়ু যখন প্রচণ্ড বাত্যা-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বৃক্ষলতাদি ভূমিসাৎ করে, তখন কে না উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে? বায়ুমানযন্ত্রের (barometer) সাহায্যে উহার সাময়িক চাপ বা ভার পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। আবার ঊর্দ্ধাকাশে জলীয় বাষ্প যখন শৈত্যস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া বারিধারা-রূপে ভূতলে নিপতিত হয়, তখনই বায়ুমধ্যে উহার অবস্থিতি ধরা পড়ে।

বৈজ্ঞানিকগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, জল ও স্থলাদি জড়-পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৭০টি মূল পদার্থের (elements) আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাদিগেরই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ফলে যাবতীয় পার্থিব জড় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের এই পৃথিবী সৌর জগতের একটি অঙ্গ (member) মাত্র। সৌরজগৎ আবার সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ এবং চন্দ্রাদি উপগ্রহ লইয়া গঠিত। সুতরাং সৌরজগতের সমুদয়

পদার্থই এই ৭০টি মূল-পদার্থ বা ভূতের দ্বারা বিনির্ম্মিত। সূর্য্য আবার একটি নক্ষত্র মাত্র। অতএব নাক্ষত্র জগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদানও এই ৭০টি পদার্থ বুঝিতে হইবে (১)।

শরৎনিশীথে কৃষ্ণপক্ষীয় নির্ম্মল অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দীপশিখার ন্যায় অসংখ্য তারকারাশি নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে উহাদিগকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া ভ্রম হইলেও উহারা প্রত্যেকেই এক-একটি সূর্য্য-বিশেষ। অনেকগুলিই আবার সূর্য্য অপেক্ষাও আকারে বৃহৎ। ইহাদেরও গ্রহ, উপগ্রহ আছে। সুতরাং ইহারাও প্রত্যেকে সম্ভবতঃ এক-একটি নাক্ষত্র্য জগতের কেন্দ্র-স্বরূপ। ইহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, তাহা ধারণাও করা যায় না। ইহাদের মধ্যে যে নক্ষত্রটি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তাহাও পৃথিবী হইতে ২০×১০^{১২} অর্থাৎ দুই শঙ্খ মাইল দূরে রহিয়াছে (২)। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল; তথাপি উপরোক্ত নিকটতম নক্ষত্রটি হইতে যে আলোক-রশ্মি বহির্গত হইয়া পৃথিবীতে আসে, তাহাকে পথিমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে হয় অর্থাৎ নক্ষত্রটির প্রায় সাড়ে-তিন বৎসর পূর্ব্বের অবস্থাকে আমরা উহার বর্ত্তমান অবস্থা বলিয়া ভ্রম করি।

অনেকেই রাত্রিতে আকাশে ছায়াপথ (milky way) লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। জ্যোতিষীরা অনুমান করেন যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরস্থিত অসংখ্য নক্ষত্র একের পশ্চাতে অন্যে দৃষ্ট হওয়ায় ঐ ছায়াপথের উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ নাক্ষত্র জগৎ অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐদিকেই বিস্তৃত।

ইহা হইতেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে যে, নাক্ষত্র জগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ বৃহৎ পদার্থ! অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যেও উহার আয়তন নির্ণয় করা অসম্ভব, অমনি ধারণা করা ত দূরের কথা।

(১) সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Faraday কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, এমন দিন হয়ত আসিবে যে-সময় বিশ্বের সমুদয় জড়পদার্থই একটি মাত্র মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে ("in the end there will be found one element with two polarities").

রসায়নশাস্ত্রবিৎ Prout সাহেব অনুমান করেন যে, লঘুতম গ্যাস যবক্ষারজানই (hydrogen) সেই একমাত্র মূল পদার্থ যাহা হইতে অন্যান্য জড়বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে (Prout......formulated the theory that the atomic weights are multiples of the atomic weight of hydrogen, the lightest of the so-called elements, which he argued might be regarded as the primordial element, the *materia prima*, from which the others are formed by successive condensations). The Story of Creation—by Edward Clodd, p. 9.)

(২) "The annual parallax of the nearest fixed star, *Alpha Centaure* is nearly one second of arc, giving a distance of twenty millions of millions of miles." The Story of Creation (1894) by Edward Clodd, page 19.

বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে এই আদি-অন্ত-হীন বিপুল বিশ্ব জড় (matter) এবং শক্তি (power) দ্বারা গঠিত হইয়াছে (৩)। এই শক্তি আবার বল (force) এবং বেগ (energy) রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

১। জড় পদার্থ:—অনন্ত আকাশে বিরাজমান যে-কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই জড়-পদার্থ-বাচ্য। এই জড় পদার্থের সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, (ক) কঠিন (solid), (খ) তরল (liquid) এবং (গ) বায়বীয় (gaseous)। সম্ভবতঃ পদার্থের এই বায়বীয় অবস্থা আরও সূক্ষ্মাকারে অর্থাৎ ইথার রূপে (ether) অনন্ত আকাশে ও প্রত্যেক জড়পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

জড়পদার্থের আদি ভূত বা মূল উপাদান একটিই হউক বা ৭০ টিই হউক, উহারা অবিভাজ্য বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত ঐ সকল মূল উপাদানকে বিভক্ত করা সম্ভব হয় নাই। আর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ-পর্য্যন্ত উহাদিগের নিজ নিজ আকার বা প্রকৃতিরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অম্লজান (oxygen)-এর কোন একটি বিশেষ পরমাণু (atom) কখন স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, কখন বা কোন প্রাণী, বা উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ঐ সকল পদার্থের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের ধ্বংসের সহিত উহার নিজ আকৃতি ও প্রকৃতির কোনরূপ বিকৃতি ঘটিবে না। একই কণিকা সুবর্ণ কখন শ্রেষ্ঠীগৃহিনীর বলয় মধ্যে, কখন দস্যুকন্যার গলদেশে হার-রূপে, কখন বা গৃহস্থবধূর কর্ণমূলে কুণ্ডলাকারে শোভা পাইতে পারে অর্থাৎ বিভিন্নাকৃতি বলয়, হার ও কুণ্ডলের উপাদান হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা নিজে যে সুবর্ণ, সেই সুবর্ণই রহিয়া যায়। খাদ দূর হইলেই উহা আবার খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হইতে পারে। সাময়িক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ফলে কোন একটি জড়-পদার্থ কখন কঠিন, কখন তরল এবং কখন বা বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইলেও উহার মূল উপাদান বা পরমাণুর আকারের বা প্রকৃতির কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না। তাপের মাত্রাভেদে একই পদার্থ জল (H_2O) কখন কঠিন বরফ, কখন তরল জল, আবার কখন বা বাষ্পরূপে পরিণত হইলেও জলের মূল উপাদানের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না।

জড় পদার্থের মূল উপাদানসমূহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক অবস্থায় কচিৎ দৃষ্ট হয়। প্রায় সমুদয় বস্তুই দুই বা ততোধিক উপাদানের মিলনের ফল মাত্র। অধিকাংশ দ্রব্যেই ৪টির অধিক মূল উপাদান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অম্লজান একটি স্বাদ-বিহীন, অদৃশ্য গ্যাস ইহার পরিমাণ অন্যান্য মূল উপাদানের পরিমাণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। বলিতে কি ভূপঞ্জরের (crust) প্রায় অর্দ্ধেকাংশই এই গ্যাস দ্বারা বিনির্ম্মিত। সূর্য্য, নক্ষত্র ও

(৩) "The Universe is made up of Matter and Power." The Story of Creation, p. 7.

গ্রহাদির আলোক-রশ্মিকে যন্ত্র (spectroscope) সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশ্বের অধিকাংশ পদার্থই প্রায় ১৪টি মূল উপাদানের সম্মিলনের ফল। পৃথিবীস্থ জীবসমুদয় প্রায়ই অঙ্গার (carbon), অম্লজান, যবক্ষার-জান এবং নাইট্রোজেন সাহায্যে উৎপন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পরমাণুর ন্যায় অণু (molecules) সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আমাদের অধিক নাই। এমন কি অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও যে সকল কণা (particles) আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হয় না, তাহারাও গ্রহাদির ন্যায় মিশ্র-পদার্থ। জলের একটি অণুর ব্যাস ১/৫০০০০০০০০ ইঞ্চি; এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের আকার মানব-ধারণার অতীত নহে কি?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমাণুসমূহের আকার নিত্য। তবে যেমন তাপপ্রভাবে জলের অণুসমূহ সাময়িক বিছিন্ন হইয়া বাষ্পাকারে বহুবিস্তৃত হইয়া থাকে, শক্তি (power) প্রভাবে সেইরূপ অণুসমষ্টির (অর্থাৎ জড়-পদার্থের) আকারেরও ক্ষণিক আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

২। **শক্তি**:—যাহা জড়পদার্থের গতির (motion) হ্রাস বা বৃদ্ধি উৎপাদন বা বিনাশ সাধন করে, উহাই শক্তি নামবাচ্য। এই শক্তি দ্বিবিধ;—যথা:—(ক) বল (force) এবং (খ) বেগ (energy)।

(ক) বল বা আকর্ষণ:—যে শক্তি-প্রভাবে গতির উৎপত্তি বা বৃদ্ধি ঘটে, যাহা জড়পদার্থের দুইটি বা ততোধিক অণুকে এমন ভাবে একত্রে আবদ্ধ রাখে যাহাতে উহারা পরস্পরের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে, তাহাই বল বা আকর্ষণ। ঐ বল বা আকর্ষণ যখন নিকটবর্ত্তী বা বহুদূরস্থ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে কার্য্য করে, তখন উহার নাম হয় মহাকর্ষণ (gravitation); যখন কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের অণুগুলির মধ্যে কার্য্য করে, তখন উহাকে আণবিকাকর্ষণ বা সংহতি (molecular attraction বা cohesion) বলে, আবার যখন উহা পরমাণুসমূহের (atoms) মধ্যে কার্য্য করিয়া উহাদিগের রাসায়নিক মিলন সম্পাদন করে, তখন উহার নাম হয় সংসক্তি (chemical attraction বা affinity)

আকর্ষণ জড়পদার্থের একটি স্বাভাবিক গুণ। উহার প্রত্যেকটি অণু অপর অণুটিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অবশ্য প্রবল বিপরীত শক্তির নিকটে উহা কখন-কখন পরাভূতও হইয়া থাকে। যাহাই হউক, ব্রহ্মাণ্ডে বলের মোট-পরিমাণ (sum total) একই থাকে, কখন কম-বেশী হয় না। আর বলের বিভিন্ন গুণাবলীকে এক কথায় বলাধ্যবসায় (Persistence of Force) বলা হয়।

(খ) বেগ বা বিপ্রকর্ষণ (energy):—যে শক্তিপ্রভাবে স্থূল জড় বা সূক্ষ্ম ইথারের কণাগুলি পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করে, অথবা কণাসমূহ পরস্পর পৃথক হইবার চেষ্টা করিলে যে শক্তি তাহাকে বাধা প্রদান করে, সেই শক্তিকে বেগ বা বিপ্রকর্ষণ বলা যায়।

বেগের মোট-পরিমাণও বলের মোট-পরিমাণের ন্যায় নিত্য অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিহীন। কিন্তু ইহা বলের ন্যায় জড়পদার্থের সহিত জড়িত (bound up) না থাকায় দ্রব্যান্তরে চালিত হইবার উপযোগী নহে। কার্য্য করুক বা না করুক, উহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে এবং তাই উহাকে ভবিষ্যত ব্যবহারে লাগাইবার জন্য সঞ্চয় করিয়াও রাখা চলে।

এই বেগ আবার দুই জাতীয়:—(১) সক্রিয় (active or kinetic) এবং নিষ্ক্রিয় (passive or potential)। মন্দিরের চূড়াস্থিত সুবর্ণ কলস, কি এক খণ্ড পাথুরিয়া কয়লা, অথবা আতসবাজীর একটা বোমার বেগ প্রথমে নিষ্ক্রিয় বুঝিতে হইবে; কিন্তু ঐ বেগই আবার সক্রিয় হয় যখন কলসটি ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হয়, পাথুরিয়া কয়লার খণ্ডটি জ্বলিতে থাকে, বা বোমাটা অগ্নিসংস্পর্শে সশব্দে ফাটিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

নিষ্ক্রিয় বেগ যেমন সুযোগানুসারে সক্রিয় হয়, সক্রিয় বেগও তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। রেলগাড়ী যখন চলিতে চলিতে কোন একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামে, তখন উহার চাকাগুলির সক্রিয় বেগ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। সক্রিয় বেগের মূর্ত্তি আবার বহুবিধ। সুতরাং উহা এক-এক সময় কোন এক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিতে না পারে এমনও নহে। রেলের চাকার সক্রিয় বেগ ঘূর্ণনের ফলে কখন তাপরূপে, কখন বা তাপ হইতে বিদ্যুতাকারে, বিদ্যুৎ হইতে আবার তাপে, অথবা আলোকে অথবা অন্য কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইতে পারে। আজকাল অনেক গাড়ীতে এঞ্জিনের সহিত ডায়নামো (Dynamo) জুড়িয়া চাকার ঘূর্ণন হইতে বিদ্যুৎ ধরিয়া গাড়ীখানির সমুদয় কামরায় বৈদ্যুতিক আলোক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নায়েগ্রা ও কাবেরী নদীর জল-প্রপাত হইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় বেগ এক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেও উহার পরিমাণ কিন্তু ঠিক একই থাকে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেগ হইতে সেই পরিমাণ তাপ, আলোক বা বিদ্যুৎ লাভ হইয়া থাকে। উহাদের পরিমাণ কখন কম-বেশী হয় না।

বেগের মূর্ত্ত্যন্তরগ্রহণক্ষমতা ও অবিনশ্বরতাকে বেগ-রক্ষণ-ক্ষমতা (Conservation of energy) বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত বলাধ্যবসায় এবং বেগ-রক্ষণ-ক্ষমতা আবার শক্তির অবিনশ্বরত্বের (indestructibility) অন্তর্ভুক্ত। বল ও বেগের পরস্পর বিরোধিতার ফলে বিশ্বের কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে: প্রত্যেক গ্রহনক্ষত্র অপরাপর সমুদয় গ্রহনক্ষত্রকে মহাকর্ষণের বলে আপনার দিকে টানিয়া লইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে,—সূর্য্য পৃথিবীকে, অন্য সূর্য্য আবার আমাদের সূর্য্যকে, চন্দ্র পৃথিবীকে, পৃথিবী আবার চন্দ্রকে টানিয়া লইতে সতত সচেষ্ট। চন্দ্র কোন্ দিন পৃথিবীর উপরে, পৃথিবী সূর্য্যের উপরে পতিত হইত! কিন্তু উহারা আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করায় যে কেন্দ্র-প্রসারী (centrifugal) বেগ উৎপন্ন হয় তাহার ফলে মহাকর্ষণের প্রভাব প্রতিহত হইয়া পড়ে। সৌর-তাপ প্রভাবে মহাসমুদ্রের জলরাশি স্বাভাবিক সংহতি-শক্তিকে হারাইয়া বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আবার

ঐ বাষ্পরাশি ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া শৈত্যসংস্পর্শে তাপের প্রভাবকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় যে ফিরিয়া আসে, উহা জলের অণুসমূহের স্বাভাবিক সংহতি-শক্তির প্রভাবে বুঝিতে হইবে।

যদি বলকে (force) বাধা দিবার শক্তি জড়ের না থাকিত, তবে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অণু মহাকর্ষণের প্রভাবে কোন একটি কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হইয়া একমাত্র সুবৃহৎ জড়পিণ্ডের সৃষ্টি করিত। আর ঐ জড়পিণ্ড জীব বা উদ্ভিদের বাসোপযোগীও হইত না।

আর যদি বেগের (energy) শক্তিকে বাধা প্রদানের জন্য বল না থাকিত, তাহা হইলে জড়ের অণুসকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিত। গ্রহ নক্ষত্রাদির জন্ম হইত না। জগতের কোনরূপ আকারেরও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত না;—জীব ও উদ্ভিদের জন্ম ত দূরের কথা। ফলতঃ এই দুইটি মহাশক্তির—বল ও বেগের—মধ্যে গজকচ্ছপের ন্যায় অহর্নিশ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকায় বিশ্বরাজ্যে নিয়ত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। কি মহাকাশে গ্রহনক্ষত্রের প্রচণ্ড গতি, কি স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, কি মার্ব্বেল প্রস্তরাদি জড়পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অদৃশ্য অণুসমূহের ঘড়ির দোলকের ন্যায় নিয়ত অগ্র-পশ্চাৎ স্পন্দন (vibrations), কি ইথারের কম্পন—কোন কার্য্যই ঘটিতে পারিত না। যবক্ষারজান গ্যাসের প্রত্যেকটি অণু (molecule) অপরাপর অণুগুলির সহিত প্রতি সেকেণ্ডে ১৭০০০০০০০০০০ অর্থাৎ এক নিখর্ব্ব সাত খর্ব্ব বার ঘাত-প্রতিঘাত করে। অথচ এই কল্পনাতীত গতি অত্যুৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখিবার উপায় নাই। পৃথিবী প্রতি মিনিটে এক হাজার মাইল বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত যবক্ষারজান অণুর গতির নিকটে অতি তুচ্ছ।

ব্রহ্মাণ্ড-পতি একদিকে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রাদির নির্ব্বিঘ্ন গমনাগমনের জন্য যেরূপ আদ্যন্তহীন মহাকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই জড়কণার মধ্যেও আবার অণু সমূহের জন্য ইতস্ততঃ স্পন্দনের সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন। পরমাণু সকলের মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই। অণুপরমাণুর মধ্যেও যে ব্যোম (space) বিদ্যমান রহিয়াছে অত্যধিক চাপ প্রয়োগ দ্বারা পণ্ডিতগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। অম্লজান ও যবক্ষারজান বাষ্পকে বরফের ন্যায় কঠিন আকারে অত্যল্প স্থানের মধ্যে রক্ষণ করার অর্থই অণুসমূহকে অধিকতর নিকটবর্ত্তী করা। ফাঁক না থাকিলে অণুগুলি ঘেঁসাঘেঁসি করিবার অবসর পাইত কি? ফলতঃ বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস এই যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কোন বৃহৎ কি ক্ষুদ্র স্থান নাই যাহাকে নিরবচ্ছিন্ন শূন্য (vacuum) বলা যাইতে পারে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, নিশীথ সময়ে অন্তরীক্ষে যে অসংখ্য তারকা দৃষ্ট হয়, উহাদের পরস্পরের মধ্যে যে মহাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাও শূন্য বা জড়হীন নহে। আবার, কি মার্ব্বেল প্রস্তর, কি সুবর্ণাদি ধাতু, কি জল ও বায়ু—সকল জড়পদার্থেরই অণুসমূহের মধ্যে ব্যোম বিরাজমান রহিয়াছে এবং ঐ ব্যোমও নিরবচ্ছিন্ন শূন্য নহে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের এই সকল আপাত শূন্য স্থান এক প্রকার স্থিতি-স্থাপক অতি সূক্ষ্ম ভূত বা পদার্থ দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পরিপূরিত। ঐ

ভূত বা পদার্থকে পণ্ডিতগণ ইথার (ether) নাম প্রদান করিয়াছেন। উহা সতত সঞ্চরণশীল; উহাকে আশ্রয় করিয়া শক্তি ও বেগ কি ধারণাতীত দূর প্রদেশে, কি কল্পনাতীত সূক্ষ্ম স্থানে— সর্ব্বত্রই কার্য্য করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে।

ঐ ইথারকে আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই না বলিয়াই কি উহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হইবে? এক গ্রেণ পরিমিত ম্যাজেণ্টার রংকে এক বাল্‌তি জলের মধ্যে গুলিয়া দিলে, লাল বর্ণ দেখিয়া জলমধ্যে উহার অস্তিত্ব যে-কেহই উপলব্ধি করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ রংই যদি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার অণুসকল এত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া যায় যে, চক্ষুর অগোচর হইয়া পড়ে। কিন্তু অদৃশ্য অবস্থায় আছে বলিয়াই কি ঐ জলকে রংশূন্য মনে করা কর্ত্তব্য? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুর অগোচর হইলেও ইথারের অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমানসময়ে বেতার যন্ত্র (wireless telegraph) পাহাড়পর্ব্বত ভেদ করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রদান করিতে যে সমর্থ হইতেছে, উহা ইথারেরই সাহায্যে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। বাস্তবিকই নিরবচ্ছিন্ন শূন্য ব্যোমে মহাকর্ষণের কার্য্য সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করাও দুরূহ (৪)।

দেখা গেল যে, আদ্যন্তবিহীন বিপুল বিশ্ব স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় বা ভূত (elements) দ্বারা পরিপূর্ণ। শক্তি জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। অবস্থাভেদে জড়পদার্থসকল কখন স্থূল (যেমন পৃথিবী ও চন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহ) কখন ক্ষুদ্র কণা (যেমন বালুকা কণা), কখন সূক্ষ্ম অণু, আবার কখন বা অতি সূক্ষ্ম পরমাণুরূপে বিদ্যমান। জলের একটিমাত্র অণু (H_2O) দুইটি যবক্ষারজান পরমাণু ও একটি অম্লজান পরমাণুর রাসয়নিক মিলনের ফল মাত্র। পরমাণুসমূহের যোগে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড়পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, পরমাণুর নিজের কোন অবয়ব নাই, পরন্তু উহা পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষসীমা স্বরূপ। কিন্তু আধুনিক রসায়নবেত্তাগণ স্বীকার করেন যে, পরমাণুর আয়তন ও ভার আছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, মূল পদার্থের পরমাণুসকল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। দুই-দুইটি, কি তিন-তিনটি পরমাণু একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করে। রাসায়নিক সংযোগস্থলে এই পরমাণুপুঞ্জ বিভক্ত হইয়া পড়ে, অন্যথা উহাদিগকে বিভক্ত করা যায় না।

সারার্থ

পরমাণুর আকার নিত্য অর্থাৎ উহার নিজ অবয়বের প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ পরিবর্ত্তন

(8) "Speaking of the force of gravitation, Newton said that to conceive of one body acting upon another through a vacuum is so great an absurdity, that no man who had 'in philosophical matters a competent faculty of thinking' could ever fall into it" The Universe: its contents—by Edward Clodd P. 16.

হয় না; তবে তাপপ্রভাবে উহার ক্ষণস্থায়ী আপেক্ষিক রূপান্তর কখন কখন ঘটিয়া থাকে বটে। কঠিন বরফখণ্ড তাপের প্রভাবে কখন তরল জলে এবং তরল জল কখন বাষ্পে রূপান্তরিত দেখায় মাত্র। কিন্তু ঐ তাপের অভাবে ঐ বাষ্প জলে এবং ঐ জল কঠিন বরফখণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

জড়কে আশ্রয় করিয়া শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। শক্তি দ্বিবিধ :—(১) বল, ও (২) বেগ। গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ উহার নাম মহাকর্ষণ। পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য পদার্থের আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। আবার একই পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহার নাম সংহতি এবং বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ দেখা যায়, তাহার নাম সংসক্তি। বল ও বেগের প্রতিযোগিতার ফলেই জড়জগতে নানাবিধ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। তবে ইথার নামক পদার্থের নিজের আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড

প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা দেখিয়াছি, জড়পদার্থের অবস্থা ত্রিবিধ :—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। এতদ্ভিন্ন জড়ের অতিসূক্ষ্ম আর একটি অবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাকে ইথার (ether) বলা হয়। জড়পদার্থ মাত্রেরই একটা ওজন থাকে। বায়ু অদৃশ্য পদার্থ হইলেও উহা সমুদ্রসমতলে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপর প্রায় ৭॥০ (সাড়ে সাত) সের ভার বা চাপ দিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু ইথারকে ওজনবিহীন মনে করিয়া থাকেন।

ইথার

এই ইথার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান। কল্পনাতীত দূর-দূরান্তরে অবস্থিত নক্ষত্র হইতে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থের অণুসকলের অভ্যন্তরস্থ ব্যোম (space) মধ্যে—সর্ব্বত্রই ইথার বিরাজমান রহিয়াছে।

মহাসমুদ্রের তীরদেশে অবস্থিত বালুকাকণার সংখ্যা যেরূপ অগণ্য, মহাকাশে তথাকথিত স্থিরনক্ষত্র (fixed stars) সমূহের সংখ্যাও সেইরূপ অগণনীয়। ছায়াপথ (milky way) উহাদেরই দ্বারা নির্ম্মিত বুঝিতে হইবে। উহারা অবশ্য বালুকাকণার ন্যায় অত ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে। অসংখ্য তারকা একই দিক হইতে আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয় বলিয়াই উহাদের পরস্পরের প্রকৃত দূরত্ব আমরা অনুমান করিতে পারি না।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড

মহাকাশের বিভিন্ন স্থানে জড়পদার্থসমূহ কিরূপভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণ একমত নহেন। ছায়াপথের উভয়পার্শ্বে অসংখ্য স্থিরনক্ষত্র ব্যতীতও বায়বীয় জলন্ত নীহারিকাপিণ্ডসকল (nebulæ) দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল পিণ্ড স্থির-নক্ষত্রের মূল-উপাদানস্বরূপ নীহারিকা (stellar nebulæ) নহে। উহাদের সকলের আকারও একই রূপ নয়; কেহ গোলাকার, কেহ বা ডিম্বাকৃতি; কতকগুলি আবার শম্বুকের

ন্যায় পাকযুক্ত (spiral)। উহাদিগকে বায়বীয় নীহারিকা (gaseous nebulæ) বলা হয়। অনেকে অনুমান করেন, এই বায়বীয় নীহারিকা হইতেই ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও গ্রহাদি সমন্বিত সৌরজগতের উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের আকার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী Mr. Proctor ব্রিটিশ-বিশ্বকোষ-গ্রন্থে (Encyclopædia Britannica) জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—"আমাদের সৌর-জগৎ নক্ষত্র-জগতের একটি অঙ্গমাত্র। এই নক্ষত্র-জগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সচরাচর যেরূপ আকারের মনে করা হয়, উহা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিকতর জটিল এবং উহার গঠনও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। উহার গভীরতম প্রদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র অবস্থিত রহিয়াছে। কি জ্বলন্ত বায়বীয়—কি শীতল নক্ষত্র (অঙ্গুরীয়, ডিম্ব বা শম্বুকাকৃতিযুক্ত)—সর্ব্ববিধ নীহারিকাপুঞ্জই, ঐ নক্ষত্র-জগতের (sidereal system) অন্তর্গত। উহার সর্ব্বাঙ্গই গতি-শক্তি-বলে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ঐ সকল গতি এত জটিল যে, অদ্যাপি উহাদের বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয় নাই।"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার

প্রাচীন কালের লোকদিগের জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের মত জ্ঞান ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন, মানুষ ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সমুদয় জীবই জোড়ায় জোড়ায় পৃথক পৃথক ভাবে একদিন ঈশ্বর-আদেশে সৃষ্ট হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক এ সম্বন্ধে বাইবেল আলোচনা করিলে ভাল হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের লোকদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা আলোচনা করিবার স্পৃহা দেখা দেয়। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বা অন্য কোন ব্যক্তি কুম্ভকারের ন্যায় মৃত্তিকাদি জড় পদার্থের সাহায্যে পৃথিবী-প্রভৃতিকে খেয়াল মাফিক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ (The Thlinkit Indians) মনে করিত যে, একটা বাক্সের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ রক্ষিত ছিল। বিশ্ব-শিল্পী উহাদিগকে চুরি করিয়া আনিয়া আকাশে ঝুলাইয়া দেন। সেই হইতে উহারা পৃথিবীকে আলোক বিতরণ করিতেছে। কিন্তু মেক্সিকোবাসী উন্নততর জাতিসমূহ পাঁচটি æons বা সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, যথা (১) পৃথিবীর সূর্য্য, (২) অগ্নির সূর্য্য, (৩) বায়ুর সূর্য্য, (৪) জলের সূর্য্য এবং (৫) বর্ত্তমান সূর্য্য। প্রাচীন হিন্দুগণও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হঠাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়; উপরার্দ্ধ হইতে আকাশ ও নিম্নার্দ্ধ হইতে পৃথিবীর জন্মলাভ ঘটে ইত্যাদি।

প্রাচীন মত-বাদ

বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য-ঋষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদ প্রচার করেন;—তাঁহার মতে জড়জগতের প্রত্যেক বস্তু অতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা অর্থাৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত।

প্রাচীন গ্রীকগণ অনেকটা বৈজ্ঞানিকভাবে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা

করেন। যিশুখৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মিলেটাস্ (Miletus)-এর টেলস্ (Thales) নামক গ্রীক পণ্ডিত (৬৪০—৫৪৬ খৃঃ পূঃ) প্রচার করেন যে, জল হইতে জগতের সৃষ্টি ঘটিয়াছে। তাঁহার মতে পৃথিবী ঐ মূল তরল পদার্থের উপরে বট-পত্রের ন্যায় ভাসমান ছিল।(১) তিনি জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। এমন কি চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিকে তিনি উহার অন্তর্নিহিত আত্মার কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীর এ্যানেক্সিম্যণ্ডার (Anaximander) মনে করিতেন, আদিম পদার্থ জল নহে, পরন্তু উহা একদিকে অগ্নি ও বায়ু এবং অপরদিকে জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ (২)। তৎপরে এ্যানেক্সিমেনেস্ (Anaximenes) এবং হেরাক্লিটিস্ (Heraclitees) বায়ু ও অগ্নিকে যথাক্রমে জগতের আদি উপাদান বলিয়া প্রচার করেন। পরিশেষে এম্‌পেডোক্লিস্ (Empedocles) (৪৯০-৪৩০ খৃঃ পূঃ) প্রকাশ করেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল এবং ক্ষিতি (মৃত্তিকা) এই চারিটি মূল উপাদানের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণের ফলেই সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। আর এই সকল উপাদান অব্যয়, অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনশীল। গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো (Plato)ও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। এরিষ্টোটোল্ (Aristotle)-এরও প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশবাদের ধারণা ছিল না। ইহাদের পরেও দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত প্রাচীনগণের জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য কোন উন্নততর ধারণা ছিল না। বেকন্ (Bacon) সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক-ভাবে মতামতগুলিকে পরীক্ষা করিতে উপদেশ দেন। নিউটন্‌ও জগৎ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া যান। এই সময় হইতেই সকল রকম যুক্তিকে স্বাভাবিক নিয়ম বা জ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়।

প্রাচীন গ্রীক-মতবাদ

বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ডেকার্‌টি (Decartes), ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে সুইডেন্‌বর্গ (Swedenborg) এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে Kant নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করেন। Decartes-এর মতবাদকে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া চলে না; অপর দুইজনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। কিন্তু Kant-এর মতবাদ অনেকটা লাপ্লাস্ (Laplace)-এর নীহারিকা-প্রকল্পের (Nebular hypothesis) অনুরূপ ছিল। ডারহাম্ ও টমাস্ রাইট্ (Durham এবং Thomas Wright) এই সময়ে "A New Theory of the Universe" নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি হয়ত Kant-এর

নূতন মত-বাদ

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু 'কারণ-সলিলে' বটপত্রের উপরে নিদ্রিতাবস্থায় ভাসমান ছিলেন বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ বিশ্বাস করিতেন। গ্রীক মতকে হিন্দুমতেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয় নাকি?

(২) "Something intermediate between fire and air on the one hand, and water and earth on the other"—Evolution in the Light of Modern Knowledge (1925). Blackie & Sons.

মনে এ-সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করিয়া থাকিবে। যাহা হউক Kant মনে করিতেন যে, আদিতে অনন্ত মূলপদার্থরাশি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিত।

Kant-এর মত-বাদ

লুক্রেটিয়াস্ (Lucretius)-এর বর্ণনা অনুযায়ী Kantও ঐ সকল মূল পদার্থকে কঠিন পরমাণু বলিয়া মনে করিতেন। উহারা তখন শীতল ছিল। মহাকর্ষণ প্রভাবে ঐ সকল পরমাণু পরস্পরের সহিত আহত-প্রতিহত হইয়া বন্দুকের গুলির ন্যায় ক্রমশঃ তাপ উৎপাদন করে। ফলতঃ Kant-এর মূল পদার্থ (elements) ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী শীতল নীহারিকা মাত্র। কিন্তু তাঁহার জানা ছিল না যে, কোন জড় পদার্থের সম্পূর্ণ নূতন করিয়া উৎপত্তি বা আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভব নহে। (conservation of mass)। "নাস্তি" হইতে "অস্তি"র জন্ম সম্ভব হয় কি ? একই সুবর্ণপিণ্ড কখন বালা, বালা ভাঙ্গিয়া চুড়ি, চুড়ি ভাঙ্গিয়া হারাদি বিবিধ আকারে পরিবর্ত্তিত হইলেও মূল সুবর্ণ সুবর্ণই রহিয়া যায় ; উহার কম-বেশী কখন হয় না। এক টুক্‌রা শুষ্ক পত্রকে পোড়াইলে অবশ্য উহা ভস্মে পরিণত হয়, কিন্তু পুড়িবার সময় যে জলীয় বাষ্প ও ভস্মাদি উৎপন্ন হয়, তাহা সংগৃহীত করিয়া ওজন করিলে পত্রের ওজনের ঠিক সমান হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে স্বর্ণ ও পত্রের ন্যায় কোন জড় পদার্থেরই আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভবপর নহে,—কেবল অবস্থান্তর হয় মাত্র। Kant ইহাও জানিতেন না যে, জড় পদার্থের ন্যায় শক্তিরও নূতন করিয়া সৃষ্টি বা আত্যন্তিক বিনাশ হইতে পারে না (conservation of energy)। কোন লৌহখণ্ডের উপরে বন্দুকের গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে লৌহখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ঐ উত্তাপ বন্দুকের গুলির শক্তির (energy) ঠিক সমান। অগ্নিসংযোগে বারুদ বায়বীয় আকার ধারণ করে। তাহাতে শক্তি উৎপন্ন হয়। পরে ঐ শক্তি লৌহখণ্ডে সঞ্চারিত হয় মাত্র ; একের দৃশ্যতঃ (apparently) অভাব ঘটে, কিন্তু অপরে উহা লাভ করিয়া থাকে। Kant-এর Conservation of Angular momentum সম্বন্ধেও কোন ধারণা ছিল না। আপনাপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে কোন একটা জড়পদার্থ আপনা হইতে আবর্ত্তন (rotation) করিতে পারে না, বা উহাকে বিনা বাধায় বন্ধ করিবারও শক্তি রাখে না, এ কথাও তাঁহার জানা ছিল না। সেইজন্য তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মহাকর্ষণের প্রভাবে যতই অণুসকলের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ ঘটে, ততই উহাদের মধ্যে আবর্ত্তন (rotation) দেখা দেয়। মাথা নাই, ত মাথাব্যথা—যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্বই ছিল না, সেই আবর্ত্তনবেগ এখন ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে উৎপন্ন হইবে কিরূপে ? কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই শীতল নীহারিকাপিণ্ড ক্রমশ: উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও আবর্ত্তনবেগের বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষপ্রদেশ হইতে পিণ্ডের পর পিণ্ড দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরিণামে পৃথিব্যাদি গ্রহের উৎপত্তি ঘটায়। শনি-গ্রহের যেরূপ বলয় (rings) দৃষ্ট হয়, Kant-এর সৌরজগৎও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে প্রত্যেক বলয় জমাট বাঁধিয়া এক-একটা গ্রহের সৃষ্টি করে। এইরূপেই কেন্দ্রস্থ মূল নীহারিকাপিণ্ড হইতে বর্ত্তমান সূর্য্যের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কালক্রমে আবর্ত্তনবেগ-প্রযুক্ত গ্রহ-দেহ হইতে কতকটা-কতকটা নীহারিকা

দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরিশেষে উপগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। Kant-এর মতে আমাদের এই সৌরজগৎ এমনি করিয়াই আদিম শীতল নীহারিকাপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সুবিখ্যাত ফরাসী গণিতবেত্তা লাপ্লাস্ (Laplace) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নীহারিকাপ্রকল্প প্রচার করেন। তিনি যে Kant-এর মতবাদ সম্যক অবগত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি মনে করিতেন যে, অত্যুষ্ণ ও আবর্ত্তনশীল নীহারিকাপিণ্ড হইতেই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার মতে আদি হইতেই নীহারিকার উত্তাপ ও আবর্ত্তন ছিল, পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে উহা উৎপন্ন হয় নাই। আর শূন্যপথে তাপবিকিরণের ফলে ঐ পিণ্ডের উপরিভাগ যতই শীতল হইতে থাকে, উহার আয়তনও ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পিণ্ডের উপর হ্রাস-বৃদ্ধি-বিহীন পূর্ব্বোক্ত আবর্ত্তনবেগ কার্য্য করায় উহার আবর্ত্তনমাত্রা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ নীহারিকা পিণ্ডটি আয়তন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বেগে ঘূর্ণিত হয়।

লাপ্লাসের প্রকল্প

অনেক সময়ে বালকেরা একগাছি সূত্রের এক প্রান্তে একখণ্ড প্রস্তর বাঁধিয়া অপর প্রান্ত তর্জ্জনীতে জড়াইয়া প্রস্তরখণ্ডটিকে কিছুক্ষণ বেগে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রস্তরখণ্ডটি তখন পরিভ্রমণপথের স্পর্শনীপথে (tangential direction) প্রস্থান করে। ঘূর্ণনকালে সূত্রটিতে পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি শক্তি (forces) উৎপন্ন হয়। (১) যে শক্তি প্রস্তর খণ্ডটিকে অঙ্গুলি অর্থাৎ পরিভ্রমণ-কেন্দ্রের অভিমুখে টানিয়া রাখে, তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখী (centrepetal) এবং যে শক্তি কেন্দ্র হইতে প্রস্তরখণ্ডের দিকে সূত্রটিকে প্রসারিত করিয়া রাখে, উহাকে কেন্দ্র-বিমুখ (centrefugal) শক্তি বলা হয়। আমাদের এই বসুন্ধরা আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ যাবতীয় পদার্থ মেরুদণ্ড হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অধিকতর প্রবল হওয়ায় উহা ঘটিতে পারিতেছে না। কিন্তু কোন কারণে এই আবর্ত্তন-বেগ (speed of rotation) যদি বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তবে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অবশ্যই হ্রাস পাইত; পৃথিবী ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে যদি প্রতি ৮৫ মিনিটে একবার করিয়া আবর্ত্তন করিতে পারিত, তাহা হইলে বিষুবরৈখিক প্রদেশে কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্র-বিমুখ উভয়বিধ শক্তিই পরস্পর সমান হইয়া পড়িত। সুতরাং তখন নিরক্ষবৃত্তপ্রদেশে কোন জড়পদার্থেরই ভার (weight) থাকিত না; এবং উহা ভূপৃষ্ঠের উপর কোনরূপ চাপ প্রদান করিতেও পারিত না; কিম্বা ঊর্দ্ধদিকেও প্রস্থান করিতে সক্ষম হইত না। পরন্তু আকাশের যে স্থানেই উহা স্থাপিত হইত, সেই স্থানেই ত্রিশঙ্কুর ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হইত—ভূপৃষ্ঠের উপরে পতিত হইত না।

লাপ্লাস্ অনুমান করেন যে, তাঁহার কল্পিত নীহারিকাপিণ্ড তাপবিকিরণের ফলে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হয়, এবং আবর্ত্তনবেগ এককালেই উপরোক্ত সাম্যাবস্থায়

উপনীত হয়। তখন ঐ পিণ্ডের বিষুবরৈখিক প্রদেশস্থ নীহারিকাকণাসমূহ অবশিষ্ট নীহারিকার উপর চাপ প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং ঐ সাম্যাবস্থাতেও যখন উহাদের নিম্নস্থ (?) নীহারিকাসমূহ তাপবিকিরণের ফলে আরো ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে, তখন বহিঃস্থ ঐ সকল নীহারিকাকণা অঙ্গুরীয়কের আকারে শূন্যে থাকিতে বাধ্য হয়। এইরূপে কালক্রমে এককেন্দ্রবিশিষ্ট বহু সংখ্যক নীহারিকা-বলয়ের উৎপত্তি ঘটে, এবং উত্তরকালে ঐ সকল বলয়ের অন্তর্গত কণাসমূহ পরস্পর জমাট বাঁধিয়া এক-একটি গ্রহের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রস্থিত সুবৃহৎ নীহারিকাপিণ্ডটি এইরূপেই আমাদের বর্ত্তমান সূর্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। অনুরূপ কারণেই বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ আবার কালক্রমে একাধিক উপগ্রহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে।

লাপ্লাসের এই মত-বাদ শতাধিকবর্ষকাল স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও উহা পণ্ডিতদিগের সমালোচনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। ফলে আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ এই প্রকল্পকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে র‍্যাবিনেট্ (Rabinet) একটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে গ্রহ-বলয় উৎপন্ন হইতে হইলে সূর্য্য-পিণ্ডের আবর্ত্তন-বেগ (angular momentum) বর্ত্তমান বেগ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকা প্রয়োজন। যদি বলা যায়, তাহাই ছিল; তবে প্রশ্ন উঠিবে, এখন সেই বেগ গেল কোথায়? উহা ত সৌরজগতের মধ্যে নাই; সমগ্র সৌরজগতের সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহাদি সকলের আবর্ত্তনবেগ একত্র করিলেও উহার পক্ষে সৌরপিণ্ডটিকে প্রতি দশ ঘণ্টায় একবারের বেশী সৌরমেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত করা সম্ভব হয় না; বিশেষতঃ এই বেগে সৌর-পিণ্ডটির বৃহস্পতির (Jupiter) ন্যায় চ্যাপ্টা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু বৃহস্পতির দেহ ত এই আবর্ত্তনে বিচ্ছিন্ন হইতেছে না; সুতরাং সমগ্র গ্রহ উপ-গ্রহাদির আবর্ত্তন-বেগ সত্ত্বেও সৌরপিণ্ডে লাপ্লাসের অনুমিত বলয় সকল উৎপন্ন হইতে পারিত না। অবশ্য একথা একেবারে অবিশ্বাস্য না হইলেও একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় যে, সৌরজগতের বহিঃস্থ একটি নক্ষত্র কোন এক সময়ে সৌরজগতের মধ্য দিয়া যাইবার সময় অজ্ঞাত উপায়ে সৌরপিণ্ডের পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত আবর্ত্তন বেগ অপহরণ করতঃ প্রস্থান করিয়াছে। র‍্যাবিনেট্ প্রভৃতির যুক্তিকে যে খণ্ডন করা না যায়, তাহা নহে; কিন্তু আধুনিক গণিত-শাস্ত্র যে আপত্তি তুলিয়াছে, তাহাকে খণ্ডন করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

যদি কোন নক্ষত্রদেহ আবর্ত্তনাধিক্য বশতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে গণিত-শাস্ত্র মতে উহার প্রায় সম-দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার কথা। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও আকাশমার্গে এইরূপ অসংখ্য যুগল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ লাপ্লাসের প্রকল্প অনুসারে আদিম নীহারিকাপিণ্ডের দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পরকে কেন্দ্র করতঃ আকাশমার্গে নিয়ত পরিভ্রমণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিতে

আধুনিক মত-বাদ

পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রহাদি সম্বলিত সৌরজগতের সৃষ্টি লাপ্লাসের মতে সম্ভব হইলেও বর্ত্তমান গণিতশাস্ত্রের যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ নিছক অনুমান-মূলক নীহারিকা-প্রকল্পকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।*

গাছের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু

মাটি (Soil)

পাথর, বালি, ধূলিকণা, মলমূত্র, পচা উদ্ভিদ, জীবজন্তুর শরীরের অংশ এবং নানা প্রকার জীবাণু লইয়া মাটির সৃষ্টি। ইহা ছাড়া খনিজ বস্তু ও জল সর্ব্বদা মাটিতে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গারক পদার্থ (অর্থাৎ যে সকল পদার্থকে পুড়াইলে ছাই হয়, সেই সকল পদার্থ) ও অনঙ্গারক পদার্থ, (অর্থাৎ এই ছাইরূপে যে সকল পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না,—পুড়াইবার সময় যাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় সেই সকল পদার্থ) লইয়া মাটির সৃষ্টি, অর্থাৎ মাটি অঙ্গারক ও অনঙ্গারক পদার্থকণিকার সমষ্টি। বাঙ্গালাতে 'অঙ্গার' নাম হইলেও, 'কার্ব্বণ' অনঙ্গারক পদার্থ।

গাছ তাহার খাদ্যের জন্য অঙ্গার বা কার্ব্বণ বাতাস হইতে ও বাকী অনঙ্গারক পদার্থ মাটি হইতে পায়। এই অনঙ্গারক পদার্থ জলরূপে ও জলে গলিত লবণরূপেই, শিকড়-দ্বারা শোষিত হয়।

মাটির বায়ুমণ্ডল—একটা লেন্স (lense) বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (magnifying glass) দিয়া মাটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মাটি যতই আঁটাল হউক না কেন, তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। মাটির কণিকা সকল যে যে স্থানে পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই, সেই সেই স্থানে একটু ফাঁক থাকিয়া যায়। এই ফাঁকগুলিই মাটির ছিদ্র। হাজার চাপ দিলেও এই ফাঁক কিছুতেই বন্ধ হয় না। অন্য উপায়েও এই ফাঁকের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে পারা যায়। খানিকটা মাটি বা বালি কাপড়ে বাঁধিয়া তাহাতে জল ঢালিলে দেখা যায়

* এই প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী :—Encyclopædia Britannica, The Story of Creation—by Edward Clodd, Parkar's Astronomy etc. etc.

যে জল কাপড় চুয়াইয়া বাহির হইতেছে। ফাঁক না থাকিলে জল বাহিরে আসিবার পথ পাইত কোথা হইতে?

মাটিতে বৃষ্টি পড়িলে বৃষ্টির জলের সবটা, অন্ততঃ কতকটা মাটিকণা মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া চুয়াইয়া নীচের দিকে যায় ও প্রত্যেক কণাকে বেষ্টন করিয়া একটি সলিলাবরণ তৈয়ারী করে। জলের এই আবরণটি মাটির কণাকে এরূপ জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে যে তাহাকে কিছুতেই কণা হইতে পৃথক করা যায় না। মাটি পুড়াইয়া এই জলকে বাষ্প না করিলে তাড়ান যায় না। বৃষ্টির জল ব্যতীত বাতাসের জলীয় বাষ্প হইতেও এই জলাবরণের উৎপত্তি হয়। ইহাকে ইংরাজীতে "হাইগ্রস্‌কপিক্ ওয়াটার" (Hygroscopic water) বলে। মাটির কণার চারিদিকে জলাবরণ থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই কণার মাঝে ফাঁক থাকিয়া যায়। এই ফাঁকের ভিতর বেশী ভাগ বাতাস থাকে ;—এবং ইহাদেরই ভিতর দিয়া মাটির উপরের বাতাসের সহিত ভিতরের বাতাসের যোগাযোগ আছে। এই বাতাসের সাহায্যে গাছের শিকড় ও মাটির ভিতরের প্রাণীসকল শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালায়। বৃষ্টির জল মাটির উপরে অনেক দিন জমিয়া থাকিলে মাটির এই বায়ুপথসকল জলে ভরিয়া যায়; তখন গাছের শিকড় বাতাসের অভাব বোধ করে এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। শিকড় মরিলে গাছেরও মৃত্যু ভিন্ন গতি নাই।

মাটির জলপথ—বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে তাহার কতকটা মাটির ছিদ্রপথে চুয়াইয়া মাটির তলদেশ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কতকটা তাহার তলদেশে জমিয়া থাকে, সমস্তটা বাহির হয় না। মাটির তলদেশের কতকটা পর্য্যন্ত জলের একটি স্তর সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এই জলস্তরকে ইংরাজীতে "ওয়াটার টেব্‌ল্" (water table) বলে। বিভিন্ন মাটিতে জলস্তরের (water table) গভীরতা বিভিন্ন। কিন্তু সকল মাটিতেই জলস্তর আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মাটির কণার চারিদিকে একটি জলের আবরণ আছে। যে মাটি যত চাপা তাহার কণার জলাবরণগুলি ততই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে অবশেষে একটি জলপথের সৃষ্টি হয়। মাটিতে জল যত বেশী সঞ্চিত হইবে জলাবরণগুলি তত পুরু হইবে; এবং মাটির ভিতরে জলের পরিমাণ যত কমিতে থাকিবে এই জলাবরণগুলিও ততই সূক্ষ্ম হইবে। মাটি হইতে জল যখন বাষ্পাকারে উপরের বাতাসে বাহির হইয়া যায় বা শিকড় যখন জল শোষণ করে, তখন মাটির সেই অংশের জলাবরণের জলের পরিমাণ কমিতে থাকে। এই অবস্থায় তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জলাবরণ হইতে জল টানিয়া লইয়া অভাব পূরণ করিতে থাকে। এইরূপে পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে জলাবরণগুলির স্থূলতার সমতা রক্ষা হয় এবং মাটির তলদেশের জলস্তর (water table) হইতে উপর পর্য্যন্ত একটা প্রবাহ উঠিতে থাকে। জল যতই বাষ্পাকারে বাহির হয় বা শিকড় যতই জল শোষণ করে, মাটি ততই শুকাইতে থাকে ও জলাবরণগুলিও সেই অনুপাতে জলশূন্য হইয়া পড়ে। তাহার পর এমন একটা সময় আসে যখন জলাবরণগুলি হইতে আর জল বাহির করিয়া

লইতে পারা যায় না। তখন মাটিতে জল না দিলে গাছ জলাভাবে মরিয়া যায়। মাটি রৌদ্রে শুকাইয়া ধূলা হইয়া উড়িয়া গেলেও এই জলাবরণ (হাইগ্রস্‌কপিক ওয়াটার=hygroscopic water) খুব সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ ধূলিকণা কখনও একেবারে শুষ্ক হয় না।

একমাপের দুইটি দেশলাইয়ের বাক্সের একটিতে বড় বড় ইটের টুকরা ও অপরটিতে অপেক্ষাকৃত ছোট ইটের টুকরা লইয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, বড় অপেক্ষা ছোট ইটের টুকরা সংখ্যায় বেশী। বড় টুকরার প্রত্যেকটি একখানা কাগজের উপর ফেলিয়া পেন্সিলের দাগ দিয়া তাহাদের গায়ের সকল দিকের বা পার্শ্বের মাপ লইয়া তদনুরূপে গৃহীত ছোট টুকরাগুলির গায়ের মাপের সঙ্গে তুলনা করিলে জানা যায়, ছোট টুকরা গুলির মোট মাপ বড় টুকরার মোট মাপ অপেক্ষা অধিক। অন্য একটা দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যাইতে পারে। একখানা বইয়ের মাপ—১ ইঞ্চি পুরু, ৫ ইঞ্চি লম্বা, আর ৪ ইঞ্চি চওড়া ও তাহার মধ্যে ১০০ পাতা আছে। তাহা হইলে, বইখানির গায়ের সকল দিকের বা পার্শ্বের মাপ কত বর্গ ইঞ্চি আর বইখানির মধ্যের পাতাগুলির গায়ের সকল দিকের বা পার্শ্বের মোট মাপই বা কত বর্গ ইঞ্চি হইবে?

বইখানির মাপ—

বইখানির ছয়টা পার্শ্ব, লম্বা ৫ ইঞ্চি, চওড়া ৪ ইঞ্চি, পুরু ১ ইঞ্চি ; তাহা হইলে—

২ পার্শ্ব, ৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া

=৫×৪×২=৪০ বর্গ ইঞ্চি

যেহেতু ১ খানি বই, সুতরাং=৪০×১=৪০ বর্গ ইঞ্চি

২ পার্শ্ব, ৫ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি পুরু=৫×১×২×১=১০ ,,

২ পার্শ্ব, ৪ ইঞ্চি চওড়া ১ ইঞ্চি পুরু=৪×১×২×১=৮ ,,

মোট ৬ পার্শ্ব ... ... মোট ৫৮ বর্গ ইঞ্চি

পাতাগুলির মাপ—

১০০ খানি পাতা, তাহার ছয়টা পার্শ্ব, লম্বা ৫ ইঞ্চি, চওড়া ৪ ইঞ্চি, পুরু $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি ; তাহা হইলে

২ পার্শ্ব, ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৪ ইঞ্চি চওড়া

=৫×৪×২×১০০=৪০০০ বর্গ ইঞ্চি

২ পার্শ্ব, ৫ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি পুরু

=৫× $\frac{১}{১০০}$ ×২×১০০

=১০ বর্গ ইঞ্চি

২ পার্শ্ব, ৪ ইঞ্চি চওড়া, $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি পুরু

=৪× $\frac{১}{১০০}$ ×২×১০০

=৮ বর্গ ইঞ্চি

মোট ৬ পার্শ্ব ৪০০০+১০+৮=৪০১৮ বর্গ ইঞ্চি

দেখা যাইতেছে যে, পাতাগুলি বইখানির সমান স্থান অধিকার করিলেও অর্থাৎ উভয়ের আয়তন (volume) সমান হইলেও পাতাগুলির সকল পার্শ্বের মোট মাপ বইখানির সকল পার্শ্বের মোট মাপ অপেক্ষা (Surface area) ৪০১৮—৫৮=৩৯৬০ বর্গ ইঞ্চি বেশী।

মাটির সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম খাটে। বড় কণা বিশিষ্ট (বালিমাটি) মাটি ও ছোট কণা বিশিষ্ট (কাদামাটি) মাটির ঠিক এইরূপ প্রভেদ। সেই হেতু ছোট-কণা-বিশিষ্ট মাটির জলাবরণের মোট মাপ বড়-কণা-বিশিষ্ট মাটির জলাবরণের মোট মাপ অপেক্ষা বেশী এবং মাপে বড় বলিয়া ছোট-কণা-বিশিষ্ট মাটিতে বড়-কণা-বিশিষ্ট মাটি অপেক্ষা জলের পরিমাণও বেশী।

মাটিতে গাছের যে সকল মূল খাদ্য থাকে, তাহারা গলিত অবস্থায় এই জলাবরণের মধ্যে থাকে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার যে, মাটির উপরের স্তরেই এই সকল মূল খাদ্য বেশী পরিমাণে থাকে, কারণ জল বাষ্পাকারে এই স্তর দিয়াই বহির্গত হয় ও জলাবরণ মধ্যস্থ গলিত বস্তু জলের টানে এই স্থানে আসিয়া জমা হয়। উপরের স্তর শুকাইয়া গেলে ঐ সকল বস্তু এত বেশী ঘন হইয়া পড়ে যে, গাছ তাহা শোষণ করিতে পারেনা, সুতরাং খাদ্য থাকা সত্ত্বেও জলের অভাবে গাছের খাদ্যাভাব ঘটে। আবার এই স্তরে খাদ্যবস্তু যদি কোন কারণে কম হইয়া পড়ে অথচ পরিমাণ মত জল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও খাদ্যের স্বল্পতা হেতু গাছের খাদ্যাভাব হয়। এইরূপ মাটিতে সার না দিলে অথবা নূতন করিয়া তাহার উপর গাছপালা, জীবজন্তু পচিয়া বা মলমূত্র জমিয়া আর একটি নূতন স্তর না পড়িলে তাহাতে গাছ জন্মে না। প্রথমে এই সকল মাটিতে ঘাস ও ছোট ছোট গাছ ভিন্ন বড় গাছ জন্মায় না। ক্রমে মাটির নূতন স্তর যেমন পুরু হইতে থাকে, বড় গাছও তেমনি জন্মিতে আরম্ভ করে।

উদ্ভিদ্‌শরীর

উদ্ভিদ্‌শরীর একটি মাত্র মূল বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। এই মূল বস্তুটিকে জীব-কোষ (Cell) বলে।

নিম্নতম শ্রেণীর উদ্ভিদ্ একটি মাত্র কোষের দ্বারা নির্ম্মিত। এই একটি কোষ লইয়াই তাহাদের শরীর ও জীবন আরম্ভ, এবং এই একটি কোষেই তাহাদের জীবনের শেষ। একটি কোষ হইতেই তাহাদের সন্তানাদি হয়। এই কোষ এত ছোট যে তাহা চ'খে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহা দেখিতে হয়। সুতরাং তাহার আকৃতি ছবি ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে বুঝাইবার উপায় নাই। একটি কোষনির্ম্মিত উদ্ভিদের ছবি দিয়া কোষের গঠন বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কোষপ্রাচীর—কোষের ভিতরের অংশকে বাহিরে আসিতে না দিবার জন্য (অর্থাৎ তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য) কোষের চারিদিকে একটি প্রাচীর বা খোলা আছে। এই প্রাচীর বা খোলাকে কোষপ্রাচীর বলে। ইহা শক্ত বস্তু দিয়া তৈয়ারী এবং ইহাই কোষের

কাঠাম। এই অংশ রূপান্তরিত হইয়া কাষ্ঠে পরিণত হয়। গাছের খাদ্যের দশটি কাঁচা মালের মধ্যে অঙ্গার বা কার্ব্বণ (carbon), হাইড্রজেন (hydrogen), ও অক্সিজেন (oxygen) এই তিনটি একত্রে মিলিত হইয়া সেলুলোজ (cellulose) নামে একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। কোষপ্রাচীর (cell wall) ইহাদ্বারাই নির্ম্মিত। সেলুলোজ (cellulose) স্বচ্ছ, বর্ণহীন, উজ্জ্বল ও রবারের ন্যায় সঙ্কোচ-প্রসারণশীল (অর্থাৎ টানিয়া ধরিলে বাড়ে ও ছাড়িয়া দিলে কমিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়)। কোষের অভ্যন্তরে যে সকল তরল বস্তু আছে, তাহার জলেই কোষপ্রাচীর সিক্ত থাকে। কোষপ্রাচীর যতক্ষণ বিশুদ্ধ

চিত্র—১
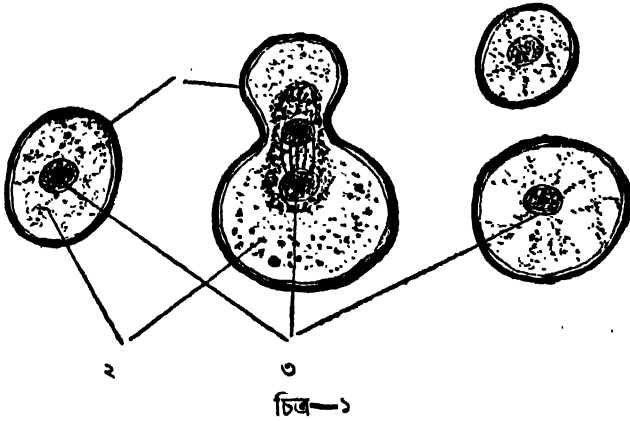
১। কোষপ্রাচীর ২। প্রোটোপ্লাজম্

৩ নিউক্লিয়াস্

অবস্থায় অর্থাৎ সেলুলোজ (cellulose) অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ জলশোষণ করিবার ক্ষমতাও তাহার থাকে। কিন্তু পরে ইহার (সেলুলোজের) পরিবর্ত্তন হয়; তখন তাহার পূর্ব্ব অবস্থার সঙ্কোচ-প্রসারণশীলতা ও জলশোষণের ক্ষমতা লোপ পায়। তখন বরং ইহার জল রোধ করিবার ক্ষমতা জন্মে। কোষপ্রাচীরের কি পরিবর্ত্তন হয় ও কেমন করিয়া হয়, তাহা পরে বলিব।

প্রোটোপ্লাজম—কোষপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত জলের ও অন্যান্য তরলাকার এবং দানাদার পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত আঠাবৎ পদার্থই কোষের জীবিত পদার্থ। গাছের যা কিছু কার্য্য ইহাদ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহা সকল ক্রিয়াশক্তির আধার। ইহার নাম প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। যে কোষে প্রোটোপ্লাজম নাই, তাহা মৃত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা গতিশীল অর্থাৎ নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। কচি অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমে শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ জল থাকে। অঙ্গার বা কার্ব্বণ, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেন ও গন্ধক দিয়া ইহা তৈয়ারী। কোষপ্রাচীর এই প্রোটোপ্লাজম হইতেই উৎপন্ন হয়।

প্রোটোপ্লাজম স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে স্বচ্ছ ও কণিকাবৎ (কিন্তু ইহার চেহারা ফেণার মত)। কচি কোষের ভিতরের সমস্ত স্থান প্রোটোপ্লাজমে ভর্ত্তি থাকে। সকল জীবিত কোষেরই প্রাচীরের অন্তর্গাত্রে ইহা সংলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থানের প্রোটোপ্লাজম সমান ঘন নহে; কোষপ্রাচীরসংলগ্ন অংশ অপেক্ষাকৃত তরল, কারণ এখানে কণিকার ভাগ কম। কোষের স্থানে স্থানে প্রোটোপ্লাজম অতিরিক্ত ঘন হইয়া নানা আকারের ছোট ছোট পিণ্ডের বা ঢেলার সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজমও অল্পপরিমাণে সঙ্কোচ-প্রসারশীল এবং জলের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে ইহার সঙ্কোচ-প্রসার এবং কার্য্যকারিতা-শক্তিরও তারতম্য হয়। জল কম হইলে ইহার সঙ্কোচ হয় ও কার্য্যকরী শক্তি কমে, জল শুকাইয়া গেলে ইহার মৃত্যু হয়। জল বেশী হইলে ইহার প্রসার হয় ও কার্য্যকরী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। অধিক তাপে বা মদ বা সুরার সহিত মিলিত হইলে জমাট বাঁধিয়া মরিয়া যায়। প্রোটোপ্লাজম জমাট বাঁধিয়া ছানার ন্যায় শক্ত ধরণের হয়। ইংরাজীতে ইহাকে "কোএগুলেসান্" (coagulation) বলে।

নিউক্লিয়াস—প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত গোল পিণ্ডাকৃতি বা ঢেলাপাকান বস্তুটিকে কোষের নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বলে। ইহা নরম, স্বচ্ছ ও স্পঞ্জের মত ফোঁপরা। ইহার উৎপত্তি হয় প্রোটোপ্লাজম হইতে। প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গার বা কার্ব্বণ, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেন, এবং গন্ধকের সহিত ফস্ফরাসের যোগে ইহার সৃষ্টি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোষের তথা উদ্ভিদ্ জীবনের যা কিছু কার্য্য, তৎ সমুদয়ই প্রোটোপ্লাজমের দ্বারা সম্পাদিত হয়; কিন্তু সেই সমুদয় কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত করে এই নিউক্লিয়াস্ ; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসই প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল—প্রাণকেন্দ্র। জীবিত কোষ মাত্রেই নিউক্লিয়াস থাকে। [সিভ্ টিউবে (sieve tube—চালুনি কোষ) নিউক্লিয়াস থাকে না। ইহার কথা "উদ্ভিদ্‌শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠন" অধ্যায়ে বলা হইবে।]

নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বাড়ে, নতুবা গাছের বংশ বৃদ্ধি হয় না। নিউক্লিয়াসের ভিতর ছোট টিপ বা তিলের মত একটি বস্তু আছে, তাহাকে নিউক্লিওলাস্ (nucleolus) বলে।

নিউক্লিয়াস কিরূপে বিভক্ত হয়, তাহার একটি ছবি প্রদত্ত হইল।

কচি অবস্থায় কোষের ভিতরের সমস্ত স্থান প্রোটোপ্লাজমে ভরিয়া থাকে। কিন্তু কোষ যখন বড় হয় ও আয়তনে বাড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে কোষপ্রাচীরের এবং প্রোটোপ্লাজমেরও প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটে, এবং তাহার ভিতরে নানা আকারের ছোট ছোট গর্ত্ত হয়। এই সকল গর্ত্ত জল ও জলের সহিত গলিত নানা বস্তুতে ভরা থাকে। গর্ত্তগুলিকে ইংরাজীতে ভ্যাকুয়োল (vacuole) বলে এবং গর্ত্তের মধ্যস্থ বস্তুকে "সেল-স্যাপ" (cell sap) বলে।

সবুজ রংয়ের যে সকল উদ্ভিদ আছে, তাহাদের কোষে নিউক্লিয়াস ছাড়া আরও কতকগুলি নানা আকারের পিণ্ডাকৃতি বস্তু প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। গাছের পাতার

একটি কোষের ছবি (২ নং) দিয়া তাহা দেখান হইল। প্রোটোপ্লাজম ঘন হইয়া পিণ্ডাকারে রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারাও নিউক্লিয়াসের ন্যায় বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বাড়ে। ইহাদের বলে প্লাসটিড্ (plastid)। এই প্লাসটিড দুই প্রকারের,—এক প্রকার বর্ণহীন ও অন্যপ্রকার সবুজ। বর্ণহীন প্লাসটিডকে লিউকোপ্লাষ্ট (leucoplast) ও সবুজ প্লাসটিডকে ক্লোরোপ্লাসটিড (chloroplastid) বা ক্লোরোপ্লাষ্ট (chroloplast) বলে। আমরা উহাকে পত্রহরিৎবিশিষ্ট ক্লোরোপ্লাষ্ট বা সবুজ প্লাসটিড বলিব।

বর্ণহীন প্লাসটিড (লিউকোপ্লাষ্ট) পত্রহরিতে (সবুজ রং-এ) রঞ্জিত হইয়া সবুজ প্লাসটিডে পরিণত হইতে পারে। তখন উহা তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বর্ণহীন প্লাসটিড চিনি হইতে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ তৈয়ারী করে। যে সকল অংশ আলো পায় না, সেই সকল অংশে এই শ্বেতসার বিদ্যমান থাকে।
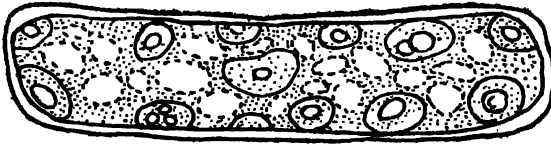
চিত্র—২
নিউক্লিয়াস্ ও পিণ্ডাকৃতি বস্তু

সবুজ প্লাসটিড বা পত্রহরিৎবিশিষ্ট কণা—ইহারা উদ্ভিদ্‌জীবনের প্রধান অবলম্বন। ইহারা কাঁচা মাল হইতে গাছের খাদ্য প্রস্তুত করে। গাছের সমস্ত সবুজ অংশ ইহাদের দ্বারা পূর্ণ। তাহার মধ্যে পাতাই প্রধান। ইহারা না হইলে গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয় না; সুতরাং গাছের সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষ হইলে এবং উদ্ভিদ্‌দেহে পত্রহরিৎবিশিষ্ট কণার অভাব ঘটিলে নূতন খাদ্য প্রস্তুত না হওয়ায় খাদ্যাভাবে গাছ মরিয়া যায়।

এখন দেখা যাক, গাছের এত দরকারী সবুজ রংটি কোথা হইতে আসে বা কেমন করিয়া জন্মায়। এই সবুজ রংকে পত্রহরিৎ (chlorophyll) বলে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পত্রহরিৎ (chlorophyll)—পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অঙ্গার বা কার্ব্বণ, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ও ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ দিয়া পত্রহরিৎ তৈয়ারী। লৌহ যদিও পত্রহরিতের মধ্যে পাওয়া যায় না, তথাপি দেখা গিয়াছে যে, লৌহ না হইলে পত্রহরিৎ জন্মিতে পারে না। উহার জন্য আলোরও প্রয়োজন, অন্ধকারে পত্রহরিৎ উৎপন্ন হয় না। উহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তাপ এবং শর্করা বা শালি জাতীয় বস্তুর দরকার। কারণ এই সকল বস্তু কার্ব্বণ, হাইড্রজেন ও অক্সিজেনের অংশ জোগায়। দেখা গেল যে, কার্ব্বণ, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রজেন, ম্যাগ্‌নিসিয়াম্, লৌহ—এই কয়েকটি অনঙ্গারক বস্তু, শর্করা বা শালি জাতীয় অঙ্গারক বস্তু এবং আলো ও তাপ না হইলে পত্রহরিৎ জন্মায় না।

উদ্ভিদখাদ্যের মূল উপাদানের দশটি অত্যাবশ্যক পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা নীচে তালিকাকারে দেখান গেল—

অংশ	মূল পদার্থ
কোষ প্রাচীর—	(১) কার্ব্বণ, (২) হাইড্রজেন, (৩) অক্সিজেন
প্রোটোপ্লাজম—	(১) কার্ব্বণ, (২) হাইড্রজেন (৩) অক্সিজেন (৪) নাইট্রজেন (৫) সালফার
নিউক্লিয়াস—	(১) কার্ব্বণ, (২) হাইড্রজেন (৩) অক্সিজেন (৪) নাইট্রজেন (৫) সালফার (৬) ফস্ফরাস
পত্রহরিৎ—	(১) কার্ব্বণ (২) হাইড্রজেন (৩) অক্সিজেন (৪) নাইট্রজেন (৫) ম্যাগ্‌নিসিয়াম্‌ (৬) লৌহ

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দশটি পদার্থের মধ্যে আটটি পদার্থই কোষনির্ম্মাণের কাজে লাগিতেছে। যদিও পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়ামের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নাই, তথাপি দেখা গিয়াছে যে, পটাসিয়াম না থাকিলে শর্করা বা শালি জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না। তা' ছাড়া পটাসিয়াম গাছের বলবর্দ্ধক।

ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম নিজেরা কোষ-শরীরের উপাদান না হইলেও পরোক্ষভাবে একটি কোষপ্রাচীর তৈয়ারী করিতে ও অপরটি শর্করা বা শালি জাতীয় খাদ্য তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে। কিন্তু কি ভাবে যে করে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

উদ্ভিদশরীরে বাকী যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয় না, যাহাতে তাহাদের অভাবে উদ্ভিদের ক্ষতি হইতে পারে।

কোষপ্রাচীর, প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও প্লাসটিড্‌ লইয়া উদ্ভিদের দেহ। এ-সকল ছাড়া প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে উৎপন্ন আরও অন্যান্য বস্তু উদ্ভিদের মধ্যে আছে,—তবে তাহারা সকল কোষে নাই, সমান ভাবেও নাই।

অরও এক জাতীয় বস্তু গাছের খাদ্য তৈয়ারী করিতে এবং খাদ্যকে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করে। তা' ছাড়া ইহারা উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহাদের এন্‌জাইম্‌ (enzyme) বলে। ইহারা আঠাবৎ পদার্থ ও প্রোটোপ্লাজমে বিদ্যমান থাকে। পরে ইহাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

তারপর শ্বেতসার (starch) বা শর্করা বা শালি জাতীয় পদার্থ (carbohydrate)। ইহা কার্ব্বণ, হাইড্রজেন ও অক্সিজেন দিয়া তৈয়ারী। জলে যেমন হাইড্রজেন অক্সিজেনের দ্বিগুণ পরিমাণে থাকে, ইহাতেও এই দুইটি পদার্থ ঠিক ঐ অনুপাতেই থাকে। ইহারা সবুজ কণিকা বা ক্লোরোপ্লাষ্টের ভিতরে তৈয়ারী হয় ও সেখান হইতে অন্য কোষে পরিচালিত হইয়া তথায় খাদ্যরূপে সঞ্চিত থাকে।

ইহা ছাড়া উদ্ভিদ্‌শরীরে তেল, চর্ব্বি, গঁদ, ধুনা, প্রটিড, সাদা আঠা (যাহা হইতে রবার তৈয়ারী হয়), গন্ধদ্রব্য, ট্যানিন্‌, গ্লুকোসাইড, এলকালয়েড প্রভৃতি অন্যান্য অনেক বস্তু আছে।

এই সকল পদার্থ হইতে আফিম, খয়ের, ঔষধ ও অন্যান্য আরও অনেক উপকারী বস্তু তৈয়ারী হয়।

উদ্ভিদ্‌শরীরের গঠন-প্রক্রিয়া—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদ্‌শরীরের উৎপত্তির মূলে আছে একটি জীবকোষ। এই একটি কোষই সংখ্যায় বাড়িয়া অনেকগুলি কোষের সৃষ্টি করে এবং নিজেরা নানাভাবে সজ্জিত হইয়া উদ্ভিদ্‌শরীর গঠন করে।

একটি কোষ কিরূপে সংখ্যায় বাড়িয়া উদ্ভিদ্‌শরীর গঠন করে, তাহা বলি।

চিত্রের (৩নং) উপর দিকে যে কোষটি রহিয়াছে তাহার নিউক্লিয়াস প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হয় ও তাহার মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম হইতে কোষপ্রাচীর উৎপন্ন হইয়া দুইটি কোষে

১

২

৩
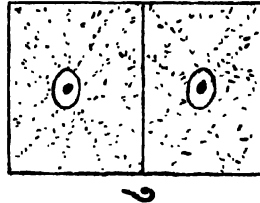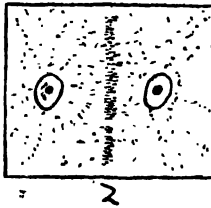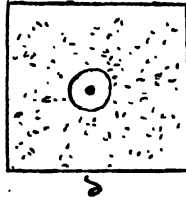
চিত্র—৩
কোষবিভাগ

পরিণত করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক কোষ নানাদিকে বিভক্ত হইয়া অগণ্য কোষের সৃষ্টি করে, এবং পরস্পরের চাপে নানাভাবে সজ্জিত হইয়া নানারকম আকৃতি লাভ করে। এই ভাবেই উদ্ভিদ্‌শরীর গঠিত হয়। এই সকল কোষের অবস্থান-প্রণালী ও সজ্জা-শৃঙ্খলার উপর বৃক্ষের আকৃতি নির্ভর করে, কিন্তু প্রকৃতি নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক আলো, বাতাস, ও তাপ প্রভৃতির উপর।

কোষবিভাগ—কোষবিভাগ সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব (৪ নং চিত্র)।

কোষমধ্যে প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস আছে। প্রথমে এই নিউক্লিয়াস (ছয়টি) সমান অংশে বিভক্ত হয়। তাহার পর আবার প্রত্যেকটি অংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মোট

ছয় জোড়া অংশে পরিণত হয়। তৎপরে ইহারা কোষের মধ্যে উপর-হইতে-তলা পর্য্যন্ত লম্বাভাবে সজ্জিত হয় এবং প্রত্যেক অংশ কোষের দুই মেরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেন্দ্র করিয়া সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজমের সূত্রদ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই ছয় জোড়া কণিকা ছয়টি করিয়া
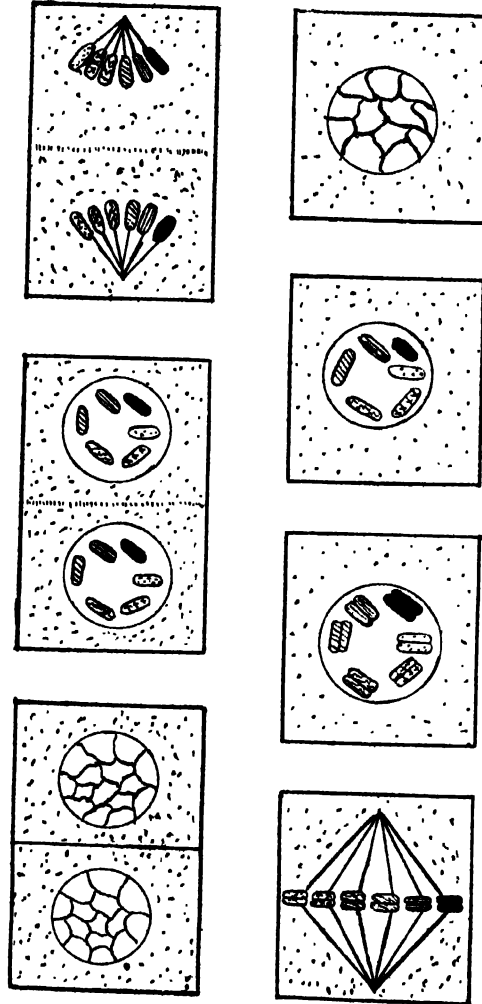
চিত্র—৪
কোষবিভাগ (বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত)

কণিকাসমষ্টিতে পৃথক হইয়া কোষের দুই মেরুতে চলিয়া যায়। তাহার পর প্রোটোপ্লাজম হইতে এই দুইটি কণিকাগুচ্ছের মাঝখানে কোষপ্রাচীর উদ্ভূত হয় এবং কণিকাগুলি পুনর্মিলিত হইয়া একটি করিয়া দুইটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। এইরূপে দুইটি সম্পূর্ণ নূতন কোষ

জন্মলাভ করে। কোষ দুইটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা থাকিলেও প্রাচীরগাত্রের একপ্রকার সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রোটোপ্লাজমের সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা পরস্পরের প্রোটোপ্লাজমের যোগ থাকিয়া যায়।

অঙ্কুরের উৎপত্তি—গাছের জন্ম বীজের মধ্যস্থ একটি কোষ হইতে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে গাছ হয়। বীজ পূর্ব্বেকার গাছ হইতে উৎপন্ন,
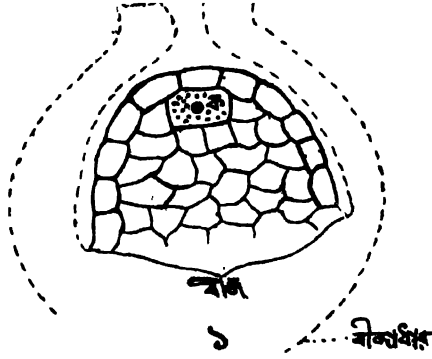
চিত্র—৫

বীজাধার ও বীজ

সুতরাং তাহার দেহ মাতৃগাছ হইতে প্রাপ্ত কোষসমষ্টি দ্বারা তৈয়ারী; কিন্তু বীজ হইতে যে অঙ্কুর জন্মে, তাহার উৎপত্তি বীজের মধ্যস্থ একটি কোষ হইতে। বীজস্থ এই একটি কোষই ডিম্বকোষের মূল—ডিম্বকোষ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি ও অঙ্কুর হইতে গাছ।
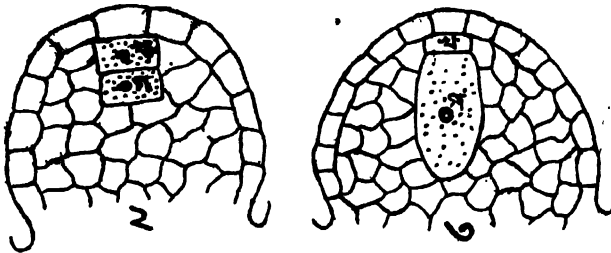
চিত্র—৬

বীজের নিউক্লিয়াস্-বিভাগ

বীজাধারের মধ্যে কচি বীজের ছবিটিতে (ছবি নং৫) বীজের বহির্ভাগস্থ সাদা কোষ-শ্রেণীর ঠিক নীচে বীজের উপর দিকে একটি কৃষ্ণবর্ণ কোষ (ক) দেখান হইয়াছে। ইহা হইতেই

ডিম্বকোষের উৎপত্তি। প্রথমে এই কোষের নিউক্লিয়াস্ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয় (৬নং ছবি ২—খ, গ)—এতন্মধ্যে "গ" কোষ বড় ও লম্বা হইয়া ডিম্বাধারে পরিবর্ত্তিত
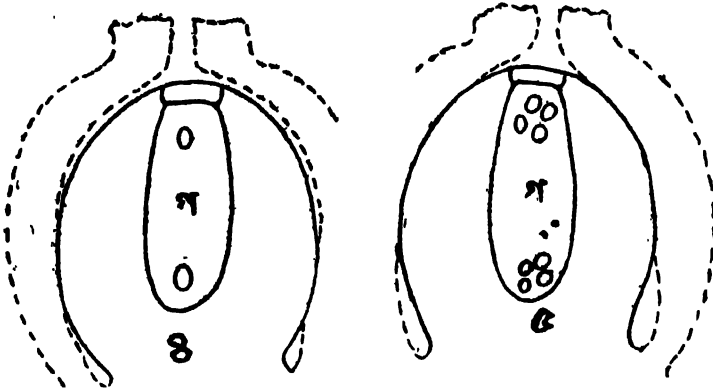
চিত্র—৭
বীজের নিউক্লিয়াস্-বিভাগ

হয়। কখনও কখনও "ক" কোষ বিভক্ত না হইয়া নিজেই ডিম্বাধার হইয়া থাকে। "গ" কোষও কখনও কখনও বিভক্ত হয়; তখন উহার দ্বিতীয় অংশ হয় ডিম্বাধার। "গ" কোষ যেমন বড় হইতে থাকে, "খ" কোষ ক্রমে লোপ পাইয়া যায়।
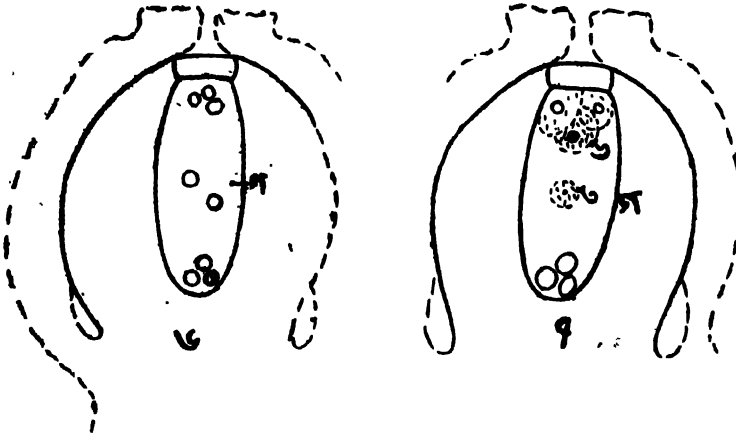
চিত্র—৮
বীজের নিউক্লিয়াস্-বিভাগ
ও
নূতন নিউক্লিয়াস্-গঠন

বীজ বড় হইবার কালে ডিম্বাধারের নিউক্লিয়াস্‌টি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কোষের লম্বাদিকের দুই মেরুতে (অর্থাৎ উপর ও নীচের দিকে) সরিয়া যায়। তথায় পুনর্বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক প্রান্তে চারিটি করিয়া মোট আটটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। তাহার পর প্রত্যেক প্রান্ত হইতে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস কোষের মধ্যস্থলে আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, এবং একটি অখণ্ড নিউক্লিয়াস্ গঠন করে (৮ নং ছবির "ঢ")। এই সময় কোষের মধ্যে আটটির স্থানে সাতটি নিউক্লিয়াস্ থাকে। (কোষের মধ্যস্থলে একটি ও দুইপ্রান্তে তিনটি করিয়া ছয়টি, মোট সাতটি)। বীজশীর্ষের নিউক্লিয়াস্ তিনটির মধ্যে যে-টি সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত (৮নং এবং ৯নং ছবির "ড") তাহাই ডিম্ব। পরাগপতনের পর ফুলের রেণু হইতে একটি কলি বাহির হইয়া বীজাধারের ছিদ্রপথ দিয়া বীজের ভিতরে প্রবেশ লাভ করে। রেণুকলি মধ্যস্থ দুইটি নিউক্লিয়াস্
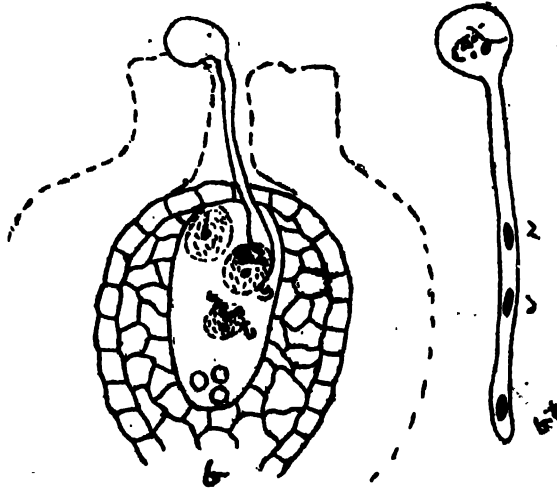
চিত্র—৯

রেণু, ডিম্ব ও ডিম্বাধার

বীজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডিম্বাধারে পৌঁছাইলে কলিটির গাত্রাবরণ ছিন্ন হইয়া যায়; তখন তাহারা ডিম্বাধারের প্রোটোপ্লাজমের স্থান লাভ করে। রেণুর প্রথম নিউক্লিয়াস্ ডিম্বাধারের "ঢ" নিউক্লিয়াসের সহিত ও দ্বিতীয়টি ডিম্বটির সহিত ("ড") মিলিত হয়, এবং ইহাদের সহিত মিশিয়া "ড" ও "ঢ" তে পরিণত হয়। সুতরাং "ড" মোট দুইটি নিউক্লিয়াসের দ্বারা তৈয়ারী হইল,—একটি ডিম্বাধারের ও অপরটি রেণুর। "ঢ" তৈয়ারী হইল, তিনটি নিউক্লিয়াস্ দ্বারা,—দুইটি ডিম্বাধারের ও একটি রেণুর। অতঃপর এই ডিম্বে কোষপ্রাচীরের সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন নিউক্লিয়াসের কোষপ্রাচীর থাকে না, এই প্রথম ডিম্ব মধ্যে কোষপ্রাচীর গঠিত হইয়া উহাকে ডিম্বকোষে পরিণত করে।

তৎপর ডিম্বকোষ ও "ঢ" নিউক্লিয়াস্ ছাড়া বাকী পাঁচটি নিউক্লিয়াস্ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়।

চিত্র—১০

ডিম্বকোষ
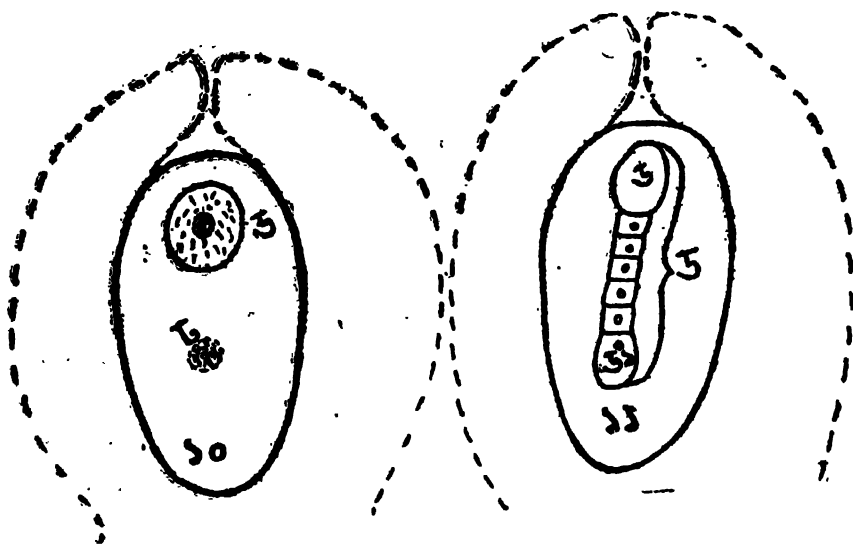
চিত্র—১১

ডিম্বকোবের বৃদ্ধি

এখন ডিম্বকোষ কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া অঙ্কুরের সৃষ্টি করে তাহা দেখা যাক :

সর্ব্বাগ্রে এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, পরাগস্থ নিউক্লিয়াস্ ডিম্বের সহিত মিশ্রিত না হইলে ডিম্বকোষ জন্মিতে পারেনা এবং সেই বীজ হইতে অঙ্কুর বা গাছ হয় না।

চিত্র—১২
ডিম্বকোষের বৃদ্ধি—
কোষবিভাগ

চিত্র—১৩
ডিম্বকোষের কোষবিভাগ

চিত্রে ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন দেখান গেল। প্রথমে ডিম্বকোষ একটি কোষ রূপে ("ড") বর্ত্তমান থাকে; তাহার পর ইহার নিউক্লিয়াস্ বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়।

চিত্র—১৪
ডিম্বকোষ হইতে অঙ্কুরের
বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি

ইহাদের মধ্যে প্রথম কোষটি (উপরের কোষ) আর বিভক্ত হয় না, কিন্তু আয়তনে বাড়িয়া যায়। তাহার পর দ্বিতীয় কোষটি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইয়া একটি পর-পর সজ্জিত কোষশ্রেণী নির্ম্মাণ

করে। এই কোষশ্রেণীর উপরের কোষটি (ড১) লম্বাদিকে চারি ভাগে ও চওড়া দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মোট আটটি কোষে পরিণত হয়।—১২ নং চিত্রে সম্মুখের চারিটি কোষ দেখা যাইতেছে ; কিন্তু ইহাদের পিছনে ঐরূপ আরও চারিটি কোষ আছে। এই আটটি কোষের বহিঃপ্রাচীরের সমান্তরালে (Parallel) নূতন প্রাচীর গঠিত হইয়া ইহাদিগকে ষোলটি কোষে পরিণত করে। তাহার মধ্যে আটটি বহির্ভাগে থাকিয়া বাকী আটটিকে আবৃত করিয়া রাখে। বাহিরের আটটি কোষ চওড়া ভাবে (transverse) বিভক্ত হইয়া অঙ্কুরের তথা সমস্ত গাছের বহিরাবরণ বা চামড়া তৈয়ারী করে। ভিতরের আটটির মধ্যে উপরদিকের চারিটি কাণ্ড ও বীজপত্রের এবং নিম্নের চারিটি শিকড়ের সৃষ্টি করে। ভিতরের এই কোষগুলি পুনরায় বিভক্ত হইয়া নূতন কোষের সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে সকলের মধ্যবর্ত্তী কোষগুলি (১৪ নং চিত্রে কাল রং-এ চিহ্নিত হইল) হইতে গাছের

চিত্র—১৫

অঙ্কুরের বৃদ্ধি

কাষ্ঠঅংশের সৃষ্টি হয়। বহিরাবণকোষ ও কাষ্ঠঅংশের মধ্যবর্ত্তী কোষগুলি হইতে গাছের ছাল উৎপন্ন হয়। এখন এই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া একটা হরতনের আকার প্রাপ্ত হয় (১৫ নং চিত্র) ; এই সময় "ড২" কোষ বিভক্ত হইয়া তিন সারি কোষের সৃষ্টি করে। তাহার মধ্যে কাষ্ঠ অংশের নিম্নবর্ত্তী কোষ হইতে শিকড়ের ছাল ও সর্ব্বনিম্ন কোষ হইতে শিকড়ের আচ্ছাদন তৈয়ারী হয়। হরতনের শীর্ষদিকের অবনমিত অংশের নিম্নকোষ হইতে ভ্রূণ-কাণ্ড এবং পার্শ্ব হইতে বীজপত্রের সৃষ্টি হয়। হরতনের নিম্নাংশ সৃষ্টি করে ভ্রূণ-মূল।

"ঢ" কোষও সঙ্গে সঙ্গে বিভক্ত হইয়া বহু কোষের সৃষ্টি করে। পরে এইগুলি বীজের খাদ্যে

পরিণত হয়, অথবা "ড" কোষ বৃদ্ধির সহিত লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর ইহা (অর্থাৎ "ড" ডিম্বাধার) আরও বাড়িয়া বীজে পরিণত হয় (১৬ নং চিত্র)।

দেখা গেল যে, অঙ্কুর অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বৃক্ষ একটি মাত্র মূল কোষ হইতে সৃষ্ট। ডিম্বকোষে আছে পরাগ ও ডিম্বের অংশ, অর্থাৎ উদ্ভিদের পিতৃ ও মাতৃ অংশ। সুতরাং অঙ্কুর পিতৃ ও মাতৃ অংশে মিলিত একটি ডিম্বকোষ হইতে উৎপন্ন, এবং ডিম্বকোষের জন্ম বীজমধ্যস্থ একটি কোষ হইতে।
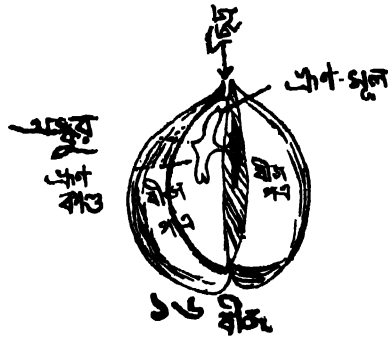
চিত্র—১৬
বীজ

যে সকল বীজের দুইটি করিয়া বীজপত্র, তাহাদের অঙ্কুরের উৎপত্তি এই প্রকারে হইয়া থাকে; কিন্তু যাহাদের একটি করিয়া বীজপত্র, তাহাদের জন্ম-ইতিহাস সামান্য একটু বিভিন্ন হইলেও প্রায় ইহার অনুরূপ। তাই আর পৃথক ভাবে তাহার আলোচনা করিলাম না।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

(৬)

অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়

নব্য ভারতে রসায়নবিদ্যার প্রচার

ও

ভারতীয় রাসায়নিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় রাসায়নিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার মূলে রসায়নী বিদ্যাচর্চ্চার জন্য যে অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাপ্য। ভাবপ্রবণ ভারতবাসীর মনে বিজ্ঞানালোচনার প্রবৃত্তি তিনিই সঞ্চারিত করিয়াছেন।—"It is he who, to the nation of metaphysicians and visionaries has added the lustre of a school of experimental and inductive scientists." প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় আজ ভারতময় বিজ্ঞানালোচনার, বিশেষতঃ রসায়নী বিদ্যাচর্চ্চার জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রঙ্ ও সাড্‌বরো প্রভৃতি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।*

ভারতময় রসায়নবিদ্যাচর্চ্চার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার পুষ্টির জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে প্রাচীন এবং সমসাময়িক ভারতে বিজ্ঞানালোচনার অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণ এবিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' পাঠে জানা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে রসায়নী বিদ্যা প্রচারের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় মনীষিগণ এবিষয়ে বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ভেলি, বেবর প্রমুখ ব্যক্তিগণ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মন্তব্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

* Professor Armstrong has more than once publicly admitted the fact; and Professor Sudborough did not hesitate to say at the last Science Congress (1917) that the Indians had done good work under the influence of Professor Ray long before the European Science Professors were imported into India, and that to him really belongs the credit of being the pioneer of chemical research in India. —F. V. Farnandes.

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৭০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতির যুগ। ইহার পর হইতে ভারতে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, এবং আরবীয়গণের মারফতে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান য়ুরোপে প্রচারিত হইয়া তথায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতে এই বিজ্ঞানের দীপনির্ব্বানের হেতু সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র 'বাঙ্গালী মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

বহুদিনের পরাধীনতার ফলে যখন লোকের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির লোপ হইতে থাকে, তখনই ভ্রাতায় ভ্রাতায় অবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির সূত্রপাত করে। এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই ভারতবাসী জ্ঞানবিজ্ঞানের চেষ্টা পরিহার করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষার অতি-ব্যস্ততায় আপনাদিগের হস্তগত পুঁথিগুলি পর্য্যন্ত এমন ভাবে লুকাইয়া ফেলিলেন যে, তাহা আর লোকলোচনের গোচরীভূত হইল না, কেবল উই আর ইঁদুরের আহার্য্যে পর্য্যবসিত হইল। অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, একের আয়ত্ত পুঁথি বা বিদ্যা অন্যকে দেখাইতে বা দান করিতে একটা সহজ অপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হইল। বাঙ্গলাদেশেই বহু পুঁথি ও অধিগত বিদ্যা এইরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সামান্য কুলজী বা বংশাবলীর পুঁথি সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া এখনও অনেক স্থলে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়।

এইরূপে আমাদিগের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খলতার চরম সীমায় উপনীত, তখন এই বিশৃঙ্খলতার পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের পত্তন ও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধানতঃ এই ইংরাজ শাসনের এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরোক্ষ ফলে যে বিজ্ঞান একদিন ভারত হইতে য়ুরোপে প্রবাসযাত্রা করিয়া তথায় পোষ্যপুত্ররূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

সুখের বিষয়, ভারতের এই নব বৈজ্ঞানিক জাগরণ বাঙ্গালীকে আশ্রয় করিয়াই সাড়া দিয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে রাষ্ট্রশক্তির উন্মেষ কিম্বা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে বাঙ্গালীর কোন কৃতিত্বের নিদর্শন সুস্পষ্ট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নব্য ভারতে নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর এই প্রাচীন অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর শক্তি ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে ইহা কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালীর এই অন্তর্নিহিত শক্তি লক্ষ্য করিয়াই বহুদিন পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছিলেন—

"The Bengalee has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the

varied nationalities of the Indian Empire"—Rev. M. A. Shooring, M.A., L.L.B.*

নব্যভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, য়ুরোপীয় রাজনীতির প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ বাঙ্গালীর চেষ্টারই ফল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করেন। তিনিই প্রথমে য়ুরোপীয় অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া এদেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। রামমোহন রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত বা প্রাচ্য শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা ভারতের উন্নতি হইতে পারে না; ভারতকে অন্যান্য প্রতীচ্য দেশের ন্যায় উন্নত করিতে হইলে, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা ব্যতীতও পাশ্চাত্য গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮২৩ অব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণকামীর নিকট তাহা মুক্তির পথ-প্রদর্শক।

১৮১৭ খৃঃ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইংরাজী ভাষা, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতির চর্চ্চা দেশে আরব্ধ হইলেও, বিজ্ঞানানুশীলনের দিকে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পর অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল গত হইলে বাংলার ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) বাস্তবিক বিজ্ঞানশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে রীতিরক্ষার নিমিত্ত হিন্দু কলেজে একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকিতেন। তাঁহাকে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ই শিক্ষা দিতে হইত। সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল মহোদয় এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় পারদর্শী দুই জন অধ্যাপক স্বতন্ত্রভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে ১৮৭৪ সালে সুবিখ্যাত আলেকজান্দার পেডলার রসায়নের ও জর্জ্জ ওয়াট উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। উভয়েই খুব সুদক্ষ ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই উত্তরকালে 'সার' উপাধি লাভ করেন। পেডলার পরে বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ধীরে ধীরে ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি, তথা তাঁহার অধ্যাপনীয় বিষয়ের প্রতি, আকৃষ্ট হইতে থাকে। পেডলারের আমল হইতে বাংলায় রসায়নশাস্ত্র-অধ্যাপনার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ কারণ তাঁহার নাম চিরকাল বাঙ্গালীর স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তাঁহার অধ্যপনাকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষণাগার ধীরে ধীরে গঠিত হইতে থাকে। এই সময়ে এম, এ পরীক্ষার জন্য খুব সামান্য ভাবে পরীক্ষণ-

* 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'—৫১ পৃষ্ঠা

ক্রিয়া আবশ্যক হইলেও, বি, এ পরীক্ষার জন্য উহা আদৌ আবশ্যক হইত না। মফঃস্বল কলেজে বি, এ এবং এফ, এ পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান পড়ান হইত বটে, কিন্তু যন্ত্রাদি প্রদর্শন বা ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ চিত্র খড়ির সাহায্যে বোর্ডে আঁকিয়া দেখান হইত। ক্রমে ক্রমে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রের যোগ হয়। প্রধানতঃ সার আলেকজান্দার পেডলার ও সার জন ইলিয়ট (Sir John Eliot) প্রভৃতির চেষ্টায়ই বি, এ পরীক্ষা বিজ্ঞান-পরীক্ষণমূলক করা হয়। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের গৃহের আয়তন ও যন্ত্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৯৪ সালে বাংলার ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়টের আমলে ১৬০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়।

বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষণ-ক্রিয়ার সাহায্যে মৌলিক তত্ত্বাবিষ্কার জিনিষটা বহুদিন ভারতে সৌখিনতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। য়ুরোপ ভিন্ন ভারতে যে মৌলিক গবেষণা হইতে পারে এরূপ ধারণাও অনেকে পোষণ করিতেন না। ভারতে সর্ব্বপ্রথম মৌলিক গবেষণা প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব সার আলেকজান্দার পেডলারের।* প্রেসিডেন্সি কলেজের সামান্য যন্ত্রাগারের সাহায্যে তিনি তাঁহার গোখুরা-বিষ (Cobra poison) ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন করেন।

১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এ-যাবৎ বি, এ পরীক্ষার দুইটি ভাগ ছিল—'A' Course এবং 'B' Course; 'এ' কোর্শে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন অবশ্য পাঠ্য ছিল এবং পরীক্ষার্থী নিজ ইচ্ছামত কোন প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস বা অঙ্ক শাস্ত্রের অন্যতর গ্রহণ করিতে পারিত। 'বি' কোর্সে ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত অবশ্য পাঠ্য ছিল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও অন্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অন্যতর গ্রহণ করা চলিত। নূতন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানপাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য B. Sc. ডিগ্রীর সৃষ্টি হয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে ইংরাজী সাহিত্যের চাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই সময়ে (১৯০৮-১৯০৯) মৃত মহাত্মা কানিংহাম সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক হইয়া মফঃস্বলের কলেজগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তার জন্য অন্য এক মহাত্মার নাম আমাদিগকে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। এ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া মৃত মহাত্মা মহেন্দ্রলাল

* প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—"It was he (Pedlar) who prepared the way. He had to clear the jungles and prepare the soil for the *abad*".

সরকার একরূপ নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে 'Indian Association for the Cultivation of Science'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। সেন্ট্ জেভিয়ার কলেজের তদানীন্তন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাঁফো মহেন্দ্রলালকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন কলিকাতার অন্য কোন দেশীয় কলেজে তখন বিজ্ঞানশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রগণের শিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছিল। এই অসুবিধা দুর করিবার অভিপ্রায়ে এবং দেশীয় লোকদিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহিত করিবার জন্য এই সমিতির সৃষ্টি। ১৮৭৬ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল্ এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অতঃপর সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়দ্বয়ের অর্থসাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়-সংসৃষ্ট বিজ্ঞানকলেজের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কলিকাতা বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুবিখ্যাত ধনকুবের তাতার অর্থে বাঙ্গালোর নগরেও 'Indian Institute of Science' নামে বিজ্ঞানচর্চ্চার এক পীঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতায় সার জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'Bose Institute' বিজ্ঞানচর্চ্চার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এইরূপে নানাস্থানে পরীক্ষণাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া বিজ্ঞানচর্চ্চার ভিত্তি স্থাপন হইল বটে, কিন্তু ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রমিথিয়াস যেমন স্বর্গ হইতে অগ্নি হরণ করিয়া মানবের জীবন দান করিয়াছিলেন, ইঁহারাও তদ্রূপ 'সাতসমুদ্র-তেরনদী'র পারে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরমধ্যস্থ সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গবেষণার প্রবৃত্তিকে এদেশে পুনরানয়ন করিয়া ভারতবাসীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চ্চা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। রসায়নবিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য দেশময় একটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী আমাদিগের আলোচ্য।

ভারতে রাসায়নিক গবেষণার ও মৌলিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়াই প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্ম্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সরকারী চাকুরীর অত্যাচার, ছাত্রগণের ঔদাসীন্য, বিজ্ঞানশিক্ষায় সাধারণের অনাস্থা, রাসায়নিক পরীক্ষণাগারের দীনতা, রাসায়নিক দ্রব্যের অপ্রতুলতা প্রভৃতি নানা কারণে প্রফুল্লচন্দ্রকে কিরূপ বিব্রত হইতে হইত, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন, তাঁহাদিগকে যে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা সাধারণের ধারণার অতীত। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের প্রথম বিজ্ঞানানুশীলনকারীদিগকে কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপ বিজ্ঞানপথের প্রথম পথিকদিগের অসুবিধা

সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার এক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছিলেন,—'Those who are pioneers in this field have no traditions to go by or follow up; they have to chalk out their own path and formulate their own schemes and carry them as best as they may. Difficulties arise at every turn but with faltering steps the weary pilgrim must keep marching on towards the goal; happy if he reaches it, but equally happy, if he perishes in the attempt.' অর্থাৎ কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত এইরূপ পথিকগণের পথনির্দ্দেশে কোন সহায়তা করে না, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পথ নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী তাঁহারা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করেন এবং নিজেদের বুদ্ধিমতই উহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রতি পদক্ষেপেই প্রতিকূলতা আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু শ্রান্ত পথিকের ন্যায় স্রস্তপদে তাঁহারা স্থির লক্ষ্যে উপনীত হইতে কদাচ পশ্চাৎপদ হন না। এইরূপ সাধু সঙ্কল্প লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারা মহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পথিমধ্যে দেহাবসান হইলে, তাহাও শ্লাঘনীয়। প্রফুল্ল-চন্দ্রের গৌরবের বিষয়, তাঁহার জীবিত কালে তাহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

অনন্ত আশা লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কোন প্রতিকূলতাই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র সুসময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন এবং সময়ের স্রোত পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগকেও এইরূপে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। প্রিষ্টলে, বয়েল্, ডেভী, ল্যাভসিয়ার, লাইবিগ, উল্হার প্রভৃতিকে বহুকাল অনুসরণকারীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। কেপ্লার বলিয়াছিলেন,—"I may well wait a hundred years for a reader, since God Almighty has waited six thousand years for an observer like myself"—'আমি পাঠকের জন্য শত বৎসর অপেক্ষা করিতে পারি, স্বয়ং ভগবান্ আমার ন্যায় তত্ত্বদর্শীর জন্য ছয় হাজার বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন।' উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্ক্রিয়ার সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার তুলনা হইতে পারে কিনা, তাহা ভবিষ্যতের বিচার্য্য; কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে স্বদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ভারতে প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্য কোন অংশে হীন নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কত ছাত্রকে তিনি বিজ্ঞানসেবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, কত ছাত্র পরীক্ষা শেষ হইলে 'tomorrow to fresh fields and pastures new'—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু তবু প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা বলিতে শুনিয়াছি—"yet in the midst of such discouraging and depressing circumstances we must cultivate our favourite science."

পেডলার একাকী কার্য্য করিয়াছিলেন, কোন ছাত্রের মনে গবেষণার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও

বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্রকেও অনুরক্ত ছাত্র লাভের জন্য বিলম্ব করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কামিংহাম সাহেবের মন্তব্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গবেষণাবৃত্তির প্রবর্ত্তনের সঙ্গে কয়েকটি ছাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেও সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে বহুদিন বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারেন নাই। বাহিরের অন্য কোন উৎকৃষ্টতর প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইলে গবেষণা বৃত্তি ছাড়িয়া দিবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতকার্য্যতা তাঁহার ছাত্রপ্রীতি ও আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালীর উপর নির্ভর করে। যখনই কোন ব্যক্তি মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম নিজের আরব্ধ কার্য্যে সামান্য রকমে সাহায্য করিতে নিযুক্ত করেন, এবং এ-বিষয়ে সামান্য মাত্র এবং অতি সাধারণ রকমের সাহায্য করিলেও নিজের রচিত প্রবন্ধের সহিত তাহার নাম সংযোজিত করিয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী বা আমেরিকার কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন প্রফুল্লচন্দ্রের নামের সহিত তাহার নিজনাম প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ছাত্রের মনে স্বভাবতঃই গৌরব ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে, এবং এইরূপে নিজের মনে স্বাধীনভাবে প্রবন্ধ প্রকাশের আগ্রহ জন্মে। ক্রমে ক্রমে শিষ্যের মনে গবেষণার শক্তি বিকশিত হইলে তিনি তাহার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করেন এবং তাহাকে স্বাধীনভাবে গবেষণার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া নিজে আবশ্যকমত উপদেশাদি দিতে থাকেন। এইরূপে একাধিক শিষ্য তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ায় পরস্পরের প্রতিযোগিতা ও গুরুর সহিত সহযোগিতায় অসংখ্য মৌলিক প্রবন্ধে ও আবিষ্কারে তাঁহার বিজ্ঞানাগার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার এক ছাত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—"The great secret of his success was his attachment to the work of his pupils. As soon as he perceived that any one had developed ability for original research, he dropped all joint work and allowed him to carry on his own independent investigation, although he was always ready to help the student with advice whenever required. Thus did he train up his disciples. That his method has been successful is evident from the results."— F. V. Farnandez.

অনুরক্ত শিষ্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, প্রফুল্লচন্দ্রের নিজের প্রবন্ধে ও আবিষ্ক্রিয়ার সংখ্যাও তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম বাইশ বৎসরে, যখন প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় একাকী কার্য্য করিতেন, তখন তিনি স্বয়ং ও কয়েকটি শিষ্যের সাহায্যে মাত্র ৩৯টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে, ৮ বৎসরে তিনি ৪৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধেও প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এইরূপ শুনা যায়, তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রবন্ধ প্রথমে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কাগজে প্রকাশ করিতে আপত্তি উঠিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে 'Indian Wares'—ভারতীয় রোদি মাল বলিয়া বোধ হয় এই আপত্তি; কিন্তু বর্ণবিদ্বেষপঙ্কিল অভিমান অচিরেই যোগ্যতার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইল। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রবন্ধসমূহ বর্ত্তমানে সমাদরে য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতেছে।

১৯০১ সালে গবেষণাবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন প্রথম গগেষণায় নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনুকুলচন্দ্র ঘোষ ১৯০৮ সালে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত ১৯১০ সালে, ডাঃ রসিকলাল দত্ত ১৯১১ সালে, ডাঃ নীলরতন ধর ১৯১২ সালে, এবং ক্রমে ক্রমে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী ছাত্রগণ আসিয়া আচার্য্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহারা অল্প-দিনের মধ্যে মৌলিক গবেষণা ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ সাধনার পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। 'উপযুক্ত গুরুলাভ না হইলে সাধনার পথ সুগম হয় না— তাই দেখি প্রহ্লাদের গুরু নারদ, শিবাজীর গুরু রামদাস, বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ, আর ফ্যারাডের গুরু ডেভী।' চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাসম্পর্কে রঘুনাথ শিরোমণির প্রভাব যেরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অধুনা কলিকাতায় রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা সম্পর্কে আচার্য্য রায়ের প্রভাবও তদ্রূপ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া আচার্য্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ তাঁহার প্রবর্ত্তিত রাসায়নিক সঙ্ঘের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যগণ ভারতের প্রায় সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী ও বে-সরকারী যাবতীয় রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে সগৌরবে স্থান লাভ করিয়াছেন। সিল্‌ভ্যাঁ লেভী (Sylvan Levi) যথার্থই বলিয়াছেন,—'His laboratory is the nursery from which issue forth the Chemists of New India'

বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দেশ ও কালের সংযোজন

ষ্টেশনের প্লাটফরমে অবস্থিত রামের সম্পর্কে ট্রেনের আরোহী শ্যামের বেগ 'ব' পরিমিত এবং উত্তর দিকে (একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে)। ঐ রেখাক্রমে দুইটা ঘটনা ঘটিল। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক, ট্রেন হইতে শ্যামের মানিব্যাগটা প্লাটফরমের উপরে পড়িয়া গেল এবং শ্যামের ভৃত্য ক্ষণকাল পরে, সুতরাং খানিকটা দূরে, মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। মানিব্যাগ ও ভৃত্যের ভূমিস্পর্শ দুইটা বিশিষ্ট ঘটনা এবং রাম ও শ্যাম উহাদের দ্রষ্টা। তফাৎ এই, ঘটনা দু'টাকে রাম দেখিতেছে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া এবং শ্যাম দেখিতেছে ট্রেনের একটা জানালার পার্শ্বে বসিয়া ; সুতরাং ঘটনার অবস্থান নিরূপণে রাম প্লাটফরমটাকে এবং শ্যাম আপেক্ষিকবেগসম্পন্ন ট্রেনটাকে ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশ এবং কালের ব্যবধান রাম ও শ্যামের মাপে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। মনে করা যাক, যাহার যাহার ভিত্তিভূমি হইতে মাপজোখ করিয়া রাম ও শ্যাম ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশের ব্যবধান (বা দূরত্ব) সম্বন্ধে যথাক্রমে 'ত' ও 'তা' এবং উহাদের বাস্তব কালের ব্যবধান সম্বন্ধে যথাক্রমে 'স' ও 'সা' সংখ্যা নির্দ্দেশ করিল, ফলে রামের 'স' এবং 'ত'-এর সহিত শ্যামের 'সা' ও 'তা'-এর নিম্নোক্ত সম্বন্ধ দু'টা (অর্থাৎ ৭ নং লোরেঞ্জ সূত্র) খাটিবে

$$\left.\begin{aligned} স &= ঐ\left(সা + \frac{ব}{ভ^{২}} \times তা \right) \\ ত &= ঐ\left(তা + ব \times সা \right) \\ \text{যেখানে 'ঐ'} &= \frac{১}{\sqrt{১-\frac{ব^{২}}{ভ^{২}}}} = \frac{ভ}{\sqrt{ভ^{২}-ব^{২}}} \end{aligned}\right\} \cdots\cdots\cdots(১৪)$$

এই সমীকরণ দু'টাকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্য হইতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে 'ব' এবং 'ঐ' রাশি দু'টাকে তুলিয়া দিতে পারা যায় ; এবং এইরূপে রাম ও শ্যামের দেশ ও কালের মধ্যে একটা 'ব' নিরপেক্ষ (সুতরাং দ্রষ্টা নিরপেক্ষ) সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় :—

উল্লিখিত প্রথম সমীকরণটার উভয় দিক 'ভ' দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলের বর্গ করিলে

$$\left(ভ \times স \right)^২ = ঐ^২ \left(ভ \times সা + \frac{ব}{ভ} \times তা \right)^২ \cdots\cdots\cdots\cdots (ক)$$

এবং দ্বিতীয় সমীকরণটার বর্গ করিলে

$$ত^২ = ঐ^২ \left(তা + ব \times সা \right)^২ \cdots\cdots\cdots\cdots (খ)$$

এই সম্বন্ধ দু'টা পাওয়া যায়। অতঃপর (খ) সমীকরণ হইতে (ক) সমীকরণটা বাদ দিলে এবং এইরূপে উহাদিগকে একত্র করিলে

$$ত^২ - \left(ভ \times স \right)^২ = ঐ^২ \left\{ \left(তা + ব \times সা \right)^২ - \left(ভ \times সা + \frac{ব}{ভ} \times তা \right)^২ \right\}$$

$$= ঐ^২ \left\{ তা^২ + ব^২ \times সা^২ - ভ^২ \times সা^২ - \frac{ব^২}{ভ^২} \times তা^২ \right\}$$

$$= ঐ^২ \left\{ তা^২ \left(১ - \frac{ব^২}{ভ^২} \right) - সা^২ \left(ভ^২ - ব^২ \right) \right\}$$

$$= \frac{ভ^২}{ভ^২ - ব^২} \left\{ তা^২ \times \frac{ভ^২ - ব^২}{ভ^২} - সা^২ \left(ভ^২ - ব^২ \right) \right\} \left[কারণ\ ঐ^২ = \frac{ভ^২}{ভ^২ - ব^২} \right]$$

$$= তা^২ - ভ^২ \times সা^২$$

অর্থাৎ $ত^২ - ভ^২ \times স^২ = তা^২ - ভ^২ \times সা^২ \cdots\cdots\cdots (১৫)$

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। এই সমীকরণটার মধ্যে 'ব' কিম্বা 'ঐ' নাই, সুতরাং ইহা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ। এই সম্বন্ধটা লোরেঞ্জ-রূপান্তর-সূত্র হইতে প্রাপ্ত এবং উহারই অন্তর্গত; কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা ভিন্ন রকমের। লোরেঞ্জ সূত্র দু'টা (১৪ নং সমীকরণ) দ্রষ্টা বিশেষের শুধু দেশের সহিত অথবা শুধু কালের সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং এই উভয় সম্বন্ধই দ্রষ্টাদ্বয়ের আপেক্ষিক বেগের উপরে নির্ভর করে; কিন্তু ১৫ নং সমীকরণটা এক দ্রষ্টার দেশ ও কালের ('ত' ও 'স'-এর) মিলিত সত্তার সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ ও কালের ('তা' ও 'সা'-এর) মিলিত সত্তার সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং ইহা আপেক্ষিক বেগের অপেক্ষা রাখে না।

১৫ নং সমীকরণের ডাহিন ও বাম দিক অবিকল একই আকারের, সুতরাং ইহাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক। যদি 'ত' ও 'স' রাশি দু'টাকে কেবল দ্রষ্টা বিশেষের (রামের) পরিমাপের ফল স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া, উহারা আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন যে কোনও দ্রষ্টার দেশ এবং কালের পরিমাপের ফল নির্দেশ করিতেছে এই অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে পারা যায়, 'ত' এবং 'স'-এর মূল্য দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও,

$ত^২ - ভ^২ \times স^২ =$ একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ রাশি।*

---

* যাহার পরিমাণ সম্বন্ধে আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন সকল দ্রষ্টাই একমত হইতে পারে, ইংরাজীতে তাহাকে invariant বলে; এইরূপ রাশিকেই আমরা এ-বাবৎ দ্রষ্টা নিরপেক্ষ বা খাঁটি পদার্থ বলিয়া আসিয়াছি।

এই দ্রষ্টা নিরপেক্ষ রাশির বর্গমূলটাকে আমরা 'অ' চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করিব; সুতরাং ১৫ নং সমীকরণটাকে

অ২ = ত২ − ভ২ × স২...............(১৬)

এই আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই সমীকরণের অন্তর্গত 'অ'-কেও একটা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ, বিশিষ্ট রাশিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 'অ'-এর অর্থ, (অর্থাৎ বাস্তব জগতে কোন জাতীয় পদার্থের প্রতিনিধি স্বরূপ 'অ'-কে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা) নিরূপণ করা আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে আমরা আরও সাধারণ ধরণের একজোড়া ঘটনার উল্লেখ করিয়া ১৬ নং সমীকরণটাকে একটা সাধারণ সমীকরণে পরিণত করিয়া লইব।

ট্রেন হইতে শ্যামের মানিব্যাগ পড়িয়া গেল এবং শ্যামের বন্ধু রাখাল, শ্যামের কাছ হইতে উঠিয়া গিয়া, একটু পরে, ট্রেনের অপর পার্শ্বে অবস্থিত বিপদ-শিকলে (danger signal) একটা টান দিল। এখানে মানিব্যাগের ভূমিস্পর্শ এবং শিকলে রাখালের হস্তস্থাপন দুইটা বিশিষ্ট ঘটনা এবং পূর্ব্বের ঘটনা দু'টার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাধারণ ধরণের ঘটনা;— সাধারণ এই অর্থে যে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ঘটনা দু'টা ঘটিয়াছে উত্তর-দক্ষিণ রেখাক্রমে বা রামশ্যামের আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর, কিন্তু বর্ত্তমান উদাহরণে ঘটনা দু'টা যে রেখাক্রমে ঘটিতেছে উহা ঐ দিকটা সম্পর্কে হেলাভাবে অবস্থিত। শ্যাম দেখিতেছে প্রথম ঘটনাটা (মানিব্যাগের ভূমিস্পর্শ) ঘটিল গাড়ীর পূর্ব্বদিককার জানালার কাছে অর্থাৎ শ্যাম যেখানে বসিয়া রহিয়াছে ঐ স্থানে; * এবং দ্বিতীয় ঘটনাটা (রাখালের শিকলে হস্তস্থাপন) ঘটিল গাড়ীর পশ্চিম দিককার ছাদের কাছে। সুতরাং জানালা হইতে গাড়ীর ছাদের ঐ স্থানটায় পহুঁছিতে হইলে শ্যামকে যদি সম্মুখের দিকে (অর্থাৎ আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর) 'তা' পাদ, ডাহিন দিকে 'থা' পাদ এবং উর্দ্ধদিকে 'দা' পাদ অগ্রসর হইতে হয়, তবে এই তিনটা পাদের পরিমাণ দ্বারা (প্রকৃতি ৩৬৯ পৃঃ) শ্যাম ঐ ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশের ব্যবধান, এবং হাতঘড়ির সাহায্যে উহাদের অন্তর্গত বাস্তব কালের ব্যবধান বা 'সা' নিরূপণ করিবে। অন্য পক্ষে রাম বলিবে, প্রথম ঘটনাটা ঘটিয়াছে প্লাট্‌ফরমের যে স্থানটায় মানিব্যাগটা পড়িয়া রহিয়াছে ঐ স্থলে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটিয়াছে, দূরে যে সিগ্‌ন্যাল্‌টা হাতা বাহির করিয়া রহিয়াছে এবং যে হাতা হইতে দোলায়মান একগাছা রজ্জুর নীচের প্রান্ত, শিকলে হাত দিতেই রাখালের হস্ত স্পর্শ করিল ঐ রজ্জু প্রান্তে। সুতরাং মানিব্যাগ হইতে ঐ দড়িটার নীচের প্রান্তে পহুঁছিতে হইলে রামকে যদি উক্ত তিন দিক বরাবর 'ত' 'থ' ও 'দ' পাদ অগ্রসর হইতে হয়, তবে এই পাদত্রয়ের পরিমাপ দ্বারা রাম ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশের ব্যবধান এবং নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া উহাদের অন্তর্গত বাস্তব কালের ব্যবধান বা 'স' নিরূপণ করিবে। বাস্তবকালনিরূপণে, প্রত্যেক দ্রষ্টাকে প্রথমতঃ হাতঘড়ির সাহায্যে ঘটনা

* এখানে অনুমান করা যাইতেছে, ট্রেনটা প্লাটফরমের ঠিক পাশ কাটিয়া চলিয়াছে, ট্রেনের জানালাটা বিন্দু পরিমিত এবং ট্রেনের মেঝের তলে অবস্থিত; অধিকন্তু জানালার উচ্চতা প্লাটফরমের উচ্চতার সমান।

দু'টার প্রত্যক্ষকাল নিরূপণ করিতে হইবে এবং পরে উহা হইতে পূর্ব্বোক্ত (প্রকৃতি ৬৯ পৃঃ) সমীকরণের সাহায্যে বাস্তব কালটা হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান উদাহরণে, রামের 'ত' বা শ্যামের 'তা' ঘটনা দু'টার অন্তর্গত পুরাপুরি দেশের ব্যবধান নির্দ্দেশ করে না,—ঐ ব্যবধানের সম্মুখের পাদ মাত্র নির্দ্দেশ করে; তথাপি এক্ষেত্রেও রামের 'ত' এবং 'স'-এর সহিত শ্যামের 'তা' ও 'সা'-এর ১৪ নং লোরেঞ্জ সূত্র, সুতরাং ১৫ নং সম্বন্ধটাও খাটিবে। অধিকন্তু, আপেক্ষিক বেগের আড়ভাবে অবস্থিত বলিয়া, 'থ'কে 'থা'-এর এবং 'দ'কে 'দা'-এর সমান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে সাধারণ ধরণের একজোড়া ঘটনার পক্ষে ১৫ নং সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করিবে

$$ত^২+থ^২+দ^২-ভ^২\times স^২=তা^২+থা^২+দা^২-ভ^২\times সা^২ \cdots\cdots(১৭)$$

এবং ১৬ নং সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করিবে

$$\left.\begin{array}{l} অ^২=ত^২+থ^২+দ^২-ভ^২\times স^২ \\ অ=\sqrt{ত^২+থ^২+দ^২-ভ^২\times স^২} \end{array}\right\} \cdots\cdots\cdots\cdots(১৮)$$

এই সূত্রটার অর্থ এইরূপ। যে কোন দিকে যে কোন দু'টা ঘটনা ঘটিল। আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা যাহার যাহার ভিত্তিভূমি হইতে ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান নিরূপণ করিল। দেশের ব্যবধান (বা দূরত্ব) নির্ণয়োদ্দেশ্যে প্রত্যেক দ্রষ্টা উহার তিনটা পাদ পরিমাপ করিয়া 'ত' 'থ' 'দ' চিহ্ন দ্বারা তাহার পরিমাপের ফল প্রকাশ করিতেছে এবং যাহার যাহার হাতঘড়ির সাহায্যে বাস্তব কালের ব্যবধানটা নির্ণয় করিয়া উহাকে 'স' চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছে। ১৮নং সমীকরণটা এই কথাটাই বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিতেছে যে, দ্রষ্টাভেদে 'ত' 'থ' 'দ' ও 'স'-এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও $\sqrt{ত^২+থ^২+দ^২-ভ^২\times স^২}$ একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ নির্দ্দিষ্ট রাশি (যাহার পরিমাণ সম্বন্ধে সকলেই একমত এইরূপ রাশি) হইবে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, (প্রকৃতি ৩৬৯ পৃঃ) ইউক্লিড্ প্রবর্ত্তিত দেশের ধারণা অনুসারে দেশমধ্যস্থ দুইটা বিন্দুর মধ্যে 'ন' নামক একটা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ দূরত্ব এবং উহার পাদত্রয়ের সহিত ঐ দূরত্বটার

$$ন=\sqrt{ত^২+থ^২+দ^২} \cdots\cdots\cdots\cdots(১৯)$$

সম্বন্ধটা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের অন্তর্গত দূরত্বের পাদত্রয়ও ('ত' 'থ' 'দ') দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের উক্তরূপ সংযোগের ফল 'ন' রাশিটা সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমান হইয়া থাকে, ইহাই ইউক্লিডিয় জ্যামিতির সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ১৮নং সমীকরণের 'অ' রাশিটাই সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান হইয়া থাকে; আর 'ন' রাশিটা সকলের পক্ষে সমান হয়, যখন কেবল দ্রষ্টাগণ পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। কারণ আপেক্ষিক বেগ থাকিলেই দুইটা দূরের ঘটনা-সম্পর্কে 'স'-এর পরিমাণ বিভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইবে; সুতরাং ১৮নং সমীকরণের

'অ' রাশিটাকে দ্রষ্টা নিরপেক্ষ হইতে হইলে ($ত^২+থ^২+দ^২$) রাশিটা, সুতরাং ঘটনা দুটার অন্তর্গত 'ন'-এর মূল্য, সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান হইতে পারে না। ফলে আপেক্ষিকতা-বাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যতক্ষণ দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় আপেক্ষিক বেগ থাকিবে, ততক্ষণ ১৯নং সমীকরণের 'ন' রাশিটাকে একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ রাশিরূপে গ্রহণ করা চলিবে না।

তথাপি এই দুইটা সমীকরণের আকারগত সাদৃশ্য হইতে 'অ' ও 'ন' রাশি দু'টাকে একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, দেখা যাইতেছে ১৯নং সমীকরণের 'ত' 'থ' 'দ' রাশি তিনটা (দূরত্বের পাদত্রয়) 'ন'-এর সহিত যে নিয়মে সম্বদ্ধ, ১৮নং সমীকরণের 'ত' 'থ' 'দ' ও 'স' রাশি চারিটাও 'অ'-এর সহিত প্রায় সেই নিয়মেই সম্বদ্ধ। প্রায় সেই নিয়মে, কেননা আপত্তি হইতে পারে যে, ১৯নং সমীকরণে 'ভ' নাই, কিন্তু ১৮নং সমীকরণে 'ভ' রাশিটা (আলোকের বেগটা) 'স'-এর একটা পূরকভাবে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যটাকে একটা পার্থক্যরূপে গণ্য করা যায় না; কারণ দেশ বা কালের মাপকাঠি বদলাইয়া 'ভ' কে সর্ব্বদাই '১' সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। "আলোকের বেগ সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ" ইহার অর্থ এই যে, যদি সেকেণ্ডকে সময়ের একক এবং ক্রোশকে দৈর্ঘ্যের একক বলা যায়, তবে আলোকের বেগ বা 'ভ' রাশিটাকে 'লক্ষ' সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু কালের একককে সেকেণ্ড পরিমিত রাখিয়া যদি দৈর্ঘ্যের একককে লক্ষগুণ বাড়াইয়া লওয়া যায় অর্থাৎ যদি লক্ষ ক্রোশকে 'এক' পরিমিত দূরত্ব বা একটা ধাপ বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তবে আলোকের বেগটাকে "সেকেণ্ডে এক ধাপ" এইরূপ বর্ণনা করিতে হয়; এবং এই ধরণের দেশের মাপকাঠিতে 'ভ' = ১ হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর আমরা লক্ষক্রোশ বা এক ধাপকে দূরত্বের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করিব; ফলে ১৮নং সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করিবে

$$অ = \sqrt{ত^২+থ^২+দ^২-স^২} \quad \ldots\ldots\ldots(২০)$$

তথাপি এই সমীকরণটাকেও ১৯ নং সমীকরণের ঠিক অনুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। কারণ এই সমীকরণে $স^২$ রাশিটা বিয়োগ চিহ্ন বিশিষ্ট হইয়া দেশের পাদের বর্গগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। 'স'-এর আবির্ভাবে অবশ্য আকস্মিকতা কিছু নাই, কেননা দেশের সহিত কালের সংযোগ সাধন করিয়াই আমরা এই সমীকরণটা পাইয়াছি; কিন্তু 'স'-এর বর্গটার বিয়োগ চিহ্ন সহ আগমনই বর্ত্তমান সমীকরণের 'অ' রাশিটাকে ১৯ নং সমীকরণের 'ন' রাশি হইতে বিশিষ্ট ধরণে পৃথক করিয়া দিতেছে। এই পার্থক্যটাও—অন্ততঃ বাহ্য দৃষ্টির পক্ষে—দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ $-স^২ = (\sqrt{-১} \times স)^২$; এবং $\sqrt{-১}$ একটা কাল্পনিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করে; সুতরাং ($\sqrt{-১} \times স$) একটা কাল্পনিক কাল প্রকাশ করে। এই কাল্পনিক কালটাকে বড় হাতের 'স' দ্বারা চিহ্নিত করিলে $-স^২ = +\mathbf{স}^২$ এইরূপ লেখা যাইতে পারে। ফলে ২০ নং সমীকরণটা

$$অ = \sqrt{ত^২+থ^২+দ^২+\mathbf{স}^২} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots(২১)$$

আকার ধারণ করে। আমাদের বরাবরকার পরিচিত ছোট হাতের 'স'টা একটা বাস্তব কাল অর্থাৎ সোজাসুজি একটা পরিমাপের ফল নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে। উহাকেই একটা কাল্পনিক সংখ্যা ($\sqrt{-১}$) দ্বারা পূরণ করিয়া ২১ নং সমীকরণের কাল্পনিক কাল বা 'স' রাশিটাকে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহাকেও পরিমাপ হইতে প্রাপ্ত একটা বিশিষ্ট ধরণের কালের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে—এমন একটা কালের চিহ্ন যাহা 'স'-শূন্য হইলে শূন্য পরিমিত হয় এবং 'স' যদি দ্রষ্টাভেদে বদলাইয়া যায়, তবে উহাও একই অনুপাতে বদলাইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র 'স'-এর আবির্ভাব ছাড়া ১৯নং ও ২১নং সমীকরণে কোনই পার্থক্য নাই। উভয় সমীকরণের আকার অবিকল একরূপ—একটার 'ন' উহার 'ত' 'থ' 'দ' রূপ দেশজাতীয় পাদত্রয়ের সহিত যে নিয়মে সম্বদ্ধ অপরটার 'অ'-ও 'ত' 'থ' 'দ' রূপ দেশের পাদ ও কাল্পনিক কাল 'স'-এর সহিত ঠিক সেই নিয়মেই সম্বদ্ধ। কিন্তু 'স' যুক্ত ও 'স' হীন সমীকরণ দু'টার বিশেষত্ব এই যে প্রথমোক্ত সমীকরণের অন্তর্গত 'অ' রাশিটা আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান হইয়া থাকে, কিন্তু 'স' হীন সমীকরণের অন্তর্গত 'ন' রাশিটা সকলের পক্ষে সমান হয়, কেবল যখন দ্রষ্টাগণ পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ১৮ বা ২০ বা ২১ নং সম্বন্ধটাকেই একটা সাধারণ বা সত্য সম্বন্ধরূপে এবং ১৯ নং সম্বন্ধটাকে উহার একটা বিশিষ্ট আকার মাত্র রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ফলে দাঁড়াইল এই। আমরা এ যাবৎ সকলের দেশ বলিয়া একটা দেশ স্বীকার করিয়া এবং উহাকে বিন্দুময় কল্পনা করিয়া দেশকে একটা বাস্তবতা দান করিয়া আসিয়াছি; ফলে উহার প্রতিজোড়া বিন্দুর মধ্যে 'দূরত্ব' নামক একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ ব্যবধানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ঐ ব্যবধানকে তিনটা পরস্পর-নিরপেক্ষ পাদে বিশ্লিষ্ট করিয়া আসিয়াছি; এবং ঐ পাদত্রয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হইয়াও ইউক্লিডিয় জ্যামিতি (১৯ নং সমীকরণ) অনুসারে পুনরায় উহাদের সংযোগ সাধন করিয়া উক্ত দ্রষ্টা নিরপেক্ষ ব্যবধানই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া অনুমান করিয়া আসিয়াছি। আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সকলের দেশ বলিয়া কোন দেশ নাই এবং দূরত্বরূপ একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ ব্যবধানের সন্ধানও কোথাও কখনও পাওয়া যায় নাই; তথাপি ঐরূপ একটা ব্যবধান খুঁজিবার প্রচেষ্টার মূলে খাঁটি সত্য নিহিত রহিয়াছে। বুঝিতে হইবে ১৮ নং (বা ২০ বা ২১ নং) সমীকরণের 'অ' রাশিটাই ঐরূপ ব্যবধান। এই সমীকরণ অনুসারে দেশ ও কালের সংযোগ সাধন করিয়াই আমরা এই ব্যবধানটার সাক্ষাৎ পাই। ফলে আমাদিগকে দেশ ও কালের একটা মিলিত সত্তা স্বীকার করিতে হইবে; এবং বলিতে হইবে যে, এই মিলিত সত্তার কেবল দেশের অংশের পক্ষে, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি অনুসারে, 'ন' এর (বা দূরত্বের) ধর্ম্ম যাহা উহার সমগ্র অংশের পক্ষে 'অ'-এর ধর্ম্মও ঠিক তাহাই। ফলে পুরাতন যুগের 'দূরত্ব' কথাটাকে আরও ব্যাপকতর অর্থ দান করিতে হইবে; এবং এইরূপে কতকটা দেশ, ও কতকটা কালময় একটা ব্যবধানের কল্পনা করিয়া 'অ' রাশিটাকে

উহারই চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই দ্রষ্টা নিরপেক্ষ 'অ'-এর অর্থ। এই দেশ-কালময় ব্যবধানকে ইংরাজীতে কেহ কেহ Interval, কেহ কেহ Separation বলেন; আমরা উহাকে দুই ঘটনার অন্তর্গত 'অবকাশ' বলিব।

দূরত্ব বা 'ন'-এর পাদত্রয় ('ত' 'থ' 'দ'), তিনটা পরস্পর নিরপেক্ষ দিকে প্রসারিত হইয়া 'ন'-এর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে, অবকাশ বা 'অ'-এর মধ্যেও ঐ তিনটা পাদের সঙ্গে 'ভন' রাশিটাও অবিকল সেই প্রণালীতে সংযুক্ত হইয়া 'অ'-এর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। ফলে 'ভন' রাশিটাকেও বিশিষ্ট দিকে প্রসারিত একটা বিশিষ্ট পাদরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, যে অর্থে দেশের মধ্যে তিনটা পরস্পর-নিরপেক্ষ দিক রহিয়াছে বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া আসিয়াছি, সেই অর্থে দেশ ও কালের মিলিত সত্তার মধ্যেও পরস্পর-নিরপেক্ষ চারিটা দিক রহিয়াছে,—যাহার তিনটা দেশজাতীয় ও একটা কালজাতীয়, এবং যাহার একটা ধরিয়া অগ্রসর হইলে অপর তিনটার দিকে মোটেই অগ্রসর হওয়া হয় না। ফলে দেশ ও কালের মিলিত সত্তাকে একটা চতুর্ধা বিস্তৃত বা চতুষ্পাদ জগৎরূপে কল্পনা করিতে হইবে। এ'যাবৎ আমরা এই জগৎটার বিশ্লেষণ সাধন করিয়া, কেবল উহার দেশের দিকটাকেই আমাদের প্রকৃত বাসভূমি বলিয়া অনুমান করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন হইতে বলিতে হইবে, কালনিরপেক্ষ দেশের বা দেশনিরপেক্ষ কালের প্রকৃত সত্তা নাই, বাস্তব সত্তা রহিয়াছে দেশ ও কালের সংযোগের ফল চতুষ্পাদ ঘটনাময় জগতের—যাহার এক-এক জোড়া ঘটনার মধ্যে অবকাশরূপ একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ ব্যবধানের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে পুরাতন যুগের ত্রিপাদ দেশকে আর আপেক্ষিকবেগ-সম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার কারবারের জগৎরূপে গ্রহণ করা চলিবে না; দেশ-কাল-ময় চতুষ্পাদ জগৎটাকেই,—যে জগতে পুরাতন যুগের বিচ্ছিন্ন কালটা, দেশের পাদত্রয়ের পার্শ্বে স্বীয় পাদ প্রসারিত করিয়া দিয়া এবং এইরূপে দেশ ও কালের কৃত্রিম বিভাগের কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, উহাকেই—সকল দ্রষ্টার পক্ষে সাধারণ জগৎ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটনাময় জগতের প্রকৃত মূর্ত্তি ইহাই এবং ইহাই আমাদের প্রকৃত বাসভূমি। এই জগতের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ-যাবৎ আমরা মাত্র একটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ বা খাঁটি পদার্থের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি—শূন্যদেশে আলোকের বেগ বা 'ভ'; বর্ত্তমানে আমরা দ্বিতীয় একটা খাঁটি পদার্থের সন্ধান পাইতেছি—ঘটনায় ঘটনায় অবকাশ বা 'অ'। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, (লোরেঞ্জ সূত্রটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে) 'ভ'-এর দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা হইতে 'অ'-এর দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতাও আপনি আসিয়া পড়ে। এই নির্ভরতার প্রণালীটা আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণটা পুনরায় স্মরণ করা যাক। গাড়ীর জানালার পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্যামের মানিব্যাগটা মাটিতে পড়িয়া গেল এবং শ্যামের বন্ধু রাখাল তখনি শ্যামের পার্শ্ব হইতে যাত্রা

করিয়া, ক্ষণকাল পরে, বিপদ-শিকলে টান দিল। আরও মনে করা যাক, মানিব্যাগ পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম একটা আলো জ্বালিল এবং যে আলোক রশ্মিটা ঐ শিকল অভিমুখে অগ্রসর হইল রাখালও ঐ রশ্মিপথ অবলম্বনে এবং ঠিক উহার সমান বেগে ('ভ' বেগে) অগ্রসর হইয়া শিকলটায় হস্ত স্থাপন করিল। এইরূপ গতিকে (অর্থাৎ যে গতি আলোকের বেগে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে) আমরা আলোক-যাত্রা বলিব।

রাখালের এই আলোক-যাত্রার আরম্ভের এবং শেষের অধ্যায়কে দুইটা বিশিষ্ট ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাত্রার আরম্ভটাকে বিচ্ছেদ এবং উহার পরিণতিটাকে মিলন বলিয়া বর্ণনা করিলে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই বিচ্ছেদটা সম্বন্ধে শ্যাম মত প্রকাশ করিবে যে, উহা ঘটিয়াছে জানালার কাছে এবং রাম বলিবে যে, উহা ঘটিয়াছে প্লাটফরমের যে স্থানটায় মানিব্যাগটা পড়িয়া রহিয়াছে ঐ স্থানে। আর মিলনটা সম্বন্ধে শ্যাম বলিবে যে, উহা ঘটিয়াছে গাড়ীর ছাদের যেখানটায় শিকলটা রহিয়াছে ঐ স্থানে; এবং রাম বলিবে, উহা ঘটিয়াছে, দূরের সিগন্যাল হইতে যে দড়িটা ঝুলিতেছে তাহার নীচের প্রান্তে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় মাপজোখ করিয়া ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশের ব্যবধানকে রাম ও শ্যাম যথাক্রমে 'ত' 'থ' 'দ' এবং 'তা' 'থা' 'দা' পাদত্রয় দ্বারা এবং বাস্তব কালের ব্যবধানকে 'স' ও 'সা' দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা দু'টার বিশেষত্ব এই যে, উহাদের অন্তর্গত দূরত্বটা রামের মাপের (ভ × স)-এর সমান এবং শ্যামের মাপের (ভ × সা)-এর সমান হইতে হইবে। এই দূরত্বের বর্গটাকে রাম ($ত^২ + থ^২ + দ^২$) পরিমিত এবং শ্যাম ($তা^২ + থা^২ + দা^২$) পরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে; ফলে এ'ক্ষেত্রে ১৭ নং সমীকরণটা

$$ত^২ + থ^২ + দ^২ - ভ^২ \times স^২ = তা^২ + থা^২ + দা^২ - ভ^২ \times সা^২ = 0 \cdots\cdots (২২)$$

সুতরাং ১৮ নং সমীকরণটা

$$অ^২ = ত^২ + থ^২ + দ^২ - ভ^২ \times স^২ = 0 \cdots\cdots\cdots (২৩)$$

এই আকার ধারণ করিবে; ইহার অর্থ এই যে, উক্ত বিচ্ছেদ ও মিলন রূপ ঘটনা দু'টার অন্তর্গত অবকাশটা প্রত্যেক দ্রষ্টার মতেই শূন্য পরিমিত হইবে।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ প্রণালী হইতে দেখা যায়, গতি ব্যাপারটাকে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরণের ঘটনার সমষ্টিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে—বিচ্ছেদ—মিলন, বিচ্ছেদ—মিলন, এইরূপ। রাম বলিবে, এই বিচ্ছেদ ও মিলনগুলি ঘটিতেছে তাহার চিরস্থির প্লাটফরমরূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থল সম্পর্কে; শ্যাম বলিবে, উহারা ঘটিতেছে তাহার চিরস্থির ট্রেনরূপ জগতের বিভিন্ন স্থলে। কিন্তু যে জগৎটাকেই ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রহণ করা যাক না কেন, গতিটা যদি আলোকের বেগে সম্পন্ন হয় (যাহাকে আমরা আলোক-যাত্রা বলিয়াছি ঐরূপ গতি হয়), তবে উহার অন্তর্গত যে কোন বিচ্ছেদ ও যে কোন মিলনের মধ্যে, প্রত্যেক দ্রষ্টার মতেই, অবকাশটা শূন্য পরিমাণের হইবে। সাধারণ ধরণের গতির পক্ষে ঐ অবকাশটা সসীম হইবে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উহার পরিমাণ সম্বন্ধে সকল দ্রষ্টাই একমত হইবে।

আলোকের বেগ সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান, এ-যাবৎ আমরা এই কথা দ্বারাই আলোকের বেগ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখানে দেখা যাইতেছে, ঐ বেগ-মাহাত্ম্য ভিন্ন-ভাবেও প্রকাশ করা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে, যে সকল ঘটনা-পরম্পরা গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের পরস্পরের অন্তর্গত অবকাশগুলি—সাধারণ বেগের পক্ষে সসীম হইলেও—আলোক-যাত্রারূপ গতির পক্ষে শূন্য পরিমিত হইয়া থাকে। আলোকের বেগের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের পথ ধরিয়াই 'অ' ও 'ভ' রাশি দু'টার মধ্যে প্রথমটা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ হইয়া অপরটাকেও—limiting case রূপে—একটা বিশিষ্ট ধরণের দ্রষ্টা নিরপেক্ষ রাশিতে পরিণত করিয়াছে।

দর্শন ব্যাপার মাত্রই আলোক-যাত্রা সম্পর্কীয় দুইটা বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। দৃশ্য বস্তুর প্রান্তে আলোকরশ্মির বিচ্ছেদ এবং দ্রষ্টার চক্ষুপ্রান্তে উহার মিলন,—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের নাম দর্শন। এই বিচ্ছেদ ও মিলনের অন্তর্গত অবকাশটা, প্রত্যেক দ্রষ্টার মতেই, শূন্য পরিমাণের। ফলে, বাস্তব ঘটনা ও উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মধ্যে অবকাশ নাই। উহাদের মধ্যে দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান রহিয়াছে এবং বিভিন্ন দ্রষ্টা ঐ সকল ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে, কিন্তু প্রত্যেকেই বলিতেছে উহাদের অন্তর্গত দেশ-কাল-ময় ব্যবধানটা শূন্য পরিমিত।

অবকাশ শূন্যপরিমিত হওয়ার অপর একটা বিশিষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, যখন ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশ ও কালের ব্যবধান ('ন' ও 'স') প্রত্যেকেই শূন্য পরিমিত হয়। ১৮ নং সমীকরণ হইতে ইহা সহজেই দেখা যায়। 'ন' এবং 'স' শূন্য পরিমিত হওয়ার অর্থ, ঘটনা দু'টার একটা ঘটনায় পরিণত হওয়া। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই, বাস্তব ঘটনা ও উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে এক হিসাবে একটা ঘটনা বলা যাইতে পারে। এক হিসাবে, কারণ যতক্ষণ দ্রষ্টা দেশ বা কালের সৃষ্টি না করিবে কেবল ততক্ষণই উহারা একটা ঘটনারূপে প্রতিপন্ন হইবে,—ঘটনার দিকে ও দ্রষ্টার দিকে কোন পার্থক্য থাকিবেনা; কিন্তু দেশ (বা কাল) সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ হইলেই কাল (বা দেশ) সৃষ্টিরও প্রয়োজন বোধ হইবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা একটা বাহ্য ঘটনারূপে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষটা একটা ভিন্ন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে। তথাপি উভয় ঘটনার অন্তর্গত অবকাশটা, শূন্য পরিমিত ছিল, শূন্য পরিমিতই থাকিবে। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রত্যক্ষ হইত (অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের প্রত্যক্ষের দাবী প্রত্যাহার করিত) এবং দেশ ও কালের সৃজন ও সংহরণ দ্রষ্টামাত্রেরই ইচ্ছাধীন হইত, তবে একটা অবকাশহীন জগতে 'এক'কে বহুতে এবং 'বহু'কে একে পরিণত করাই জাগতিক ক্রিয়ার একটা বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইত।

আলোক-যাত্রা সম্পর্কীয় আর একটা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব। পূর্ব্বের উদাহরণে শ্যাম যে আলোটা জ্বালিয়াছিল তাহা হইতে আলোকরশ্মিগুলি

চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্যাম বলিতেছে, প্রত্যেক রশ্মিই তাহার দেহসম্পর্কে (বা ট্রেনসম্পর্কে) 'ভ' বেগে অগ্রসর হইয়াছে, ঐ সকল রশ্মির অগ্রভাগ বা শিখাগুলি একটা গোলাকার পিঠের উপরে অবস্থিত, ঐ গোলকের কেন্দ্রে রহিয়াছে তাহার দেহটা (বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জানালাটা) এবং উহাকেই বরাবর কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া ঐ গোলাকার পিঠটা 'সা' সময় পরে ছাদসংলগ্ন শিকলটা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। অন্যপক্ষে রাম বলিতেছে, ঐ সকল আলোকরশ্মির শিখাগুলি একটা গোলকের পিঠে সজ্জিত হইয়া এবং প্লাটফরমে অবস্থিত মানিব্যাগটাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া ঐ মানিব্যাগ (বা প্লাটফরম) সম্পর্কে 'ভ' বেগে অগ্রসর হইয়াছে এবং 'স' সময় পরে দূরস্থ সিগন্যাল পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, আকোকরশ্মির বিস্তারের বর্ণনায় রাম ও শ্যাম যে গোলকের উল্লেখ করিতেছে, উহার দুইটা কেন্দ্র, এবং এই কেন্দ্রদ্বয় (শ্যামের দেহ ও মানিব্যাগ) পরস্পর সম্পর্কে বেগসম্পন্ন ; এবং এইরূপ বর্ণনাতেই আলোকের বেগের পরিমাণ সম্বন্ধে উহারা একমত হইতে পারিতেছে। বুঝিতে হইবে, ঘটনাসমূহের অবস্থান বর্ণনায় ইউক্লিড বর্ণিত দেশের জ্যামিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইউক্লিডের জ্যামিতি—যাহা কেবল দূরত্বরূপ পরিবর্ত্তনশীল মাপকাঠিকে ভিত্তি করিয়া একটা দেশ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল—সকল দ্রষ্টার উপযোগী বা সর্ব্বসাধারণের জ্যামিতি নহে। দেশ ও কালের সংযোগের ফল চতুষ্পাদ জগতের জ্যামিতিকেই আপেক্ষিকবেগসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে কারবারের জ্যামিতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং এই জ্যামিতি গড়িয়া তুলিবার জন্য দ্রষ্টা নিরপেক্ষ চতুষ্পাদ অবকাশটাকেই সাধারণ মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ

বসুবিজ্ঞানমন্দিরে একাদশ বর্ষোৎসব

বিগত ২৯ শে নভেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত "বসুবিজ্ঞান মন্দিরে"র একাদশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সেই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র তাঁহার অতি-আধুনিক আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি মনোরম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি উপস্থিত জনগণ সমক্ষে উদ্ভিজ্জীবনের বিশেষত্ব নির্দ্দেশক কয়েকটি পরীক্ষাও করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতার পূর্ব্বে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর হান্‌স্ মলীশকে মহাসমাদরে অভিনন্দিত করেন। অধ্যাপক মহোদয় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী গবেষণার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। উত্তরে মলীশ

বলেন,—"আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানকেন্দ্র বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট বসু-বিজ্ঞান-মন্দির কিছু কাল হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিতেছে। দূর হইতে যে ধারণা লইয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম বসু-বিজ্ঞান-মন্দির তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত, অনেক অধিক প্রশংসার পাত্র। আমি এই দীর্ঘ জীবনে বহু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (Experiment) দেখিয়াছি, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তীক্ষ্ণতম সুক্ষ্মানুভব-শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্রাদির কল্যাণে অদৃশ্য জগতের যে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত দেখিলাম, এমন হৃৎ-স্তম্ভনকারী বিস্ময়ের বস্তু আর কোথাও দেখি নাই। জীবনের যে সকল ক্রিয়া-কলাপ এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, এই সকল পরীক্ষাতে সেইগুলি সম্যক নয়নগোচর হইয়াছে। যে মনীষী মূকের মুখে ভাষা জোগাইয়াছেন, গতিশক্তিহীন উদ্ভিদ্‌কে নিজ জীবন-রহস্যের লিপি-লেখনে সমর্থ করাইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।"

অতঃপর আচার্য্য তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম। তিনি বলেন—

জীবনের যে স্পন্দন—যে বাণী প্রতিনিয়ত আমাদের চারিদিকে লীলায়িত বা উত্থিত হইতেছে, তাহার অতি অল্পাংশই মানবের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ নিজে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখে, তাই বহিরিন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা মানুষ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, চক্ষুর অভাব কৃত্রিম উপায়ে মিটাইতে প্রয়াসী হইয়াছে। দৃশ্যমান আলোকের পশ্চাতে অদৃশ্য জগৎ আপনাকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষু হইতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে পারে নাই,—বৈজ্ঞানিক তাহার প্রতিভা বলে উহার সকল রহস্য, সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে।

প্রাণিজীবনের সঙ্গে অসাড়, বোধশক্তিহীন উদ্ভিদ্-জীবনের তুলনা করিলে প্রথম দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে বিপুল প্রভেদ লক্ষিত হয়। সেইজন্যই লোকে মনে করিত, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধবিহীন দুই বিভিন্ন জীবন-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই প্রকারের ভ্রমপূর্ণ মতবাদই এতকাল জ্ঞান-বিস্তারের পথে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।

প্রথম যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভব হইল, তখন বিজ্ঞান-জগতে এক প্রচণ্ড উত্তেজনা আসিয়াছিল। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পদার্থকে মাত্র ২,০০০ গুণ বড় দেখায়, বসুবিজ্ঞান মন্দিরে যে সকল যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে দেখায় ৫০,০০০,০০ গুণ বড়। এই সকল যন্ত্র সাহায্যে এক অনাবিষ্কৃত বিস্ময়পূর্ণ নূতন জগৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

একটি জীবন্ত উদ্ভিদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কোন-না-কোন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের পাকস্থলীর কার্য্য আলোচনা করিলে এই বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। পাকস্থলীর গ্রন্থীনিঃসৃত রসে গৃহীত খাদ্য জীর্ণ হইয়া উদ্ভিদের দেহ

পুষ্টির সাহায্য করে। পতঙ্গভুক "সান্-ডিউ" (Sun Dew) নামক বৃক্ষের পত্রগুলি এক প্রকার শুঁয়া দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কোন পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া পত্রের উপর বসিলে, যতক্ষণ না উহা সম্পূর্ণ গলিয়া পরিপাক হইয়া যায়, ততক্ষণ শুঁয়াগুলি উহাকে পত্রপৃষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখে। প্রাণিগণের পাকস্থলীর সঙ্গে এই অনাবৃত অতি-সাধারণ পাকস্থলীর বিশেষ কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "ভিনাস্ দেবীর ফ্লাইট্র্যাপ্" (Fly Trap) নামক পতঙ্গভুক বৃক্ষপত্রের দুই অংশ প্রাণীর ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া থাকে। গহ্বরে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিবামাত্র অংশ দুইটি বন্ধ হইয়া যায়,—অসহায় পতঙ্গের আর নিস্তারের পন্থা থাকে না। "কুম্ভ-উদ্ভিদে"র (Pitcher plant-এর) পাকস্থলী প্রায় প্রাণীর পাকস্থলীর অনুরূপ। সুতরাং উদ্ভিদ্ রাজ্যের এই ক্রম-পরিবর্ত্তন আলোচনা করিয়া আদিমতম অতি-সাধারণ পাকস্থলী হইতে প্রাণিগণের এই অতি-জটিল পাকস্থলী পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যাইতে পারে।

অতঃপর জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌সমূহের গতিবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহাদের যে সকল কার্য্যকলাপ আমরা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না, বা দেখিতে পাইলেও যাহা অসম্পূর্ণরূপে দেখি, সেই সকল কার্য্যপ্রণালী তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি সাহায্যে কিরূপে সকলের চক্ষুগোচর করিয়াছেন, পরীক্ষাদি সহ সে বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—কয়লা না পোড়াইলে যেমন এঞ্জিনের গতি-শক্তি জন্মে না, তেমনি উদ্ভিদেরও গতি-শক্তি অর্থাৎ বৃদ্ধি-পরিণতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কয়লার (অর্থাৎ খাদ্যের) প্রয়োজন হইয়া থাকে। উদ্ভিদের হরিৎ পত্রসকল বায়ু অথবা সলিলমধ্যস্থিত যবক্ষারজান গ্যাস্ হইতে আলোকের সাহায্যে "অঙ্গার" অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করে।

এইখানে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সত্যটি প্রতিপন্ন করেন। যন্ত্রটির প্রধানতঃ দুইটি অংশ। একটি উদ্ভিদাধার, ও অপরটি কি পরিমাণ খাদ্য গৃহীত হইয়াছে তাহার হিসাব লিখিয়া দিবার বন্দোবস্ত। উদ্ভিদ নিজেই এই হিসাব লিখিয়া দেয়। বৃক্ষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন আধার মধ্যে সঞ্চিত হওয়ার পর একবিন্দু অতিরিক্ত হইলেই উহা বাহির হইয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড কাগজের উপর বহির্গমন বার্ত্তা লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। দূরস্থিত লোকের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে লিখন-কালে একটি ঘণ্টাও বাজিয়া উঠে। সুতরাং লিপি-চিহ্ন দেখিয়া বা ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া অনায়াসেই কি পরিমাণ যবক্ষারজান গ্যাস্ উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে নির্দ্ধারণ করা যায়।

এইরূপে পরীক্ষাকালে উদ্ভিদটি কি হারে আহার্য্য গ্রহণ করিতেছিল, উপস্থিত সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করায় ঘণ্টাধ্বনি অতি-দ্রুত হইতে লাগিল—অর্থাৎ উদ্ভিদ্ তখন অতি বেশী পরিমাণ আহার করিতে লাগিল। কিন্তু উহার শরীরের মধ্য দিয়া তীব্র বৈদ্যুতিক উত্তেজনাপ্রবাহ চালিত করিবার পর আর মোটেই ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না—উদ্ভিদ্‌টির তখন জীবনান্ত হইয়া গিয়াছে—আহার করিবার শক্তি তাহার চিরতরে অপহৃত হইয়াছে।

গাজরের দেহের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালনা করিলে তাহার দেহে যে বিচিত্র উত্তেজনা প্রকাশ পায়, তাহাও একটা দেখিবার মত ব্যাপার। বহু বর্ষ পূর্ব্বে যখন আচার্য্য এই পরীক্ষাটি 'রয়াল সোসাইটী'র সভ্যবৃন্দের সম্মুখে করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তখন সকলে বলিয়াছিল "এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে না।" জগদীশচন্দ্রের বিশ্বাস, এই প্রতিবাদের—এই অবিশ্বাসের মূলে ছিল বিরক্তি এবং অশ্রদ্ধা ; কারণ, জগদীশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াও শারীর-বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার অভিনব তথ্যগুলি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধারণা করিতে,—অন্ততঃ সহ্য করিতে পারিতেন না যে, এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগেও তাহার প্রতিভা দেখাইবে।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের শারীরবিজ্ঞান বিভাগে যে কোন জ্ঞানই ছিল না—এমত নহে। তিনি ছাত্রজীবনে পদার্থবিদ্যা অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিগণের শারীরবিজ্ঞান পাঠ করিতে হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপকরূপে তিনি প্রারম্ভে বেতার-তরঙ্গের বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে বেতার যন্ত্র লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি উদ্ভিদ্-রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। উদ্ভিদেরও প্রাণিগণের ন্যায় বোধশক্তি, তীব্র অনুভবশক্তি আছে কি না—তিনি সেই সমস্যার মীমাংসা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। আচার্য্য জগদীশ বলিলেন, কিছু কাল মাত্র হইল তিনি সেই প্রযত্নে সিদ্ধকাম হইয়াছেন।

হৃদ্‌যন্ত্রের স্বতঃ-স্পন্দন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষত্ব এতকাল কেবলমাত্র প্রাণিজীবনেরই বিশিষ্ট লক্ষণরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। আচার্য্য জগদীশ উদ্ভিদের দেহেও অনুরূপ স্পন্দনের সন্ধান পাইয়াছেন। বন-চাঁড়ালের (Desmodium) ক্ষুদ্র পত্রগুলি যে হৃদ্‌যন্ত্রেরই মত তালে তালে নিয়ত স্পন্দিত হইতে থাকে—এ বিষয়ে তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। অধিকন্তু যে সকল ঔষধ প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের উপর যে বিশেষ প্রকার ক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ করে, সেই সকল ঔষধ স্পন্দনশীল উদ্ভিদ্‌দেহে প্রয়োগ করিয়া অনুরূপ ফল লাভ করা গিয়াছে।

উপস্থিত জন সমক্ষে আলোকের সাহায্যে বন-চাঁড়ালের সুকোমল পত্রের স্পন্দনলেখা বক্তৃতা-গৃহের প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো হইয়াছিল। (কথাপ্রসঙ্গে আচার্য্য বলিলেন—এই যন্ত্রটি সেই উৎসবদিবসেই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে)। পত্রদেহে ক্লোরোফরম্ (Chloroform) প্রদান করাতে জীবনমরণের ভীষণ দ্বন্দ্ব প্রাচীরগাত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। উদ্ভিদ্ নিজের প্রাণ সবলে দেহে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছে, মরণ উহার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইতে উদ্যত। অতঃপর মরণের জয় হইল ;—স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গেল। আলোকের যে নৃত্যশীল রেখা এতক্ষণ প্রাচীরগাত্রে উদ্ভিদ্‌জীবনের সজীবতা নির্দ্দেশ করিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্তম্ভিতভাবে একই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। আচার্য্য তখন এই স্তব্ধ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য উদ্ভিদ্‌দেহে বিষ-বিনষ্ট-

কারী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঔষধ অপূর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করিল,—মুহূর্ত্তমধ্যে নিস্তব্ধ হৃদয় আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। প্রাচীরগাত্রের আলোক-রেখা পুনরায় আনন্দ-নৃত্যে উদ্ভিদের পুনর্জীবনলাভ ঘোষণা করিল।

আচার্য্য বলিলেন, উক্ত পরীক্ষা দ্বারা তিনি বহু ভারতীয় ভেষজের নানা গুণাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রকার অনুসন্ধানের ফলে তিনি এমন ঔষধের সন্ধানও লাভ করিয়াছেন, যাহার কথা পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে যখন তিনি ভিয়েনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞান-সভায় মৃত্যুপথযাত্রী এক ভেকের স্তব্ধপ্রায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া উদ্ভিদ্‌কোষ-স্পন্দনবর্দ্ধনকারী ভারতীয় ভেষজজাত ঔষধ প্রয়োগে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তখন উপস্থিত বিজ্ঞান-মনীষিগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। ঔষধের সেই অপূর্ব্ব ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহারা আবিষ্কর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বলেন, উদ্ভিদের অনুভবশক্তির যে কোন বাহ্য প্রকাশ নাই, তাহার কারণ উহার সঙ্কোচশীল কোষশ্রেণী (cortex) চির-স্থবির কাষ্ঠঅংশের (wood) সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে দৃঢ়সংবদ্ধ রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার "অতি-সূক্ষ্ম আকুঞ্চনমান যন্ত্রের" (Infinitesimal Contraction Recorder) আবিষ্কার করিয়া উদ্ভিদের শীর্ষ হইতে মূল-প্রান্ত পর্য্যন্ত —সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া এই সঙ্কোচশীল কোষশ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই কোষশ্রেণী বাহিরের উত্তেজনা বা আঘাতের ফলে সঙ্কুচিত হয়। সাধারণ অবস্থায়,—এমন কি অণুবীক্ষণের সাহায্যেও এই আকুঞ্চন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আচার্য্যের আবিষ্কৃত অদ্ভুত যন্ত্রের নিকট এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনও আপনাকে গোপন রাখিতে পারে নাই।

যন্ত্রটির একাংশে, দুইটি দণ্ডের মধ্যে বৃক্ষকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়;—দণ্ডদ্বয়ের একটি গতিশীল, কিন্তু অপরটি স্থির। গতিশীল দণ্ডটির গতি নিয়ন্ত্রিত করে বৃক্ষকোষের আকুঞ্চন। বৃক্ষকোষ সঙ্কুচিত হইলে,—সে আকুঞ্চন যতই সামান্য হউক, তাহাতে গতিশীল দণ্ডটি অবশ্যই আন্দোলিত হইবে। দণ্ডের এই প্রান্তের ক্ষীণতম আন্দোলন অপরপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়, তদুপরি আবার মুক্তপ্রান্তের (free end of the movable lever) গতি প্রতিফলিত আলোকের দ্বারা আরও বর্দ্ধিতাকারে নয়নগোচর করা হয়। এইরূপে বৃক্ষকোষের অতি-সূক্ষ্ম আকুঞ্চন লক্ষ লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আচার্য্য তাঁহার যন্ত্রটির অপূর্ব্ব ক্ষমতা, তথা উদ্ভিদের অচিন্তনীয় সূক্ষ্মানুভবশক্তি প্রমাণ করিবার জন্য একটি পরীক্ষা করিয়া দেখান। অভিন্ন তাড়িত-প্রবাহ-সঞ্চার পথে (same electrical circuit) একটা উদ্ভিদ্‌ এবং একজন মনুষ্যকে সংযুক্ত করিয়া উভয়ের দেহমধ্য দিয়া অতি-লঘু বৈদ্যুতিক উত্তেজনা পরিচালিত করা হয়। মনুষ্যটি এই উত্তেজনা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু উদ্ভিদ্‌কোষের আকুঞ্চন ফল যন্ত্র সাহায্যে আলোকরেখার দ্রুত গতিদ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শিত হইয়া গেল। এইরূপে প্রমাণিত

হইল, মানব অপেক্ষা উদ্ভিদের অনুভবশক্তি অধিকতর সূক্ষ্ম ;—যে আঘাত মানবশরীরে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, উদ্ভিদ্‌দেহে তাহা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

অতঃপর উক্ত সংযোগসূত্র হইতে মনুষ্যটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র উদ্ভিদ্‌দেহের ভিতর দিয়া অতি তীব্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করা হয়। তাড়িত-প্রবর্ত্তন-কুণ্ডলী যন্ত্রের (Induction coil) তীক্ষ্ণ ঘর্ঘর ধ্বনিতে দূরস্থিত শ্রোতাদেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, উদ্ভিদ্‌শরীরের মধ্য দিয়া প্রাণান্তকর অশনিঝড় প্রবাহিত হইতেছে। প্রতিফলিত আলোক-রেখা বৃক্ষকোষের তীব্র আকুঞ্চন ফলে তুমুল আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই বিক্ষোভ নিস্তেজ হইয়া আসিল,—উদ্ভিদ্ তীব্র যাতনায় মরণের চির-নিস্তব্ধতাময় ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিল; প্রতিফলিত আলোকরেখাও স্থির হইয়া রহিল।

এই সকরুণ দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য তাঁহার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিলেন। উপসংহারে বলিলেন—

"এই পরীক্ষাগুলি হইতে মনে হয়, উদ্ভিদ্‌জাতিকে আমরা আমাদের নিকট হইতে যত দূর মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহারা তত দূর নহে। বাহ্য দৃষ্টিতে উহারা জড় পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ উহাদের প্রত্যেক কোষ, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবনশক্তির অপূর্ব্ব আনন্দে ঝঙ্কৃত হইতেছে। আমরা উহাদের সতত স্পন্দনশীল হৃদয়ের ইতিহাস আহরণ করিয়াছি। জীবন প্রবাহের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছায়াপাতে ইহাদিগকেও উৎফুল্ল অথবা বিমর্ষ হইতে দেখিয়াছি। মৃত্যুর কবলেও ইহাদের হৃৎ-স্পন্দন এইমাত্র আমাদের নয়ন সমক্ষেই চির-তরে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

"যে বাধা উদ্ভিদ্‌জগতকে প্রাণিজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একদিন তাহা অবশ্যই দূরীকৃত হইবে। একদিন নিশ্চয়ই একবাক্যে স্বীকৃত হইবে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ একই জীবন-স্রোতের দুই বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। এই অখণ্ড সত্যের নির্ম্মল আলোতে জীবনের প্রহেলিকা আরও নিবিড় হইয়া দাঁড়াইবে। স্বল্প-বুদ্ধি, সকল রকমে অসম্পূর্ণ, সীমাবদ্ধ-দৃষ্টি মানব চির-অজ্ঞাত রহস্য সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা নিরূপণপ্রয়াসী হইয়া এই আবিষ্কার-যাত্রা-পথে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিস্ময়লোকের ক্ষণস্থায়ী আলোকরেখা দেখিয়া উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসব

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মতিথি-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন করা হয়। এই উপলক্ষে "বসুবিজ্ঞান মন্দিরে" নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্যানটি ভারতীয় প্রথায় পত্র-পুষ্প-দীপাবলী সজ্জিত করা হইয়াছিল। মাঙ্গলিক আলিপনায় ও ধূপধুনার পবিত্র গন্ধে সমগ্র উৎসবক্ষেত্র সেই অপরাহ্নে সমাগত ভক্তগণের নয়ন-সম্মুখে আর্য্যঋষিগণের তপোবনের পবিত্র স্মৃতি

জাগাইয়াছিল। সার রিচার্ড গ্রীগরি, মিঃ বার্ণার্ড শ', রোমাঁ রোঁলা, সার জন ফারমার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ আচার্য্যদেবের দীর্ঘজীবন কামনা ও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; উৎসবক্ষেত্রে সে সকল লিপি পঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মহীশূরের দেওয়ান, নেপালের মহারাজ এবং ভারতীয় নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি আসিয়াছিল। চীন গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে যে ভক্তি-নিবেদন ও অভিনন্দন আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই—

"বিজ্ঞানকে পারমার্থিক সত্যে উন্নীত দেখিবার আশায় সমস্ত পৃথিবী আপনার দিকে চাহিয়া আছে। সমস্ত এশিয়া আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত।"

উৎসবারম্ভে মাঙ্গলিক সঙ্গীতের পর ডাঃ কালিদাস নাগ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি —এক অপূর্ব্ব কবিতা—পাঠ করেন। উপস্থিত স্বদেশীয় এবং বিদেশাগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যদেবকে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। অতঃপর উত্তরে জগদীশচন্দ্র বলেন যে, জ্ঞানের সীমা বিস্তার দ্বারা জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতের জন্য যোগ্য আসন সংগ্রহ করিবার মানসে তিনি গত ৪০ বৎসর যাবৎ সাধনায় নিযুক্ত আছেন। জগৎ আজ সভ্যতা বিনাশ-কল্পে দ্বন্দ্বমুখর, নিখিল বিশ্বের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা-সভ্যতার দিক দিয়া সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা জগতকে এই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাই প্রাচ্যের বাণী;— মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে নিখিল মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ঐক্য বিধান করিতে হইবে।

তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি আনন্দিত। তাঁহার বিজ্ঞানমন্দির যদি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট্ ছাত্রগণকে কোন সাহায্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে সাহায্য দানে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার মাতৃস্থানীয় (Alma Mater)। জগতের চক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানের পাত্র করিয়া তুলিতে পারিলে তিনি ধন্য হইবেন।

দেহগঠনের উপর আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোকের প্রভাব

ইদানীং সূর্য্যরশ্মির রোগনিবারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে যে প্রকার বিস্ময়কর প্রমাণাদি পাওয়া যাইতেছে এবং দিন দিন সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে রোগীর যে আশাতীত উপকার হইতেছে, তাহাতে তত্ত্বান্বেষী মহলে যে ইহা লইয়া একটা খুব উত্তেজনা পড়িয়া যাইবে, উহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। বস্তুতঃ, প্রাণী বা উদ্ভিদের দৈহিক এবং প্রাণশক্তির বৃদ্ধির উপর আল্ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মির (ultra violet light) কতদূর প্রভাব আছে, সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেখিবার জন্য বহু অভিজ্ঞের দৃষ্টি ইতোমধ্যেই আকৃষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে যে সকল তথ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসঙ্কোচে ভরসা করা

যায় যে, সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসার ক্ষেত্র যথেষ্ট সুপ্রসর; এবং বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে ইহা জাতীয় জীবনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিবে।

এই কার্য্যের জন্য দুই বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এতদুভয়ের এক প্রণালীতে যত অধিক পরিমাণে সম্ভব সূর্য্যালোকের ব্যবহার, এবং পক্ষান্তরে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট আলোকের প্রয়োগ করা হয়। প্রথম প্রণালীতে একই সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত স্থানে রশ্মিপ্রয়োগ করা চলে বটে; কিন্তু সীমাবদ্ধ স্থানে রশ্মিপ্রয়োগ করিতে হইলে দ্বিতীয় প্রণালীই বিশেস উপযুক্ত। বিশেষতঃ সূর্য্যালোক-প্রদীপ (Sunlight lamps) অতি মহার্ঘ বস্তু, সুতরাং তাহার ব্যবহারক্ষেত্রও এতদিন সঙ্কীর্ণ ছিল। অধুনা সে অসুবিধা দূরীকৃত হইয়াছে, এবং বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সূর্য্যরশ্মির ব্যবহার দূরপ্রসারী হইতেছে। সূর্য্যালোক নিজে সহজপ্রাপ্য হইলেও তাহাকে কার্য্যকরীরূপে রূপান্তরিত করিতে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। বায়ুমণ্ডলস্থ যে নিবিড় ধূম্রজালের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক পৃথিবীতে নামিয়া আসে, তাহাতে তাহার আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মির অনেকটাই হ্রাস হইয়া যায়। তবে ভরসা এই যে, এখন ধূম্রনিবারণ প্রচেষ্টা অল্প বিস্তর সকল দেশেই ফলপ্রসূ হইয়াছে। বিশেষতঃ, অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা এমন জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক প্রেরণ করিলে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মির শতকরা আশি ভাগই আদায় করিয়া লওয়া যায়। এই সকল জিনিষের মধ্যে Cellulose Acetate Compound নির্ম্মিত বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই মিশ্র পদার্থ (compound) প্রায়শঃই গ্যাল্‌ভেনাইজড্ তারে প্রস্তুত সূক্ষ্ম জালের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ (reinforced) করা থাকে। ইহার নাম "ভিটা কাচ" (vita glass)। সাধারণ কাচের ন্যায় ভিটা কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক যদিও দেখা যায় না, তথাপি কৃষিকার্য্যে, উদ্যান রচনাকার্য্যে সব্জীগৃহ প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার বিশেষরূপে উপযোগী। ইহাদের নির্ম্মাণ-ব্যয় কাচের নির্ম্মাণব্যয় অপেক্ষা কম, এবং য়ুরোপের কৃষকেরা আজকাল বহুল পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিতেছে।

লণ্ডনের রয়াল্ জুলোজিক্যাল্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত পরীক্ষার ফলাফল ইদানীং যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছে। বিখ্যাত রেজেন্ট্ উদ্যানের (পার্ক) বানর-গৃহ, সিংহ-গৃহ, সরীসৃপ-গৃহ প্রভৃতির ছাত ভিটা-কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সোসাইটীর সম্পাদক ডাঃ মিচেল (Mitchell) বলেন যে, এই কাচ এবং বৈদ্যুতিক আলোকের গোলক-(bulb) নিঃসৃত আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি বানর, সিংহ প্রভৃতির সাধারণ স্বাস্থ্য এবং প্রাণশক্তির অতি বিস্ময়কর ও আশাতীত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকাতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলোক ভিটামিন-হীন খাদ্যব্যবহারজনিত ক্ষতি বহুলাংশেই পরিপূরণ

করিতে পারে। সারের (Surrey) এক কৃষিশালায় এই উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তোষজনক ফল পাইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মূল্যবান ঘোড়াসমূহের স্বাস্থ্য ও শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য য়ুরোপের বহু স্থানে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলোকের ব্যবহার চলিতেছে।

জুলোজিক্যাল্ সোসাইটীর গবেষণাফল হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যালোকের অন্তরস্থ আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়াও প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়। টাঙ্‌ষ্টেন্-প্রদীপজাত রশ্মিতে কিন্তু অনিষ্ট হইয়া থাকে,—অতি অল্পক্ষণ ব্যবহারের ফলেও প্রাণীর জীবননাশ হইতে দেখা গিয়াছে। কৃত্রিম উপায়জাত রশ্মি সাধারণতঃই অত্যধিক পরিমাণে শক্তিশালী হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহার শক্তি ও পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি সর্পবিষ প্রতিষেধ করিতে পারে কি না, নির্ণয় করিবার জন্য ফিসালি ও পাস্তর নামক দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন; কিন্তু এখনও তেমন আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

বিভিন্ন প্রাণীর উপর রশ্মি প্রয়োগের কাল বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সকল প্রকার প্রাণীর দেহগঠন বা শারীরিক অবস্থা তো এক প্রকার নহে; সুতরাং রশ্মি প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রয়োজন মত প্রয়োগকাল বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতীতও ইহাতে ইন্দ্রলুপ্ত (কেশহীনতা), অস্থিবিকৃতি রোগ, নিউমোনিয়া, কফজ্বর (শ্লেষ্মাঘটিত জ্বর), তাণ্ডবরোগ প্রভৃতিরও যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

বিলাতের কিউ (Kew) উদ্যানে পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভিটা কাচের আবরণ নিম্নে বীজ প্রাকৃতিক অঙ্কুরোদ্গম সময়ের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে অঙ্কুরিত হয়, এবং তিন সপ্তাহ পরেই উদ্ভিদ্‌গুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দেখায় এবং গাঢ় সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হয়। বিলাতি বেগুন বহু পূর্ব্বেই সুপক্ক হয়, ইক্ষু অধিকতর শীঘ্র পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সালাদ প্রভৃতি অতি অল্প সময়েই পরিপুষ্ট ও সুস্বাদু হইয়া থাকে।

গৃহপালিত-পশুপক্ষী-ব্যবসায়েও (Poultry) আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ আলোকের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে। Poultry-ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নবজাত হাঁস, মুরগী প্রভৃতির পায়ের দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রশ্মিপ্রয়োগ করিলে উহাদের পায়ের এই দুর্ব্বলতা নিবারণ করা যায়। অধিকন্তু শাবকগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থসবল হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বৃদ্ধি, দৈহিক গঠন ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য আল্‌ট্রা-ভায়োলেট আলোকের প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। য়ুরোপ, ও আমেরিকাতে ইহার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কৃষিক্ষেত্রগুলিতে এই রশ্মি

প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইত, এবং অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকেরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিত। সূর্য্যরশ্মির সঞ্জীবনী শক্তি সম্বন্ধে এ-দেশের আপামর সাধারণ এতটা নির্ভরশীল যে, কচি শিশুদিগকে সর্ষপতৈলসিক্ত করিয়া রৌদ্রে রাখা প্রত্যেক প্রসূতি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। আবার ইহাও মনে হয় যে, এ-দেশে বহু প্রাচীন যুগে সূর্য্যপূজাপ্রবর্ত্তনও বোধ হয় মহাব্যাধি নিবারণকল্পে প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল। পুরাণে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে শাম্ব কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পশ্চিম (ক্যাল্‌ডিয়া) হইতে মগ-ব্রাহ্মণ (magi) আসিয়া কণার্ক-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সূর্য্যপূজা প্রবর্ত্তন করিলে শাম্ব ব্যাধিমুক্ত হন। সুতরাং সূর্য্য-রশ্মিবিশেষের রোগনিবারণশক্তি সম্বন্ধে ভারতবাসী গোড়া হইতেই অসন্দিগ্ধ। এখন কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিলে অতি সহজেই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ডাঃ রমণের অভিনব আবিষ্কার

কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ রমণ এক নূতন প্রকারের রশ্মি (radiation) আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, এই নবাবিষ্কৃত কিরণ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের গবেষণাক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত করিয়া দিবে।

শুভ্র আলোক রশ্মি কোনও পদার্থের উপর পতিত হইলে, পদার্থের অন্তরস্থ কণাগুলিতে আহত হইয়া বহুধা বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; বিচ্ছুরিত আলোকরেখা আপতিত আলোকের বর্ণাদি ও তরঙ্গায়তি (wave-length) ব্যতীতও অন্যান্য অনেক নূতন বর্ণ ও তরঙ্গপূর্ণ রশ্মি বিকীরণ করে।—নবাবিষ্কৃত কিরণমালার ইহাই মূল কথা। একবর্ণ বা অভিন্ন তরঙ্গায়তিবিশিষ্ট আলোক কোনও স্বচ্ছ তরল বা বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইলেও ঐরূপ বিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রশ্মি-বর্ণ-বিশ্লেষণ-যন্ত্র (Spectroscope) দিয়া দেখিলে উক্ত বিক্ষিপ্ত আলোকের বর্ণলেখায় (Spectrum) কতকগুলি উজ্জ্বল রেখাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মূল আলোকের বর্ণলেখায় কিন্তু এই রেখাচিহ্নগুলির কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই চিহ্নগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তরল পদার্থের অণুর দেহে সংহত হইয়া নিশ্চয়ই কোন নূতনতর আলোকরশ্মির সৃষ্টি হইয়াছে। বহুবিধ স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া শুভ্র আলোক প্রেরণ করিয়া অধ্যাপক রমণ এই আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধুনা যে মতবাদ প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইলে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যাখ্যা সহজেই মিলিতে পারে।

প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের মতে আলোক রশ্মিশক্তির কণিকা-সমষ্টি (Quantum) ব্যতীত আর কিছু নহে। রশ্মিশক্তির কোন একটি কণিকা পদার্থের কণাকে আঘাত করিয়া যখন সম্পূর্ণ অবিভক্ত অবস্থায় প্রতিহত বা বিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই একটি কণিকার

ক্রিয়াই আমরা সমস্ত আলোকরশ্মিটির বিস্তৃতি হিসাবে দেখিতে পাই। এইরূপ আঘাতের ফলে কণিকাটি যে অবিভক্ত থাকিবেই—এরূপ অনুমান করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। আহত হইয়া উহা নানা অংশে বিভক্তও হইয়া যাইতে পারে; তখন তাহার কতকাংশ পদার্থের কণা নিজে গ্রাস করে, অবশিষ্টাংশ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থা হইতেই—অর্থাৎ যখন রশ্মিকণিকার আংশিক হ্রাস ঘটে, তখনই—নূতন কিরণরেখার সৃষ্টি হয়। বিচ্ছুরিত আলোকের তরঙ্গায়তি মাপিয়া দেখিলেই উক্ত অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কখনও কখনও আপতিত আলোকের হ্রাসপ্রাপ্তি না ঘটিয়া বৃদ্ধিও হইতে পারে। আইনষ্টাইন্ পূর্ব্বেই অনুমানের (theory) উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অধুনা পরীক্ষা করিয়াও অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, (অর্থাৎ যখন বৃদ্ধি ঘটে) আপতিত আলোকরেখা দ্বারা আহত উত্তেজিত পদার্থকণা আলোকের অংশ গ্রাস না করিয়া বরং নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির (energy) কিয়দংশ পরিত্যাগ করে। তাহার ফলে পদার্থের কণা হইতেই আরও কতকটা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সুতরাং আপতিত আলোক অপেক্ষা বিচ্ছুরিত আলোকের কম্পন (frequency) অধিকতর হইবার সম্ভাবনা ঘটে, অর্থাৎ বিচ্ছুরিত আলোকের তরঙ্গায়তি অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়।

ডাঃ রমণ বিচ্ছুরিত আলোকের এই দ্বিবিধ প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার অভ্রান্ততা প্রমাণিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণলেখায় অনেকগুলি নূতনতর রেখাচিহ্নের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোন প্রকার স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক পরিচালিত করিলেই বিচ্ছুরিত আলোক অনুরূপ ফল প্রকাশ করে। তবে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রেখাচিহ্নের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক; কেননা, বিভিন্ন পদার্থের অণু বিভিন্ন রূপই হইয়া থাকে।

নিছক আবিষ্কারের দিক হইতে রমণ-ফলের (Raman Effect) মূল্য নিতান্ত কম নহে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চক্ষে ইহার মূল্য অপরিমিত। বিচ্ছুরিত আলোকের (রমণ-রশ্মির) বর্ণলেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া অদূর ভবিষ্যতে অণুর তথা পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যাইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন। ইহা ব্যতীত স্বদীপক পদার্থ (fluorescent body), পদার্থের স্বাভাবিক আলোকবিকীরণশক্তি (phosphorescence) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোকের প্রভাব (Photo-Chemistry) প্রভৃতি বিষয়েও বহু নূতন সংবাদ জানিতে পারার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি নীহারিকার গঠনপ্রণালী অথবা সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কখনো কখনো আকাশে যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহার জ্যোতির কারণ সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা আবিষ্কার হওয়াও বিচিত্র নহে।

ডাঃ রমণের আবিষ্কার বিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্র এতদূর প্রসারিত করিয়াছে যে, লণ্ডন রয়াল্ সোসাইটীর বৈদেশিক সভ্য খ্যাতনামা অধ্যাপক আর, ডব্লিও, উড্ বলিয়াছেন, "ডাঃ রমণের আবিষ্কার যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মূল্যবান, এবং ইহার ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল; কেননা, রমণ-ফলের সম্যক আলোচনা দ্বারা 'আলোকের শক্তিকণিকা বাদ' (Quantum Theory of Light) সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।"

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

আবহ-বিজ্ঞান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু (কৃষক, আশ্বিন, ১৩৩৫)

জল—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত (মাতৃমন্দির, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

জীবতত্ত্বের অ-আ—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু (সুবর্ণবণিক সমাচার, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

ব্যবহারিক কীট-পতঙ্গ—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক, ১৩৩৫)

ভিটামিনের কথা—কাপ্তেন ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র দে দেবভূতি, আই-এম্-এস্, এম্-বি, (বৈশ্য-শক্তি, আশ্বিন, ১৩৩৫)

মক্ষিকা সমাচার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস (স্বদেশী বাজার, ১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা)

সাবান প্রস্তুত প্রণালী—শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যবসা ও বাণিজ্য, কার্ত্তিক, ১৩৩৫)

সূর্য্যালোক ও স্বাস্থ্য—শ্রীকালীচরণ ঘোষ, বি-এল্ (স্বাস্থ্যসমাচার, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

স্বাস্থ্যরক্ষার অ-আ—ডাক্তার শ্রীকমলকৃষ্ণ শীল দেবভূতি, এম্-বি (বৈশ্য-শক্তি, আশ্বিন, ১৩৩৫)

ভ্রমসংশোধন

শরৎ-সংখ্যা প্রকৃতির ২৪৯ পৃষ্ঠাস্থ তালিকার তৃতীয় সারির দ্বিতীয় স্তম্ভের "০" স্থানে "১" এবং তৃতীয় স্তম্ভের "১.০০০০৫" স্থানে "১.০০০০০৫" হইবে।

উক্ত সংখ্যার ২৫৪ পৃষ্ঠার ১১নং সমীকরণের প্রথম লাইনের শেষ রাশিটির ভাজককে (Denominator) "$১+\frac{ব}{ভ}\times\frac{তা}{সা}$" স্থানে "$১+\frac{ব}{ভ^২}\times\frac{তা}{সা}$" হইবে।

Printed and published by Sj. Raghunath Seal, B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuabazar Street, Calcutta.
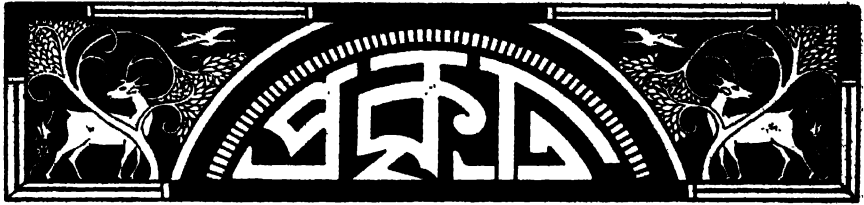
৫ম বর্ষ　　পৌষ-মাঘ ১৩৩৫　　৫ম সংখ্যা

বৃক্ষের অন্তর্নিক্ষেপ (ইন্‌জেক্‌সন্‌) প্রক্রিয়া

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা ও উহার শারীরিক অসুস্থতা দূর করিবার জন্য অন্তর্নিক্ষেপ প্রণালীর প্রয়োগ চেষ্টা কেন খুব বেশী ভাবে করা হয় না, এই প্রশ্ন আমার মনে উপস্থিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমি টবে বর্দ্ধিত কতকগুলি Crinum asiaticum Linn. (সুখদর্শন) চারাগাছ প্রায় এক সপ্তাহ কাল একটি অন্ধকার ঘরে রাখিয়াছিলাম, এবং যখন এইরূপে ঐ গাছগুলির পত্র সম্পূর্ণরূপে সাদায় পরিণত হইল, তখন আমি জানালাগুলি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া শতকরা ·৫ (·5°/₀) হীরাকষ (Ferrous Sulphate) দ্রব hypodermic ষ্টীল সূচের সাহায্যে তাহাদের মূলমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলাম। ঐ সূচের নিম্নভাগ রবারের নলদ্বারা একটি ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত কাচের নলের সহিত যুক্ত ছিল (ক চিত্র) এবং ঐ কাচের নলটি একটি কাষ্ঠখণ্ডের সহিত সংলগ্ন ছিল—যাহাতে নলটি দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। সর্ব্বদা ঊর্দ্ধাভিমুখী চাপে যাহাতে উক্ত দ্রব বৃক্ষের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য সূচটি কয়েক দিনের জন্য মূলে প্রবিষ্ট করান ছিল এবং ঐ নল-সংলগ্ন কাষ্ঠখণ্ডটি ভূমি হইতে কিছু উচ্চে একটি টেবিলের উপর বসানো ছিল। প্রত্যহ কতটা পরিমাণে দ্রব শোষিত হইত তাহার হিসাব রাখিতাম। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে দেখিলাম যে, এই প্রণালীতে এক ডজন চারাগাছের মধ্যে একটি সম্পূর্ণরূপে, এবং অপরগুলি এবং Control plantগুলি কিয়ৎ পরিমাণে সবুজ হইয়াছে। ইহাতে আমার মনে হইল যে, কোনও আকস্মিক কারণ বশতঃ এই একটি মাত্র গাছ সম্পূর্ণরূপে সবুজে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর কিছুকাল এই কাজ বন্ধ থাকে, কারণ আমাকে ইউরোপে যাইতে হইয়াছিল।*

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিয়া যখন আমি এই প্রক্রিয়া পুনরারম্ভ করি তখন আমার দৃষ্টি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সি, বি, লিপ্‌ম্যান্‌-এর (Dr. C. B. Lipman) কার্য্য প্রণালীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনিও হীরাকষ-দ্রব বহু হরিদ্রাবর্ণ, পীড়িত লেবু বৃক্ষের কাণ্ডে প্রবেশ করাইয়া সবুজে পরিণত করিয়াছিলেন (Journal of General Physiology; May 20, 1924; Vol. No, 5 pp. 615…623)
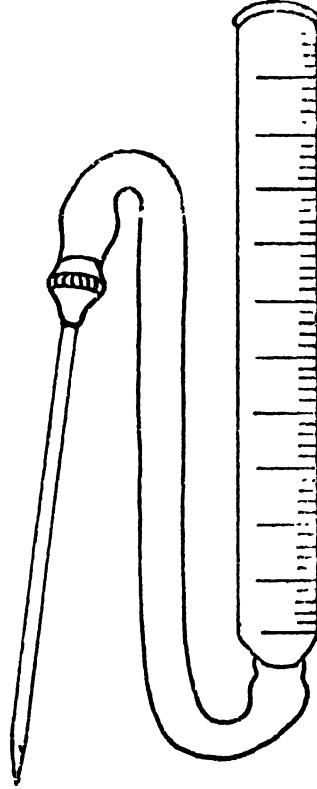
চিত্র—ক

তিনি যে প্রণালীতে দ্রব প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমিও ঠিক সেই ভাবে দ্রব প্রয়োগ করিয়াছিলাম। গাছগুলিকে স্বাভাবিক সবুজ রঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিতে তাঁহার প্রায় ৩ মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা Bose Research Institute-এর মাঠে অনেকগুলি সুস্থ সবুজ-রং-বিশিষ্ট Mimosa (লজ্জাবতী) গাছের মধ্যে কয়েকটা হরিদ্রাবর্ণের গাছ দেখিতে পাই। গাছগুলির সমস্ত পত্র ও পত্রক হরিদ্রাবর্ণ ছিল। এই স্থানের মৃত্তিকায়

লৌহক্ষারের অভাব ছিল না, কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের অতি নিকটবর্ত্তী লজ্জাবতী গাছগুলি সম্পূর্ণ সবুজবর্ণ ছিল।

এই গাছগুলির শিকড় ও শিকড়ের সূক্ষ্ম কেশগুলি ভূগর্ভের কঠিন ইষ্টকের সংস্পর্শে আসার জন্যই বোধহয় তাহাদের এই রোগের উৎপত্তি। ডাঃ মার্লোথ ওয়েলিংটন-জিলার ফলবান্ বৃক্ষসমূহের হরিদ্রারোগের কারণ নির্ণয় করিতে করিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (Univ. South Africa. Dept. Agric. Sci. Bull. 29. 21p, 6pl.—1927.) মার্লোথ আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এইরূপে আক্রান্ত ৫,০০০ বৃক্ষের কেবল শিকড়গুলি ব্যাধিগ্রস্ত দেখা গিয়াছিল ;—তন্মধ্যে কতকগুলির মূল সম্ভবতঃ কৃষিকার্য্য-কালীন ভূমিকর্ষণে আহত হইয়াছিল।

আমি শতকরা '২৫ ('25%) অতি তরল হীরাকষ-দ্রব লজ্জাবতী গাছের কাণ্ডে ইস্পাত-নির্ম্মিত hypodermic সূচের সাহায্যে প্রয়োগ করিতেছিলাম। সুখদর্শন (Crinum asiaticum) গাছের মূলে দ্রব প্রয়োগ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, এইবারও ঠিক সেই প্রণালীতে কার্য্য করিলাম। ঐ ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত কাচের নলটি শতকরা '২৫ Ferrous Sulphate ('25%) দ্রবদ্বারা পূর্ণ ছিল ; যাহাতে দ্রব বাষ্পীভূত না হয় তজ্জন্য দ্রবের উপরি-ভাগে ক'এক ফোঁটা (মেশিন্-অয়েল্) তৈল রাখিয়াছিলাম। সর্ব্বদা ঊর্দ্ধাভিমুখী চাপের সাহায্যে যাহাতে দ্রব গাছের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেইজন্য hypodermic ষ্টীল সূচটি কাণ্ডের মধ্যে ক'এক দিবসের জন্য প্রবিষ্ট করানো ছিল। তরল দ্রবের সমতল ভাগ দেখিয়া প্রত্যহ কি পরিমাণ দ্রব শোষিত হইতেছে, তাহার তালিকা রাখা হইত। ৩।৪ দিন পরে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পত্রক সম্পূর্ণরূপে সবুজ হইয়াছে, এবং এই প্রক্রিয়া-সাধিত সবুজ গাছ ও স্বাভাবিক সবুজ গাছের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। আমি পুনরায় এই প্রক্রিয়া এক ডজন ছোট গাছের উপর প্রয়োগ করিলাম। প্রত্যেক বারেই ফল একপ্রকার দেখা গেল। কোন কোন গাছের প্রতিক্রিয়া-শক্তি এত বেশী যে দুই দিনের মধ্যেই সমস্ত গাছটি সবুজে পরিণত হইত। দ্রবের শোষণ-পরিমাণ অবশ্য বাহিরের আবহাওয়া ও প্রত্যেক বৃক্ষের স্ব স্ব প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য শোষিত দ্রবের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। গাছের বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী প্রথম ২৪ঘণ্টার মধ্যে ১'৫ ঘন সেণ্টিমিটার (c.c.) হইতে ৩ ঘন সেণ্টিমিটার (c.c) পর্য্যন্ত দ্রব শোষিত হইতে দেখা যায়। এই অন্তর্নিক্ষেপ-প্রক্রিয়ায় দুইটি বিষয়ে সাবধান হইতে হয়—প্রথম, যাহাতে সূচের সরু মুখ বন্ধ হইয়া না যায়, এবং দ্বিতীয়, যাহাতে দ্রব সন্ধিস্থল হইতে চুয়াইয়া না পড়ে। সূচটি একেবারে কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠের (xylem) মধ্যে—ঠিক যে স্থলে রসস্রোত প্রবাহিত হয় সেই প্রদেশে প্রবেশ করাইতে হইবে। যাহাতে কাণ্ডমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনুরূপ দ্রব হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট লজ্জাবতীগাছপূর্ণ মাটিতে ঢালা হইয়াছিল। এই গাছগুলিকে ক'এক

দিন ধরিয়া দেখা হইল, শেষে ইহা দেখা গেল যে, ইহাদের প্রতিক্রিয়া-শক্তি খুব কম—এত কম যে উল্লেখযোগ্য নহে।

১৯২৫ খৃঃ জুনমাসে আমি পুনরায় কতকগুলি লজ্জাবতী গাছে ঠিক ঐ ভাবে উক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিলাম—এবারে লক্ষ্য করিলাম যে, দ্রবের লৌহ পদার্থের অধিকাংশ ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত কাচের নলের গাত্রে ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া, মরিচা পড়িয়া জমিয়া রহিয়াছে, এবং যে দ্রব বস্তুতঃ গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অতি তরল অ্যাসিড্ মিশ্রিত জল,—এবং তাহাতে অতি অল্প পরিমাণেই লৌহ আছে। এইরূপ দেখিয়া আমি লৌহদ্রব একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম এবং খুব অল্প পরিমাণে অ্যাসিড্মিশ্রিত জল (১০০ c. c. জলে এক ফোঁটা Sulphuric acid.) লইয়া পুনরায় আর এক নূতন সেট্ হরিদ্রাবর্ণ লজ্জাবতী গাছের কাণ্ডে ষ্টীলের সূচদ্বারা প্রয়োগ করিলাম। এবারে ৪।৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত গাছ সবুজ রঙ্গে পরিণত হইল। হীরাকষ-দ্রব প্রয়োগে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, এবারও সেইরূপ হইল; বহুবার এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া, প্রত্যেক বারেই একপ্রকার ফল দেখা গেল। প্রত্যেকটিতে প্রত্যহ কত পরিমাণে অ্যাসিড্ জল শোষিত হইত, তাহার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখিয়াছিলাম। বর্ণানুক্রমিক (colorimetric method of analysis) উপায়ে ধার্য্য হইল যে, গুল্মকাণ্ড মধ্যে যে অ্যাসিড্ জল প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণে (0·00025°/。) লৌহদ্রব ঐ লৌহনির্ম্মিত সূচ্ হইতে অ্যাসিড্ সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

এই প্রক্রিয়া-সাধিত গাছগুলির উপর ১ বৎসরের অধিক কাল লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল,—কিন্তু একটিকেও পুনরায় হরিদ্রাবর্ণ হইতে দেখা যায় নাই।

১৯২৬ সালে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে, কলিকাতা Bose Research Institute-এ আমি পুনরায় কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণের লজ্জাবতী গাছ লইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কেবল অ্যাসিড্ জল (১০০ c. c. জলে ১ ফোঁটা Merck-এর খাঁটি Sulphuric acid) প্রয়োগ করিলাম—কিন্তু এবারে লৌহনির্ম্মিত সূচ ব্যবহার না করিয়া কাচের খুব সরু শক্ত অতি-সূক্ষ্ম-ছিদ্র (capillary) নলের অগ্রভাগ ঘষিয়া সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিলাম। এবার প্রতিক্রিয়াশক্তি অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ হইল,—দুই সপ্তাহ কাল মধ্যে প্রায় ২ c. c. অ্যাসিড্ জল শোষিত হওয়া সত্ত্বেও গাছগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

ইহার পর আমি হরিদ্রাবর্ণপত্রবিশিষ্ট নাতিদীর্ঘ দৃঢ়দেহ Ixora-coccinea (রঙ্গণ) গাছের কাণ্ডে ষ্টীলের সূচদ্বারা ঠিক সেইরূপ অ্যাসিড্ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ১১ দিনের মধ্যে সমস্ত শাখা ও উপশাখাগুলি সবুজে পরিণত হইল; অবশ্য লজ্জাবতী গাছে যে পরিমাণ জল শোষিত হইত, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে একপশলা বৃষ্টি হওয়ার পর আমাদের কলেজের উদ্যানস্থ

কতকগুলি হরিদ্রাবর্ণ লজ্জাবতী গাছ হঠাৎ স্বাভাবিক সবুজে পরিণত হইয়া গেল। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে বৃষ্টির জল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া পীড়িত গাছগুলির শোষণ-শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল।

Benjamin Moore বর্ণিত (Proc. Royal society, vol. 87 (1914) pp. 556-571.) Macallum-এর লৌহ-পরিমাণ-নির্ণয়ের অতি সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা গেল যে, হরিৎবর্ণ পত্র অপেক্ষা সুস্থ সবুজ পত্রে অধিক পরিমাণে লৌহ বর্ত্তমান। আর বর্ণানুক্রমিক (colorimetric method of analysis) উপায়ে দেখা গেল যে, হরিদ্রারোগাক্রান্ত গাছ অপেক্ষা সুস্থ সবুজ গাছে (কাণ্ডে বা মূলে) লৌহের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ; এবং গাছের কাণ্ডে শিকড় অপেক্ষা অধিক লৌহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। এই লৌহের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আমি আমাদের কলেজের Bio-Chemistry Department-এর গবেষণাকারী বন্ধুপ্রবর ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস্-সি ; এম, বি ; ডি, আই, সি, মহাশয়ের নিকট ঋণী।

হরিদ্রারোগাভিভূত বৃক্ষগুলিতে এই অন্তর্নিক্ষেপ প্রণালীদ্বারা সবুজে পরিণত করিতে পারার নিছক আনন্দ ব্যতীতও ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয়। আমার বিশ্বাস দুর্ব্বল ক্ষীণ ফলবৃক্ষদের মৃত্তিকায় সার দিয়া চিরাচরিত উপায়ে শক্তিমান করান অপেক্ষা এই সরল সহজ অন্তর্নিক্ষেপ প্রণালী অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর।

এই প্রবন্ধের অনেকটা লিখিয়া ফেলিবার পর আমার দৃষ্টি Hopkins এবং Wann-এর কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, (Bot. Gazette Vol. LXXXIV No. 4, Dec. 1927 ; pp. 523-424.) তাহাতে লেখা আছে যে, গাছের পুষ্টি ক্ষেত্রস্থ লৌহের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে কেবল ionized-লৌহের পরিমাণের উপর। এতএব কোনও জমিতে অধিক পরিমাণে লৌহ থাকিলেও, ion আকারের লৌহ অল্প হইলে গাছের বৃদ্ধি অতি অল্প হয় ;—এমন কি একেবারে নাও হইতে পারে।

পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষায় অ্যাসিড্‌জলমধ্যস্থ কত সামান্য পরিমাণ লৌহ যে হরিৎবর্ণ লজ্জাবতী এবং রঙ্গণ গাছগুলিকে স্বাভাবিক সবুজবর্ণে পরিণত করিয়াছিল, তাহা উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে অতি সহজেই বোঝা যায়।*

* এই প্রবন্ধের জন্য বিহার ও উড়িষ্যার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর আমাকে ১৯২৩ সালের উডহাউস্-মেমোরিয়াল্ প্রাইজ প্রদান করেন।

রাসায়নিক পরিভাষা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যে জার্ম্মাণী বিজ্ঞান-জগতে এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির দ্বারা পৃথিবীতে প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আর্য্যঋষির সন্তান ভারতবাসীও বিজ্ঞান শিক্ষার্থী হইয়া আজ যাহার দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন, সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী আজ যাহার ভাষা শিখিতে এত লালায়িত, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই জার্ম্মাণীতে ফরাসী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হইত। এই একশত বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণী নূতন ভাষার প্রচলন এবং নব বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া সামান্য বিজ্ঞানশিশুটিকে এতবড় করিয়া তুলিয়াছে। এখন কোন বৈজ্ঞানিকই জার্ম্মাণ ভাষা না শিখিয়া বিজ্ঞানালোচনায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুষ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অবলম্বন ছিল জার্ম্মাণভাষা। জগৎপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ (Mendeleeff) বৈদেশিক ভাষায় স্বদেশে বিজ্ঞানপ্রচলন জাতীয় উন্নতির বিরোধী বুঝিয়া, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও গবেষণার দ্বারা যাহা কিছু আবিষ্কার করিতেন, অসংস্কৃত রুষ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট শুনাইতেন। এইরূপে রুষভাষাতেও এমন রাসায়নিক তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে যে, রসায়নশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভেচ্ছু বৈজ্ঞানিকদের এখন সেই অসংস্কৃত সুকঠিন রুষ-ভাষাও শিখিবার প্রয়োজন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন যে, রুষ-ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানের গূঢ় রত্নোদ্ধার কল্পে বর্ত্তমান রাসায়নিক জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহার এক এডিনবরাস্থ (Edinburg) সহপাঠীকে রাত্রিদিন শ্রম সহকারে রুষভাষা শিখিতে হইয়াছিল। আজকাল জাপানেও জাপানী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা চলিতেছে। সমগ্র জগৎ ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এ'বিষয়ে চিরন্তন শিথিলতা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তবে আজকাল যে সামান্য একটু জাগরণের চিহ্ন দেখা যায়, তাহাতেই ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইতেছে; এবং কালে হয়ত বিজ্ঞান-জগতে ভারতবর্ষেরও স্থান হইতে পারে ভরসায় আমাদের বিজ্ঞান-সারথিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

আমাদের দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্কলন বিষয়ে কিছু আলোচনা হইতেছে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ এ-বিষয় সর্ব্বপ্রথম কার্য্যারম্ভ করেন। তাহার পর মহামতি মহারাজ সয়াজি রাও গায়কোয়াড় মহোদয় উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও এ'কার্য্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎও এবিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ৺কাশীধামের নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও বাহির হইয়াছে। জনৈক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয় * অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়াছেন। অধুনা "প্রকৃতিতে"ও অনেক বিজ্ঞানসেবী অধ্যাপক এ'বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এই সমস্ত স্বদেশহিতৈষিগণ সাহিত্য-বিজ্ঞান-অনুরাগী বিদ্যোৎসাহী মাত্রেরই অকপট ধন্যবাদের পাত্র।

এ-বিষয়ে আমি যতটুকু করিতে পারিয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম।

একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন—"Panini, whom Maxmüller called the greatest grammarian the world has ever produced, by resolving sanskrit to its simple roots, paved the way for the science of languages"। সুতরাং পাণিনি যখন বিচিত্র সূত্রসমষ্টি গ্রথিত করিয়া ভাষাবিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুত করা সুকঠিন নহে, কেবল শ্রমসাপেক্ষ মাত্র। আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রীক কিম্বা ল্যাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত। গ্রীক এবং সংস্কৃতভাষার মূলধাতু প্রায় একরকম বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও গ্রীকভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃতভাষা প্রাচীনতম ভাষা। যখন এই দুই ভাষার মূলধাতুসমূহের অর্থের ঐক্য প্রতীয়মান হইতেছে, তখন আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন কার্য্যে সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলেন যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন নাই, ইংরাজী শব্দগুলি যেমন আছে, সেইরূপ রাখিলেই চলিবে। এই মত বিচারসাপেক্ষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে আমাদের ভাষার দিক হইতে কতকটা ভয়েরও কারণ আছে, কেন না অতগুলি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিলে, বঙ্গভাষার দফারফা হইবে এবং কালে ইহা ইংরাজী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। ঐ প্রথায় ভারত সন্তানদেরও বিশেষ অখ্যাতি হইবে এবং সমগ্র জগতে তাঁহাদের একটা অকীর্ত্তি থাকিবে যে, ভারতবাসীর জাতীয়তার প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে, মনে করি। ইংরাজ 'কলিকাতা'কে কলিকাতা বলে না—বলে 'Calcutta,' 'মুঙ্গের'কে—মুঙ্গের বলে না "Monghyr" বলে, 'মুম্বইকে" বলে Bombay, 'মান্দ্রাজ'-এর নাম দিয়াছে 'Madras'। তাই বলিতেছিলাম—এই মত, অর্থাৎ ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ বাঙ্গালাতে প্রচলন বিচারসাপেক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার মত এই যে,—যখন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, রুষিয়া, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আছে, তখন আমাদের হাতে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা

* ৺জগন্নাথ স্বামীকৃত ত্রৈলিঙ্গ ভাষায় 'নব্য সাংখ্যসার' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। আর্য্যপ্রেস, Vizigapatam, Madras.

এবং পাণিনিকৃত সর্ব্বভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যাকরণ ও রাশীকৃত কোষ (প্রায় আট হাজার) থাকিতেও পরের নিকট হইতে শব্দ ধার করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু কেহ কেহ এমন আপত্তি তুলিয়াছেন যে, যদি স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অবতারণা করা হয়, তাহা হইলে সেগুলি আন্তর্জাতিক (international) বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুকূল হইবে না, সুতরাং আমাদের দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রবন্ধাদি উত্তম হইলেও জগতের অন্যান্য সাহিত্যে স্থান পাইবে না। এরূপ আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ হইবার কারণ দেখি না। জার্ম্মাণী, ইংরাজী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি প্রায়ই একরূপ শুনায়। চেষ্টা করিলে আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণ ও কোষাদি অবলম্বন পূর্ব্বক নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে তৎসমুদয়ও শুনিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির ন্যায় হয়, (phonetic resemblance) তাহা করাও খুব অসম্ভব ব্যাপার নহে। অবশ্য সঙ্কেতাদি সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অনুসরণে ইংরাজীতেই রাখিতে হইবে, কারণ ইহা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুকূল বলিয়া সমগ্র বিজ্ঞানজগৎ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ করিলে, আমাদের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণের প্রচেষ্টায় কালে আমাদের পরিভাষাও অন্যান্য দেশের পরিভাষার সমকক্ষ হইতে পারিবে।

সংস্কৃত ভাষা কামদুঘা, যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়, এবং এ'ভাষা হইতে নিত্যই যে নূতন শব্দ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার পথও আর্য্যঋষিরা দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন একটি শব্দ রচনা করিতে হইলে প্রধানতঃ তাহার অর্থ লইয়াই গোল উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই অর্থ কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ঋষিগণ সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।

ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী

শক্তিগ্রহং—শক্তিং গৃহ্ণাতি যঃ ইত্যর্থে শক্তি শব্দ পূর্ব্বকাৎ গ্রহ ধাতোরল্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্ন ইতি কেচিৎ। শব্দ শক্তিজ্ঞানম্। যথা অস্মাৎ শব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছা শক্তিরিতি তার্কিকাঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ। অতএব শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানেতি—ইতি প্রাঞ্চঃ। ইতি দুর্গাদাসঃ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সূত্রমতে শব্দের শক্তিগ্রহ অর্থাৎ তাহার অর্থ গ্রহণ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে হইয়া থাকে ;—

(১) ব্যাকরণানুসারে, (২) তুলনার দ্বারা, (৩) শব্দকোষ মতে, (৪) আপ্তবাক্যের অনুশাসনে, (৫) ব্যবহারানুসারে, (৬) কোন প্রবন্ধে শেষোক্ত শব্দার্থের অনুশাসনে, (৭) বিবৃতির অনুসরণে, (৮) সিদ্ধপদের সন্নিধি হেতু। সমস্ত ভাষাতেই এই প্রণালীতে শব্দার্থ গ্রহণ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় কিরূপে বৈজ্ঞানিক শব্দ রচিত হইতে পারে, তাহাই আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং=ইংরাজী, ফ=ফরাসী, জা=জার্ম্মাণ, সং=সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
(১) ইং—Hydrogen (H) ফ—Hydrogene (H) জা—Wasser-stoff (H) সংস্কৃত (ভারতীয়) প্রতিশব্দ— **আর্দ্র্জন** (H)	**আর্দ্র্জন**—(H) আর্দ্রম্ ক্লিন্নং জনয়তি যঃ সঃ আর্দ্র্জনঃ। আর্দ্র্ম—সজলবস্তু, ভিজা ইতি ভাষা—ইতি শব্দ-কল্পদ্রুমঃ ; ক্লিন্নং ইত্যমরঃ। আর্দ্র্ +জন—নিচ্ +অচ্। (Gk. 'hudro' for 'hudor' √wad='to wet' meaning water, and √gan='to produce.'	ইং—'আর্দ্র্জন' অর্থে জল-উৎপাদক বুঝায়—a substance which produces wetness or moisture। ইংরাজী শব্দটি Greek 'hudro' পদ হইতে উদ্ভূত, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। 'hudro' পদের মূলধাতু √wad=to wet, ভিজান। এবং √gan=to produce। আর্দ্র্জন অর্থে যদ্দারা ক্লেদন অর্থাৎ আর্দ্রীভাব জন্মায় তাহাই বুঝায়। আর্দ্র্জন কোন শুষ্কপাত্রে পুরিয়া জ্বালিলে সেই পাত্রটিকে ভিজাইয়া দেয়।
(২) ইং—Oxygen (O) ফ—Oxygene (O) জা—Sauerstoff (O) সং—(ভারতীয়) **অক্ষজন** (অম্লজন) (O)	**অক্ষজন (অক্ষ্রজন)** (O) ১। অক্ষজন—অক্ষং অস্ত্রং ("অক্ষং চক্রং অস্ত্রং"—ইতি মেদিনী) অস্ত্রবৎ তীক্ষ্ণং—ইতি ভাবঃ—তীক্ষ্ণাস্বাদং অম্লাস্বাদং বা জনয়তি যঃ সঃ—অক্ষজনঃ। অক্ষ+জন—নিচ+অচ (meaning *acid producer*, অর্থ—অম্লজনয়িতা) [From Gk. Skarp—to cut, and Gen—to produce. The root of *oxus*, i.e. Axe is √AK—	অক্ষজন শব্দটিতে অম্ল উৎপাদক, জীবনরক্ষক, অগ্নিজনক, বায়ুর স্রষ্টা, এবং ব্যাপ্তি অর্থে সর্ব্বস্থানে—বাতাসে, জলে, স্থলে—বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত যাহার সত্তা উপলব্ধি করা যায়, এইরূপ বুঝায়। আধুনিক রসায়নশাস্ত্র অনুসারে এই নাম (অর্থাৎ 'অক্ষজন') ঐ পদার্থের সমুদয় গুণেরই জ্ঞাপক, সুতরাং 'অক্ষজন' শব্দ ইংরাজি oxygen পদের সম্যক প্রতিশব্দ হইবারই যোগ্য।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
	to cut. Axe—Sanskrit 'অক্ষ'। The taste of acid is sharp. অম্লের স্বাদ তীক্ষ্ণ (Sans. "অম্লঃ—শতবেধী, বেধকঃ, ভীমঃ, ভেদনঃ, ভেদী, সহস্রবেধী" ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)।	
	২। অক্ষঃ—"আত্মা" ইতি হেমচন্দ্রঃ। আত্মা—"হুতাশনো, জীবো, বায়ুঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।	
	অক্ষং—আত্মানং (হুতাশনং অগ্নিং ইত্যর্থঃ) জনয়তি যঃ সঃ অক্ষজনঃ—অগ্নিজনকঃ (অগ্নি উৎপাদক ও বর্দ্ধক) (supporter or generator of fire)	
	৩। অক্ষং আত্মানং (জীবনং ইত্যর্থঃ) জনয়তি রক্ষতি যঃ সঃ অক্ষজনঃ—জীবনরক্ষকঃ (জীবন রক্ষক) (supporter of life.)	
	৪। অক্ষং আত্মানং (বায়ুং ইত্যর্থঃ) জনয়তি যঃ সঃ অক্ষজনঃ—বায়ুজনকঃ (বায়ুকারক) (generator of air)	
	৫। অক্ষেণ ব্যাপ্ত্যা ("অক্ষু-ব্যাপ্তৌ," ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ) জায়তে প্রকাশতে ইতি অক্ষজনঃ	

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
	অক্ষ+জন+অচ That which is known by its pervasion ব্যাপ্তির দ্বারা প্রকাশমান।	
(৩) ইং—Nitrogen (N) ফ—Azote (N) জা—Stickstoff (N) সং—(ভারতীয়) **নেত্রজন** (N)	**নেত্রজন** (N) নেত্রজন = নেত্রং বৃক্ষমূলং ("নেত্রং মূলে দ্রুমস্যচ" ইতি মেদিনী) জনয়তি বর্দ্ধয়তি যঃ সঃ নেত্রজনঃ —নেত্র+ জন+নিচ্-অচ্। বৃক্ষবর্দ্ধকঃ। বৃক্ষমূলম—বৃক্ষস্য আশ্রম স্থিতিকারণম = পৃথিবী, পৃথিবী = ভূমি, ক্ষারভূমি, মৃত্তিকা—ক্ষার-মৃত্তিকা, রসা—ক্ষার রসা। বৃক্ষমূলম্—বৃক্ষস্য আশ্রম স্থিতি-কারণম অস্য বলং মজ্জা, সারঃ স্থিরাংসঃ। [সারঃ —বজ্রক্ষারম (Nitre) ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ] বৃক্ষমূলম্—বৃক্ষস্য মূলম্ মূলকম ক্ষারং—বৃক্ষক্ষারম (alkaline salt) [মূলম = মূলকম্ (মূল+ স্বার্থে ক), মূলকম = ক্ষারং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ]	Nitrogen — বায়ু বৃক্ষবর্দ্ধক, ইহা সকলেই অবগত আছেন। 'নেত্রজন', অর্থে বৃক্ষবর্দ্ধক বুঝায়, এবং সেই কারণ ইহা Nitrogen শব্দের সম্যক প্রতিশব্দ হইবারই যোগ্য। এ'দিকে 'নেত্রজন' ইংরাজী Nitrogen-এর অনুসারে ক্ষারের জনকও বুঝায়। ইংরাজী 'Nitrogen' আরবী 'Natrum' হইতে উদ্ভূত, এই Natrum হইতে Nitrogen পদটি হইয়াছে। আরবী 'Natrum' সংস্কৃত 'নেত্রং' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ইহা প্রমাণের সহিত মৎকৃত "Nitre Industry in Ancient India"নামক প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে—(Modern Review 1910. July সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)।
(৪) ইং—Carbon. (C) ফ—Carbone. (C) জা—Kohlenstoff(C)	**কারবম্** (C) "কারবঃ কাকঃ"—ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, 'ন' উপামায়াং, ("ন স্থাননিষেধো-পময়ো" ইতি মেদিনী)—কারবঃ কাক ইব	ইংরাজী 'Carbon' ল্যাটিন 'Carbonem' হইতে উদ্ভূত। Carbonem শব্দের অর্থ Coal বা কয়লা—(a solid black substance) অর্থাৎ কঠিন

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
সং—(ভারতীয়) **কারবন** (C)	কৃষ্ণবর্ণঃ ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। কারবন—কারবেন সদৃশঃ [কাকঃ—কৃষ্ণ, ইতি জটাধরঃ]	কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। সংস্কৃত সিদ্ধপদ "কারবন" অর্থের সহিত ইহার বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। কারবন শব্দের অর্থে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। কয়লাও কারবন। কয়লা যে কাকের ন্যায় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং ইং Carbon-এর প্রতিশব্দ সংস্কৃত 'কারবন' অনায়াসে গ্রাহ্য হইতে পারে।
(. ৫) ইং—Fluorine (F) ফ—Fluor (F) জা—Fluor (F) সং—(ভারতীয়) **প্লোরীণ** (F)	**প্লোরীণ** (F) প্লবা গত্যা স্পন্দনেন ইতি যাবৎ রীণয়তি ক্ষারয়তি যঃ সঃ প্লোরীণ প্লো+রীণ+কিপ্ [প্লু+বিচ (ভাবে)=প্লো—গতিঃ, স্পন্দনং ইত্যর্থঃ। রীণ ক্ষরণম্ ("রীণম্ ক্ষরিতম্ ইত্যমরঃ —রী+ক্ত = রীণ) রীণং করোতীতি রীণয়তি নামধাতুঃ —"রী-ক্ষরণে" ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ] প্লোরীণ অর্থে কোন পদার্থ যাহার সংযোগে ধাতু স্পন্দনের দ্বারা ক্ষরিত হয়, এইরূপ বুঝায়। (ত্রাস্নুমিস্ মন ক্বনিপ্ বনিপ্ বিচ্ কিপঃ। ধোরেতে স্যুঃ কেভাবে চ। ইতি মুগ্ধবোধং ১০৩২। মাবর্ধাতু কার্ষ ধাতু-কয়ো"—৭।৩।৮৪ পাণিনি]	Fluor-spar একপ্রকার flux অর্থাৎ এক প্রকার খনিজ পদার্থ যাহাদ্বারা লৌহ ইত্যাদি ধাতুকে অগ্নির সাহায্যে শীঘ্র গলান যায়। এই পদার্থের উপাদান Fluorine বাষ্প(gas), এই কারণ ঐ বাষ্পটির নাম Fluorine হইয়াছে। ইহার মূলধাতু √Plu এবং সংস্কৃত 'প্লু' উভয়েরই অর্থ এক, অর্থাৎ 'গতি' বুঝায়। স্বনামধন্য জার্ম্মাণ রাসায়নিক লিবিগ্ (Liebig)—flux-এর প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা "স্পন্দনের দ্বারা ক্ষরণ" এইরূপ সিদ্ধ করেন।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং=ইংরাজী, ফ=ফরাসী, জা=জার্ম্মাণ, সং=সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
(৬) ইং—Chlorine (Cl) ফ—Chlore (Cl) জা—Chlor (Cl) সং—(ভারতীয়) **কুল্‌হরিণ*** (Cl)	**কুলহরিণ** (Cl) কুলহরিণ—কুলম স্বরূপং ইত্যর্থঃ হরিণং পাণ্ডুবর্ণং যস্য ইতি কুল্‌হরিণঃ। কুল+হরিণ=কুল্‌হরিণ—পৃষোদরাদিত্বাৎ অ লোপঃ। কুলং তনৌ ইতি মেদিনী "হরিণঃ পাণ্ডুঃ"ইত্যমরঃ। কুলহরিণ অর্থে এক পদার্থ যাহার স্বরূপ পাণ্ডুবর্ণ বুঝায় (a substance having a pale green body or appearance)	ইংরাজী 'Chlorine' *Greek* 'Chloros' হইতে উদ্ভূত। Greek 'Chloros' শব্দের অর্থ পাণ্ডুবর্ণ (pale-green)। Chlorine ও কুলহরিণ একই রকম শুনায় এবং ইহাদের অর্থও এক। অতএব 'কুল-হরিণ' পদটি ইংরাজী Chlorine শব্দের যোগ্য প্রতিশব্দ হইতে পারে।
(৭) ইং—Bromine (Br) ফ—Brome (Br) জা—Brom (Br) সং—(ভারতীয়) **বরমীন** (Br)	**বরমীন** (Br) (বরঃ=গন্ধকঃ পূতিগন্ধঃ, অতিগন্ধঃ ইতি শব্দরত্নাবলী) —বরেণ পূতিগন্ধেন মীয়তে জ্ঞায়তে যৎ তৎ বরমং—বরমম্ এব বরমীণ স্বার্থে ঈন্ বর+মা +ক—ঈন্ (স্বার্থে) বরমীন—এক পদার্থ যাহার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র (a substance identified by its strong smell)	ইংরাজী Bromine গ্রীক 'Bromos' হইতে উদ্ভূত। 'Bromos' অর্থে Stench বা পূতিগন্ধ বুঝায়। এই কারণ ইংরাজী Bromine শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যাকরণ ও কোষমতে "বরমীন" ধার্য্য হইয়াছে। Bromine ও বরমীন উভয় শব্দের অর্থ এক।
(৮) ইং—Iodine (I) ফ—Iode (I)	**এতিন** (I) এতং কর্ব্বুরবর্ণং অস্য অস্তি ইতি অস্ত্যর্থে ইন্—'এতিন'	ইংরাজী Iodine গ্রীক *iodes* (contracted form of *ioeides*) হইতে উদ্ভূত। গ্রীক *ion* অর্থে 'violet' এবং *eidos*

* অনয়োঃ পরয়োরিজন্তাঙ্গস্য গুণঃ স্যাৎ। "আর্দ্ধধাতুকং শেষ" ৩।৪।১১৪ পাণিনি। তিঙশিদ্ভ্যোঽন্যঃ ধাত্বধিকারোক্ত প্রত্যয়ঃ এতৎ সংজ্ঞঃ স্যাৎ।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
জা—Iod (I) সং—(ভারতীয়) **এতিন** (I)	("এতঃ কর্ব্বুরঃ" ইতি মেদিনী) —আ + ই + ক্ত—-ইন্ = এতিন্ ইহার অর্থ—একটি পদার্থ যাহার বর্ণ রক্তনীল (violet)। কর্ব্বুরঃ —ফলসংজ্ঞা—-সাকুরুণ্ডঃ, অস্য গুণং—বস্ত্ররঞ্জনকত্বং ইতি রাজ-নির্ঘণ্টঃ—সাকুরুণ্ডঃ—গুজরাটী সকরুণ্ডর।	অর্থে 'appearance' বা রূপ বুঝায়। ইংরাজী Iodine অর্থে violet বর্ণ বুঝায়। কারণ Iodine violet-বর্ণ পদার্থ বিশেষ। 'এতিন' শব্দটির অর্থ কর্ব্বুরবর্ণ। কর্ব্বুরবর্ণ অর্থে বিচিত্রবর্ণ বুঝায়। দুই বা ততোধিক বর্ণ একত্রিত করিলে বিচিত্র বর্ণ জন্মে। ইংরাজী 'ভায়লেট' বর্ণ সংস্কৃত 'রক্তনীল' অর্থাৎ রক্ত (Red) এবং নীল (Blue) উভয় মিশ্রিত করিয়া যে বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহাকে বলে। সুতরাং রক্তনীল একটি বিচিত্র বর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে একরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহাকে কর্ব্বুরফল বলে। ইহা গুজরাট দেশে অধিক পরিমাণে জন্মায়। ইহার সংস্কৃত কর্ব্বুর এবং গুজরাটী নাম 'সকুরুণ্ডর'। ইহাতে বস্ত্ররঞ্জন করা হয়, এবং যে বর্ণ প্রস্তুত হয় তাহা রক্তনীল বা 'ভায়লেট' বর্ণ। অতএব Iodine-এর প্রতিশব্দ সংস্কৃতে এতিন সিদ্ধ হইয়াছে।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
(৯) ইং—Phosphorus (P) ফ—Phosphore (P) জা—Phosphor (P) সং—(ভারতীয়) **ভাস্ফরস—** (P)	**ভাস্ফরস্** (P) ভাসা দীপ্ত্যা স্ফুরতি প্রকাশতে ইতি ভাস্+স্ফর+অস্ (ঔণাদিক) (ভাশ্ছবিদ্যুতিদীপ্তয়ঃ; ইত্যমরঃ) অর্থাৎ যে বস্তুর অঙ্গ হইতে দীপ্তি প্রকাশ পায়। (meaning a substance known by the *emission of light* from its body). ভাস্—প্রভা। অস্য শব্দস্য—প্রথমান্তরূপং ভাঃ ইত্যমরঃ।	ইংরাজী শব্দ Phosphorus গ্রীক *Phōs*—light (*Phos*—light) ধাতু—*Pha*—to shine [√BHA — to shine, সংস্কৃত "ভা—দীপ্তৌ" ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ] এবং *Phoros* (bringing from) 'Pherein' —to bring. [√BHAR—to bear, to carry, সংস্কৃত "স্ফর, চলে স্ফূর্ত্তৌ" ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ] হইতে উদ্ভূত। ইংরাজী Phosphorus এবং সংস্কৃত 'ভাস্ফরস' একইরূপ শুনায়, এবং দুইটি শব্দের অর্থও এক, সুতরাং 'ভাস্ফরস' Phosphorus-এর প্রতিশব্দ রচিত হইল।
(১০) ইং—Antimony (Sb) ফ—Antimone (Sb) জা—Antimon (Sb) সং—(ভারতীয়) **অন্তমণীকম**(Sb)	**অন্তমণীকম** (Sb) মণীকস্য অঞ্জনস্য অন্তঃ ("অন্তঃ অবয়বঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ) অবয়বঃ (অঙ্গং উপায়ঃ ইতি যাবৎ) ইতি অন্তমণীকম্, রাজদন্তাদিবৎ পূর্ব্বনিপাতঃ—অর্থাৎ মণীকের অঞ্জনের (মণীকম্—অঞ্জনম্ ইত্যুণাদিকোষঃ) অঙ্গ বা উপায় (constituent)। মণীকর= Black Sulphide of Antimony.	ইংরাজ কোষকারগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ইং Antimony শব্দটির উৎপত্তি অজ্ঞাত। 'মণীকম্' কথাটি আমাদের সংস্কৃত কোষেই আছে, ইহার অর্থে "অঞ্জন" (Black Sulphide of Antimony) বুঝায়। ইং Antimony নামক উপধাতু এই অঞ্জনের একটি বিশেষ উপাদান, সেই কারণ ইহার প্রতিশব্দ 'অন্তমণীকম' রচিত হইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন--ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা· সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
(১১) ইং— Arsenic (As) ফ—Arsenic (As) জা— Arsen (As) সং—(ভারতীয়) আর্জ্জনিক(As)	**আর্জ্জনিক** (As) (ঋজ + অনট্ = অর্জনং) অর্জনং বলং অস্য অস্তীতি আর্জনিকং (অর্জন + ষ্ণিক), "ঋজ উর্জ্জনে উর্জবলে" ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ —অর্থাৎ "যে বস্তুর বল আছে" (meaning a substance having powerful properties)	ইংরাজী 'Arsenic' শব্দটি গ্রীক arsen হইতে উদ্ভূত। 'arsen' শব্দের অর্থে "পুরুষভাবগত বল" বুঝায়। এ্যাল্‌কেমিষ্টগণ (alchemist) ধাতুদের বলানুসারে স্ত্রীপুরুষ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। সে হিসাবে বিষাক্ত দ্রব্যের বল অধিক। এই ধারণায় এই বস্তুটির নাম Arsenic দিয়াছিলেন, কারণ ইহা বিষ। সংস্কৃত আর্জনিক শব্দের অর্থে এইরূপ বলই বুঝায়, সেই কারণ Arsenic -এর প্রতিশব্দ আর্জনিক রচিত হইল।
(১২) ইং— Bismuth (Bi) ফ—Bismuth (Bi) জা—Wismuth (Bi) সং—(ভারতীয়) বিষমদ (Bi)	**বিষমদ** (Bi) বিষমদ—("বিষং-রসায়নম্" ইতি জটাধরঃ "মদঃকল্যাণবস্তু" ইতি ধরণিঃ)"। বিষঞ্চাসৌ মদশ্চেতি বিষমদং—কল্যাণকর রসায়নমিত্যর্থঃ—অর্থাৎ "কল্যাণকর রসায়ন"। (meaning a substance having *good medicinal properties*)	Bismuth ঔষধে ব্যবহৃত হয়। উহার উৎপত্তির বিষয় বৈজ্ঞানিকগণ এবং কোষকারগণ অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একটি কল্যাণকর ঔষধ বা রসায়ন বলিয়া ইহার প্রতিশব্দ "বিষমদ" রচিত হইল।
(১৩) ইং—Sulphur (S) ফ—Soufre (S)	**শুল্‌বারিঃ** (S) "শুল্‌বারিঃ গন্ধকঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।	ইংরাজী Sulphur শব্দটি সংস্কৃত 'শুল্‌বারিঃ' হইতে উদ্ভূত, ইহাই ইংরাজী কোষকারগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'শুল্ব'

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
জা—Schwefel (S) সং—(ভারতীয়) **শুল্বারি** (S)		শব্দের অর্থে 'তাম্র' বুঝায়, তাহার অরি অর্থাৎ 'শত্রু', কারণ গন্ধক তাম্রকে স্বতঃই বিকৃত করে।
(১৪) ইং—Silicon (Si) ফ—Silicium (Si) জা—Silicium (Si) সং—(ভারতীয়) **শিলাকণ** (Si)	**শিলাকণ** (Si) শিলাকণঃ শিলা পাষাণঃ তস্যা কণঃ সূক্ষ্মাংশঃ উপাদানং ইতি যাবৎ ("শিলা পাষাণঃ" ইত্যমরঃ, কণঃ "লবলেশ কণাণবঃ" ইত্যমরঃ), অর্থাৎ শিলার উপাদান বিশেষ। (meaning the main constituent of পাষাণঃ stone)	ইংরাজী Silicon শব্দটি ল্যাটিন Silex (Stem—Silic) হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ stone, flint অর্থাৎ পাষাণ। সুতরাং "শিলাকণ" ও Silicon উচ্চারণে ও অর্থে এক।
(১৫) ইং—Selenium (Se) ফ—Sélénium (Se) জা—Selen (Se) সং—(ভারতীয়) **সলিলীনম** (Se)	**সলিলীনম** (Se) সলিলে (সমুদ্র সলিলে) ভবম্ ইতি সলিলীনম্ চন্দ্র ইব ইত্যর্থঃ সলিল+ঈন্ (সাদৃশ্যে) ("চন্দ্রঃ সিন্ধুজন্মা" ইতি জটাধরঃ) অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল—meaning a substance resembling *moon* in appearance.	ইংরাজী Selenium গ্রীক Selene (moon—চন্দ্র) হইতে উদ্ভূত। Selenium-এর উজ্জ্বল ও মনোহর রূপ দেখিয়া বার্জিলিয়াস্ (Berzelius) ইহার ঐ নামকরণ করেন। সংস্কৃত সলিলীনম-এর অর্থও চন্দ্র সদৃশ। অতএব উভয় শব্দের অর্থ এক।
(১৬) ইং—Tellurium (Te) ফ—Tellure (Te) জা—Tellur (Te)	**তলরম্** (Te) তলে (পৃথিব্যাং) রমতে বিরাজতে—ইতি তলরম (তল+রম +কিপ্), তলম মহীতলম্ ইতি	ইংরাজীর Tellurium ল্যাটিন Tellus (Telluris—earth, পৃথিবী) হইতে উদ্ভূত। বৈজ্ঞানিক ক্ল্যাপরথ (Klaproth) ইহার

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং=ইংরাজী, ফ=ফরাসী, জা=জার্ম্মাণ, সং=সংস্কৃত

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ	সংস্কৃত অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
সং—(ভারতীয়) **তলরম্** (Te)	মেদিনী) অর্থাৎ যে বস্তু পৃথ্বি হইতে উদ্ভূত। (meaning a substance which is found in the earth)	এই নাম দেন, কারণ ইহাতে মৃত্তিকাযুক্ত খনিজ পদার্থ (earthy ore) হইতে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব ইংরাজী Tellurium ও সংস্কৃত 'তলরম' শব্দের অর্থ এক, সেই কারণ ইহার প্রতিশব্দ 'তলরম' রচিত হইল।
(১৭) ইং—Boron (B) ফ—Bore (B) জা—Bor (B) সং—(ভারতীয়) **বুরণ** (টঙ্কণক) (B)	**বুরণ (টঙ্কণক)** (B) টঙ্কণকঃ টঙ্কয়তি দ্রাবয়তি ইতি টঙ্কণঃ তং জনয়তীতি কঃ প্রত্যয়ঃ ; সোহাগার জনক অর্থাৎ যাহা হইতে সোহাগার (Borax-এর) উৎপত্তি হয়। "টঙ্কণঃ ক্ষার বিশেষঃ" (সোহাগা ইতি ভাষা)—ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ; টঙ্ক + অন্ = টঙ্কণঃ, টঙ্কণঃ + ক — টঙ্কণকঃ।	ইংরাজী Boron পারসী ও আরবী Būrāq (Arab) Burah (Persian) হইতে উদ্ভূত। পারসীতে সোহাগাকে বুরণ বলে। অনেক পারসী শব্দ আমাদের ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ব্যবহার অনুযায়ী এ শব্দটিও আমাদের পরিভাষায় রাখিলে বিশেষ দোষ হইবে না। তাহা ছাড়া Boron-এর প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃত পদ টঙ্কণকও রচিত হইল।

(ক্রমশঃ)

তারা-পরিচয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(৩য় চিত্র)

Ursa Minor (শিশুমার) উত্তর আকাশে ধরাপৃষ্ঠের সহিত প্রায় সমান্তরভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। Cepheus মধ্যরেখায় আসিয়াছে। Draco আরও পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। Ursa Major অস্ত গিয়াছে। Bootes তারাপুঞ্জও প্রায় সম্পূর্ণ অস্তমিত। Coronaও শীঘ্র অস্ত যাইবে। Corona-র কিছু উপরে Hercules এবং তাহারও পূর্ব্বে Lyra। ঠিক পশ্চিমে Ophiuchus অস্ত যাইতেছে। তাহার পূর্ব্বে Aquila। দক্ষিণ পশ্চিমাকাশে Scorpio-র পুচ্ছাংশ এখনও দেখা যাইতেছে; উহা এখনই ডুবিবে। Scorpio-র পূর্ব্বে Sagittarius এবং তাহারও পূর্ব্বে Aquarius। Aquarius এখন মধ্যরেখায় অবস্থিত। উহার দক্ষিণে মধ্যরেখায় Piscis Australis ও Grus, তাহারও দক্ষিণে Toucan ও Pavonis দেখা যাইতেছে। Sculptorus ও Phœnix যথাক্রমে Piscis Australis ও Grus-এর পূর্ব্বে রহিয়াছে। Aquarius-এর পূর্ব্বে পূর্ব্বদক্ষিণাকাশে Cetus দেখা যাইতেছে; O Cetus তারার অপর নাম The Wonderful; ইহার পরিবর্ত্তনশীলতা বিস্ময়কর; ১·৭ ঔজ্জ্বল্যমান হইতে কমিতে কমিতে ইহা শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং পরে ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে হইতে প্রায় ৩৩২ দিনে পুনরায় পূর্ব্বের উজ্জ্বলতায় ফিরিয়া আসে। Cetus-এর উপরে Piscis। Piscis-এর উত্তরে Square of Pegasus। Aries ও Andromeda আরও একটু উত্তরপূর্ব্বে। Andromeda-র উত্তরপূর্ব্বকোণে Perseus; Perseus-এর নীচে Auriga তারাপুঞ্জ উঠিতেছে। α Auriga (ব্রহ্মহৃদয়) এখনই ক্ষিতিজের উপর উঠিয়াছে। Aries-এর ঠিক পূর্ব্বে Taurus অর্দ্ধোদিত হইয়াছে। α Taurus (রোহিণী) তারা এখনই ঠিক ক্ষিতিজের উপরে উদিত হইয়াছে। উহার অল্প পশ্চিমে η Taurus; η Taurus তারার অপর নাম Pleiades; ইহা কৃত্তিকা নক্ষত্রের যোগতারা; মুক্ত চক্ষে η Taurus তারার চারিদিকে ছোট ছোট আরও ছয়টি তারা দেখা যায়। η তারা সহ এই তারা কয়টিকে লোকে সাধারণতঃ 'সাত ভেয়ে' বলে। ছায়াপথ পূর্ব্বোত্তর ক্ষিতিজ হইতে দক্ষিণপশ্চিম ক্ষিতিজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

৩য় চিত্র দেখিবার সময়

মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময়		মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময়	
		ঘ	মি			ঘ	মি
সেপ্টেম্বর	৬	১১	০	অক্টোবর	১	৯	২০
	১১	১০	৪০		৬	৯	০
	১৬	১০	২০		১১	৮	৪০
	২১	১০	০		১৬	৮	২০
	২৬	৯	৪০		২১	৮	০
					২৬	৭	৪০
					৩১	৭	২০
				নবেম্বর	৬	৭	০
					১১	৬	৪০

(৪র্থ চিত্র)

Ursa Minor পশ্চিমোত্তর দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ≺ Ursa Minor-এর অল্প নীচে উত্তর ধ্রুববিন্দু P। এই বিন্দুর চতুর্দ্দিকে আকাশমণ্ডলের সমস্ত তারা পরিভ্রমণ করিতেছে। এই পরিভ্রমণ অবশ্য আপেক্ষিক। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে মনে হয় যেন তারাসমূহ সত্য সত্যই এই ধ্রুববিন্দুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। তারাসমূহের এই পরিক্রমণ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘটে, অর্থাৎ ধ্রুব হইতে উপরের তারাসমূহের গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, এবং তাহার নীচের তারাসমূহের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। ধ্রুবের প্রায় ৩০° উত্তরে Cassiopeia; ইহার আকৃতি এখন অনেকটা ইংরাজী অক্ষর W-এর মত। ইহার উপরে Andromeda। ≺ Andromeda এখন মধ্যরেখায়। Andromeda-র পশ্চিমদক্ষিণে Pegasus এবং পূর্ব্বদক্ষিণে Aries; আবার পূর্ব্বোত্তর দিকে Perseus। β Perseus-এর অপর নাম Algol, ইহা পরিবর্ত্তনশীল; ২দিন্ ২১ ঘণ্টা মাত্র ইহার পরিবর্ত্তনকাল। Perseus-এর পূর্ব্বোত্তরে Auriga তারাপুঞ্জ; ইহার প্রধান তারা ≺ Auriga-র অপর নাম Capella; সংস্কৃতে ইহা ব্রহ্মহৃদয় বলিয়া পরিচিত। Auriga-র পূর্ব্বদক্ষিণে Gemini (কন্যা) তারাপুঞ্জের কতকাংশ উদিত হইয়াছে। Gemini ও Aries (মেষ)-এর মধ্যে Taurus (বৃষ) তারাপুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার ≺, β ও η তারার সংস্কৃত নাম যথাক্রমে রোহিণী, অগ্নি ও কৃত্তিকা। Gemini-র অল্প দক্ষিণে ঠিক পূর্ব্বাকাশে Orion তারাপুঞ্জ প্রায় সম্পূর্ণ উদিত হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত নাম মৃগ। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এ'সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত আখ্যায়িকা আছে। নিম্নে তারাপুঞ্জ-বিবরণে ইহা বর্ণিত হইল। λ Orion তারা এই মৃগের শির বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, ইহাই সংস্কৃত মৃগশিরা তারা। ≺ Orion সংস্কৃত আর্দ্রা

নক্ষত্রের যোগতারা। পূর্ব্বদক্ষিণ আকাশে ও Aries তারাপুঞ্জের দক্ষিণে Cetus তারাপুঞ্জ। Cetus-এর নীচে Eridanus ; Eridanus-এর প্রধান তারা ৫ দক্ষিণ ক্ষিতিজের অতি নিকটে শোভা পাইতেছে; ইহা অত্যুজ্জ্বল তারকাগণের অন্যতম। Cetus-এর দক্ষিণে ও Eridanus-এর পশ্চিমে Sculptorus, Phœnix ও Toucan। দক্ষিণপশ্চিমাকাশে খমধ্য হইতে যথাক্রমে Aquarius, Capricornus ও Sagittarius ; Sagittarius এখন অস্তোন্মুখ। Aquarius-এর দক্ষিণে Piscis Australis ও Grus দেখা যাইতেছে। পশ্চিমাকাশে Aquila ; তাহার উত্তরে Cygnus ও Lyra। Cygnus-এর উত্তরে ও Cassiopeia-র পশ্চিমোত্তর কোণে Cepheus। Cepheus-এর নীচে Draco অস্ত যাইতেছে। ছায়াপথ খমধ্যের উত্তর দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ক্ষিতিজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যাইতেছে।

৪র্থ চিত্র দেখিবার সময়

মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময়		মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময়	
		ঘ	মি			ঘ	মি
অক্টোবর	১৬	১০	২০	নবেম্বর	৬	৯	০
	২১	১০	০		১১	৮	৪০
	২৬	৯	৪০		১৬	৮	২০
	৩১	৯	২০		২১	৮	০
					২৬	৭	৪০

মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময়	
		ঘ	মি
ডিসেম্বর	১	৭	২০
	৬	৭	০
	১১	৬	৪০
	১৬	৬	২০
	২১	৬	০

(৫ম চিত্র)

উত্তরে Ursa Minor ধ্রুববিন্দু হইতে নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। উহার উপরে পশ্চিমোত্তর আকাশে Cepheus। উহার অল্প পূর্ব্বদক্ষিণে Cassiopeia ; ইহা এখন মধ্যরেখার পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। Cassiopeia-র পূর্ব্বদক্ষিণে—যথাক্রমে Perseus, Auriga, Gemini ও Canis Minor তারাপুঞ্জ। পূর্ব্বাকাশে খমধ্য হইতে প্রায় ৩০° পূর্ব্বে Taurus (বৃষ), তাহার নীচে পূর্ব্বদক্ষিণ আকাশে Orion ও Canis Major তারাপুঞ্জদ্বয়।

α Canis Major আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। ইহার সংস্কৃত নাম লুব্ধক। Canis Major-এর পশ্চিমে Lupus ও তৎপশ্চিমে Eridanus। Aries ও Cetus এখন মধ্য-রেখায়। α Aries ঠিক খমধ্যে ও O Cetus প্রায় মধ্যরেখায়। O Cetus-এর অপর নাম Mira বা The Wonderful। Andromeda ও Pisces তারাপুঞ্জদ্বয় মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাকাশে সরিয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশে খমধ্যের প্রায় ৩০° দূরে Square of Pegasus সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমাকাশে খমধ্য ও ক্ষিতিজের প্রায় মধ্যস্থলে Aquarius; ও তন্নিম্নে Capricornus দেখা যাইতেছে; Capricornus অস্তোন্মুখ। Aquarius-এর দক্ষিণে অস্তোন্মুখ Piscis Australis ও Grus। Cetus-এর দক্ষিণে Sculptorus ও Grus। পূর্ব্ব-ক্ষিতিজ হইতে একটু উত্তরে Aquila অস্ত যাইতেছে; উহার প্রধান তারা α Aquila (শ্রবণা) এখনও দেখা যাইতেছে, দুই এক মিনিটের মধ্যেই উহা অদৃশ্য হইবে। ছায়াপথ পশ্চিমোত্তর ক্ষিতিজ হইতে পূর্ব্ব-ক্ষিতিজের অল্প দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশের অত্যুজ্জ্বল তারকাগণের প্রায় সমস্তই ইহার মধ্যে বা পার্শ্বে অবস্থিত।

৫ম চিত্র দেখিবার সময়

মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময় ঘ	মি	মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময় ঘ	মি
নবেম্বর	১৬	১০	২০	ডিসেম্বর	১	৯	২০
	২১	১০	০		৬	৯	০
	২৬	৯	৪০		১১	৮	৪০
					১৬	৮	২০
					২১	৮	০
					২৬	৭	৪০
					৩১	৭	২০

মাস	তারিখ	সান্ধ্যসময় ঘ	মি
জানুয়ারী	৫	৭	০
	১০	৬	৪০

তারাপুঞ্জের বিবরণ

শরৎ সংখ্যা (ভাদ্র-আশ্বিন) প্রকৃতিতে ১ম ও ২য় তারা-চিত্রের অন্তর্গত তারাপুঞ্জসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই তারাপুঞ্জসমূহের মধ্যে অনেকগুলি ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তারা-চিত্রে পাওয়া যাইবে না, কারণ শেষোক্ত চিত্রের তারা দর্শন সময়ে ঐগুলি অস্তমিত থাকিবে;

এবং অন্য নূতন কয়েকটি তারাপুঞ্জ ঐ সময়ে উদিত হইয়াছে, দেখা যাইবে। এই অতিরিক্ত নূতন তারাপুঞ্জসমূহের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

Taurus (বৃষ)। ১লা জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α তারার অপর নাম Aldebaran; উহার সংস্কৃত নাম রোহিনী, ইহা রোহিনী নক্ষত্রের যোগতারা। ইহার ঔজ্জ্বল্যমান ১; ইহার আলোকবিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে, ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্, ক্যালসিয়াম, বিসমাথ, টেলুরিয়াম, অ্যান্টিমণি, লৌহ ও পারদ রহিয়াছে। ζ ও β Taurus তারাদ্বয়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ Crab Nebula (1M.)।

η Taurus তারার চতুঃপার্শ্বস্থ তারাগুচ্ছ Pleiades নামে অভিহিত হয়; ইহা সংস্কৃতে কৃত্তিকা নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন, η তারা তারাজগতের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে, এবং জগতের সমুদয় তারামণ্ডলী ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। β তারার সংস্কৃত নাম অগ্নি। γ Taurus (Hydes) আর একটি তারাগুচ্ছ। Gemini (মিথুন) ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মধ্যরেখায় আসে। α ও β তারার অপর নাম যথাক্রমে Castor ও Pollux। α তারা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা। α ও β তারা যথাক্রমে দ্বিতারক ও ত্রিতারক। η ও ζ তারাদ্বয় পরিবর্ত্তনশীল। 35M একটি তারাগুচ্ছ।

Auriga। ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় উপস্থিত হয়। α তারার অপর নাম Capella; ইহার সংস্কৃত নাম ব্রহ্মহৃদয়। ϵ তারা পরিবর্ত্তনশীল। M36, M37, M38 তিনটি নীহারিকা (Nebula)।

Orion (মৃগ)। ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। ইহার প্রধান প্রধান তারাগুলি লইয়া একটি মানুষের মূর্ত্তি কল্পনা করা হয়; ইহা সাধারণের নিকট কালপুরুষ নামে পরিচিত। প্রাচীন কালে ইহা প্রজাপতি নামেও পরিচিত ছিল। ইহার কটিবন্ধে তিনটি তারা আছে, সকলের উপরেরটির অপর নাম Muitaka। ইহা দ্বিতারক ও পরিবর্ত্তনশীল। α তারা (Belelgeuse) পরিবর্ত্তনশীল; ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা উত্তর দিকের তারাগুলির মধ্যে উজ্জ্বলতম ছিল। এই তারার উপাদান মধ্যে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বিসমাথ ও লৌহের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে; ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন নাই। β তারাও পরিবর্ত্তনশীল। Orion-এর শীর্ষদেশে λ তারা; ইহা মৃগশিরা নক্ষত্রের যোগতারা, ইহা ত্রিতারক। ζ দ্বিতারক। M42 বা N কটিবন্ধের নীচের নীহারিকা। অন্ধকার রাত্রিতে মুক্ত চক্ষুতেও ইহা দেখা যায়। আলোকবিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে, ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস্ প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রহিয়াছে। শক্তিশালী যন্ত্রে ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিতারক, ত্রিতারক ও বহুতারক তারার সমাবেশ দেখা যায়।

Canis Major। ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৮টার সময় ইহা মধ্যরেখায় উপস্থিত

হয়। α তারার অপর নাম Dog-Star বা Sirius। ঋগ্বেদেও ইহা শ্ব বা কুক্কুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা লুব্ধক বা মৃগব্যাধ নামেও পরিচিত। আকাশের মধ্যে ইহা উজ্জ্বলতম তারা। আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা ইহার ঘনায়তন (volume) প্রায় ২৭০০ গুণ বেশী; আকাশের মধ্যদিয়া ইহা ঘণ্টায় প্রায় ৭২০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

Canis Minor। ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রায় ৯টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। ইহারও প্রধান তারা α; ঋগ্বেদে শ্ব বা কুক্কুর নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম Procyon। ইহাও অতিশয় উজ্জ্বল তারা।

Eridanus। ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় ইহা মধ্যরেখায় আসে। α তারার অপর নাম Achernar ও β তারার অপর নাম Cursa।

বৈদিক প্রসঙ্গ

স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, এককালে বিষুববিন্দু মিথুনরাশিতে (Gemini), β Gemini তারার ৫° পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ইহা প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৬৭ অব্দের কথা। তখন আকাশমণ্ডল ছায়াপথ দ্বারা দেবযান ও পিতৃযান—এই প্রধান দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, ও বৃশ্চিক—এই কয় রাশি তখনকার দেবযান; এবং ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ ও বৃষ—এই কয় রাশি পিতৃযানের অন্তর্গত ছিল। বৈদিক কালে বৎসরারম্ভ ধরা হইত সূর্য্যের বিষুববিন্দু অতিক্রম করিয়া দেবযানে প্রবেশের সময় হইতে। ইহা ছিল তখনকার বর্ষারম্ভের রীতি। দেবযানই স্বর্গ, তথায় প্রবেশ করিতে হইলে স্বর্গনদী পার হইতে হইত; উহার দুই তীরে দুইটি কুক্কুর প্রহরীস্বরূপ থাকিত। ছায়াপথই সেই স্বর্গনদী এবং উহার উভয় তীরবর্ত্তী α Canis Major (Sirius) ও α Canis Minor (Procyon)—দুইটি তারা সেই দুই কুক্কুর। বেদে এই নদী সরস্বতী, ক্ষরিত মধু, ক্ষরিত ঘৃত, স্বর্গের স্বর্ণপ্রাকার, রজধাতুময় অগ্নি, অদিতির রজঃ, প্রজাপতির রেতঃ প্রভৃতি নানাভাবে, নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে। ছায়াপথকে রজঃ ও রেতঃ স্বরূপ বর্ণনা করার বোধ হয় ইহাই উদ্দেশ্য যে, উহা হইতেই দেব ও পিতৃনামক তারাগণের উৎপত্তি; অর্থাৎ তারাজগতের সমস্ত তারার মূল ঐ ছায়াপথ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বিশ্বসৃষ্টির আধুনিক মতের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে কি না। α Orion তারা মিথুন রাশির অন্তর্গত আর্দ্রানক্ষত্রের যোগতারা। এই তারা ছায়াপথের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই জন্য ইহা আর্দ্র বা সিক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশে সূর্য্য যখন এই নক্ষত্রে উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীকে রজস্বলারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে; ইহারই অপর নাম অম্বুবাচী।

তিলক আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত অগ্রহায়ণ ও গ্রীক্ শব্দ Orion অভিন্ন;

এবং ইহাও দেখাইয়াছেন যে, খৃঃপূর্ব্ব প্রায় ৪০০০অব্দে λ Orionতারার নিকট বিষুব ছিল, এবং তদানীন্তন রীতি অনুসারে Orion-এর প্রথম সান্ধ্য উদয় হইতে বৎসরারম্ভ সূচিত হইত। এই সময়েই Orion-কে প্রজাপতি কল্পনা করা হয়, এবং Orion-এর পশ্চিমস্থ ছয়টি রাশি পিতৃযান; ও পূর্ব্বস্থ ছয়টি রাশি দেবযান স্বরূপ গৃহীত হয়।

কালক্রমে আবার বিষুববিন্দু λ Orion হইতে α Taurus (Aldeboran) বা রোহিণীতে সরিয়া যায়। ইহা বৈদিক ঋষিগণ লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের এই আবিষ্কারটি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এবং তৎকালিক বিষুববিন্দু নির্দ্দেশ করার জন্য নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

"প্রজাপতি নিজ কন্যা দ্যোঃ বা উষার কথা চিন্তা করিলেন। নিজে মৃগরূপ ধারণ করিয়া রোহিতরূপিনী কন্যার প্রতি ধাবিত হইলেন। দেবতারা ইহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'প্রজাপতি অকৃত করিতেছেন; কে তাঁহাকে নিহত করিতে পারিবে?' * * * ভূতবান প্রজাপতিকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেন। * * * আকাশের লুব্ধক নক্ষত্র ভূতবান, রোহিণী তারা রোহিত, এবং মৃগ নক্ষত্র প্রজাপতি। যে শরদ্বারা প্রজাপতি বিদ্ধ হন, তাহা তাঁহারই কটিবন্ধের তিনটি তারা।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

ইহার মর্ম্মার্থ এই :—(১ম) প্রজাপতি ও বিষুব একার্থক। নক্ষত্রসমূহ ইতঃপূর্ব্বেই প্রজাপতির কন্যা স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিল; সুতরাং রোহিণীও প্রজাপতির কন্যা। যখন বিষুব Orion বা মৃগ হইতে রোহিণীতে সরিয়া গেল, তখন একথা বলা অসঙ্গত হয় না যে, প্রজাপতি নিজ কন্যা রোহিতের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। সাধারণের চক্ষে এই ঘটনাটি—অর্থাৎ বিষুব বিন্দুর পশ্চাচ্চলন অদ্ভুত ব্যাপার; এবং সে' কথাটি জ্ঞাপন করিবার জন্যই ইহাকে এইরূপ অদ্ভুতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; যেন এই আবিষ্কারটি লোকের স্মরণপথে চিরজাগরুক থাকে।

(২য়)—রোহিণীই উষা। বেদে উক্ত হইয়াছে, আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র। সূর্য্য যে সময়ে বিষুববৃত্তের উত্তরে থাকেন, তখন দেবতাদের দিবা, ও যখন তিনি উহার দক্ষিণে থাকেন, তখন তাঁহাদের রাত্রি; অর্থাৎ দেবযানে ও পিতৃযানে সূর্য্য থাকিলে দেবতাদের যথাক্রমে দিবা ও রাত্রি হয়। দেবযান ও পিতৃযানের সন্ধিস্থল বিষুব, এবং তথায় রোহিণী আছেন। কাজেই রোহিণীতে উপস্থিত হইলে দেবতাদের উষা হয়; তাই রোহিণীকে উষা বলা হইয়াছে।

(৩য়)—ভূতবান মৃগের কটিবন্ধস্থ শরদ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিয়াছেন। ৫ম চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধগম্য হইবে, ভূতবান বা লুব্ধক (α Canis Major) এবং Orion-এর কটি-বন্ধের মধ্যতারা θ Orion-কে একটি রেখা দ্বারা যোগ করিয়া ঐ রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে উহা রোহিণী (α Taurus) তারার অতি নিকট দিয়া যাইবে। সুতরাং ভূতবানের এই শরবেধ বর্ণনাটি কেবল তদানীন্তন বিষুববিন্দু নির্দ্দেশের ইঙ্গিত মাত্র। বর্ত্তমান কালেও আমরা

এতদনুরূপ উপায়ে অর্থাৎ সপ্তর্ষির (Ursa Major-এর) α ও β তারাদ্বয়ের সংযোজক রেখা দ্বারা বর্ত্তমান ধ্রুবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

ইহা ছাড়াও বেদে রোহিণী (α Taurus) সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তাহাতে ইহাকে বর্ষমুখ, প্রজাপতি, দিন-মাস-ও-তিথির পরিমাতা প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। রোহিণী নামই ইহার বিষুবত্বব্যঞ্জক। কারণ রোহিণী হইতেই সূর্য্য তখন বিষুবের উত্তরে বা দেবযানে আরোহণ করিতেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে রোহিনীতে বিষুব অবস্থিত ছিল, এবং ঠিক ঐ বৎসর হইতেই বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত কল্যব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কল্যব্দটি একেবারে কাল্পনিক নহে।

ঋগ্বেদে ভূতবান (লুব্ধক) আবার রুদ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন। ভূতবান কর্ত্তৃক প্রজাপতির নিধন আখ্যায়িকা হইতে পরে মহারুদ্র শিব কর্ত্তৃক দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞধ্বংস আখ্যায়িকার উৎপত্তি হইয়াছে।

বিষুব রোহিণী হইতে পশ্চিমে সরিতে সরিতে প্রায় ৮০০ বৎসর পরে কৃত্তিকায় উপস্থিত হয়। তখন কৃত্তিকাই বর্ষমুখ ছিল। ইহা খৃঃ পূর্ব্ব ২৩০০ অব্দের কথা। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে। এই সময়ে বা ইহার অল্প কিছু কাল পরে রাশিচক্রকে মেষাদি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহাতে কৃত্তিকা বৃষরাশির মধ্যে পতিত হয়। কৃত্তিকা হইতে বিষুব যখন আবার মেষরাশিতে উপস্থিত হয়; তখন বলা হয়, প্রজাপতি মেষমুখ। ইহা হইতেই হয়ত পরে দক্ষপ্রজাপতির ছাগমুণ্ডত্ব কল্পিত হইয়াছে।

৪২১ শক বা ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে বিষুব মেষ ত্যাগ করিয়া মীন রাশিতে প্রবেশ করে। তখন বিষুব ζ Piscium তারার ১° পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এখন আবার তথা হইতে আরও ১৯°।৫২′ পশ্চিমে সরিয়া 2 Cetus তারার সহিত এক যাম্যোত্তর রেখায় অবস্থিত আছে।

কালিদাসের বৃক্ষলতা

দ্বিতীয় পর্য্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীগণপতি সরকার

২০। কিংশুক :—

উপহিতং শিশিরাপগমশ্রিয়া
মুকুলজালমশোভত কিংশুকে।
প্রণয়িনীব নখক্ষতমণ্ডনং
প্রমদয়া মদয়াপিত লজ্জয়া॥ (রঘু ৯।৩১)

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্
বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥ (কু—৩।২৯)

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্তসময়ে হি সমাচিতেয়ম্
রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥ (ঋ—৬।১৯)

পলাশকুসুম যত বায়ুভরে অবনত
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সম চারিভিতে শোভিছে;
তাহে নব-বধূ সম ধরারাণী অনুপম
রক্তবাস পরি মধু মধুকালে মোহিছে॥

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং (ঋতু ৬।২০)

আম্রী-মঞ্জুল-মঞ্জরী-বর-শরাঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনুঃ
জ্যা যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিতরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥ (ঋতু ৬।২৮)

চুতাঙ্কুর শর যার, কিংশুক কোদণ্ড আর,
অলিহার ছিলা, শ্বেত-ছত্র শশি নির্ম্মল,
মত্ত গজ সে মলয়, পরভৃত বন্দী হয়,
সে বিজয়ী মধুসখা করুন গো মঙ্গল॥

অভিধান :—

ত্রিপত্রক, পলাশ, কিংশুক, ব্রহ্মপাদপ।—(হেমচন্দ্র ও হলায়ুধ। glossary of হলায়ুধ :— Butea frondosa.

পলাশে কিংশুকঃ পর্ণো বাতপোথস্ত্রিপর্ণকঃ।
আস্ফোতো ব্রহ্মবৃক্ষশ্চ হস্তিকর্ণদলে কৃতী॥ (বৈজয়ন্তী)

অর্থাৎ পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, ত্রিপর্ণক, আস্ফোত, ব্রহ্মবৃক্ষ, হস্তিকর্ণদল এবং কৃতী—এইগুলি পলাশের নাম।

Vocabulary of বৈজয়ন্তী মতে,—হস্তিকর্ণদল এবং কৃতী ইহারা বিভিন্ন প্রকার পলাশ, kind of Butea frondosa; তামিল নাম—Kodi murukka। আর সাধারণ পলাশ— Butea frondosa; তামিল নাম—Murukka. পলাশ, কিংশুক, পর্ণ ও বাতপোথ (অমর)।

বাতপোথ অর্থে—বাত নাশ করে যে। অতএব বোঝা যায় যে, পলাশ বাতরোগনাশক। কিংশুক অর্থে—কিং (কুৎসিৎ) শুক (বোঁটা) ইহার। ইহার বোঁটা কুৎসিৎ।

পলাশ—প্রশস্ত পত্র ইহার। পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ এবং সমিদ্বর এইগুলি পলাশের পর্য্যায়। (ভাবপ্রকাশ)। এই চিকিৎসা-গ্রন্থে ইহাকে বাতনাশক বলিয়া বাতপোথ নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

দেশভেদে নাম :—হিন্দুস্থানে—ধারা, কেসু, ঢাক, টেসু, কাংকরিয়া, পলাশ। মহারাষ্ট্রে—পঠ্‌ঠস বা পলস। কর্ণাটে—মুশুলু। তৈ :—মোটুগ, মাতুকাচেটু। উৎকলে—পরাশু। বোম্বায়ে—খাকরো। গুঃ—খাখরো। তাঃ—পরশন্। ইং—Downy branch Butea, লাটিন্ বা বোটানিক নাম—Butea frodoza, ডাক্তারী নাম—Butia Gum বুটিয়া গাম। সিং—কেল। বাংলায় :—পলাশ।

ঔষধে পলাশের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ ও নির্য্যাস ব্যবহার হয়।

পলাশ আমাদের সুপরিচিত বৃক্ষ। "বনৌষধিদর্পণে" পলাশের বর্ণনা এইরূপ—"পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয়। কোচবিহারে যেখানে সেখানে পলাশগাছ দেখা যায়। রাঢ়ে তেমন দেখা যায় না। ছ'চার পল্লীর পর হয়তো একটা পলাশ দেখা গেল। পলাশের একবৃন্তে তিনটি পাতা থাকে বলিয়া ইহার ত্রিপত্রক নাম। সাধারণ বৃন্ত অতিদীর্ঘ। মধ্যস্থ পত্রের বৃন্ত পাশের পাতাদুটি অপেক্ষা দীর্ঘতর, মধ্যস্থ পত্র কচিৎ কিঞ্চিৎ সগহ্বরাগ্র। পত্র বৃহৎ, অণ্ড গোলাকার, পত্রোদর চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠ রোমাঞ্চিত। ইহার পাতা শাল-পাতার মত দীর্ঘকাল কার্য্যোপযোগী থাকে। রাঢ়ে যেমন তালপাতার "পেকে" "টোকা" তৈয়ারি করে, কোচ-বিহারে তেমনি পলাশের পাতার "ঝাঁপি" করে। বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পাইলে পলাশের নূতন পাতা জন্মে। বসন্তে যখন ফুল ফোটে তখন পাতা থাকে না। ইহার ফুল বাঘের নখের মত বাঁকা। রাজনিঘণ্টু মতে পলাশের ফুল চারি প্রকার—রক্ত, পীত, শুভ্র, নীল। নিঘণ্টুকার ইহাকে "রক্তপুষ্প" বলিলেও স্বরূপতঃ ইহা কমলালেবুর খোসার রঙে একটু লাল রং মিশাইলে যে রং হয়, ইহার রং তাই। পলাশের শিম্বি চাপ্টা সিমের মত এবং পাৎলা। শিম্বির অগ্রভাগে পাৎলা কাগজের মত আবরণে আবৃত একটি মাত্র বৃক্কাকৃতি বীজ থাকে।"

পলাশফুল লাল ও বক্র বলিয়া নখক্ষতের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। ইহা বসন্ত পুষ্প।

২১। কীচক :—

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ।(পূ. মেঘ ১।৫৬)॥

স কীচকৈ র্মারুতপূর্ণ রন্ধ্রৈঃ
কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যাম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈঃ
উদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥ (রঘু ২।১২)॥

ভূর্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ।
গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে ॥ (রঘু ৪।৭৩) ॥

যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্
দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং
তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥ (কু—১।৮) ॥

অভিধান :—

"বেণবঃ কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ"—(অমর) ॥

অর্থাৎ ছিদ্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিলে যে বাঁশে শব্দ হয়, সেই বাঁশকে কীচক বা বেণু বলে।

"স্বনন্ বাতাৎ স কীচকঃ —(হেমচন্দ্র) ॥

অর্থাৎ বাতাসের আঘাতে শব্দকারী বাঁশকে কীচক বলে।

"পবনোদ্ধূত ধ্বনিষু কীচকাঃ —(বৈজয়ন্তী) ॥

"স্বনন্তি যেঽনিলোদ্ধূতা বেণবস্তে তু কীচকাঃ"—a hollow bamboo said to be sounding when shaken by the wind—(হলায়ুধ)।

কীচক বলিতে "রন্ধ্রবংশ"। ইহা একপ্রকার বাঁশ। সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মে। কালিদাস হিমালয় প্রদেশে ইহার উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Bamboo, Bambusa, so called from the whistling noise they make.
Tamil—Sabdik Kira Mungal.

২২। কুঙ্কুম :—

প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কুমাক্তম্
স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভিঃ
মদালসাভি র্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ (ঋতু ৬।১২) ॥
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুম রাগগৌরৈঃ ॥ (ঋতু ৬।৪) ॥

অভিধান :—

অমর = কুঙ্কুমম্ কাশ্মীরজন্মাঽগ্নিশিখংবরং বাহ্লীক-পীতনে। রক্ত-সংকোচ-পিশুনং ধীর-লোহিতচন্দনম্।

কাশ্মীরজন্মা—কাশ্মীর দেশ ইহার জন্ম।
অগ্নিশিখ—অগ্নির শিখার ন্যায় ইহার দীপ্তি।
বর—দেবগণ ইহা বরণ করে।

বাহ্লীক—বাহ্লীক দেশজাত।

পীতন—ইহা মাখিলে অঙ্গ পীতবর্ণ হয়।

রক্ত—ইহা রক্তবর্ণ।

সঙ্কোচ—অন্য বর্ণকে সঙ্কুচিত করে।

পিশুন—অন্য গন্ধদ্রব্যের সূচক।

ধীর—ধী (সুবুদ্ধি) দেয় যে।

লোহিতচন্দন—লাল চন্দনের বর্ণ।

হলায়ুধ= কুঙ্কুমং ঘুসৃণং বর্ণং প্রোক্তং লোহিতচন্দনম্।
কাশ্মীরজং চ বিদ্বদ্ভিঃ কালেয়ং জাগুড়ং স্মৃতম্॥

হেমচন্দ্র= কাশ্মীরজন্ম ঘুসৃণং বর্ণং লোহিতচন্দনম্।
বাহ্লীকং কুঙ্কুমং বহ্নিশিখং কালেয়-জাগুড়ে।
সঙ্কোচ-পিশুনং রক্তং ধীরং পীতন-দীপনে॥

বৈজয়ন্তী= কুঙ্কুমং ঘুসৃণং বর্ণ্যং রক্তং লোহিতচন্দনম্।
করটং চিতকাবেরং গৌরবং বাসনীয়কম্।
কাশ্মীরজং পুষ্পরজঃ সংকোচং পীতনং বরম্।
ঘোরং চাগ্নিশিখঞ্চাপি জপাপুষ্পং প্রিয়ঙ্গু চ॥

ভাষানাম ঃ—

বৈদ্যকে "কুঙ্কুম" "ঘুসৃণ" এবং "রুধির" নামে বহুল প্রচার। বাঃ—কুন্‌কুম্, হিঃ—কেসর। সিং—কোকুম্। গুঃ—কেসর। কঃ—কুঙ্কুম। তৈঃ—কুঙ্কুমপুবু। ফাঃ—লরকীমাস। অঃ—জাফ্‌রান্। ইং—স্যাফ্‌রণ্ saffron। বোটানিকঃ—Crocus sativus।

উৎপত্তিবোধক নাম—"কাশ্মীর" এবং "বাহ্লীক"।

উৎপত্তি সম্বন্ধে "ভাবপ্রকাশে" পাওয়া যায়, "কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ। সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধিতদুত্তমম্॥" অর্থাৎ কাশ্মীরে যে কুঙ্কুম জন্মায়, তাহা রক্তবর্ণ এবং পদ্মগন্ধি। তাহাই উৎকৃষ্ট। তাহার কেশর সূক্ষ্ম। আর "বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্। কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥" অর্থাৎ বাহ্লীকদেশে যে কুঙ্কুম জন্মায়, তাহা পাণ্ডুবর্ণ এবং কেতকী ফুলের গন্ধবিশিষ্ট। তাহার কেশর সূক্ষ্ম। তাহা মধ্যম। এবং "কুঙ্কুমং পারসীকে যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥" অর্থাৎ পারস্যদেশোৎপন্ন কুঙ্কুমের গন্ধ মধুর ন্যায়। তাহা অল্প পাণ্ডুর বর্ণ। তাহার কেশর স্থূল। তাহা অধম।

এখন কাশ্মীর, পারস্য, স্পেন, ফ্রান্স ও সিসিলিতে কুঙ্কুমের আবাদ হইয়া থাকে। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীরে কুঙ্কুমের চাষ হইয়া আসিতেছে। আজও কাশ্মীরের অন্তর্গত পম্পুরের সন্নিকটে ১০০।১২৫ হস্ত উচ্চ ২।২½ ক্রোশ দীর্ঘ ভূমিখণ্ডে ইহার আবাদ

হয়। আরণ্য ও আবাদী ভেদে কুঙ্কুমের গাছ দুই প্রকার। পালিত স্ত্রীকুঙ্কুমের গাছ প্রায় বন্ধ্যা হয়, এই জন্য আরণ্য পুংকুঙ্কুম গাছের ফুলের পরাগের সহিত কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রী-কুঙ্কুম গাছের গর্ভাধান নির্ব্বাহ করাইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে কুঙ্কুমের গাছে ফুল হয়। উত্তম কুঙ্কুম গাঢ় লেবুরঙের। পুরাতন ও নিকৃষ্ট কুঙ্কুম ফিকে পীত বা কাল। বিলাতি কুঙ্কুমে প্রাণীর মেদ ও মাখন মিশ্রিত থাকে। চর্ব্বিমিশ্রিত কুঙ্কুম তৈলাক্ত দেখায়। এই বিলাতি কুঙ্কুম ঔষধার্থে বা দেবোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় না। কুঙ্কুম বা জাফরাণ শীতপ্রধান দেশে ভালরূপ জন্মে। মূল আশ্বিন মাসে রোপণ করিতে হয়। ইহার ফুল অতিশয় সুন্দর।

২৩। কুটজ :—

অংশলম্বি-কুটজার্জ্জুন-স্রজঃ
তস্য নীপরজসাঙ্গরাগিণঃ।
প্রাবৃষি প্রমদবর্হিণেষ্বভূৎ
কৃত্রিমাদ্রিষু বিহারবিভ্রমঃ॥ (রঘু ১৯।৩৭)॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন সকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥ (পূঃ মেঘ ১।৪)॥

অভিধান :—

"কুটজো গিরিমল্লিকা" ইতি হলায়ুধঃ।
"কুটজে কুটচো বৎসঃ শক্রাখ্যো গিরিমল্লিকা" ইতি বৈজয়ন্তী।
"কুটজঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকা" ইতি অমরঃ।
"কুটজঃ কূটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গ শক্রশাখী চ মল্লিকা পুষ্প ইত্যাপি"॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

"কুটজো গিরিমল্লিকা"—a tree (Nerium anti-dysentericum Lin)—ইতি হলায়ুধঃ।

"বনৌষধিদর্পণ"কার দুই প্রকার কুটজের নাম করিয়াছেন। একটি সিত কুটজ, অন্যটি অসিত কুটজ। সিত অর্থাৎ শুভ্র কুটজই পুংকুটজ। আর অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ কুটজই স্ত্রীকুটজ বৃক্ষ। প্রথমটির কাণ্ড ত্বক পাণ্ডুবর্ণ, দ্বিতীয়টির কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটির পাতা শুকাইলে বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়টির শুষ্ক পাতা কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটির বীজ দারুচিনি-রঙের ও তিক্তস্বাদ, দ্বিতীয়টির বীজ মধুর ও কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমটির শিম্বী পৃথক, দ্বিতীয়টির শিম্বীদ্বয় অগ্রভাগে সংলগ্ন থাকে। প্রথমটির পুষ্প শ্বেতবর্ণ, পুষ্পনল সঙ্কুচিত; দ্বিতীয়টির পুষ্প বৃহৎ, স্থূল, শুভ্রবর্ণ ও অতি সুরভি। সিত কুটজ বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে, কিন্তু অসিত কুটজ বঙ্গে দুর্ল্লভ; ইহা মধ্যপ্রদেশ,

গুজরাট, গোদাবরীতীর, এবং ব্রহ্মদেশে জন্মে। উৎপত্তি স্থান দেখিয়া মনে হয়, কালিদাসের যক্ষ সম্ভবতঃ এই সুরভিত অসিত কুটজ দিয়াই মেঘকে অর্ঘ দিয়াছিলেন।

সিতকুটজের ভাষা নাম :—

বাঃ—কুড়চি বা কুরচি গাছ। কোঃ—ইন্দ্রজলতিতা। হিঃ—কুড়া, কৌরৈয়া। সিং—কেলিন্দ। গুঃ—পণ্ড্রাকুড়া। গোঃ—খণ্ড, কুরো। পঃ—কুরো। লঃ—পণ্ড্রাকুড়া। তাঃ—ভেপ্পালরিসি Velpalai। তৈঃ--অম্‌কুডু। ইং—কোনেসি বার্ক। উঃ—কুড়িয়া। অঃ—তিবাজ্‌। বোটানিক—Holarrhena Antidysenterica, Well। Vocabulary of the Vaijayanti—Echites antidysenterica. or Nerium antidysentericum।ইহার বীজের নাম—বাঃ—ইন্দ্রযব। হিঃ—ইন্দ্রযৌ।

অসীতকুটজের ভাষা নাম :—

হি :—মিঠা ইন্দ্রযো। গুঃ—গোদী ইন্দ্রযব। তাঃ—ভেৎপালভিরাই। তৈঃ—অন্‌কড্ কোদিসা। বোটানিক :—Wrightia Tinctoria, Br.

সিত কুটজের গাছ মধ্যাকৃতি। ইহা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। কোচবিহারে ইহার বন দেখা যায়। ইহার কোমল শাখাগ্র বা পত্র ভাঙ্গিলে শাদা আঠা বাহির হয়। ইহা বর্ষা পুষ্প।

২৪। কুন্দ :—

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎ কৃষ্ণশার-প্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্॥ (মেঘ ১।৪৭)॥

হস্তে লীলাকমল-মলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্। (মেঘ ২।২)॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞান-প্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্ম্মমাপি
প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ॥ (মেঘ ২।৫০)॥

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈর্
উদ্দ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগম্
প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্॥ (ঋতু ৬।২৩)॥

যেন রে রমণী-হাসি শ্বেতকুন্দ রাশি রাশি
ফুটেছে সুন্দর তাহে উপবন হইয়া,
ভোগহীন মুনি-মন হরণের পূর্ব্বক্ষণ
রাগ-দুষ্ট যুব-মন হরিতেছে মোহিয়া॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Prof. Wilson ইহাকে Jasminum pubescum বলিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহারে কুন্দকে বসন্তপুষ্প বলিয়াছেন। আবার মেঘদূতে উত্তর-মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে ছয় ঋতুর ছয়টি বিশেষ পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে এই কুন্দকে "বালকুন্দ" বলায় সঞ্জীবনীতে মল্লিনাথ বলিতেছেন, "যদ্যপি কুন্দানাং শৈশিরত্বম্ অস্তি মাঘ্যং কুন্দমিত্যভিধানাৎ তথাপি হেমন্তে প্রাদুর্ভাবঃ শিশিরে প্রৌঢ়ত্বমিতি ব্যবস্থাভেদেন হেমন্তকার্য্যত্বমিত্যাশয়েন বালবিশেষণম্।" অর্থাৎ কুন্দ শীতকালের ফুল, কিন্তু ইহাকে বালকুন্দ বলায় বুঝিতে হইবে যে, হেমন্তে যখন প্রথম ফোটে, তখন বাল্যকাল; শীতকালে প্রৌঢ়বস্থা। বালকুন্দ বলায় অর্থাৎ কুন্দের বাল (নবীন) বিশেষণ থাকায় ইহা হেমন্ত পুষ্প হইতেছে। এখন বোধ হইতেছে যে, হেমন্তে কুন্দ প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, শীতে মধ্যাবস্থা এবং বসন্তে পরিণত হয়। বসন্তের সময়ে ইহার ফোটাও বন্ধ হয়। মহাকবি "প্রাতঃ কুন্দ প্রসবশিথিলং" বলিয়া বুঝাইলেন যে কুন্দফুল প্রাতে ঝরণোন্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

২৫। কুমুদ:—

"তস্মাদস্যা কুমুদ বিশদাস্যহসি ত্বং ন ধৈর্য্যান্ (মেঘ ১।৪০)

"শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং" (মেঘ ১৫৮)

তস্মিন্ নভিদ্যোতিতবন্ধুপদ্মে
প্রতাপ সংশোধিত শত্রুপঙ্কে।
ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমার্য্যা
কুমুদ্বতী ভানুমতীব ভাবম্॥ রঘু ৬।৩৬॥

প্রমুদিত বরপক্ষ মেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডল মন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং
কুমুদবন প্রতিপন্ননিদ্রমাসীৎ॥ রঘু ৬।৮৬॥

যোষিতা মুড়ুপতেরিবার্চিষাং
স্পর্শ নিবৃতিমসাববাপ্নুবন্।
আরুরোহ কুমুদাকরোপমাং
রাত্রিজাগরপরো দিবাশয়ঃ॥ রঘু ১৯।৩৪॥

"হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি" (ঋতু ৩।২)

শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা
বিগত জলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগত কলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী
বিমল কিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্॥ ঋতু ৩।২২॥

শরতে কুমুদ সনে শীতলতা সমীরণে,
মেঘহীন দিক্‌দশ শোভে মনোহর,
বিগত কলুষ জল, শুষ্কপঙ্ক ধরাতল,
বিমল চন্দ্রিকা নভে তারকা সুন্দর ॥

দিবসকরময়ূখৈ র্বোধ্যমানং প্রভাতে
বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং জৃম্ভতেঽদ্য।
কুমুদমপি গতেঽস্তং লীয়তে চন্দ্রবিম্বে
হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ঋতু ৩।২৩ ॥

প্রভাতে তপনকরে কমলিনী প্রীতিভরে
জাগিয়া রমণী শ্রেষ্ঠ মুখকান্তি ধরে,
অস্ত গেলে নিশাপতি প্রবাসে যাহার পতি
সে নারীর হাসি ধরে কুমুদনিকরে।

কুমুদ রুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ম্‌" (ঋতু ৩।২৬)

বোটানিক—Nympæa Lotus, Linn.

বাংলা নাম—শালুক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে "কুমুদ্বতী" দ্রষ্টব্য।

২৬। কুরবক (কুরুবক):—

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়াম্‌
অভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ
কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥ রঘু ৯।২৯ ॥

চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং (মেঘ ২।২)

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতে মাধবীমণ্ডপস্য।
একসখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥ (মে ২।১৫)॥

ইহার বোটানিক নাম Barleria। "মালঞ্চ" রচয়িতা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় ইহার ফুল বর্ষাকালে ও শীতকালে প্রচুর ফোটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মহাকবি ইহাকে বসন্ত পুষ্প বলিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৭। কুশ :—

বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্তিতঃ
স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।
কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ
কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ॥ কু ৫।১১ ॥

নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালাম্
অধ্যাস্য প্রযত-পরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ।
তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং
সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায় ॥ রঘু ১।৯৫ ॥

ক্রিয়ানিমিত্তেষপি বৎসলত্বাৎ
অভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু।
তদঙ্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা
কচ্চিন্ মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ ॥ রঘু ৫।৭ ॥

তত্র তীর্থসলিলেন দীর্ঘিকাঃ
তল্পমন্তরিত-ভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ
সঞ্চিকায় ফলনিস্পৃহস্তপঃ ॥ রঘু ১৯।২ ॥

অভিধান :—

বর্হির্দর্ভঃ কুথঃ কুশঃ

(Sacrificial grass—poa cynosuroides)—হলায়ুধ।

কুশে মুনিঃ কুথো দর্ভো বীনাহোঃ যজ্ঞজাগরঃ—kind of small sacrificial darbha grass—বৈজয়ন্তী।

দর্ভঃ কুশঃ কুথো বর্হিঃ পবিত্রম্—হেমচন্দ্র।

কুশং কুথো দর্ভঃ পবিত্রম্—অমর।

কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ, এইগুলি কুশের পর্য্যায় এবং দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র, এই দুইটি দর্ভের পর্য্যায়—ভাবপ্রকাশ।

কুশঃ, হ্রস্বোমৃদুঃ সূচীপত্রঃ Poa ciliaris।

দর্ভঃ, পৃথুলঃ খরপত্রোদীর্ঘঃ Poa cynosuroides, Roxb. Eragrostis cynosuroides. Prain. (Retz). [কাশঃ, চামরপত্রঃ শারদঃ, সিতপুষ্পকঃ, নাদেয়ঃ, Saccharum Spontaneum, Linn.]—বনৌষধিদর্পণ।

দেশভেদে নাম :—

বাং—কুশ। হিঃ—কুশা, দাভ, ডাভ। মঃ—লঘুদর্ভ, থোরদর্ভা। গুঃ—দরভ, ডাভ। ক—বিলীপ, বুদকুশি, উন্নাকুশি। তৈ—কুশদুর্বালু, দুভ। ল্যাটিন—Andropogon snordaides। বোটানিক—Poa cynosuroides পোয়া সাইনোস্থুরাইডেস। (ভাবপ্রকাশ)।

কুশ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও বেশ জন্মায়। এই জন্ম চল্তি কথায় লোকে নিতান্ত অনুর্ব্বরা ভূমিকে "কুশ ফলে না" বলে। দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে হিন্দুদের কুশ চাই, নিতান্ত না পাওয়া গেলে "কেশে" ব্যবহার হয়।

২৮। কুসুম্ভ :—

বিকচ নব কুসুম্ভ স্বচ্ছসিন্দুর ভাসা
প্রবল পবনবেগোদ্ভূতবেগেন তূর্ণম্।
তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গনব্যাকুলেন
দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন॥ ঋতু ১।২৪॥

সিন্দূর কুসুম্ভভাস বিকচ নির্ম্মল
নবীন, সম্প্রাপ্তবেগ পবনে প্রবল,
তটতরু লতাগ্রের আকুল আশ্লেষে
দহিছে অনল ভূমি শীঘ্র দিক্‌দেশে।

কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈর্
নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্।
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুমরাগগৌরৈর্
অলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি॥ ঋতু ৬।৪॥

কুসুম্ভ-রাগেতে মরি রঞ্জিত বসন করি
নিতম্ববিম্বেতে বিলাসিনীগণ পরেছে,
কুঙ্কুমরাগেতে তায় গৌররক্ত বাস হায়
স্তনমণ্ডলেতে দিয়া অলঙ্কৃত করেছে॥

অভিধান :—

১ং মহারজনং কুসুম্ভং কমলোত্তরম্—হেমচন্দ্র।

মহারজনমিচ্ছন্তি কুসুম্ভঞ্চ সুমেধসঃ—safflower (carthamus tinctorius)—হলায়ুধ।

অথ কমলোত্তরম্। স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং মহারজনমিত্যপি।—অমর।

পদ্মোত্তরং বহ্নিশিখং মহারজনমিত্যপি কুসুম্ভে—বৈজয়ন্তী।

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।—ভাবপ্রকাশঃ।

গ্রাম্যকুঙ্কুমঃ, কুক্কুটশিখম্, বহ্নিশিখম্—(পরিচয় সংজ্ঞা)

বস্ত্ররঞ্জনম্—(ব্যবহারবোধিকা সংজ্ঞা)—বনৌষধি দর্পণ।

দেশভেদে নাম :—

বাং—কুসুমফুল। হিঃ—কর্ কুসুম। ম—কর্ডীচেং ফল্ল, কর্ডয়া। গু—কুসুম্ব। কর্ণাটে—কুসম্ভ। তৈ—লত্তুক, লক্কবঙ্গারমু (অগ্নিশিখা)। আরবীতে—অথরীজ, হবুল অস্ফর। তা—সেন্দুরকুম্। কোঃ—কুসুম্ শাগ্। সিং—বসুপ। ইং—স্যাফ্লোয়ার্। বোটানিক—Carthamus Tinctorius, Linn. C. Oxycantha (wild form of the plant) Bieb.

কাহারও মতে কুসুমফুল তিন প্রকার—(১) মহা কুসুম্ভ। (২) হ্রস্ব কুসুম্ভ। (৩) (৩) বন্য কুসুম্ভ।

রবি শস্যের ন্যায় কুসুমফুলের বীজ শরতে বপন করিতে হয়। শীতে পুষ্পিত হয়। ইহার পাতা সরু, লম্বা ও কণ্টকব্যাপ্ত। ফুল প্রায় কুঙ্কুমের বর্ণ; এই জন্য ইহাকে গ্রাম্য কুঙ্কুমও বলে। অগ্নিশিখার ন্যায় ফুলের রং বলিয়া ইহার নাম বহ্নিশিখ। পুষ্প কেবল শাখাগ্রে থাকে। কোচবিহারের লোক কুসুমশাক খায় শুনিয়াছি। পূর্ব্বে রেশম রং করিবার জন্য ৬।৭ লক্ষ টাকার কুসুমফুল এদেশ হইতে রপ্তানি হইত, এখনও কিছু টাকার কুমুমফুল বিদেশে যায়। ইহাতে রং হয় বলিয়াই ইহার নাম "মহারজন্" ও "বস্ত্ররঞ্জন"।

মহাকবি বসন্তকালে ইহার রং দিয়া কাপড় ছোপাইয়াছেন। সুতরাং বসন্তকালেও ইহা ফোটে, অনুমান করা চলে। তবে শীতকালে ফোটে ইহা জানা আছে। আর শীতে ফুটিলেও, তাহার দ্বারা বসন্তে কাপড় রং করা চলিতে পারে।

২৯। কেতকী :—

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ স্থচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈ র্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রাম চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়-দিন-স্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ॥ (মেঘ ১।২৩)॥

মুরলামারুতোদ্ধূতম্ অগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদ্যোধবরবাণানাম্ অযত্নপটবাসতাম্॥ (রঘু ৪।৫৫)॥

বিলাসিনী-বিভ্রমদন্তপত্রম্
আপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়ানিতম্বোচিত সন্নিবেশৈঃ
বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ॥ রঘু ৬।১৭॥

বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে
সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি ।
মামক্ষমং মণ্ডনকালহানেঃ
বেত্তীব বিম্বাধর-বদ্ধ-তৃষ্ণম্ ॥ রঘু ১২।১৩ ॥

কদম্ব-সর্জার্জুন কেতকী বনম্
বিকম্পয়ংস্তৎ কুসুমাধিবাসিতঃ ।-
সসীকরাম্ভোধর সঙ্গ শীতলঃ
সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ঋতু ২।১৭

সসাকর-মেঘ সনে শীত-সমীরণে
কেতকী-অর্জুন-নীপ-সাল-তরুগণে
কাঁপায়ে, কুসুমগন্ধে করি আহরণ
করিছে আকুল, বল, নহে কার মন ?

মালাঃ কদম্ব-নবকেশর-কেতকীভির্
আয়োজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য ।
কর্ণান্তরেষু ককুভদ্রুম-মঞ্জরীভির্
ইচ্ছানুকূল রচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ঋতু ২।২০ ॥

কদম্ব কেতকী নবকেশরের ফুলে
গাঁথি মালা পরে মাথে যত নারীকুলে ;
ককুভ মঞ্জুরী করি কাণেরি ভূষণ
আপন ইচ্ছায় পরে বিলাসিনীগণ ॥

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ
কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্ ।
জনিত রুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ
পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ঋতু ২।২৩ ॥

নবজলসেকে কিবা শীতল হয়েছে,
ফুলভরে নততরু আশ্রয় করেছে,
কেতকী-পরাগ মাখি সুগন্ধ পবন
প্রোষিত যুবক-মন করিছে হরণ ।

অভিধান :—

কেতকী গাছের নাম—কেতক, ক্রকচচ্ছদ (হেমচন্দ্র)

হলীমে কেতকী নং স্ত্রী দীনো ব্যঞ্জন জম্বুলৌ।
স্ত্রীভূষণো রজঃপুষ্পো গুপ্তরাগো বল্লীনকঃ॥ (বৈজয়ন্তী)

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণ কেতকীত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী॥ (ভাবপ্রকাশ)

কেতকী দুই প্রকার—(১) শাদা (২) হরিদ্রাভ। দ্বিতীয় প্রকার কেতকীকেই "ভাবপ্রকাশে" সুবর্ণ কেতকী বলিয়াছে। "বনৌষধিদর্পণে" শাদা কেতকীকে পুরুষ এবং স্বর্ণ কেতকীকে স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আরও বলিয়াছে যে, তৈলঙ্গী ভাষায় পুং কেতকীকে "মুগ্‌লীক" বা "মোগলী" এবং স্ত্রী কেতকীকে "গজ্‌ডুগু" বা "গোজ্জাঙ্গি" বলে। কেতকীর অন্য নাম "শিবদ্বিষ্টা" অর্থাৎ ইহার ফুলে শিব পূজা হয় না।

দেশভেদে নাম :—

বাঃ—কেয়াফুলের গাছ। হিঃ—কেবড়া, কেতকী, পীলীকেতকী। মঃ—কেতকী, শ্বেত কেবডী। তৈঃ—মোগিলি চেট্টু, মুগলীপুবু। কঃ—কেদগে। কোঃ—ক্যাওড়ার গচ্। গুঃ—কেবডো। কাঃ—করজ। আরবীতে—কাদী। তামিল—Talai। বোটানিক :—Pandanus odoratissimus. পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩০। কেশর :—

"মালাঃ কদম্বনবকেশর কেতকীভিঃ"—(ঋতু ২।২০)
গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং
কাদম্বমর্দ্ধোদ্‌গত কেশরঞ্চ।
স্নিগ্ধশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুঃ
যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে॥ রঘু ১৩।২৭॥

অভিধান :—

চাম্পেয়ঃ কেশরো নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ (অমর)
[পুন্নাগে পুরুষস্তুঙ্গঃ কেসরো দেববল্লভঃ (অমর)]

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥ ভাবপ্রকাশ।

দেশভেদে নাম :—

হিন্দুস্থানে, কর্ণাটে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে—নাগকেশর। তৈঃ—নাগকেশরালু। বোম্বায়ে —নাগচম্প। আরবী—নারমুস্ক। বাং—নাগেশ্বর। তামিলে—নাঙ্গল Cirundkappamaram. বোটানিক—Mesua ferrea. সিং—নাকেস্থরু।

কেশরের বানানে "শ" এবং "স" দুই দেখা যায়। অভিধানাদিতে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে "শ" দিয়া যে "কেশর" বানান করা হয়, তাহাতে নাগকেশর এবং "স" দিয়া যে

"কেসর" বানান করা হয়, তাহাতে "বকুল" (বকুলঃ কেসরঃ—হেমচন্দ্র) এইরূপ বুঝিতে হয়।

মহাকবি কালিদাস বর্ষাকালের এবং বসন্তকালের বর্ণনায়—দুই স্থানেই "কেশর" উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই গোল বাধিয়াছে। অথচ বর্ষাকালের বর্ণনাতেও বকুলের ব্যবহার করিয়াছেন—

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাম্
বিকসিত নবপুষ্পৈ যূথিকাকুড্মলৈশ্চ।
বিকচ নবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাম্
রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষঃ॥ (ঋতু ২।২৪)॥

বকুল মালতী আর নবফুল্ল ফুলে
গাঁথি মালা দেয় শিরে, যূথিকামুকুলে;
বিকচ কদম্বফুল শ্রবণে বধূর
পরাইছে কান্ত সম প্রাবৃট্ মধুর।

সুতরাং মহাকবির মতে বকুল বর্ষায় এবং বসন্তে, দুই কালেই ফোটে। তবে বসন্তে বকুলের বহু ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে কেশর বলিতে বকুলই ধরিয়াছেন কি না, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। ঋতুসংহারের "মালাকদম্ব-নবকেশর-কেতকীভিঃ" হইতে কদম্ব, নূতন-ফোটা কেশর ও কেতকী—এই তিন ফুল পাইতেছি। আর রঘুবংশের "কাদম্বমর্দ্ধোদ্গত কেশরঞ্চ" হইতে কদম ফুল এবং আধফোটা কেশর ধরা যায়। অথবা কদমফুলের কেশর অর্দ্ধেক বাহির হইয়াছে, ধরাও চলে। এখন, এই কেশরই বকুল; বা বকুল ও কেশর দুইটি বিভিন্ন ফুল? "বনৌষধি দর্পণে" নাগকেশরের বর্ণনা হইতে পাইতেছি যে, নাগকেশর বৃহৎ বৃক্ষ। ইহার পাতা লম্বা, অগ্রভাগ সরু, পত্রপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ণ লেপ থাকে, মুছিলে দাগ পড়ে, পত্রোদর হরিদ্বর্ণ। আর কচি নাগকেশরের গাছের ডাল এমন ঘন থাকে যে, গাছটিকে দেখিলে রথের মত বোধ হয়। ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের প্রথমে নাগকেশরের ফুল ফোটে। এই ফুলের কেশর অনেক এবং অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত। ফুলের দল শাদা, দেখিতে ঠিক বড় টগর ফুলের দলের মত। দল সুবিন্যস্ত নয়। ফুলের গন্ধ মনোরম। ফুল বড় হয়। ফল হইতে একপ্রকার নির্য্যাস বাহির হয়। প্রবোধ বাবুও ফাল্গুন চৈত্রে ইহার ফুল ফোটে লিখিয়াছেন। আর ইহার নাম বলিয়াছেন। "নাগেশ্বর চাঁপা" ইহার ফুল বর্ষা পর্য্যন্ত থাকে কিনা, জানা নাই। যদি বর্ষায় ইহার ফুল হয়, তাহা হইলে ইহাকে "বকুল" না বলিয়া "নাগেশ্বর" বলা চলে। মহাকবির মতে ইহা "বকুল" কি "নাগেশ্বর", তাহা লইয়া একটু সন্দেহ এখনও থাকিল। কিন্তু যদি নাগকেশর বর্ষায় ফোটে, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। অবশ্য ইহা যে বর্ষায় ফোটে এ কথা "মালঞ্চে" বা

"বনৌষধিদর্পণে" লিখিত হয় নাই। কালিদাস কিন্তু বর্ষায় যে ইহা ফোটে, তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩১। কোবিদার :—

মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখঃ
পুষ্পোদ্গমপ্রচয়কোমল-পল্লবাগ্রঃ।
মত্তদ্বিরেফ-পরিপীত-মধু-প্রসেকঃ
চিত্তং বিদারয়তি কস্য ন কোবিদারঃ॥ ঋতু ৩।৬॥

মন্দ মন্দ বায়ু বয় শাখাগ্র ব্যাকুল হয়,
প্রচুর কুসুমে পত্র সুকোমল রয়,
কোবিদার ফুল মধু পানে মত্ত অলি বঁধু,
বল ইথে কার মন হরি' নাহি লয়।

অভিধান :—

কোবিদারঃ যুগপত্রঃ (হেমচন্দ্র)
[রক্তকাঞ্চন গাছের নাম—ঐ অনুবাদক]
কোবিদারমপি কাঞ্চনারকম্ (হলায়ুধ)
[কোবিদার—a species of ebony.
কাঞ্চনারক—a species of ebony (bauhinia variegata)—Glossary of Halayudha]
কোবিদারে চমরিকো রক্ত পুষ্পো যুগচ্ছদঃ।
কাঞ্চনারঃ (বৈজয়ন্তী)
[কোবিদার—mountain ebony (Bauhinia variegata). Tamil—Kovidaram.—vocabulary of the Vaijayanti].
কোবিদারে চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ (অমর)
[চমরক—চমরের (রোমের) ন্যায় পুষ্প ইহার। যুগপত্রক—যুগ (যুগল) পত্র ইহার। ইহা রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। ইহার হিন্দি নাম "কচ্নার"—ঐ অনুবাদক]।

দেশভেদে নাম :—

বাং—কাঞ্চন ফুলের গাছ। হিং—কচ্নার। সিং—কোবলীন। কোঃ—কঞ্চন গচ্। মঃ—কোরল। গুঃ—চম্পকাটী। কঃ—কোচানে কচনার। তৈঃ—দেবকাঞ্চন।

বনৌষধি দর্পণে—ফুলের বর্ণভেদে কোবিদার তিন প্রকার (১) শ্বেতপুষ্প (২) রক্ত বা তাম্র পুষ্প এবং (৩) পীত পুষ্প।

[শ্বেত কোবিদার (নির্গন্ধ) Bauhinia Acuminata, Roxb. শ্বেত কোবিদার (সুগন্ধি পুষ্প) B. Condida, Roxb.। তাহা হইলে শাদা কোবিদার দুই প্রকার হইল ;—(১) একটি নির্গন্ধ, (২) অন্যটি সুগন্ধযুক্ত।

তাম্রপুষ্প কোবিদার—B. Veriegata, Roxb.

কোবিদারশ্চমরিকঃ কুদ্দালো যুগ্মপত্রকঃ।
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অস্তকঃ স্বল্পকেশরী॥ (ভাব প্রকাশ)

পীতপুষ্পকোবিদার—B. Purpurea, Roxb. গিরিজ, মহাপুষ্প, মহাযমলপত্রক (রাজ নিঘণ্টু)

Glossary of Indian plants মতে ইহা Bauhinia acuminata, Linn. (কাঞ্চন)। আর Bauhinia Variegata, Linn. কাঞ্চনাড় অর্থাৎ রক্তকাঞ্চন।

ভাব প্রকাশে দুই প্রকার কাঞ্চনার ধরিয়াছে। এক কাঞ্চনার পর্য্যায়ে কোবিদার আছে। তাহাকে হিন্দিতে কবনার বলে। অন্য যে কাঞ্চনার তাহার কোন হিন্দি নামের উল্লেখ নাই। উহা—"কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।" আর কোবিদার পর্য্যায়ে পাওয়া যাইতেছে, "যুগ্মপত্রক" তাম্রপুষ্পশ্চ" এবং "স্বল্পকেশরী"। ইহা হইতে জানা যায় যে, কাঞ্চনার পুষ্প ঘোর রক্তবর্ণ। আর কোবিদারের পুষ্প তামার ন্যায় রক্তবর্ণ।

কোবিদারের নাম যুগ্মপত্র। কারণ ইহার পত্রাগ্র ভাগ এমনভাবে চেরা যেন দুইটি পত্র মিলিত হইয়াছে। ফুলের পাঁচটি দল বিষমাকৃতি। রক্ত কোবিদার ফাল্গুন-চৈত্রে ফোটে। শ্বেত কোবিদার শীতে, কচিৎ শরতে ফোটে। পীত কোবিদার বড় গাছ। প্রায় পর্ব্বতে জন্মায় বলিয়া ইহাকে "গিরিজ" বলে। ইহার পাতা পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার কাঞ্চন বৃক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম "মহাযমল পত্র"। ইহার ফুল বড় বলিয়া নিঘণ্টুকার ইহাকে "মহাপুষ্প"ও বলিয়াছেন। আর ইহার ফুলের রং ঘোর গোলাপী। কালিদাস শরৎ পুষ্পের মধ্যেই কোবিদারের বর্ণনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

রক্তের কথা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া রক্তের কথা জানা যে অত্যাবশ্যক, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই ঘন লালবর্ণ তরল পদার্থের বাহ্য রূপের সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় থাকিলেও, শরীরস্থ ধমনী ও শিরাসকলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া রক্ত যে জীবের কত উপকারে আসে, অনেকেই সে বিষয় সম্যক জ্ঞাত নহেন। এই প্রবন্ধে আমরা জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা না করিয়া মোটামুটিভাবে রক্তের প্রয়োজনীয়তা,—তাহার ধর্ম্ম ও উপাদান প্রভৃতির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

রক্তের প্রয়োজনীয়তা—(১) আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার কিয়দংশ রক্তের সাহায্যে খাদ্যনালি হইতে শরীরাভ্যন্তরে গৃহীত হয়।

(২) খাদ্যবস্তু জীর্ণ ও পরিপাক হইবার পর, রক্তের প্রবাহ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া দেহের বিভিন্ন কোষে সঞ্চালিত হয় এবং দেহের পুষ্টি সাধন করে।

(৩) নিঃশ্বাসের সহিত গৃহীত ফুস্‌ফুসের ভিতরকার বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া রক্তই তাহা শরীরের সর্ব্বস্থানে লইয়া যায়।

(৪) দেহস্থ কোষের কার্য্যকারিতার (activity) ফলে শরীরে দগ্ধাঙ্গারক, ইউরিয়া (carbon-dioxide, urea) প্রভৃতি নানা অপ্রয়োজনীয় পদার্থের (waste products) উদ্ভব হয়। রক্ত দেহের সকল স্থান হইতে সেই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বহির্নিক্ষেপকারী যন্ত্রসমূহ মধ্যে (excretory organs) স্থাপন করে। পরে, সেই পদার্থগুলি শরীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া হয় (excreted)।

(৫) শরীরের নালিবিহীন গণ্ডগুলির অভ্যন্তরীণ রস (Internal secretion of the ductless glands) রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়।

(৬) রক্তের সহিত নানা প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে অনেক অহিতকর জীবাণুর বিষক্রিয়ার প্রভাব হইতে রক্ত আমাদের শরীরকে রক্ষা করে। এই বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

(৭) শরীরের বিভিন্ন কোষসমূহের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যকারিতার ফলে নানাস্থানে নানারকম উত্তাপের সঞ্চার হয়। কিন্তু অবিরত প্রবাহের ফলে রক্ত শরীরের সর্ব্বস্থান সমান-উত্তাপ-সম্পন্ন করিয়া রাখে (equalises the temperature)।

(৮) সাধারণতঃ নালি (vessel) হইতে নির্গত হইলেই রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় (coagulates)। ইহাতে দুইটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়;—(ক) জমাট বাঁধিয়া

যাওয়ার দরুণ ছিন্ন শিরামুখ হইতে রক্তক্ষরণে বাধা পড়ে, এবং (খ) মুখবন্ধ হওয়াতে কোন প্রকার জীবাণুও শিরাপথে শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

(৯) রক্তমধ্যে কয়েকটি অজৈব লবণের (Inorganic salts) অবস্থিতির জন্যই হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন ও বিস্ফারণ ক্রিয়া (rythmic activity of the heart) সাধিত হয়। ইহাদের অভাবে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে।

রক্তের ধর্ম্ম (Properties):—রক্তের বর্ণ সাধারণতঃ লাল হইলেও বর্ণের গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নহে। ধমনী ও শিরার অভ্যন্তরস্থ রক্তের তুলনা করিলেই এই বৈষম্য সহজে লক্ষিত হয়। রক্তের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত এবং ইহার একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে। জলের সহিত তুলনায় রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ১০৫৫-৬০ (জল= ১০০০)।

রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণের উপায়:—বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় বলিয়া সাধারণতঃ যেভাবে অন্যান্য তরল পদার্থের আপেক্ষিপ গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হয়, রক্ত সম্বন্ধে তাহা খাটে না। ক্লোরোফর্ম রক্ত অপেক্ষা অধিকতর ভারী (dense), কিন্তু বেন্‌জিন্ (Benzene) হাল্কা; আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ক্লোরোফর্ম ও বেন্‌জিন এমন পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়, যাহাতে ঐ মিশ্রিত পদার্থের গুরুত্ব ১০৫৫ কিম্বা তাহার কাছাকাছি হয়। এইবার এক ফোঁটা রক্ত উক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থের (mixture) ভিতর ফেলিয়া দিয়া দেখিতে হইবে উহা ভাসিয়া উঠে, কিম্বা তলাইয়া যায়। ভাসিলে বুঝিতে হইবে, রক্ত ঐ মিশ্র পদার্থ অপেক্ষা লঘু, ডুবিলে বুঝিতে হইবে ভারী। এইরূপে ক্লোরোফর্ম ও বেন্‌জিনের গুরুত্ব অনুসারে উহাদের মিশাইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভারী কিম্বা হাল্কা হইয়া ক্রমে রক্তের সহিত এক-গুরুত্ব সম্পন্ন হইবে। উভয়ে একই রকম ভারী হইলে পদার্থ মধ্যে রক্তবিন্দুটি যেখানে রাখা যাইবে, সে'খানেই থাকিবে; ভাসিয়া অথবা তলাইয়া যাইবে না। এইবার একটি গুরুত্ব-নির্দ্ধারক-যন্ত্র (Hydrometer) সাহায্যে সহজেই ঐ মিশ্রিত পদার্থের, তথা রক্তের গুরুত্ব নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহাকে হ্যামার্সল্যাগের আপেক্ষিক-গুরুত্ব-নির্দ্ধারণের প্রণালী (Hammerschlag's method of determining the specific gravity) বলা হয়।

উপযুক্ত নির্দ্ধারক (Indicator), সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রক্ত ক্ষারধর্ম্মী (alkaline)। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অল্প পরিমাণ অম্ল কিম্বা ক্ষার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারত্বের (normal alkalinity) কোনও ইতর বিশেষ হয় না। দেহস্থ প্রতিদ (Protein) অম্ল কিম্বা ক্ষারের সহিত যুক্ত হইয়া এক যৌগিক পদার্থের (compound) সৃষ্টি করে; এই যৌগিক পদার্থ আর বিশ্লিষ্ট (dissociated into ions) হয় না। কাজেই অতিরিক্ত অম্ল কিম্বা ক্ষার রক্তের স্বাভাবিক ক্ষারধর্ম্মের কোনও প্রভেদ ঘটাইতে পারে না, শুধু প্রতিদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায় মাত্র।

রক্ত জল অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিকতর ঘন (viscous)। রক্তের বিদ্যুৎবহন ক্ষমতা

(electrical conductivity) আছে, এবং উহা চর্ম্মান্তর্বাহ চাপ প্রয়োগে সমর্থ (exerts osmotic pressure)।

রক্তের উপাদান :—প্রধানতঃ কণিকা (corpuscles) ও তরল রক্তরসের (plasma) সংযোগেই রক্তের উদ্ভব। কিন্তু কণিকা ও রক্তরসের মূল উপাদান (composition) জানিতে হইলে, উহাদিগকে পরস্পর বিযুক্ত করা প্রয়োজন। একটি শিরার মধ্যভাগে দুইটি গ্রন্থি (ligatures) বাঁধিলে সেই গ্রন্থিমধ্যবর্ত্তী স্থলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। এখন এই বদ্ধ শিরার অংশ কাটিয়া লইয়া কোনও শীতল স্থানে রাখিলে রক্ত শীঘ্র জমাট বাঁধে না, এবং কণিকা রক্তরস অপেক্ষা ভারী বলিয়া ধীরে ধীরে তলায় থিতাইয়া পড়ে। ইহাকে "জীবন্ত আধারে বিযুক্ত করিবার উপায়" (living test-tube method) বলে। চতুঃপার্শ্ব বরফ দ্বারা শীতল করিয়া কোনও পাত্রে রক্ত লইয়া অপেক্ষাকৃত সহজতর উপায়েও কণিকা ও রক্তরসের পরস্পর বিযোগ সম্ভব।

রক্তরস (Plasma) :—অমিশ্রিত (pure) রক্তরস পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহাও ক্ষারধর্ম্মী। রক্তরসে শতকরা ৯০ ভাগ জল এবং ১০ ভাগ স্থূল পদার্থ আছে। এই স্থূল পদার্থ পরীক্ষা করিলে—(১) প্রতিদ (protein), (২) নানা প্রকারের নির্য্যাস পদার্থ (extıactives) (৩) অজৈব পদার্থ, (৪) বিভিন্ন প্রকারের কিণ্ব (ferments), (৫) নালিবিহীন গণ্ডের ক্ষরিত রস, এবং (৬) দেহরক্ষাকারী নানা পদার্থ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অম্লজান, যবক্ষারজান, দগ্ধাঙ্গারক (carbon-dioxide) প্রভৃতি নানা প্রকারের বায়বীয় পদার্থও রক্তরসে বর্ত্তমান।

পূর্ব্বোক্ত কঠিন পদার্থসমূহের মধ্যে :—

(১) প্রতিদ ; তিন প্রকারের—
 (ক) ফাইব্রিণোজেন
 (খ) সিরামগ্লবিউলিন—(১) এন্‌গ্লবিউলিন
  (২) সিউডোগ্লবিউলিন
 (গ) সিরাম এ্যালবুমিন

(২) নির্য্যাসপদার্থসমূহ ; দুই প্রকারের—
 (ক) যবক্ষারজানযুক্ত— (১) ইউরিয়া
  (২) ইউরিক এ্যাসিড্
  (৩) ক্রিয়াটিন
  (৪) ক্রিয়াটিনিন
  (৫) জ্যান্‌থিন, ইত্যাদি
 (খ) যবক্ষারজানরহিত— (১) স্নেহপদার্থ (Fat)
  (২) শার্কর পদার্থ (Carbohydrate) ইত্যাদি

(৩) অজৈব পদার্থসকল প্রধানতঃ খটিক, পত্রক, মগ্নক এবং লৌহ ধাতুর সহিত হরিত, গন্ধক, স্ফুরক প্রভৃতির সংযোগজাত লবণ বিশেষ (Chlorides, Sulphates, Phosphates etc. of Calcium, Potassium, Magnesium and Iron)।

(৪) কিণ্বের মধ্যে লাইপেস্ ও গ্লাইকোলেস্ প্রধান।

(৫) রক্তরসে পিটুইট্রিন ও এ্যাড্রিন্সালিন (Pituitrin and adrenalin) রসদ্বয় বর্ত্তমান।

(৬) দেহরক্ষাকারী পদার্থসমূহের মধ্যে :—

(১) ইমিউন পদার্থসমূহ (Immune bodies)
(২) কমপ্লিমেণ্ট (Complement)
(৩) অপ্সোনিন (Opsonin)
(৪) এ্যাগ্লুটিনিন (Agglutinin) ইত্যাদি আছে

রক্তের দ্বারা শরীরের যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, রসভাগই তাহার অধিকাংশ সুসম্পন্ন করিয়া থাকে। কণিকার কার্য্য বিশেষ বিস্তৃত নহে।

কণিকা (Corpuscles) :—এক ঘন মিলিমিটার (cubic millimeter) রক্তের মধ্যে পুরুষের শরীরে প্রায় পাঁচ কিম্বা সাড়ে পাঁচ লক্ষ এবং স্ত্রীলোকের শরীরে সাড়ে চার কিম্বা ৫ লক্ষ কণিকা পাওয়া যায়। অত্যধিক পরিমাণে জল খাইলে, উচ্চ পর্ব্বতারোহণ করিলে কিম্বা গর্ভাবস্থায় উক্ত সংখ্যার অল্প ইতর বিশেষ হয়।

বিভিন্ন রোগকালে শরীরস্থ রক্তকণিকার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নিম্নলিখিত উপায়ে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয় :—

থোমা-জিসের কণিকাগণনার যন্ত্র (Thoma-Zeiss Hæmocytometer) :—একটি কৈশিক নলের (capillary tube) মধ্যভাগ স্ফীত (ampullated) হইয়া দুইদিক আবার সরু হইয়া গিয়াছে। নলের শেষে একটি রবারের নল এবং তাহার শেষে আর একটি অপেক্ষাকৃত মোটা কাচের নল (ছবি দেখুন)। কৈশিক নলের গায়ে এমনভাবে রেখা অঙ্কিত আছে যে, যদি "১" রেখা পর্য্যন্ত রক্ত লওয়া হয় এবং পরে লবণ মিশ্রিত জল (saline solution) লওয়া হয় "১০১" রেখা পর্য্যন্ত, তাহা হইলে ১ ভাগ রক্ত ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ১০১ ভাগ জল ও রক্তের মিশ্রণ হইল। নলের স্ফীত অংশমধ্যস্থ একটি ছোট কাচের মুড়ি (glass bead) এই মিশ্রণে সাহায্য করে।

এদিকে একটি কাচের পাতের (slide) মধ্যস্থলে এক বর্গ মিলিমিটার স্থান (square millimeter) ৪০০ ভাগে বিভক্ত ক্রমাঙ্ক চিহ্নে চিহ্নিত; আবার এই রেখাঙ্কিত স্থানের চতুঃপার্শ্বে একটি নাতিগভীর খাদ (moat) এবং এক-দশমাংশ (one tenth) মিলিমিটার উপরে একটি আবরণ রহিয়াছে। কাজেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের আয়তন ১/৪০০০ ঘন মিলিমিটার (cubic millimeter)। এইবার ঐ মিশ্রিত রক্ত পাতের উপর লইয়া আমরা

যদি প্রতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর কয়টি করিয়া কণিকা আছে, অণুবীক্ষণ (microscope) যন্ত্র সাহায্যে গণনা করি, তাহা হইলে সহজেই এক ঘন মিলিমিটারে কত কণিকা আছে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব ; কারণ প্রত্যেক গণ্ডির আয়তন এবং মিশ্রিত পদার্থের ভিতর রক্তের পরিমাণ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জানা আছে।

রক্তে যে কণিকা পাওয়া যায়, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত—লাল ও বর্ণবিহীন। ইহা ব্যতীত রক্তরসে ভাসমান এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাও (blood platelets) দেখা যায়। উপরে কণানির্দ্ধারণের যে উপায় বলা হইয়াছে, সেই উপায়েই বর্ণহীন কণিকার সংখ্যাও নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রতি ঘন মিলিমিটারে বর্ণবিহীন কণিকার সংখ্যা ৫,০০০—১০,০০০।

রক্তকণিকার (red corpuscles) আকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (ক) কাহারও মতে প্রত্যেকটি কণিকা একটি সূক্ষ্ম উপস্নেহ পদার্থের জাল (lipoid stroma) দ্বারা গঠিত এবং ঐ জাল রক্তলোহিত (Hæmoglobin) নামক এক প্রকার রং ও অন্যান্য অজৈব পদার্থের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। (খ) অপর মতে, প্রতি কণিকার একটি উপস্নেহ পদার্থের বাহ্য আবরণ (outer envelope) আছে, হিমগ্লবিন ও অজৈব পদার্থ তন্মধ্যে অবস্থিত। ব্যাপার যাহাই
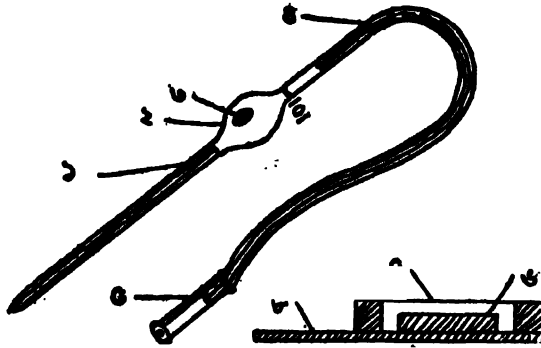
চিত্র—১

কণিকাগণনার যন্ত্র

(১) কৈশিক নল ; (২) স্ফীত অংশ ; (৩) মুণ্ডি ;
(৪) রবারের নল ; (৫) কাচের নল ;
(৬) খাদ ; (৭) উপরের আবরণ ;
(৮) কাচের পাত

হউক, প্রতি কণিকার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের চর্ম্মান্তর্ব্বাহ চাপ (osmotic pressure) বাহিরের রক্তরসের চাপের সমান ; কাজেই উভয়ের মধ্যে তেমন আদান প্রদান নাই। আবার শতকরা ৯ ভাগ লবণ মিশান জলের চাপ রক্তরসের চাপের সমান। ইহাকে বলা হয়, শরীরধর্ম্মী লবণাক্ত জল (physiological saline solution)। আমরা যদি শতকরা

৯ ভাগ অপেক্ষা বেশী লবণাক্ত জলে কণিকাগুলিকে ভাসাইয়া দিই, তাহা হইলে বাহিরের তরল পদার্থের চর্ম্মান্তর্ব্বাহ চাপ বেশী হওয়াতে, কণিকাভ্যন্তরস্থ জলীয় ভাগ বাহিরে প্রবাহিত হইয়া কণিকাগুলিকে কুঞ্চিত, ক্ষুদ্রায়তন করিয়া ফেলিবে। এইরূপ কণিকাকে কুঞ্চিত কণিকা (crenated corpuscle) বলে। কিন্তু যদি বিপরীত অবস্থা ঘটে, অর্থাৎ শতকরা ৯ ভাগ অপেক্ষা কম লবণাক্ত জলে কণিকাগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, বাহিরে চর্ম্মান্তর্বাহ চাপ কম হওয়াতে বাহিরের লবণাক্ত জল ক্রমেই কণিকাশরীর মধ্যে আসিয়া সঞ্চিত হইবে। ফলে কণিকাগুলি স্ফীত, বিপুলায়তন হইয়া উঠিবে এবং শেষে অত্যধিক চাপে বাহ্য আবরণ বিদীর্ণ হইয়া কোষ হইতে হিমগ্নবিন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাকে হিমলিসিস (Hæmolysis) বলে। অন্যান্য নানা কারণেও এইরূপ ধ্বংস ঘটিতে পারে। যেমন—

(১) যদি কেবল বাহিরের রক্তরসকে জল মিশাইয়া অপেক্ষাকৃত তরল (diluted) করা যায়, তাহা হইলে সহজেই কণিকাগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(২) এ্যামিল এ্যাল্‌কহল্‌, ক্লোরোফর্ম, ইথার (amyl alcohol, chloroform, ether) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগেও কণিকাগুলি নষ্ট হইতে পারে।

(৩) যদি কোনও কণিকার উপস্নেহ পদার্থের জাল বা আবরণটি (lipoid stroma or envelope) গলাইয়া ফেলা যায় (dissolved), তাহা হইলে হিমগ্নবিন কোষমুক্ত হইয়া কণিকাগুলি বিনষ্ট করে।

(৪) যদি এক জীবের কণিকা অপর এক জীবের রক্তাম্বুর (serum—রক্তরস জাতীয়; কিন্তু অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে—পরে আলোচনা করা হইবে) মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে কণিকার নাশ হয়। শুদ্ধ মাত্র চর্ম্মান্তর্বাহ চাপের ইতর-বিশেষেই এই বিনাশ সাধিত হয় না; হিমলিসিন (Hæmolysin) নামক এক প্রকার দ্রব্যগুণেই এরূপ হয়। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের কখন কখন ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যথা,—অশ্বের রক্তরসে শশকের কণিকা রাখিলে কোনও রূপ ক্ষতি হয় না।

(৫) নানা জীবাণুর বিষক্রিয়ার ফলেও কণিকার ধ্বংস হয়।

(৬) নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ বিষেও কণিকা বিনষ্ট হইতে পারে।

(৭) সর্পবিষ কণিকার পক্ষে মারাত্মক।

কণিকার উপাদান—কণিকায় প্রায় ৭০ ভাগ জল এবং ৩০ ভাগ কঠিন পদার্থ আছে। জলের কথা ছাড়িয়া দিলে, কঠিন পদার্থগুলির মধ্যে হিমগ্নবিন প্রধানতম। নিউক্লিয়ো-প্রতিদ, কোলেষ্ট্রিণ ও নানা প্রকার অজৈব লবণ (nucleo-protein, cholestrin and inorganic salts) কণিকায় বর্ত্তমান।

হিমগ্নবিন (Hæmoglobin)—হিমাটিন নামক একপ্রকার রং এবং গ্লবিন নামক এক প্রকার প্রতিদের সংযোগে হিমগ্নবিন গঠিত। হিমগ্নবিন রক্ত মধ্যে সাধারণতঃ দুই অবস্থায় পাওয়া যায়—(১) ধমনীস্থ রক্তে অম্লজানযুক্ত অবস্থায় (oxy-hæmoglobin) এবং

(২) শিরার রক্তে অম্লজানবিযুক্ত অবস্থায় (reduced hæmoglobin)। অন্যান্য বস্তু সংযোগে হিমগ্লবিনের অপরাপর যৌগিক পদার্থ গঠনও সম্ভব; যথা—কার্ব্বন-মনক্সাইড-হিমগ্লবিন, নাইট্রিক-অক্সাইড-হিমগ্লবিন, কার্ব্বোহিমগ্লবিন ইত্যাদি। (Carbon-monoxide Hæmoglobin; nitric-oxide Hæmoglobin, Carbo-Hæmoglobin with Carbon-dioxide)।

হিমগ্লবিনের প্রধানতম গুণ এই যে, ইহা সহজে অম্লজান বাষ্পের অণুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে। কিন্তু এই যৌগিক পদার্থ তেমন স্থায়ী (stable) হয় না; অম্লজান বাষ্প সহজেই পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনীর ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল করিবার সময় বায়ুস্থিত অম্লজান বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া হিমগ্লবিন অক্সি-হিমগ্লবিন নামক পদার্থ গঠন করে। পরে সেই রক্ত শরীরস্থ বিভিন্ন কোষে অম্লজান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হয় এবং একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্ত্তন করে। সুতরাং এই হিমগ্লবিনের কার্য্যকারিতার গুণেই বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া শরীর আপন পুষ্টি সাধন করে।

পূর্ব্বে অন্যান্য বাষ্পের সহিত সংমিশ্রণে হিমগ্লবিনের যে সকল যৌগিক পদার্থ গঠনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সাধারণ অবস্থায় (normal condition) তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। অম্লজান বাষ্পের সহিত মিশিয়া হিমগ্লবিন মেট-হিমগ্লবিন (met-hæmoglobin) নামক অপর এক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই যৌগিক পদার্থ অক্সি-হিমগ্লবিনের ন্যায় অত সহজে আপন অম্লজান ত্যাগ করে না; এবং এই পদার্থের গঠন শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্মও নহে।

বিভিন্ন বায়বীয় বস্তুর সহিত মিশ্রণে গঠিত যৌগিক পদার্থ ছাড়া রক্তলোহিতের বিশ্লেষণ ফলেও আমরা নানা পদার্থ প্রাপ্ত হই। হিমগ্লবিনের ধ্বংস হইয়া যে সকল পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা :—

(১) লৌহযুক্ত (Iron-containing)—(ক) হিমাটিন (Hæmatin)
(খ) হিমিন (Hæmin)
(গ) হিমোক্রমোজেন (Hæmochromogen)

(২) লৌহরহিত (Iron-free)—
(১) হিমাটোপরফিরিণ (Hæmatoporphyrin)
(২) হিমাটয়িডিন (Hæmatoidin)
(৩) পিত্তের বর্ণদায়ক (Bile-pigments)
(ক) বাইলিরুবিন (Bilirubin)
(খ) বাইলিভার্ডিন (Biliverdin)

(৪) মূত্রের বর্ণদায়ক (urinary pigment)
  (ক) ইউরোবাইলিন (urobilin)
(৫) মলের বর্ণদায়ক (Fæcal pigment)
  (ক) ষ্টার্কোবাইলিন (Starchobilin)

পূর্ব্বোক্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যে হিমিন (লৌহযুক্ত, খ) সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। ইহা সাধারণতঃ কৃত্রিম উপায়ে (artificially) গঠিত হইয়া থাকে। একটি কাচের পাতের উপর পুরু করিয়া এক স্তর (layer) রক্ত লইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা গ্লেসিয়াল এ্যাসেটিক এ্যাসিড (glacial acetic acid) মিশাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে, অতি সহজেই হিমিনের স্ফটিক (crystal) গঠিত হইয়া উঠে। কোনও লাল বর্ণ পদার্থ রক্ত কিনা পরীক্ষা করিতে হইলে, আমরা যদি হিমিন-স্ফটিক গঠন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সহজেই উহা রক্ত কিনা জানিতে পারিব। অজ্ঞাত পদার্থটি রক্ত হইলে হিমিনের উদ্ভব সম্ভব, অন্যথা হিমিন গঠিত হইবে না। পুরাতন রক্ত পরীক্ষা করিতে হইলে পরীক্ষার পূর্ব্বে একখণ্ড অমিশ্রিত লবণ (sodium chloride) রক্তে মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু নূতন রক্তের বেলা এই সকল কিছুই প্রয়োজন হয় না।

কোনও লালবর্ণ পদার্থ রক্ত কিনা স্থির করিবার পর স্বতঃই জানিবার ইচ্ছা হয়, অন্য রক্ত হইতে মানব-রক্তের পার্থক্য নির্দ্ধারণের কোনও উপায় আছে কি না। দেখা গিয়াছে যে, কোনও জীববিশেষের শরীর হইতে রক্তাম্বু লইয়া অপর কোন জীবের দেহে সঞ্চালিত করিয়া দিলে, শেষোক্ত জীবদেহে উহা বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। কিন্তু দ্বিতীয় জীবটির শরীরের রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথম জীবের রক্তাম্বুর বিষক্রিয়ার ফলে উহার দেহে এক প্রকার প্রতিষেধক পদার্থের (anti-toxin) সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রতিষেধকের প্রধান গুণ এই যে, ইহা প্রথমোক্ত জীবের রক্তাম্বুর সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা অধঃপাতিত (precipitated) হয়। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত জীবের প্রতিষেধক-সম্পন্ন রক্তাম্বু প্রথম ব্যতীত অন্য জাতীয় জীবের রক্তাম্বুর উপর কোন রূপ ক্রিয়া প্রদর্শন করে না। কাজেই, মানবশরীরের রক্তাম্বু লইয়া কোনও একটি জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, এই জীবশরীরে এমন এক প্রতিষেধক পাওয়া যাইবে, যাহা কেবল মানব রক্তাম্বুর (human serum) সহিত মিশাইলেই উহাকে অধঃপাতিত করিতে পারে। এইরূপে এই জীবের রক্তাম্বুর সাহায্যে আমরা সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি, কোনও রক্ত মানবরক্ত কি না। কারণ, অধঃপাতন ঘটিলে নির্দ্ধারিত হইবে উহা মানবরক্ত, অন্যথা মানবরক্ত নহে।

<u>হিমগ্লবিন পরিমাপক যন্ত্র</u>—(Hæmoglobinometer)—কোনও কোনও রোগে শরীরস্থ রক্তে হিমগ্লবিনের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়া রোগীকে বিশেষরূপে নির্জীব ও বিবর্ণ করিয়া ফেলে। এই সকল ক্ষেত্রে রোগীর রক্তে হিমগ্লবিনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত উপায়ে এই কার্য্য সাধিত হয়ঃ—

এই পরিমাপক যন্ত্রের দুইটি আধার (test-tube) আছে; তাহার মধ্যে একটির মুখ বন্ধ, অপরটির খোলা। এই বন্ধমুখ আধারটিতে কার্ব্বন-মনক্সাইড-হিমগ্লবিন জলের সহিত মিশাইয়া এমন একটি বিশিষ্ট রং তৈয়ারী করা আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া পরীক্ষেয় রক্তে হিমগ্লবিনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা যায়। কার্ব্বন-মনক্সাইড-হিমগ্লবিন দিয়া রং করিবার কারণ এই যে, ইহা অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। একটি কৈশিক নলের সাহায্যে ২০ ঘন মিলিমিটার রক্ত লইয়া (নলের গায়ে দাগ আছে) উক্ত মুখখোলা আধারে রাখিয়া উহার মধ্যে কয়লার বাষ্প (coal gas) সঞ্চালিত করিলে রক্তমধ্যস্থ সমস্ত হিমগ্লবিন কার্ব্বন-মনক্সাইড-হিমগ্লবিনে পরিণত হয়। এইবার, যন্ত্রের সহিত রক্ষিত অপর একটি শিশি হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল এই পরীক্ষেয় রক্তের সহিত মিশান হয়। দ্বিতীয় আধারের গায়ে এমনভাবে রেখা অঙ্কিত আছে যে, জল দিয়া আয়তন বাড়াইলে যে ক্রমাঙ্কচিহ্ন পর্য্যন্ত আসিয়া উভয় পাত্রস্থ বস্তুর রং একই প্রকার গাঢ় হয়, শতকরা তত (সংখ্যক) ভাগ হিমগ্লবিন দ্বিতীয় আধারের রক্তে আছে। যেমন; জল মিশাইয়া উভয়ের রং একই
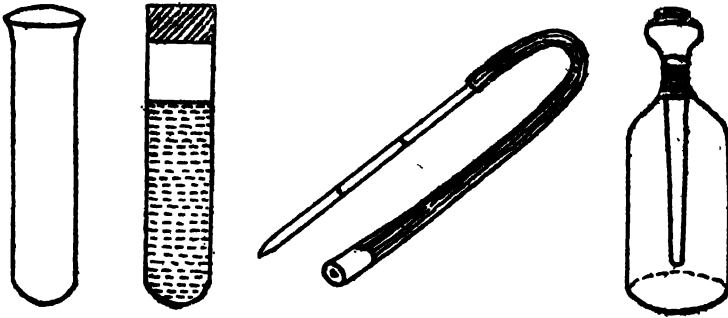
চিত্র—২

রক্ত-লোহিত-পরিমাপক যন্ত্র

রকম করিয়া দেখা গেল যে, দ্বিতীয় আধারটিতে মিশ্রিত পদার্থ ৭০ রেখা পর্য্যন্ত আসিয়াছে; বুঝিতে হইবে, পরীক্ষেয় রক্তে শতকরা ৭০ ভাগ হিমগ্লবিন আছে। সেই মত ১০০ রেখা বা তদূর্দ্ধে উঠিলে বুঝিতে হইবে, রক্ত যথোচিত বা অধিক হিমগ্লবিন-সম্পন্ন।

রক্তকণিকার জন্মেতিহাস:—জরায়ুমধ্যস্থিত শিশুর (intra-uterine life) শরীরের এক বিশিষ্ট অংশে (vascular area) কতকগুলি শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন, নাভিযুক্ত বড় বড় কোষ (angioblasts) দেখা যায়। কালে ঐ নাভি (nucleus) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতিখণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ জীববস্তুর (protoplasm) মধ্যে এক প্রকার রং (হিমগ্লবিন) জন্মে। ক্রমে কোষসমূহের শাখা সকল ফাঁপা হইয়া উঠে এবং আদি-ধমনীরূপে কার্য্য করে। এইরূপে রক্তকণিকা এবং নালির (red corpuscles and vessels) জন্ম হয়। প্রথম অবস্থায় রক্তকণিকাগুলি নাভিসম্পন্ন থাকে; কিন্তু শিশুদেহের পূর্ণতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-

কণিকা হইতে উহারা তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার রক্তকণিকাতে নাভি থাকে না। প্রথমে কোনও একটি বিশিষ্ট স্থানে কণিকার জন্ম হইলেও জরায়ু জীবনের শেষভাগে দেখা যায় যে, যকৃৎ, প্লীহা এবং অন্যান্য স্থানেও এই সকল নাভিযুক্ত কোষ বিদ্যমান। জন্ম গ্রহণের পরে লাল অস্থিমজ্জাই (red bone-marrow) প্রধানতঃ রক্তকণিকার জন্মদাতার কার্য্য করে।

রক্তকণিকা সাধারণতঃ নাভিশূন্য হইলেও অত্যধিক রক্তপাতের পর রক্তমধ্যে নাভিযুক্ত কণিকাও দেখিতে পাওয়া সম্ভব। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বশতঃ পরিপূর্ণতা লাভের পূর্ব্বেই মজ্জামধ্যস্থ কণিকাসকল রক্তস্রোতে আসিয়া পড়িয়াছে।

হিমগ্লবিনের সাহায্যে ফুস্‌ফুসের বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প লইয়া শরীরস্থ কোষসমূহে তাহা ছড়াইয়া দিয়া কোষের পুষ্টিসাধন করাই রক্তকণিকার প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল কোষ হইতে দগ্ধাঙ্গারক নামক বিষ বাষ্পের নির্গমনে (excretion) সাহায্য করাও রক্ত-কণিকার অপর এক কার্য্য।

সাধারণ জীবনে প্রতিনিয়তই অসংখ্য নূতন রক্তকণিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং পুরাতন কণিকাসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। প্লীহার অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করিলে আমরা বহু ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন রক্তকণিকা দেখিতে পাই। কিন্তু প্লীহাতেই এই ধ্বংসকার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন হয় না। এই সকল ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন কণিকা রক্তস্রোতে চালিত হইয়া যকৃতে আসিয়া আশ্রয় লয়। যকৃতের কার্য্যকারিতার গুণে হিমগ্লবিন হিমাটিন ও গ্লবিন নামক আদি উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর লৌহযুক্ত হিমাটিন হইতে লৌহ পৃথক হইয়া পড়ে; এই লৌহ পুনরায় অস্থিমধ্যস্থ মজ্জায় সঞ্চালিত হইয়া নূতন রক্তকণিকা গঠনে সহায়তা করে।

<u>বর্ণবিহীন কণিকার জন্মেতিহাস</u>:—বর্ণবিহীন কণিকার জন্ম এবং জীবন ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা ইহার প্রকারভেদের বিষয় কিছু বলিব। কারণ, বর্ণবিহীন সকল কণিকা সমান নহে।

(১) লসিকা কণিকা (lymphocytes)। ইহারা সাধারণতঃ নিতান্ত ক্ষুদ্র, রক্তকণিকা হইতে আয়তনে সামান্য বড় হইতে পারে। কিন্তু কোষাভ্যন্তরস্থ নাভি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং গোল আকারের। জীববস্তুর কোন দানা-বাঁধা রূপ (granulated appearance) নাই। সংখ্যায় ইহারা শতকরা ২৫ ভাগ থাকে।

(২) বৃহৎ একনাভিযুক্ত কণিকা (large mononuclear)। এই শ্রেণীর কণিকার নাভি সাধারণতঃ ডিম্বাকার; এখানেও জীববস্তু দানা-বাঁধা নহে। ইহারা শতকরা ১ ভাগ।

(৩) অবস্থান্তরিত কণিকা (transitional)। এই প্রকারের বর্ণবিহীন কণিকাগুলির মধ্যে অখণ্ড ডিম্বাকার নাভি হইতে খণ্ড খণ্ড পরস্পরসংযুক্ত নাভি পর্য্যন্ত, নানা প্রকার রূপ নয়নগোচর হয়। ইহাতে জীববস্তু অল্প দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা শতকরা ২-৪ ভাগ মাত্র।

(৪) একাধিক নাভিযুক্ত বর্ণবিহীন কণিকা (polynuclear leucocytes)। এ'ক্ষেত্রে নাভির সংখ্যা একাধিক ; সাধারণতঃ তিনটি ; এবং তাহারা ক্রোম্যাটিন (Chromatin) নামক একপ্রকার তন্তুদ্বারা পরস্পরযুক্ত। জীববস্তু দানা-বাঁধা। ইহারা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা ৭০ ভাগ।

(৫) লাল চিহ্নিত কণিকা (eosinophiles)—এখানেও নাভির সংখ্যা প্রায়ই একাধিক ; কিন্তু ইহারা একাধিক নাভিযুক্ত কণিকা (polynuclear) অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর। জীব-বস্তুতে বেশ বড় বড় দানা পাওয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত কণিকার সহিত ইহাদের গভীর রাসায়নিক প্রভেদ বর্ত্তমান।

(৬) মাষ্ট্ সেল (mast cell)। এই প্রকারের কণিকাগুলিতে নাভিসংখ্যা একটি ; জীববস্তু দানা-বাঁধা। ইহারা সাধারণতঃ সুস্থ রক্তে থাকে না। ইহাদের সংখ্যা শতকরা ½ ভাগ।

বর্ণবিহীন কণিকার উদ্ভববিষয়ে দুইটি মত বিদ্যমান :—

(ক) অদ্বৈত মত (unitarian theory)। এই মত অনুসারে সকল বর্ণবিহীন কণিকাই যকৃৎ, প্লীহা, লসিকাগণ্ড (lymph gland) ও লসিকা কণিকাকলা (lymphoid tissue) হইতে জন্মগ্রহণ করে।

চিত্র—৩

বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবিহীন কণিকা

১। লসিকা কণিকা ; ২। বৃহৎ একনাভিযুক্ত বর্ণবিহীন কণিকা ;
৩। অবস্থান্তরিত কণিকা ; ৪। একাধিক নাভিযুক্ত
বর্ণবিহীন কণিকা ; ৫। লালচিহ্নিত কণিকা

(খ) দ্বৈতমত (dualistic theory)। দ্বৈতবাদীরা বলেন, লসিকাকলায় কেবল লসিকা জন্মে। অন্যান্য বর্ণবিহীন কণিকা জন্মে অস্থিমধ্যস্থ মজ্জার মায়েলোসাইট (myelocytes) নামক কোষ হইতে।

বর্ণবিহীন কণিকার একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা নড়িতে চড়িতে পারে। ইহাদের গতির একটি বিশিষ্টতা আছে ; তাহাকে পরিবর্ত্তাকার ভ্রমণ (amœboid movement) বলে। সেইজন্য ধমনীর ভিতর দিয়া চলাচল করিবার কালে ইহারা অতি স্বচ্ছন্দেই ধমনী

প্রাচীর (wall) ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে। ইহাতে ফল এই হয় যে, কোনও বিষাক্ত জীবাণু আমাদের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বর্ণবিহীন কণিকার দল এই গতি বলে তাহাদের সন্নিহিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, এবং স্বশরীরস্থ জীবাণুনাশক (bacteriolysin) এক প্রকার রস সাহায্যে তাহাদের বিনাশ সাধন করে। পরে সেই জীবাণুর মৃতদেহ ইহাদের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি শক্তির অভাব বশতঃ ইহারাই জীবাণু কর্তৃক বিনষ্ট হয়, তখন আমাদের দেহে নানারোগের সঞ্চার হয়। যে সকল বর্ণবিহীন কণিকা জীবাণু আহার করে, তাহাদিগকে বলে ফ্যাগোসাইট্‌স্ (Phagocytes), এবং এই আহার-ক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস্ (Phagocytosis)।

উপরোক্ত গুণ ব্যতীত বর্ণহীন কণিকাগুলির অন্যান্য উপকারিতাও আছে। রক্তপাতের (hæmorrhage) সময় বর্ণবিহীন কণিকাই রক্ত জমাট বাঁধাইয়া স্রোত বন্ধ করে। খাদ্যনালি হইতে প্রতিদ ও স্নেহ পদার্থ গ্রহণ (absorption) কালেও ইহারা অনেক কাজে আসে।

বর্ণবিহীন কণিকাগুলিও কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে ধ্বংসোন্মুখ নানা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্ত মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার জন্মবিবরণ :—(ক) একাধিক নাভিযুক্ত বর্ণবিহীন কণিকা-সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর নাভিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণারূপে (blood-platelets) দেহমধ্যে থাকিয়া যায়।

(খ) অপরিণত রক্তকণিকা যখন পরিণতি লাভ করিয়া নাভি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই নাভিগুলি কণারূপেই রক্তস্রোতে বর্ত্তমান থাকে।

(গ) অস্থিমধ্যস্থ মজ্জার ভিতর একপ্রকার বিশালকায় কোষ আছে; তাহাদিগের নাম দানব কোষ (giant-cell)। এই সকল কোষ হইতে নাভির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অল্প জীব-বস্তু সংলগ্ন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পরে কণার জন্মদান করে।

(ঘ) কাহারও কাহারও মতে নাভির প্রতিদ ভাগ অধঃপাতিত হইয়া ক্ষুদ্র কণার সৃষ্টি করে।

ইহাদিগের চরম গতির (fate) বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে দেখা গিয়াছে, রক্ত জমাট বাঁধিবার সময় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা খুব কাজে আসে। হিমফিলিয়া (Hæmophilia) নামক একপ্রকার রোগে রক্তের জমাট-বাঁধিবার-শক্তি নিতান্ত কমিয়া যায়, তখন সেই রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সংখ্যা সুস্থ রক্তের তুলনায় নিতান্ত কম।

রক্তের জমাট বাঁধা (Coagulation) :—বাস্তবিক, রক্ত যতক্ষণ শরীরাভ্যন্তরে যথাস্থানে আছে, ততক্ষণ কোনও গোল নাই; কিন্তু বাহিরে আসিলেই যে অচিরে জমাট বাঁধিয়া যায়, এ সত্য আমাদের নিতান্ত পরিচিত হইলেও, বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রথমে রক্তের জমাট-বাঁধার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া পরে আমরা এই রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব।

যখনই কোনও স্থানে রক্তপাত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, বহির্নির্গত রক্ত ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠে এবং শেষে একপ্রকার আঁটালো পদার্থে পরিণত হয়; সেই আঁটালো বস্তু (jelly) হইতে ফিকা হলুদবর্ণ (straw-coloured) একপ্রকার তরল পদার্থ বাহির হইয়া আসে। ইহাকে রক্তাম্বু (serum) বলে। আঁটালো জিনিষটির যে কোন একটি অংশ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, একপ্রকার সূক্ষ্ম তন্তুজাল ইহার সমগ্র দেহে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; রক্তকণিকাগুলি তন্মধ্যে আবদ্ধ। ইহাই রক্তের জমাট-বাঁধা। আবার রক্তাম্বু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, রক্তরসের সমস্ত উপাদান ইহাতে বর্ত্তমান, কেবল তিনপ্রকার প্রতিদের (ফাইব্রিণোজেন, সিরাম গ্লবিউলিন, সিরাম এ্যালবুমিন) মধ্যে প্রথমোক্তটি নাই। আর আঁটালো পদার্থটির তন্তুজাল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা ফাইব্রিণ নামক একপ্রকার প্রতিদ পদার্থে গঠিত। কাজেই বোঝা যায়, রক্তের রসভাগই (plasma) রক্তাম্বুর (serum) উদ্ভবের হেতু, মাত্র ফাইব্রিণোজেন-অংশ ফাইব্রিণে পরিণত হইয়া কণিকাগুলিকে আবদ্ধ করতঃ আঁটালো জিনিষটির সৃষ্টি করে। নিম্নে প্রদর্শিত বিভাগ-তালিকা হইতে রক্তরস, রক্তাম্বু ও আঁটালো বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক সহজেই প্রতিভাত হইবে।

রক্ত { রক্তরস { রক্তাম্বু; ফাইব্রিণোজেন }; কণিকা } আঁটালো পদার্থ; ফাইব্রিণোজেন ফাইব্রিণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখন, পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কি উপায়ে ফাইব্রিণোজেন ফাইব্রিণে পরিণত হয়। কোন কারণে রক্তপাত হইলে, রক্ত মধ্যে থ্রম্বিন নামক এক প্রকার পদার্থ জন্মে। এই থ্রম্বিনের কার্য্যকারিতার ফলেই উক্ত পরিবর্ত্তন সম্ভব। কিন্তু প্রবহমান রক্তমধ্যে অধিক পরিমাণে থ্রম্বিন বর্ত্তমান থাকে না। রক্তপাতকালে বর্ণবিহীন কণিকাসকল এবং রক্তস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এই ধ্বংসের ফলে একপ্রকার পদার্থ জন্মগ্রহণ করে, উহার নাম থ্রম্বোজেন বা প্রোথ্রম্বিন (thrombogen or prothrombin)। এই প্রোথ্রম্বিন ক্রমে থ্রম্বিনে পরিণত হয়। অনুসন্ধানে নির্ণীত হইয়াছে, ফাইব্রিণোজেনের ফাইব্রিণে পরিণতির জন্য যেমন থ্রম্বিন নামক পদার্থ আবশ্যক হয়, সেইরূপ প্রোথ্রম্বিনের থ্রম্বিনে পরিণত হইতে হইলে দ্রবণীয় খটিক লবণ (soluble calcium salt) ও থ্রম্বোকাইনেস (thrombo-kinase) নামক পদার্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং শেষের দিক হইতে দেখিতে গেলে, থ্রম্বোকাইনেস ও দ্রবণীয় খটিক লবণের উপস্থিতি হেতু কণা এবং বর্ণবিহীন কণিকা হইতে উদ্ভূত প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিনে পরিণত হয়; এবং থ্রম্বিন ও ফাইব্রিণোজেনের সংযোগ ফলে জন্মে ফাইব্রিণ। থ্রম্বোকাইনেসও বর্ণবিহীন কণিকা, এবং ক্ষুদ্রকণার বিশ্লেষণ (disin-tigration) ফলে আবির্ভূত হয়। কিন্তু উহাই থ্রম্বোকাইনেস-উদ্ভবের একমাত্র কারণ নহে। শরীরের অন্যান্য স্থলেও থ্রম্বোকাইনেস আছে। আহত দেহকোষের (injured tissue-cells) সম্পর্কে আসিলে তত্রস্থ রক্ত থ্রম্বোকাইনেসের প্রভাবেই জমাট বাঁধে।

এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ ভাবে রক্তের জমাট-বাঁধিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু শরীরতত্ত্বজ্ঞগণের এ'বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। আজও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হয় নাই; এবং কোন একটি মতও সর্ব্বজনগ্রাহ্য নহে। যাহা হউক, আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য দু'একটি মতের আলোচনা করিয়া এ বিষয় শেষ করিব।

হাউয়েলের মত (Howell's Theory) :—উপরে যে মতের আলোচনা করিয়াছি, উহা মোরাউইজের (Morawitz) মত বলিয়া পরিচিত। হাউয়েল এই মতের বিরোধী। তিনি বলেন, প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করিতে দ্রবণীয় খটিক লবণই যথেষ্ট। তাঁহার মতে, সুস্থ শরীরে এ্যান্টিথ্রম্বিন (anti-thrombin) নামক একপ্রকার পদার্থ আছে। অধিকন্তু, খটিক লবণ ও প্রোথ্রম্বিনেরও অভাব নাই। কিন্তু তবু যে শরীরাভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে, এ্যান্টিথ্রম্বিন সমস্ত খটিক লবণকে সংযুক্ত করিয়া রাখে; কাজেই সহজ অবস্থায় প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করিতে যতটা খটিকের প্রয়োজন, তাহার অসদ্ভাব ঘটে। কিন্তু যখন রক্তপাত হয়, তখন বর্ণবিহীন কণিকা, ক্ষুদ্র কণা এবং আহত দেহকোষ হইতে উদ্ভূত থ্রম্বোকাইনেস এ্যান্টিথ্রম্বিনের শক্তির প্রতিরোধ করে (neutralises)। সুতরাং খটিক আর তখন আবদ্ধ থাকে না, এবং উহার মুক্তি লাভের ফলে প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিনে, ও তৎসহযোগে ফাইব্রিণোজেন ফাইব্রিণে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যায়, থ্রম্বোকাইনেসের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করেন না। তবে মোরা-উইজ বলেন, থ্রম্বোকাইনেস ও দ্রবণীয় খটিক লবণ বিদ্যমান থাকাতেই প্রোথ্রম্বিন থ্রম্বিনে পরিণত হয়; আর হাউয়েল বলেন, থ্রম্বোকাইনেস এ্যান্টিথ্রম্বিনের শক্তি প্রতিরোধ করিলে, কেবল দ্রবণীয় খটিক লবণের উপস্থিতির জন্যই উপরোক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

হেক্‌মার মত (Hekma's Theory) :—শরীরাভ্যন্তরে কিছু পরিমাণ থ্রম্বিন প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যায়, ধমনীর অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না। কাজেই হেক্‌মা প্রভৃতি কয়েকজন শরীর-তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বোধ হয় থ্রম্বিন, প্রোথ্রম্বিন ইত্যাদি সকল কিছুই মিথ্যা, ভিত্তিহীন। তাঁহাদের মতে, ফাইব্রিণোজেন যে ফাইব্রিণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা একেবারেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (chemical change) নহে; কেবল গঠনগত, স্থূল পরিবর্ত্তন মাত্র (physical change)। সান্দ্র পদার্থসমূহের (colloids) বিশেষত্ব এই যে, তাহারা যে সকল আদিকণা (aggregates) দ্বারা গঠিত, সহজেই তাহাদের আকারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। যেমন, গরম জলে খানিক জিলাটিন (gelatin) গলান হইলে ক্ষুদ্র কণাগুলি যে আয়তনের থাকে, জল শীতল হওয়ার সহিত তাহাদের আকার বৃহত্তর হয় এবং তরল পদার্থ ক্রমেই ঘনতর হইয়া উঠে। হেক্‌মা বলেন যে, ফাইব্রিণো-জেনের পরিবর্ত্তন এই রূপেই ঘটে। কিন্তু জিলাটিনের বেলায় যেমন উত্তাপের তারতম্যে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, রক্তের বেলায় সেরূপ হয় না, তখন সেই কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে রক্তের

বাহ্যতান চাপ (surface tension)। যতদিন রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হয়, এই চাপের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না বলিয়াই রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় না। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, তৈলাক্ত নলের সাহায্যে তৈলাক্ত আধারমধ্যে ধমনী হইতে যদি অল্প একটু রক্ত লওয়া হয়, তাহা হইলে তৈলের প্রভাব হেতু বাহ্যতান চাপের বিশেষ ব্যাঘাত না ঘটাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই রক্ত জমাট বাঁধে না। অবশ্য এই মতবাদ দ্বারা সকল ব্যাপার বিশদীকৃত না হইলেও, অনেকেই আশা করেন, সত্বরই এই বিষয়ে আরও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসেই সকল বিবাদ, সকল সন্দেহের নিষ্পত্তি করিতে পারা যাইবে।

এইবার আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিব, কেন রক্ত যে পর্য্যন্ত ধমনীতে থাকে, সাধারণতঃ জমাট বাঁধিয়া যায় না। অবশ্য কখনও যে এমন দুর্ঘটনা ঘটে না, এমন নহে; কিন্তু উহা নিতান্তই অসাধারণ ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুস্থ অবস্থায় শরীরাভ্যন্তরে রক্তকণিকা ও বর্ণবিহীন কণিকাসকল আপন আপন কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই থ্রম্বোকাইনেস ও প্রোথ্রম্বিনের উদ্ভব হয়। আবার, রক্তে খটিক ও ফাইব্রিণোজেনেরও অপ্রতুল নাই। কিন্তু মোরাউইজ বলেন, রক্তস্রোতে এত অল্প পরিমাণ থ্রম্বোকাইনেস বর্ত্তমান যে, তদ্দ্বারা কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তবে আঘাতজনিত রক্তপাতের সময় আহত কোষ হইতে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ থ্রম্বোকাইনেস পাওয়া গিয়া থাকে। হাউয়েলও অনেকটা এই কথাই বলেন। তিনি মনে করেন, সাধারণ অবস্থায় শরীরে থ্রম্বোকাইনেস অতি অল্প, কাজেই তাহার দ্বারা এ্যান্টিথ্রম্বিনের শক্তির প্রতিরোধ অসম্ভব। কিন্তু আহত কোষের সংস্পর্শে থ্রম্বোকাইনেস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং রক্তও তখন জমাট বাঁধিতে পারে।

নিম্নলিখিত অবস্থায় রক্ত ধমনীমধ্যেই জমাট বাঁধিয়া যাইতে পারে :—

(১) যদি কোন কারণে রক্তনালির প্রাচীর (vessel wall) আহত (injured) হয়, তাহা হইলে অভ্যন্তরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইতে পারে।

(২) রক্তস্রোতে অল্প পরিমাণে বায়ু বা কোন জীবাণু বা অন্য কোন বিজাতীয় পদার্থ (foreign substance) উপস্থিত হইলেও, এই ঘটনা ঘটিতে পারে।

(৩) অধিক পরিমাণে কোষনির্য্যাস (tissue-extracts) শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, নালির মধ্যেই রক্ত জমাট বাঁধে।

(৪) নিউক্লিও-প্রতিদ (nucleo-protein) নামক একপ্রকার পদার্থ যদি রক্তস্রোতে মিশাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়।

সচরাচর রক্তপাত হইবার পর, তিন মিনিট হইতে দশ মিনিটের মধ্যে উহা জমাট বাঁধে। কিন্তু নানা উপায়ে, এই সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে রক্ত অতি সত্বরই জমাট বাঁধিতে পারে, নিম্নে সেই সকল বিবৃত হইল।

(ক) নিঃসৃত রক্তের তাপমাত্রা (temperature) ৩৭০ফ (370F) অপেক্ষা অধিক করিলে রক্ত শীঘ্র জমাট বাঁধে।

(খ) একটি কাঠি (stirrer) লইয়া অবিরত রক্তটুকুকে নাড়িতে থাকিলে জমাট বাঁধিতে মোটে বিলম্ব হয় না।

(গ) কোনও বিজাতীয় বস্তুর সংস্পর্শ মাত্রই রক্ত জমাট বাঁধে।

(ঘ) দ্রবণীয় খটিক লবণও উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত।

(ঙ) রক্তাম্বু, ফাইব্রিণ কিম্বা কোষনির্য্যাস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেও এই পরিবর্ত্তন শীঘ্র সাধিত হয়।

প্রয়োজনমত যেমন নানা উপায়ে রক্তকে শীঘ্র জমাট বাঁধানো দরকার হইয়া পড়ে, তেমনি তাহার বিপরীত কার্য্যও কখন কখন আবশ্যক হয়।

(১) নিঃসৃত রক্ত অত্যধিক পরিমাণে সর্জ ও হরিতজাত বা মগ্নক ও গন্ধকজাত লবণ বিশেষের (Sodium chloride or Magnesium sulphate) সহিত মিশাইতে পারিলে, তাহাকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

(২) দ্রবণীয় টক পালং প্রভৃতির দ্রাবকজাত লবণ (soluble oxalate) বা বীজপূরাম্লজাত লবণ (soluble citrate) যোগ করিলেও রক্ত আর কোন মতে জমাট বাঁধিতে পারে না।

(৩) তাপমাত্রা 0° ডিগ্রিরও নীচে নামাইয়া দিলে, রক্ত জমাট বাঁধে না।

(৪) তৈল বা চর্ব্বি বা ঐ জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে রক্তের জমাট বাঁধিতে দেরী হয়।

(৫) কোনও প্রাণীর জীবন্ত অবস্থায় যদি তাহার শরীরে খানিক বাজারের পেপটোন (commercial peptone) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার রক্ত সহজে জমাট বাঁধিবে না। কিন্তু নিঃসৃত রক্তে পেপটোন যোগ করিলে সে'রূপ ঘটে না। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষভাবে পেপটোনের রক্তসংযোগে এই বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন ঘটাইবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু শরীরে প্রবেশের পর যকৃতস্থ কোষের (Liver cell) সংস্পর্শে আসিয়া প্রচুর এ্যান্টিথ্রম্বিনের সৃষ্টি করে এবং সেই জন্য রক্তের জমাট বাঁধিতে দেরী হয়।

(৬) জোঁকের নির্য্যাস (leech-extract) যোগেও রক্তের জমাট বাঁধিতে বেশী সময় লাগে।

(৭) জীবন্ত ধমনীর প্রাচীরের (living vascular wall) সহিত সংস্পর্শ রাখিলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না।

(৮) অল্প পরিমাণে সর্পবিষ (snake-venom) কিম্বা জীবাণু ঘটিত বিষ (bacterial-toxin) শরীরে প্রবেশ করাইবার পর রক্তপাত ঘটিলে, সে রক্ত দেরীতে জমাট বাঁধে।

রক্তের শরীররক্ষার ক্ষমতা (Protective mechanism) :—প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই নিয়ত জীবাণুর বিষক্রিয়ার প্রকোপে পড়িতেছে; পানাহারে, নিঃশ্বাস গ্রহণ সময়ে আমরা প্রতি-

দণ্ডে যে কত অসংখ্য জীবাণু শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিতেছি, তাহার আর ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে অবিরতই রোগভোগ করি, এমন নহে। ইহার কারণ এই যে, আমাদের শরীরে এই সকল জীবাণুর বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক এমন কিছু আছে, বা প্রয়োজন হইলে আবির্ভূত হয়, যাহাদের শক্তিপ্রভাবে আমরা রোগের হাত হইতে উদ্ধার পাই। কিন্তু জীবাণুর বিষক্রিয়া প্রতিষেধকের শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইলে আমরা জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হই।

জীবাণুর বিষক্রিয়াপ্রতিষেধক শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—(ক) স্বাভাবিক, ও (খ) আয়ত্তীকৃত (natural and acquired) নির্ব্বিষতা।

(ক) স্বাভাবিক—জীবজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সকল রোগ সকল জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কুকুরের কিংবা ছাগলের কখনও টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis) হয় না। আবার ইতর শ্রেণীর ভিতরেও এমন কয়েকটি রোগ আছে, যাহা মানবশরীর আক্রমণ করে না। ইহাকে স্বাভাবিক নির্ব্বিষতা বলা হয়।

(খ) গঠিত—স্বাভাবিক উপায় ব্যতীত যদি অন্য কোনও উপায়ে জীব আপনাকে এমন-ভাবে গঠন করিতে পারে, যাহাতে কোন একটি বিশেষ রোগ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহাকে বলে গঠিত নির্ব্বিষতা। গঠিত নির্ব্বিষতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) স্বকীয় এবং (২) পরকীয় (active and passive)।

(১) স্বকীয় গঠিত (active acquired) :—লোকের একবার বসন্ত হইলে, সাধারণতঃ (ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়) তাহার জীবনে আর ঐ রোগ হয় না। ইহার কারণ এই যে, বসন্তের বিষক্রিয়ার ফলে তাহার শরীরে এক প্রকার প্রতিষেধকের (anti-toxin) আবির্ভাব হয়, এবং ইহার উপস্থিতির জন্যই বসন্তের বিষ আর তাহার শরীরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বিনা চেষ্টাতেই শরীরে প্রতিষেধকের জন্ম হয় বলিয়া তাহাকে স্বকীয় বলে।

অপর এক উপায়েও স্বকীয় গঠিত নির্ব্বিষতা লাভ করা যায়। একটি ঘোটক-শরীরে বেশী পরিমাণে ডিপ্‌থিরিয়া (Dyptheria) বা অন্য কোনও জীবাণুঘটিত বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অশ্বটির মৃত্যু হয়। কিন্তু বিষের পরিমাণ অল্প হইলে, ঘোটকটির মৃত্যু হয় না। পরন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া ঐ অশ্বদেহকে এমন শক্তিশালী করা যায় যে, প্রথম অবস্থায় যে পরিমাণ বিষে সুনিশ্চয় জীবটির প্রাণবিয়োগ ঘটিত, এখন সেই পরিমাণ, এমন কি ততোঽধিক দিলেও অশ্বের কোনও ক্ষতি হয় না। ইহাও পূর্ব্বোক্ত কারণেই ঘটে, অর্থাৎ, অল্প পরিমাণ বিষের ফলে অশ্বের শরীরে একপ্রকার প্রতিষেধকের উদ্ভব হয়। ক্রমে উহার পরিমাণও বাড়িতে থাকে ; সুতরাং অধিক বিষেও আর কোন ক্ষতি হয় না।

পরকীয় গঠিত (passive acquired) :—যদি কোন জীবশরীরের প্রতিবিষ আমরা

সেই জাতীয় অপর এক জীবের বিষাক্ত দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিই, তাহা হইলে উহার কোনও অনিষ্ট হয় না। বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে, রুগ্ন জীব স্বশরীরে প্রতিবিষের সৃষ্টি না করিয়া, অপর শরীরজাত প্রতিবিষ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ইহাকে পরকীয় গঠিত বলে।

শুধু যে জীবাণুঘটিত বিষ শরীরে প্রবেশ করিলেই প্রতিষেধক বিষের আবির্ভাব হয়, এমন নহে। অন্যান্য নানা দ্রব্য রক্তপ্রবাহের মধ্যে উপস্থিত হইলেও প্রতিরোধক (anti-bodies) পদার্থ সকল উদ্ভূত হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে ইহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে এ্যান্টিজেন (antigen) বলে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কোথাও কোন বিশেষ পদার্থ (agglutinin) সাহায্যে জীবাণুসকলকে গতিহীন ও একত্রিত করিয়া (agglutinating), কোথাও বা জীবাণুদিগকে কোনও বিশেষ উপায়ে আহারোপযোগী করিয়া, (action of opsonin), কোথাও বা প্রতিষেধক দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া, এই এ্যান্টিজেন জীবশরীরকে নানাবিধ বিষক্রিয়া হইতে নানা উপায়ে রক্ষা করে।

বর্ণবিহীন কণিকাসকল যে জীবাণুকে আক্রমণ ও সংহার করিয়া (bacteriolysin) পরে তাহাদিগকে ভোজন (phagocytosis) করে, সে'কথা আমরা পূর্ব্বে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

<u>রক্তপ্রবাহ</u> (Circulation) :—সাধারণ ভাবে রক্তের উপাদান, ধর্ম্ম, কার্য্যকারিতা ইত্যাদি আলোচনা করিবার পর এইবার আমরা রক্তপ্রবাহের কারণ-নির্ণয় ও পথনির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে হার্ভির (William Harvey) আবিষ্কারের পূর্ব্বে রক্তের প্রবাহ সম্বন্ধে নানা রকম অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত ছিল। তখনকার জনসমাজ বিশ্বাস করিতেন যে, কেবল শিরার (veins) ভিতর দিয়াই রক্ত চলাচল করে। কেহ বলিতেন, ধমনীর মধ্য দিয়া বায়ু, আবার কেহ বা বলিতেন, জৈবশক্তি (animal spirit) প্রবাহিত হয়। যাহা হউক, মহামতি হার্ভি নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত ধমনীপথে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় শিরাপথে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। রক্ত যে যথা-ইচ্ছা, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হয় না, নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতেই সে সত্য প্রমাণিত হয়।

(১) হৃৎপিণ্ডে এবং শিরাপথে একপ্রকার কপাট (valve) আছে ; তাহারা রক্তকে শুদ্ধ একদিকেই প্রবাহিত হইতে দেয়।

(২) জীবিতকালে জীবের ধমনী হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হয়। আর, রক্তের ঝলক ধমনীমুখ হইতে বহির্গত হয় হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চনের সমকালে। হৃৎপিণ্ডের গতিশব্দ তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

(৩) যদি হৃৎপিণ্ডের নিকটস্থ শিরাকে গ্রন্থিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অচিরেই হৃৎপিণ্ড রক্তশূন্য, বিবর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু গ্রন্থি মুক্ত করিয়া দিলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

(৪) হৃৎপিণ্ডের নিকটস্থ ধমনীপথ রুদ্ধ করিলে, রক্ত প্রবাহিত হইতে পারে না বলিয়া হৃৎপিণ্ড স্ফীত হইয়া উঠে। ধমনীপথ মুক্ত হইলে আবার রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চনজাত চাপের প্রভাবে, ধমনীর স্থিতি-স্থাপকতার (elasticity) জন্য এবং হৃৎপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ধমনী ও শিরা বাহিয়া ক্রমেই রক্তের উপর চাপ কমিয়া যাওয়ার দরুণ (decrease of pressure) শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়।

সাধারণ সুস্থদেহে হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭২ বার কুঞ্চিত (beat) হয়। রোগকালে ঐ সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে।

পরিশেষে, রক্তস্রোতের প্রবাহপথ জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলির বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। হৃৎপিণ্ডের চারিটি ভাগ আছে। দক্ষিণ ও বাম রক্তগ্রাহক আশয়, এবং দক্ষিণ ও বাম রক্তচালক আশয়। দক্ষিণগ্রাহক আশয় হইতে রক্তের প্রবাহ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সে স্থান হইতে রক্ত, দক্ষিণগ্রাহক ও দক্ষিণচালক আশয়ের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথ দিয়া শেষোক্ত স্থানে আসিয়া পড়ে। পরে পাল্মনারী ধমনী পথে (pulmonary artery) রক্ত ফুস্‌ফুসে্ যায়। এইরূপে পূর্ব্বের গ্রাহক-আশয়স্থিত অম্লজানহীন রক্ত ফুস্‌ফুসের বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করিয়া পাল্মনারী শিরা (pulmonary veins) বাহিয়া বামগ্রাহক আশয়ে আসে, এবং বামগ্রাহক ও বামচালক আশয়ের মধ্যস্থিত পথ দিয়া বামচালক আশয়ে উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে শরীরস্থ প্রধান ধমনী এ্যয়টা (aorata) উদ্ভূত। রক্ত এইবার এই প্রধান ধমনীপথ বাহিয়া নানা শাখাপ্রশাখা সাহায্যে শরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হইয়া পুনরায় শিরাপথে [মস্তক, গলদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে রক্ত ঊর্দ্ধ-ভিনাকেভা (superior venacava) পথে এবং শরীরের নিম্নভাগের রক্ত নিম্ন-ভিনাকেভা (inferior venacava) পথে] দক্ষিণগ্রাহক আশয়ে ফিরিয়া আসে।

উপরে রক্তপ্রবাহের যে সাধারণ পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জরায়ুমধ্যস্থ শিশুশরীরের গঠনপার্থক্য বশতঃ তাহাদের শরীরে রক্তপ্রবাহের পথ উহা হইতে ঈষৎ ভিন্ন।

বারান্তরে রক্তপ্রবাহের গতিবেগ (velocity), হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী ও শিরা সকলের কার্য্যকারিতা, রক্তের চাপ (blood pressure) প্রভৃতি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*

* প্রবন্ধ রচনাকালে শুভানুধ্যায়ী 'প্রকৃতি'-সম্পাদক শ্রীযুত সত্যচরণ লাহা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় পরিভাষা-সঙ্কলনে আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। লেখক

গাছের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু

প্রাকৃতিক নিয়ম

উদ্ভিদ্‌জীবনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া জানিতে হইলে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম জানা দরকার। এই সকল নিয়মানুযায়ী জলশোষণ, স্বেদন, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ও খাদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহা ছাড়া উদ্ভিদ্‌শরীরের অভ্যন্তরীণ গঠনও জানা দরকার। তাহা হইলে কোন্ অংশ কি ভাবে কার্য্য করে তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়।

উদ্ভিদ্‌শরীরের অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলিকে তরল, বাষ্পীয় ও কঠিন—তিন আকারে দেখিতে পাইলেও উহারা উদ্ভিদ্‌কোষের ভিতরে প্রবেশ করে গলিত অবস্থায় বা তরলাকারে; অন্য আকারে কোষের মধ্যে যাইতে পারে না। এই প্রবেশ কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত হয় কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা।

এখন, এই নিয়ম ও উদ্ভিদ্‌দেহের তিন বিভিন্ন আকারের বস্তু, এবং তাহাদের উপর এই নিয়মগুলির প্রভাব সম্বন্ধে এক এক করিয়া আলোচনা করা যাক।

বাষ্প—বাষ্পের কোন আকৃতি বা গঠন (shape) আমরা দেখিতে পাই না। বাষ্পের ধর্ম্ম এই যে, তাহার অণুগুলি পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ও যে আধার বা পাত্রে তাহাকে ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহার যতটা পারে পূর্ণ করিয়া রাখে। কিন্তু যদি পাত্রের আবরণ বা ঢাকনা না থাকে, বা অন্য কোন পথ মুক্ত থাকে, তাহা হইলে বাষ্প ঐ আধারে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মুক্ত পথ দিয়া বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। বাষ্পের কোন গাত্র বা বহির্দ্দেশ (free surface) নাই।

তরল পদার্থ—যে কোন গলিত পদার্থকে তরল পদার্থ বলে। জল এবং জলে গোলা বাষ্প ও কঠিন পদার্থকেও তরল পদার্থ বলা হয়। বাষ্পের অণু অপেক্ষা তরল পদার্থের অণু কম গতিশীল। তরলপদার্থ যে পাত্রে রাখা যায়, উহা সেই পাত্রানুযায়ী আকার ধারণ করে। ইহাদের উপরিভাগ আছে অর্থাৎ একটি সমতল গাত্র (free surface) আছে। তরল পদার্থ যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রে ছিদ্র না থাকিলে অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু জল, সুরা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ বাষ্পাকারে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তরল পদার্থ যে আধারে থাকে, তাহার গাত্রে একটা চাপ বা ধাক্কা দেয়।

কঠিন পদার্থ—ইহারা তরল পদার্থ অপেক্ষাও কম গতিশীল। সুতরাং ইহাদের নিজেদের একটা আকৃতি বা গঠন (shape) এবং উপরিভাগ, তলদেশ ও পার্শ্বদেশ অর্থাৎ

অনেকগুলি গাত্র বা পৃষ্ঠ (free surface) আছে। কতকগুলি কঠিন পদার্থকে (যথা, বরফ, সীসা ইত্যাদি) তরলাকারে পরিণত করিয়া বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তন করা যায়। আবার কতকগুলি (যেমন, কর্পূর) তরলাকারে পরিবর্ত্তিত না হইয়া একেবারেই বাষ্পাকারে পরিণত হয়।

ব্যাপ্তি (Diffusion)

ব্যাপ্তি কাহাকে বলে—একটি পাত্রে মুক্ত অবস্থায় যদি দুইটি বিভিন্ন বাষ্প রাখা যায়, কিম্বা তাহাদের মাঝে একটা পর্দ্দা দিয়া যদি তাহদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া যায়, আর যদি ঐ দুইটি বাষ্পের ঐ পর্দ্দার ভিতর দিয়া বাহিরে যাইবার শক্তি থাকে, অর্থাৎ পর্দ্দায় যদি ছিদ্র থাকে বা পর্দ্দাটির যদি ঐ বাষ্পগুলিকে শোষণ করিবার ক্ষমতা থাকে, বা ঐ বাষ্প, যে বস্তু দিয়া

চিত্র—১
ব্যাপ্তি

পর্দ্দা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাতে দ্রবীভূত হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ দুইটি বাষ্প পর্দ্দার ভিতর দিয়া যাইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

একটি কাচের পাত্রের মধ্যে খানিকটা মিশ্রির সরবৎ রাখিয়া ঐ সরবতের উপর একটা কাচের গ্লাসে খানিকটা জল রাখিলেও পাত্রটি ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে গ্লাস ভেদ করিয়া জল বা সরবৎ মিশিতে পারে না। কিন্তু যদি সরবতের বদলে সালফিউরিক এ্যাসিড রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, গ্লাসের জল বাষ্প হইয়া পাত্রমধ্যস্থ বাতাস ভেদ করিয়া এ্যাসিডের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। কিন্তু সালফিউরিক এ্যাসিড এত ধীরে ও এত সামান্য পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয় যে, সেই সামান্য এ্যাসিড্‌বাষ্প পাত্র মধ্যস্থ বাতাসে আটকাইয়া থাকে, বাহির হইতে পায় না; জলীয় বাষ্প কিন্তু সহজেই বাহির হইয়া

যায়। এখানে, পাত্র মধ্যস্থ বাতাস পর্দ্দার কাজ করিতেছে,—জলীয় বাষ্পকে অবাধে যাইতে দিতেছে, কিন্তু সালফিউরিক এ্যাসিডকে দিতেছে না।

এখন, জলের গ্লাসটি যদি কাচের না হইয়া এমন কোন পদার্থদ্বারা তৈয়ারী হইত, যাহা মিশ্রিকে দ্রবীভূত করিতে বা মিশ্রির সহিত মিশিতে পারে; এবং পাত্রস্থ গলিত মিশ্রির উপর, যে বস্তু দ্বারা গ্লাস নির্ম্মিত, তাহার আকর্ষণ অপেক্ষা জলের আকর্ষণ বেশী হইত, তাহা হইলে মিশ্রি গ্লাস ত্যাগ করিয়া জলের সহিত মিশিত। এখানে, গ্লাসটিই পর্দ্দার কাজ করিত।

পর্দ্দা থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন পদার্থের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া এইরূপ মিশ্রিত হওয়াকে ব্যাপ্তি বলে।

বাষ্পের ব্যাপ্তি—কোন বাষ্প জলীয় পদার্থে গলিত অবস্থায় থাকিলে যে বাষ্প যত পরিমাণে দ্রবীভূত হইবে, তাহা ঠিক সেই পরিমাণে ব্যাপ্ত হইবে। যদি কোন পর্দ্দা থাকে,
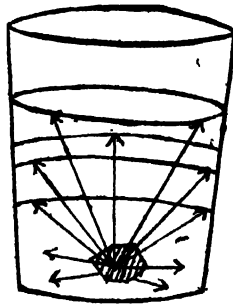
চিত্র—২
কঠিন পদার্থের দ্রবীভূত
অবস্থায় ব্যাপ্তি

তাহা হইলে যে বস্তু দিয়া সেই পর্দ্দা তৈয়ারী, সেই বস্তুটি এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে বাষ্পটি দ্রবীভূত হইতে পারে; অথবা পর্দ্দাটি জলে সিক্ত হওয়া চাই, যাহাতে এই জলে অন্ততঃ বাষ্প দ্রবীভূত হয়।

বাষ্প যদি জলীয় পদার্থে গলিত না হইয়া বাষ্পভাবেই থাকে, তাহা হইলে যে বাষ্প যত হাল্কা সেই বাষ্প তত ব্যাপ্ত হইবে; অর্থাৎ হাল্কা বাষ্প বেশী পরিমাণে ব্যাপ্ত হইবে।

কঠিন পদার্থের দ্রবীভূত অবস্থায় ব্যাপ্তি—যে সমস্ত পদার্থ জল বা সুরা (alcohol), ইথার (ether), ক্লোরোফরম (chloroform) প্রভৃতি অন্যান্য তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়, ইংরাজীতে তাহাদিগকে সলিউবল্ সাবস্‌টান্স (soluble substance) বলে; জল বা অন্য দ্রাবক বস্তুকে সল্‌ভেণ্ট (solvent) বলে, দ্রবীভূত বস্তুকে বলে সলিউট (solute)।

একটা পাত্রে জল লইয়া তাহাতে এক টুকরা মিশ্রি ফেলিয়া দিলে দেখা যায় যে,

মিশ্রির টুকরাটি গলিয়া ক্রমে সমস্ত জলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মিশ্রি গলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ জলে বেশী পরিমাণে মিশ্রি থাকে (ইহার অপেক্ষাকৃত অধিক গাঢ়তা নগ্ন চোখে দেখা যায়) ও সেই জল বেশী মিষ্টি হয়। যে জল মিশ্রির নিকট হইতে যত তফাতে, সেই জল তত কম মিষ্টি। এখানে দেখা যায় যে, মিশ্রি বেশী-ঘন স্থান হইতে কম-ঘন অংশে ব্যাপ্ত হয়। ক্রমে যখন সমস্ত জলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন জলের ঘনতা সকল অংশে সমান হইয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মিষ্টতাও সমান হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্রবীভূত পদার্থ ঘন অংশ হইতে পাতলা অংশে, এবং ক্রমে দ্রাবকবস্তুর সমস্ত অংশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

আবার, যে দ্রাবকবস্তু অন্য বস্তুকে দ্রবীভূত করে, তাহা উহার চারিদিকে অর্থাৎ সলভেন্ট সলিউটের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। এখানে, প্রথমে জল মিশ্রির টুকরার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে ও সেই জলে মিশ্রি গলিতেছে; তাই মিশ্রির নিকটস্থ জল বেশী ঘন। তাহার পর, এই ঘন অংশের নিকটস্থ জল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, ও এই ভাবে সমস্ত জলে মিশ্রি দ্রবীভূত হইতেছে।

উদ্ভিদ্‌শরীরে যে সকল বস্তু প্রবেশ করে, তাহারা গলিত অবস্থায় না থাকিলে কোষের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা বাষ্পই হউক, বা কঠিন পদার্থই হউক, প্রথমে গলিত হইয়া তরলাকারে পরিণত হয়।

জল ও তরল বস্তুর ব্যাপ্তি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দ্রবণীয় বা দ্রবীভূত পদার্থ দ্রাবক বস্তুর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। যদি দ্রবণীয় বা দ্রবীভূত বস্তু এবং দ্রাবক বস্তু উভয়ই তরল পদার্থ হয়, তাহা হইলেও তাহারা পরস্পরের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জলের সহিত জল, কিম্বা সুরা বা গ্লিসারিণ মিশ্রিত করিলে, জল সুরা বা গ্লিসারিণ জলের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইবে। আবার যদি মিশ্রির সরবতে জল মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই জল সরবতের জলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে পাতলা করে। ক্রমে জল মিশ্রির অণুগুলির চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, মিশ্রির অণুগুলিও জলের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া জলকে মিষ্টি করে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, দ্রবণীয়, দ্রবীভূত, ও দ্রাবক বস্তুর পরস্পরের উপর একটা টান বা আকর্ষণ আছে। বস্তুভেদে এই আকর্ষণের তারতম্য ঘটে। কোন্ বস্তু কতটা গলিবে, বা কোন্ দ্রাবকে গলিবে, তাহা এই আকর্ষণের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

অস্‌মসিস্ (Osmosis)—যদি দ্রবীভূত ও দ্রাবক বস্তুর মধ্যে এমন একটা পর্দ্দা থাকে, যাহার ভিতর দিয়া দ্রাবক বস্তুটি বাহির হইতে পারে, অথচ দ্রবীভূত বস্তুটি বাহির হইতে পারে না, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, দ্রাবক ও দ্রবীভূত বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ ফলে দ্রাবক দ্রবীভূত বস্তুটির দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে।

(১) পাতলা ভেড়ার চামড়া (পার্চ্চমেণ্ট) নির্ম্মিত একটা বোতলের মধ্যে মিশ্রির সরবৎ পুরিয়া সেই বোতলটি যদি বালতীর জলে ডুবাইয়া রাখা যায়;

অথবা (২) এমন একটা বস্তু দ্বারা তৈয়ারী বোতলের মধ্যে মিশ্রির সরবৎ পুরিয়া তাহা লবণাক্ত জলের মধ্যে ডুবান যায়, যাহাতে সেই বোতলের ভিতর দিয়া লবণাক্ত জল—জল ও লবণ—বাহির হইতে পারে কিন্তু মিশ্রি বাহির হইতে পারে না ;

কিম্বা (৩) যদি পর্দ্দার মধ্য দিয়া জল, লবণ ও মিশ্রির তিনটিই বাহির হইতে পারে ; এবং লবণাক্ত জল ও মিশ্রির সরবতের ঘনতা বা আপেক্ষিক গুরুত্ব ভিন্ন হয় ;

তাহা হইলে বোতলের ভিতরের বস্তু (মিশ্রি) বাহিরের জলের দিকে আসিবার চেষ্টা করিবে এবং তন্নিবন্ধন বোতলের ভিতরে মিশ্রির অণুগুলির মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে। ফলে—
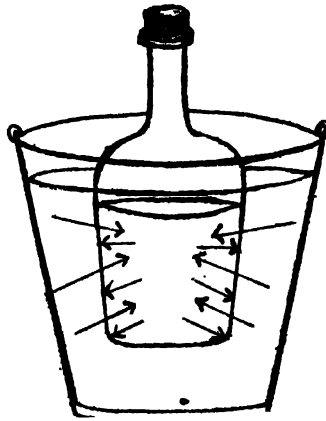
অসমসিস
চিত্র—৩

(১) জল বোতলের মধ্যে ঢুকিবে, কিন্তু মিশ্রি বোতলের বাহিরে আসিতে পারিবে না।

(২) লবণাক্ত জল বোতলের মধ্যে ঢুকিবে, কিন্তু মিশ্রি বাহিরের জলে আসিবে না।

(৩) জল বা লবণাক্ত জল (কম ঘন হইলে) বোতলের মধ্যে বেশী পরিমাণে ঢুকিবে ও মিশ্রির সরবৎ অর্থাৎ মিশ্রি কম পরিমাণে বাহিরের জলে আসিবে। উপরোক্ত কারণে বোতলের মধ্যে মিশ্রির অণুগুলি বোতলের গায়ে নিয়তই একটা চাপ দিতে থাকে। এই চাপ পর্দ্দাটিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া রাখে, তাহাতে পর্দ্দায় এমন টান পড়ে যে, বাহিরের জল ভিতরে আসিবার জন্য যদি উল্টা চাপ না দেয়, তাহা হইলে পর্দ্দাটি ছিঁড়িয়াও যাইতে পারে। একটা পর্দ্দার ভিতর দিয়া এই ভাবে বস্তুর ব্যাপ্তিকে অস্‌মসিস্ (Osomosis) বলে। দ্রবীভূত বস্তু পর্দ্দার উপর যে চাপের সৃষ্টি করে, সেই চাপকে অস্‌মটিক চাপ বা অস্‌মটিক প্রেসার (Osmotic pressure) বলে।

যে কোষে দ্রবীভূত বস্তুর ভাগ যত বেশী, বা জলের ভাগ যত কম অর্থাৎ যে কোষের রস

(sap) যত ঘন, সেই কোষের অস্‌মটিক প্রেসার বা চাপ তত বেশী। যতক্ষণ কোষের ভিতর ও বাহিরের পদার্থের ঘনতা সমান না হইবে, ততক্ষণ কম-ঘন পদার্থ বেশী-ঘন পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিবে ; ঘনতা সমান হইলে প্রবেশ বন্ধ হইবে। তখন বহির্দৃষ্টিতে অস্‌মটিক প্রেসারের লোপ হইলেও আসলে কিন্তু তখনও তাহা বর্ত্তমান থাকে।

সুতরাং দেখা গেল যে

(১) Diffusion (ডিফিউসান) প্রথায় পর্দ্দা থাকিতে অথবা না থাকিতেও পারে। পর্দ্দা থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া যে সকল বস্তু যাইতে পারে, বা যে যে বস্তুর উপর পর্দ্দার আকর্ষণ কম অর্থাৎ পর্দ্দা যাহাদের আটকাইয়া রাখে না, তাহাদের ব্যাপ্তি ঘটে। পর্দ্দা না থাকিলে সকল বস্তুরই ব্যাপ্তি হয় বেশী-ঘন অংশ হইতে কম-ঘন (পাতলা) অংশে।

(২) Osmosis (অস্‌মসিস্) প্রথায় একটি পর্দ্দা থাকা চাই-ই। এই প্রথায় পাতলা অংশ হইতে ঘন অংশে ব্যাপ্তি ঘটে ; ইহা ডিফিউসান (diffusion) প্রথার উল্টা। তেল ছাড়া প্রায় সমস্ত তরল পদার্থ এবং লবণাকারের প্রায় সকল কঠিন বস্তুই জলে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং জলের সহিত গলিত বস্তুর পরিমাণ অনুসারে জলের পরিমাণও কম বেশী হইবে। অস্‌মসিস্ প্রথায় সর্ব্বপ্রথম জল প্রবেশ করিবে, ও তারপর যে সলিউসানে জলের ভাগ যত বেশী অর্থাৎ যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব যত কম, তাহা তত বেশী পর্দ্দার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবে (অবশ্য যদি পর্দ্দা সেই বস্তুকে বাধা না দিয়া প্রবেশ করিতে দেয়)। যখন কোন বস্তুর পরিমাণ পর্দ্দার দুইদিকেই সমান হইবে, তখন উহা আর প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অস্‌মসিস্ (Osmosis) ও অস্‌মটিক প্রেসারের (Osmotic pressure) কথা বলা হইল। আরও একটি বিষয় জানা দরকার।

টারজিডিটি (Turgidity) বা জলের চাপে শক্ত হওয়া—অস্‌মসিস্ প্রথায় কোষের ভিতরে বাহিরের জল প্রবেশ করিয়া যত জমিতে থাকে, কোষ তত ফুলিয়া উঠে ও আয়তনে বাড়ে (কারণ কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম্ সঙ্কোচ-প্রসারশীল), এবং কোষভিতরে জলের একটা চাপের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে কোষটি শক্ত হয়। এইরূপ জলে ফুলিয়া আয়তনে বাড়িয়া শক্ত হওয়াকে টারজিডিটি (turgidity) বলে, এবং জলের চাপকে বলে টারগর প্রেসার (turgor pressure)।

দেখা গেল যে, কোষের মধ্যে দুই প্রকার চাপ বর্ত্তমান। একটি গলিত পদার্থের চাপ—অস্‌মটিক প্রেসার (Osmotic pressure) ; ও অপরটি জলের চাপ—টারগর প্রেসার (turgor pressure)। অস্‌মটিক প্রেসার যদিও সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, কিন্তু সকল সময়ে ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন জল প্রবেশ করে, তখনই কেবল তাহার অস্তিত্ব জানা যায়। অস্‌মটিক প্রেসারের এই ভাবের বিকাশকে 'টারগর প্রেসার' বলে। সুতরাং টারগর প্রেসার অস্‌মটিক প্রেসারের দাস, অর্থাৎ অস্‌মটিক প্রেসারের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ্‌কোষের কোন্ অংশ পর্দার কাজ করে তাহা জানা দরকার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোষের প্রাচীর আছে। এই প্রাচীর আংশিকভাবে পর্দার কাজ করে; বাকীটা করে প্রাচীরসংলগ্ন প্রোটোপ্লাজমের অংশ। সুতরাং কোষপ্রাচীর ও তৎসংলগ্ন প্রোটোপ্লাজমের অংশকে একত্রে পর্দা বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কোষ-প্রাচীর সকল বস্তুকে পথ দেয়, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম সকল বস্তুকে পথ দেয় না; কতকগুলিকে যাইতে দেয়, আবার কতকগুলিকে রোধ করে। সুতরাং কোন বস্তুর কোষের ভিতর প্রবেশ করা, বা না করা প্রোটোপ্লাজমের উপর নির্ভর করে।

সূর্য্যরশ্মি

সপ্তরঞ্জন (Spectrum)—সূর্য্যকিরণ হইতে উদ্ভিদ্ তাহার শক্তি লাভ করে। কিরণের আলো ও তাপ হইতে এই শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা যে বর্ণহীন বা শাদা আলো দেখি, তাহা একটি অমিশ্র রশ্মি নহে। দেখিতে বর্ণহীন হইলেও সাতটি রঙিণ রশ্মির সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। সুতরাং সূর্য্যকিরণে সাতটি বিভিন্ন প্রকার রশ্মি আছে।

চিত্র—৪

সপ্তরঞ্জন

বাস্তবিক সাতটা রশ্মি সূর্য্যকিরণে আছে কিনা, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা করা যায়। একটা অন্ধকার ঘরের জানালার ছিদ্র দিয়া যদি সূর্য্যকিরণ দেওয়ালে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সোজাসুজি দেয়ালের গায়ে শাদা আলোর একটি রেখা পড়িয়াছে (ছবির ক, খ অংশ দেয়াল; জ=জানালা; ছ=ছিদ্র; স্=সূর্য্যকিরণ)। কিন্তু যদি সূর্য্যকিরণ এইরূপ অপ্রতিহত ভাবে দেয়ালের গায়ে না পড়িয়া দেয়াল ও ছিদ্রের

মধ্যপথে রক্ষিত একটা ত্রিপার্শ্ব বেলোয়ারী কাচের ভিতর দিয়া আসে (ছবির গ অংশ) তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেই কিরণ কাচ অতিক্রম করিয়া একটা রশ্মিরূপে না পড়িয়া সাতটি রঙিণ রশ্মিতে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এই সপ্তরশ্মির সমষ্টিকে সপ্তরঞ্জন (Spectrum) বলে। ইহারা নীচে হইতে উপর দিকে যথাক্রমে (১) লাল (২) কমলা (৩) হলদে (৪) সবুজ (৫) নীল (৬) নীলবড়ি রং ও (৭) বেগুনী রেখায় প্রকাশিত হয়। আরও দেখা যায় যে, নীচে হইতে যে রেখা যত উপর দিকে গিয়াছে, সেই রেখা বেলোয়ারীকাচ হইতে দেয়ালের গায়ে ততই বাঁকিয়া পড়িয়াছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে যে, লাল, কমলা ও হলদে রশ্মির গতি কম-বক্র ; নীল, নীলবড়ি রং ও বেগুনী রশ্মির গতি বেশী-বক্র ; এবং সবুজ মাঝামাঝি স্থানে আছে। এই সকল রশ্মির ভিতর যে গুলি রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের এক্‌টিনিক রেজ বা রশ্মি (actinic rays) বলে। মোটামুটি জানিয়া রাখা ভাল যে, যে রশ্মি যত কম বক্র, উদ্ভিদ্‌শরীরে সেই রশ্মি তত বেশী রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য করে। লাল রশ্মি গাছের শর্করা বা শালি জাতীয় খাদ্য তৈয়ারে সাহায্য করে ; স্বেদন কার্য্যের উপর নীল ও বেগুনী রশ্মির প্রভাব বেশী।

এই রশ্মিগুলি সকল রংয়ের বস্তু ভেদ করিয়া আসিতে পারে না। এক এক রকমের রশ্মি এক এক রংয়ের বস্তু ভেদ করিয়া আসিতে পারে, অন্য রংয়ের বস্তু ভেদ করিয়া আসিতে পারে না।

যদি কোন রঙিণ কাচ, বা অন্য কোন স্বচ্ছ রঙিণ বস্তুর উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, যে-রংয়ের কাচ বা বস্তু, তাহার ভিতরে সেই রংয়ের রশ্মি ভিন্ন বাকীগুলি আটকাইয়া থাকে, ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না ; বাহিরে আসে শুধু সেই রংয়ের রশ্মিটি। দেখা গিয়াছে যে, নীল কাচের ভিতর দিয়া লাল রশ্মি বা কমলা রংয়ের কাচের ভিতর দিয়া নীল ও বেগুনী রশ্মি আসিতে পারে না। যখন কোন রঙিণ বস্তুর ভিতর সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তখন তাহার ভিতর যে রশ্মিগুলি আটকাইয়া থাকে, বস্তুর মধ্যে তাহাদের প্রভাব থাকিয়া যায় ; পরে তাহার দ্বারা বস্তুর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এইজন্যই গাছের রংয়ের প্রভেদে তাহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ারও প্রভেদ হয়।

শক্তি (Energy)—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উদ্ভিদ্ সূর্য্যরশ্মি হইতে শক্তি সংগ্রহ করে। এখন, শক্তি কাহাকে বলে ও তাহার ধর্ম্মই বা কি, তাহার আলোচনা করা যাক।

কাজ করিতে হইলে শক্তির দরকার। এই শক্তি দুই অবস্থায় বর্ত্তমান :—(১) সচল বা কার্য্যকরী ও (২) স্থির বা অচল। প্রথমটি ব্যক্ত ও দ্বিতীয়টি সুপ্ত বা সঞ্চিত। ইংরাজীতে প্রথমটিকে কাইনেটিক এনার্জি (kinetic energy) ও দ্বিতীয়টিকে পোটেন্সিয়াল এনার্জি (potential energy) বলে।

কাইনেটিক এনার্জি নিজে কর্মক্ষম; বস্তুকে গতি দান করাও তাহার কাজ। পোটেন্সিয়াল এনার্জি নিজে নিষ্ক্রিয়, বস্তুর ভিতর সুপ্ত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে, এবং প্রয়োজন মত কার্য্যকরী অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। তখন তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অবস্থায় তাহাকে কাইনেটিক এনার্জি বলে।

একটা বস্তুতে শক্তি হয় সক্রিয়, নয় ত নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকিবে। যখন এই শক্তি বস্তুর উপর সক্রিয়ভাবে প্রয়োজিত হয়, তখন সমস্ত শক্তি ব্যয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বস্তু সক্রিয় থাকে অর্থাৎ হয় উহা গতিশীল থাকিবে, বা না হয় তাহার তাপ বাড়িবে, কিম্বা তাহার ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। কিন্তু যখন সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে, তখন সমস্ত কাজও বন্ধ হইবে; কিন্তু তখন আবার সমস্ত শক্তি (energy) সেই বস্তুতে সুপ্ত অবস্থায় সঞ্চিত হয়। এখানে, সমস্ত শক্তি প্রথম অবস্থায় কাইনেটিক এনার্জি রূপে বর্ত্তমান ছিল; পরে সবটাই সেই একই পরিমাণ পোটেন্সিয়াল এনার্জিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং শক্তির মোট পরিমাণের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইল না, শুধু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইল মাত্র।

পোটেন্সিয়াল এনার্জি কোন উত্তেজনার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে কাইনেটিক এনার্জিতে পরিণত হইতে পারে। উপরে উক্ত হইয়াছে যে, পোটেন্সিয়াল এনার্জি বস্তুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে, কিন্তু তাহাতে একথা বুঝায় না যে, পোটেন্সিয়াল এনার্জি বস্তুর মধ্যে আছে বলিয়া তাহার পরিমাণ বা আয়তন বাড়িবে। আমরা যখন ঘড়ীতে দম দিই, তাহার স্প্রীং গুটাইয়া যায়। পরে সেই স্প্রীং যেমন খুলিতে থাকে, ঘড়ীও চলিতে থাকে; দম ফুরাইলে আবার বন্ধ হয়। এই দুই অবস্থায় ঘড়ীর আয়তন বা পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। দম দেওয়াতে যে শক্তি প্রয়োগ করা হইল, গুটানো স্প্রীংয়ের মধ্যে তাহা সঞ্চিত অবস্থায় রহিল; স্প্রীং যেমন খুলিতে থাকিল, শক্তি অমনি কাইনেটিক অবস্থায় রূপান্তরিত হইল।

সাধারণতঃ আমরা শক্তির যে সকল বিকাশ দেখিতে পাই—সূর্য্যরশ্মি হইতেই তাহার উৎপত্তি; গাছ সূর্য্যরশ্মি হইতে তাহা আহরণ করিয়া জগতকে সরবরাহ করিতেছে। সূর্য্যরশ্মির কাইনেটিক এনার্জি লইয়া উদ্ভিদ্ তাহার নিজ দেহমধ্যে যে সকল যৌগিক পদার্থ তৈয়ারী করে, সেইগুলির ভিতর শক্তি পোটেন্সিয়াল এনার্জিরূপে সঞ্চিত থাকে। যখন এই সকল যৌগিক পদার্থ কম তাপে অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া (অক্সিডাইজ = oxidise) সাধারণতঃ অঙ্গারক বাষ্প (carbon dioxide) ও জল—এই দুই পদার্থে বিভক্ত হয়, তখন এই সঞ্চিত শক্তির মুক্ত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কম তাপে অক্সিজেনের সহিত এই মিলনকে অক্সিডেসন (oxidation) বলে। কাঠ বা কয়লা বেশী তাপে (অর্থাৎ জলিয়া) অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া এই একই কার্য্য করে। বেশী তাপে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হওয়াকে কম্বাস্চান (combustion) বলে। কম্বাস্চানে তাপ ও আলো—দুইই বাহির হয়; কিন্তু অক্সিডেসনে শুধু তাপ বাহির হয়, আলো বাহির হয়

না। উদ্ভিদ্‌দেহমধ্যে কেবল অক্সিডেসন হয়, কম্বাস্‌চান হয় না। বলা বাহুল্য, কাঠ বা কয়লা উভয়ই গাছের অংশ। পৃথিবীর কোথাও সূর্য্যরশ্মির অভাব নাই, তথাপি উদ্ভিদ্ ছাড়া আর অন্য কোন বস্তু তাহার কাইনেটিক এনার্জি ব্যবহার করিতে পারে না। গাছ কিরূপে সূর্য্যরশ্মি হইতে শক্তি সঞ্চয় করে, তাহা কার্ব্বণ-এসিমিলেসান অর্থাৎ পরিপাক-ক্রিয়া আলোচনা কালে বিবৃত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প

পক্বাশয়, পক্বাধান পাকস্থলী—Large and small intestines ; stomach ; intestinal tract.

পক্তব্য—Fit for digestion.

পক্তি—Cooking.

পক্তিশূল—Inflammation of the bowels ; colic.

পক্ব—Ripe ; boiled rice, grey

পক্বাশয়—Stomach.

পক্তৃ, পক্তা—Cook.

পক্ষ্মন্—Eye lashes,

পক্ষ্মাত, পক্ষাঘাত ; পক্ষবধ—Paralysis ; hemiplegia.

পক্ষকোপ—Trichiasis.

পক্ষশাৎ—Opthalmia tarsi.

পঙ্গু—Lameness of both legs.

পচত্যাগ্নি—Digestive fire.

পচ্যমান—In the course of digestion.

পঞ্চ কর্ম্ম—The five modes of treatment such as by vomiting, purging, bleeding, blowing the nose, and evacuation by stool.

পঞ্চ কষায়—The five astringent vegetables.

পঞ্চকোষ—The five sheaths of the spirit,in animated being.

পঞ্চগব্য—Five articles derived from cow ;—milk, curd, clarified butter, urine and dung.

পঞ্চত্ব, পঞ্চতা—Death.

পঞ্চদীর্ঘ—Arms, eyes, tongue, nose, intermamary space.

পঞ্চপল্লব—Medical preparation from the sprouts of five trees.

পঞ্চপ্রাণ—The five vital airs constituting animal life.

পঞ্চবক্ত্র—A five-faced blunt instrument.

পঞ্চভূত—The five primary elements.

পঞ্চভৌতিক—Consisting of the five orignial elements.

পঞ্চম—Cohabitation.

পঞ্চমুখ—A speculum having five holes.

পঞ্চমূল—A well-known mixture of five roots.

পঞ্চরত্ন—The five gems (gold, diamond, pearl, ruby, amethyst).

পঞ্চলবণ—The five salts.

পঞ্চশস্য—The five grains.

পঞ্চশাখ—The hand.

পঞ্চসূনা—The five instruments in a house by which animal life can be accidentally destroyed.

পঞ্চাগ্নি—The five mystic fires blazing in the body.

পঞ্চাঙ্গী—A five-tailed bandage.

পঞ্চামৃত—The five nectarious substance,—milk, curd, ghee, honey and sugar.

পঞ্চেন্দ্রিয়—The five organs of sense.

পঞ্জর—A skeleton.

পটল—A film on the eye ; coats of eye.

পট্য, পট্টক—Bandage.

পট্ট, পট্ট, পেষণি, পেষনী, পিষন শিলা পট, শিলা—A flat stone for grinding, stone slab for grinding condiments.

পটালুকা—Leeches.

পণ্ড—Eunuch.

পর্ণমৃগ—Arboreal animals.

পলিক্লী, পলিত—Gray haired.

পণ্ডিত—A scholar.

পতদ্গ্রহ—A spittoon.

পত্রকৃমি—Worms which live on the leaves of trees.

পথ্য—Wholesome food.

পথ্যাপথ্য—Wholesome and unwholesome dietary and other items of treatment.

পদ—Foot.

পদতল—Plantar surface of foot.

পদাঙ্গুলি—Toes.

পদ্ম—Centre ; plexus.

পদষ্ঠীব—Knee and leg.

পদ্মাসন—A posture in religious meditation.

পদ্মিনী কণ্টক—Lupus ; a sort of lichen.

পনসিকা—Boil in the ear.

পরু, পর্ব্ব—Joints.

পরুষ—Knuckles ; rough.

পর্ব্বক—Knee-joint.

পর্ব্বণিকা—Eruption on margin of cornea.

পর্ব্বণী—A small, round, copper-coloured, painful swelling at the juncture of the black and white part of the eye.

পবিত্র—Filter

পর্য্যায়—Regular order

পর্য্যায়িনী—Mothers who give birth to male and female children alternately

পর্য্যুসিত—Stale

পরমাণু—An atom

পরতন্ত্রপেশী—Voluntary muscle

পরপুষ্ট, পরাশ্রয়, পরাচিত, পরিষ্কন্দ, পরজাত, পরভৃত } -Parasite

পরমাত্মা—Almighty

পরমান্ন—Boiled rice with milk and sugar

পরমায়ু—The entire period of one's life; the age of a person

পরম্পরাগত—Propagated from father to sons

পরলোক—The other world; another state of existence after death

পরাগ—Pollen

পরিকর্ম্ম—Bath and toilet

পরিচর্য্যা, পরিচরণ কর্ম্ম, পরিশ্রূষা—Attendance on a person; ministration

পরিচার্য্য—Patient to be nursed

পরিচারক—Nurse; servant

পরিণাম শূল, পাকজ-পরিণামজ-পক্তিশূল } —Colic pain

পরিদর—Bleeding gum

পরিপাক, পরিপকতা—Digestion

পরিপোটক—Inflammation of lobule of ear

পরিপোষক—Nutritous

পরিবর্ত্তিকা—Phymoois; balanitis

পরিবাহ, পরীবাহ—An innundation; overflow

পরিমণ্ডল—Globular. A mosquito which moves in a circle

পরিমাণ—Measure

পরিমিত—Suitable; moderate; tempeatea

পরিম্লায়ী—Yellow sparkling vision

পরিমোক্ষ—Purgation

পরিলেখী—Eczema of ear

পরিষেক—Lotion

পরিসর্পি—Macular leprosy

পরিস্রাবণ—Water strainer

পরিস্রাবী—A variety of fistula-inano

পরিস্রুত—Distilled

পরেষ্টুকা—Multi-parous cow

পরোপ্তা—Casting out of the dead

পরোক্ষ—Invisible; indirect

পয়োধর—Female breast

প্রকাশ—Beauty of the upper part of the body

প্রকৃতি—Primordial matter; Nature

প্রকোষ্ঠ—Fore arm

প্রগণ্ড—Upper arm

প্রগতজানু, প্রগত জানুকা,—A man who stands with knees wide apart

প্রচ্ছ, প্রচ্ছ, প্রচ্ছান—Scarification

প্রজন—Period for conception

প্রজনন প্রগম,—Birth; sexual intercourse during the period

প্রজনন শক্তি—Power of procreation
প্রজন্ম—Pudenda
প্রজা—Son ; progeny
প্রজাতি—Grand-child
প্রণাল, প্রণালী—Sewer ; drain.
প্রণষ্ট—Deeply imbedded foreign body
প্রণিধানদোষ—The defects due to wrongly handling of clysters
প্রত্ন—Ancient
প্রত্যঙ্গ—limb
প্রত্যক্ষ—Perceptible to the eye ; direct
প্রতরসন্ধি—Raft-like joint as the costo-vertebral
প্রতল—Slap ; hand with extended fingers
প্রত্যবসান—Eating
প্রত্যষ্ঠীলা—Transverse or lateral abdominal tumour below umbilicus
প্রত্যাধ্মান—Name of a disease of the nerve ; distension of stomach
প্রত্যাদিষ্ট—Revealed
প্রতান—Hysterical convulsions
প্রতিকর্ম, প্রসাধন—Toilet
প্রতিক্রিয়া—Reaction
প্রতিচ্ছদ, প্রতিরূপ—Photograph
প্রতিচ্ছায়া, প্রতিকৃতি—Clay or stone model
প্রতিজিহ্বা—Uvula
প্রতিতুনি—Intestinal pain
প্রতিপালন, পোষণ—Nursing
প্রতিবিম্ব—A reflected image
প্রতিভা—Creative genius
প্রতিরোধক—Obstructing
প্রতিশ্যা, প্রতিশ্যায়, পিনস—Diseases of the nose ; peenash
প্রতিশ্যায় প্রতিশ্যা—Catarrh
প্রতিষেধ—Remedy
প্রতিষেধক—Countermanding ; antidote
প্রতিষ্ঠ, প্রথিক, পৃথু, প্রথিথা, প্রথিথী—Fatty
প্রতিকার—Treatment
প্রতুদ—Birds that torment their food with the beak
প্রতোলী—A broad bandage for the neck and the penis
প্রদর—Dysmenorrhœa or menor rhagia
প্রদেশ—Different parts of the animal body
প্রদেশিনী—Index finger
প্রদেহ—Plaster
প্রধামন—Blowing powders into the nose
প্রপদ, পাদাগ্র—Tips of feet ; front of feet
প্রপাণি—Tip of hand
প্রব্রজ্যা—The fourth stage of a Brahmin's life ; wandering about
প্রবর—Progeny
প্রবাল—A sprout ; coral

প্রবাহন—Fluxing the patient
প্রবাহিনী—Ringshaped rectal muscles for outflow of fæces
প্রবাহিকা—Whiteh plux ; Diarrhœa
প্রবীণ—Eminent
প্রবৃদ্ধ, প্রৌঢ়—Adult
প্রবৃদ্ধা, প্রৌঢ়া—Female between 30 and 55 years of age
প্রবেষ্ট—The lower part of the arm
প্রবোধ—Sleeplessness
প্রভঞ্জন—Wind
প্রভব—Cause ; etiology
প্রভাব—Strength, effect
প্রমত—Dumb
প্রমা, প্রমিতি—True knowledge
প্রমত্ত—Intoxicated
প্রমার্জন—Rubbing out foreign bodies as from the eyes
প্রমাথি—Disturbing
প্রমাদ—Inadvertence
প্রমীড়—Suffering from urinal disorders
প্রমেহ—Urinary affection ; morbid secretion of urine
প্রমেহ পীড়ক—Abscess or eruption due to urinary disorder
প্রযাত—Dead.
প্রযাতা, প্রসূতা, প্রসূতিকা—A woman just delivered
প্ররোহ—Shoot ; germination
প্রলম্বাণ্ড—Hanging testicles
প্রলাপ—An incoherent talk ; delirium
প্রলেপ, প্রদেহ—An ointment
প্রলেপক—Hectic fever
প্রশ্ন—Question
প্রষ্ঠৌহী—Woman pregnant for the first time
প্রসব—Production of young ones ; delivery
প্রসভ—Violence ; rape
প্রসহ—Quadrupeds and birds that fall on their food with force
প্রস্কন্ন—A disease of the chest of a horse
প্রসাধনী—Comb
প্রস্রবণ—Mountain spring
প্রসাদনাঞ্জন—Soothing collyrium
প্রস্রাব—Urine
প্রস্তার্যার্ম—A disease of the eye, a thin reddish swelling on the sclerotic coat
প্রসৃতা—Leg
প্রসৃতি, প্রসৃত—The clenched fist
প্রস্বেদ—Excessive sweating
প্রহর—An eighth part of a day
প্রয়াস—Exertion
প্রয়োগ—Application
প্রক্ষালন—Washing as a wound with water
প্রক্ষেপ—Drugs to be thrown into some boiling medicinal preparation

পল—Measure of time in weights
পলক—The twinkling of an eye
পলল—Meat ; flesh
পললজ্বর, পিলাগ্নি—Bile
পললাশয়—Fleshy tumour
পলান্ন—A rich food consisting of rice, butter boiled with flesh or fish
পলিক্নি—A grey haired woman ; a cow for the first time with a calf
পর্শুকা, পক্ষতিত, পার্শ্ব, পার্শ্বকা, পার্শ্বর—Ribs
পয়—Water ; milk
পয়স্বিণী—A milched cow
পাক—Cooking
পাকল—The fever of an elephant
পাকশালা—Kitchen
পাকস্থান—Oven
পাকাত্যয়—Membraneous opacity of eye
পাগল—Mad
পাচক—A kind of bile
পাচন—Mixture
পাটন—Incision, excision
পাটিত—Excised
পানক—Liquid food
পাণি—Hand
পাণিতল—Palm
পাণিমন্থ—Awl
পানীয়—Water
পাণ্ডুর, পাণ্ডুক, পাণ্ডুরোগ—Anæmia ; pale, yellowish white
পাণ্ডুশর্করা—Name of a disease
পাতক, পাপ—Crime ; sin
পাতন—A chemical procedure to purify mercury
পাত্র—A measure of 8 seers ; In case of a liquid, 16 seers are taken
পাতাল যন্ত্র—A kind of pharmaceutical instrument
পাতাল—The regions under the earth
পাদকনিষ্ঠ—Little toe
পাদচতুষ্টয়—Four legs
পাদাঙ্গুষ্ঠ—Great toe
পাদানামিকা—Fourth toe
পাদতর্জনী—Second toe
পাদত্রাণ, পাদুকা, পাদপা, পাদবক্ষণ—Shoes
পাদদাহ—Burning of feet
পাদদারিকা—One of the minor diseases
পাদদারী—Cracked sole
পাদমধ্যমা—Middle toe
পাদরোগ—Diseases of the foot
পাদহর্ষ—Numbness with tingling pain in foot
পাদহর—Anæsthesia
পাদবল্মিক, পাদগণ্ডির—Elephantiasis
পাদশোথ, পাদশোফ—Swelling on the foot
পাদস্ফোট, পাদস্ফোটি—A form of leprosy

পাদীন—Long footed aquatic birds
পাদোলূক—An incurable swelling in the leg of a horse
পানবিভ্রম—Delirium tremens
পানা—Infusion
পানাত্যয়, পানাজীর্ণ—Alcoholism
পামন—Man suffering from skin disease
পামন, পামা—Itch ; eruption ; eczema, scabies
পারণ, পারণা—Break-fast
পারত, পারদ—Mercury
পালি—Lobule of the ear
পাশ—A shackle to bind the insane
পার্শ্ব—Side of the body
পার্শ্বকা—Ribs
পার্শ্বশূল—Pain at the side of the chest ; pleurisy
পার্শ্বী—The ribs collectively ; the side of the body
পার্ষ্ণি—The heel ; Os calcis ; a violent woman
পাষাণ গর্দ্দভ—Parotitis
পাংশু—Ashes ; dust
পায়ু—Rectum or anus
পায়ুদেশ—Rectal or anal region
প্রাকেবল—The primary of original disease
প্রাক্তন—Previous ; former, specially relating to the former state of existence ; destiny
প্রাকৃতজ্বর—Seasonal fever
প্রাণ—Life
প্রাণথ—Air
প্রাণদ—Blood ; water
প্রাণদণ্ড—Capital punishment
প্রাণায়াম, প্রাণসংযম—Stoppage of respiration as an accessory to meditation
প্রাণেন্দ্রিয়—Heart
প্রাণাপ্রাণৌ—The two divine doctors
প্রাণময় কোষ—The second of the five metaphysical sheaths
প্রাণবায়ু—Inspired air
প্রাণসখ—Body
প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন—Break-fast ; morning meal
প্রাতঃকৃত্য—Observance of morning duties
প্রাতঃস্নান—Morning bath
প্রাতিলোম্য—Inversion
প্রাদেশ—The span between index finger and the thumb when extended
প্লব—Floating birds
প্লাশি—Bladder
প্রায়োপবেশ—Fasting to death
প্রাংশু—High ; tall
পিচু—Medicated plug ; pessary
পিচিণ্ডিকা, পিণ্ডিকা—Calf or leg
পিচিণ্ডিল—Flabby abdomen
পিচ্ছাবস্তি—A form of an enema recommended in a case of dysentery

পিচ্চিতব্রণ—Contusion

পিচ্ছিল, পিচ্ছিলবস্তি—Mucilagenous enema

পিণ্ড, পিণ্ডিকা—A lump ; bolus

পিণ্ডিত—Concocted

পিঙ্গল—Of a tawny colour

পিঙ্গলা—Brown coloured

পিঙ্গলাখ্য—Addison's disease

পিত্ত—Bile

পিত্তকোষ—Gall-bladder

পিত্তজ লিঙ্গনাশ—Blindness due to yellowish patch over the pupil

পিত্তজ্বর—Bilious fever

পিত্তরক্ত, পিত্তশোণিত, পিত্তাস্র—Leprosy

পিত্তপ্রকৃতি—Bilious tempered man

পিত্তধরা কলা—Sixth kala or tissue holding the chyme derived from the foods

পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি—Yellow vision due to deranged bile in the third coat of the eye ; day blindness

পিত্তাভিষ্যন্দ—Ophthalmia due to deranged bile

পিত্তস্রাব—A warm watery discharge from the middle part of the unions of the eye

পিত্তোপদংশ—Ulcerating chanere

পিপাসা—Thirst

পিপীলিকা—Ant ; the name of an external parasite

পিবর, পিষ, পীবা, পিবা, পীন—Fatty ; stout and strong

পিষ্টক—Cake ; a raised white circular speck on the white coat of eye

পিষ্টকা—Fatty tumour of eye

পিষ্টমেহ—Chyluria

পিড়কা—Eruption or abscess

পীঠসর্পি—Lame

পীড়ক, পীড়কা—Boil ; pustules

পীড়ন—Pressure to let out pus

পীড়ন দোষ—Over-pressure and under-pressure of an injection into the rectum ; defect of clysters

পীড়া—Pain ; distress ; disease

প্লীহা, প্লীহন্—Spleen

প্লীহোদর—Enlarged spleen

পুজস্রাব—Discharge of pus from a swelling in any of the unions of the eye

পুটপাক—A form of pharmaceutical operation for preparation of medicine

পুণ্ডরীক—Fever of an elephant, a variety of leprosy

পুণ্ডরীক মুখী—A green coloured leech having a mouth like a lotus

পুণ্ড্র—Marks on the horse's body

পুতনা—A demon causing tetanus in infants

পুতিখস—A tree cat emitting a pungent odour

পুরক—Filling

পুরুষ—Man

পুরীষ, পূতিক—Fæces

পুরীষধরাকলা—Fifth form of tissue in the abdomen which separates the fæcal refuse in the large intestine

পুপফুস—The lungs, sigmoid flexture

পুপফুল—Abdominal gas

পুলক—Horripilation

পুষ্কর—The tip of elephant's trunk a kind of disease

পুষ্কাবিকা—Chancroid

পুষ্প—Flower ; delivery ; coloured spots on the animal body ; a kind of eye disease

পুষ্পনেত্র—Tubular instrument for the urethra

পুষ্পাদ্রব, পুষ্পরস, পুষ্পদ, পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পনির্য্যাসক ; পুষ্পাম্বজ—Essence of flower

পুষ্পবতি—A woman during her menstruation

পুষ্পিকা—Sordes ; tartar of the teeth

পুষ্ট—Nourished ; plump

পুষ্টি, পোষণ—Nourishment

পুংচিহ্ন—Male organ of generation

পুংসবন—Ceremony performed during pregnancy for getting a male child

পুংস্ত্ব—Semen

পুংস্ত্বদোষ—Defects of virility

পূযন, পূঁয—Pus

পূযরক্ত—Discharge of pus and blood from nose

পূণিকা, পূপিকা, পৌলি, পূপলা, পোপিকা—A sort of cake

পূর্তি—Bad smell

পূতিকর্ণ, পূতিকর্ণক—Fœtid discharge from ear ; discharge of pus from an abscess of the ear

পূতিনস্য—Nasal polyp ; ozæna

পূর্ব্বরূপ, পূর্ব্বলক্ষণ,—Premonitary signs

পূরীত—Pericardicum ; intestines

পূর্ব্ব-প্রণাদ—Ringing or noise in the ear

পূরি—A sort of cake fried in ghee

পুরীষোণ্ডক—Cæcum

পূর্ব্বাবদ্ধ—A mental disease of untrained elephants

পৃচ্ছ—Tail of a horse

পৃষ্টি—Backbone

পৃষ্ঠ—Back

পৃষ্ঠগ্রণি—Hunch

পৃষ্ঠবংশ, পৃষ্ঠাস্থি—Vertebral column

পৃষ্ঠোর্দ্ধ—Upper part of the back

পেল—Scrotum

পেলব—Delicate

পেশী, পেশনী—Muscles ; fleshy growth

পেশীবস্তু—Muscular tissue

পেষ্ট—Crushed

পেয়—Water ; milk ; drink

পেয়া—Sherbot
প্রেক্ষণকূট—Eye-balls
পৈত্তিক—Billious
পৈষ্টী—Liquor distilled from rice
পোগণ্ড—A boy of 10 years age; deformed
প্রোথ—Nose of a horse
পৌরুষ—Prostrate gland

সজীব আলোক

অধ্যাপক ডাঃ হান্‌স্ মলীশ

উদ্ভিদ্ গতিশক্তি (mechanical energy), চর্ম্মান্তর্ব্বাহী শক্তি (osmotic energy), বৈদ্যুতিক শক্তি, উষ্ণতা, আলোক প্রভৃতি উৎপাদন করিতে সমর্থ। উদ্ভিদের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্বন্ধে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অতি চমৎকার প্রামাণিক পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমি উহার আলোকদানক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিতেছি। প্রথমে জাভাতে, পরে য়ুরোপে ও জাপানে এবং বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আমি উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত আছি। উদ্ভিদের দীপ্তিদান সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-গুলি বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার জগদীশ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

এককোষ "পেরীডিনি"র (Peridineae) দেহে একপ্রকার আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তাহারই ফলে সামুদ্রিক দীপ্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। কাহারও মতে "পেরীডিনি" একপ্রকার জীব, আবার কেহ বলেন, উহা উদ্ভিদ্। কিন্তু সে যাহাই হউক, ঐ আলোক ব্যতীত আর সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ আলোকের উৎপত্তির মূলেই আছে হয় জীবাণু, না হয় ছত্রতন্তু জাতীয় উদ্ভিদ্ (mycelial fungi)। প্রায় ৩০ প্রকার বিভিন্ন জীবাণু এবং ২০ প্রকার ছত্রক এইরূপ দীপ্তি দান করিবার ক্ষমতা রাখে।

কিছুকাল পূর্ব্বেও মাংসবিক্রেতার মাংস মধ্যে এই আলোকের সৃষ্টি লোকে অসাধারণ ঘটনা বলিয়াই মনে করিত, এবং কদাচিৎ কখনো দেখিতে পাইলেও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইত। এই আলোকের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই প্রকার অতি-বিস্ময়ের হেতু। আমি যখন ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন এইপ্রকার মাংস পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া উঠিল। যে সকল লোকের নিকট বা যে যে স্থানে এরূপ আলোক-বিকীরণকারী মাংস পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের নিকট বহু চিঠিপত্রাদি লিখিলাম, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে একটি টুক্‌রাও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এই প্রচেষ্টা একেবারেই

পরিত্যাগ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার একদিন মনে হইল, বাড়ীতে আহারের নিমিত্ত যে মাংস ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে, একবার তাহা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পরীক্ষার ফলে এক অতি বিস্ময়কর আবিষ্কার হইয়া গেল। দেখিলাম, ঐ মাংস এক হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত একটি শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃই আলোক বিকীরণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ মাংসখণ্ডটির অর্দ্ধাংশ যদি শতকরা তিন ভাগ (3 p.c.) লবণজলে ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আলোকদান সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই থাকে না। ক্রমাগত তিন মাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, পরীক্ষেয় মাংসখণ্ড-গুলির মধ্যে শতকরা ৮৭টি আলোকদান ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আরও দেখিয়াছিলাম, গোমাংসের শতকরা ৮৯টি এবং সাধারণ খাদ্য মাংসের শতকরা ৬৫টি খণ্ড আলোক বিকীরণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম যে, "ব্যাক্‌টেরিয়াম্ ফস্ফোরিয়াম্" নামক এক প্রকার তীব্র আলোক-সম্পন্ন জীবাণুর উৎপত্তিই এইরূপ দীপ্তির একমাত্র কারণ। আমি বহু বৎসর ধরিয়া উক্ত গবেষণা করিয়া আসিতেছি। কেবলমাত্র প্রাগ্ (Prague) নগরেই নহে, বহু বিভিন্ন নগরে এবং কিছু কাল পূর্ব্বে জাপানেও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র সকল সময়ে ঠিক একই প্রকার ফল লাভ করিয়াছি। এখন আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, আলোকের এই প্রকার স্বতঃউৎসারণ কিছুমাত্র অসামান্য ঘটনা নহে।

জাভাতে অবস্থান-কালে জীর্ণায়মান পত্র হইতেও উক্তরূপ আলোক বিকীর্ণ হইতে দেখি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—বিশেষতঃ জাভাতে—নৈশ ভ্রমণ কালে আমি প্রায়ই বাঁশ (Bambusa), লিচু, আঁশফল (Nephelium) প্রভৃতি বৃক্ষের ধ্বংসোন্মুখ পত্র হইতে অন্ধকারে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতাম। প্রাচ্যে লব্ধ এই নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া য়ুরোপে ফিরিয়া আসিয়া আমি আমার জন্মভূমিতেও উক্ত আলোকের উৎস অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ওক্ এবং বীচ্ বৃক্ষের আলোক-বিকীরণকারী জীর্ণ পত্র মধ্য-য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও দেখিলাম, পত্র নিজে আলোক দান করে না, তন্মধ্যস্থ একপ্রকার সজীব জীবাণুই আলোকের জন্মদাতা।

এখানে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, একপ্রকার দীপ্তিময় জীর্ণ কাষ্ঠও সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে দেখিয়াছি, "এ্যাগারিকাস্ মিলিয়াস্" এবং "মাইসেলিয়াম্ এক্স্" জাতীয় ছত্রতন্তুই প্রায়শঃ ইহাদের দীপ্তির কারণ।

মৃত সামুদ্রিক জীব—বিশেষতঃ মৎস্যের আলোকবিকীরণের কথা বহুকাল হইতেই জানা আছে। তাহাদের দেহে একপ্রকার দীপক জীবাণুর জন্ম হয় বলিয়াই উক্ত আলোক বিকীর্ণ হইয়া থাকে।

আমরা এই সকল স্বভাবজাত জীবাণু হইতে কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি ও অবিমিশ্র

(pure) জীবাণুর চাষ করিতে পারি। এবং তৎসাহায্যে ইহাদের জীবন ও প্রকৃতির ইতিহাস এবং এই সজীব আলোকের বিশেষত্বগুলি আলোচনা করিতে পারি।

ডুবোয়া এবং হার্ভির (Dubois and Harvey) গবেষণা ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, দীপক প্রাণিগণের দেহে "লুসিফেরীণ" এবং "লুসিফেরাস্" নামক দুইটি পদার্থ বিদ্যমান; এবং উহাদের একত্রে মিশ্রিত করিলে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। দীপ্যমানতার জন্য অম্লজান বাষ্পের একান্ত প্রয়োজন। বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে আমি দীপ্তিদানে অম্লজান্ বাষ্পের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকি। ১।১॥০ মিটার লম্বা এবং প্রায় ৮ মিলিমিটার ব্যাস-সম্পন্ন একপ্রান্ত-বদ্ধ একটা কাচের নল শীর্ষ হইতে ৫ মিলিমিটার নিম্ন-অবধি তীব্র আলোকসম্পন্ন মাংসের কাথ (bouillon) দ্বারা পূর্ণ করিয়া লই। এইরূপ অবস্থায় জীবাণুগুলি নলমধ্যস্থ সামান্য অম্লজান বাষ্প অতি সত্বরই নিঃশেষ করিয়া ফেলে; সুতরাং নল হইতে কোনরূপ আলোক বিচ্ছুরিত হয় না; কেবল মাত্র নলের মুখে যে ক্ষুদ্র স্থানটুকুতে কাথের সঙ্গে বায়ুর সংযোগ থাকে, সে'খানে সামান্য আলোক দেখা যায়। এইবার, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নলের মুখ বন্ধ করিয়া নলটাকে উল্টাইয়া ধরিলে এক বিন্দু বায়ু নলমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহার সমস্ত গমনপথ আলোকিত করিয়া কাথের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধাভিমুখে উঠিবে। অন্ধকারে মনে হইবে, যেন একটি ধুধুপ ধীর-গতিতে আকাশে উঠিতেছে। ১৫ মিনিটের অনধিক কাল মধ্যেই আলোক নিভিয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পুনঃপ্রদর্শন করানো যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে আমি একপ্রকার জীবাণু প্রদীপ নির্ম্মাণ করিয়াছি। বেশ বড় একটি (১।২ লিটার) আলেনুমায়ার ফ্লাস্কে (বোতলে) ২০০।৩০০ ঘন-সেণ্টিমিটার Salt-peptone-gelatin দ্রব পূর্ণ করিয়া লই। অতঃপর পাত্রের মুখ কার্পাস তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া পাত্রটিকে পরিশোধিত করি। শীতল হইলে—কিন্তু সমস্ত শিরীষ (জিলাটীন) সম্পূর্ণরূপে জমাট বাঁধিয়া যাইবার পূর্ব্বে—পাত্রমধ্যস্থ তরল পদার্থ দ্যুতিমান টাটকা "ব্যাক্‌টেরিয়াম্ ফস্ফোরিয়াম্" বীজাণুতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পাত্রটি সমতলভাবে ধরিয়া ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত করিতে থাকিলে শিরীষ (জিলাটীন) ফ্লাস্কের প্রাচীরগাত্রে জমাট বাঁধিয়া ক্রমে একটা দৃঢ় আবরণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই অবস্থায় কোনও শীতল গৃহ মধ্যে পাত্রটি দুই-তিন দিন রাখিয়া দিলে পাত্রপ্রাচীরের সকল দেহ ব্যাপিয়া স্থানে-স্থানে জীবাণুগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যায়। ফলে পাত্রটি এক অতি সুন্দর নির্ম্মল নীল-পীত আলোকে দীপ্যমান হইয়া উঠে, এবং স্নিগ্ধ অকম্প ঔজ্জ্বল্যে অতি মনোরম আকার ধারণ করে। এইরূপ প্রদীপ শীতল গৃহমধ্যে প্রায় এক পক্ষ কাল আলোক দান করিতে পারে। অন্ধকারে অভ্যস্ত নয়নযুগল অনায়াসেই এই আলোকে ঘড়ীর কাঁটা বা তাপমানের (thermometer) ক্রমাঙ্ক চিহ্ন, অথবা বড়-বড় অক্ষরে লিখিত লিপি পাঠ করিতে পারে। অন্ধকার রজনীতে ৬৪ পদ দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এই প্রদীপ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রয়োজন

হইলে নৈশ প্রদীপ রূপে ব্যবহার করা চলে। এই সজীব প্রদীপালোকে আমি আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছি, উদ্ভিদের সূর্য্যানুবর্ত্তিতা (Heliotropism) প্রদর্শন করিয়াছি, এবং জীবাণুজাত আলোকের বর্ণলেখা (Spectrum) পাঠ করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক মৎপ্রণীত "লয়েস্‌টেন্‌ডে পফ্লানৎজেন্" (জেনা ১৯১২, টুজোয়াইটে আউফ্‌ লাগে ; বাই জি, ফিশার) [Leuchtende Pflanzen—Jena 1912, Zweite Auflage ; bei G. Fischer] নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিলে এই সকল পরীক্ষা ও তথ্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।*

বিবিধ

মার্‌সেলো ম্যাল্‌পিগির ত্রি-শত-বার্ষিকি

কিছুদিন হইল অণুবীক্ষণতত্ত্বের জন্মদাতা মার্‌সেলো ম্যাল্‌পিগির ত্রি-শত বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশীয় বহু বৈজ্ঞানিক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিগত সপ্তদশ শতাব্দী বিজ্ঞান-জগতের এক স্মরণীয় কাল। মহারাণী এলিজাবেথের সুযোগ্য চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম্ জিল্‌বার্ট এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞানের (experimental science) প্রচলন করেন। এই শতাব্দীর মাঝা-মাঝি গ্যালিলিও ও কেপ্‌লার অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নূতন রূপ মানুষের নয়নসম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরেন। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম্ হার্ভিও ঐ সময় যন্ত্রসাহায্যে প্রাণিদেহের রক্তপ্রবাহপথ (Blood Circulation) প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি এই প্রদর্শন প্রক্রিয়ার বিশেষ উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই ;— দেহের একাংশের রক্ত চলাচল কেবল তিনি দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক মারসেলো ম্যালপিগি (Mercello Malpighi) যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করিয়া হার্ভির আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন। হার্ভি প্রমাণ করিয়াছিলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী পথে বাহির হইয়া শিরা ঘুরিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। তিনি অণুবীক্ষণ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া ধমনী হইতে ঠিক কোন্ পথে রক্ত শিরাতে প্রবেশ করে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে পারেন নাই ; কারণ সে পথ নগ্ন চক্ষে নিরূপণ করা অসম্ভব। ম্যাল্‌পিগিই সর্ব্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ধমনী ও

* 'প্রকৃতি'র জন্য রচিত মূল ইংরাজী প্রবন্ধের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদ।

শিরার সংযোগবিধানকারী স্বচিসম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক পথগুলি (capillaries) আবিষ্কার করেন। গবেষণা কালে ভেকের হৃৎপিণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ম্যাল্‌পিগি এই গোপন-পথগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ভেকের হৃৎপিণ্ডটা দেখিতে স্বচ্ছ, তাহার গঠনপ্রণালীও তত জটিল নহে, এবং কৈশিক পথগুলিও খুব স্পষ্ট ও অগভীর (superficial)। এই সকল কারণে অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষার পক্ষে ভেকের হৃৎপিণ্ড বিশেষ উপযুক্ত।

ইহার কয়েক বৎসর পরে অণুবীক্ষণ সাহায্যে ম্যাল্‌পিগি রক্তস্রোতস্থ লোহিত কণিকারও (red corpuscles) সন্ধান পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে গ্যালেলিও-শিষ্য বোরেলীর (Borelli) সহিত ম্যাল্‌পিগির আলাপ হয়। তাঁহারই প্ররোচনায় তিনি অণুবীক্ষণ সাহায্যে প্রাণিদেহের গঠনকৌশল বিশ্লেষণ করিতে যত্নবান্ হন। ভ্রূণতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অধুনাতন বহুধা বিস্তৃত পরিণত বিজ্ঞানের শিশু-অবস্থায় তিনি অদৃশ্য জগতের যে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা আজিও বিজ্ঞান-জগতে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে। হৃৎযন্ত্র এবং স্নায়ুমণ্ডলী সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

গুটিপোকা সম্বন্ধেও তিনি বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে উহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে পান যে, উহার দেহগঠন মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীদের (verti-brates) অপেক্ষা কিছুমাত্র কম জটিল নহে। মানবদেহস্থ ধমনীর ন্যায় একপ্রকার জটিল বায়ু-নালি (air tubes) গুটিপোকার সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে—তৎসাহায্যে উহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ম্যাল্‌পিগি-ই সর্ব্বপ্রথম ঐ বায়ু-নালি গুলির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি উহাদের প্রকৃতি ও কার্য্যকারিতা (functions) সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আজিও তাহা নির্ভুল বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

উদ্ভিদ্-শারীর-বিদ্যা (anatomy of plants) বিভাগেই তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনিই প্রথম বৃক্ষদেহস্থ আবর্ত্তিত নাড়ীকা (spiral vessel) আবিষ্কার করেন। পতঙ্গ-দেহের বায়ু-নালির সঙ্গে উহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, উহাদের কার্য্যপ্রণালীও অনুরূপ, অর্থাৎ ঐ নাড়ীকা উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বাস-পথ। যদিও ম্যাল্‌পিগির এই অনুমান ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য তাহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, যদিও দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতি-ব্যাখ্যা সকল ক্ষেত্রে তাঁহার নির্ভুল হইত না। ভাষ্যকার হিসাবে যেমনই হউক, আবিষ্কারক হিসাবে বিজ্ঞানজগতে তাঁহার স্থান খুবই উচ্চে। উদ্ভিদদেহাংশবিশেষের তিনি এমন চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, যাহার নির্ভুল ও নিখুঁত বৈশিষ্ট্য এই সেইদিন মাত্র প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির যথার্থ মূল্য কেহ বুঝিতে পারেন নাই; নিজেরা

উদ্ভিদদেহে ঐগুলি খুঁজিয়া পাইতেন না বলিয়া মনে করিতেন, ম্যাল্‌পিগি দেখিতে ভুল করিয়াছিলেন। অধুনা কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অত্যন্ত সতর্কতা ও অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্রাঙ্কিত বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাইয়াছেন এবং ম্যাল্‌পিগির অপূর্ব্ব মনীষা ও দর্শনক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বৃক্ষকোষ-মধ্যস্থ জীববস্তুর সন্ধান তিনিও পাইয়াছিলেন, পত্রস্থ বায়ুকূপ (stomata) সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই দৃষ্টিপথে পড়ে, পুষ্পের গঠন-পারিপাট্যও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

উদ্ভিদ, তথা প্রাণিবিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-পরিণতির মূলে ম্যাল্‌পিগির স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। প্রথম পথ-প্রদর্শক ম্যাল্‌পিগি এই সুবিশাল বিজ্ঞান-আয়তনের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য নিখিল বিশ্বের সুধীমণ্ডলী তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার অপূর্ব্ব আবিষ্কারগুলি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাল্‌পিগির নামানুসারে মানবশরীরের কতকগুলি অংশবিশেষের নামকরণ করিয়াছেন।

কানাডাতে মশকদমন

কানাডা রাষ্ট্রের যে স্থানে এখন "ন্যাশানালপার্ক" নামক বিখ্যাত ক্রীড়াক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সে স্থানে পূর্ব্বে মশকের অবাধ রাজ্য ছিল। এই মশক দূরীকরণার্থে কর্ত্তৃপক্ষকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। নানা প্রকার চেষ্টা ও বহু গবেষণার পর এক অভিনব উপায়ে ইদানীং তাঁহারা মশক-দমনে সমর্থ হইয়াছেন। যে সকল জলা-ভূমিতে মশক জন্মায়, তাহার উপরে এক প্রকার মিশ্রিত তেল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। জলের উপরের এই সূক্ষ্ম তৈলাবরণ ভেদ করিয়া মশক-কীটেরা উপরে উঠিয়া আসিতে পারে না। এইরূপে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া হাজার হাজার মশা একই সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রথম প্রথম নানা রকমের তেল আলাদা আলাদা ব্যবহার করিয়া দেখা হইত। কেরোসিন প্রভৃতি তেল সস্তা বলিয়া প্রথমে তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু কেরোসিনের সূক্ষ্ম পর্দ্দা (film) অতি সহজেই ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাই ইহা কার্য্যকরী হয় নাই।

নানারকম তেল লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে করিতে অবশেষে ২।৩ রকম তৈল মিশাইয়া এমন একটা মিশ্রিত-তেল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার পর্দ্দা বেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই মিশ্রিত তেল "সিঞ্চন-যন্ত্র" (spray) সাহায্যে জলের উপর বেশ পরিপাটী রূপে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই মিশ্রিত তেলের মূল্যও খুব বেশী নহে—১ গ্যালনের দাম মাত্র ॥৶০।

যেখানে পূর্ব্বে মশার ভয়ে লোকে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত, এখন সেখানে কানাডার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াক্ষেত্র শোভা পাইতেছে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বহুদিনের উৎপীড়ন নিবারিত হইয়াছে। বাংলা দেশও তো মশার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতে

বসিয়াছে। আমাদের দেশের কোনো রসায়ন-বিৎ কি এমন একটা কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন না, যাহা বাংলার মশার নিঃশেষে উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে?—দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিতে পারে?

কার্পাসবীজের উপর গন্ধকদ্রাবকের প্রভাব

কার্পাসবীজের উপর গন্ধকদ্রাবক প্রয়োগ করিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে, না, একেবারেই নির্জীব হইয়া পড়ে;—কিছু দিন হইল এই একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক ভি, এইচ্, ব্ল্যাক্‌ম্যান্ এই সমস্যার নিরাকরণার্থে ইদানীং গবেষণা করিতেছিলেন। Empire Cotton Growing Review (Vol 5. No 3) নামক পত্রিকাতে তাঁহার গবেষণা-ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সলিলসিক্ত বীজের সঙ্গে দ্রাবকসিক্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গমের তুলনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ২০।৩০ মিনিট তীব্র দ্রাবকে (strong acid) নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে, বীজ বা নবজাত অঙ্কুরের বিশেষ কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। পরন্তু দ্রাবকসিক্ত বীজগুলির অঙ্কুর অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বাহির হয়, এবং সাধারণতঃ ছয় দিনে অঙ্কুর যত বড় হয়, দ্রাবক প্রয়োগে উহা চারিদিনের মধ্যেই ঘটিযা থাকে। বীজগুলিকে দ্রাবকের তীব্র জলে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখিয়াও দেখা গিয়াছে যে, উহাতে তাহাদের কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু বীজগুলিকে প্রথমে ক্ষীণশক্তি (diluted or weak) দ্রাবকে সিক্ত করতঃ পরে উহাদিগকে শুষ্ক করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রাবকের তীব্রতা বৃদ্ধি করিলে, আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না, বরং তাহাতে অঙ্কুরোদ্গমশক্তির বিশেষ হ্রাসই হইয়া থাকে।

তীব্র দ্রাবকে সিক্ত করার দরুণ যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বীজের জীবনীশক্তির হানি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—এই প্রকার সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বীজমধ্যস্থ নগণ্য পরিমাণ জলের সঙ্গে গন্ধকদ্রাবকের সংস্পর্শ হেতু এত অল্প তাপ উৎপন্ন হয়, যে তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গালাতেও কার্পাসের চাষ প্রচলিত আছে। উক্ত উপায় অবলম্বনে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইলে এবং তাহাতে নবজাত অঙ্কুরের কোনও প্রকার অনিষ্ট না হইলে কার্পাস চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল হইবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় আবহাওয়াতেও উক্ত প্রক্রিয়ায় অনুরূপ ফল পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? সুফল লাভ করিলে বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। আমরা এই দিকে সরকারী কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

অণু-পরমাণুর আকৃতি—অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী (মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৩৫)

আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ, ১৩৩৫)

আবহ-বিজ্ঞান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু (কৃষক, কার্ত্তিক, ১৩৩৫)

গণিত-পরিভাষা—শ্রীপরমানন্দ চক্রবর্ত্তী (উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

গ্রামোফোন—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত (মাতৃমন্দির, পৌষ, ১৩৩৫)

জড়ের গঠন—শ্রীফণিভূষণ রায়, বি-এস্-সি (শান্তি, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

জন্তুবিশেষের নিকট বিজ্ঞানশাস্ত্র কিরূপ ঋণী—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ (স্বাস্থ্য, পৌষ, ১৩৩৫)

জলচাষ ও মৎস্যবিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার (জীবনের আলো, পৌষ, ১৩৩৫)

জীবের জন্মতত্ত্ব—রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ, এম্-এ, বি-এল্, তত্ত্বনিধি (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৩৫)

দেশ-কাল-সংহতি—শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্ (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৫)

দেশের কথা ও গ্লাস্-ইণ্ডাষ্ট্রী—শ্রীঅনাদি সেন (স্বদেশীবাজার, ১ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা)

বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার—শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৫)

যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আর্থিক উন্নতি, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

সাবান-শিল্প—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (শান্তি, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)

Printed and published by Sj. Raghunath Seal, B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuabazar Street, Calcutta.

প্রকৃতি

অধ্যাপক ডাক্তার হান্‌স্‌ মলীশ

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার এবং "প্ল্যাণ্ট্‌ ফিজিওলজিক্যাল্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটে"র অধ্যক্ষ ডাঃ মলীশ্‌ সম্প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। 'দীপক উদ্ভিদ' ও "মাইক্রোকেমিষ্ট্রি" সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার 'সজীব প্রদীপ' জাত 'নিরুত্তাপ আলোক' আবিষ্কাররাজ্যের অন্যতম সম্পদ। ইঁহার রচিত অন্যূন ১৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে "মাইক্রোকেমিষ্ট্রি অব্‌ প্ল্যাণ্টস্‌" এবং "লুমিনাস্‌-প্ল্যাণ্টস্‌" বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক।
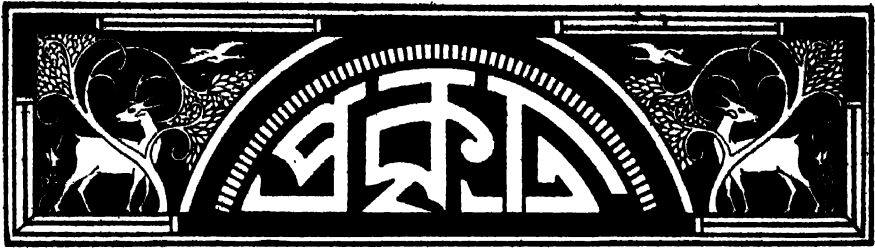
৫ম বর্ষ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৫ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পাটনার হিন্দু মাল্লাদিগের কাঠ্-দেওতা পূজা

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

পাটনার হিন্দু মাল্লারা কাঠ্-দেওতা (অর্থাৎ কাষ্ঠদেবতা) নামক উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। একখানি কাষ্ঠফলককে ক্ষোদিত করিয়া মোটামুটিরূপে মানবমুখাকৃতিতে পরিণত করা হয়। সেই মানবমুখ কাষ্ঠখণ্ডকে মাল্লারা কাঠ্-দেওতার প্রতিমাস্বরূপ বিবেচনা করে। কাঠ্-দেওতার যে প্রতিমাখানি আমি পাটনাতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে চক্ষুদ্বয় ও মুখের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি ক্ষোদিত ছিল। ঐ দেশে প্রত্যেক নৌকার সম্মুখভাগে এই কাঠ্-দেওতার প্রতিমা সংলগ্ন থাকে।

মাল্লাগণ বলে যে, নৌকার "জিউ" অর্থাৎ প্রাণ এই প্রতিমাখানিতে বাস করে; এবং এই "জিউ"র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নৌকাখানি নদীজলের উপরে চলাচল করিয়া থাকে। পাটনাতে যে সমস্ত মাল্লার নিকট আমি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহারা যদিও আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলে নাই, তবু আমার মনে হয় যে, মাল্লাগণের বিশ্বাস কাঠ্-দেওতার প্রতিমা নৌকার যাত্রাকালে নৌকাখানিকে ও তাহার আরোহিগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই কাঠ্-দেওতা নৌকাখানির বিপদনাশক ও সৌভাগ্যদাতা (mascot)।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন আমি পাটনায় অবস্থান করিতেছিলাম, তখন কাঠ্-দেওতার উপাসনার বিষয় জানিতে পারি। ১৯২৭ খৃঃ ৮ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণে আমি পাটনা কলেজের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বসু এম্-এ মহাশয়ের সহিত সোণপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত দুইজন মহিলা,

একজন যুবক ও একটি ছোট বালক ছিল। গঙ্গাতীরস্থ পাটনা সহরের গুল্‌বিঘাট্ নামক মহল্লা হইতে আমরা একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া নদী পার হইয়া সোণপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গার অপর তীরে যাইয়া অবতরণ করিলাম। নৌকা সোণপুর তীরে পৌছিলে আমাদের সঙ্গী জ্যেষ্ঠা মহিলাটি যেমন নৌকার সম্মুখ-ভাগস্থ ক্ষোদিত কাষ্ঠফলকের উপর তাঁহার পদদ্বয় রাখিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিতে যাইতেছেন, অমনি একজন মাল্লা বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরাণি! অনুগ্রহ করিয়া এই কাষ্ঠফলকের উপর আপনার পদদ্বয় রাখিবেন না। এই ফলকখানি আমাদের কাঠ্‌-দেওতা। নৌকার "জিউ" অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মা এই ফলকখানিতে বাস করেন। "জিউ"র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের নৌকাখানি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নদীর জলে বিচরণ করিয়া থাকে।"

ইহা শুনিয়া আমি সেই মাল্লাটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ওহে বাপু! তোমরা কি এই কাঠ্‌-দেওতার অর্চ্চনা করিয়া থাক?" সে বলিল, "হাঁ মহাশয়! উৎসবের দিনে আমরা এই কাঠ্‌-দেওতার সম্মুখে হোম করি এবং অর্ঘ্যস্বরূপ ইঁহাকে 'লাড্ডু' প্রদান করিয়া থাকি।"

তাহার পর যখন আমরা সোণপুর হইতে প্রত্যাগন করিতেছিলাম, তখন পূর্ব্বোক্ত মহিলাটি অনবধানতা বশতঃ তাঁহার পদদ্বয় সেই ক্ষোদিত কাষ্ঠ ফলকখানির উপর রাখিয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া মাঝিরা বলিয়াছিল, "ঠাকুরাণি! আপনি আমাদের দেবতার প্রতিমাখানি অপবিত্র করিয়াছেন।" তাহারা কাষ্ঠফলকখানি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া উহার নষ্ট পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাঠ্‌-দেওতার ক্ষোদিত প্রতিমাখানি নৌকার বিঘ্ননাশক এবং সৌভাগ্যদাতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় জাহাজগুলির সম্মুখভাগেও এক একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। কাঠ্‌-দেওতার ন্যায় এই প্রতিমূর্ত্তিগুলিও জাহাজের বিঘ্নবিনাশক ও সৌভাগ্যদাতার (mascot) কার্য্য করে। ইউরোপীয় নাবিকদিগের বিশ্বাস যে, জাহাজের মাস্তুলের উপর ঘোড়ার নাল সংলগ্ন করিয়া দিলে ভূতপ্রেতাদি জাহাজের নিকট আসিতে পারে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পোতাধ্যক্ষগণ রণতরী ও বাণিজ্যপোতসমূহের মাস্তুলের উপর ঘোড়ার নাল সংলগ্ন করিয়া দেন।

এই বিষয়ে "সিড্‌নীসান্" নামক অষ্ট্রেলিয়ার একখানি সংবাদপত্রে জনৈক ইউরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন, "ঘোড়ার নাল ভূতপ্রেতাদিকে বিতাড়িত করে। এই জন্য প্রাচীন কাল হইতে রণতরী ও বাণিজ্যপোতসমূহের মাস্তুলের উপরিভাগে ঘোড়ার নাল সংলগ্ন করিয়া দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কোন সময়ে ইটালী দেশায় একখানি জাহাজ

বজ্রপতন ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল। জাহাজখানির মাস্তুলের উপরিভাগে যে ঘোড়ার নালটি সংবদ্ধ ছিল, সেই নালের একটি প্রতিকৃতি জনৈক বজ্রাহত নাবিকের দেহের উপর মুদ্রিত দেখা গিয়াছিল।"*

সমুদ্র ও নদীতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে প্রাচীন জাতিরাও সমুদ্র-দেব ও নদী-দেবগণের অর্চ্চনা করিত। প্রাচীন গ্রীকরা এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সমুদ্র-দেব পোসিডনের (Poseidon) প্রীত্যর্থে বৃষবলি দিত। প্রাচীন রোমানরাও তাহাদের সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নেপ্চুনের (Neptune) নিকট ষণ্ড বলি দিত। আধুনিক কালে জাপানীরা সমুদ্র ও নদীতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সমুদ্র ও নদী-দেবতাগণের প্রীত্যর্থে তণ্ডুল, বস্ত্র ও রম্ নামক মদ্য অর্ঘ্যস্বরূপ উপহার দিয়া থাকে। উত্তর আমেরিকানিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ান্ (Red Indian) জাতিরা মিসীসিপি নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবিগণের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পেরুদেশনিবাসিগণও তাহাদের নদী-দেবগণের উপাসনা করে।†

বায়ু-মণ্ডল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবী জল, স্থল ও বায়ু লইয়া গঠিত। স্থলভাগ নীরেট (solid), কঠিন, প্রস্তরময়। ইহাকে পণ্ডিতেরা প্রস্তরমণ্ডল (Litho-sphere) বলেন। জলভাগ নদী, সাগর, মহাসাগরাদি নামে অভিহিত। ভৌগলিকগণ ইহাকে বারিমণ্ডল (Hydro-sphere) নাম দিয়াছেন। আর জল ও স্থলভাগের উপরের আবরণ সাধারণতঃ বায়ু-মণ্ডল (Atmosphere) নামে কথিত হইয়া থাকে। জল ও স্থলভাগ যে উপাদানে গঠিত, বায়ুমণ্ডলও ঠিক সেই উপাদানেই বিনির্ম্মিত। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, উহা বায়বীয় আকারে বিরাজমান থাকে (১)। জল যেমন কখন কঠিন তুষারশিলা, কখন তরল জল, আবার কখন বা বাষ্পাকারে থাকিতে পারে, বায়ু তেমন পারে না।

---

* ১৯২৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের "ষ্টেট্স্ম্যান্" নামক দৈনিকপত্রে প্রকাশিত "Quaint Superstitions of the Sea" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

† ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগর হইতে প্রকাশিত ও মিস্ এম্, আর্, কক্স্ প্রণীত "An Introduction to Folklore" নামক ইংরাজী গ্রন্থের ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

(১) It (i.e. atmosphere) contains the same elements as those which make up the land and sea, only it exists in the gaseous instead of the solid or the liquid form. College Physiography (1920) by Ralph Stockman Tarr, P. 709.

মহাসাগরপরিবেষ্টিত প্রস্তরমণ্ডলকে লোকে সচরাচর পৃথিবী বলিয়া থাকে। সেইজন্য পৃথিবীর আকার গোল প্রমাণ করিবার সময় সকলে জাহাজের গমনাগমন, বা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে পৃথিবীর ছায়ার আকারাদির বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকে; বায়ুর বিষয় গণ্য করে না। কিন্তু পৃথিবীর এই বায়বীয় আবরণ বা বায়ুমণ্ডলের আকারও জলস্থলময় পৃথিবীর ন্যায় অনেকটা গোলাকার। ইহারও উত্তর দক্ষিণ—দুই প্রান্ত চাপা। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বায়ুমণ্ডলের আকার

মৎস্যগণ যেমন নিয়ত জলের মধ্যে বাস করে, আমরাও তেমনি বায়ু-সাগরের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। বায়ু আমরা অবশ্য দেখিতে পাই না, কিন্তু উহার একান্ত অভাব হইলে জীব ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকিত না। জীবগণ বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করতঃ দেহের তাপ রক্ষা করে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস ত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং জীবের জীবনরক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে অম্লজান গ্যাসের যোগান (supply) থাকা প্রয়োজন। উদ্ভিদ্ আবার রৌদ্র সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া অম্লজান গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের পরিবর্ত্তন ঘটিলে পৃথিবী জীব ও উদ্ভিদের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িত।

বায়ুমণ্ডলের উপকারিতা

পৃথিবী অনন্ত আকাশপথে সূর্য্যের চারিদিকে সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছে। জল ও স্থলময় পৃথিবীর নিজস্ব খুব বেশী তাপ নাই। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, আকাশ বা ব্যোমের (space) উত্তাপের পরিমাণ ফারেনহাইট-তাপমানের শূন্যেরও ৪৫৯° নীচে। এই মারাত্মক শৈত্যের হাত হইতে পৃথিবী কি উপায়ে রক্ষা পাইতেছে? বায়ুমণ্ডলরূপ গাত্রাবরণই প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীকে অনন্তাকাশে অযথা তাপবিকীরণ করিতে দিতেছে না। দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে জল ও স্থলভাগ দিবসে যে পরিমাণ সৌরতাপ সংগ্রহ করে, রাত্রিকালে তাহার অনেকটা বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু এই আবরণের জন্য রাত্রিতেও অত্যধিক তাপক্ষয় হইতে পারে না।

বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর জলস্থলময় অংশের ন্যায় বায়ুমণ্ডল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিলেও, মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে উহা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত আকাশের অন্য কোন অংশে যাইতে পারিতেছে না।

বায়ুমণ্ডলের গভীরতা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপযোগী গাঢ় বায়ুস্তর সম্ভবতঃ ৫।৬ মাইল উচ্চ। মনুষ্যবিহীন বেলুন (sounding baloons) ১৮।২০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিতে পারিয়াছে। ঊষার আলোক দেখিলে অনুমান হয় যে, বায়ুমণ্ডল অন্ততঃ ৪৫ মাইল গভীর। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ইথার নামক একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পদার্থ বিরাজমান। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া নক্ষত্র ও সূর্য্য হইতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে

বায়ুমণ্ডলের গভীরতা

আসে। অন্ধকারময় নিশিতে আকাশপথে উজ্জ্বল "তারা খসিতে" অর্থাৎ উল্কাপিণ্ড (meteor) পুড়িতে দেখা যায়। ঐ দাহনকার্য্য ইথারের মধ্যে ঘটিতে পারে না, কেন না উহা অতীব সূক্ষ্ম। কোন একটি উল্কাপিণ্ড যখন পৃথিবীর প্রবল টানে বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধ স্তরে প্রবেশ করে, তখন তাহার সহিত সংঘর্ষণফলে উহা ঐরূপে জ্বলিয়া উঠে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ঐ দহনকার্য্য ভূগর্ভ হইতে প্রায় ২০০ মাইল উচ্চে ঘটে। সুতরাং সে হিসাবে বায়ুমণ্ডলকে অন্ততঃ ২০০ মাইল গভীর বলিতে হয়। মেরুপ্রদেশীয় আলোকমালা (Aurora Borealis) দৃষ্টে মনে হয়, ২০০ মাইলেরও ঊর্দ্ধে বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য অত ঊর্দ্ধের বায়ু ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু।

বায়ু অদৃশ্য পদার্থ, উহার কোন আকৃতি নাই ; যখন যে পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন সেই আকার ধারণ করে। কিন্তু যখন উহা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তখন স্পর্শশক্তিপ্রভাবে আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। প্রভঞ্জন আকারে ভীষণ মূর্ত্তিতে যখন উহা বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষকে ভূমিস্যাৎ করে, তখন বাতাসের শক্তি স্পষ্ট অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য যতই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হউক না কেন, জল ও স্থলের ন্যায় বায়ুও জড় পদার্থ মাত্র। উহা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ নহে ; পরন্তু মিশ্র পদার্থ (mechanical mixture)। উহাকে প্রধানতঃ অম্লজান ও যবক্ষারজান গ্যাসের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। কারণ বায়ুর একশত ভাগের মধ্যে ২১ ভাগ অম্লজান, ও প্রায় ৭৯ ভাগ যবক্ষারজান গ্যাস। উহাতে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প, এ্যমোনিয়া প্রভৃতি গ্যাসও আছে। দশ সহস্র ভাগ বায়ুর মধ্যে মাত্র ৩ ভাগ দ্ব্যম্লাঙ্গারক (carbon dioxide) গ্যাস পাওয়া যায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আর্গন (argon), হিলিয়ম্ (helium) প্রভৃতি আরো কয়েকটি নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উহারা প্রায় যবক্ষারজানেরই ন্যায় নিষ্ক্রিয় (inert)। সুতরাং উহাদের গুণাগুণ আলোচনা নিরর্থক। চাপের আধিক্য ঘটিলে বায়ু সঙ্কুচিত এবং চাপহ্রাসের ফলে প্রসারিত হয়। আবার তাপাধিক্যেও প্রসারিত এবং তাপহ্রাসে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

বায়ুর উপাদান

বায়ুর প্রধান কয়েকটি উপাদানের গুণাগুণ :—

(১) অম্লজান—মনুষ্য ও অপরাপর জীবজন্তুগণ ইহাকে শ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার অভাব ঘটিলে যে জীবের বাঁচিবার উপায় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাষ্ঠাদির প্রজ্জ্বলন বা দাহনও অম্লজানের অভাবে হইতে পারে না। রক্তের সহিত ইহার মিশ্রণের দরুণ রক্তের তাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডল যদি কেবলমাত্র অম্লজান গ্যাসে গঠিত হইত, অর্থাৎ যবক্ষারজান ও অন্যান্য গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় না থাকিত, তাহা হইলে জীবদেহ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, প্রাণ ধারণ করা আদৌ সম্ভবপর হইত না।

(২) যবক্ষারজান—ইহার সহিত মিশ্রিত থাকায় অম্লজানের মাত্রা খুব কমিয়া যায়।

তাই আমাদের দেহ নিঃশেষে জ্বলিয়া যায় না। শিম, মটর প্রভৃতি কতকগুলি শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের ইহা প্রধান খাদ্য।

(৩) দ্ব্যম্লাঙ্গারক—ইহা একভাগ অঙ্গার ও দুইভাগ অম্লজানের সাহায্যে গঠিত। বায়ুমণ্ডলে ইহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইলেও ইহা অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্ভিদ্‌গণ সূর্য্যালোক সাহায্যে ঐ দুই উপাদানকে পৃথক করিয়া অঙ্গার দ্বারা আপন দেহ নির্ম্মাণ করে ও অম্লজানকে বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয়। আর জীবগণ ঐ পরিত্যক্ত অম্লজান শ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাসের সহিত অল্প মাত্রায় দ্ব্যম্লাঙ্গারক গ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সৃষ্টিরক্ষার কি বিচিত্র কৌশল! জীবদেহনিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাসের কিয়দংশ উদ্ভিদ্‌দেহগঠনে ব্যয়িত হইয়া বাকী অংশ পুনরায় জীবগণেরই প্রাণরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

(৪) এ্যমোনিয়া—বায়ুর মধ্যে সামান্য এ্যমোনিয়া (ammonia) গ্যাস দেখা যায়।

এই সকল উপাদান ভিন্ন বায়ুর সহিত (ক) জলীয় বাষ্প, (খ) ধূলিকণা, (গ) নানাবিধ জৈব পদার্থ ও বহুপ্রকার রোগবীজাণু মিশিয়া থাকে।

(ক) জলীয় বাষ্প—গ্রীষ্মকালে সৌরকর প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিলে, বহু অগভীর জলাশয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল, বিল, ডোবা—জলহীন হইয়া পড়ে। ঐ জলের বিলোপ আমরা চক্ষে দেখিতে না পাইলেও স্পষ্ট অনুমান করিতে পারি যে, উহা বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিয়া আছে। আর্দ্রবস্ত্র যে শুষ্ক হয়, তাহার অর্থও এই যে, বাষ্পাকারে জলকণা বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। ফলতঃ বাষ্পাকরণের (evaporation) প্রভাবে জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। ঐ বাষ্প যতক্ষণ উষ্ণাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শৈত্যের তারতম্য অনুসারে উহা কখনো শিশির, কখনো মেঘ, বৃষ্টিকণা, তুষার, বরফ ও করকা (hail) প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকায় বাষ্পীকরণ প্রবলবেগে চলিতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, বর্ষাকালে আর্দ্রবস্ত্র শীঘ্র শুষ্ক হয় না; কিন্তু শীতঋতুতে বায়ুমণ্ডল যখন অনেকটা বাষ্পহীন হইয়া পড়ে এবং বাষ্পীকরণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে চলিয়া থাকে, তখন সিক্ত বস্ত্র শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

(খ) ধূলিকণা—(১) ধূমের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গারকণা, (২) বাত্যাতাড়িত অতি ক্ষুদ্র মৃৎকণা (৩) পুষ্পপরাগ, (৪) আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত ছাই, (৫) প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ডসমূহের দেহাবশিষ্ট ভস্ম, (৬) সামুদ্রিক লবণ প্রভৃতি যে সকল কঠিন কণা বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে আমরা ধূলিকণা (dust) বলিব।

(১) শীতকালে কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশ নানাবিধ কলের চিম্‌নীর কল্যাণে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তখন নাকের মধ্যে কয়লার গুঁড়া জমিয়া থাকে। ধূলিকণা বা ধোঁয়ার মাত্রা অত্যধিক হওয়ায় চক্ষু জ্বালা করে। লণ্ডন

শহর নাকি এই কারণে শীতকালে অনেক সময় সূচিভেদ্য অন্ধকারময় কুয়াসায় আবৃত হইয়া যায়। বৃষ্টি হইলে ধূলিরাশি ধৌত হইয়া যায়। সুতরাং এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ নির্ম্মল বোধ হয়। উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং মহাসমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু ধূলিকণার অভাবে প্রায়ই বেশ নির্ম্মল থাকে।

(২) আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুরাশি অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণাদ্বারা পূর্ণ থাকিলেও উহাদিগকে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না; তবে ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া অন্ধকারময় গৃহে যদি রৌদ্র প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ রশ্মিমধ্যে অসংখ্য ধূলিকণাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়।

ঊর্দ্ধাকাশে ভাসমান এই সকল ধূলিকণার সংস্পর্শে আসিলে জলীয় বাষ্পকণাসমূহ জমিয়া কুয়াসা বা মেঘ আকারে দেখা দেয়। সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত সময়ে কখন কখন আকাশপথে যে মনোরম রামধনু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এই সকল ধূলিকণার জন্য। ঊষা ও গোধূলির (twilight) আলোকও ইহাদেরই কল্যাণে ঘটে।

বলা বাহুল্য ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুরাশি অল্পাধিক পরিমাণে এই ধূলিকণাদ্বারা পূর্ণ। বাত্যা-তাড়িত ধূলিকণা কখন কখন দিনের পর দিন, এমন কি মাসের পর মাস, বায়ুসাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। নির্বাত সময়ে মাধ্যাকর্ষণ (gravity) প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া ধূলিস্তরের সৃষ্টি করে। আবদ্ধ গৃহের আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। আবার বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলেও উহা ভূপৃষ্ঠে নীত হইয়া থাকে। রাজ-পুতনার মরুভূমি হইতে উত্থিত ধূলিকণা বায়ুবলে পরিচালিত হইয়া পাঞ্জাবের উত্তরপূর্ব্বাংশে, এমন কি শিমলা শৈল হইতেও, আকাশপথে মেঘের আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আফ্রিকা মহাদেশের বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি হইতে সময়ে সময়ে এত ধূলিরাশি আকাশে উত্থিত হয় যে, ভূমধ্য সাগর পার হইয়া দূরবর্ত্তী ইতালী ও ফ্রান্স দেশের দক্ষিণাংশ হইতেও উহা দর্শন করা যায়। অনেক সময় যে "রক্তবৃষ্টি" হওয়ার কথা শোনা যায়, তাহা লোহিত বর্ণের ধূলিরাশিরঞ্জিত বৃষ্টিধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৩) খেজুর, তাল, কেয়া প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে সময় সময় অত্যধিক পরিমাণে পরাগরেণু (pollen dust) স্খলিত হইয়া বাতাসের বেগ অধিক হইলে আকাশময় ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তকালে হিমালয় পর্ব্বতের স্থানেস্থানে এত ঋতুপুষ্প ফোটে যে, উহাদের রেণুগন্ধে নিকটস্থ প্রদেশসমূহ আমোদিত হইয়া থাকে। অন্যত্রও যে এরূপ কত ঘটে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৪) অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে প্রভূত ভস্মরাশি, জলীয় বাষ্পাদি ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হয়। বায়ুবেগে ঐ ভস্মরাশি বহুদূরে নীত হইতে পারে। ইতালীর অন্তর্গত ভিসুভিয়স্ আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্গিরিত ভস্মরাশি বহুদূরবর্ত্তী তুরস্ক দেশের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল শহরে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। আইস্‌লণ্ড (Iceland) দ্বীপস্থ হেক্‌লা (Hecla) নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে ধূলিরাশি ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা একবার উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া নরওয়ে ও সুইডেন দেশে গিয়া

উপস্থিত হয়। শুণ্ডা প্রণালীর অন্তর্গত ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) আগ্নেয়গিরি হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যে ভস্মরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বহু দূর দেশ-বিদেশে নীত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত ভারী কণাগুলি অবশ্য শীঘ্রই ভূপৃষ্ঠে পড়িতে বাধ্য হয়, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ অত সহজে নীচে টানিয়া আনিতে পারে না; উহারা বায়ু-প্রবাহের সঙ্গে এদেশে ওদেশে ভাসিয়া বেড়ায়। এই কারণে ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস পরেও অতি দূরবর্ত্তী ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে সূর্য্যাস্ত সময়ে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইত।

(৫) উল্কাপিণ্ডদহনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেবলমাত্র রাত্রিকালেই যে "তারা খসে" তাহা নহে, দিবাভাগেও বহুসংখ্যক উল্কাপাত হইয়া থাকে। তবে প্রখর সূর্য্যকিরণের নিকট মোমবাতির আলোকের ন্যায় উল্কাপাতের আলোকও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এই সকল পিণ্ডের আকার একরূপ নহে, কোনটা বেশ বড়, আবার কোনটা অতীব ক্ষুদ্র। ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া ইহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা কি? কেহ কেহ মনে করেন, ইহারা বিদীর্ণ গ্রহবিশেষের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র (২)। ব্রহ্মাণ্ডময় ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ইহারা পৃথিবীর অনেকটা নিকটে আসে, তখন পৃথিবীর আকর্ষণপ্রভাবে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যাইয়া পড়ে এবং সংঘর্ষণের ফলে কাহারও সমুদয় অংশ, আবার কাহারও বা কিয়দংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কলিকাতায় যাদুঘরে (museum) অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড রক্ষিত আছে। অনেকে মনে করেন, প্রতিদিন ভূপৃষ্ঠে যত উল্কাপাত হয়, তাহাদের সংখ্যা ২ কোটির কম নহে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহারা ব্রহ্মাণ্ডের আদিম উপাদান। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে পৃথিব্যাদি গ্রহ, এমন কি সূর্য্য পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। সে যাহা হউক, বায়ুমণ্ডলে উল্কাভস্মের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে।

অতএব দেখা গেল, বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণার কিয়দংশ আকাশ হইতে পতিত উল্কাভস্ম; আর বাকী সমস্তটাই ভূপৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন।

(গ) গোমহিষাদি বহুবিধ জীবজন্তুর মৃতদেহ পচিয়া নিকটস্থ বায়ু দূষিত করে, তাহাতে বায়ুমণ্ডলে নানাপ্রকার জৈব পদার্থ ছড়াইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন, অনেক সংক্রামক রোগের জীবাণু বাতাসে নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকাসকল (white blood corpuscles) সর্ব্বদা ঐ সকল শত্রুর হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়াই আমরা জীবিত আছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জল ও স্থলের ন্যায় বায়ুও জড় পদার্থবিশেষ। জল ও স্থলের তো ভার

(২) These meteorites are pieces of rock of all sizes, scattered in vast numbers through space, and may be perhaps fragments of a planet that has burst into pieces. Geography for Senior Classes by E. Marsden B.A. (1918) p. 271

রহিয়াছে। তবে কি বায়ুরও ভার আছে? আমরা উহা আদৌ অনুভব করিতে না পারিলেও জলীয় বাষ্পের ন্যায় বায়ুরও যে ভার আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। প্রণালীটা এইরূপ :—

আগাগোড়া সমানছিদ্রবিশিষ্ট এক গজ আন্দাজ লম্বা একটা মোটা কাচনলের এক মুখ বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে পারদ ঢালুন, যেন সমস্ত নলটি পূর্ণ হইয়া যায়। পরে খোলামুখটাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে দৃঢ়রূপে বন্ধ করতঃ নলটিকে উল্টাইয়া ধরুন ও খোলা মুখটাকে পারদপূর্ণ একটা পাত্রের মধ্যে সাবধানে ডুবাইয়া রাখুন। দেখিবেন যেন অসাবধানতা বশতঃ নলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। নলটিকে খাড়াভাবে ধরিলে দেখিতে পাইবেন, নলের ভিতরের পারদ কতকটা নামিয়া পড়িয়াছে। পাত্রস্থ পারদের উপরি-পৃষ্ঠ হইতে কাচনল মধ্যস্থ পারদস্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৩০ ইঞ্চ হইবে। সমুদ্রতলে (sea-level) এই পরীক্ষাটি করিলে ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রতল কাহাকে বলে? অসংখ্য নদ নদী দিয়া মহাসমুদ্রে নিয়ত প্রচুর পরিমাণ জল যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন বৃষ্টির জলের পরিমাণও কম নহে। সুতরাং মহাসমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ ক্রমাগত উচ্চ হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। বাষ্পীকরণের ফলে মহাসমুদ্রের জল ক্রমাগত জলীয় বাষ্পাকারে আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই কারণেই সমুদ্র-পৃষ্ঠ প্রায় একই সমতলে থাকিয়া যায়। ইহার নাম সমুদ্রতল। মহাসাগরের মধ্যস্থলে জোয়ার-ভাঁটা বড় একটা বোঝা যায় না, কিন্তু উপকূলের নিকটে সর্ব্বদাই জোয়ার-ভাঁটা খেলে। এই জন্য উচ্চতম জোয়ার (অমবস্যা বা পূর্ণিমার দিন) এবং নিম্নতম ভাঁটার গড় উচ্চতাকে সমুদ্রতল ধরা হয়।

বায়ুমণ্ডলের চাপ

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত কাচনলের মধ্যস্থ পারদস্তম্ভ আংশিকভাবে নামিয়া শেষে স্থির হয় কেন? কিন্তু নলশীর্ষের আবদ্ধ মুখটিকে সছিদ্র করিবামাত্র পারদস্তম্ভ (mercurial column) একেবারে নামিয়া পাত্রস্থ পারদতলের সমান হইয়া পড়ে। ইহারই বা কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ২০০ মাইলেরও অধিক। আর বায়ু অম্লজান, যবক্ষারজান, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মিশ্র পদার্থ মাত্র। উহারই ভার বা চাপপ্রযুক্ত কাচনলমধ্যে পারদস্তম্ভ প্রায় ৩০ ইঞ্চ উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। তরল পদার্থ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক গুণ দেখা যায় যে, উহার কোন এক অংশের উপরে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ বিন্দুমাত্র না কমিয়া সমভাবে পদার্থের সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে। এই গুণানুসারে পারদপাত্রের উপরে পতিত ২০০ মাইলের অধিক গভীর বায়ুরাশির ভার (weight) বা চাপ (pressure) সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু কাচনলের বন্ধ মুখের উপরে চাপ পড়িলেও নিম্নের খোলা মুখে পড়িবার সুযোগ পায় না। কাজে কাজেই খোলা মুখে বায়ুচাপের অভাব ঘটে, কিন্তু পাত্রস্থ পারদের মধ্য দিয়া ঐ চাপ খোলা মুখপথে ঊর্দ্ধদিকে সংক্রামিত হয়। কিন্তু পারদস্তম্ভের নিজের তো

একটা নিম্নাভিমুখী ভার বা চাপ আছে। ঐ চাপ যে পর্য্যন্ত বায়ুর উর্দ্ধমুখী চাপের সমান না হয়, সে পর্য্যন্ত পারদস্তম্ভের অতিরিক্ত পারদ নিম্নদিকে নামিতে থাকে। যখন উভয় চাপ সমান হইয়া পড়ে, তখন আর পারদ নামে না, স্থিরভাবে থাকে। কাচ নলের ছিদ্রটি একবর্গ ইঞ্চ পরিমিত হইলে ঐ পারদস্তম্ভের পরিমাণ প্রায় ৩০ ঘন ইঞ্চ হয় এবং উহার ওজন হয় প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা ৭॥০ সের। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সমুদ্রতলে
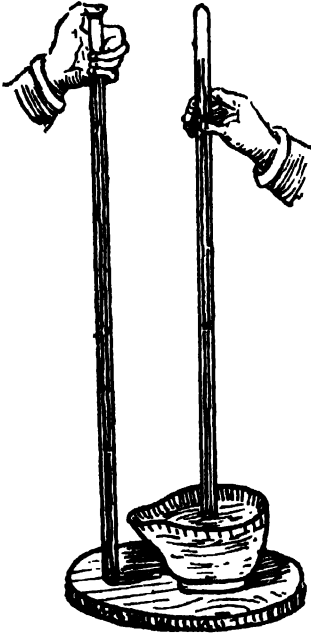
চিত্র—১ (ক)
বায়ুর চাপ

চিত্র—১ (খ)
বায়ুমান যন্ত্র

প্রতিবর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় ৭॥০ সের। বলা বাহুল্য ঐ পারদস্তম্ভের উচ্চতা বায়ুমণ্ডলের তাপ ও জলীয় বাষ্পের তারতম্যের উপরে কতকটা নির্ভর করে, অর্থাৎ তাপ ও বাষ্পের মাত্রা অধিক হইলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমিয়া যায়, কিন্তু কম হইলে বাড়ে।

সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় পণ্ডিত টরিসেলী (Torricelli) প্রথমে এই পরীক্ষাটি করেন। এই। নাম বায়ুমান যন্ত্র (Barometer)।

সমুদ্রতলে যদি প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর প্রায় ৭॥০ সের আন্দাজ ভার পড়ে, তাহা হইলে মানুষের দেহের উপরে তো অসম্ভব বায়ুচাপ পড়িবার কথা। তবে আমরা যে শতসহস্র মণ ভার প্রতিনিয়ত বহন করিয়াও উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, শরীরের ভিতর ও বাহিরের চাপ সমান। যদি বাহিরের চাপকে হঠাৎ কমান সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু অধিকতর চাপের ফলে সম্ভবতঃ বহু ধমনী ও কৈশিক শিরা বিদীর্ণ করিত; আমাদের গাত্রচর্ম্ম ফাটিয়া যাইত, চক্ষুতারকা বাহির হইয়া পড়িত। মহাসমুদ্র মধ্যে ৬ হাজার ফুট জলের নীচে প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপরে জলের চাপ ১$\frac{১}{২}$ টন অর্থাৎ প্রায় ৩০।১৩।০ (ত্রিশ মণ সওয়া তের সের)। জাপান দ্বীপপুঞ্জের অদূরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন স্থান ৫॥০ (সাড়ে পাঁচ) মাইলেরও অধিক গভীর। এই জন্য উহার অনেক স্থলে জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চের উপর প্রায় ৬$\frac{১}{২}$ টন বা ১৫৬৮ মণ। সুতরাং গভীর সলিলবিহারী সামুদ্রিক মৎস্যের দেহের উপরে যে কি অসম্ভব চাপ পড়ে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরস্থ রক্তের চাপ বাহিরের চাপের সঙ্গে সমান থাকায় মৎস্যগণ উহা আদৌ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যখন জেলেরা ঐ সকল মৎস্য ধরিয়া জাহাজের উপরে অর্থাৎ হাল্কা বায়ুর মধ্যে রাখে, তখন বাহিরের চাপের হঠাৎ হ্রাস ও আভ্যন্তরিক চাপের আধিক্য বশতঃ উহাদের পটুকা (bladders) মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, চক্ষুতারকা কোটরের বাহির হইয়া আসে এবং গাত্রচর্ম্ম ফুটির ন্যায় ফাটিয়া যায়। ঐ সকল মৃত দেহের ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া আমরা গভীর জলে চাপের মাত্রা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

বায়ুর চাপ উপরে-নীচে, আশেপাশে ঠিক সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখী; সেই জন্য আমরা অত ভার বহন করিয়াও উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না।

সমুদ্রতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ যত অধিক, উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবশ্য ঐ চাপ তত অধিক হইতে পারে না। কেন না, বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ কমিয়া যায়। এই জন্যই আমরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া ৭ হাজার ফুট উচ্চ সিমলাশৈলে গমন করি, তখন সামান্য শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয়। তত্রত্য যক্ষপর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিবার সময় পদেপদে শ্বাসকষ্ট বোধ হয়। ঊর্দ্ধগমন জনিত পরিশ্রম ভিন্ন বাহ্য বায়ুর চাপের হ্রাস এবং আভ্যন্তরিক চাপের হঠাৎ আধিক্য বশতঃও আমাদের ফুস্‌ফুসের কার্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য জীবজন্তু অথবা মানুষেরা জন্ম হইতে হাল্কা বায়ু সেবনের ফলে উক্ত কার্য্যাদিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। সেই জন্য উহারা আনায়াসে আমাদিগের অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিতে পারে। অতিউচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর এই কারণে আমরা সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না।

ইউরোপের অন্তর্গত আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক (Mont Blanc)।

ইহা ১৫০০০ ফুটেরও অধিক উচ্চ। সমুদ্রতল হইতে একটি বায়ুমান যন্ত্র ঐ শৃঙ্গের উপরে লইয়া গেলে দেখা যায়, পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চ হইতে কমিয়া প্রায় ১৫ ইঞ্চ হয়। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শৈত্যের তারতম্যানুসারে বায়ুর চাপ কমবেশী হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি ৯০০ ফুট উচ্চে উঠিলে পারদস্তম্ভ ১ ইঞ্চ নামিবে মনে করা যাইতে পারে। এই হিসাব অনুসারে আমরা দার্জ্জিলিং সিমলা প্রভৃতি শৈল শহরসমূহের উচ্চতা নির্ণয় করিতে পারি। মনে করা যাক, সিমলা শৈলের একস্থানে বায়ুমান যন্ত্রে দেখা গেল, পারদস্তম্ভ মাত্র ২২ ইঞ্চ লম্বা। বুঝিতে হইবে, ঐ স্থানের উচ্চতা ৯০০×(৩০—২২) বা ৭২০০ ফুট। অবশ্য বহু উচ্চে এই নিয়ম ঠিক খাটে না।

বায়ুমান যন্ত্রের ব্যবহার

উচ্চতা নির্ণয়

বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ দিক হইতে ঝড় বহিবে, তাহাও বলা যাইতে পারে।

কলসী প্রভৃতির মধ্যের বায়ু স্থিরভাবে থাকিলেও ভূপৃষ্ঠের বায়ু কখনও স্থির থাকে না; সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতে থাকে—কোথাও আকাশের দিকে উঠে, কোথাও আকাশ হইতে মাটির দিকে নামে; কখন সমুদ্র হইতে তীরের দিকে, কখন বা তীর হইতে সমুদ্রের দিকে বহিয়া যায়।

বায়ু যখন সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে (horizontally) চলাচল করে, তখন তাহাকে বাতাস (wind) বলে। বাতাস জলের ন্যায় গতিশীল পদার্থ (i.e. fluid) এবং মহাসমুদ্রের জলের ন্যায় সর্ব্বদাই প্রবহমান। জলকে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু বায়ুকে পাই না। তবে জলের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে বায়ুর গতিবিধিও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

বায়ুপ্রবাহ

ঘটি, বাটি বাল্‌তীতে ঢালিবামাত্র জল পাত্রের সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে, বালুকারাশির ন্যায় একস্থানে উঁচু "ঢিপি" হইয়া থাকে না। পুকুর বা হ্রদের উপরিপৃষ্ঠকে এইজন্য সমতল বলিয়া মনে হয়। নালা দিয়া পুকুর, বা নদী দিয়া হ্রদের মধ্যে যত জল আসুক না কেন, জলের পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিলেও কখনো অসমান হইবে না। মহাসমুদ্রে অসংখ্য নদনদী হইতে প্রভূত পরিমাণ জল নিয়ত আসিয়া পড়িতেছে এবং প্রায়ই কোন না কোন অংশের উপর বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু তবু মহাসমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ মোটামুটি একই সমতলে (level) অবস্থিত রহিয়াছে। পুকুর বা হ্রদের জলে বাতাসের তাড়নায় কখন কখন ঢেউ খেলিলেও উহাদের পৃষ্ঠদেশ যেমন সমতলই থাকে, মহাসমুদ্রের পৃষ্ঠদেশও ঐরূপ থাকে। নদীতীর হইতে এক কোদাল বালুকা উঠাইয়া লইলে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বালুকা আসিয়া ঐ গর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করে না, কিন্তু নদী হইতে এক কলসী জল উঠাইয়া লইবা মাত্র চারিদিক হইতে জল আসিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করে। জল উঠাইয়া লওয়ার জন্য ঐ স্থানে জলের চাপ কম হইয়া যায়, এই জন্য চারিপাশ হইতে জল আসিয়া চাপের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান করিয়া দেয়।

এইরূপ কোন স্থানে বায়ুর পরিমাণ কোন কারণে কম হইয়া পড়িলে পার্শ্ববর্ত্তী সকল স্থান হইতে বায়ু আসিয়া চাপের সমতা রক্ষা করে। সৌরতাপ ও বাষ্পীকরণের (evaporation) তারতম্য বশতঃ বায়ুর পরিমাণ অর্থাৎ চাপ কমবেশী হইয়া থাকে।

জলপূর্ণ কাচপাত্রের তলদেশে একটি প্রজ্জ্বলিত বাতি স্থাপন করিলে দেখা যায়, তলদেশের উত্তপ্ত জল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে। আবার উপরের দিক হইতে পাশের দিকে নামিয়া আসিতেছে। ইত্যবসরে শীতল জল উহার পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া উহারই ন্যায় উপরের দিকে উঠিতেছে। ভাত ফুটিবার সময়ও আমরা এইরূপ নীচ-উপর-গতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। দুধ জাল দিবার সময়ও এইরূপ দেখা যায়। ফলতঃ সমুদয় তরল দ্রব্য ঊর্দ্ধাধোভাবে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই প্রক্রিয়াকে 'কনভেক্‌শান' (convection) বলে।

পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ কাচপাত্রের মধ্যে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে উহা ভাসিয়া থাকে। অতি শীতল বরফখণ্ডের সংস্পর্শে আসায় এক স্তর জল অধিকতর শীতল ও সেইজন্য ভারী হইয়া
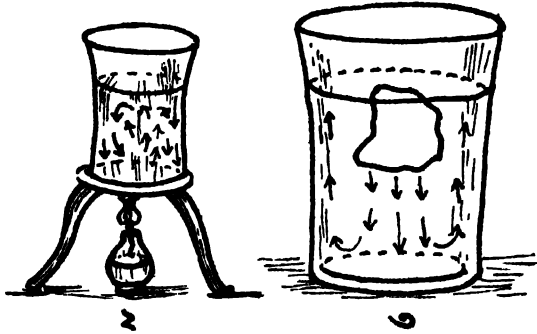
চিত্র ২—ঊর্দ্ধাধঃপ্রবাহ

চিত্র ৩—অধোর্দ্ধ প্রবাহ

পাত্রের তলদেশে অবতরণ করে। কিন্তু তলদেশের জল অত শীতল না থাকায় ভার লাঘব হেতু পার্শ্বদেশে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। উপর হইতে আর একস্তর শীতল জল ইতোমধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় নামিয়া আইসে। কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত গরম জল পাত্রটির পার্শ্ব বাহিয়া উপরে উঠিতে বাধ্য হয়। উপরের শীতল জল ক্রমাগত যতই নীচের দিকে নামিতে থাকে, উপর পৃষ্ঠে ভার বা চাপ ততই কমিয়া যায়। সেইজন্য পার্শ্বের জল গিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করে। তাহাতে ভারসাম্য রক্ষা পায়। ঐ জলও আবার ঠাণ্ডা হইয়া পাত্রের তলদেশে নামিয়া থাকে। এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। অর্থাৎ উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরের দিকে জলমধ্যে একটা স্রোত প্রবাহিত হয়। ইংরাজীতে ইহারও নাম কন্‌ভেক্‌শান। আমরা ইহাকে ঊর্দ্ধাধঃস্রোত বলিব।

পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র দেখিতে একরূপ

নহে। কোথাও বৃক্ষলতাশূন্য বারিবিহীন সুবিস্তৃত ভূভাগ ধূ ধূ করিতেছে। উহার নাম মরুভূমি। সাহারা, আরব, গোবী ও থর ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার কোথাও তৃণপূর্ণ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র (যথা,—সাইবিরিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ (Stepps)), কোথাও বা সুবৃহৎ বনানী (যেমন,—মধ্য আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশস্থ অরিনকো ও আমেজন নদীর তীর প্রদেশ) শোভা পাইতেছে। কোথাও আবার অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বতমালা ; হয় তো উহার কোনকোন শৃঙ্গ চিরতুষারে আচ্ছন্ন। নগাধিরাজ হিমালয় ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং সূর্য্যরশ্মি যে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বাংশকে সমান ভাবে উত্তপ্ত করিতে পারে না, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এতদ্ভিন্ন সূর্য্যকিরণ বিষুববৃত্তের (equator) উভয় পার্শ্বে—গ্রীষ্মমণ্ডলে—অল্পাধিক লম্বভাবে পতিত হয়, এই জন্য গ্রীষ্মমণ্ডল এত গরম। মেরুপ্রদেশে সৌরকর প্রায় শায়িতভাবে পড়িয়া থাকে। এই হেতু ঐ প্রদেশ প্রায় সময়ই তুসারাচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল নামে খ্যাত।

সূর্য্যকিরণকে ২০০ মাইলেরও অধিক গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু বায়ু এই সময় সৌরতাপ হরণ করে না বলিলেই হয়, তবে ভাসমান ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্প যে কিঞ্চিৎ উত্তাপ গ্রহণ করে না, এমন নহে ; এবং এই জন্যই ভূপৃষ্ঠ প্রথমে একটু উত্তপ্ত হয়। ঐ উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া একস্তর বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠে। উত্তপ্ত হইলে জলের ন্যায় বায়ুরও আয়তন বাড়ে। সুতরাং উহা অপেক্ষাকৃত হালকা হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র একরূপ নহে। সেই হেতু সৌরকর এক ভাবে পতিত হইলেও ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র সমান তপ্ত হয় না। তাই অদূরবর্ত্তী শীতল স্থানের অপেক্ষাকৃত ভারী বায়ু মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে উত্তপ্ত স্থানে আসিয়া হাল্‌কা বায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দেয়। নবাগত ঠাণ্ডা বাতাসও আবার কিছুক্ষণ ঐ উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকিলে তপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাকেও আবার পূর্ব্ব বায়ুর ন্যায় স্বস্থান ছাড়িয়া দিয়া ঊর্দ্ধাকাশে প্রস্থান করিতে হয় ; চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী নূতন বায়ু সেই স্থান অধিকার করে। কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকে। সুতরাং ঐ স্থানের বায়ুর উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে জল যেমন উচ্চ স্থান ছাড়িয়া নীচের দিকে গমন করে, বায়ুও তেমনি উচ্চ হইলে নীচের দিকে না গিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং উষ্ণ উচ্চ বায়ু ঊর্দ্ধাকাশ দিয়া প্রবাহিত হইতে বাধ্য হয়।

ঊর্দ্ধাকাশস্থিত উষ্ণ বায়ু যে বরাবর সমান উষ্ণ থাকে তাহা নহে ; তাপবিকীরণের ফলে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। সুতরাং আয়তনেহ্রাস প্রাপ্ত—কাজে কাজেই ভারী হইয়া পূর্ব্বোক্ত কাচপাত্রের উষ্ণ জলের ন্যায় একটু দূরে নীচের দিকে নামিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে নিম্নের গরম ও হাল্‌কা বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া বরাবর বহিয়া দূরে যায় এবং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের level অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

জলীয় বাষ্প যখন ঊর্দ্ধদিকে উঠে, তখন উহা বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা। সুতরাং

বাষ্পপূর্ণ বায়ু সমায়তন বিশুদ্ধ শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা নিশ্চয়ই হাল্‌কা হইবে, এবং সেইজন্ম ঊর্দ্ধাকাশে উঠিবে। উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে সমর্থ। এইজন্ম আমরা গ্রীষ্মকালে মেঘ ও বৃষ্টি অধিক হইতে দেখি।

বায়ুমণ্ডলের যে চাপ আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বায়ুপ্রবাহের যে একটি নিয়ম (law) আছে, বাস্তবিক উহা মাধ্যাকর্ষণের ফল মাত্র। একটা কাচের গ্লাসে প্রথমে খানিকটা তেল ঢালিয়া তাহার উপরে অতি ধীরে ধীরে জল ঢালিলে, উপরের ভারী জল নীচের হাল্কা তেলকে সরাইয়া দিয়া গ্লাসের তলায় গিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ ঠাণ্ডা, সুতরাং বেশী ভারী বাতাস হাল্কা গরম বাতাসকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া উহার নীচে আপনার স্থান করিয়া লয়; অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইতে গরমের দিকে বাতাস বহিয়া থাকে। অপর কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যেখানে বাতাসের চাপ বেশী, সেই স্থান হইতে যেখানে উহার পরিমাণ কম সেইদিকে বাতাস সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। গভর্ণমেণ্টের আবহাওয়া-বিভাগ (Meteorological Department) নানাস্থানে রক্ষিত বায়ুমানযন্ত্রের চাপসাহায্যে বায়ুপ্রবাহ অর্থাৎ ঝড়ের গতি নির্ণয় করিয়া থাকে। উত্তাপাধিক্যের ফলে যে প্রদেশের বায়ুর চাপ যত কম হয়, অদূরবর্ত্তী অন্যান্ম প্রদেশ হইতে অধিকতর চাপযুক্ত বায়ু ঐ অঞ্চলে আসিবে বলিয়া প্রচার করে।

বায়ুপ্রবাহের নিয়ম

উচ্চ ছাদের উপরে লম্বভাবে রক্ষিত লৌহদণ্ডের মাথায় একটা টিনের হাল্কা তীর এমনভাবে সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়, যেন উহা বাতাসের সামান্য বেগেই ঘুরিতে পারে। ইহাকে wind vane বলে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে কোন্ দিক হইতে বাতাস বহিতেছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

বায়ুপ্রবাহের দিঙ্ নির্ণয়

বাতাসের গতির বেগ নির্ণয় করিবার জন্য একটি পৃথক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। উহাকে বায়ুবেগ-মান (anemometer) যন্ত্র বলে। দুইটি সরু শিকের চারি প্রান্তে ৪টি অতি হাল্কা বাটি আবদ্ধ থাকে। শিক দুইটিকে আড়াআড়িভাবে বাঁধিয়া একটা ঋজু দণ্ডের উপরে স্থাপন করা হয়। বাটিতে সামান্য বাতাস আট্‌কাইলেই শায়িত শিক দুইটি ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহাদের সহিত আর একটি খাড়া শিকের এক প্রান্ত সংলগ্ন থাকে; অপর প্রান্ত ঘড়ির চাকার ন্যায় দাঁত-বিশিষ্ট একটা চাকার (cog-wheel) সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়। ঘড়ির কাঁটা যেরূপ একটা প্লেটের (dial) উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘণ্টা মিনিটাদি নির্দ্দেশ করে, এক্ষেত্রেও একটা হাতল তেমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্লেটের উপরে বাতাসের গতিবেগ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বায়ুপ্রবাহের বেগনির্ণয়

মোটামুটি বলিতে গেলে মন্দ সমীরণের (light breeze) বেগ ঘণ্টায় ১ হইতে ১০ মাইল

„	„	„	প্রবল বাতাসের (strong wind)	„	„	২০	„	৩০	„
„	„	„	ঝড়ের (gale)	„	„	৪০	„	৬০	„
„	„	„	বাত্যার (tornado)	„	„	১০০	„	২০০	„

বাংলার মৎস্যপরিচয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

চাকুন্দাদি

Family Dorosomidae

মুখব্যাদান অল্পপ্রস্থ, সরু এবং প্রায় অথবা সম্পূর্ণরূপে নিম্নস্থ। উপরের চোয়াল নিম্ন চোয়াল অপেক্ষা সম্মুখদিকে প্রলম্বিত। চক্ষের পাতা মেদোময়। উদরপ্রান্ত করাতের ন্যায় দন্তযুক্ত। দেহ চেপ্টা। শ্বাসচ্ছদাংশু ৪-৬। দন্তহীন।

কোনগণ

Genus Dorosoma Rafinesque

উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের পশ্চাতে অবস্থিত। পুচ্ছ দ্বিখণ্ডিত। পৃষ্ঠপক্ষের শেষের অংশুটি প্রলম্বিত।

(১৭) Dorosoma nasus (Bleeker) (চিত্র ১) [Chatoessus nasus, ডে (৩) পৃ. ৬৩৪ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৮৭] চিত্র ১।
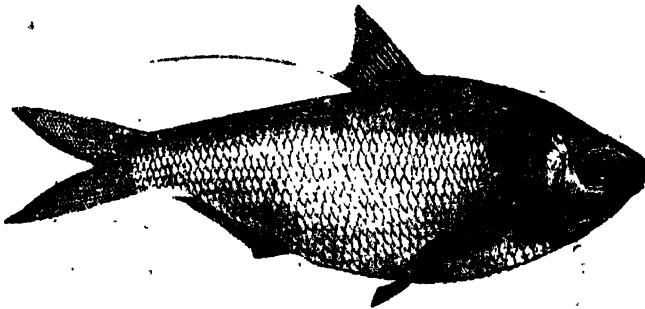
চিত্র—১

পর্য্যায়—কোন (উড়িষ্যা, তেলেগু) (৩) ; বারাং (দক্ষিণবঙ্গ) (১২) ; খোকা ইলিশ (কলিকাতা) ; সুনা (মলবর) (৩) ; মুড্ডু কণ্ডই (তামিল) (৩)।

পরিচয়—পৃ. প. ১৫-১৭ ; উ. প. ২২-২৪ ; পু. প. ১৯ ; পা. রে. ৪৬-৫০ ; পৃ. ব. ১৮-১৯।

দেহ—মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ২/৯ হইতে ১/৫, দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ৩/১০ হইতে ২/৭।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষের শেষের অংশু দীর্ঘ এবং পুচ্ছের মূলদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে। পাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের সম্মুখের অংশুগুলির নিম্নে থাকে।

শল্ক—শল্কগুলির ধার দন্তযুক্ত; উদর ও বক্ষপ্রান্তে ২৮টি শল্ক থাকে, তাহাদের মধ্যে ১৫টি পাদপক্ষের সম্মুখে অবস্থিত।

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ ধূসরআভাযুক্ত সবুজ। প্রথম সাতটা সারির শল্কগুলির মধ্যদেশ কাল হওয়ায় সাতটি অনুলম্ব রেখা গঠিত হয়; নিম্নস্থ রেখাটি পুচ্ছ পর্য্যন্ত পৌঁছে না। উদর ঈষৎ শাদা এবং তাহাতে সুবর্ণের আভা থাকে। স্কন্ধে একটা ঈষৎ নীলবর্ণের দাগ থাকে, কখন কখন থাকেও না। অস্থিময় শ্বাসকুপচ্ছদের সম্মুখের অংশ উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণ। পৃষ্ঠপক্ষ সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ; পশ্চাৎ প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ। বাহুপক্ষ, পাদপক্ষ, উদরপক্ষ এবং পুচ্ছপক্ষ লঘু হরিদ্রাবর্ণ; পুচ্ছপক্ষের প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ।

ভারত সমুদ্র, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত।

চাকুন্দা গণ

Genus Chatoessus Cuvier

পূর্ব্বের মত, কিন্তু পৃষ্ঠপক্ষের শেষস্থ অংশু দীর্ঘ নহে।

(১৮) Chatoessus chacunda (H.B.) (চিত্র ২) [Clupanodon chacunda, হা. বু. (১), পৃ. ২৪৬, ৩৮৩; ডে (৩) পৃ. ৬৩২; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৮৬], চিত্র ২।
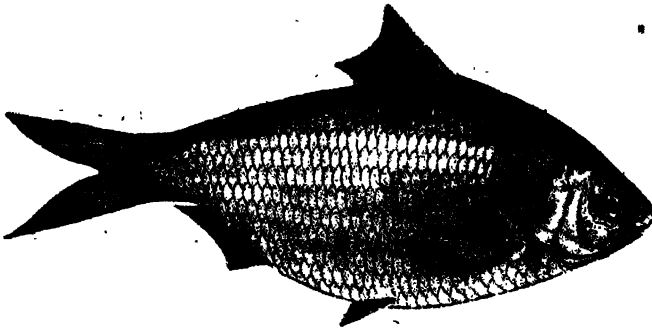
চিত্র—২

পর্য্যায়—চাকুন্দা (উত্তরবঙ্গ) (১৭), ঢেল্যা (ত্রিপুরা); মাড্ডিরু (তেলেগু) (৩); মেব (মারাঠি); ঙ্গাতেমী (আরাকান)।

পরিচয়—পৃ. প. ১৭-১৯; বা. প. ১৫; পা. প. ৮; উ. প. ১৯-২০; পু. প. ১৯; পা. রে. ৪০-৪২; পৃ. ব. ১৩-১৪।

দেহ—মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ২/৯ হইতে ১/৫ ; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ২/৫ হইতে ৩/৮ ।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষে দীর্ঘ অংশ নাই। পাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যস্থলের নিম্নে অবস্থিত।

শল্ক—প্রান্ত দন্তহীন, সুসজ্জিত ; উদর ও বক্ষ প্রান্তে ২৮টি কণ্টক, তন্মধ্যে ১৬ বা ১৭টি পাদপক্ষের সম্মুখে।

বর্ণ—সুবর্ণবর্ণ, তাহাতে নীললোহিত আভা থাকে ; পার্শ্বের উপরের ১/৩ অংশে শল্ক সারির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ থাকে, সেগুলি একত্রে রেখার ন্যায় দেখায়। স্কন্ধে একটি কাল দাগ থাকে।

ভারত সমুদ্র ও নদীর মোহনায়। অন্ততঃ ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ।

(১৯) Chatoessus manmina (H.B.) (চিত্র ৩) [Clupanodon manmina, হা. বু. (১), পৃ. ২৪৭, ৩৮৩ ; ডে (৩) পৃ. ৬৩৩ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৮৬ ; Clupanodon cortius, হা. বু (১) পৃ ২৪৯,৩৮৩—ইহার স্কন্ধে কাল দাগ নাই]। চিত্র ৩।
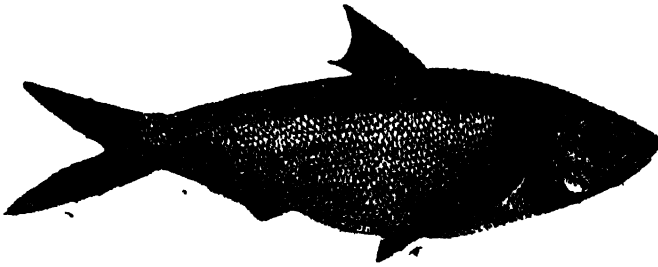
চিত্র—৩

পর্য্যায়—(১) c. m.—কর্তি (পুর্ণিয়া) (১৩) ; গাং খয়রা (কলিকাতা) (১৩) ; চিঁপলি (লক্ষীপুর) (৩) মনুমীন (গোয়ালপাড়া) (১৩) ; মকুন্দি (উড়িষ্যা) (৩)।

(২) c. c.—খয়রা (কলিকাতা, গোয়ালপাড়া) (১৩) ; কর্তি (পুর্ণিয়া) (১৩) ; করতি (মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর) (১৩) ; চিঁপলি (লক্ষীপুর) (১৩) ; সুহিয়া (ভাগলপুর) (১৩)।

পরিচয়—পৃ. প. ১৪-১৫ ; বা. প. ১৫ ; পা. প ৮ ; উ. প. ২২-২৪ ; পা. রে. ৫৮-৬৩ ; পৃ. ব. ২২-২৪।

দেহ—মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ৩/১৪ হইতে ১/৫ ; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ৩/১১ হইতে ২/১৫।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের মূলদেশের কিছু সম্মুখে অবস্থিত ; পৃষ্ঠপক্ষের শেষের অংশটি কিছু প্রলম্বিত। পুচ্ছ গভীররূপে দ্বিখণ্ডিত, নিম্নস্থ খণ্ড দীর্ঘতর।

শল্ক—বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত। কণ্ঠ হইতে পাদপক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত শল্ক সংখ্যা ১৭ ; তাহার পশ্চাতে ১৩টি।

বর্ণ—রৌপ্যবর্ণ, স্বর্ণের আভা থাকে ; গণ্ডদেশ লঘু নীললোহিত ; পৃষ্ঠ নীলাভ সবুজের আভাযুক্ত। স্কন্ধে একটি কাল দাগ থাকে ; c. cortius-এ ঐ দাগ নাই। পক্ষগুলি লঘু পীতবর্ণ, পৃষ্ঠপক্ষ ও পুচ্ছপক্ষের ধার কাল।

বড় বড় নদীতে দৃষ্ট হয়। অন্ততঃ ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ।

(২০) Chatoessus chanpole (H.B.) (চিত্র ৪) [Clupanodon chanpole হা. বু. (১) পৃ. ২৪৯, ৩৮৩ (চিত্র আছে) ; হা. চি (২) ৯০ সংখ্যা (c. champil)] চিত্র ৪।

পর্য্যায়—চম্পোলি, চাম্পিল (১৭) ; চাঁপিলা (জলপাইগুড়ি) (১৩) ; চাপিলা চাঁদকুড়া (১৯)।

সংস্কৃত—চম্পকুন্দ

পরিচয়—পৃ. প. ১৫; উ. প. ২১ ; বা. প. ১৩ ; পা. প. ৮ ; পু. প. ১৯-২১ ; ছ. ৬
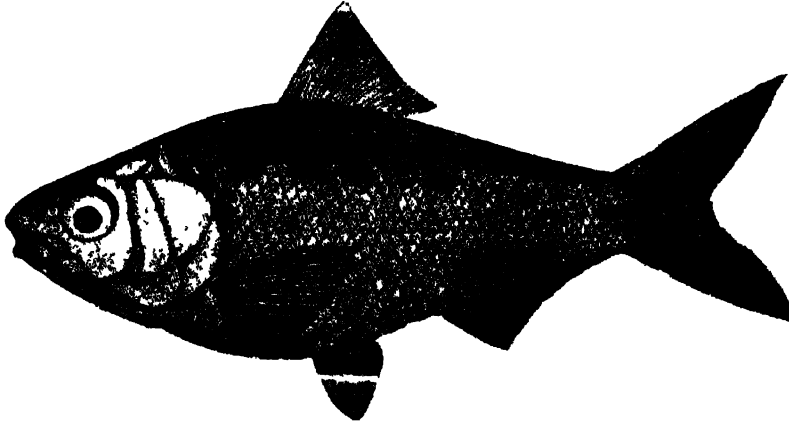
চিত্র—৪

দেহ—মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১০/৪৪ বা ঐরূপ ; মস্তকের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ৭/২৯ ; চক্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের ২/৫। দেহের উচ্চতা (পৃষ্ঠপক্ষের সম্মুখে) দেহদৈর্ঘ্যের ৩৫/৮৬। মস্তক ও পৃষ্ঠের উপরের প্রান্ত সম রেখায় অবস্থিত ; পৃষ্ঠের মধ্যস্থল ন্যুব্জ ; মস্তকের উপরপ্রান্ত ও পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ সরল। বক্ষদেশ ন্যুব্জ ; তাহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ সরল।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের কিছু সম্মুখ দিক হইতে উদরপক্ষের সম্মুখের কিছু অগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; প্রথম অংশুটি অতি খর্ব্ব ; প্রথম ৩টি অংশু শাখাহীন, অন্যগুলি শাখাযুক্ত। উদরপক্ষ পাদপক্ষের কিছু পশ্চাদ্দিক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; অংশুগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র। পুচ্ছ দুই সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত ; খণ্ডদ্বয় সূক্ষ্মাগ্র।

শল্ক—পৃষ্ঠপক্ষ এবং পাদপক্ষের মধ্যে ১২।১৩ ; দেহের পার্শ্বে অনুলম্বভাবে মস্তক হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত ৪২-৪৫। শল্কের প্রান্ত মসৃণ।

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ সবুজ ; পার্শ্ব ও বক্ষ রৌপ্যবর্ণ ; পার্শ্বের উপরিভাগে ৩ হইতে ৬টি কাল দাগ আছে, দাগগুলি অনুলম্বভাবে শ্রেণীবদ্ধ। পক্ষগুলি স্বচ্ছ। পুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুদ্বারা চিহ্নিত। চক্ষু রৌপ্যবর্ণ।

বঙ্গদেশের পুকুরে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

Chatoessus cagius (H.B) [Clupanodon cagius, হা. বু, পৃ. ২৫০, ৩৮৩]

পর্য্যায়—খাজি (১৭)

পরিচয়—পৃ. প. ১৫ ; বা. প. ১৪ ; উ. প. ২৩ ; পা প. ৮ ; চ্ছ. ৬।

দেহ—দেখিতে চম্পোলির ন্যায়। পৃষ্ঠপক্ষের ১ম অংশু অতি ক্ষুদ্র এবং ভাল করিয়া দেখা যায় না।

বর্ণ—চম্পোলির ন্যায় ; পার্শ্বের দাগগুলি সংখ্যায় অনেক।

উত্তর বিহারের পুষ্করিণী ও নদীতে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ইঞ্চি।

ইহা চম্পোলির এক প্রকারভেদ মাত্র।

মোলা গণ

Genus Dussumieria

চ্ছদকণ্টক বহুসংখ্যক ; শ্বাসঝিল্লি বর্ত্তমান ; শ্বাসকূপচ্ছদদ্বয় পরস্পর হইতে ভিন্ন। দেহ প্রলম্বিত এবং চিপিট ; উদরপ্রান্ত অতীক্ষ্ণ এবং দন্তহীন। ত্রোটী সূক্ষ্ম। উপরের চোয়াল
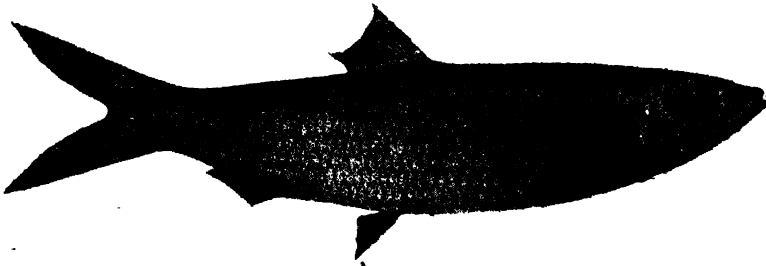
চিত্র—৫

সম্মুখদিকে প্রলম্বিত নহে। চক্ষুর পাতা স্থূল এবং মেদোময়। দুই চোয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত থাকে, সীরিকাস্থি দন্তহীন। তাব্রস্থি এবং উপপক্ষাস্থি কয়খানিতে কণ্টকাকৃতি দন্ত থাকে ; জিহ্বার উপরও ঐরূপ দন্ত বর্ত্তমান। পৃষ্ঠপক্ষ পাদপক্ষের উপরে অবস্থিত। আমাশয়িক অন্ত্রাগ্র বহুসংখ্যক।

(২১) Dussumieria acuta (চিত্র ৫) [ডে (৩) পৃ. ৬৪৭, চিত্র—৪, চিত্রপট্ট ১৬৬ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯৯, চিত্র, ১২৩]

পর্য্যায়—মোলা (পুরী) ; পুণুউরিঙ্গা (তামিল) ; মরওয়া (তেলেগু)।

পরিচয়—ছ. ১৪-১৫ ; পৃ. প. ১৯-২০ ; বা. প. ১৪ ; উ. প. ১৪-১৭ ; পু. প. ২১ ; পা. রে. ৪০-৪২ ; পৃ. ব. ১১-১২ ।

দেহ—মস্তক দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫ হইতে ২/১১ ; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ২/৫ হইতে ৩/২১ । চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের ১/৫ । উদর পৃষ্ঠাপেক্ষা অধিকতর স্যুব্জ। শ্বাসকঙ্কতের কণ্টকগুলি পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে চক্ষুর ব্যাসের অর্দ্ধভাগ ; চতুর্থ (বহিঃস্থ) শ্বাসকঙ্কতের অধোভাগে তাহাদের সংখ্যা ২২ ।

বর্ণ—সবুজবর্ণ, নীলবর্ণের বহুদাগ আছে ; শ্বাসকুপচ্ছদের ধারে যথাক্রমে নীল, পিত্তল এবং লালবর্ণের দাগযুক্ত রৌপ্যবর্ণের রেখা আছে ; পুচ্ছে নীল, সবুজ ও স্বর্ণবর্ণের দাগ আছে । বাহু, পদ ও উদরপক্ষ শ্বেতবর্ণ ; বাহুপক্ষের ১ম অংশুতে কাল দাগ আছে ।

সিন্ধুদেশ হইতে ভারত মহাসাগরের মধ্যদিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত দেখা যায় । দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ ৭ ইঞ্চি ।

তিলরাদি

Engraulidae

দেহ দীর্ঘাকার, অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব । উদরদেশ চেপ্টা এবং প্রান্তভাগ করাতের মত দন্তযুক্ত । মুখবিবর প্রশস্ত । তুণ্ড মুখের অগ্রে প্রলম্বিত । শ্বাসকুপচ্ছদের কণ্টক ৬-১৯ । পার্শ্বরেখা নাই । পুরোহম্বস্থি অতি ক্ষুদ্র ; উর্দ্ধহন্বাস্থি বৃহৎ এবং তাহাতে অতিরিক্ত অস্থি সংলগ্ন থাকে ।

কগজ গণ

Stolephorus, Lacepede

দেহ দীর্ঘাকার ও চেপ্টা ; উদরপ্রান্ত করাতের ন্যায় দন্তযুক্ত । শ্বাসরন্ধ্র প্রশস্ত এবং কণ্ঠযোজক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত নহে । মুখ প্রশস্ত এবং তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত । তুণ্ড মুখবিবরের সম্মুখদিকে অধিকভাবে প্রলম্বিত । পৃষ্ঠপক্ষ সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে উদরপক্ষের উপরে অবস্থিত । দন্তগুলি ক্ষুদ্র, এবং সীরিকাস্থি, দুই চোয়াল, তাম্বস্থি ও উপপক্ষাস্থিতে সংলগ্ন । শল্ক বৃহৎ অথবা মধ্যমাকার ।

(২২) Stolephorus indicus (V. Hasselt) (চিত্র ৬) [Engraulis indicus, ডে (৩) পৃ. ৬২৯, চিত্রপট্ট ২৫৮, চিত্র ৩ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯৫ ; চৌ. মে (৯), ৫,১৯১৬, পৃ. ৪২৫]

পর্য্যায়—কগজ (পূর্ব্ববঙ্গ) (১২) ; নেটেলি (তামিল) (৪) ; নাটু (তেলেগু) (৩) ; জুরুকর্তদা (আন্দামান) (৪) ।

পরিচয়—ছ. ১১-১৩ ; পৃ. প. ১৫-১৬ ; বা. প. ১৫ ; পা, প. ৭ ; উ. প. ১৯ ; পু. প. ১৯ ; পা. রে. ৪০ ; পৃ. ব. ৮-৯ ।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ৩/১৪ হইতে ১/৫, দেহের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ১/৬ হইতে ২/১৩। চক্ষুব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের ২/৭ ; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর ব্যবধান চক্ষুব্যাসের ২/৩ হইতে ৩/৪ ; চক্ষুদ্বয়ের পরস্পরের ব্যবধান চক্ষুর ব্যাসের সমান। ঊর্দ্ধহন্বস্থি বৃহৎ এবং হনুসন্ধির বিপরীত-দিকে ছিন্ন। তুণ্ড সূক্ষ্মাগ্র, এবং চোয়ালদ্বয়ের সম্মুখে বিশেষরূপে প্রলম্বিত। দেহ মধ্যরূপ চেপ্টা এবং পৃষ্ঠ ও বক্ষপ্রান্ত সামান্যরূপে এবং সমভাবে ন্যুব্জ।
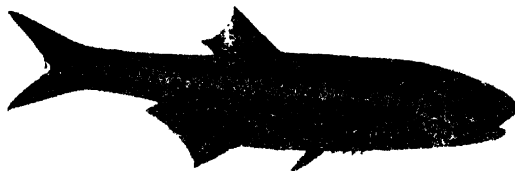
চিত্র—৬

পক্ষ—তুণ্ডাগ্র হইতে পুচ্ছমূলের নিকটতর স্থান হইতে পৃষ্ঠপক্ষের আরম্ভ ; ইহার প্রথম অর্দ্ধেক উদরপক্ষের আরম্ভস্থানের অগ্রে অবস্থিত। শ্বাসকক্তের কণ্টকগুলি পরস্পরের নিকটস্থ এবং চক্ষুর ব্যাস অপেক্ষা খর্ব্বতর।

শল্ক—শীঘ্র খসিয়া যায়। পাদপক্ষের মূলদেশের সম্মুখে ৪টি দৃঢ় শল্ক থাকে।

বর্ণ—রৌপ্যবর্ণ, পৃষ্ঠদেশে সবুজের আভা থাকে, কখন কখন মস্তকের পশ্চাদ্দিকে কতকগুলি কাল দাগ থাকে। একটি উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণ প্রশস্ত রেখা চক্ষুর উপরদিক হইতে পুচ্ছের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (টাট্‌কা মাছ লালআভাযুক্ত পিঙ্গলবর্ণ এবং মলিন হরিদ্রাবর্ণও হইতে পারে)।

ভারত মহাসাগরে দৃষ্ট হয়। বড় বড় নদীতেও দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে ৩-৩৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।
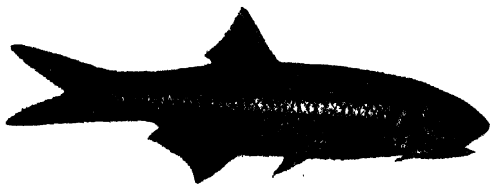
চিত্র—৭

(২৩) Stolephorus commersonianus Lacepede (চিত্র ৭) [Engraulis commersonianus, ডে (৩) পৃ. ৬২৯, চিত্রপট্ট ১৫৮, চিত্র ১ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯৪ ; চৌ. মে (৯), ৫, ১৯১৬, পৃ. ৪২৬]

পরিচয়—পৃ. ১১-১৩ ; পৃ. প. ১৪-১৬ ; বা. প. ১৫-১৬ উ. প. ১৯-২১ ; পু. প. ১৯ ; পা. রে. ৩৮-৪০ ; পৃ. ব. ৮-৯ ; আমাশয়িক অন্ধান্ত্র ১৬ ।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের $^{১}/_{৫}$ হইতে $^{৪}/_{২১}$, পুচ্ছ দেহদৈর্ঘ্যের $^{৪}/_{২১}$ হইতে $^{১}/_{১১}$, দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের $^{৪}/_{২১}$ হইতে $^{৪}/_{২৩}$ ।

চক্ষু—চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের $^{২}/_{৭}$; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব ইহার ব্যাসের $^{১}/_{৫}$ হইতে $^{২}/_{৩}$ এবং পরস্পরের ব্যবধান প্রায় ব্যাসের মত ।

তুণ্ড সূক্ষ্মাগ্র, মুখের সম্মুখে বিশেষরূপ প্রলম্বিত । ঊর্দ্ধহন্বস্থি শ্বাসরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত । মস্তকের উচ্চতা তাহার দৈর্ঘ্যের $^{৩}/_{৪}$ ।

দন্তগুলি—সূক্ষ্ম ।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ তুণ্ডাগ্র হইতে পুচ্ছমূলের নিকটতর, এবং পাদপক্ষের পশ্চাতে অবস্থিত । উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ ।

শল্ক—শীঘ্র খসিয়া পড়ে ।
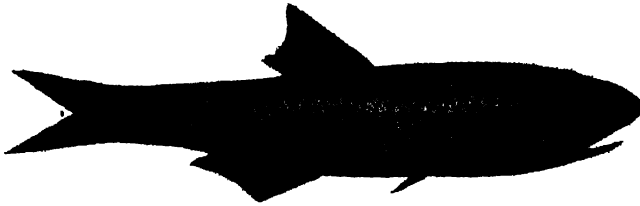
চিত্র—৮

বর্ণ—রৌপ্যবর্ণ, উপরদিকে সবুজাভ ; শ্বাসকূপচ্ছদ রৌপ্যবর্ণ, তাহাতে স্বর্ণবর্ণের দাগ থাকে । মস্তকের পশ্চাদ্দিকে একটি বড় কাল দাগ থাকে । একটি প্রশস্ত রৌপ্যবর্ণের রেখা শ্বাসকূপচ্ছদের পশ্চাৎ ধারের মধ্যস্থল হইতে পুচ্ছের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহা পশ্চাদ্ভাগে প্রশস্ততর । উদর পাতলা লালাভ হরিদ্রাবর্ণ । পক্ষ হরিদ্রাভবর্ণ, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ থাকে । চক্ষু রৌপ্যবর্ণ, চারিধার কাল । পুচ্ছ নীলাভ ।

ভারত মহাসমুদ্র ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয় । ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় ।

(২৪) Stolephorus tri (Bleeker) (চিত্র ৮) [Engraulis tri, ডে (৬) পৃ. ৬৩০, চিত্রপট্ট ১৫৮, চিত্র ৬ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯৫ ; চৌ. মে. (৯), ৫, ১৯১৬, পৃ. ৪২৬]

পর্য্যায়—ত্রাহি (তেলেগু) ; ঘাণ্ডঘুজলি ।

পরিচয়—ছ. ১১ ; পৃ. প. ১+১৪-১৫ ; বা. প. ১৩ ; পা. প. ৭ ; উ. প. ২০-২২ ; পু. প. ১৭ ; পা. রে. ৩২-৩৮ ; পৃ. ব. ৮ ।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের $^{১}/_{৫}$ হইতে $^{৪}/_{২১}$; পুচ্ছদৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের $^{৪}/_{২১}$; দেহের

উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫ হইতে ৪/২১। চক্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের ২/৭ ; চক্ষু তুণ্ডাগ্র হইতে ব্যাসের ১/২ হইতে ১/৪ দূরে অবস্থিত ; চক্ষুদ্বয়ের ব্যবধান ১ ব্যাস।

দেহ চেপ্টা, উদরপ্রান্ত পৃষ্ঠপ্রান্ত অপেক্ষা অধিকতর ন্যুব্জ। তুণ্ডভিন্ন মস্তকের দৈর্ঘ্য তাহার উচ্চতার সমান। তুণ্ড সূক্ষ্মাগ্র, এবং মুখবিবর হইতে বিশেষরূপে প্রবর্দ্ধিত। ঊর্দ্ধহন্বস্থি হনুসন্ধির দিকে স্ফীত, পশ্চাদ্দিকে সূক্ষ্মাগ্র এবং শ্বাসকূপছিদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষের সম্মুখপ্রান্ত চক্ষুর অগ্রভাগ এবং পুচ্ছের মূলদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পাদপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের আরম্ভস্থলের সম্মুখে আরম্ভ। উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ।

শল্ক—নিয়মিত ভাবে সজ্জিত। ৪টি সরু, লম্বা, দৃঢ় শল্ক পাদপক্ষের সম্মুখে অবস্থিত। শ্বাসকঙ্কতের অধোভাগের কণ্টকগুলি সংখ্যায় ২৫টি।

বর্ণ—নীল লোহিতের আভাযুক্ত রৌপ্যবর্ণ, কখন কখন রক্তাভ পিঙ্গলবর্ণ। দেহের পার্শ্বে চক্ষু হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক রৌপ্যবর্ণ প্রশস্ত রেখা থাকে। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে একটি কাল দাগ থাকে।
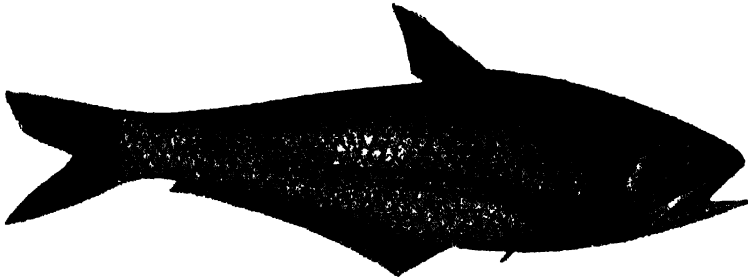
চিত্র—৯

ভারত সমুদ্র এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয় ; হুগলী নদীতে (কলিকাতায়) পাওয়া যায়। প্রায় ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়।

(২৫) Stolephorus taty Bleeker (চিত্র ৯) [Engraulis taty, ডে (৩) পৃ. ৬২৮, চিত্রপট্ট ১৫৪, চিত্র ৫ ; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯৩]

পর্য্যায়—টাটি (তেলেগু)।

পরিচয়—ছ. ১১-১১ ; পৃ. প. ১+১৩-১৫ ; বা. প. ১৫ ; পা. প. ৭ ; উ. প. ৫১-৫৭ ; পু. প. ১৯ ; পা, রে. ৪২-৪৬ ; পৃ. ব. ১২।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১/৬ হইতে ২/১৩ (শিশুর ২/১১) ; পুচ্ছদৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের ৪/২১ ; দেহের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ৪/১৫ হইতে ১/৪ ; চক্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের ১/৪ ; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব ব্যাসের ১/২ হইতে ২/৩ ; পরস্পরের দূরত্ব ব্যাসের ৩/২।

তুণ্ড নিম্নহনুর সম্মুখে প্রলম্বিত; ঊর্দ্ধহনু হনুসন্ধির পশ্চাতে প্রলম্বিত; ইহার পশ্চাদ্দিক স্ফীত এবং ছিন্ন।

দন্তগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং কণ্টকাকৃতি।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ তুণ্ডের নিকটতর অথবা তুণ্ড এবং পুচ্ছমূলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উদরপক্ষ দৈর্ঘ্যে পুচ্ছহীন দেহদৈর্ঘ্যের অর্দ্ধভাগ; ইহা পৃষ্ঠপক্ষের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ। বাহুপক্ষের প্রথম অংশুটি অতিশয় দীর্ঘ এবং তন্তুর মত। পুচ্ছপক্ষ দুই খণ্ডে বিভক্ত, নিম্নখণ্ড দীর্ঘতর।

শল্ক—১২টি দৃঢ় শল্ক পাদপক্ষের মূলদেশের পশ্চাতে এবং প্রায় ২৩টি তাহার সম্মুখে অবস্থিত।

শ্বাসকক্ষতের কণ্টকগুলি ভল্লাকার এবং পরস্পরের দূরে অবস্থিত।

বর্ণ—মস্তকের উপরিভাগ ও পৃষ্ঠদেশ সবুজবর্ণ অথবা সবুজাভ পীত, তাহাতে বহু কাল বিন্দু থাকে। পার্শ্বদেশ, উপব, চিবুক ও শ্বাসকুপচ্ছদ রৌপ্যবর্ণ। পৃষ্ঠ, পুচ্ছ ও উদরপক্ষ পীতবর্ণ; পৃষ্ঠপক্ষে কাল বিন্দু আছে। পাদ ও বাহুপক্ষ পীতাভ, বাহুপক্ষ কখন কখন কাল। পুচ্ছপক্ষের ধার কৃষ্ণাভ। চক্ষুর উপর ভাগ নীলাভ কৃষ্ণ।

ভারত সমুদ্র, বড় বড় নদীর মোহনা এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। লম্বায় ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

ফেসক গণ

Engraulis, Cuvier

তুণ্ড মুখবিবরেব সম্মুখে অধিক প্রলম্বিত নহে। পৃষ্ঠপক্ষ উদরপক্ষের সম্মুখে অথবা আংশিক উপবে অবস্থিত। অন্য বিষয়ে কগজগণের ন্যায়।
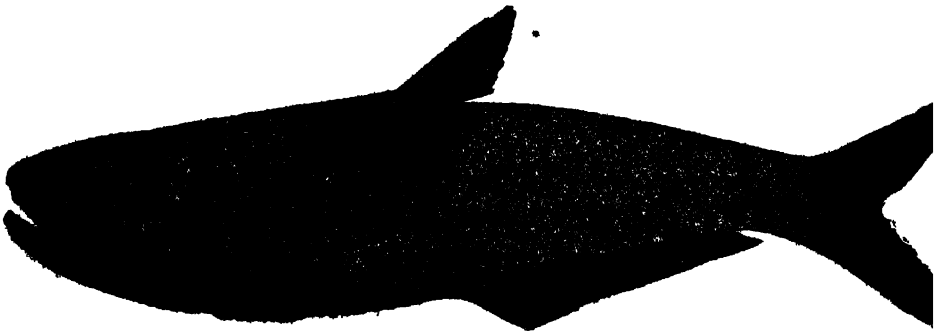
চিত্র—১০

(২৬) Engraulis kempi Choudhuri (চিত্র ১০) [চৌ. মে. ই. মি (৯) ৫ম খণ্ড, ১৯১৬ ইং, পৃ. ৪২১]

পরিচয়—পৃ. প. ১+২+১০ ; বা. প. ১৪ ; পা. প. ৮ ; উ. প. ৪০ ; পু. প. ২৫-২৭ ; পা. রে. ৪৫ ; পৃ. ব. ১২ ।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫ কিছু অধিক ; দেহের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ৭/২৫ ; পুচ্ছদৈর্ঘ্য দেহের ১/৬ । চক্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের ৩/৫ ; তুণ্ডের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১/২০ ।

দেহ চিপিট ভল্লাকার। পৃষ্ঠপ্রান্ত পৃষ্ঠপক্ষ পর্য্যন্ত সরল, পশ্চাতে ন্যুব্জ। উদরপ্রান্ত মলদ্বার পর্য্যন্ত ন্যুব্জ, পশ্চাতে কুব্জ ; দুই প্রান্ত প্রায় সমান। তুণ্ড সামান্য ভাবে সম্মুখে প্রলম্বিত। উর্দ্ধহনু হনুসন্ধির নিকটে স্ফীত এবং শ্বাসরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষের আরম্ভ পুচ্ছমূল অপেক্ষা তুণ্ডের নিকটতর ; উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের প্রায় ১/৫ ; ইহাতে ২০টি চেপ্টা শল্ক আছে। উদরপক্ষ দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ৮/২৫ ; বাহুপক্ষ পাদপক্ষের মূলদেশ অতিক্রম করিয়া পশ্চাতে বিস্তৃত, ইহার কুক্ষিতে একটি প্রশস্ত শাখা আছে ; ইহার দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের প্রায় ১/৫ । পাদপক্ষ ইহার মূলদেশ হইতে মলদ্বারের দূরত্বের অর্দ্ধাংশ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহার মূলদেশে একটি প্রশস্ত শাখা আছে ; ইহা দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের ১/১৪ । পুচ্ছপক্ষ দ্বিখণ্ডিত, নিম্নাংশটি সামান্য দীর্ঘতর।
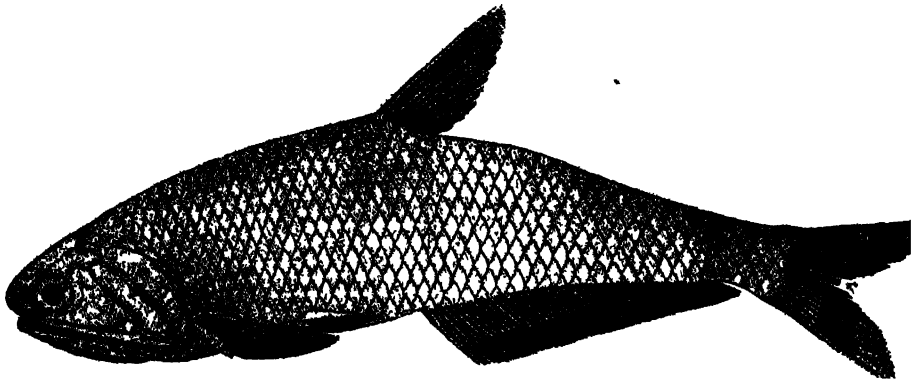
চিত্র—১১

শল্ক—উদরপ্রান্তের অন্তভাগে ২৩টি দৃঢ় শল্ক থাকে, তন্মধ্যে ৮টি পাদপক্ষের পশ্চাতে বর্ত্তমান

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ কাল, দেহের মধ্যভাগ এবং উদরের পূর্ব্বাংশ রৌপ্যবর্ণ, অবশিষ্টাংশ মলিন পীতবর্ণ, পক্ষগুলি স্বচ্ছ।

চিল্কাহ্রদে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে আড়াই ইঞ্চির উপর।

(২৭) Engraulis rambhae Choudhuri (চিত্র ১১) [চৌ. মে. ই. সি (৯) ৫ম খণ্ড ১৯১৬ ইং, পৃ, ৪২৩]

পরিচয়—পৃ. প. ১×১+১০ ; উ. প. ৪০ ; বা. প. ১৩ ; পা. প ৭ ; পু. প. ৩০ পা. রে. ৪৬ ; পৃ. ব. ১২ ।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ৬/২৫ ; দেহের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ১৩/২৫। চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের ১/৪ তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব চক্ষুর ব্যাসের ৪/৬।

পৃষ্ঠপ্রান্ত অতিশয় ন্যুব্জ ; উদরপ্রান্ত প্রায় সরল। দেহ চেপ্টা। তুণ্ড সুবর্দ্ধিত। উর্দ্ধহন্বাস্থি হনুসন্ধির নিকটে স্ফীত ; ইহার ক্রমসূক্ষ্ম পশ্চাৎখণ্ড শ্বাসরন্ধ্রের পশ্চাদ্দিকে কিছু প্রলম্বিত ; কিন্তু বাহুপক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে না।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ পুচ্ছমূল হইতে তুণ্ডের নিকটতর। উদরপক্ষ দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের প্রায় ৪/৬। বাহুপক্ষ পাদপক্ষমূল অতিক্রম করিয়া ইহার ৩/৪ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; বাহুপক্ষের শাখাটি ক্ষুদ্র ও পাতলা ; বাহুপক্ষ দেহদৈর্ঘ্যের ৯/৫০। পাদপক্ষ দেহদৈর্ঘ্যের ৯/১০০ ; ইহার শাখাটি ক্ষুদ্র এবং পাতলা ; পাদপক্ষের অগ্রভাগ মলদ্বারের তিন শল্ক পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পুচ্ছপক্ষ দ্বিখণ্ডিত।
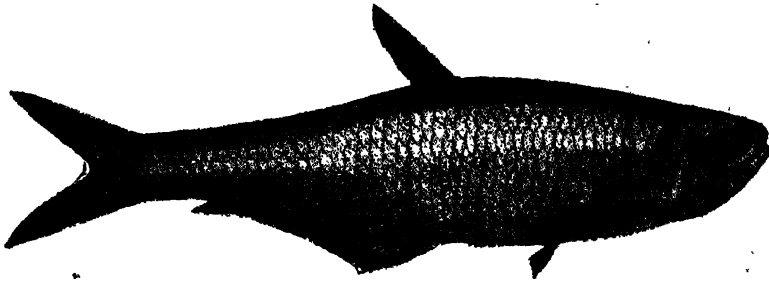
চিত্র—১২

শল্ক—উদরপ্রান্তের পূর্ব্বভাগে ২২টি দৃঢ় শল্ক থাকে, তাহাদের মধ্যে ৭টি পাদপক্ষের পশ্চাতে থাকে।

বর্ণ—পৃষ্ঠপ্রান্ত কাল ; দেহ রৌপ্যবর্ণ, উর্দ্ধভাগ পীতাভ পিঙ্গল, নিম্নভাগ পশ্চাদ্দিকে পিঙ্গলবর্ণ। পক্ষগুলি স্বচ্ছ।

রম্ভা উপসাগরে দৃষ্ট হয় (চিল্কা হ্রদ)। দৈর্ঘ্যে ৩॥০ ইঞ্চির উপর।

(২৮) Engraulis purava (H.B.) (চিত্র ১২) [Clupea purava, হা. বু. (১) ; পৃ. ২৩৮, ৩৮২ ; ডে (৩) পৃ. ৬২৮ ; ডে (৪) ১ম, ৩৯৩ ; চৌ. মে. ই. সি (৯) ৫ম খণ্ড, ১৯১৬, পৃ. ৪২৪]

পর্য্যায়—পুসই, তাঁপরা (উড়িষ্যা) (৩) ; পেড্ডা পুরবা (তেলেগু)।

পরিচয়—ছন্ন. ১২ ; পৃ. প. ১+১৩ (৩+১০) ; বা. প. ১৫ ; পা. প. ৬ ; উ. প. ৪৫-৪৭ (২+৪৩-৪৫), পা. রে ৪৬ ; পৃ. ব. ১২।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ৪/২৩ হইতে ১/৫, পুচ্ছদৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ৪/২৩ হইতে ১/৬ ; দেহের উচ্চতা দৈর্ঘ্যের ৪/১৭ হইতে ২/৯। চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের ২/৯ হইতে ১/৫ ; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব ব্যাসের ৩/৪ এবং পরস্পরের দূরত্ব ১ ব্যাস।

তুণ্ডাগ্র নিম্নহনুর সম্মুখে সামান্যভাবে প্রলম্বিত। শ্বাসকূপচ্ছদের মসৃণাংশ প্রস্থতার দ্বিগুণ উচ্চ এবং তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। উর্দ্ধহনু হনুসন্ধির নিকটে স্ফীত; ইহা বাহুপক্ষের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত।

দন্তগুলি সূক্ষ্ম। শ্বাসকঙ্কতের কণ্টকগুলি ভল্লাকার এবং পরস্পরের দূরে অবস্থিত।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ তুণ্ডাগ্র এবং পুচ্ছমূলের মধ্যে অথবা শেষোক্তটির নিকটতর। বাহুপক্ষ পাদপক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাদপক্ষ উদরপক্ষের মূলদেশের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ। পুচ্ছপক্ষ দ্বিখণ্ডিত।

শল্ক—সুশৃঙ্খলভাবে পার্শ্বগ রেখায় সজ্জিত। পৃষ্ঠ ও উদরপক্ষের পাদশেষে একটি ক্ষুদ্র সারি থাকে। কণ্ঠ এবং পাদপক্ষের মূলদেশের মধ্যে ১৫ অথবা ১৬টি এবং পাদপক্ষ ও উদরপক্ষের মধ্যে ১০ বা ১১টি দৃঢ় শল্ক থাকে।

বর্ণ—রৌপ্যবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ইস্পাতের ন্যায় নীলবর্ণ। মস্তকে স্বর্ণবর্ণের আভা আছে; পৃষ্ঠ ও পুচ্ছপক্ষ পীতাভ। মস্তকের পশ্চাতে পিয়ারার আকারের একটি কাল দাগ আছে।
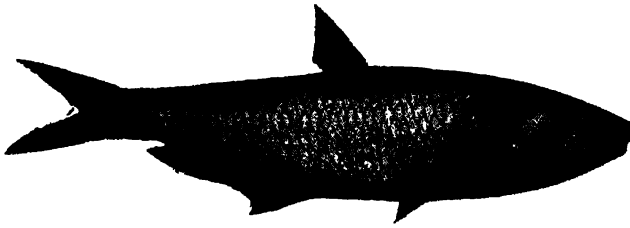
চিত্র—১৩

ভারত মহাসাগরে ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

(২৯) Engraulis mystax (চিত্র ১৩) (Bl. and Schn.) [ডে (৩) পৃ. ৬২৫, চিত্রপট্ট ১৫৭, চিত্র ৩; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯০]

পর্য্যায়—রাম ফ্যাসা (চাটিগাঁ) (৩,১১)।

পরিচয়—চ্ছ. ১২-১৪; পৃ. প. ১+১৩—১৫ (৩+১০-১২) বা. প. ১২; পা. প. ৭; উ. প. ৩৫—৩৮ (২—৩+২৩—৩৫); পু. প. ১৯; পা. রে. ৪৫; পৃ. ব. ১২।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ১/৫; পুচ্ছদৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ২/১১; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের ২/৯ হইতে ৩/১১। চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের ২/৯, তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব চক্ষুর ব্যাসের সমান, পরস্পরের দূরত্ব চক্ষুর ব্যাসের ৩/৪।

তুণ্ড প্রলম্বিত। উর্দ্ধহন্বস্থি হনুসন্ধির নিকট স্ফীত, ইহা বাহুপক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। শ্বাসকূপচ্ছদ প্রস্থতার দ্বিগুণ উচ্চ।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ তুণ্ডাগ্র ও পুচ্ছাগ্রের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ। পুচ্ছপক্ষ দ্বিখণ্ডিত, নিম্নখণ্ড

দীর্ঘতর। উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের শেষের অংশুর পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ। বাহুপক্ষ পাদপক্ষের শেষের $^1/_3$ খণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাদপক্ষ ক্ষুদ্র।

শল্ক—পাদপক্ষের পশ্চাতে ৯টি সবল দৃঢ় শল্ক এবং পূর্ব্বে ১৬ বা ১৭টি নরম দৃঢ় শল্ক আছে। শ্বাসকঙ্কতের নিম্নাংশের কণ্টকগুলি সংখ্যায় ১৩, ইহারা দৈর্ঘ্যে চক্ষুর ব্যাসের $^2/_3$। উপফুল্কা (pseudo branch) অস্পষ্ট।

বর্ণ—পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ পীতবর্ণ; পুচ্ছের পশ্চাৎ এবং উর্দ্ধভাগ কাল (অন্ততঃ বাল্যাবস্থায়); স্কন্ধদেশে কাল শিরা থাকে।

ভারত মহাসাগরে এবং বড় বড় নদীর মোহনায় দৃষ্ট হয়। চীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জেও দৃষ্ট হয়।

(৩০) Engraulis telara (H.B.) (চিত্র ১৪) [Clupea telara phasa হ্যা. ব. (১), পৃ. ২৪১, ৩২৮; ডে (৩) পৃ. ৬২৭; চিত্রপট্ট ১৫৮, চিত্র ২; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯২]

পর্য্যায়—তিলর (দিনাজপুর) (১৩); তেনাড় (১৭); গাংফেসা (কলিকাতা) (১৩); খয়রা তেলি; তেলতাঁপরি, তাঁপার (উড়িষ্যা) (১২); তালগাগরা (মালদহ) (১১);
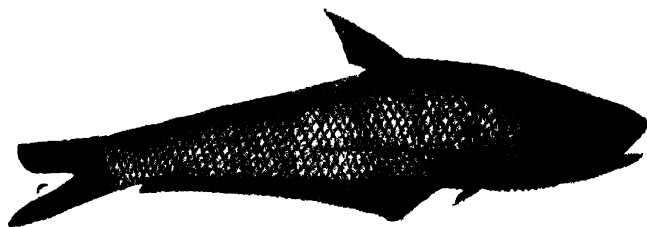
চিত্র—১৪

ফোইঙ্গ্যা (গোয়ালপাড়া) (১৩); ফাঁসা (মহানন্দা নদী) (১৩); ফসিয়া (বিহার) (১৩); ফেওয়া (পূর্ব্ববঙ্গ) (১১); ফিরকি (পুরী, বালেশ্বর) (১৩); ফাসিয়া (চাটিগাঁ পাহাড়) (১৩); ফান্সা (চাটিগাঁ) (১৩); ফাউয়া (নোয়াখালী) (১৩); ফান্সা (পূর্ণিয়া) (১৫); আঙ্গার (উড়িষ্যা)।

পরিচয়—চক্ষু. ১২-১৩; পৃ. প. ১+১৪-১৫ (২-৩+১২); বা. প. ১৫; পা. প. ৭; উ. প. ৭০-৮০ (২+৬৮-৭৮); পু. প. ১৯; পা. রে. ৫২; পৃ. বু. ১৪।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের $^1/_6$ হইতে $^1/_7$; পুচ্ছের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের $^1/_6$ হইতে $^2/_{13}$; দেহের উচ্চতা দেহদৈর্ঘ্যের $^2/_9$। চক্ষুর ব্যাস মস্তকের দৈর্ঘ্যের $^2/_9$; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব ব্যাসের $^3/_4$ এবং পরস্পরের দূরত্ব ব্যাসের $^3/_2$।

উদরপ্রান্ত পৃষ্ঠপ্রান্ত অপেক্ষা ন্যুব্জতর। তুণ্ডাগ্র কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত। উর্দ্ধহনু হনুসন্ধির নিকটে স্ফীত, শ্বাসকূপ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত এবং স্ফীতস্থল হইতে অগ্রভাগে সমভাবে সূক্ষ্ম। শ্বাসকূপচ্ছদ প্রস্থতার দ্বিগুণ উচ্চ।

শল্ক—দুই চোয়ালে সূক্ষ্ম; তালুতে বৃহত্তর; নীহ্নিকাস্থিতে কতকগুলি সূক্ষ্ম।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ উদরপক্ষের কিছু পশ্চাতে আরম্ভ; পুচ্ছের পাদদেশ অপেক্ষা তুণ্ডাগ্রের নিকটতর। বাহুপক্ষের উপরের ১ম অংশুটি কিছু প্রলম্বিত অথবা দীর্ঘ এবং উদরপক্ষের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বাহুপক্ষ পাদপক্ষের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পুচ্ছ দ্বিখণ্ডিত; দুই খণ্ডই সূক্ষ্মাগ্র অথবা নিম্নখণ্ড দীর্ঘতর এবং উপরের খণ্ড কর্ত্তিত (অসূক্ষ্ম)। উদরপক্ষ দৈর্ঘ্যে দেহদৈর্ঘ্যের (পুচ্ছ সমেত) অর্দ্ধাংশের অনেক অধিক।

শল্ক—শীঘ্র খসিয়া পড়ে; পাদপক্ষের সম্মুখে ১৫।১৬টি এবং পশ্চাতে ৭টি কণ্টকাকার শল্ক থাকে। উপকুম্ভ অস্পষ্ট। শ্বাসকঙ্কতের কণ্টকগুলি চক্ষু অপেক্ষা দীর্ঘতর।

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ সবুজাভ; উদর রৌপ্যবর্ণ, তাহাতে স্বর্ণবর্ণের আভা থাকে। পৃষ্ঠ ও পুচ্ছপক্ষ পীতবর্ণ; পুচ্ছের উপর খণ্ড এবং পৃষ্ঠপক্ষের প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ; বাহুপক্ষ বাল্যাবস্থায় পীতাভ, কিন্তু পূর্ণাবস্থায় নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ; দীর্ঘ অংশুটি পশ্চাতের ৩/৪ অংশে কোন রং থাকে না। পাদ ও উদরপক্ষ স্বচ্ছ।
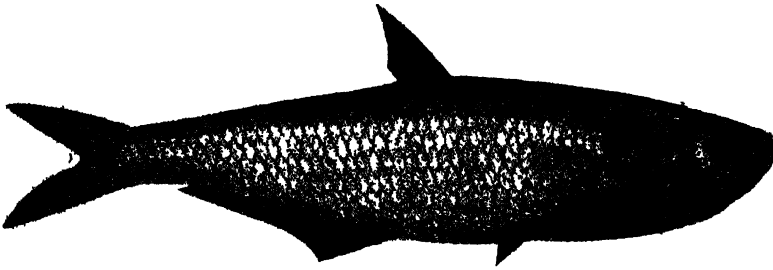
চিত্র—১৫

হ্যামিল্টন বুকানন সাহেব গাংফেসা (E. telara) এবং ফেসা (E. phasa) এই দুই মৎস্যকে দুই জাতির অন্তর্গত করিয়াছেন। গাংফেসার বাহুপক্ষের ১ম অংশুটি সামান্য দীর্ঘ, পুচ্ছের উপরের খণ্ডটি কর্ত্তিত এবং অসূক্ষ্ম। ফেসার বাহুপক্ষের ১ম অংশুটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং পুচ্ছের দুই খণ্ডই তীক্ষ্ণ। কলিকাতায় অনেকগুলি মৎস্য পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, দুইটি এক জাতীয়। যে দুইটি প্রভেদ উল্লিখিত হইল তাহা অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় না।

উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, কাছাড় ও ব্রহ্মদেশে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ ১৬ ইঞ্চি হয়।

(৬১) Engraulis hamiltonii (চিত্র ১৫) (Gray and Hard.) [ডে (৩) পৃ. ৬২৫, চিত্রপট্ট ১৫৭, চিত্র ৪; ডে (৪) ১ম, পৃ. ৩৯২]

পর্য্যায়—ফ্যাসা (পূর্ব্ববঙ্গ) (১১,১২)।

পরিচয়—ছ. ১২; পৃ. প. ১+১৩ (২+১১; বা. প. ১২; পা. প. ৭; উ. প. ৪০-৪১; পু. প. ১৯; পা রে. ৪৪; পৃ. বৃ. ১১-১২।

মস্তকের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ২/২১ হইতে ২/১১; পুচ্ছের দৈর্ঘ্য দেহদৈর্ঘ্যের ২/২১; দেহের

উচ্চতা দৈর্ঘ্যের $^{8}/_{37}$। চক্ষুর ব্যাস মস্তকদৈর্ঘ্যের $^{8}/_{37}$; তুণ্ডাগ্র হইতে চক্ষুর দূরত্ব চক্ষুর ব্যাসের $^{3}/_{4}$; পরস্পরের দূরত্ব ১ ব্যাস।

তুণ্ডাগ্র কিঞ্চিৎ প্রবর্দ্ধিত; ঊর্দ্ধহনস্থি হনুসন্ধির নিকটে স্ফীত এবং প্রান্ত অক্ষিকোটরের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দন্তগুলি সূক্ষ্ম। শ্বাসকুপচ্ছদ উচ্চতায় প্রস্থতার দ্বিগুণের অধিক।

পক্ষ—পৃষ্ঠপক্ষ তুণ্ডাগ্র ও পুচ্ছমূলের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ। পুচ্ছপক্ষের নিম্নখণ্ড দীর্ঘতর। বাহুপক্ষ ক্ষুদ্র, পাদপক্ষের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উদরপক্ষ পৃষ্ঠপক্ষের পশ্চাতের অংশের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ।

শল্ক—শল্ক দৃঢ় সবল, পাদপক্ষের সম্মুখে ১৬টি এবং পশ্চাতে ১০টি। শ্বাসকঙ্কতের কণ্টকগুলির সংখ্যা পশ্চাতের শ্বাসকঙ্কতের নিম্নাংশে প্রায় ১৩। উপযুক্ত অস্পষ্ট।

বর্ণ—পৃষ্ঠদেশ পিত্তলবর্ণ, উদরদেশ নীললোহিত এবং স্বর্ণবর্ণের আভাযুক্ত; দুই-এর মাঝে একটি প্রশস্ত রৌপ্যবর্ণের রেখা আছে। শ্বাসকুপচ্ছদের উপর অংশের পশ্চাতে কাল শিরা আছে। পক্ষগুলি পীতবর্ণ; পুচ্ছপক্ষের প্রান্ত কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ।

ভারত মহাসাগর এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

কোলয়ড্ রসায়ন

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী

খুব ছোট ছোট পদার্থকণাকে উপযুক্ত তরল পদার্থের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যে চঞ্চল অবস্থায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহা লেবেন্ হোক্ অষ্টবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লক্ষ্য করেন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত এই চঞ্চলগতি কোন প্রকার জীবনীশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মনীষী ব্রাউন্ বিজ্ঞানজগতে এক নূতন সাড়া আনিয়া দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, কাচ, গন্ধক, কয়লা প্রভৃতির গুঁড়া—যাহাতে আদৌ কোন প্রকার জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না, তাহারাও জলের মধ্যে ঐ প্রকার চঞ্চল গতিতে ভ্রমণ করে। ব্রাউন্ বলিলেন যে, জলের অণুবৃন্দের তাপজনিত কম্পনফলেই এই চঞ্চল গতির উৎপত্তি হয়। জলের অণুগুলি কাচ, কয়লা বা গন্ধকের কণাগুলিকে ধাক্কা মারিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর গ্রেহাম্ এইরূপ পদার্থকে কোলয়ড্ নামে অভিহিত করেন।

কোলয়ডের বিশিষ্ট প্রকৃতি এই যে, খোলা চোখে সাধারণ অবস্থায় উহাদিগকে দেখিলে

কণাগুলির বিভিন্ন অস্তিত্ব কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু যদি একটি কাচের পাত্রে কোন প্রকার কোলয়ড্ রাখিয়া চারিদিক অন্ধকার করতঃ কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, এবং ঠিক উপর হইতে একটি বেশ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করা হয়—তাহা হইলে অনেক ছোট ছোট কণাকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। মনে হইবে যেন আকাশে শত শত নক্ষত্র ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

কোলয়ড্ রসায়ন লইয়া জেভন্স, স্নুল্‌ৎসে, গুয়ে, জিগ্‌মণ্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। জিগ্‌মণ্ডি কোলয়ড্ দ্রব (solution) হইতে কোলয়ড্‌কণা গণনা করিবার ও তাহাদের আকৃতি মাপিবার জন্য এক সুন্দর যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া কয়েক বৎসর হইল নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন। এই যন্ত্রকে অতি-অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (ultramicroscope) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতি-অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কার কোলয়ড্‌রসায়নে এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। উক্ত যন্ত্র সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, কোলয়ড্‌কণাগুলি আণুবীক্ষণিক হইতে আণবিক পরিমাণ আকৃতিতে বর্ত্তমান। কোলয়ডের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কণার ব্যাস এক ইঞ্চির ২৫ লক্ষভাগের এক ভাগ মাত্র। গ্রেহাম্ দেখাইয়াছেন কোলয়ড্‌কণা ও অণুতে তফাৎ এই যে, কয়েকটি অণু লইয়া একটি কোলয়ড্‌কণা গঠিত। আমরা সাধারণতঃ পদার্থের তিন প্রকার অবস্থার কথা জানি—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। কোলয়ড্‌কে বাস্তবিক আমরা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া ধরিতে পারি। জেভন্স ও তৎপরবর্ত্তী প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই বলেন, কোলয়ড্‌কণাগুলির দেহে একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি বর্ত্তমান—যাহার জন্য উহারা স্বচ্ছন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির উপরই উহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এই শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বার্টন্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনেক সুন্দর সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা লইয়া আমাদের দেশেও অনেক গবেষণা চলিতেছে। ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কোলয়ড্‌কে দ্রব হইতে অবিক্ষিপ্ত (precipitated) করা যায়।

কোলয়ড্ তৈয়ারী করিবার দুইটি প্রধান উপায় আছে। প্রথম উপায় হইতেছে, কোন রকমে পদার্থকে খুব ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা। দ্বিতীয় উপায়ে পদার্থের কতকগুলি আণবিক অংশকে জড় করিয়া আণুবীক্ষণিক আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা। প্রথম উপায়ে কোলয়ড্ তৈয়ারী করিতে হইলে, বড় বড় পদার্থখণ্ডকে পিশিয়া, বা দুই ধাতুখণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিয়া করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়ে, প্রয়োজন মত উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিলে পদার্থের কতকগুলি অণু মিলিয়া একটি বড় অণু বা কোলয়ড্‌কণাতে পরিবর্ত্তিত হয়। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়া যে সম্পূর্ণ রাসায়নিক তাহা অনেকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মনুষ্যজীবনের সঙ্গে কোলয়ড্ গভীরভাবে জড়িত। আমাদের অধিকাংশ খাদ্য, দুধ, চা প্রভৃতি পানীয়, পরিধানের বস্ত্রাদি—এমন কি যে পৃথিবীর উপর আমরা ভ্রমণ করি তাহা শুদ্ধ—সমস্তই কোলয়ড্‌ময়।

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোলয়ড্ রসায়নশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ উপলব্ধি হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে, আমাদের শরীরের মধ্য যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই শরীরের মধ্যে কোলয়ড্‌রূপ পদার্থ জমার জন্য। কাজেই যেমন বিষ প্রয়োগে বিষ নষ্ট করা হয়, তেমনি কোলয়ড্-জনিত ব্যাধি নষ্ট করিবার জন্য ঔষধকে কোলয়ড্-রূপে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা দরকার; যেমন, আর্শেনিক, গন্ধক ও কুইনিন্। কোলয়ড্ রূপে ও সাধারণ অবস্থায় এই সকল ঔষধের প্রক্রিয়া একেবারে বিভিন্ন।

প্রাণিজগতে ও উদ্ভিদ্‌জগতে অনেক জিনিষ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণতঃ কোলয়ড্‌রূপে বিদ্যমান থাকে। কাজেই কোলয়ড্ রসায়নের অনুশীলন জন্য বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন প্রেরণা আসিয়াছে। উপরন্তু দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা পৃথিবীর যে কোন পদার্থকেই কোলয়ড্‌আকৃতিতে পরিণত করা যাইতে পারে। সুতরাং সকল প্রকার রাসায়নিক আলোচনাতে কোলয়ড্ রসায়ন একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাবান, নানা প্রকার রঙ্ প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীগুলিকে আজ কোলয়ড্ রসায়নের নবলব্ধ জ্ঞানই এত উন্নত করিতে পারিয়াছে।

কৃষিকার্য্যেও কোলয়ড্ রসায়নের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমস্তই কোলয়ড্। কাজেই জমির সহিত সারের কিরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিতে পারে, ইহা জানিতে হইলে কোলয়ড্ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে দুধের কথা আসিয়া পড়ে। দুধ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উহা কোলয়ড্। দুধের মধ্যে "আল্‌বুমিন্" ও "কেসিন্" নামক দুইটি পদার্থ আছে। এই দুইটির মধ্যে "কেসিন্"ই শরীরের পুষ্টি সাধন করে। "আল্‌বুমিনে"র কাজ হইতেছে "কেসিন্"কে কোলয়ড্‌রূপে রক্ষা করা; অবক্ষিপ্ত হইতে অর্থাৎ ছানা কাটিতে না দেওয়া। কোনরূপ টক অথবা এসিড্ সংযোগে দুধের "আল্‌বুমিন্" নষ্ট করিয়া দিলে "কেসিন্" ছানা হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, শিশুরা সহজে গরুর দুধ হজম করিতে পারে না, কিন্তু গাধার দুধ হজম করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, গাধার দুধে গরুর দুধ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ "আল্‌বুমিন্" বেশী থাকে। কাজেই গাধার দুধে "কেসিন্"কণাগুলি সহজে ছানা কাটিয়া পড়িতে পারে না। ইহা হজমের পক্ষে অনুকূল।

রাস্না বা অর্কিড

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ফুলের কেন এত আদর ? কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, ফুল সকলেরই প্রিয়। কি ধনীর সুরম্য অট্টালিকায়, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, ফুল সর্ব্বত্র সমানভাবে আদৃত। পৃথিবীতে এত রকমের ফুল পাওয়া যায় যে বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রায় সকল ফুলই সুন্দর, কিন্তু আমাদের মনে হয়, রাস্না ফুলের ন্যায় সুন্দর ফুল বুঝি আর নাই। সভ্য জগতে উদ্যানে ইহার আদরের সীমা নাই, এবং গৌরবে ইহা অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। কতকগুলি রাস্নাফুল বড়ই মনোহর এবং তাহাদের গঠন বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তাহাদের সাদৃশ্য প্রাণীজগৎ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। কোনটি দেখিতে প্রজাপতির মত, কোনটি মৌমাছির মত, কোনটি বা হংসের মত। এই ফুল কেবল মানুষকে আনন্দ দিবার জন্যই নহে; বিধাতার অসাধারণ শক্তি ও অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিতেই যেন ইহারা জগতের চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে।

রাস্না বলিতে সাধারণতঃ আমরা একপ্রকার সুন্দর রং ও গন্ধযুক্ত ফুল বুঝিয়া থাকি। ঐ ফুল সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু জানিতে হইলে উহার গঠন, প্রকৃতি, আবাসস্থান ও চাষ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। কি কৌশলে তাহারা বাঁচিয়া থাকে ও বড় হয়, এবং ঈশ্বরের কি অদ্ভুত ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে অতি সহজ উপায়ে ইহাদের অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ বিশেষ পরস্পর মিলিত হইয়া এমন অপরূপ বর্ণের ফুল উৎপাদন করে, তাহা বেশ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয়। রাস্না পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মাঠে, বনে, বা পাহাড়ে সহজপ্রাপ্য যে সকল মনোহর রাস্না জন্মিয়া থাকে, সেগুলির গঠন ও শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিব।

বিষয়টিকে দুরূহ ও অপ্রীতিকর মনে করিলে সকল উৎসাহ ও উদ্যম ব্যর্থ হইবে। বিদ্যালয়ে সচরাচর অতি নীরস ভাষায় শুষ্ক লতাপাতার ব্যবচ্ছেদসহকারে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার ফলে শিক্ষার্থিগণ বিষয়টি রসহীন ও কঠিন মনে করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু আমার মনে হয় এই শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বেশ সরল ও সুললিত কথায় বিবৃত করা যাইতে পারে। শুষ্ক লতাপাতার পরিবর্ত্তে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের উজ্জ্বল বর্ণে মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকচ্ছলে লতাপাতাফুলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে উদ্ভিদবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। এইরূপভাবে অনুশীলন করিলে বিষয়টি অপ্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত আমোদজনক হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইলে প্রথমতঃ কতকগুলি নামের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সূক্ষ্মদর্শী হইতেও অভ্যাস করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে বিভিন্ন প্রকারের লতা, গাছ, ফুল প্রভৃতির মধ্যে প্রধানতঃ কি প্রভেদ তাহা বুঝা বা মনে রাখা সুকঠিন হইবে।

প্রত্যেক গাছের ৫টি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; যথা—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল। প্রথম ৩টি শব্দের প্রচলিত অর্থ সকলেই জানেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা ফল বলিতে সকল রকম ফল বুঝিয়া থাকেন; কেবল যে পেয়ারা, পেঁপে, আম, জাম প্রভৃতি বুঝেন এমন নহে; যব, ধান, নারিকেল, শুপারি প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যও ঐ নামে অভিহিত করেন।

আমার মনে হয়, ফুল সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই বড় বেশী কিছু জানেন না। বীজ সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন, ফুলের মধ্যে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফুলের

চিত্র—১
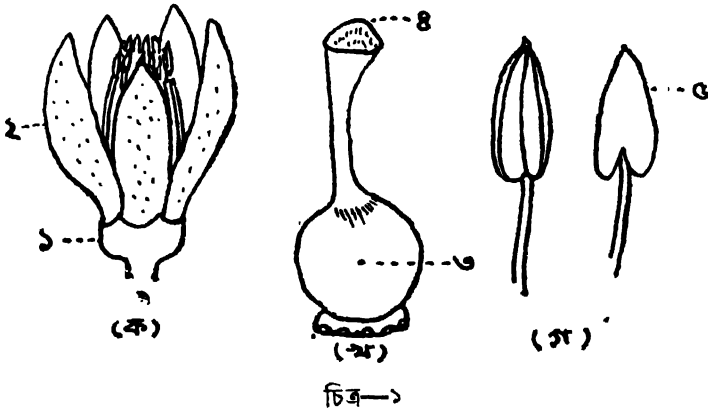
(ক) নেবুফুল, (খ) গর্ভকেশর, (গ) পরাগকেশর

১। বৃতি, ২। পুষ্পমুকুট, ৩। গর্ভকোষ, ৪। মুণ্ড, ৫। পরাগকোষ

ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; কিন্তু সচরাচর লোকে তাহা ব্যবহার করে না। সুতরাং ঐ নামগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। একটি নেবুফুল লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা যাক।

নেবুফুলের ঠিক মধ্যস্থলে সবুজবর্ণের একটি স্থূল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম "গর্ভকেশর"। ঐ সবুজ বস্তুটির নীচের অংশ ঈষৎ স্থূল ও গোলাকার এবং উপরের অংশটি আলপিনের মাথার মত, এবং আঁঠাল ও চকচকে। নীচের ঐ স্থূল অংশটির নাম "গর্ভকোষ" এবং উপরের গোল মাথাটির নাম "মুণ্ড"। "গর্ভকোষ" ও "মুণ্ডে"র মধ্যবর্ত্তী অংশটিকে "গর্ভতন্তু" বলে। "গর্ভকোষটি" দেখিতে যদিও একটি নিরেট বস্তুর বা কচি বীচির মত, কিন্তু বাস্তবিক

ইহা বীচি নহে। গর্ভকোষের ভিতরটা ফাঁপা ও উহাতে কতকগুলি খুব ছোট ছোট ডিম্বের মত পদার্থ আছে। ঐ গুলিকে ডিম্বাণু বলে। বড় হইলে ইহারা বীচি হয়। ডিম্বাণুই বড় হইয়া বীচি হয় বটে, কিন্তু সকল ডিম্বাণু বীচিতে পরিণত হয় না। ডিম্বাণুর পরিণতি মুণ্ডের উপরে পরাগ পতিত হওয়ার উপর নির্ভর করে। এই সকল আশ্চর্য্যজনক কার্য্যাবলির আলোচনা আমরা পরে করিব।

পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ১০।১২টি শাদা সূত্রাকার পদার্থ গর্ভকেশরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই গুলিকে "পরাগকেশর" বলে। ইহাদের প্রত্যেকের উপরিভাগে একটি করিয়া হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র কৌটার মত পদার্থ আছে; তাহাকে বলে "পরাগকোষ"। পরাগ-কোষের ভিতর হইতে একরূপ হলদে রঙের গুঁড়া নির্গত হয়। এই গুলিকে "পরাগ" বা "রেণু" বলে। পরাগকেশরকে বেষ্টন করিয়া আছে ৪।৫টি বড় বড় শাদা পুরু পাপড়ি। এই পাপড়ি গুলিকে "পুষ্পমুকুট" বলা হয়। সচরাচর ফুলের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য পাপড়ির উপর নির্ভর করে। পাপড়িগুলির পাদদেশ হইতে মধু নিঃসৃত হয়। মধুমক্ষিকারা তাহাদের খাদ্যের জন্য এই মিষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে। সুযোগ পাইলে আমরাও তাহাদের চাক ভাঙ্গিয়া মধু আহরণ করি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ফুলের পাপড়িগুলি একটি ছোট সবুজ "বাটী"র মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই সবুজ পদার্থটির নাম "বৃতি"। সকল ফুলের "বৃতি" একরূপ নহে। কোন কোন ফুলের বৃতি পৃথক এবং বিস্তৃত। নেবু ফুলে ৪।৫টি বৃতি সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া বাটীর আকার ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীর সকলপ্রকার ফুলেই পূর্ব্বোক্ত চারিটি অবয়ব আছে। অবশ্য ঐ সকল অবয়বের গঠন, বর্ণ ও সজ্জাপ্রণালী সব ফুলে একরূপ নহে। তবে মোটামুটি একই প্রকার বলা যাইতে পারে। ফুলটির নিম্নদেশে বৃতি থাকে। কোরক অবস্থায় উহা পাপড়ি ও অন্যান্য অবয়বগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়া নানা প্রকার অনিষ্টের হাত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করে। বৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর পাপড়িগুলি অবস্থান করে; পাপড়িগুলির ভিতরে থাকে পরাগবহনকারী সুতার মত কতকগুলি পদার্থ, আর সকলের মধ্যে থাকে বীজবহনকারী কৌটাটি।

সাধারণ ফুলের সহিত রামাফুলের কোন বিভিন্নতা আছে কিনা, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি।

গাছের সৃষ্টির প্রারম্ভে গাছে ফুল ধরিত না। ফুলের স্থানে কয়েকটি আবর্ত্তপত্র থাকিত। কালে এই পত্রগুলি অল্পে অল্পে তাহাদের প্রকৃতি ও আকৃতি বদলাইয়া আধুনিক পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে। নেবুফুল পরীক্ষাকালে দেখা গিয়াছে যে এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক অঙ্গের নাম ও আকৃতি যেমন পৃথক পৃথক, তেমনি তাহাদের কার্য্যও ভিন্নরূপ। পাপড়িগুলিকে পত্র বলিলে অনেকেই হয়তো

আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু এরূপ রূপান্তর সত্যসত্যই ঘটিয়াছে এবং তাহার পরিচয় সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

বনগোলাপে একস্তর মাত্র পাপড়ি দেখা যায়। এই বনগোলাপ বহুবৎসরের যত্ন ও চাষের পর আমাদের বাগানের সুন্দর বহুস্তর পাপড়ি-বিশিষ্ট ফুলে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বহুস্তর ফুলকে দোহারা ফুল বলে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বুনো গোলাপে অসংখ্য পরাগকেশর রহিয়াছে কিন্তু দোহারা ফুলে পরাগকেশরের বা গর্ভকেশরের সংখ্যা তত বেশী নাই। তাহার কারণ কি? সেগুলি কোথায় লুকাইল? সেগুলি লুকায় নাই, কেবল রূপান্তরিত হইয়া পাপড়িতে পরিণত হইয়াছে। অতএব গর্ভকেশর, পরাগকেশর পাপড়ির রূপান্তর মাত্র। আবার অনেক গোলাপফুলের বৃতি দেখিতে অবিকল গোলাপের পাতার মত। অতএব বৃতিগুলিকেও পত্রের রূপান্তর মনে করা যাইতে পারে। কোন কোন গোলাপফুলে এক আধটা পাপড়ির রং ও রূপ বৃতির বা পত্রের ন্যায়। অতএব পাপড়ি ও বৃতি উভয়ই পত্র। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, পুষ্পের সকল অবয়বগুলিই পত্রের রূপান্তর মাত্র।

সমস্ত ফুলে ৪টি অবয়ব থাকিবার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ফুলেই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সকল ফুলে সকল অবয়ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন ফুলে এক বা একাধিক অবয়বের লোপ পাইয়াছে, আবার কোনও ফুলে বা একটি অবয়ব অন্য অবয়বের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দুই অবয়বের নিয়দিকটা মিশিয়া যায়। পাপড়িগুলি বৃতির গায়ে লাগান বা পরাগকেশরগুলি পাপড়ির গায়ে লাগান এইরূপ নানা রকমের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়।

নেবুফুলের সহিত রাস্নাফুলের কি পার্থক্য এইবার তাহা দেখা যাক। ডেণ্ড্রোবিয়ম নোবিলি প্রায় সকল বাগানে পাওয়া যায়। এই ফুল দেখিতে বড় সুন্দর। ইহাতে সমগ্র রঙ্গিন পত্রের সংখ্যা ছয়টি। ৩টি পত্র অপর ৩টির মধ্যে অবস্থিত। এই ফুলের মধ্যের গোলাকার পাপড়িটি—যাহাকে নিম্নদল বলে—প্রথমেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করে। নিম্নদলের পাদদেশ একটি অতি সঙ্কীর্ণ অঙ্গের দ্বারা ফুলের অন্য অঙ্গের সহিত সংযুক্ত। ইহা এমনই স্থিতিস্থাপক যে ইহার উপর একটি মৌমাছি বসিলেও পাপড়িটি অনেকটা অবনত হইয়া যায় এবং কীটটি উড়িয়া গেলে পাপড়িটি যথা স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাকী ৫টি পাপড়ি ডিম্বাকৃতি এবং প্রসারিত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে, এই ফুলে নেবু-ফুলের মত বৃতি নাই, কেবল পাপড়ি আছে। কিন্তু ইহাতে বৃতি ও পাপড়ি দুইই বর্ত্তমান। কোন্‌টি বৃতি এবং কোন্‌টি পাপড়ি, তাহা ঠিক করা একটু দুরূহ; কারণ তাহারা দেখিতে একরকম। বিশেষতঃ গোলাকার প্রশস্ত নিম্নদলটি যে কি, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমরা জানি, বৃতি পাপড়ির বাহিরে থাকে; এতএব বাহিরের ৩টি পত্র বৃতি এবং ভিতরের ৩টি পত্র পাপড়ি। সত্য বটে এখানে বৃতি এবং

পাপড়ির মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুলের সকল অবয়বগুলিই পত্র এবং রাস্নাফুলে এই পত্রগুলির আকৃতি ও বর্ণ প্রায় একই রকমের। এই ফুলের অপরূপ আকৃতির কারণ আর কিছুই নহে; কেবল ইহার নিম্নদলটির আকার ও পরিমাণ অসঙ্গত এবং ইহার বৃতির ও পাপড়িগুলির গঠন ও বিন্যাসপ্রণালী অদ্ভুত ও অসাধারণ।
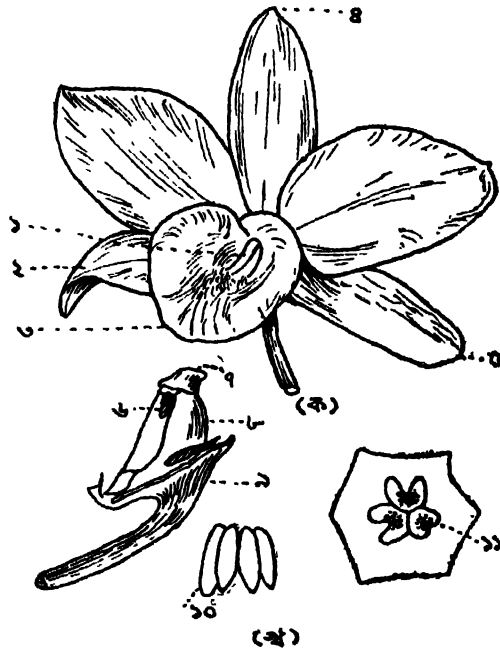
চিত্র—২

(ক) ডেণ্ড্রোবিয়ম নবিলি ফুল

(খ) ছেদিত গর্ভকোষের বিভিন্ন অংশ

১। দন্ত, ২। বৃতি, ৩। নিম্নদল, ৪। বৃতি, ৫। বৃতি,

৬। গর্ভদ্বার, ৭। পরাগপিণ্ডের ঢাকনা, ৮। দন্ত,

৯। গর্ভকোষ, ১০। পরাগপিণ্ড, ১১। ডিম্বাণু

আমরা দেখিয়াছি, নেবুফুলে বৃতি ও পাপড়ির পরবর্ত্তী অবয়ব পরাগকেশর ও তাহার পর গর্ভকেশর। আপাতদৃষ্টিতে রাস্নাফুলে এই দুই সারি পদার্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটি মাত্র মোটা "দন্ত" ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এই দন্তটি পরাগকেশর ও গর্ভকেশর মিলিত হইয়া গঠিত। দন্তের মাথার উপর একটি শাদা রঙ্গের ছোট ঢাকনা

আছে। এই ঢাকনার ঠিক নীচে নিম্নদলের ঠিক বিপরীত দিকে উজ্জ্বল আঠাযুক্ত একটি স্থান আছে। ইহা গর্ভদ্বার। দন্তটি বৃতির নীচেও কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই নীচের অংশটুকু সবুজ। ইহাই গর্ভকোষ। গর্ভকোষটি আড়াআড়িভাবে ছেদন করিলে দেখা যায়, ইহার ভিতর ফাঁপা এবং তিন পংক্তিতে অসংখ্য ডিম্বাণু সাজান। উল্লিখিত ঢাকনাটি উন্মোচন করিলে ছোট ছোট চারিটি হরিদ্রা রঙের পিণ্ডাকার পদার্থ দেখা যাইবে। এইগুলি কি? ইহার কিয়দংশ লইয়া জলের ভিতর দুই আঙ্গুলে রগড়াইলে এবং ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহাতে অসংখ্য পরাগ একসঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই পিণ্ডাকার পদার্থগুলি পরাগরেণুর সমষ্টি মাত্র। পরাগকোষ সাধারণতঃ কেশরের মাথায় থাকে। রাস্নাফুলে পরাগকেশরগুলির স্থলে মাত্র একটি দন্ত দেখা যায়। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় রাস্নাফুলের কেশরগুলি লোপ পাইয়াছে এবং পরাগকোষগুলি গর্ভকেশরের মাথার উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যায় যে, দন্তটি কেশর, পরাগ ও গর্ভকেশরের সম্মিলনে গঠিত। রাস্নাজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ফুলেরই পরাগপিণ্ড, দন্ত, নিম্নদল, ও অন্যান্য অঙ্গের রূপান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু গর্ভকেশর ও পরাগকেশর সংযুক্ত হইয়া সবগুলিতেই দন্তের রূপ ধারণ করিয়াছে। এই দন্তদ্বারা রাস্না-জাতিকে অন্য জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক করা যায়। কোন ফুল পরীক্ষা করিতে করিতে এইরূপ দন্ত দেখিলে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে সেইটি রাস্নাজাতীয় ফুল। দন্তই রাস্নাজাতির প্রধান বিশেষত্ব।

(ক্রমশঃ)

রাসায়নিক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইংরাজী মৌলিক (element) পদার্থগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচিত হইয়াছে। এই শব্দগুলি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রান্তর্গত সমুদয় উপধাতু (non-metal) গুলির নাম মাত্র। এক্ষণে উহাদের পরস্পর রাসায়নিক বৈধর্ম্মসংযুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ সমবায়ি বা compound-গুলির নামকরণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা দেখা যাক। ইংরাজীতে সমবায়ি বা compound পদার্থগুলির নামকরণে কয়েকটি প্রত্যয় (Suffix) এবং কয়েকটি উপসর্গের (Prefix) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্র আছে, যথা—*ide, ite, ate*। দুইটি বৈধর্ম্মসংযুক্ত দ্রব্যের ফলে যে সমবায়ি দ্রব্য উৎপন্ন

হয়, তাহাদের নামকরণ *ide* প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ; যেমন *Oxide, Sulphide* ইত্যাদি। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ করিতে হইলে দুইটি নিয়ম আবশ্যক। ইংরাজী ভাষায় *Oxide* শব্দটি রচিত হইয়াছে Ox অর্থাৎ Oxygen-এর সংক্ষিপ্তাকারের সহিত *ide* প্রত্যয় যোগ করিয়া। এক্ষণে দেখা যাক, সংস্কৃত শাস্ত্রানুশাসনে আমরা ঐরূপ শব্দ রচনা করিতে পারি কি না। একটি আপ্ত বাক্য আছে যে "নাম্নৈক দেশগ্রহণে নামমাত্রস্য গ্রহণং"। এই আপ্তবাক্যানুসারে 'অক্ষজন' শব্দটি গ্রহণ না করিয়া 'অক্ষ' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরে ইহাতে একটি প্রত্যয় যোগ করিলেই Oxide-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে।* এই প্রত্যয়টি 'ইদ' হইলেই ভাল। পাণিনি 'ইদ' প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন নাই। তবে একটি আপ্তবাক্য দিয়াছেন—"উণাদয়োবহুলম্।"

"কচিৎপ্রবৃত্তিঃ কচিদপ্রবৃত্তিঃ কচিদবিভাষাঃ। কচিদন্যদেব।
বিধেবির্ধানং বহুধা সমীক্ষ্য চাতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি।"

উক্ত আপ্তবাক্যের অনুশাসনে 'ইদ' উণাদিক প্রত্যয় ব্যবহৃত হইতে পারে। তাহা হইলে 'অক্ষ+ইদ' সম্পন্ন হইল। পরে পাণিনির "যস্যেতি"—"ইকারেতদ্ধিতে চ পরে ভস্যেবর্ণাবর্ণয়োর্লোপঃ" সূত্র মতে 'অক্ষ' শব্দের অন্তের 'অ' বর্ণের লোপ হওয়ায় সন্ধিপ্রকরণের দ্বারা 'অক্ষিদ' শব্দ সিদ্ধ হইল। এইরূপে Oxide-এর প্রতিশব্দ 'অক্ষিদ' ('অক্‌ষিদ'), Hydride=আর্দ্রিদ, Sulphide=শুল্বিদ, Chloride=কুল্‌হরিদ, Phosphide=ভাস্ফিদ, Hydroxide=আর্দ্রাক্ষিদ, ইত্যাদি রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে '*ite*' প্রত্যয়ের জন্য পাণিনি লিখিত 'ইতচ্' প্রত্যয় সংযোগ করা যাইতে পারে।† তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আপ্তবাক্যাদির অনুশাসনে 'শুল্ব+ইত'=শুল্বিত (Sulphite) 'নেত্র+ইত'=নেত্রিত (Nitrite)। এইরূপে যাবতীয় '*ite*'-যুক্ত শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচিত হইতে পারে। এখন বাকী রহিল '*ate*' প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি। পাণিনি 'এত' প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করেন নাই; সুতরাং উহা আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (অর্থাৎ 'ইদ'-এর ন্যায়) নিষ্পন্ন করার আবশ্যক দেখি না, কারণ 'যস্যেতিচ' সূত্রানুসারে যেমন 'নেত্র+ইত' পদের "নেত্র" শব্দের অন্তের 'অ' বর্ণের লোপ হইয়া যায়, সেইরূপ অন্যকোন আপ্তবাক্যের অনুশাসনে উক্ত 'অ' বর্ণের পুনরাগম ঘটাইতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।** এমন একটি আপ্তবাক্য বক্ষ্যমান শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে জার্ম্মাণি Oxygen-এর প্রতিশব্দ প্রথমে করিয়াছিলেন Sauerstoff, কিন্তু পরে compound করিতে গিয়া—"Oxid" করিয়াছেন। সুতরাং Sauerstoff, Stickstoff প্রভৃতি জার্ম্মাণ প্রতিশব্দগুলি সুবিধা হয় নাই।

† তদস্য তস্মিন্নিতি তারকাদিভ্যং ইতচ্। "ডিতিচ"—ডিতি পরে টের্লোপঃ। টি—অচোন্ত্যাদি টি—অচাং মধ্যে যো অন্ত্যঃ স আদির্য্যস্য তৎ 'টি' সংজ্ঞং স্যাৎ।

** এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে যেমন—'প্রেম' শব্দ প্র+ইমন্=প্রেম, এখানে প্রিমণ না হইয়া 'প্রেম' হইল।

"বর্ণাগমোবর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌচাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগঃ তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং ॥ বর্ণাগমোগবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ। ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাৎ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥"—ইতি সারস্বতচন্দ্রিকা।

"ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহোবর্ণ বিপর্য্যয়াৎ
গুঢ়োত্মা বর্ণ বিকৃতে বর্ণনাশাৎ পৃষোদরম্"—ইতি পাণিনি।

সুতরাং নেত্র + ইত = নেত্রেত (Nitrate), শুল্ব + ইত = শুল্বেত (Sulphate), আর্দ্র + ইত = আর্দ্রেত (Hydrate) ইত্যাদি শব্দ রচিত হইতে পারে।*

আরও দুই একটি প্রত্যয়-(Suffix) যুক্ত পদ ইংরাজীতে আছে ;—যেমন Hydroxyl, Nitrosyl, Phosphonium, Carborundum ইত্যাদি। সংস্কৃতে ইহাদিগের প্রতিশব্দ নিম্নলিখিত প্রকারে করা হইয়াছে। Hydroxyl = আর্দ্রাক্সিল (আর্দ্রাক্ষিল = আর্দ্র + অক্ষ + ইলচ্) Nitrosyl = নেত্রসিল (নেত্রস + ইলচ্—নেত্রং নেত্রজনং সপতি সমবৈতি ইতি 'নেত্রস'); Phosphonium = ভাস্ফনীয় (ভাস্ফনী + ইয়—ভাস্ফং ভাস্করসং নয়তি যঃ সঃ ইতি ভাস্ফনী = ভাস্ফ + নী + কিপ); Carborundum = কারবেন্দম = কারবং ইন্দং ঐশ্বর্য্যং (ইন্দং পরমৈশ্বর্য্যং ইতি গণদর্পণঃ) যস্য তৎ কারবেন্দম যদ্বা কারবম্ ইন্দতি বর্দ্ধয়তি যৎ তৎ কারবেন্দম। এইরূপ আরও কতকগুলি প্রতিশব্দ আমার পুস্তিকায় ব্যাখ্যার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার পর Nitrous acid ও Nitric acid-এর প্রতিশব্দ 'নেত্রসাম্ল' = নেত্রস + অম্ল এবং নেত্রিকাম্ল (নেত্র + ষ্ণিক + অম্ল) রচিত হইয়াছে।

Arsenic-এর প্রতিশব্দ "আর্জনী"—আর্জনং আর্জনিকং অস্য অস্তীতি "আর্জনী" সম্পাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে উপসর্গগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

সংখ্যা	ইংরাজী উপসর্গ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ
১।	Pyro (meaning fire i.e. burnt)	'প্রুষ'—দহি ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ ; 'প্রুষ্টঃ'—দগ্ধঃ ইত্যমরঃ।
২।	Meta (after, meaning little)	'মিতঃ'—'পরিমিতঃ স্বল্প' ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।
৩।	Ortho ('orthos'—right or rect)	অর্থা = ন্যায্য ইত্যমরভরতৌ।
৪।	Sub (under)	সবা = প্রতিকূলঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ বামঃ ইত্যমরঃ (বামঃ অধমঃ ইতি সিদ্ধান্ত-কৌমুদ্যামুণাদিবৃত্তিঃ)
৫।	Per (excess, above)	'প্র' = উৎকর্ষঃ, আধিক্য ইতি দুর্গাদাসঃ ; পরা = প্রাধান্যম্ ইতি মেদিনী।

* যেখানে এইরূপ হইবে সেখানে মূল শব্দের মাথায় দাঁড়ি দিলেই চলিবে ; যেমন শুল্ব + ইত = শুল্বেত।

সংখ্যা	ইংরাজী উপসর্গ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ
৬।	Hypo (under, below)	অপ = অপকৃষ্টার্থঃ ইতি মেদিনী ; উপ = হীনঃ ইতি দুর্গাদাসঃ।
৭।	Thio (thios, sulphur)	শুল্ব, শুল্বারি পদের সংক্ষিপ্তাকার।
৮।	Monos (single, sole, alone)	মনঃ—একঃ (মনঃ আত্মা ইতি মেদিনী ; আত্মাচৈকঃ অতঃ মনঃ শব্দোত্র একত্ব পরঃ বা একত্ববোধকঃ)।
৯।	Di (Bi)	দ্বি—Bi সংস্কৃত 'দ্বি' পদের অপভ্রংশ।
১০।	Tri	ত্রিঃ।
১১।	Tetra	চতুর।
১২।	Penter	পঞ্চ।
১৩।	Hexa (Sesqui)	ষষ্, ষষ্ঠ।
১৪।	Hepta	সপ্ত।
১৫।	Octa	অষ্ট।

এক্ষণে দুই-একটি ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ বাকী আছে। যেমন Halogen, Ammonia, Ozone, Azote, Cyanogen ইত্যাদি। ইহাদের প্রতিশব্দ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। ইং Halogen—ডাক্তার Skeat প্রমুখ কোষকারগণ বলেন যে, এই শব্দটি গ্রীক *Hals* = Sea-Salt এবং "Gennao—to produce" এই দুই পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ "হলজন" স্থির করিয়াছি। হঃ হলম্ ইতি মেদিনী ; হং জলং লাতি গৃহ্নাতি ইতি হলঃ সমুদ্রঃ, হলে ভবং ইতি হলম্ লবণং সমুদ্রলবণং ইত্যর্থঃ, তৎ জনয়তি যঃ সঃ হলজন। হল + জন – ণিচ্ + অচ্। হঃ জলম্ – শিবম্ ইত্যুণাদিকোষঃ ; সৈন্ধবং সমুদ্রলবণং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

২। ইং Ammonia—ডাক্তার Skeat প্রমুখ কোষকারগণ বলেন, ইহা ল্যাটীন, গ্রীক, ইজিপ্সিয়ান (Egyptian) ভাষা হইতে উদ্ভূত। L, Gk., Egyptian—A construction for Latin *Sal-ammoniac, rock-salt. Greek—ammonias.* Libyan-Gk. *ammon*, the Libyan *Zeus—ammon.* A word of Egyptian origin—Herod ii, 42. It is said that *Sal-ammoniac* was first obtained near the temple of Ammon (Jupiter Ammon). Jupiter—Zeus ;—সংস্কৃত জীবঃ = বৃহস্পতি, অমরেজ্য অমরঃ, সুতরাং ammonia পদের প্রতিশব্দ "অমরীয়" (অমরে অমর মন্দির সান্নিধ্যে ভব ইতি অমরীয়) প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩। ইং Ozone—ডাক্তার Skeat প্রমুখ কোষকারগণ বলেন, ইহা Greek "ozein" =

smell (from √ad = smell) শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দ্রব্যটির গন্ধ মৎস্যগন্ধের ন্যায়। সেই জন্য উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "অণ্ডজন" করা হইয়াছে। 'অণ্ডজ' অর্থে মৎস্য বুঝায় (অণ্ডজঃ মৎস্য ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ), 'ন' উপমা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অণ্ডজ ইব মৎস্য ইব গন্ধঃ যস্যেতি। মূল ধাতু হইতে "উজ্জন" শব্দও ozone-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। উদ্ প্রাবল্যং গন্ধপ্রাবল্যং ইতি যাবৎ তেন জায়তে প্রকাশতে ইতি 'উজ্জন' অর্থাৎ যাহা গন্ধের প্রাবল্য হেতু প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'উজ্জন' বলা যায়। উদ্ = প্রাবল্যং ইতি মেদিনী।

৪। ইং ও ফরাসী Azote—ডাক্তার Skeat বলেন যে, এই শব্দটি গ্রীক হইতে উদ্ভূত। Azote = Nitrogen, so called because destructive to animal life, Gk.—'a' = negative prefix, *'jwitikos'*—preserving life: from Gk "Jwn" — life. অতএব Azote-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ "অজীবক" নির্দ্ধারিত করা হইল। 'অজীবক'—অ (ন)+জীবক (জীবনরক্ষক)—অজীবক। ন জীবয়তীতি — ন + জীব — ণিচ্ + ণক্। যাহাতে জীবন রক্ষা হয় না।

৫। ইং Cyanogen—সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণ ও পাশ্চাত্য কোষকারগণ বলেন যে, এই শব্দ Greek 'Kyonos'—Blue হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ইহার প্রতিশব্দ 'সুনীলজন' স্থির করা হইয়াছে। সু—ইংরাজী 'Cy' শব্দের ধ্বনির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সুনীলং জনয়তি যঃ সঃ সুনীলজন ইতি।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাস্তব রসায়নের (Inorganic Chemistry) অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের (প্রায় সহস্রাধিক) সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সংস্কৃতে শব্দ রচনা করিবার অর্থ এই যে, তাহা মূলভাষা বলিয়া সমগ্র ভারতবাসী বিজ্ঞানোৎসাহী সাহিত্যসেবীর সহজে গ্রাহ্য হইবে।

নিম্নে সংস্কৃত রাসায়নিক পরিভাষা * হইতে কেবলমাত্র 'নেত্রজন' (Nitrogen) ও ভাস্বরস (Phosphorus)-এর সমবায়ি পদার্থ (compound) গুলির প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল।

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
১।	Nitrogen	N.	নেত্রজন	নেত্র + জন—ণিচ্ + অচ্
২।	Nitrite	—	নেত্রিত	নেত্র + ইতচ্
৩।	Nitrate	—	নেত্রেত	নেত্র + ইতচ্
৪।	Nitric acid	HNO_3	নেত্রিকাম্ল	নেত্র + ষ্ণিক + অম্ল

* ইহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে (মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ১ নং রামকৃষ্ণপুর ফার্ষ্ট বাইলেন, শিবপুর পোঃ, হাওড়া; গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়)। অপর পাঁচটি ভাগ অর্থাভাবে এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
৫।	Nitrogen Boride	NB	নেত্রজন বুরিদ	নেত্রজন+বুর+ইদ
৬।	Nitrogen Bromide	NBr_3	নেত্রজন বরমিদ	নেত্রজন+বরম+ইদ
৭।	Nitrogen Chloride	NCl_3	নেত্রজন কুল্‌হরিদ	নেত্রজন+কুল্‌হর+ইদ
৮।	Nitrogen Dioxide	N_2O_2	নেত্রজন দ্বাক্ষিদ	নেত্রজন+দ্বি+অক্ষিদ
৯।	Nitrogen Hydride or (ammonia)	NH_3	নেত্রজনার্দ্রিদ (অমরীয়)	নেত্রজন+আর্দ্র+ইদ
১০।	Nitrogen Iodide	NI_3	নেত্রজনেতিদ	নেত্রজেন+এত+ইদ
১১।	Nitrogen monoxide	N_2O	নেত্রজনমনাক্ষিদ	নেত্রজন+মন+অক্ষ+ইদ
১২।	Nitrogen oxide	N_2O	নেত্রজনাক্ষিদ	নেত্রজন+অক্ষ+ইদ
১৩।	Nitrogen Peroxide	N_2O_4	নেত্রজনপ্রাক্ষিদ	নেত্রজন+প্র+অক্ষ+ইদ
১৪।	Nitrogen Pentoxide	N_2O_5	নেত্রজন পঞ্চাক্ষিদ	নেত্রজন+পঞ্চ+অক্ষ+ইদ
১৫।	Nitrogen Sulphide	N_4S_4	নেত্রজন শুল্বিদ	নেত্রজন+শুল্ব+ইদ
১৬।	Nitrogen Selenide	N_2Se_3	নেত্রজন সলিনিদ	নেত্রজন+সলিনি+ইদ
১৭।	Nitrogen Sulphate	$SO_3N_2O_3$	নেত্রজন শুল্বেত	নেত্রজন+শুল্ব+ইত
১৮।	Nitrogen Trioxide	N_2O_3	নেত্রজন ত্র্যাক্ষিদ	নেত্রজন+ত্রি+অক্ষিদ
১৯।	Nitrous acid	HNO_2	নেত্রসাম্ল	নেত্রস+অম্ল
২০।	Nitrous oxide	N_2O	নেত্রসাক্ষিদ	নেত্রস+অক্ষিদ
২১।	Hyponitrous acid	$H_2N_2O_2$	অপনেত্রসাম্ল	অপ+নেত্রস+অম্ল
২২।	Nitric oxide	NO	নেত্রিকাক্ষিদ	নেত্র+ষ্ণিক+অক্ষিদ
২৩।	Nitrosyl Chloride	$NOCl$	নেত্রসিল কুল্‌হরিদ	নেত্রস+ইলচ+কুল্‌হরিদ
২৪।	Nitric anhydride	N_2O_5	নেত্রিকণার্দ্রিদ	নেত্র+ষ্ণিক+অন+আর্দ্রিদ
২৫।	Nitrogen pentasulphide	N_2S_5	নেত্রজন পঞ্চশুল্বিদ	নেত্রজন+পঞ্চ+শুল্বিদ
২৬।	Nitrogen tetroxide	N_2O_4	নেত্রজন চতুরক্ষিদ	নেত্রজন+চতুঃ+অক্ষিদ

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
২৭।	Nitrohydroxylamic acid	$H_2N_2O_3$	নেত্রার্দ্রাক্ষিলা-মরিকাম্ল	নেত্র + আর্দ্র + অক্ষি + ইলচ + অমর + ষ্ণিক + অম্ল
২৮।	Nitrosohydroxyl-amine Sulphonic acid	$H_2SN_2O_6$	নেত্রসার্দ্রাক্ষিলা-ময় শুল্বনিকাম্ল	নেত্রস + আর্দ্র + অক্ষ + ইলচ্ + অমর + শুল্বন + ষ্ণিক + অম্ল
২৯।	Nitroso Sulphonic anhydride	$S_2O_5(NO_2)_2$	নেত্রস শুল্বনি-কনার্দ্রিদ	নেত্রস + শুল্বন + ষ্ণিক + অন + আর্দ্রিদ
৩০।	Nitrosyl Bromide	NOBr	নেত্রসিল বরমিদ	নেত্রস + ইলচ্ + বরম + ইদ
৩১।	Nitrosyl Sulphuric acid	$HOSO_2ONO$	নেত্রসিল + শুল্বা-রিকাম্ল	নেত্রস + ইলচ + শুল্বারি + ষ্ণিক + অম্ল
৩২।	Nitrosyl Sulphuric anhydride	$OSO_2O(NO_2)_2$	নেত্রসিল-শুল্বারিকনার্দ্রিদ	নেত্রসিল + শুল্বারিক + অনার্দ্রিদ
৩৩।	Nitrosyl Sulphuryl Chloride	$ClSO_2ONO$	নেত্রসিল শুল্বারিল-কুল্‌হরিদ	নেত্রসিল + শুল্বারি + ইলচ্ + কুল্‌হরিদ
৩৪।	Nitroxyl	NOH	নেত্রাক্ষিল	নেত্র + অক্ষিল
৩৫।	Nitropyro Sulphuric acid	$O(OS_2NO_2)_2$	নেত্রপ্রষ্ট-শুল্বারিকাম্ল	নেত্র + প্রষ্ট + শুল্বারি + ষ্ণিক + অম্ল
৩৬।	Nitrous anhydride	N_2O_3	নেত্রসানার্দ্রিদ	নেত্রস + অনার্দ্রিদ
৩৭।	Nitroso Sulphuric acid	$ONSO_2H$	নেত্রস শুল্বনিকাম্ল	নেত্রস + শুল্বন + ষ্ণিক + অম্ল

Phosphorus

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
১।	Phosphorus	P	ভাস্করস	ভাস + স্কর + অস্
২।	Phosphine	PH_3	ভাস্কীন	ভাস্ক + ঈন্
৩।	Phosphonitrile Chloride	$PNCl_2$	ভাস্কনেত্রিল-কুল্‌হরিদ	ভাস্ক + নেত্র + ইলচ্ + কুল্‌হরিদ

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
৪।	Phosphonium Bromide	PH_4Br	ভাস্ফনীয় বরমিদ	ভাস্ফনীয়+বরমিদ
৫।	Phosphonium Iodide	PH_4I	ভাস্ফনীয়েতিদ	ভাস্ফনীয়+এতিদ
৬।	Phosphoric acid	H_3PO_4	ভাস্ফরিকাম্ল	ভাস্কর+ষ্কিক+অম্ল
৭।	Phosphoric anhydride	P_4O_{13}	ভাস্ফরিকনার্দ্রিদ	ভাস্ফরিক+অনার্দ্রিদ
৮।	Phosphoric Oxide	P_4O_{10}	ভাস্ফরিকাক্ষিদ	ভাস্ফরিক+অক্ষিদ
৯।	Phosphoric Diamide	$HOP(NH_2)$	ভাস্ফরসদ্ব্যামরিদ	ভাস্ফরস+দ্বি+অমর +ইদ
১০।	Phosphorus Oxide	P_4O_6	ভাস্ফরসক্ষিদ	ভাস্ফরস+অক্ষিদ
১১।	Phosphorus Oxychloride	$POCl_3$	ভাস্ফরসক্ষ-কুল্‌হরিদ	ভাস্ফরস+অক্ষ+কুল্‌হরিদ
১২।	Metaphosphoric acid	HPO_3	মিতভাস্ফরিকাম্ল	মিত+ভাস্ফরিক +অম্ল
১৩।	Pyrophosphoric acid	$H_4P_2O_7$	প্রপ্টভাস্ফরিকাম্ল	প্রপ্ট+ভাস্ফরিকাম্ল
১৪।	Orthophosphoric acid	H_3PO_4	অর্থ্যভাস্ফরিকাম্ল	অর্থ্য+ভাস্ফরিকাম্ল
১৫।	Phosphorus Chloro Bromide	PCl_2Br_3	ভাস্ফরসকুল্‌হর-বরমিদ	ভাস্ফরস+কুল্‌হর +বরমিদ
১৬।	Phosphorus Di-iodide	P_2I_4	ভাস্ফরস দ্ব্যেতিদ	ভাস্ফরস+দ্বি +এতিদ
১৭।	Phosphorns Nitride	P_3N_5	ভাস্ফরস নেত্রিদ	ভাস্ফরস+নেত্রিদ
১৮।	Phosphorus Oxybromide	$POBr_3$	ভাস্ফরসক্ষবরমিদ	ভাস্ফরস+অক্ষ+বরমিদ
১৯।	Phosphorus Oxybromo dichloride	$POBrCl_2$	ভাস্ফরসক্ষবরম-দ্বিকুল্‌হরিদ	ভাস্ফরস+অক্ষ+বরম+দ্বি+কুল্‌হরিদ
২০।	Phosphorus Oxychloride	$POCl_3$	ভাস্ফরসক্ষ-কুল্‌হরিদ	ভাস্ফরস+অক্ষ+কুল্‌হরিদ
২১।	Phosphorus Oxyfluoride	POF_3	ভাস্ফরসক্ষপ্লোরিদ	ভাস্ফরস+অক্ষ+প্লোরিদ
২২।	Phosphorus Pentabromide	PBr_5	ভাস্ফরস-পঞ্চবরমিদ	ভাস্ফরস+পঞ্চ+বরমিদ

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
২৩।	Phosphorus Pentaiodide	PI_5	ভাস্ফরস-পঞ্চএতিদ	ভাস্ফরস+পঞ্চ+এতিদ
২৪।	Phosphorus Pentoxide	P_2O_5	ভাস্ফরসপঞ্চাক্ষিদ	ভাস্ফরস+পঞ্চ+অক্ষিদ
২৫।	Phosphorus Sesquisulphide	P_4S_6	ভাস্ফরস ষষ্ঠশুল্বিদ	ভাস্ফরস+ষষ্ঠ+শুল্বিদ
২৬।	Phosphorus Suboxide	P_4O	ভাস্ফরস সব্যাক্ষিদ	ভাস্ফরস+সব্য+অক্ষিদ
২৭।	Phosphorus tetroxide	$(PO_2)_4$	ভাস্ফরস চতুরক্ষিদ	ভাস্ফরস+চতুঃ+অক্ষিদ
২৮।	Phosphorus Thiofluoride	PSF_3	ভাস্ফরস-শুল্বপ্লোরিদ	ভাস্ফরস+শুল্ব+প্লোরিদ
২৯।	Phosphorus Thioiodide	PSI_3	ভাস্ফরস শুল্বেতিদ	ভাস্ফরস+শুল্ব+এতিদ
৩০।	Phosphorus Sulphoxide	$P_4O_6S_4$	ভাস্ফরস শুল্বক্ষিদ	ভাস্ফ+শুল্ব+অক্ষিদ
৩১।	Phosphorus Tribromide	PBr_3	ভাস্ফরস ত্রিবরমিদ	ভাস্ফরস+ত্রি+বরমিদ
৩২।	Phosphorus trichoride	PCl_3	ভাস্ফরস-ত্রিকুল্হরিদ	ভাস্ফরস+ত্রি+কুল্হরিদ
৩৩।	Phosphorus Trifluoride	PF_3	ভাস্ফরস-ত্রিপ্লোরিদ	ভাস্ফরস+ত্রি+প্লোরিদ
৩৪।	Phosphorus Tricyanide	$P(CN)_3$	ভাস্ফরস-ত্রিসুনীলিদ	ভাস্ফরস+ত্রি+সুনীল+ইদ
৩৫।	Phosphorus Tri-fluoro dibromide	PF_3Br_2	ভাস্ফরস-ত্রিপ্লোর দ্বিবরমিদ	ভাস্ফরস+ত্রিপ্লোর+দ্বি+বরমিদ
৩৬।	Phosphoryl Nitride	PON	ভাস্ফরিল নেত্রিদ	ভাস্ফর+ইলচ+নেত্র+ইদ
৩৭।	Phosphate		ভাস্ফেত	ভাস্ফ+ইত
৩৮।	Phosphite		ভাস্ফিত	ভাস্ফ+ইত
৩৯।	Phosphide		ভাস্ফিদ	ভাস্ফ+ইদ
৪০।	Phosphoryl Metaphosphate		ভাস্ফরিলমিত-ভাস্ফেত	ভাস্ফর+ইলচ+মিত+ভাস্ফেত

সংখ্যা	ইং শব্দ	সঙ্কেত	সং প্রতিশব্দ	ব্যাখ্যা
৪১।	Phosphoryl Sulphate		ভাস্ফরিল শুল্বেত	ভাস্ফরিল+শুল্বেত
৪২।	Phosphoryl Tribromide	$POBr_3$	ভাস্ফরিল-ত্রিবরমিদ	ভাস্ফরিল+ত্রি+বরমিদ
৪৩।	Phosphoryl Trichloride	$POCl_3$	ভাস্ফরিল-ত্রিকুল্হরিদ	ভাস্ফরিল+ত্রি+কুল্হরিদ
৪৪।	Phosphoryl Trifluoride	POF_3	ভাস্ফরিল-ত্রিপ্লোরিদ	ভাস্ফরিল+ত্রি+প্লোরিদ
৪৫।	Pyrophosphate		প্লুষ্ট ভাস্ফেত	প্লুষ্ট+ভাস্ফেত
৪৬।	Pyrophosphoryl Chloride	$P_2O_3Cl_4$	প্লুষ্ট ভাস্ফরিল-কুল্হরিদ	প্লুষ্ট+ভাস্ফরিল কুল্হরিদ
৪৭।	Hypophosphoric acid	$H_4P_2O_6$	অপভাস্ফরিকাম্ল	অপ+ভাস্ফরিক+অম্ল
৪৮।	Hypophosphorus acid	H_3PO_2	অপভাস্ফরসম্ল	অপ+ভাস্ফরস্+অম্ল
৪৯।	Phospham	PHN_2	ভাস্ফামর	ভাস্ফ+অমর
৫০।	Phosphamidic acid	$NH_2PO\text{-}(OHO)_2$	ভাস্ফামিদিকাম্ল	ভাস্ফ+অমিদ+ষ্ণিক+অম্ল
৫১।	Phosphamide	$PO(NH)NH_2$	ভাস্ফামিদ	ভাস্ফ+অম+ঈদ

জৈবিক রসায়ন (Organic Chemistry) অন্তর্গত নামকরণের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি শব্দ দেওয়া হইল—

১। Allyl disulphide—'ওলিল দ্বিশুল্বিদ', allyl শব্দটি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কোষকারগণ বলেন, ইহা ল্যাটিন Olium = Tuber হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃতে—ওলঃ স্কন্দঃ (Tuber) ইতি মেদিনী—পাওয়া যায়। সুতরাং ইংরাজী শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ অনায়াসেই হইতে পারে—ওল+ইলচ্, তাহাতে দ্বিশুল্বিদ = Disulphide যোজনা করিলেই অভীষ্ট শব্দটি পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপভাবে জৈবিক (Organic) শব্দগুলিও গঠন করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি সরল এবং কোনটি কঠিন হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন Nitrous acid নেত্রসাম্ল, ইহা সহজেই উচ্চারিত হইবে; কিন্তু Nitrosohydroxylamine Sulphonic acid শব্দের প্রতিশব্দটি 'নেত্রসার্দ্রাক্ষিলমর শুল্বনিকাম্ল' (নেত্রস-আর্দ্রাক্ষিল অমর-শুল্বনিকাম্ল) পদটি উচ্চারণ করিতে সকলে পারিবে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, ইংরাজী শব্দটির উচ্চারণ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সহজ। তবে আমরা বহুদিবস যাবৎ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকায়

এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। এখন সকলেই ইংরাজী ভাষার পক্ষপাতী। ইহা স্বাভাবিক, একটা কুটীরেও যদি কয়েক বৎসর বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহাও ছাড়িয়া সুরম্য অট্টালিকায় যাইতে প্রাণ কেমন করে, মায়ার উদ্রেক হয়। এই উপমা এখানেও প্রযোজ্য। বহুদিবস বৈদেশিক ভাষা আমাদের বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার মায়া হঠাৎ কি ত্যাগ করিতে পারি? জৈবিক রসায়নের এক লাইন কঠিন লম্বা শব্দ আমরা অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিতে পারি, কিন্তু সন্ধিপ্রকরণ দ্বারা গঠিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করিতে হাঁপাইয়া পড়ি। ইহা অভ্যাসের দোষ। যাহা জার্ম্মাণি পারিয়াছে, যাহা রুষ প্রভৃতি অপর দেশবাসী পারিয়াছে, তাহা আমরাই বা না পারিব কেন? অভ্যাস করিলে কালে সবই সহজ বলিয়া বোধ হইবে। আজ যেমন ইংরাজী শব্দগুলি সহজে উচ্চারিত হইতেছে, কালে অভ্যাসে সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণও স্বল্পায়াসসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে। তখন সেই অমর কবি শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিব এবং আক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বলিব—

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপবলে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেব স্মরি;
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়মন।
বঙ্গ-কুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?"

যন্ত্রবিজ্ঞান

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের মূল ধারণা ও পরিমাণ

পদার্থ ও দ্রব্য :—ছুরী, হাতুড়ী, রেল, বয়লার ইত্যাদির প্রভেদ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। তেমনই বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প, ইহারাও বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহাদিগকে বিভিন্ন "পদার্থ" বলা হইবে।

ছুরী ও বয়লার, বরফ ও জলীয় বাষ্প বিভিন্ন পদার্থ। কিন্তু ছুরী, বয়লার ইত্যাদির উপাদান এক—লৌহ। তেমনই জল, জলীয় বাষ্প ও বরফের উপাদান—জল।

পদার্থের উপাদানকে "দ্রব্য" বলা হইবে। দ্রব্যের বাহ্য রূপ পদার্থ। কতকগুলি ছুরী একত্র দেখিলে তাহাদের আমরা একই "পদার্থ" বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রত্যেকটি ছুরী এক একটি বিভিন্ন "বস্তু"।

সুতরাং একটি কাচের পেয়ালা ভগ্ন হইলে পদার্থটি নষ্ট হইল বটে; কিন্তু দ্রব্য (কাচ) অবিকৃতই রহিল। বরফ হইতে জল ও জল হইতে বাষ্প সৃষ্টিতেও মূল দ্রব্যের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না।

পদার্থগত ধর্ম্মাদি "পদার্থ-বিজ্ঞানে"র আলোচ্য।

একখণ্ড কাষ্ঠের দহনে উহার উপাদানসকল পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন দ্রব্যে পরিণত হয়। এই প্রকার দ্রব্যগত ধর্ম্মাদি "দ্রব্য-বিজ্ঞানে"র বা "রসায়নে"র আলোচ্য।

পদার্থের পরিমাণাদি :—পদার্থের মূল পরিমাণকে তাহার "সত্ত্বা" বলা হয়। পদার্থটি শূন্যে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহার নাম পদার্থটির "আয়তন"। সমান আয়তনবিশিষ্ট বিভিন্ন পদার্থের সত্ত্বাও বিভিন্ন। নির্দ্দিষ্ট আয়তনে পদার্থের সত্ত্বাকে পদার্থের "গুরুত্ব" বলা হইবে।

পদার্থের আয়তন ও গুরুত্ব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু সত্ত্বা অপরিবর্ত্তনীয়। সকল পদার্থই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষিত হইয়া থাকে ("মাধ্যাকর্ষণ" :—প্রসঙ্গান্তরে যেমালোচ্য)। এই আকর্ষণের বল, সত্ত্বার পরিমাণের সমানুযায়ী। সত্ত্বা-পরিমাণের অন্য anকানও উপায় না থাকায় সত্ত্বার সমতুল এই আকর্ষণের পরিমাণই সত্ত্বার পরিমাণবাচক ধার্য্য হইয়া থাকে। ইহাই পদার্থের "ভার"।

ভারপরিমাণের জন্য নানাবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডের প্রচলন আছে। একটি ইস্পাতনির্ম্মিত "স্প্রিং"-এর সঙ্কোচনের পরিমাণ হইতেও পদার্থের ভার নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ যন্ত্রকে "স্প্রিং-তৌলযন্ত্র" বলা হইবে। সকল প্রকার যন্ত্রেই মূলতঃ পদার্থটির ভারের

ক্ষিত নির্দ্দিষ্ট ভারবিশিষ্ট অন্যান্য পদার্থের ভার তুলনা করা হইয়া থাকে। এইরূপ তুলনার জন্য নানা প্রকার "তুলে"র প্রচলন আছে।

প্যারী (Paris) নগরে রক্ষিত একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনায় পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রকাশিত হয়। দণ্ডটির নাম মিটার (meter)। ইহার সমান দৈর্ঘ্য এক মিটার (মিঃ)। মিটারের শতাংশ সেণ্টিমিটার (centimetre সে মিঃ), সহস্রাংশ মিলিমিটার (milimetre মি মিঃ)। সহস্র মিটারে এক কিলোমিটার (kilometre কিলোমিঃ) ধার্য্য হয়। ইহাই বিজ্ঞানপ্রচলিত দৈর্ঘ্য পরিমাণ।

সাধারণের ভিতর প্রচলিত দৈর্ঘ্যপরিমাণের মূল, লণ্ডননগরে রক্ষিত একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য। ইহার নাম "গজ" (yard)। গজের দৈর্ঘ্য প্রমাণ মনুষ্যহস্তের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া গজের অর্দ্ধেককে "হাত" বা "হস্ত" বলা হইয়া থাকে। গজের তৃতীয়াংশ "ফুট" (ফুঃ)। ফুটের দ্বাদশাংশ "ইঞ্চি" (ইঃ)। উক্ত পরিমাণানুযায়ী দীর্ঘ ও বিভাগ-চিহ্নিত মানদণ্ড (scale) দৈর্ঘ্যপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থতা একত্রে প্রকাশ করিয়া ক্ষেত্র বা তল (area) নির্দ্দিষ্ট হয়। ১ সেমিঃ দীর্ঘ ও ১ সেমিঃ প্রস্থ সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের পরিমাণ ১ বর্গ সেণ্টিমিটার (ব সেঃ)। সুতরাং

দৈর্ঘ্য × প্রস্থতা = ক্ষেত্র।

এক সে মিঃ দীর্ঘ, এক সে মিঃ প্রস্থ ও এক সে মিঃ উচ্চ সমচতুর্ভুজ বেষ্টিত স্থানের আয়তন এক ঘন সে মিঃ ধার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং

দৈর্ঘ্য × প্রস্থতা × উচ্চতা = আয়তন।

এক ঘন সে মিঃ আয়তনবিশিষ্ট বিশুদ্ধ জলের (৪°সেঃ তাপ মাত্রায়) সত্ত্বার পরিমাণ এক "গ্রাম" (গ্রাঃ) ধার্য্য হইয়া এই পরিমাণের তুলনায় সকল পদার্থের সত্ত্বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। গ্রামের শতাংশ সেণ্টিগ্রাম (সে গ্রাঃ), সহস্রাংশ মিলিগ্রাম (মি গ্রাঃ)। সহস্র গ্রামে এক কিলোগ্রাম (কিলোগ্রাঃ) হয়।

একগ্রাম সত্ত্বাবিশিষ্ট পদার্থের উপর পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণের পরিমাণকেও সংক্ষেপে এক গ্রাম বলা হয়।

দুইটি বিভিন্ন পদার্থের সত্ত্বা যথাক্রমে $স_১$, $স_২$ ও তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব বা অন্তর "অ" ধার্য্য হইলে, পদার্থ দুইটি পরস্পরের প্রতি যে বলে আকর্ষিত হয়, তাহার পরিমাণ $= \frac{স_১ \times স_২}{অ^২}$। বিশ্বে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি পরস্পরের প্রতি এই নিয়মানুযায়ী আকর্ষিত হইতেছে। "মাধ্যাকর্ষণ" অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণের বলও এই নিয়মাধীন। একটি পদার্থের ভারপরিমাণের সময়, পৃথিবীর সত্ত্বা অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া ভারের পরিমাণ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে দূরত্ব অনুসারে উক্ত সমীকরণ অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠে সকলস্থান ভূকেন্দ্র হইতে সমান্তর নহে বলিয়া একটি বস্তুর ভারও সর্ব্বত্র সমান হয় না। সচরাচর ভারনিরূপনে "তুল" ব্যবহার করা হয় বলিয়া, উপরোক্ত বিভিন্নতা পদার্থটির

উপর ও তুলের উপর সমান ভাবে সর্ব্বত্র ফলিত হয়। সেইজন্য ভারের তারতম্য হয় না। কিন্তু একটি "স্প্রিং যন্ত্র" ভূপৃষ্ঠের এক স্থানে যে ভার প্রদর্শন করিবে, স্থানান্তরে তাহা করিবে না। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারের পরিমাণ বিষুবরেখান্তর্গত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম, ও মেরুপ্রদেশে সর্ব্বাধিক; কারণ মেরুপ্রদেশ দুইটি কেন্দ্রের নিকটতম। অবশ্য ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানে উক্ত বিভিন্নতার পরিমাণ যৎসামান্য বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উহা গ্রাহ্য হয় না।

কোনও দুইটি পদার্থ এক সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না। ইহা পদার্থের একটি মূল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সাহায্যে পদার্থের আয়তন নিরূপিত হইয়া থাকে। একটি পাত্রের একস্থানে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া পাত্রটি চিহ্নপর্য্যন্ত জলপূর্ণ করা হয়। তাহার পর পরিমেয় পদার্থটি উহার ভিতর নিমজ্জিত করা হইলে তাহার সম-আয়তনের জল চিহ্নটি অতিক্রম করিবে। এই চিহ্নাতিরিক্ত জল সাবধানে পাত্রান্তরিত করিয়া ওজন করিলে পদার্থটির সম-আয়তনবিশিষ্ট জলের ভার নিরূপিত হইল। পদার্থটিকে ওজন করিয়া এই সংখ্যাকে পূর্ব্বসংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ইহার গুরুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইবে।

১ ঘ সেঃ জলের ভার ১ গ্রাম। সুতরাং কার্য্যতঃ জলের গুরুত্বই গুরুত্বপরিমাণের মূল। বায়বীয় পদার্থের গুরুত্বপরিমাণে সম-আয়তন "উদ্‌জান" নামক লঘুতম গ্যাসের ভার মূল ধার্য্য হইয়া থাকে।

কালপরিমাণ:—সৌর দিবসের পরিমাণ, বিজ্ঞানে সময় বা কালবাচক। এক দিবসের মধ্যাহ্ন হইতে পরদিবসের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সময়ের ১/৮৬,৪০০ ভাগকে এক "সেকেণ্ড" (সেকেঃ) বলা হয়। ৬০ সেকেণ্ডে ১ "মিনিট" (মিনি) ও ৬০ মিনিটে এক "ঘণ্টা" ধার্য্য হয়। ২৪ ঘণ্টায় এক "দিবস"।

গ্রাম-সেণ্টিমিটার-সেকেণ্ড প্রথার পরিমাণকে সংক্ষেপে "গ্রাঃ সেঃ প্রথা" ও ফুট-পাউণ্ড সেকেণ্ড প্রথানুসারে পরিমাণকে "ফুঃ সেঃ প্রথা" বলা হইবে।

কোণপরিমাণ:—সমকোণকে ৯০টি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি ভাগকে এক এক "ডিগ্রী" বলা হয় (১°) কোন বস্তু অপর একটিকে বেষ্টন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে একবার ঘুরিয়া আসিলে চারি সমকোণ পরিমিত কোণ আবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ বস্তুটি ৩৬০° অতিক্রম করে।

কোণপরিমাণের আরও একটি প্রথা আছে। ইহাকে "সার্কুলার" পরিমাণ (circular measure) বলা হয়। একটি বৃত্তের কেন্দ্রে, ব্যাসার্দ্ধের ("ব্য") সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বৃত্তাংশ যে কোণ রচনা করে, তাহার পরিমাণ এক "রেডিয়ান" (রেঃ)। বৃত্তের পরিধি ২π × ব্য।*

---

* π (পাই) একটি গ্রীক অক্ষর= প্রায় ৩·১৪৩...

সুতরাং সম্পূর্ণ আবর্ত্তনের পরিমাণ ২π×ব্য রেডিয়ান। উপরে বলা হইয়াছে যে, ইহার পরিমাণ ৩৬০° ডিগ্রী। সুতরাং

$$\text{এক রেডিয়ান} = \frac{৩৬০}{২\pi} = ৫৭\cdot৩ \text{ ডিগ্রী।}$$

পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগ :—পদার্থবিজ্ঞানে প্রধানতঃ ছয়টি বিভাগ ; (১) যন্ত্রবিজ্ঞান, (২) তাপবিজ্ঞান, (৩) শব্দবিজ্ঞান, (৪) আলোকবিজ্ঞান, (৫) চুম্বকবিজ্ঞান, (৬) তড়িৎবিজ্ঞান।

যন্ত্রবিজ্ঞান

"যন্ত্রবিজ্ঞান" শাখায় পদার্থের উপর বলের ক্রিয়া আলোচিত হইয়া থাকে। বলের উৎপত্তি এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে।

বলের প্রয়োগে পদার্থে প্রথমতঃ গতির পরিবর্ত্তন ও দ্বিতীয়তঃ আকৃতি-আয়তনাদির পরিবর্ত্তন আলোচিত হইবে। আলোচনাব সময় সমগ্র পদার্থটির পরিবর্ত্তে উহার একটি মাত্র কণিকা গ্রহণ করিলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও সরল হয় বলিয়া তাহাই করা হইয়া থাকে। কণিকার ধারণা জ্যামিতির অন্তর্গত "বিন্দু"পরিকল্পনার অনুরূপ। কণিকার অবস্থান আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই।
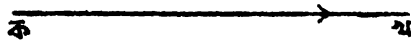
চিত্র—১

একটি কণিকা উপরের চিত্রানুযায়ী (১নং) "ক" বিন্দু হইতে "খ" বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখাপথে চালিত হইলে ইহার স্থানপরিবর্ত্তনের পরিমাণ কখ রেখার দৈর্ঘ্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আলোচনার সময় গতিমুখও ব্যক্ত করা আবশ্যক। "স্থানচ্যুতি" বলিলে স্থান-পরিবর্ত্তনের পরিমাণ ও গতিমুখ—উভয়ই প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত চিত্রে কণিকাটির স্থানচ্যুতি "কখ"। "খক" লিখিলে বিপরীত দিকে সমান স্থানচ্যুতি ব্যক্ত হইবে।

গতি ও গতিমাত্রা :—কণিকাটির স্থানপরিবর্ত্তনের বেগ উহার "গতি"। স্থানপরিবর্ত্তন সরল রেখাক্রমে হইলে স্থানচ্যুতির বেগ, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে স্থানচ্যুতির পরিমাণ, কণিকাটির "গতিমাত্রা"। সুতরাং একটি কণিকা "স" সেকেণ্ড সময়ে "প" পরিমাণ পথ অতিক্রম করিলে উহার গতিমাত্রা $\text{গ} = \frac{\text{প}}{\text{স}}$।

গতিমাত্রার পরিমাণানুযায়ী দীর্ঘ সরলরেখাদ্বারা কণিকার গতিমাত্রা ব্যক্ত হইয়া থাকে। "বাণচিহ্ন" দ্বারা গতিমুখ নির্দ্দিষ্ট হয়।

গতিবৃদ্ধি ও গতিহ্রাস :—কণিকাটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি সেকেণ্ডে সমান পথ অতিক্রম করিতে থাকিলে, উহার গতি "সমগতি"। গতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে

উহা "অসমগতি"। সুতরাং কণিকাটির গতি "স" সেকেণ্ডে "$গ_১$" হইতে "$গ_২$" পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার গতিবিকারের পরিমাণ $= \frac{গ_২ - গ_১}{স}$. উক্ত পরিমাণ যুক্ত (+) চিহ্নানুযায়ী হইলে কণিকাটির "গতিবৃদ্ধি", এবং বিযুক্ত (−) চিহ্নানুযায়ী হইলে "গতিহ্রাস" ঘটে। "গতি" প্রকাশের সময় সর্ব্বদাই (+) চিহ্নদ্বারা একমুখী ও (−) চিহ্ন দ্বারা বিপরীতমুখী গতি ব্যক্ত হইয়া থাকে।

একটি কণিকার মূল গতিমাত্রা "গ"। উহা "বৃ" পরিমাণ গতিবৃদ্ধিহারে চালিত হইলে "স" সেকেণ্ড পরে "স × বৃ" পরিমাণ গতিবৃদ্ধি লাভ করিবে। সুতরাং "স" সেকেণ্ড পরে কণিকাটির গতি = গ + স × বৃ।......(১)

দুইটি সমকোণবর্ত্তী সরলরেখা, মিলনবিন্দু হইতে সমান সমান দূরে চিহ্নিত করিয়া "শয়ান" রেখাটির উপর সময় ও "ঊর্দ্ধ" রেখাটির উপর গতিমাত্রা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।
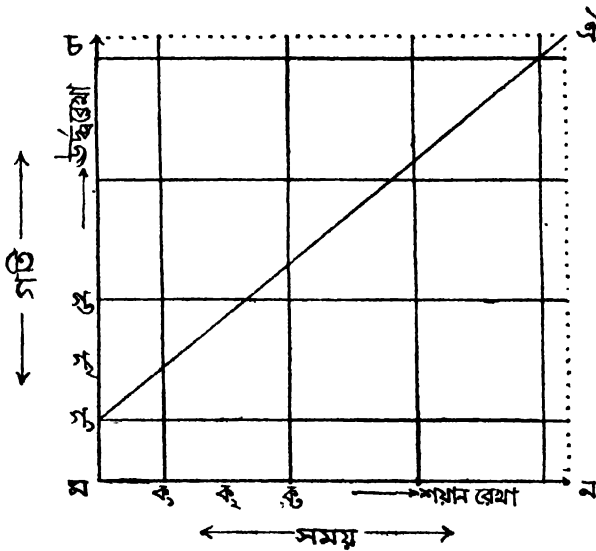
চিত্র—২

শয়ানরেখাক্রমে একএকটি চিহ্ন এক সেকেণ্ড পরিমাণ সময়পরিমাপক ও ঊর্দ্ধরেখাক্রমে প্রতি চিহ্ন গতিহার পরিমাপক। অর্থাৎ $মক_১ = ১$ সেকেণ্ড, $মক_২ = ২$ সেকেণ্ড ইত্যাদি এবং $মগ_১ = ১$ ফুট-সেকেণ্ড গতিহার, $মগ_২ = ২$ ফুট-সেকেঃ গতিহার ইত্যাদি। (২নং চিত্র)।

একটি কণিকা এক ফুট-সেকেণ্ড গতিহার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১ ফুট-সেকেণ্ড পরিমাণ গতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে কল্পিত হইল। সুতরাং প্রথমেই, অর্থাৎ শূন্য

সেকেণ্ডে উহার গতি $=$ ১ ফুট-সেকেণ্ড $=$ মগ$_১$। এক সেকেণ্ড পরে (অর্থাৎ "মক$_১$" অনুযায়ী) গতিহার এক ফুট-সেকেণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ২ ফুট-সেকেণ্ড হইল $=$ মগ$_২$। গ$_২$ ও ক$_১$ হইতে লম্বরেখা দুইটির পরস্পর মিলন স্থান "অ" দ্বারা চিহ্নিত হইল। ২ সেকেণ্ড পরে ($=$ মক$_২$) গতিহার ৩ ফুট-সেকেণ্ড $=$ মগ$_৩$ হইবে। ক$_২$ ও গ$_৩$ হইতে লম্বরেখা "আ" বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হয়। সুতরাং অ, আ বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে এক সেকেণ্ড ও দুই সেকেণ্ড পরের গতিহার নির্দ্দেশ করিতেছে। অ, আ যুক্ত হইয়া সরল রেখাটি উভয়দিকে বর্দ্ধিত হইলে উহা সর্ব্বসময়ের গতিহার প্রকাশ করিবে। "ন" সেকেণ্ড পরে গতিহার পরিমাণ করিতে হইলে শয়ানরেখাক্রমে "মন" অংশ চিহ্নিত হয়। "ন" বিন্দুর উপর লম্বরেখা অঙ্কিত হইয়া গতিনির্দ্দেশক রেখায় "ঐ" বিন্দুতে মিলিত হইল। সুতরাং "ন" সেকেণ্ড পরে কণিকাটি "ঐন" $=$ মচ অনুযায়ী গতিমাত্রা প্রাপ্ত হইবে।
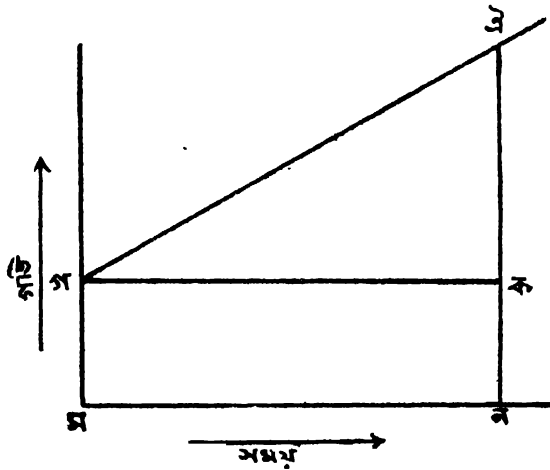
চিত্র—৩

"ন" সেকেণ্ড পরে গতিহার $=$ ঐন। মূল গতি মগ$_১$ $=$ গন। সুতরাং গতিবৃদ্ধি $=$ ঐন $-$ গন $=$ ঐগ। গতিবৃদ্ধি হার $= \frac{\text{ঐগ}}{\text{মন}}$ ($=$ বৃ)।

$$\therefore \text{ বৃ} \times \text{মন} = \text{ঐগ}।$$

অর্থাৎ গতিহার $=$ মূলগতি $+$ গতিবৃদ্ধিহার $\times$ সময় (পূর্ব্বেও অনুরূপ বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে)।

উপরের চিত্রে (৩নং) মূল গতিহার $=$ মগ; "গঐ" গতিরেখা; "মন" অনুযায়ী সময়ের পর গতিহার $=$ "ঐন" অনুযায়ী। কণিকাটির সমগতি কল্পিত হইলে উহা "মন" পরিমাণ সময়ে

গম × মন = গমনক চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলানুযায়ী পথ অতিক্রম করিবে। ক্রমবৃদ্ধির জন্য "মন" সময়ের পর গতিমাত্রা = ঐন। সুতরাং

$$\text{পথ} = \text{গমনঐ ক্ষেত্রের ফল} = \text{গমনক} + \text{ঐগক} = \text{গম} \times \text{মন} + \tfrac{1}{2} \times \text{ঐক} \times \text{গক}$$

$$= \text{গম} \times \text{মন} + \tfrac{1}{2} \times \left(\frac{\text{ঐক}}{\text{গক}}\right) \times \text{গক}^2$$

$$\therefore \text{পথ} = \text{মূলগতিমাত্রা} \times \text{সময়} + \tfrac{1}{2}\text{গতি বৃদ্ধি} \times (\text{ সময় })^2 \text{ ।} \cdots\cdots(২)$$

অনুরূপ বিচারেও এই তথ্যে উপনীত হওয়া যাইবে। কণিকাটির মূলগতি "গ" ধার্য্য হইলে, "ন" সেকেণ্ড পরে "বৃ" হারে গতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গতি $\text{গ}_{\text{ন}} = \text{গ} + \text{বৃ} \times \text{ন}$ হইবে।

সুতরাং কণিকাটি গড়ে $\dfrac{\text{গ} + (\text{ গ} + \text{বৃ} \times \text{ন })}{২}$ গতিমাত্রায় চালিত হইতেছে, ধার্য্য হইতে পারে।

$$\text{সুতরাং পথ প} = \text{ন} \times \frac{২\text{গ} + \text{বৃ} \times \text{ন}}{২} = \text{গ} \times \text{ন} + \tfrac{1}{2}\text{ বৃ} \times \text{ন}^2 \cdots (২)$$

পূর্ব্বের সমীকরণ, $\text{গ}_{\text{ন}} = \text{গ} + \text{বৃ} \times \text{ন}$ বর্গফল লইলে

$$\text{গ}_{\text{ন}}^2 = \text{গ}^2 + \text{বৃ}^2 \times \text{ন}^2 + ২\text{গ} \times \text{বৃ} \times \text{ন}$$

$$= \text{গ}^2 + ২\text{বৃ} (\tfrac{1}{2}\text{ বৃ} \times \text{ন}^2 + \text{গ} \times \text{ন})$$

$$\therefore \text{গ}_{\text{ন}}^2 = \text{গ}^2 + ২\text{বৃ} \times \text{প} \qquad \cdots\cdots(৩)$$

এই তিনটি সূত্র স্মরনীয়। ইহাদের সাহায্যে গতিসংক্রান্ত যে কোনও তথ্য নিরূপিত হইতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণ বলে সকল পদার্থ ক্রমবর্দ্ধিত গতি-অনুসারে ভূপতিত হইয়া থাকে। এই গতিবৃদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে। পরিমাণটি সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ৩২ ফুঃ সেঃ ধার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং একখণ্ড প্রস্তর একটি গভীর কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ৪ সেকেণ্ড পরে কূপের তলস্পর্শ করিলে কূপের গভীরতা (২) সূত্রের সাহায্যে পরিগিত হইবে :— $\text{প} = \text{গ} \times \text{ন} + \tfrac{1}{2}\text{ বৃ} \times \text{ন}^2$। সুতরাং $\text{প} = 0 + \tfrac{1}{2} \times ৩২ \times ৪^2$; কারণ মূল গতিমাত্রা $= 0$

$$\therefore \text{প} = ১৬ \times ১৬ = ২৫৬ \text{ ফুট ।}$$

একখণ্ড প্রস্তর উর্দ্ধমুখে সেকেণ্ডে ৩০ ফুট বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে উহার গতিবৃদ্ধি বিপরীত-মুখী অর্থাৎ $= -৩২$; এই হারে গতিহ্রাস হইয়া শেষগতি $= 0$ হইলে প্রস্তরটি ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং প্রস্তরের উত্থান (৩) সূত্রানুযায়ী পরিমিত হইবে :—

$$\text{গ}_{\text{ন}}^2 = \text{গ}^2 + ২ \times \text{বৃ} \times \text{প}$$

$$\text{অর্থাৎ } 0 = ৩0^2 + ২ \times (-\text{বৃ}) \times \text{প} = ৩0^2 - ২ \times \text{বৃ} \times \text{প}$$

$$\text{সুতরাং } 0 = ৩0^2 - ২ \times ৩২ \times \text{প} \quad \therefore \text{প} = \frac{৩0 \times ৩0}{২ \times ৩২} = ১৪ \text{ ফুঃ (ন্যূনাধিক) ।}$$

একটি রাইফেল হইতে সেকেণ্ডে ২৩০০ ফুট বেগে উর্দ্ধমুখে গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে

$$০=২৩০০^২-২\times৩২\times প$$

$$\therefore প=\frac{২৩০০\times২৩০০}{২\times৩২}=৮২,৬৫৬'২৫ \text{ ফুঃ}$$

$$=\text{প্রায় ১৬ মাইল।}$$

অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে বায়ুর বাধার জন্য এতদূর উত্থিত হয় না।

<u>কণিকার উপর দুইটি বা ততোধিক গতিমাত্রার একত্র ফল</u>:—একটি চলন্ত ষ্টীমারের উপর আরোহীর বিপরীতমুখ গতি, তীরে দণ্ডায়মান দর্শকের চক্ষে ষ্টীমারের গতিমুখ অনুযায়ী বোধ হয়। তাহার কারণ ষ্টীমারের গতিমাত্রা আরোহীর অতিমাত্রার অধিক, ও ফলিত গতি =ষ্টীমারগতি—আরোহীগতি। ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময় ভিন্নমুখগামী ও একমুখগামী ট্রেণের গতি আরোহীর নিকট বিভিন্ন বোধ হয়। উভয়ের গতিমাত্রা $গ_১$ ও $গ_২$ ধার্য্য হইলে ফলিত গতি $=গ_১-গ_২$। ফলিত গতির মুখ উক্ত সংখ্যার চিহ্নানুযায়ী হইবে।
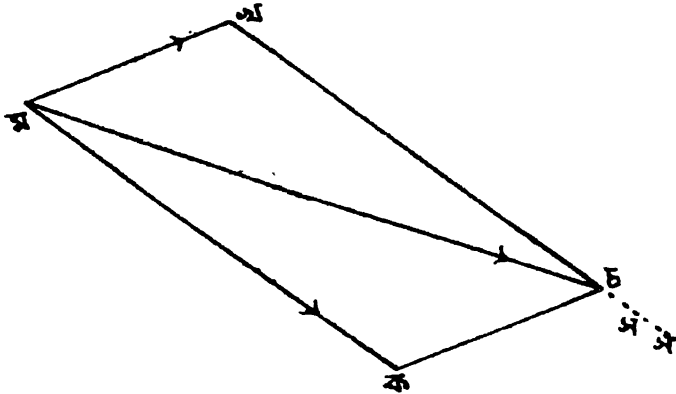
চিত্র—৪

উক্ত উদাহরণে, উভয় গতিমাত্রা একই সমরেখানুযায়ী কল্পিত হইয়াছে। গতিরেখা বিভিন্ন হইলে ফলিত গতিমাত্রা অন্যরূপ হয়। চিত্রানুযায়ী (৪নং) মক ও মখ অনুসারে গতিমাত্রা দুইটি ম বিন্দুতে একটি কণিকার উপর ফলিত হইতেছে। কচ ও খস যথাক্রমে মখ ও মক রেখার সমান্তরাল ভাবে অঙ্কিত হইল। উভয়ে চ বিন্দুতে মিলিত হইল। এক্ষণে মচ যুক্ত হইলে এই রেখা ফলিত গতিমাত্রা নিরূপণ করিবে। গতিমুখ চিত্রে বাণচিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

একটি কণিকার উপর দুইটির অধিক গতিমাত্রা একত্রে ফলিত হইলে উক্ত উপায়ে যে কোনও দুইটির ফল নিরূপণ করিয়া তাহার সহিত আর একটি গতিমাত্রার ফল নিরূপিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল গতিমাত্রার একত্র ফলিত গতিমাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যে কোনও গতিমাত্রা দুইটি ভিন্নমুখী গতিমাত্রায় বিভক্ত হইতে পারে। চিত্রে (৫নং) প্রদর্শিত উপায়ে মগ অনুযায়ী গতিমাত্রা মক ও মখ অনুযায়ী গতিমাত্রায় বিভক্ত করা যায়। মক ও মখ অসংখ্য পরিমাণানুযায়ী হওয়া সম্ভব; কারণ এইরূপ অসংখ্য সমান্তরাল চতুর্ভুজ অঙ্কণ সম্ভবপর।
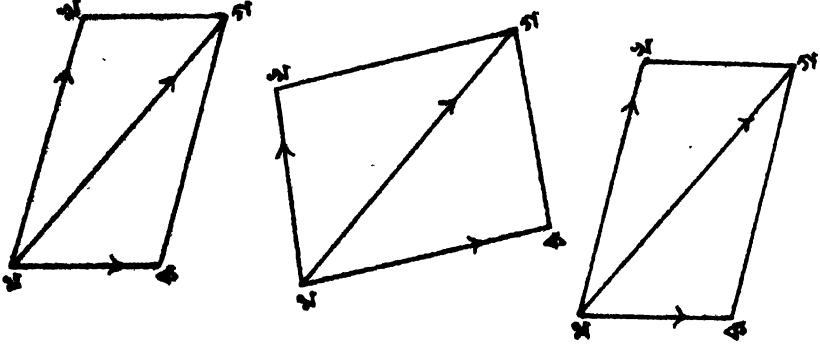
চিত্র—৫

গতিমাত্রা বিভক্ত হইলে, "গতিব্যক্তি" দুইটির পরিমাণ ত্রিকোণমিতিগত সূত্রসাহায্যে নিরূপিত হইয়া থাকে। এ স্থলে কয়েকটি ত্রিকোণমিতিগত সংজ্ঞা সন্নিবিষ্ট হইল। বিজ্ঞানালোচনায় এগুলি সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়।

ম ক খ একটি সমকোণী ত্রিভুজ (৬নং চিত্র); ক খ ম কোণ সমকোণ। ক ম খ কোণের নাম θ ("থীটা" = একটি গ্রীক অক্ষর) ধার্য্য হইয়া থাকে। ত্রিকোণমিতি মতে $\frac{\text{কখ}}{\text{কম}} = \text{Sin}\theta$

চিত্র—৬

("সাইন" থীটা); $\frac{\text{খম}}{\text{কম}} = \text{Cos}\theta$ ("কোসাইন" থীটা) $\frac{\text{কখ}}{\text{মখ}} = \tan\theta$ ("ট্যান্‌জেণ্ট" থীটা); $\frac{\text{মখ}}{\text{কখ}} = \text{Cot}\,\theta$ ("কোট্যান্‌জেণ্ট" থীটা)। এইগুলি মূল সংজ্ঞা। সুতরাং $\text{Cot}\,\theta = \frac{}{\tan\theta}$

ত্রিভুজের ধর্ম্মানুসারে $\text{কখ}^2 + \text{খম}^2 = \text{কম}^2$

অর্থাৎ $\frac{\text{কখ}^২+\text{খম}^২}{\text{কম}^২}$ ১ $= \left(\frac{\text{কখ}}{\text{কম}}\right)^২ + \left(\frac{\text{খম}}{\text{কম}}\right)^২$

$\therefore$ ১ $= \text{Sin}^২\,\theta + \text{Cos}^২\,\theta$ ।

দ্রষ্টব্য :—$(\text{Sin}\theta)^২$ কে, $\text{Sin}^২\theta$—এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।

(১) চিত্রানুযায়ী (৭নং) ম বিন্দুতে ম প রেখা আবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ক খ গ ঘ. বৃত্ত রচনা করিতেছে, কল্পিত হইল। ক গ ও খ ঘ যথাক্রমে শয়ানরেখা ও উর্দ্ধরেখা কল্পিত হইয়াছে। ম প রেখা ম ক অনুযায়ী স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতি অনুযায়ী খ অভিমুখে চালিত হইল। ম প ও ম ক রেখার ভিতর কোণ $=\theta$ ধার্য্য হইল। যাত্রার
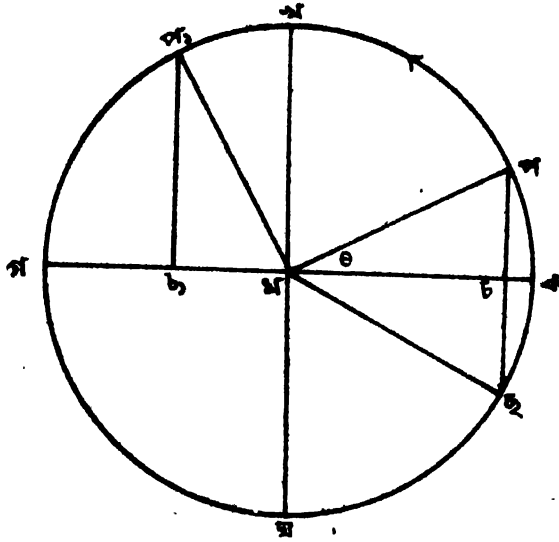
চিত্র—৭

সময়, $\theta=0$। প চ $=$ প হইতে ম ক রেখার উপর লম্ব রেখা $=0$। সুতরাং, $\text{Sin}\ 0° = 0$। কিন্তু এই সময়ে চ ও ক বিন্দুর অবস্থান একই। অর্থাৎ ম চ $=$ ম ক $=$ ম প। সুতরাং $\text{Cos}\ 0° =$ ১।

(২) প বিন্দু সঞ্চালিত হইয়া প ম ক কোণ $=\theta=$ ৩০° অতিক্রম করিল। সুতরাং ম প চ কোণ $=$ ৯০° $-\theta=$ ৬০°। প চ বর্দ্ধিত হইয়া প চ $=$ চ ছ পরিমাণ লওয়া হইল। ম ছ সংযুক্ত হইল। প ম ক ও ছ ম ক ত্রিভুজ দুইটি সর্ব্বতোভাবে সমান। সুতরাং ক ম ছ কোণ $=$ ৩০° ও প ম ছ কোণ ৬০°। সুতরাং প ম ছ ত্রিভুজের অপর কোণ ম ছ প $=$ ৬০°; অতএব ত্রিভুজটি সমবাহু। অর্থাৎ প চ $=\frac{১}{২}$ ম প। প চ^২ $+$ চ ম^২ $=$ প ম^২; অর্থাৎ $(\frac{১}{২}$ ম প$)^২$ $+$ চ ম^২ $=$ প ম^২

$$\text{সুতরাং চ ম}^২ = \text{প ম}^২ - \frac{\text{প ম}^২}{৪} = \frac{৩\text{ প ম}^২}{৪}$$

$$\therefore \quad \text{চ ম} = \frac{\sqrt{৩}}{২} \times \text{প ম।}$$

$$\therefore \quad \text{Sin } \theta = \frac{\text{পচ}}{\text{পম}} = \frac{১}{২}; \quad \text{ও Cos } \theta = \frac{\text{চম}}{\text{পম}} = \frac{\sqrt{৩}}{২} \quad ।$$

(৩) θকোণের পরিমাণ ৪৫° হইলে প ম চ ত্রিভুজের অপর কোণ ম প চ = ৪৫°। সুতরাং প চ = চ ম; এবং $\cos\theta = \sin\theta = \frac{১}{\sqrt{২}}$; $\tan\theta = ১$।

(৪) ম প ক্রমে ম খ স্থান অধিকার করিলে, $\theta = ৯০°$। এক্ষেত্রে প চ রেখার দৈর্ঘ্য অসীম (∞) কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং প চ = চ ম; ও $\sin\theta = ১$; $\cos\theta = 0$; ও $\tan\theta = \infty$।

(৫) ম প ও ম ক রেখাদ্বয়ের মধ্যে কোণ ৬০° হইলে তাহার ত্রিকোণমিতিগত পরিমাণ (২) অনুসারে পাওয়া যাইবে। ম প চ (= ৬০°) কোণকে θ ধরিলে $\sin\theta = \frac{\sqrt{৩}}{২}$; $\cos\theta = \frac{১}{২}$; ও $\tan\theta = \sqrt{৩}$।

(৬) θ কোণের পরিমাণ = ১২০°। ম প রেখার ম $প_১$ অবস্থা। $প_১$ $চ_১$ লম্ব অঙ্কিত হইল। এক্ষেত্রে $প_১$ ম $চ_১$ কোণ = ১৮০° − ১২০° = ৬০°। কিন্তু ম $চ_১$ = −ম চ। সুতরাং $\sin\theta = \frac{\sqrt{৩}}{২}$ ও $\cos\theta = -\frac{১}{২}$, $\tan\theta = -\sqrt{৩}$ অর্থাৎ $\sin\theta = (১৮০° - \theta)$; $\cos\theta = -\cos(১৮০° - \theta)$।

উপরোক্ত সমীকরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে,

$$\sin\theta = \cos(৯০° - \theta) \quad \text{ও} \quad \cos\theta = \sin(৯০° - \theta)।$$

চিত্রে (৮নং) ম গ একটি নির্দিষ্ট গতিমাত্রানুযায়ী অঙ্কিত হইল। ইহাকে ম ক অনুযায়ী যে কোনও মুখে ও ম খ অনুযায়ী শেষোক্তের সমকোণমুখে খণ্ডিত করা যায়। ম ক খ গ সমকোণী চতুর্ভুজ। সুতরাং ম ক = ম গ $\times \cos\theta$ ও ম খ = ম গ $\times \sin\theta$।

ম ক ও ম খ অনুযায়ী গতিমাত্রাকে ম গ-গতিমাত্রার "ব্যক্তি" বলা হইবে।

আরও একপ্রকার গতির বিষয় আলোচনা করিব। ইহা "দোলন"গতি। দোলকের গতি একপ্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মধ্যস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। তৎপর ক্রমে হ্রাস পাইয়া আবার অপর প্রান্তে গতিশূন্য হয় এবং পুর্ব্ববৎ বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিব।

<u>নিউটনের গতিসূত্র</u> :—পণ্ডিত নিউটন বিজ্ঞানজগতে তিনটি সূত্র প্রচার করেন। ইহাদের যাথার্থ্য সর্ব্ববাদিসম্মত; এই সকল সূত্রের ভিত্তির উপরই বিজ্ঞানের আলোচনা ও

ফল অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত। কার্য্যকালে সূত্রানুযায়ী ফলপ্রাপ্তি হইতে সূত্রগুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

প্রথম সূত্র :—বাহ্য বলপ্রয়োগে অবস্থান্তর না ঘটিলে, প্রত্যেক পদার্থ স্থিরভাবে এক স্থান অধিকার করিয়া থাকে, নতুবা সরল রেখাক্রমে সমগতিতে চলিতে থাকে।

এই সূত্রানুযায়ী পদার্থের ধর্ম্মকে উহার "নিশ্চেষ্টতা" (বা জড়ত্ব) বলা হয়। উপরোক্ত সূত্রটি হইতে "বলের" ধারণা হইয়া থাকে। যে ক্রিয়াফলে পদার্থের স্বাভাবিক স্থির অবস্থা, অথবা সরল রেখাক্রমে সমগতি প্রাপ্তি হয়, তাহাই "বল"।
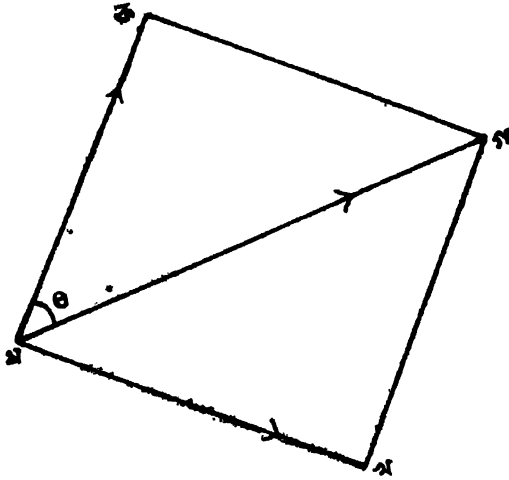
চিত্র—৮

দ্বিতীয় সূত্র :—ইহাতে বলের পরিমাণ ও প্রয়োগমুখানুযায়ী গতিপরিবর্ত্তনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আলোচনার সময় পদার্থটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় "দৃঢ়" কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ, পদার্থের কণিকাগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে, একটি কণিকার উপর বলপ্রয়োগ করিলে উহা সমস্ত কণিকার উপর (অর্থাৎ সমগ্র পদার্থটির উপর) এককালে ফলিত হইয়া থাকে।

পদার্থের "গতিফল" তাহার গতিমাত্রা ও সত্ত্বার একত্রানুপাতিক। এই তথ্যের সত্যতা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি গুরু ভার পদার্থের গতি নিবারণ করিতে প্রভূত বল আবশ্যক :—যথা ট্রেণের গতি। একটি লঘু পদার্থের গতিরোধ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলের প্রয়োজন। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র রাইফেলের গুলি সামান্য সত্ত্বাবিশিষ্ট হইলেও, অতি দ্রুতগতি-সম্পন্ন বলিয়া উহাকে নিবারণ করিতে প্রচুর বলের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সুতরাং, "গতিফল" = "সত্ত্বা" × "গতিমাত্রা"।

∴ অতএব নির্দ্দিষ্ট পদার্থের গতিফল, তাহার গতিমাত্রার অনুযায়ী। গতিফলের পরিবর্ত্তন, গতিমাত্রার পরিবর্ত্তন, (অর্থাৎ "গতিবৃদ্ধির") অনুযায়ী। নিউটনের ভাষায় সূত্রটি এই

"গতিফলের পরিবর্ত্তন প্রযুক্তবলের সমানুপাতিক, ও বলের প্রয়োগমুখে ফলিত হইয়া থাকে।"
—এইরূপ বলা যাইতে পারে।

বলের "প্রয়োগকাল" :—নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বল এক সেকেণ্ড প্রযুক্ত হইলে গতিফল যে পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে, দুই সেকেণ্ড কাল প্রয়োগে পরিবর্ত্তন তাহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে। প্রযুক্ত বলের প্রয়োগকাল ও পরিমাণ একত্রে "ঘাত" শব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্থতরাং, "ঘাত" = বল × প্রয়োগকাল।

অতএব, নিউটনের সূত্র এইরূপে ব্যক্ত হইতে পারে—"গতিফলের পরিবর্ত্তন, প্রযুক্ত ঘাতের সমানুপাতিক"। এস্থলে দ্রষ্টব্য যে, গতিফলের পরিবর্ত্তন মাত্র আলোচিত হইতেছে; স্থতরাং পদার্থটি স্থির অথবা সরল গতিসম্পন্ন হউক, কথা একই।

"ক" পরিমাণ সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি স্থির পদার্থের উপর দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে বলপ্রয়োগ করিলে যদি উহা সেকেণ্ডে "খ" পরিমাণ গতিমাত্রা লাভ করে, তাহা হইলে উহার গতিফল = ক × খ। পদার্থটি প্রথমতঃ স্থির না হইয়া, উত্তরমুখে "খ" গতিমাত্রাসম্পন্ন হইলে ১ সেকেণ্ড পরে উহার গতিমাত্রা = ২খ। স্থতরাং গতিপরিবর্ত্তন = (২খ − খ); ও গতিফল = (২খ − খ) × ক = খ × ক। অর্থাৎ পূর্ব্ব গতিফলের সমান। পদার্থটি উত্তর হইতে দক্ষিণমুখে "খ" পরিমাণ গতিমাত্রাসম্পন্ন হইলে, এক সেকেণ্ড পরে উপরোক্ত বলপ্রয়োগে উহার গতি নষ্ট হইবে। কারণ উত্তরমুখে গতিবৃদ্ধি = দক্ষিণমুখে গতিহ্রাস। এস্থলে, গতিফল = ক × (− খ) = − কখ।

পদার্থের গতি পূর্ব্ব-পশ্চিমে হইলে উহার উপর উত্তর-দক্ষিণে প্রযুক্ত বলের কোনও ফল হয় না।

একটি কণিকার উপর অনেকগুলি বিভিন্ন বল একত্রে প্রয়োগ করিলে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

স্থতরাং, "ব" পরিমাণ বল, "ক" পরিমাণ সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি পদার্থে "স" সেকেণ্ড ব্যাপিয়া প্রযুক্ত হইলে যদি "গ" পরিমাণ গতিপরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে ঘাত = ব × স = ক × গ

$$\therefore \quad ব = \frac{ক \times গ}{স}।$$

পদার্থটির মূলগতিমাত্রা "$গ_১$" ও বলপ্রয়োগে পরিবর্ত্তিত হইয়া "$গ_২$" হইলে,

$$ব = \frac{ক \times (গ_২ - গ_১)}{স}।$$

উপরোক্ত সমীকরণ দুইটিতে $\frac{গ}{স}$ ও $\frac{গ_২ \cdot গ_১}{স}$ সংখ্যাদ্বয় গতিবৃদ্ধির হার নির্দ্দেশ করিতেছে।

স্থতরাং প্রকৃত পক্ষে ব = ক × বৃ।

এক গ্রাম সত্ত্বাবিশিষ্ট পদার্থে যে পরিমাণ বল প্রয়োগে সেকেণ্ডে এক সেন্টিঃসেকেঃ পরিমাণ গতিবৃদ্ধি (বা গতিহ্রাস) হয় তাহাকে এক "ডাইন" বলা হইয়া থাকে।

ফুট-সেকেণ্ড প্রথায় যে পরিমাণ বলপ্রয়োগে এক পাউণ্ড সত্ত্বাবিশিষ্ট একটি পদার্থে সেকেণ্ডে এক ফুট-সেকেণ্ড পরিমাণ গতিপরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহাকে এক "পাউণ্ডাল" বলা হয়।

এক পাউণ্ডাল=১৩,৮২৫'৫ ডাইন।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র:—পদার্থের উপর যে কোনও ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া ফলিত হইয়া থাকে।

টেবিলের উপরে অঙ্গুলীর চাপ দিলে অনুভব করা যায় যে, টেবিলটিও অঙ্গুলীর উপর চাপ দিতেছে। ঘোড়া যে বলে গাড়ী আকর্ষণ করে, গাড়ীও সেই পরিমাণ বলে ঘোড়াকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এস্থলে ঘোড়ার গাড়ী লইয়া অগ্রসর হওয়ার কারণ, ঘোড়া পাদক্ষেপে ভূপৃষ্ঠের উপর পশ্চাদ্দিকে চাপ দেয়। এই চাপফলে সম্মুখদিকে প্রতিক্রিয়াজাত আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। ইহাই ঘোড়ার অগ্রগমনের হেতু।

চিত্র—৯
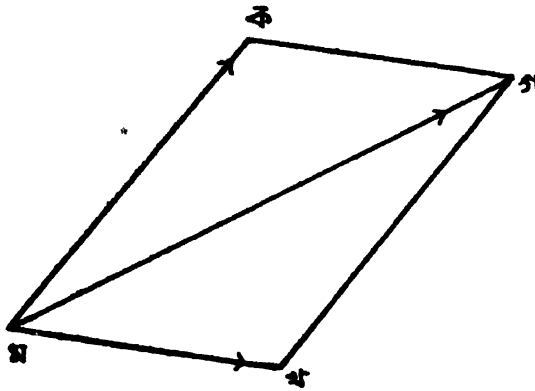
একটি বল সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিতে তাহার সম্বন্ধে তিনটি তথ্য জানা আবশ্যক:— বলের (১) প্রয়োগস্থান, (২) প্রয়োগমুখ ও (৩) পরিমাণ। এই তিনটি তথ্যই সরল রেখাদ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। কারণ, বলের প্রয়োগস্থান হইতে প্রয়োগমুখানুযায়ী সরলরেখা অঙ্কিত হইতে পারে। সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য বলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিলে প্রয়োগমুখ বাণচিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হইবে।

দুইটি বল একত্রে একটি কণিকার উপর প্রযুক্ত হইলে তাহাদের ফল উভয়ের পরিমাণ ও প্রয়োগমুখের উপর নির্ভর করে। এক সরলরেখাক্রমে উভয় বলের প্রয়োগ হইলে, যদি উভয়ের প্রয়োগমুখ এক হয়, তাহা হইলে সেই মুখে বল দুইটির যোগফলের পরিমাণে একটি বল ফলিত হইবে। কিন্তু বিপরীতমুখী হইলে ফলিত বলের পরিমাণ উভয়ের বিয়োগ ফলের সমান ও প্রয়োগ-মুখ বৃহত্তর বলটির অনুযায়ী হইবে।

বল দুইটি এক সরলরেখাক্রমে প্রযুক্ত না হইয়া ভিন্নমুখে ফলিত হইলে, উভয় বল অনুযায়ী দুইবাহু-সম্পন্ন সমান্তরাল চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া প্রয়োগবিন্দু হইতে বিপরীতকোণযোগী রেখাক্রমে ফলিত বল নির্দ্দিষ্ট হইবে। চিত্রে (৯নং) ম বিন্দুতে ম ক ও ম খ বল একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ম ক গ খ সমান্তরাল চতুর্ভুজ অঙ্কিত হইল। এক্ষণে ম গ যুক্ত হইলে ফলিত বল এই রেখানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবে।

পূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে গতিমাত্রাও এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে একটু প্রভেদ আছে। গতিমাত্রার প্রয়োগস্থান নাই। সুতরাং গতিমাত্রাবাচক রেখার সমান্তরাল যে-কোন সমান রেখাও একই গতিমাত্রা নির্দ্দেশ করিবে।

একটি নির্দ্দিষ্ট বল যে কোনও কোণ-অভিমুখে ও শেষোক্তের সমকোণাভিমুখে একত্রে বিভক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ একটি বলের যে কোনও মুখে ব্যক্তির পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে। চিত্রে (১০নং) ম গ অনুযায়ী বল ম ক ও ম খ অনুযায়ী দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ক ম গ কোণ $=\theta$ ধার্য্য হইলে, ম ক $=$ ম গ $\times\cos\theta$; ও ম ঘ $=$ ম গ $\times\sin\theta$। ম ক ও ম খ মুখে ম গ বলের ব্যক্তি যথাক্রমে উক্তরূপ পরিমাণানুযায়ী হইবে।
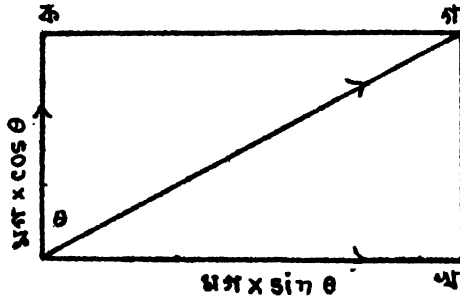
চিত্র—১০

ত্রিকোণমিতিগত সূত্রে জানিতে পারি, Cos ৯০° $=0$; সুতরাং বলের প্রয়োগমুখের সমকোণাভিমুখে উহার কোন ব্যক্তি নাই।

বলের ভিন্নরেখাক্রমে ব্যক্তি, পালযোগে নৌকাসঞ্চালনের সময় বুঝিতে পারা যায়। উত্তরমুখে বাতাস বহিলেও উত্তরপূর্ব্ব বা দক্ষিণপশ্চিম বা অন্য যে কোনও কোণাভিমুখে নৌকা সঞ্চালিত হইতে পারে। অবশ্য উত্তরমুখে বলের ফলে যে পরিমাণ গতিলাভ হয়, অন্য কোনও মুখে নৌকাটি সে পরিমাণ গতি প্রাপ্ত হয় না।

বলের আবর্ত্তনী শক্তি:—একটি পদার্থের একস্থানে বলপ্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ পদার্থটিতে অন্তর্গতি অর্থাৎ পদার্থটির স্থানচ্যুতি, ও আবর্ত্তগতি অর্থাৎ পদার্থটির আবর্ত্তন (স্থান ত্যাগ না করিয়া)—উভয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুর এমন একটি বিন্দু আছে, যেখানে বলপ্রয়োগে বস্তুটি অন্তর্গতি মাত্র লাভ করিয়া থাকে। এই বিন্দুটিকে

বস্তুর "ভারকেন্দ্র" বলে। বস্তুর ভার, এই বিন্দুতে নিম্নমুখে ফলিত হয়, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

বস্তুটি একস্থানে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ কল্পিত হইলে, স্থানান্তরে বলপ্রয়োগফলে উহা আবর্ত্তগতি মাত্র প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট বলের, বস্তুতে আবর্ত্তন সংঘটিত করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র বলের "ঘাতের" উপর নির্ভর করে না; বলের প্রয়োগরেখা হইতে বস্তুটির আবর্ত্তন-বিন্দুর সমকোণক্রম দূরত্বের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বারবন্ধ করিবার সময় দেখা যায় যে, দ্বারের প্রান্তে ও সমকোণমুখে বলপ্রয়োগে অনায়াসে দ্বার বন্ধ হয়; কিন্তু দ্বারের মধ্যে বা আবর্ত্তনরেখার ("কব্জা"র) সন্নিকটে, অথবা অসমকোণানুযায়ী বলপ্রয়োগে অধিকতর বলের আবশ্যক হইয়া থাকে।

চিত্র—১১

চিত্রে (১১নং) প্রদর্শিত পদার্থটির "ক" আবর্ত্তবিন্দু। "ম" বিন্দুতে খম ও গম অনুযায়ী বিভিন্নমুখী বলের প্রয়োগ কল্পিত হইয়াছে। আবর্ত্তবিন্দু হইতে কচ ও কছ প্রয়োগ-রেখাদ্বয়ের উপর যথাক্রমে লম্ব অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রে কছ-রেখা কচ-রেখা অপেক্ষা হ্রস্বতর হওয়ায় গম বলের আবর্ত্তনীশক্তিও পরিমাণে অল্পতর। কচ ও কছ যথাক্রমে খম ও গম বলের "কেন্দ্রান্তর"।

সুতরাং

আবর্ত্তনীশক্তি = বল × কেন্দ্রান্তর।

পদার্থটির আবর্ত্তন, ঘড়ির কাঁটার আবর্ত্তনের অনুযায়ী হইলে ইহা বিযুক্ত (−) চিহ্নদ্বারা ও বিপরীতানুযায়ী হইলে (+) যোগ চিহ্নদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দুই স্থানে সমান্তর রেখামুখে বলপ্রয়োগে পদার্থটির অন্তর্গতি, উভয় বলের সমষ্টিদ্বারা

নিরূপিত হয়। বল দুইটি বিপরীতমুখী হইলে উভয়ের প্রভেদ ফলিত হইয়া গুরুতর বলটির অনুযায়ী অন্তর্গতি সংঘটিত হইবে।

যুগ :—উক্ত প্রকার দুইটি সমান বল, বিপরীত মুখানুক্রমে একটি পদার্থের দুইটি বিভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত হইলে পদার্থটির কোনও অন্তর্গতি ফলিত হয় না; আবর্ত্তগতি মাত্র ফলিত হয়। উভয় বলের প্রায়োগমুখ একরেখাবর্ত্তী হইবার প্রয়াসফলে এই আবর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। চিত্রে (১২নং) তক ও চখ অনুযায়ী বল একত্রে যথাক্রমে চ ও ত বিন্দুতে প্রযুক্ত হইয়া আবর্ত্তন সৃষ্টি করিতেছে। পদার্থটির উপর যে কোনও স্থানে একটি বিন্দু "ব" হইতে উভয় বলের প্রয়োগরেখার উপর লম্ব অঙ্কিত হইল।

চিত্র—১২

"ব" বিন্দুতে চক বলের আবর্ত্তনীশক্তি = −চক × বন ; কারণ আবর্ত্তনপ্রয়াস ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ মুখী। মখ বলের শক্তি = +মখ × বম, কারণ আবর্ত্তনপ্রয়াস ঘড়ির কাঁটার বিপরীতানুযায়ী। সুতরাং আবর্ত্তনী শক্তির সমষ্টি = মখ × বম − চক × বন = মখ বা চক × (বম − বন) [কারণ, বল দুইটির পরিমাণ সমান] = −মখ × মন। সুতরাং বল দুইটির একত্র আবর্ত্তনীশক্তি = একটি বলের পরিমাণ × উভয়ের প্রয়োগ রেখার অন্তর। এইরূপে দুইটি সমান ও বিপরীতমুখী বল একটি পদার্থের উপর একত্রে বিভিন্ন বিন্দুতে প্রযুক্ত হইলে তাহাদিগকে "যুগ" বলা হইবে।

সুতরাং

যুগাবর্ত্তন = যুগবল × যুগান্তর।

বলের সমস্থিতি :—একটি পদার্থের উপর বিভিন্ন পরিমাণ বল প্রযুক্ত হইলেও যদি পদার্থটির গতি পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে উক্ত বলগুলি "সমস্থিতি" প্রাপ্ত হইয়াছে বলা হয়।

সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটি মাত্র বলের প্রয়োগে পদার্থের সমস্থিতি সম্ভবপর নহে।

দুইটি বলের একত্র প্রয়োগে সমস্থিতি সংঘটিত হইলে বল দুইটি প্রথমতঃ পরিমাণে সমান, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের প্রয়োগরেখা এক, ও তৃতীয়তঃ উহাদের প্রয়োগমুখ পরস্পরের বিপরীত।
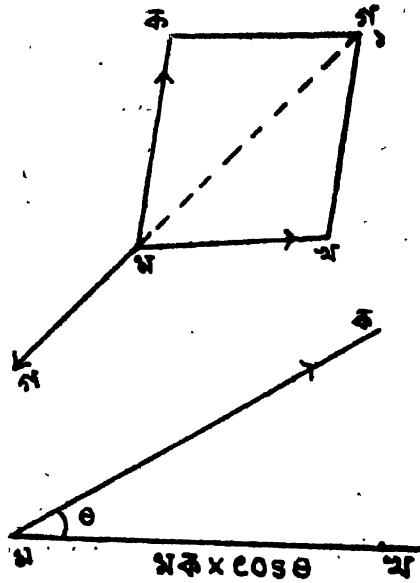
চিত্র—১৩

তিনটি বল একত্রে সমস্থিতি লাভ করিলে, তাহাদের মধ্যে যে কোনও একটি অপর দুইটির ফলিত বলের সমান ও বিপরীতমুখী হইয়া থাকে। পার্শ্বস্থ চিত্রে (১৩নং, উপরের অংশ) ম ক, ম খ ও ম গ বলত্রয় সমস্থিতি লাভ করিয়াছে। ম ক ও ম খ বলদ্বয়ের ফল ম গ, ও ম গ সমান ও বিপরীতমুখী।

সমস্থিতির অবস্থায় পদার্থের যে কোনও বিন্দুতে বিভিন্ন বলের আবর্ত্তনীশক্তির যোগফল = ০ হইবে। কারণ, তাহা না হইলে পদার্থটি আবর্ত্তগতি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফ

ফণ্ড—Belly ; abdomen

ফণ, ফট—Snake's hood

ফণিফেন—Opium

ফণী—A hooded serpent

ফল—Fruit ; effect

ফলক—Leather ; piece of bone

ফলকোশ—Testicle ; scrotum

ফলবর্ত্তি—Suppository

ফলিতার্থ—Substance ; purport

ফলিনি যোনি—A dilated vagina of a girl of tender years, when ravished by a man with abnormally developed genital organ

ফাণ্ট—Infusion in hot water

ফিরঙ্গ রোগ—Syphilis

ফিরঙ্গ রোটী—Loaf

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—Blowing

ফুসফুস, ফুপ্‌ফুস—Lungs

ফুসফুসধরাকলা—Pleura

ফেণ, ফেন, ফেনক—Froth

ফেণকা—Massage ; a kind of friction of the body with small wooden rollers

ফেনবাল, ফেনিল, ফেনল—Frothy

ফেনমেহ—Frothy urine

ব (বর্গীয়)

বংক্ষণ—Groin

বদ্ধগুদ—Intestitnal obstruction ; rectal stricture

বধ, বধকর্ম্ম—Murder

বধক, বধী—Murderer

বধস্থান, বধস্থালী—Slaughter house ; place of execution

বধির—Deaf

বন্ধ, বন্ধন, বন্ধনক্রিয়া—Bandage ; bandaging

বন্ধ্যা—Sterile woman

বন্ধ্যাযোনি—Suppression of catamenial fluid

বস্ত্র—Urethra

বল—Strength

বলদ—Tonic

বলবান—Strong ; muscular

বলাহা—Phlegm

বলাস—Cyst of conjunctiva

বলি, বলী, বলিমাণ, বলিন, বলিমান—Looseness of skin due to old age

বলিষ্ঠ—Very strong

বল্য—The principal element of body ; semen

বষ্কয়নী, বষ্কয়িনী, বষ্কয়িনী—Cow conceiving at long intervals

বহুলবর্ত্ম—Crops of pustules of equal size on the eye-lid

বহিস্ত্বক—Epidermis

বহিঃ কঙ্কাল—Exo-skeleton

বহুপ্রসূ—Multipara

বহুদুগ্ধ—A cow giving copious milk

বহুমূত্র—Diabetes

বহ্বাশী—Large eater ; voracious

বাড়—Food in small intestines

বাণ—Arrow

বাধক—Dismenorrhœa

বাধন, বাধ—Disease

বধির্য্য—Deafness

বায়গতুণ্ডসন্ধি—Coccygeal joint

বালক, বাল—Boy

বাল—Cranial hair

বালক্রিমি—Parasite of the cranial hair

বালগর্ভিনী—A cow pregnant for the first time

বালগ্রহ—Demons having influence on infants

বালতন্ত্র—A treatise on midwifery and the diseases of children

বালরোগ—Diseases of children

বালব্যজন—The tail of the Tibetian *yak*

বালিকা—Girl

বালিশ—Pillow ; boy

বালীশ—Strangury

বালুকাযন্ত্র—A pharmaceutical instrument for preparation of medicine

বালুকাস্বেদ—Fomentation by means of hot sands

বাল্য—Infancy

বাষ্প—Tears ; vapour

বাহু, বাহু, বাহু—Arms

বাহুমূল—Axilla

বিগুচ্ছ—A nerve ganglion

বিষ্ট—Injured

বিষ্টম্ভ—Intestinal obstruction

বুক্ক—Heart ; muscular structure inside the heart

বুক্কাগ্রমাংস—Heart

বুদবুদ--Shape of the fœtus on the fifth night of impregnation

বুদ্ধি—Intelligence

বুদ্ধীন্দ্রিয়—Organs of sense

বুভুক্ষা—Hunger

বুভুক্ষিত—Hungry

ব্রধ্ন—Inguinal abscess ; bubo

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা—The originator of the science of medicine

ব্রহ্মচর্য্য—The life of abstinence from commerce with woman lived by a Brahmin student

ব্রহ্মদণ্ড—Spinal column

ব্রহ্মকায়—Virtuous, hospitable and God-fearing man

ব্রহ্মরন্ধ্র, ব্রহ্মবিবর—The aperture supposed to be at the crown of the

head through which the soul takes its flight at death; suture of the crown

ভ

ভক্ত—Boiled rice or food
ভক্তকার, ভক্ষ্যংকার—Cook
ভক্তদ্বেষ—Disgust for food
ভক্তখণ্ড—Gruel
ভক্ষণ, ভোজন, ভুক্তি—Eating of solid food
ভগ—Vagina
ভগন্দর—Fistula-in-ano
ভগাল—Human skull
ভগার্শ—Vaginal polypi
ভগাস্থি—Pubes
ভগ্ন—Fracture
ভগ্নপৃষ্ঠ—Broken back
ভগ্নসন্ধি—Dislocated joint
ভগ্ন—The name of a disease
ভঙ্স—Buttocks
ভংস—Fundamental; bottom; generative organ
ভঞ্জন—Snap [fracture of tooth
ভঞ্জনক—A disease of the facc;
ভম্ভরালি—Flies
ভম্ভরালিকা—Gnat
ভয়—Fear
ভরণ—Feeding; support
ভরদ্বাজ—A celebrated sage who propagated the science of medicine amongst men
ভদ্রাকরণ—Shaving of head
ভষৎ—Rump
ভসৎ—Female organ
ভস্ত্রকা, ভস্ত্রাকা, ভস্ত্রা, ভস্ত্রী, ভস্ত্রিকা—A pair of bellows
ভস্ম—Ashes; metallic oxides
ভস্মক—A morbid appetite, a kind of disease
ভস্মকাগ্নি—Bulimia
ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়, ভক্ষিতব্য—Edible
ভক্ষ্যাভক্ষ্য—Wholesome and unwholesome food
ভক্ষিত, ভুক্ত—Eaten; consumed
ভাণ্ডি—A razor case
ভাষ্য—Commentary
ভাষ্যকার—Commentator
ভাসদ—Glaus penis
ভাস্বর—Luminous
ভিন্ন—Broken
ভিন্নব্রণ—Penetrating wound
ভিষক—A physician
ভিস্সিটা, ভিস্মিটা, ভিস্সটা, ভিস্মিষ্টা, ভিস্মিকা—Burnt rice
ভিস্সা—Boiled rice
ভুগ্ন—Weak form disease
ভুজ, ভুজা—Arm
ভুজাকণ্ট—Nails of hand
ভুজকোটর—The arm pit
ভুজমধ্য—The breast; the chest
ভ্রম—Giddiness
ভ্রূ, ভ্রূতোরণ—Brow
ভ্রূকেশর—Eye-brow
ভেষজ—Medicine

ম

মূর্চ্ছা—Swooning

মূত্র—Urine

মূত্রকৃচ্ছ্র—Strangury

মূত্রবহস্রোত—Ureters

মূত্রাঘাত—Retention of urine

মূত্রাশয়—Bladder

মূঢ়গর্ভ—Malposition of fœtus and difficult labour ; unnatural labour

মূর্দ্ধা—Head

মূলাধার—A spinal ganglion

মৃতবৎসা—Mother whose children are still-born

মৃতধ্বজ—Man of lost virility

মেঢ্র, মূত্রনাল—Penis

মেঢ্রাস্থি—Pubic bone

মেদ—Obesity ; fat

মেদজবৃদ্ধি—Elephantiasis of scrotum

মেদঃবপা—Omentum

মেরুদণ্ড—Spinal column

মেহন—Penis

মলাধার—Bladder or receptacle of impurity

মসৎ—Loins ; hip

মসূরিকা—Small pox

মস্তক—Cranium

মস্তিষ্ক—Brain ; Cerebrum

মহাকুষ্ঠী—Tubercular leprosy

মহাশৈশির—Gangrenus inflamation of gums

মহাস্রোত—Alimentary canal

মাংস—Flesh

মাংসতন্ত্র—Muscular tissue

মাংসরজ্জু—Tendons

মাষক—Warts

মিন্মিন—Nasal voice

মুখ—Mouth

মুখরোগ—Disease of mouth

মূত্রজবৃদ্ধি—Hydrocele

মূত্রাতিসার—Painful urination ; Frequent urination

মুষ্ক—Testes

মূক—Dumb

মকল—Abscess in the groin

মজ্জ, মজ্জা—Marrow

মজ্জাধরকলা—Endosteun

মণিপুর—A nerve ganglin in the naval region

মণিবন্ধ—Wrist ; metacarpal ; joint

মণ্ডপত্যা—Mother of a still-born child

মণ্ডলসন্ধি—Circular joint

মৎস্ন—Kidney

মৎস্নদ্বয়—Two bones on the sides of heart

মদাত্যয়—Delirium tremens

মধুমেহ—Diabetes

মধ্যকঙ্কাল—A real skeleton

মধ্যকায়—Trunk

মধ্যমা—Middle finger

মন—Mind

মন্যাগ্রহ—Spasmodic torticollis ; wry-neck

মন্যাস্তম্ভ—Wry-neck or torticollis

মণিকা—Slyloid process

মল—Excretion of urine and faeces

য

যকৃ, যকৃত—Liver

যকৃদ্দাল্যুদর—Enlarged liver on the right side of the abdomen

যদৃচ্ছা—Unlooked for appearances of phenomena

যন্ত্র—Blunt instrument

যন্ত্রনা, যাতনা—Pain

যন্ত্রপেষণী—Grindstone

যব, যবক—Barley

যবক্ষার, যবাগ্রজ, যবলাস, যবশূক, যাবশূক, যবনালজ, যবজ, যবশূকজ, যবাহ্ব, যবাপত্য —Saltpetre ; Nitre

যবনেষ্ট, যামুনেষ্ট—Lead

যবপ্রখ্যা—Small tubercles shaped like barley corn

যবগণ্ড, যুবগণ্ড, যৌবনকণ্টক, যৌবনপীড়কা —Boils of youth on the cheek

যবাগূ—Barley water ; Gruel, of barley

যবাম্ল—Antimony

যবিয়ান—Young man

যবিষ্ঠ—Robust young man

যম, যমজ—Twins

যমসূ, যমিনী—Mother of twins

যাম্যসত্ব—A peculiar type of persons, dutiful, prompt, firm, courageous, pure, calm, with no fear and malice

যশদ—Zinc

যশোদ—Mercury

যষ্টিকা—A rod shaped parasitic worm

যক্ষ্মা—Phthisis pulmonalis ; Sickness or illness

যাতযাম—Digested ; Stale

যাবজ্জীব, যাবদায়ু—Life-long

যাভ—Co-habitation

যায়াক্ষ্ম, যাযেক্ষ্ম—A kind of yaksma or consumption ; Syphilis

যাপ্য—Temporarily curable

যুক্তসেবনী—Sutura limbosa

যুগ্ম—Pair ; couple

যুজৌ—The Asvin twins

যুবতী, যুবতি, যুনী—A young female from 16 to 30 years

যুবা, যুবক—A young man from 16 to 30 years

যুক, যুকা—Louse

যুষ—Juice ; Extract

যোগ—Prescription ; combination ; mediation, mental abstraction

যোগসার—A selected prescription to cure diseases

যোনী—Vagina ; female generative organ ; source ; womb

যোনীকন্দ—Vaginal tumours

যোনীজ—Born of a female generative organ

যোনিব্যাপদ, যোনিরোগ—Disease of the female organs of generation

যৌন—Sexual crime

যৌবন—Youth

র

রক্ত—Blood

রক্তগুল্ম, রক্তজগুল্ম—Aneurysm tuterine tumours ; blood-originated tumour in the female patients

রক্তজদাহ—Burning of the body due to excited circulation of blood

রক্তজ দোষ—Diseases due to disorder of the blood

রক্তজ প্রতিশ্যায়—Discharge of blood from the nose

রক্তজ বাতরক্ত—Preponderance of vitiated blood in leprosy

রক্তজ বিদ্রধি—A deep-seated painful swelling which has its seat in the vitiated blood

রক্তজ বৃদ্ধি—The swelling of scrotum covered with black vesicles ; Hæmatocele

রক্তজ শিরোরোগ—Headache due to the disorder of the blood

রক্তদোষ—Diseased state of the blood

রক্তধরাকলা—Vascular tissue of the blood vessels

রক্তপা, রক্তপাতা, রক্তপায়িনী, রক্তমন্দশিকা—Leeches

রক্তপিত্ত—Hæmorrhage ; Hæmatemesis

রক্তপিত্তধাতু—Hæmorrhagic diathesis

রক্তপ্রদর—Menorrhagia ; Bloody catamenia

রক্তফেনজ—Lungs

রক্ত বাত—A kind of disease

রক্ত বিন্দু, রক্ত কণা—Particles or drops of blood

রক্তবৃষ্টি, রুধির বর্ষণ—Exeessive bleeding

রক্ত মেহ—Bloody urine

রক্ত মোক্ষণ—Venesection

রক্ত স্রাব—Hæmorrhage

রক্তাতিসার—Dysentry

রক্তাধার—Skin

রক্তার্ব্বুদ—Vascular tumour

রক্তাভিষন্দ—Ophthalmia due to a vitiated condition of the blood

রক্তার্ম্ম—A fleshy growth on the white part of the eye

রক্তার্শ—Bleeding piles

রকসা—One of the minor varieties of leprosy ; Dry erythema

রক্ষণারক—Strangury

রঙ্গ—The tinker's solder ; tin

রজত—Silver

রজস্বলা, রজযুক্তা—A woman during her menstruation

রজ্জু—Muscular cords ; a substitute for a blunt instrument ; rope

রণ রণ—Mosquitoes
রতি ক্রিয়া—Sexual intercourse
রত্নি—The distance from the elbow the end of the closed fist
রদ, রদন—Tooth ; the tusk of an elephant
রদচ্ছদ, রদচ্ছেদ, রদনচ্ছেদ—Lips
রন্ধন—Cooking
রম্পাক—A sharp instrument required in the treatment of elephants ; a nail-pairer
রশনা, রসনা—Tongue
রস—One of the five qualities of matter, tastle, relish, savour etc. ; chyle
রসকর্পূর—Submuriate of mercury Hydrarg perchloride
রসগত মসূরিকা—Varicella
রস মর্দ্দন—Powdering of mercury
রসমারণ—Killing the mercury
রস মূর্চ্ছন—Swooning of mercury
রস শোধন—Purification of mercury
রসসিন্দুর—A well-known medicinal preparation of mercury
রসাঞ্জন, রসগর্ভ, রসোদ্ভুত, রসাগ্রজ, রসরাজ, রসর্গাভ—Antimony ; Lead ore used as a collyrium
রসায়ন—The elixir vitæ of alchemists ; medicine for the cure of diseases and for the prevention of old age and decrepitude
রসায়ন তন্ত্র—Treatise on the science of rejuvenation
রাক্ষস সত্ত্ব—A type of man characterised by fierceness, jealousy, external piety, ignorance and vanity
রসায়নী—Lymphatics
রাগ ষাড়ব—Mudga soup prepared with grapes and expressed pomegranate juice
রাজ যক্ষ্মা, রাজ জক্ষা—Phthisis pulmonalis
রাজদন্ত—The two upper incisors
রজস, রাজসিক—One of the three fundamental attributes of the latent nature ; passionate
রাত্র্যন্ধ্য—Night blindness, Hemaralopia
রাল—Resin
রুক প্রতিক্রিয়া—Treatment of diseases
রুক্ষ, রূক্ষ—Rough
রুগ্ন—Infirm ; invalid ; Sick
রুচক—A kind of bone to which teeth belong
রুচকাস্থি—Toothed bones
রুচি—A liking ; appetite
রুজা, রুজাকর, রোগ, রুক—Disease
রুদ্রসূ—Mother of eleven sons
রুধির, রক্ত—Blood
রূপ—Beauty
রেচক—Expired air
রেচন—Purgation

বিবিধ

বিমানপোত সাহায্যে সুমেরুপ্রদেশ আবিষ্কারেচ্ছু আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হিংসাদ্বেষের ভিতর দিয়া গগনবিহার বিদ্যার যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আজিকার এই শান্তির দিনে তাহা বহু প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর কাজে লাগিয়া যাইতেছে। বায়ু অপেক্ষা লঘু অথবা গুরু-ভার বিমানপোত এখন দূর হইতে দূরান্তর-প্রদেশ দ্রুত অতিক্রম করিবার জন্য নিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে। নিছক বৈজ্ঞানিক খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্যও উহাদের ব্যবহার বড় কম হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেও রুশ গবর্ণমেণ্ট সুমেরু-সাহায্য-অভিযানকারীদের (Arctic Relief Expedition) একখানা বিমানপোত দিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধকালে নগর, জেলা ও বনজঙ্গলের অবস্থিতি, শত্রুর সৈন্যসংস্থান প্রভৃতিও বিমানপোতের সাহায্যেই নির্ণীত হইত। কোন কোন দেশে শস্য-ধ্বংসকারী পঙ্গপালের বিনাশের জন্যও বিমানব্যবহার করার কথা শুনা গিয়াছে।

অধুনা কেবল যে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যেই গগন-পথে সংযোগ সাধিত হইয়াছে—তাহা নহে, পরন্তু আমেরিকা হইতেও শূন্যপথে য়ুরোপে যাতায়াতের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা চলিতেছে। পুনঃপুনঃ বহু বিপদপাত সত্ত্বেও বিমানবিহারীরা আটলাণ্টিক্ মহাসাগর অতিক্রম করিবার সুগম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের পথও শীঘ্রই এই ব্যোম-চারীদের আয়ত্তে আসিবে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরভাগ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর-তীরস্থ ভূখণ্ডসমূহে আসিবার যে সকল শূন্যপথ ব্যবহারোপযোগী বলিয়া অনুমান হইতেছে, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, সুমেরু-প্রদেশের পথই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা। এই পথ উত্তরমেরু বা তন্নিকটস্থ স্থানসমূহ এবং উত্তর মহাসাগরের বহু অজ্ঞাত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যাইবে। এই অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের পরিমাণ সমস্ত উত্তর মহাসাগরের প্রায় ২/৩ অংশ। অত্যল্পকাল পূর্ব্বে এই অজ্ঞাত প্রদেশের পরিমাণ আরও অনেক অধিক ছিল; কিন্তু ইদানীং উত্তরমেরু-অভিযানের ফলে (নোবীল-প্রভৃতির) কতকটা স্থান লোকগোচর হইয়াছে। উক্ত অভিযানগুলির আরম্ভে যদিও কেহ কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য লইয়া প্রবৃত্ত হন নাই, তথাপি তাহারই ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, উত্তর প্রদেশের অনেকটা স্থানই জলপূর্ণ। ভবিষ্যতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তরমেরু অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে সে স্থান সম্বন্ধে সকল তথ্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পূর্ণরূপে জানা প্রয়োজন। নব-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সম্মুখে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। এ-বিষয়ে এই সঙ্ঘ একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। সঙ্ঘের বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই পথের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন।

জার্ম্মেণী এই ব্যাপারে প্রথম হস্তক্ষেপ করে। তাহার চেষ্টাতেই মেরু-আবিষ্কারকারী এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যদিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এইপ্রকার একটা চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল, তথাপি রীতিমত ভাবে এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর। মেরু-আবিষ্কারকারী বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফ্রিজফ্ ন্যান্সেন (Fridtjof Nansen) 'অস্লো' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্ম্মী হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। তিনি এই সঙ্ঘের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার যোগদানের ফলেই এই সঙ্ঘের বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছে এবং সেই জন্যই ইহা এত শীঘ্র সকল দেশের ও সকল জাতির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে।

এই সঙ্ঘের কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—বার্লিন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই শতেরও অধিক সভ্য এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ বা মেরু-আবিষ্কারে ইতঃপূর্ব্বেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা গগনবিহার বিদ্যায় বহুপূর্ব্বেই পারদর্শীতা দেখাইয়াছেন। অষ্ট্রিয়া, বুল্গেরিয়া, সিকোশ্লোভাকিয়া, ডেন্মার্ক, ইংলণ্ড, এষ্টোনিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড্, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, হল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, লাট্‌ভিয়া, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, স্পেন্, সুইডেন, সুইট্জারল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট্ রাষ্ট্র প্রভৃতি এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। বেলজিয়াম্, কানাডা ও গ্রীসের নাম যদিও উক্ত তালিকায় নাই, তথাপি তাহাদিগকেও দলভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; কেন না তাহারা তাহাদের নিজেদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় দল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা তিন শতের কম হইবে না; নিত্যই নূতন নূতন সভ্য দলপুষ্টি করিতেছেন।

কোনও এক দেশের সভ্যসংখ্যা যথেষ্ট বেশী হইলে তাঁহারা নিজেদের দেশে এই সঙ্ঘের একটি স্থানীয় শাখাসঙ্ঘ স্থাপন করিতে পারেন। ইহাতে মূল সঙ্ঘের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না। এই প্রণালী অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার চাঁদা, এক কালীন দান এবং বিভিন্ন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যই সঙ্ঘের অর্থাগমের উপায়। বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যার উপরই তত্তৎ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সঙ্ঘের এখন যদিও প্রধানতঃ সংগঠনের কার্য্যই চলিতেছে, তথাপি ইহার বৈজ্ঞানিক দিকটাও একেবারে পিছনে পড়িয়া নাই। বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর বার্লিন শহরে উহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী গ্রীষ্মে লেলিন্‌গ্রেড্ নগরে হইবে বলিয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে।

১৯২৯ সালে এক দল লোক অভিযানে বাহির হইবেন, এরূপ স্থির হইয়া রহিয়াছে। কে কে সেই দলে যোগদান করিবেন, এখন হইতেই তাহার বাছাই চলিতেছে। যতই অর্থশালী বা শক্তি-উদ্যমশালী হউক না কেন, কোনও একটি স্বতন্ত্র দলের পক্ষে এত বড়

একটা বিরাট অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় পোত বা অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র সরবরাহ করা বড় সহজ কথা নহে! জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু একাই একখানা বিমান-পোতের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উৎসাহ তাহাদের এতই প্রবল। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার জন্য জার্ম্মেণীর এই উদ্যম প্রশংসনীয়। রুষ-গবর্ণমেণ্টও কম উৎসাহ দেখান নাই। তাঁহারা ভার নিয়াছেন মারম্যান্ (Murman) নামক স্থানে একটা mooring mast নির্ম্মাণ করিবার। মারম্যান্ হইতেই অভিযানকারীরা মেরু-উদ্দেশে বায়ুপথে যাত্রা আরম্ভ করিতে পারিবেন।

স্থির হইয়াছে মূল্যবান বিরাটদেহ বিমানপোতই মাত্র এই অভিযানে ব্যবহার করা হইবে। কেন না, এই অভিযানের ব্যবস্থা তো কেবলি বেড়াইবার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই হয় নাই; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান। সহজ কথায় ইহাকে বিজ্ঞান-অভিযান বলাই সঙ্গত। সুতরাং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় পোতের মধ্যে আবশ্যক মত সকল রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহু পরিমাণে লইতে হইবে এবং যাহাতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত একই সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ, মেরুপ্রদেশ অতিক্রম করিতে কয়েক দিবস মাত্র সময় লাগিবে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হওয়া দরকার। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে মেরুপ্রদেশের অনস্তমিত সূর্য্যালোকে বৈজ্ঞানিকরা ২৪ ঘণ্টাই কাজ করিবার সুযোগ পাইবেন। এক দল লোকের পক্ষে সমস্ত দিন অক্লান্ত ভাবে কায করিতে পারা সম্ভবপর নহে, তিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগে-ভাগে কায করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাযেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া একই পোতে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিকের যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে; এবং তজ্জন্য বিরাট বিমানপোত ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এই অভিযান ব্যতীত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ মেরু-প্রদেশ-পরিবীক্ষণের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও মতলব আঁটিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে উত্তরমহাসাগরের চতুঃপার্শ্ব ঘেরিয়া স্থানে স্থানে বেতারের আড্ডা (wireless station) বসাইবার কথা চলিতেছে। প্রত্যেক আড্ডার কাযকর্ম্ম বা পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল পরস্পরকে জানানো হইবে এবং উত্তরভূমণ্ডলার্দ্ধের আব-হাওয়া বিভাগের সঙ্গেও ইহাদের একটা সম্বন্ধ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী (temporary) বেতার আড্ডা স্থাপন করিয়া উত্তরমহাসাগরস্থ তুষার-স্তূপ সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সকল বিভিন্ন আড্ডাতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবে বিমানপথে। কোন আড্ডাতে কখনও কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে অথবা অন্য কোনও প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হইলে, বেতারে খবর দিলেই বায়ু-পথে অল্প সময় মধ্যেই সাহায্যকারীরা যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারিবে।

গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাস হইতে এই সঙ্ঘ "আর্কটিস্" (Arktis) নামক একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। জার্ম্মেণীর গোটানগরস্থ জুসটাস্ পারটস্ কোং

(Justus Pertes Co) হইতে কাগজখানা প্রকাশিত হয়। ইংরাজী, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ— এই তিন ভাষাতে পত্রিকাখানির জন্য প্রবন্ধ লেখা চলে। বিভিন্ন দেশের বহু লেখক এই পত্রিকায় রীতিমত প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া আসিতেছেন। তাহাতে এই সঙ্ঘটির আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সুমেরুপ্রদেশের একখানা নূতন মানচিত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পৃথিবীর নানা ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, যাহাতে কোন দেশের লোক সুমেরু সম্বন্ধে নবার্জ্জিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত না হয়।

গোবি মরু ও রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজ

এ বৎসরের 'প্রকৃতি'র প্রথম সংখ্যায় আমরা মিঃ রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজের অভিযানের কথা লিখিয়াছিলাম। কেহ যেন মনে না করেন, ইহাই তাঁহার শেষ বৈজ্ঞানিক অভিযান, অতঃপর আর তিনি ভূস্তরাভ্যন্তর হইতে জীবকঙ্কাল উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইবেন না। যে কয় বার গোবি মরুভূমিতে তিনি বিলুপ্ত জীবের সন্ধান করিয়াছেন, কখনও তিনি বিফলপ্রযত্ন হন নাই। গত বৎসর তখন মহাচীনে সমরানল প্রজ্জ্বলিত; উত্তরের সহিত দক্ষিণের সংঘর্ষ তখনও চলিতেছে; মার্কিণ, ইংরাজ, জাপ্, কাহারও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিরাপদ ছিল না; —অথচ বিজ্ঞানদেবতার এই একনিষ্ঠ মার্কিণ সেবক কোনও প্রকার বিপদভয়ে বিচলিত না না হইয়া আদিম মানবের জন্মস্থান আবিষ্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া মহাচীনের প্রত্যন্তদেশে উপস্থিত হইলেন। চীন সর্দ্দার তাঁহাকে অভয় দিল বটে, কিন্তু বিলুপ্ত বালুকাচ্ছন্ন নদীরেখায় অথবা নাতিগভীর খাতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অতর্কিত ভাবে অগ্রসর হইবার সময় কোথা হইতে বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার একটি পা জখম করিয়া দিল। মিঃ এণ্ড্রুজ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন না। কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; সেই মরু প্রান্তরে তাঁহারা নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; বাত্যাবিক্ষুব্ধ বালুকারাশির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া দেহ ও মন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল; অতিকষ্টে পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হইল। তুর্কীস্থানের সে কি বিভীষিকাময় ধূ ধূ প্রান্তর! তৃষ্ণায় ও খাদ্যাভাবে উটগুলি প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আর কতদিন এভাবে চলিতে পারে? তিনি বলেন, "পাঁচ জন লোক ও দুইখানি গাড়ি লইয়া আমি পূর্ব্বদিক ধরিয়া চলিলাম; সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত প্রদেশ; কিছুই পাইলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। হাসপাতালক্যাম্পে ওয়াল্টার গ্রাঞ্জার আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'আমি উত্তর দিকে গিয়াছিলাম। ঐ পীত বালুকাস্তূপের পশ্চাতে আমি দূরবীক্ষণ সাহায্যে যে মহাকায় জীবকঙ্কাল দেখিয়াছি, আপনি দেখিবেন আসুন।' যাহা দেখিলাম, এশিয়া ভূখণ্ডের বাহিরে কুত্রাপি তাহার দোসর মিলিবে না।" কঙ্কাল সংগৃহীত হইলে দেখা গেল যে, জীবদ্দশায় উক্ত অতিকায় প্রাণীটি অন্ততঃ ২৮ ফুট উচ্চ ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ বলিলেন, যে স্তরে ইহাকে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে

ইহারা সাড়ে তিন কোটি বৎসর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত। কয়েকটি অতিকায় গণ্ডার-শাবকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে; তাহারা আন্দাজ ষাট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। মিঃ এণ্ড্রুজ বলেন, এযাত্রা অন্ততঃ তিনটি মহাকায় জীবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের কোনও পরিচয় এতদিন জানা ছিল না। যাহা হউক, তিনি মঙ্গোলিয়ায় গিয়াছিলেন আদিম মানবের বা ঘোটকের সন্ধান পাইবার আশায়; কিন্তু যাহা পাইলেন, বিজ্ঞানের দরবারে তাহার মূল্য কম নহে। ধন্য তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়!

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত গণ্ডারের বিলোপ

আফ্রিকাতে এক প্রকারের গণ্ডার পাওয়া যায়, তাহাদিগকে "শ্বেত গণ্ডার" বলে। আসলে কিন্তু তাহাদের বর্ণ শ্বেত নহে—ধূসর; তবে তাহাদের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ গণ্ডার অপেক্ষা অধিকতর মসৃণ। খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকার প্রচণ্ড রবিকরোজ্জ্বল দিবসে দূরবর্ত্তী গণ্ডারের মসৃণ চর্ম্মের তীব্র ঔজ্জ্বল্য দেখিয়াই তত্রত্য অধিবাসীরা উহাদের বর্ণকে শুভ্র বলিয়া ভুল করিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, উহারা শ্বেত গণ্ডার নামেই পরিচিত। উচ্চতায় ইহারা প্রায় সাত ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণ জাতীয়দের অপেক্ষা ইহাদের দেহায়তনও অনেক বেশী বড়। চলিবার সময় ইহারা সর্ব্বদাই নতমস্তকে চলে। এমনকি দাঁড়াইয়াও যখন থাকে, তখনও মস্তক উত্তোলন করে না। ইহাদের লম্বা দোদুল্যমান কর্ণপ্রান্ত এবং চতুষ্কোণ শৃঙ্গও ইহাদিগকে কৃষ্ণজাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা তৃণভোজী।

শত বৎসর পূর্ব্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার জলশূন্য শুষ্ক প্রস্তরময় স্থান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই বহু শ্বেত গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু য়ুরোপীয়দের বসতিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। এইরূপে এক সময় যে জাতি সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমানে তাহা কেবল জুলুল্যাণ্ড নামক প্রদেশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; এবং সেই বিরাট জাতির অগণিত প্রাণীর সংখ্যা পর্য্যবসিত হইয়াছে মাত্র ৩৪টিতে। আল্‌বার্টনিয়েন্‌জা হ্রদের উত্তরে আল্‌বার্ট নীলনদের বামতীরস্থ উগাণ্ডা নামক স্থানে এখনও ১৫০টি প্রাণীর অস্তিত্বের সংবাদ জানা গিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম সুদানের জনমানবহীন স্থানে, বেল্‌জিয়ান্ কংগোর উত্তরপূর্ব্ব অংশে, এবং ক্যামেরুনের পশ্চিমে এখনও শ্বেত গণ্ডারের বসতি আছে বলিয়া শুনা যায়।

শ্বেতগণ্ডারশিকারে যে খুব একটা আমোদ পাওয়া যায়, তাহা নহে। তথাপি শিকারীরা এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণিগণকে হত্যা করিতে বিরত হন নাই। ফরাসী এবং বেলজিয়ান্ সরকার শিকারীদের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার যথারীতি ব্যবস্থা করিতেছেন; ইংরাজ সরকারের অধিকৃত স্থানসমূহে ইহাদের হত্যা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে স্থানীয় লোকেরা ইহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিত না। কিন্তু ইদানীং ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভূখণ্ডসমূহে গণ্ডারশৃঙ্গের চাহিদা অতিরিক্ত বৃদ্ধি

পাওয়ায় শ্বেতগণ্ডারহত্যা স্থানীয় জনগণের খুব লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাংসলোভী আদিম অধিবাসীদিগের লালসাবহ্নিতেও কম প্রাণী জীবনদান করে নাই।

শ্বেতকায় গণ্ডারের সম্মুখভাগের শৃঙ্গ সাধারণতঃ খুব দীর্ঘ হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরাংশের গণ্ডারদের কোন শৃঙ্গই এতাবৎ ৪২ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও একটি গণ্ডারশৃঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এতদপেক্ষা দীর্ঘতর শৃঙ্গের কথা আজিও শুনা যায় নাই। দক্ষিণ-দেশীয়দের শৃঙ্গ সাধারণতঃ ৫১ হইতে ৬২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। স্ত্রী-গণ্ডারদের শৃঙ্গই অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বা হয়। নিয়ত আনমিত মস্তকে চলার দরুণ নিরন্তর কঠিন মৃত্তিকাঘাতে শৃঙ্গশীর্ষ প্রায়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। বিশেষতঃ বহির্বর্ত্তুল (convex front) শৃঙ্গগুলি এইরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অতি বিকট আকার ধারণ করে। শৃঙ্গের উভয় পার্শ্বের কিয়দংশ চেপ্টা হওয়াতে শৃঙ্গশীর্ষটি দেখিতে অনেকটা কৃপাণফলকের মত হয়। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, উইঢিপির কঠিন মৃত্তিকাপৃষ্ঠে অনবরত ঘসিয়া ঘসিয়া গণ্ডারসমূহ তাহাদের শৃঙ্গগুলির ঐরূপ বিকৃতি সংঘটিত করে।

শ্বেত গণ্ডারের পাকস্থলী বিলম্বিত অবস্থায় প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া থাকে। স্তন্যপায়ী বৎসগুলি দেখিতে শূকরশাবকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়। ইহাদের সন্তানপ্রজননপ্রণালী সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

তৃণভোজী বলিয়াই বোধ হয় ইহাদিগকে সাধারণতঃ তৃণাস্তৃত সমতলভূমি, অনিবিড় (thinly forested) বনভূমি প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা কদাচিৎ জলপান করিয়া থাকে। শ্বেতকায় গণ্ডারেরা আলবার্ট নীলনদের তীরবাসী হইলেও কেহ কখনও তাহাদিগকে নীল-নদে নামিয়া জলস্পর্শ করিতে দেখে নাই। জলের প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ প্রদর্শন না করিলেও কিন্তু ইহারা জলাভূমি, নদী প্রভৃতির তীরবর্ত্তী পঙ্কিল কর্দ্দমপূর্ণ স্থানে বাস করিতেই অধিক ভালবাসে। খুব সম্ভবতঃ হস্তী প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত জন্তুর উপদ্রবের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই ইহারা দুরতিক্রম্য বিশাল নদ-নদীর তীর আশ্রয় করিয়া নিজেদের বাসস্থান মনোনীত করে। তজ্জন্যই বোধ হয় আলবার্ট নীলনদের দক্ষিণতীরে শ্বেতগণ্ডারের কোন বসতির সন্ধান পাওয়া যায় না। জাম্বেজী নদীর দক্ষিণতীরে শ্বেত-গণ্ডারের সংখ্যা অগণিত হইলেও উত্তরতীরে তাহাদের কোনও চিহ্ন না থাকারও ঐ কারণই বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করিয়া থাকেন।

কিন্তু তাই বলিয়া উহাদিগকে ভীরু মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। উহারা বস্তুতঃ নির্ভীক ও সাহসী। মনুষ্যসমাগমকে উহারা গ্রাহ্যও করে না। তবে শিকারীরা নিরন্তর উত্যক্ত করিয়া ইদানীং উহাদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছে। নতুবা স্বভাবতঃ উহারা ধীর ও নির্ব্বিরোধী ছিল।

পুংগণ্ডারগুলি কখনও কখনও পরস্পরের সহিত অতি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে

বিকট চীৎকারে রণস্থল প্রকম্পিত করিয়া তোলে। সাধারণ অবস্থায় কিন্তু উহাদিগকে কদাচিৎ শব্দ করিতে শোনা যায়। যুদ্ধান্তে ক্ষতবিক্ষত গণ্ডারের আকৃতি দেখিতে অতি বীভৎস হইয়া থাকে।

শিকারীদের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পলায়নকালেও ইহারা একপ্রকার বিকট শব্দ করিয়া থাকে। ইহাদের শ্রবণএবং ঘ্রাণ-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ, কিন্তু স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা ও সামান্য কারণে ব্যস্ততাপ্রকাশে অনিচ্ছার জন্য উহা সহজে বুঝা যায় না।

অষ্টাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন এবার মাজু গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিভাগে ডাক্তার হেমেন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অধিবেশনের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি বিষম পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে নব নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ যে সরল সরস তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি রচনা করিয়া সুধীবৃন্দকে আপ্যায়িত করিয়াছেন তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। এমন এক দিন ছিল যখন বিজ্ঞান বলিতে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায় কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যা ও রসবিজ্ঞান বুঝিত। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাফোঁ, স্যর জগদীশ, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সেই বিজ্ঞান ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আজও নিয়োগী-সাহাপ্রমুখ বিজ্ঞানসেবিগণ সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এখন কিন্তু বাঙ্গালীপ্রতিভা দিকে দিকে স্ফুরিত হইতেছে। নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাণিবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ডাক্তার একেন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ রচিত। তিনি গৌরব বোধ করিতেছেন যে, আজকাল বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন বঙ্গবাসী বঙ্গের প্রাণীতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। ডাঃ বি, কে, দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ ভাতুড়ী, রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের নানা আলোচনা উল্লেখ করিয়া তিনি ডাঃ বনোয়ারি লাল চৌধুরী মহাশয়ের মৎস্যালোচনার প্রসঙ্গে বলেন—'সম্প্রতি আমি বঙ্গভাষায় বাংলার মৎস্যপরিচয় নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে 'প্রকৃতি' নামে দ্বৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যতদূর সম্ভব মৎস্যগুলির দেশীয় নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।' শুধু বাঙ্গালী কেন, ডাঃ সুন্দরলাল হোরা এখনও মৎস্যের চর্চ্চা করিতেছেন। এই সুযোগে যদি সভাপতি মহাশয় সমবেত সুধীজনকে জানাইয়া দিতে পারিতেন যে, সম্প্রতি ভারতসচিব আদেশ দিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারতের মৎস্য-Fauna গ্রন্থ এবার হইতে ডাঃ হোরা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে, তাহা হইলে বিজ্ঞানবিৎ মাত্রই আনন্দিত হইতেন।

কুমেরুপ্রদেশে নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কার

বায়ার্ড-অভিযান-দলের পরিচালক বিমানচারী কমাণ্ডার বায়ার্ড দীর্ঘকাল বিমানবিহারের পর বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে কুমেরুপ্রদেশে এক সুবিশাল ভূখণ্ডের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর নামানুসারে উক্ত ভূখণ্ডের নামকরণ হইয়াছে "মেরী বায়ার্ড ল্যাণ্ড।" এই ভূমি বৃটিশ-অধিকারের বহির্ভাগে "রস্"সমুদ্র ও "গ্র্যাহাম্‌স্ ল্যাণ্ড" নামক দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। মেরী বায়ার্ড ল্যাণ্ডে বায়ার্ড আর একটি নূতন পর্ব্বতশ্রেণীরও সন্ধান লাভ করিয়াছেন। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ হাজার ফুট। কিছুকাল পূর্ব্বে বায়ার্ড এই প্রদেশেই নিউজিল্যাণ্ডের অধিকৃত স্থানে আরও একটি পর্ব্বতশ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম দিয়াছিলেন "রক্‌ফেলার পর্ব্বতশ্রেণী"। নবাবিষ্কৃত পর্ব্বত ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত। বায়ার্ডের বিমানচর দল ইতিমধ্যে বায়ুপথে কুমেরু প্রদেশের প্রায় ৪০,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

ক্যান্‌বেরার সংবাদে প্রকাশ যে, সার ডগ্‌লাস্ ম্যশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটি কুমেরুঅভিযানকারী দল সংগঠন করিবেন। এই দল খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে কুমেরু অভিমুখে যাত্রা করিবে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হইবে "রস্"সমুদ্র ও "এন্‌ডার্বি ল্যাণ্ডে"র মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ পর্য্যটন করা। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অর্থনীতি ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা এবং সমুদ্রপথের জরিপাদি করাও উক্ত অভিযানের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। বিমানপোত সাহায্যে বায়ুপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিমিশিকার ও তিমি-ব্যবসায়ের কোনরূপ সুবিধা হইতে পারে কিনা তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন স্কটের সুবিখ্যাত "ডিস্‌কভারী" নামক জাহাজখানি এই অভিযানের ব্যবহারার্থ দান করিয়াছেন। নিউজিল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট অভিযানের ধনভাণ্ডারে ২,৫০০ পাউণ্ড দিবেন, ঘোষণা করিয়াছেন। অভিযানের কর্ত্তৃপক্ষ এই উভয় সরকারকে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণিতে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান যুগের পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানবের আবিষ্কারের একটা স্থূল বিবরণী ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তকে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-কাহিনী প্রকাশিত না হইলে জাতির এ কলঙ্ক থাকিয়া যাইত যে, যে দেশে জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যে দেশের ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা, শুধু সেই দেশের ভাষায় তাঁহার আবিষ্কারকাহিনী প্রকাশিত হইল না। রায়সাহেবের এই পুস্তকপ্রকাশে জাতির কলঙ্ক অপনোদিত হইল।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় রায়সাহেব জগদানন্দ রায় সিদ্ধহস্ত। সুতরাং তিনি এ কার্য্যভার গ্রহণ করায় ব্যাপারটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এতটুকুও নিষ্প্রভ হয় নাই। আজও তিনি যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগৎ চমৎকৃত হইতেছে। রায়সাহেব জগদানন্দ রায় তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মোটামুটি ভাবে জগদীশচন্দ্রের সকল আবিষ্কারেরই পরিচয় দিয়াছেন।

'জগদীশচন্দ্র বসু বিনাতারে টেলিগ্রাফ বার করেচেন', 'জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ বার করেচেন' বাঙ্গালী পাঠক মুখে মুখে শুধু এই টুকুই শুনিয়া আসিয়াছে—আর কিছু জানিবার তাহার সুযোগ ঘটে নাই। আজ রায়সাহেব জগদানন্দ রায়ের হৃদয়গ্রাহী লেখার মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের কচকচি বাদ দিয়াও বাঙ্গালী পাঠক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার-সমূহের সম্যক পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইল।—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চুম্বক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলি চিত্তাকর্ষকরূপে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যাঁহারা যত্ন লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রবাবুর পরেই জগদানন্দ বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানপ্রচারের পক্ষে বাধা অনেক। প্রথমতঃ পারিভাষিক শব্দের অভাব,—লেখককে কতগুলি নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া লইতে

হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য আমাদের আগ্রহের অভাব,—লেখককে রুচিরও সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়। বর্ত্তমান উপন্যাসের যুগে এ কাজ নিতান্ত সহজ নহে। তথাপি রামেন্দ্রবাবু ও জগদানন্দবাবু এ বিষয়ে অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং প্রধানতঃ তাহা তাঁহাদের ভাষার গুণে। বাস্তবিক ইঁহাদের লেখা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক।

বাঙ্গালা ভাষায় 'গতিবিজ্ঞান' ও 'তাপ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর 'জগৎকথা' প্রকাশিত হইবার পরে পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়েরও মূল কথাগুলি সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু 'আলো', 'শব্দ', 'চুম্বক', 'তাড়িত' প্রভৃতি বিষয় লইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ পুস্তক লেখেন নাই। জগদানন্দবাবুর চেষ্টায় সে অভাব কতকটা দূরীভূত হইল; এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এখানে আমরা তাঁহার নব প্রকাশিত 'চুম্বক' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১। কাগজ, ছাপা ও চিত্র:—এ পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও চিত্র সকলই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে ইহা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও ইংরাজী পুস্তকের তুলনায় ন্যূন নহে। ছবিগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া আঁকা হইয়াছে; বিশেষতঃ চৌম্বক-বল-রেখার চিত্রগুলি বাস্তবের অবিকল প্রতিকৃতি হওয়ায় যথোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু চিত্রগুলির ব্যাখ্যান উদ্দেশ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ ইংরাজী অক্ষর (N, S, a_1, a_2 প্রভৃতি) ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

২। পরিভাষা:—'Pole'-এর বাংলা জগদানন্দবাবু 'মেরু' করিয়াছেন। কেহ কেহ পূর্ব্বে 'ধ্রুব' শব্দটা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু 'মেরু' কথাটাই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

'Induction'-এর প্রতিশব্দ 'আবেশ', magnetic field = বলক্ষেত্র, Permanent magnet = স্থায়ীচুম্বক, Line of force = বলরেখা, Declination = দিকপতন, Cell = বিদ্যুৎকোষ, Vertically = লম্বভাবে, Horizontally = অনুপ্রস্থভাবে প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় "তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, উহাতেও 'Line of force' অর্থে 'বলরেখা', 'Magnetic field' অর্থে "চৌম্বক-বল-ক্ষেত্র" 'Induction' অর্থে "আবেশ" "Cell" অর্থে "বিদ্যুৎকোষ" ব্যবহার করিবার পক্ষে ইঙ্গিত ছিল।

কিন্তু 'Electromagnet'-এর প্রতিশব্দ 'বৈদ্যুৎ চুম্বক', 'Inclination'-এর প্রতিশব্দ 'অধঃপতন' প্রভৃতি সেরূপ উপযোগী হয় নাই। অথচ কিরূপ প্রতিশব্দ ঠিক অর্থজ্ঞাপক এবং মোলায়েম হইবে সহসা তাহা বলাও সহজ নহে।

৩। ভাষা:—পুস্তকের ভাষা আগাগোড়া সরল। বালকবালিকাগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সে জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যাপ্রণালীও অনেক স্থলে সুন্দর

হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ২৮ পৃষ্ঠায় চুম্বক ভাঙ্গা ব্যাপারটাকে রক্তজীবের হনন ব্যাপারের সহিত তুলনা কর', অথবা ২২ পৃষ্ঠায় চুম্বকের মাঝামাঝি জায়গায় কেন চুম্বকশক্তি থাকে না তাহার ব্যাখ্যা, কিম্বা ২৬ পৃষ্ঠায় চৌম্বক আবেশের (Magnetic Induction) সহিত ভূত-চাপার তুলনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন কোন স্থলে ভাষার ত্রুটিও লক্ষিত হয়; যথা :—

(ক) ৬পৃঃ—"তোমরা যদি কোন চুম্বককে এই রকমে সুতা বাঁধিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখো তবে দেখিবে একটু ঘুরপাক খাইয়া সেটি তাহার একপ্রান্ত উত্তরে এবং আর এক প্রান্ত দক্ষিণে রাখিয়া স্থির থাকিবে।" "ধরিয়া রাখো"র পরিবর্ত্তে "ঝুলাইয়া রাখো" বলা ভাল।

(খ) ১১ পৃঃ—"কিন্তু কম্পাসের কাঁটাকে স্থির না রাখিলে তাহা উত্তরদক্ষিণে দাঁড়ায় না।" "স্থির না রাখিলে" পরিবর্ত্তে "স্বাধীনভাবে ঘুরিতে ফিরিতে না দিলে" বলা ভাল।

(গ) ১৬ পৃঃ—"এই আকর্ষণবিকর্ষণ লইয়া আজকাল অনেক কল তৈয়ারী করা হইতেছে।" "আকর্ষণ বিকর্ষণকে ভিত্তি করিয়া" বলিলে ভাল হয়।

(ঘ) ৫০ পৃঃ—"চুম্বক হইতে যত দূরে যাওয়া যায় তাহার বলক্ষেত্রের শক্তির তত কমিতে থাকে"। 'যত' ও শব্দ proportionality বা সমানুপাত ইঙ্গিত করে, সুতরাং আপত্তিজনক। 'তত' না বলিয়া "তাহার বর্গের অনুপাতে" বলিলে ঠিক হয়, এবং নিয়মটাও ঠিকমত প্রকাশ করা হয়। কঠিন হইবে বলিয়া নিয়মটা চাপা দিয়া গেলেও 'যত' 'তত' শব্দের প্রয়োগ এ সকল স্থানে সঙ্গত নহে। ইহাতে ভুল শিক্ষার আশঙ্কা থাকে। রামেন্দ্রবাবু এইরূপ অর্থে অনেক স্থলে 'যত তত' প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐ রূপ প্রয়োগের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

(ঙ) ৫১ পৃঃ—"সুতরাং এখানকার আকর্ষণের দিক অন্য রকম হইয়া গিয়াছে।" "বল ক্ষেত্রের দিক" বলা যুক্তি সঙ্গত।

(চ) ৬৪ পৃঃ—চুম্বকের উপরে পৃথিবীর Directive action-এর ব্যাখ্যা বালক বালিকাগণের উপযোগী হয় নাই।

৪। ভুল ভ্রান্তি :—পুস্তকের স্থলে স্থলে ভুল-ভ্রান্তি লক্ষিত হয়। নিম্নে ছোট খাটো ভুলের গোটা কয়েক উদাহরণ দেওয়া গেল—

(ক) ১৭ পৃঃ—"তোমরা হয়ত বলিবে ডাইনের খণ্ডে উত্তরমেরু এবং বামের খণ্ডে দক্ষিণমেরু থাকিবে।" চিত্র অনুসারে বলা উচিত "তোমরা হয়ত বলিবে বামের খণ্ডে কেবল উত্তরমেরু এবং ডাইনের খণ্ডে কেবল দক্ষিণমেরু থাকিবে।"

(খ) ২১ পৃঃ—"কিন্তু সেই লোহাকেই যখন চুম্বক করা যায় তখন তাহার প্রত্যেক অণুর দক্ষিণমেরু একদিকে এবং উত্তরমেরু অন্য দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ায়।" "প্রত্যেক অণুর" বলিলে ভুল হয়, "অণুগুলির" বলিলে ততটা ভুল হয় না।

(গ) ২৩ পৃঃ—"চুম্বকের শক্তি যে তাহার অণুর ভিতরেই থাকে..............."। "অণুর ভিতরেই" আপত্তিজনক।

(ঘ) ২৩ পৃঃ—"খানিকটা লোহার গুঁড়াকে একটা কাচের নলের মধ্যে পুরিয়া কোন বড় চুম্বকের কাছে রাখো। ইহাতে গুঁড়ার এক প্রান্তে উত্তরমেরু এবং অপর প্রান্তে দক্ষিণ-মেরুর লক্ষণ দেখা যাইবে। এখন সেই বড় চুম্বকখানিকে দূরে সরাইয়া ফেলো। দেখিবে, ইহাতে নলের ভিতরকার গুঁড়ার চুম্বকত্ব লোপ পাইবে না।" "লোহার গুঁড়া"র পরিবর্তে "ইস্পাতের গুঁড়া" এবং "কাছে রাখো"র পরিবর্তে "কোন বড় চুম্বকের একটা মেরু নলের উপর দিয়া টানিয়া লও" বলা ভাল।

(ঙ) ২৮ পৃঃ—"এই অবস্থায় N′S′ লোহার টুকরায় একটুও চুম্বকশক্তি থাকিবে না "একটুও" আপত্তিজনক।

(চ) ৫৩ পৃঃ—"তারপর গুঁড়া যাহাতে কাগজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তাহার জন্য উহাতে ধীরে ধীরে আঙ্গুলের টোকা দিয়াছিলাম।" "ছড়াইয়া পড়ে"র পরিবর্ত্তে "সহজে বল-রেখাক্রমে সজ্জিত হইতে পারে" বলা উচিত।

(ছ) ৫৪ পৃঃ—"তাহাতেই এককণা তাহার কাছের কণাকে আকর্ষণ করিয়া এই রেখার আকার পাইয়াছে।" "তাহাতেই প্রতিকণা বলরেখাক্রমে সজ্জিত হইয়া এই রেখার সৃষ্টি করিয়াছে" বলা যুক্তিযুক্ত।

(জ) ৭৬ পৃঃ—"কিন্তু লোহাটি যখন হেলান অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে যদি জোরে হাতুড়ির ঘা মারা যায়, তাহা হইলে প্রায়ই উহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হইয়া পড়ে।" এখানে "উহা সহজে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়" বলা যাইতে পারে; কিন্তু "উহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হইয়া পড়ে" বলা ঠিক নহে।

অপেক্ষাকৃত বড় রকমের ক্রটিরও কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(ক) ৪৯ পৃঃ—"দেখিবে বাক্সে আবদ্ধ থাকিয়াও চুম্বক কম্পাসের কাঁটাকে এবং লোহাকে টানিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, চুম্বকের আকর্ষণ কাগজ, কাঠ বা বাতাসের বাধা মানে না।.........কাজেই বলিতে হয় গ্রহনক্ষত্রেরা আকাশে থাকিয়া যে রকম বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে.........চুম্বকের আকর্ষণ সেই রকমই একটা কিছু।" কাগজ, কাঠ বা বাতাসের বাধা মানে না, কেবল এই ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া মাধ্যাকর্ষণ ও চৌম্বকাকর্ষণের সমজাতীয়তা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-বলক্ষেত্রে ও চৌম্বক-বল-ক্ষেত্রে একটা মস্ত পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত বলক্ষেত্রের সোণা-লোহার প্রতি ভিন্ন আচরণ দেখা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। বাস্তবিক মাধ্যাকর্ষণ-বল-ক্ষেত্রের এই বিশেষত্বকে ভিত্তি করিয়াই আইনষ্টান্ "বল"রূপে "মাধ্যাকর্ষণ-বল"টাকে একপ্রকার উড়াইয়াই দিতে চাহেন।

(খ) ৫৩ পৃ :—"কাঁটার উত্তরমেরু এই রকমে যে একটি বাঁকা পথ ধরিয়া চলিল তাহাই

একটি বলরেখা।" বলরেখার এই সংজ্ঞা আপত্তিজনক, কেন না চুম্বকমেরুর 'সংবেগ' বা Momentum রহিয়াছে ; সুতরাং উহা ঝোঁকের মুখেও চলিতে চাহে।

(গ) ১২ পৃঃ—"পৃথিবী জোড়া একটা প্রকাণ্ড চুম্বককে পৃথিবীর ঠিক মাঝ দিয়া চালাইলে এবং তাহার দক্ষিণমেরুকে খানিকটা পশ্চিমে হেলাইয়া রাখিলে, তাহা হইতে যে রকম কাজ পাওয়া যায়, পৃথিবীর চুম্বকশক্তিতে আমরা ঠিক সেই রকমেরই কাজ পাই।" "পৃথিবীজোড়া একটা প্রকাণ্ড চুম্বক" কথাটা ঠিক নহে। "প্রকাণ্ড চৌম্বকশক্তি সম্পন্ন একখানা খুব ছোট চুম্বককে পৃথিবীর ঠিক মাঝ দিয়া চালাইলে·· ·····" বলিলে ঠিক হয়।

(ঙ) উদাহরণ :—১৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর চুম্বকশক্তিতে কম্পাসের কাঁটার বিচলন ও তাহা বন্ধ করিবার উপায়, ডাইনামোর বৈদ্যুৎ-চুম্বকশক্তিতে ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হওয়া ও তাহা নিবারণের উপায়, ৮৫ পৃষ্ঠায় বৈদ্যুৎ ঘন্টা ও সুইচের চিত্র প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে। এই সকল উদাহরণ হইতে বালকবালিকাগণ কৌতূহলোদ্দীপক নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনায় অনেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে হইল ; কারণ বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের ভাষা সরল ও সরস হয়, ইহা যেমন বাঞ্ছনীয়, ইহার অন্তর্গত ব্যাখ্যাপ্রণালীও সর্ব্বত্র নির্ভুল হয় তাহাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ইহা কঠিন কার্য্য। রামেন্দ্র বাবু ও জগদানন্দ বাবু পথপ্রদর্শকরূপে এবিষয়ে অনেকটা সকলকাম হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের ভাষা একটা বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষা এজন্য ইঁহাদের নিকট ঋণী। কিন্তু গোড়াপত্তন হইয়াছে মাত্র, গণিতসম্বলিত উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞানের ভাষা (Mathematical physics) এখনও উপযুক্ত শিল্পীর অপেক্ষা করিতেছে।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ান—শ্রীযুত জীবনতারা হালদার, এম-এস-সি সম্পাদিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত একখানা সচিত্র মাসিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রতি সংখ্যা চারি আনা। আমারা সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ানের প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা পাইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য্য জগদীশ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় "প্রকৃতি"র জন্য বিশেষভাবে লিখিত ডাঃ হানশ্ মলীশের "সজীব আলোক" শীর্ষক ইংরাজী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রকৃতি"র পাঠকগণ শীতসংখ্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ব্যতীত আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই পত্রিকা খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটের উপর নানা তথ্যসম্ভারে সজ্জিত এই পত্রিকাখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-লাভেচ্ছুর উপকারে আসিবে। পত্রিকার ভাষা ও ছাপা বেশ ভাল। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক!

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

অর্কিড—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (কৃষিসম্পদ, কার্ত্তিক, ১৩৩৫)

আবহ-বিজ্ঞান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু (কৃষক, পৌষ ও মাঘ, ১৩৩৫)

উদ্ভিদের বিশালত্ব—শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ (কৃষক, পৌষ, ১৩৩৫)

ক্ষেত্রজ উদ্ভিদের অধোগতি—শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুর্ত্তা (কৃষি-সম্পদ, কার্ত্তিক, ১৩৩৫)

খাদ্যপ্রাণ—অধ্যাপক শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, এম-এস্-সি, এম্-বি (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

খাদ্য সংরক্ষণ ও তাহার প্রণালী—শ্রীনির্ম্মলানন্দ পালিত (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

জগতের পরিণাম—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

জড়ের গঠন—শ্রীফণিভূষণ রায়, বি-এস্-সি (শান্তি, পৌষ ও মাঘ, ১৩৩৫)

জীবজীবনের ক্রমবিকাশের গল্প—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু (সুবর্ণবণিক সমাচার, চৈত্র, ১৩৩৫)

জীবতত্ত্বের অ-আ—নৃপেন্দ্রকুমার বসু (সুবর্ণবণিক সমাচার, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

পদার্থের অবস্থান্তর—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩৫)

পিত্তকোষ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বাস্থ্য সমাচার, মাঘ, ১৩৩৫)

ফসলের রোগ—শ্রীসন্তোষবিহারী বসু (গ্রামের ডাক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩৫)

ভীষণদেহী সরীসৃপ—শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

শক্তি ও তাহার প্রবণতা—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত (মাতৃমন্দির, চৈত্র, ১৩৩৫)

শৈত্যমূলক সংরক্ষণ প্রণালী—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৩৫)

সাবান—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (স্বদেশীবাজার, ১ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা)

সূর্য্য—ডাঃ শ্রীমেঘনাদ সাহা (উত্তরা, মাঘ, ১৩৩৫)

হাতবাক্সে বেতার যন্ত্র—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় (বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩৫)

Printed and published by Sj. Raghunath Seal, B A., at the Calcutta Oriental Press, 107 Mechuábazar Street, Calcutta.